এক বসন্ত দুই ঋতু

মানব গঙ্গোপাধ্যায়

মডার্ন কলাম
১০/২এ, টেমার লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৯

প্রথম প্রকাশ : ১লা বৈশাখ ১৩৬৯ / এপ্রিল ১৯৬২

প্রকাশিকা : লতিকা সাহা। মডার্ন কলাম। ১০/২এ, টেমার লেন, কল-৯

মুদ্রাকর : দুলাল জানা। নিউ গঙ্গামাতা প্রিণ্টিং। ১৯ডি, গোয়াবাগান স্ট্রিট, কল-৬

প্রচ্ছদ : অনুপ রায়

আমার বাবা ও মা

ঁদিগিন্দ্র কুমার গঙ্গোপাধ্যায়

ঁনিবেদিতা দেবী

—সশ্রদ্ধ স্মরণে

ক'দিনই রাত হয়ে যাচ্ছে। শীতের সাতটা রাত না বলে উপায় কী? অপরাধবোধ নিয়ে নিজের ফ্ল্যাটের কলিংবেল টিপল। ভাবখানা যদি একটু দেরিও হয় দরজা খুলতে, তবুও রীনার মুখোমুখি হবার সময় একটু পেছিয়ে যায়। ততটুকুই লাভ। অস্থির হয়ে একবার করুণ চোখে ঘড়ির দিকে তাকাল কল্যাণ—যেন সময়কে পেছনে যেতে শেষ বারের মতো অনুরোধ।

দরজা খুলে গেল। রীনাকে দেখে মনে হল যেন এইমাত্র গা ধুয়ে চুল বেঁধে সবে ড্রেসিং টেবিল থেকে আয়নার কাছে বিদায় চাহনি চাচ্ছিল—ঠিক তেমনি সময় কলিং বেলের ডাক। না, কল্যাণ তা সচেতনভাবে ভাবেনি। অস্ফুটভাবে নিজের অগোচরে ভেবেছিল মাত্র। দরজা খোলবার সঙ্গে সঙ্গেই কল্যাণ বলল—বড্ড রাত হয়ে গেল আমার। ক'দিন ধরেই হচ্ছে ..... এমন বিশ্রী .....। বলতে বলতে ঘরের মধ্যে এসে দাঁড়াল।

—আমিও তো এই এলাম। আধঘণ্টাও হয়নি। রীনা কল্যাণের হাত থেকে ব্যাগটি নিয়ে যথাস্থানে রাখল—তারপর ড্রেসিং টেবিলের কাছে কল্যাণকে দাঁড় করিয়ে ওর টাই খুলতে খুলতে বলে—স্কুলে মেয়েদের একটা ফাংশন হবে বলছিলাম না—তারই গানের মহড়া। শেষে এত টায়ার্ড লাগছিল। এসে স্নান করবার পর—এখন বেশ ঝরঝরে লাগছে।

রীনার মুখের দিকে তাকিয়ে মনে হল—পুওর গার্ল। নিজের দেরিতে আসবার সঙ্কোচেই এত তন্ময়..... যাকগে যাকগে। কোনও হইচই না হবার অনারে একটা সিগারেট ধরাতেই হয়। সত্যি আজ ওর দেরি হয়েছে বলে নয় ওর দেরি না হলেও রীনা ক্ষমা করতে জানে—খুব একটা অন্যায় আবদার নেই। স্বামীকে স্বাধীনতা দিতে জানে। রীনার গুণের কথা ওর মনে পড়ে।

—তা নয়, দেরিতে এলে নিজেরই খারাপ লাগে । কল্যাণ জিজ্ঞাসু চোখে তাকায়। নিজেকে সৌখীন অপরাধে অভিযুক্ত করবার আকাঙ্ক্ষায়। অপরাধ-বিলাসের যদি একটা উচ্ছ্বসিত আবেগ অনুভব করা যায় এই ফাঁকে। নিজেকে অপরাধী বলে তারস্বরে চিৎকারের মধ্যে এক স্লাইস মহৎ হবার সুযোগ ঘটে।

—তা আর লাগে না। কিন্তু উপায় কী, বলো?

কল্যাণ এক মুহূর্ত শুধু রীনার ঠোঁটের সঙ্গে নিজের নিচের ঠোঁটটি লাগিয়ে বলে—উপায় কড়া শাসন।

রীনা কেমন একটু ম্লান হয়ে যায়।—কেন কড়া শাসন কেন?

—আমি দেরিতে এলে তুমি কৈফিয়ত দাবি করতে?

—আমারও তো দেরি হয়।

—তুমি বুঝি সেই ভয়ে কিছু বলো না। পুওর গার্ল। তোমার দেরি হলেই আমার দেরি করবার অধিকার নেই—আমার দেরি হবে বলে তেমনি তোমার দেরি করে আসবার অধিকার নেই। কেউ বোম ছুড়বে বলে তোমার বোম ছোড়বার অধিকার জন্মায় না। রীনা আস্তে আস্তে বলে—ঠিক সময়ে কারোরই আসা সম্ভব নয়। ট্রামে বাসে তো আসতে হয়। তিনটেয় ট্রাম বন্ধ হল তো—পাঁচটায় বাস বন্ধ। ট্যাক্সি ধর্মঘট করে তো—রিক্সাওয়ালারা কোথাও যেতে নারাজ—এখানে বোমা—ওখানে স্ট্রাইক। এ অবস্থায়—

—রাইট রাইট। গুলি, সংঘর্ষ, বোমা, খুন যেখানে রোজকার ব্যাপার সেখানে—ঠিক বলেছ। কারেক্ট। কল্যাণ খুশি হয়ে সোফায় বসে পড়ে। বসে আবার তক্ষুণি জামাকাপড় ছাড়বার জন্যে ওয়ার্ডরোবের কাছে যায়—গিয়ে তাড়াতাড়ি শার্ট-প্যান্ট খুলতে শুরু করে—ওর এমনি ব্যস্তভাব, চঞ্চলভাব দেখে রীনা খুশি হয় জেনেই এখন সেই ভাব ফুটাতে ব্যস্ত হয়ে ওঠে। নিজের এই হাসিখুশি চঞ্চলভাব যে স্বতঃস্ফূর্ত নয়, এমনকী রীনা রাগ না করবার আনন্দও নয়, রীনার রাগ না করবার ঠিক পুরস্কারও নয়, রাগ না করবার ঠিক ঘুষও নয়, ঘুষ ও পুরস্কারের মাঝামাঝি এক তোষামোদজনক আচরণ, একথা বুঝেও না বুঝবার চেষ্টা করে কল্যাণ ভাবে, রিয়ালি মেয়েরা এমন প্র্যাকটিক্যাল কারণ দেখাতে পারে। নিজেকে খুব খুশি ও সুখী মনে করতে চেষ্টা করে। লাভলি অফিস ও বিউটিফুল হোম—নিজের এই সংসার ও অফিসকে ওর সুখী হবার আদর্শজনক পরিস্থিতি বলে হঠাৎ এক ঝলক আশ্বাস ওর চেতনায় মুহূর্তের জন্য স্পষ্ট হয়ে দেখা দেয়। ভাবে আগামিকালই রীনাকে কিছু প্রেজেন্ট করতে হবে। না, না, বই নয়। বই পেলে খুশি হবার ভান করতে হয়—নইলে কালচার্ড ভাবে না এই ভয়ে। বই দিলে লোকের ইনফিরিয়রিটি কমপ্লেক্সকে এক্সপ্লয়েট করা হয়—নো, নো, একটা ভালো শাড়ি। তা ওর যত শাড়িই থাক—সেই শাড়ির সঙ্গে ম্যাচ করা ব্লাউজ। আটত্রিশ ইঞ্চি। কিছুক্ষণ আগেও আর দেরি করে বাড়ি না আসবার যে প্রতিজ্ঞা করেছিল—একবার সেই প্রতিজ্ঞার কথা উঁকি দিতেই কল্যাণ তা মন থেকে ঝেড়ে ফেলে দিল। মনে মনে শুধু নিজেকে শোনাল, রীনার আগে এসে হা-পিত্যেস করে করে স্ত্রীর জন্যে বসে থাকা সম্ভব নয়। আমি চাই, আমাকে রিসিভ করতে রীনা ঘরে থাকবে। ঠিক সময় অফিস থেকে বাড়িতে আসা—গার্হস্থ্য জীবনের ওপর অত্যন্ত স্ত্রৈণতা—অতখানি মিডওক্রিটির চর্চা—ইম্‌পসেব্‌ল।

কল্যাণের এই ছেলেমানুষি, এই ব্যস্ত ভাব, সঙ্কোচ, একটু স্ফূর্তি ও চোখমুখ রীনার মন থেকে গ্লানি অনেকটা দূর করে দেয়। জামা কাপড়গুলো গুছোতে গুছোতে ভাবে, বেচারী দেরি করে আসবার জন্যে কাঁচুমাচু হয়ে ঘরে ঢুকেছিল। মনে মনে সেই কাঁচুমাচু চেহারা ভেবে রীনা ঠিক করে, আগামিকাল ঠিক সময়ে আসবার চেষ্টা করবে। ওর খুশি ভাব, স্ফূর্তি রীনার মনেও প্রভাব বিস্তার করে। নিজেকে ওর সুখীই মনে হয়। এতক্ষণের সঙ্কোচ ও গ্লানি মন থেকে চলে যেতেই রীনা নিজের মনেও ঝরঝরে বোধ করতে চায়। কিন্তু ছেলেবেলা থেকে খুশি ভাবটাকে কেমন বিশ্বাস হয় না। মনে হয়, নিজেকে খুশি, সুখী মনে করলে একটু পরেই দুঃখ অনিবার্য। তাই মুখখানা হাসি হাসি রেখেও মনকে খুশি হবার সংবাদ না দেবার জন্যে খুশি ভাবকে দমন করতে চায়।

—আমাদের কর্মচারীরা বিক্ষোভ জানাল। চারটে থেকে একটানা স্লোগান। ঐ একজনকে বরখাস্ত করা হয়েছিল—তাকে আবার নেবার জন্যেই....।

—আমাদের আগামী মাসের গোড়ায় একদিনের প্রতীক ধর্মঘট হবে। সেদিন মিছিলে যেতে হবে।

—মিছিলে যেতে খুব লজ্জা করে, না?

—প্রথম প্রথম। কিন্তু মিছিলে বা ময়দানে যাওয়া, বক্তৃতা শোনা এগুলো ভয়ংকর নেশা। তোমাদের পান সিগারেটের চেয়ে কম নয়।

—আমি জানি, অতগুলো লোকের সঙ্গে আস্তে আস্তে এক হয়ে যাওয়া, সামান্য কথা শুনে হাততালি দেওয়া, কোরাসভাবে উত্তেজিত হওয়া, তুচ্ছ রসিকতায় আনন্দ পাবার শক্তি—নিজের জটিল ব্যক্তিত্বের হাত থেকে কিছু সময়ের জন্যে পরিত্রাণের নেশা যে কম নয় তা আমি জানি।

—বাব্বাঃ একসঙ্গে এত বড় বাক্য সারাদিনের খাটুনির পর ....। তোমারও কিন্তু বক্তা হবার প্রমিস ছিল।

—তোমার খুব খাটুনী না? আমি তো বারবার বলছি, তুমি চাকরি ছেড়ে দাও—যা পাই এতে খুব চলে যাবে। গান চর্চা করে তোমার সময় বেশ কেটে যাবে। গলা তোমার এমন ভালো।

—চলনসই। কিন্তু তা না। চাকরিটা এক ধরনের নেশা—

—আমাদের পান সিগারেটের মতো—না মিছিলে ময়দানে যাবার মতো?

—মেয়েদের চাকরি ভিন্ন ধরনের নেশা—আমি আর ভাবতেই পারি না সারা দুপুর একা একা কোনও কাজ নেই—গান করি বটে—শুনতেও ভালো লাগে—কিন্তু সারাসময় গানের চর্চা করতে আর তা না করলে ঠিক ভালো শিল্পী হওয়াও যায় না। সারাসময় সরগম—না, ভালো লাগে না।

—চাকরি আমাদের কাছে অনেকটা দাসত্ব—তোমরা কিন্তু চাকরিতে স্বাধীনতার স্বাদ পেয়েছ—তুমি চাকরি ছাড়তে চাও না—স্বাধীনতার স্বাদ চলে যাবে বলে—তাই না ডারলিং।

রীনা মাথা নেড়ে বলল—তাই। মিস্টার ডারলিং এবার তোমার ডারলিং কফি এনে আমার ডারলিংকে দিচ্ছে। কি বিচ্ছিরি ঐ ডারলিং শব্দটা তাই না?

রীনা এবার উঠে দাঁড়িয়ে বলল—তোমার তো বেশ বক্তৃতা আসে—তুমি কি ভাবতে পার—ঐ বক্তা হবার জন্যে তুমি চাকরি-বাকরি ছেড়ে বক্তৃতা শিল্প সারাদিন চর্চা করবে? আমিও গানের জন্যে চাকরি ছাড়ি কী করে?

—পেশাদার রাজনীতিক হলে হয়তো তাই করতুম। রাজনীতি আমার কাছে সময় কাটাবার সৌখিন বিষয় নয়—উগ্র নেশাও না—একটা অনিবার্য আপদ। আর বক্তৃতার ক্ষমতা—অতি তুচ্ছ গুণ—যার কোনও প্রেরণা আমার স্বভাবে নেই—ওর ওপর আমি নির্ভরও করি না। বাদ দাও—বড্ড সিরিয়াস বাক্য বলেছ সারাদিনের খাটুনির পর। এখন বরং ডারলিং কফিই .....।

—এই যাই .....।

চলে যাবার জন্যে পা বাড়াতেই কল্যাণ আঁচল ধরে রীনাকে আকর্ষণ করে—রীনা একবার জানলার পর্দার দিকে তাকিয়ে কল্যাণের গলাটা জড়িয়ে ওর কাছে দাঁড়ায়।

—তোমার সঙ্গে মীমাংসা করা যাক—সিজ ফায়ার প্রপোজাল—আমার বক্তৃতা শুধু তোমার জন্যে—তোমার গান আমার জন্যে।

—আমি গান করলেই তুমি বক্তৃতা দেবে নাকি?

—আমার হাততালি তোমার জন্যে। তোমার হাততালি আমার জন্যে।

রীনা গলা থেকে হাত নামিয়ে সঙ্গে সঙ্গে একটু হাততালি দিয়ে বলল—এই বক্তৃতার জন্যে এখনই নগদ হাততালি দিয়ে দিলাম।

—নগদ না দিয়ে মাসকাবারেও দিতে পার—দাম একটু বেশি নেব—সেই সঙ্গে আরো দিতে হবে।

—জানি জানি। বলে রীনা পাশের ঘরে চলে গেল।

গ্যাসে কফির জল চাপিয়ে দিয়ে রীনা গুন্ গুন্ করে গান করে। যেন নিজের কানে একবার পরখ করে নিতে চায়, কেমন গান ওর হতে পারে। 'আমি জেনেশুনে বিষ করেছি পান'।

কল্যাণ সোফা থেকে ঘাড় ফিরিয়ে বলল—কি হচ্ছে, 'করেছি পান'। গানটি এত চারদিকে হচ্ছে—জান, সেদিন সান্যালের নতুন বউকে গাইতে বলা হলে দুটো গান করল—তাতে একটা 'করেছি পান'—আর 'ভরা থাক স্মৃতি সুধায়'।

—'ভরা থাক স্মৃতিসুধায়' তো ফেয়ারওয়েলের গান।

—একটা গান যখন একবার ওঠে—তখন চারদিক থেকে সবাই এমন ভাবে তা গাইতে শুরু করে—যাতে অচিরেই ঐ গানটি আমাদের অ্যালার্জি হয়ে দাঁড়ায়। সুন্দর সুন্দর গানকে কচলে-কচলে তেতো করে দেওয়া আমাদের জাতীয় চরিত্রের একটা ক্রিমিনাল টেনডেনসি। না, না, তোমার থামতে হবে না। গানকে জনপ্রিয় করতে আমরা জানি না—আমরা গানকে সস্তা করে ফেলি। গানকে আমরা ব্যবহার করি—প্রয়োগ করতে জানি না। তোমার থামলে চলবে না—তুমি নট গিল্টি।

পট ভর্তি কফি এনে রীনা এক কাপ তৈরি করে কল্যাণকে দেয়। নিজেও এক কাপ নিয়ে সোফায় হেলান দিয়ে বসে।

চুমুক দিয়ে রীনা বলে—রাত করে কফি খেলে কিছুতেই ঘুম আসতে চায় না।

—তা হলে বলো, জেনে শুনেই কফি করেছি পান।

একটু হেসে রীনা বলে—ঘুম না এলে পরদিন কাজকর্ম কিছু করা যায় না।

—পরদিন রোববার হলে ভালো হয়। শনিবার রাতে না ঘুমুলেও চলে, কেমন।

—তা কি হয়। তাহলে রোববার দুপুরে ঘুমিয়ে পড়ব। আর দুপুরের ঘুমের জন্য রোববার রাতে ঘুম হবে না। সোমবার যা কষ্ট হবে।

—তুমি কষ্টকে খুব ভয় পাও—তাই না?

—তোমার বুঝি কষ্টকে ভয় নেই—আমি বুঝি একলা। না, মেয়েমানুষের কষ্টকে গ্রাহ্য করতে নেই, তবে ....

—ভয় করতেই আমার ভয় লাগে শুধু—আর কিছুতেই নয়।

—বাব্বা, নেপোলিয়ন না হিটলার শুনি?

—নেপোলিয়ন। রোমান্স ও অ্যাডভেঞ্চারে।

—রোমান্স তো বুঝলাম—অ্যাডভেঞ্চার।

—আমার রোমান্সই অ্যাডভেঞ্চার।

ঠিক একই ধরনের চিন্তা দুজনের চেতনায়। কল্যাণ ভাবে, রোমান্সের অ্যাডভেঞ্চার বলবান পুরুষেরই সাজে। নিজেকে খুব শক্তিশালী পুরুষ বলে মনে হয় হঠাৎ। মনে হয়, প্রেমের পৌরুষ শুধুমাত্র একটি সংখ্যায় নিঃশেষ হয়ে যাওয়া একনিষ্ঠতা বাড়াবাড়ির উদাহরণ হতে পারে—পৌরুষের লক্ষণ তা নয়। হৃদয়ে যে অনেককে স্থান দিতে পারে—হৃদয় যার ফিউডল ক্যাসেলের মতো বিরাট—বা স্কাই স্ক্র্যাপারের মতো উঁচু, যেখানে কতজনের স্থান হতে পারে সে কেন....।

কল্যাণ হঠাৎ রীনার দিকে মুগ্ধ দৃষ্টি তুলে বলে—আজকে রিয়ালি তোমাকে.... এত চমৎকার....। নিজের ঠোঁটটা দিয়ে উপরের ঠোঁটটা চেটে রীনা চোখ দিয়ে শুধু জিজ্ঞাসা চিহ্ন ফুটিয়ে তোলে। যে চিন্তা থেকে উঠে রীনা কল্যাণের মুগ্ধতায় সাড়া দিল তা হচ্ছে অ্যাডভেঞ্চারের সম্মান আছে—মর্যাদা আছে—কিন্তু একাধিক রোমান্সের ব্যাপারে সেই মর্যাদা বা সম্মান নেই। সেখানে আছে বিশ্বাস ভঙ্গ করবার গ্লানি। অসৎ হবার অপবাদ—লজ্জা, অপমান, গ্লানি বা অপমৃত্যু। না, রোমান্সের ব্যাপারে অ্যাডভেঞ্চার কথাটি হয়তো খাটে না। রোমান্সের ব্যাপারে অনেক দেশ দখল কেউ চায় না। মুখে যাই বলুক। অ্যাডভেঞ্চার বলতে এখানে বহু প্রেমের দিগ্বিজয় যদি বুঝিয়ে থাকে—তা হলে কেউ তা মানে না। চায়ও না। সেখানে সকলেই রক্ষণশীল। একথাগুলোই ভাসছিল রীনার মনে। চোখে চোখ রেখেই রীনা আসন্ন এক পশলা আদরের জন্যে প্ররোচনাদায়ক অপেক্ষা করতে থাকে।

আদরের জন্যে রীনাকে অপেক্ষা করতে দেখে কল্যাণ ক্লান্তি বোধ করে। অল্প একটুখানি আদর করাই তার ইচ্ছে ছিল—কিন্তু রীনার চোখমুখের মধ্যে একটা লম্বা প্রোগ্রামের প্রত্যাশা দেখে কল্যাণ ভীত হয়ে ওঠে। আদর করবার জন্যে কিন্তু ভিতরের তাগিদ ছিল না—ঝোঁকের মাথায় মনের আনন্দে নৈতিক কর্তব্যমাত্র করতে যাচ্ছিল। রীনাকে আদর করলে রীনার ওপর ঠিক সুবিচার করা হয়—এমনি ধরনের একটা অস্পষ্ট চিন্তামাত্র মাথায় ছিল—কিন্তু এখন যেন বড্ড ক্লান্ত লাগছে—রীনার সাড়া দেওয়াকে এড়িয়ে চলা যায় না....। জেনে শুনেই বিষ পান করতে হবে এখন।

রীনার কানের কাছে মুখ নিয়ে একটু হেসে বলে—ভাবছ অফিস থেকে এসেই শুরু করেছে।

কিন্তু রীনা কথাটি স্বীকারও করে না, অস্বীকারও করে না। বরং চোখে মুখের নিবিড়তায় অস্বীকারের চিহ্নই আস্তে আস্তে গভীরতর হতে থাকে। এমনি সময় কত কথাই না বলে, সে সব শুধু হাসি মুখে শুনে যেতে হয়—ও নিয়ে মাথা ঘামাতে নেই।

হঠাৎ সোফার মধ্যে মাথা এলিয়ে গম্ভীরভাবে কল্যাণ বলে—না, আর নয়, নিজেকে শেষ পর্যন্ত সংযত করতে পারব না—তোমার মতো তো নই। নিজের ওপর অতখানি জোর তো আমার নেই....এই সন্ধ্যা বেলাই...।

রীনা ঠিকঠাক হয়ে বসে।

কল্যাণ অস্বস্তি বোধ করতে থাকে। রীনার যে অনিচ্ছা ছিল না এ ভাবটি বুঝেও না বুঝার ভাব করলাম বলে রীনা সন্দেহ করছে না তো—ক্ষুণ্ন হল হয়তো। কিন্তু উপায় কী? ভালো লাগছে না এখন।

রীনার আদর পাবার ইচ্ছাটিও ঠিক কিন্তু আন্তরিক ছিল না—কতকটা স্বামীর প্রতি কর্তব্য, কিছুটা নিজের আনুগত্যকে প্রকাশ করা। কিছু ইচ্ছাও বটে। কল্যাণ হঠাৎ নিজেকে সংযত করায় রীনাও স্বস্তি বোধ করে—উঠে যাবার তাগিদ ভিতরে স্পষ্ট হয়ে উঠতে থাকে। অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে কেমন যেন ক্ষুণ্নও মনে হয় নিজেকে—মনে হয়, অনুগত দেখাতে গিয়ে যেন নিজেকে কাঙাল বলে পরিচয় দিলাম। তবে, বাধা কল্যাণের দিক থেকে আসায় নিজের বিবেক অনেক পরিষ্কার লাগে—নিজেকে হাল্কা লাগে কিন্তু কেমন একটা ক্ষীণ অপমান যেন সূক্ষ্ম কাঁটার মতো খচখচ করতে থাকে। যতই রীনা তাকে অগ্রাহ্য করবার চেষ্টা করুক না কেন। .... রোজ রোজ স্কুল থেকে ফিরে নিজের ঘর ঠিক আছে কি না পরীক্ষা করে দেখবার পর সেই পুরনো হাল্কা বোধটি সবে দেহে মনে দেখা দিতে শুরু করেছিল। ভাবে, কল্যাণ নিজেকে সরিয়ে নেবার জন্যে কিছুক্ষণ মুখ ভার করে থাকবে নাকি—তারপর শোবার সময় একটু চোখের জলের মধ্যে দিয়ে....না না তাতে মনে করবে—বড্ড হ্যাংলা ....আমি আদর কম হওয়াতে....তা হয় না। উঠে যেতে যেতে মনে হল কল্যাণ যে সংযত নিছক এই প্রশংসাটি প্রমাণ করবার জন্যেই এই কৃত্রিম সংযম।

রান্নাঘরে গিয়ে তক্ষুণি ফিরে এসে সোয়েটার খুলে আবার রান্নাঘরের দিকে যাবার সময় আড়চোখে তাকাতেই কল্যাণ বলে—আগের যুগ ছিল ফিউডাল—নেপোলিয়নদের —কিন্তু আমাদের যুগের প্রায় দু'রুম ফ্ল্যাটে দুটি হৃদয়ই হাত-পা ছড়িয়ে থাকতে বড্ড বেশি ঘেঁষাঘেঁষি করে ফেলে। এখানে অ্যাডভেঞ্চার মানে থার্ডক্লাস স্লিপার কোচে পুরী যাওয়া, আর রোমান্স বলতে পিকনিক পার্টি শীতকালে।

রীনা মাথা নিচু করে শুনল। কেন যেন কল্যাণের চোখের দিকে তাকাতে পারে না। রাগ নয়—কেমন যেন লজ্জা। শেষ হবার অপেক্ষায় থাকে। কল্যাণ একটু চুপ করতেই রান্নাঘরে চলে আসে। ওর যে অভিমান হয়েছে একথা প্রমাণ হয়ে গেল। অথচ ওর অভিমান হয়নি—কেন যেন লজ্জা করছিল আসতে। কেন লজ্জা করছিল? শুধু লজ্জা যে তাই নয়, কেমন তাকাতে ইচ্ছাও করছিল না। ...বেশি আদর না করাতেই বুঝি অভিমান করলাম। এই হয়তো ভেবে বসল। ....আজকাল কেন যেন ওর সৌখীন কথাগুলো ভালো লাগে না। শুনে মুগ্ধ হওয়া দাম্পত্য নিয়ম—তাই প্রশংসা করতে হয়েছে। এক এক সময় যে খারাপ লাগে তা নয় ... তবে। অভিমান যে হয়েছে তা ঠিক নয় তবে নিজেকে সংযত বলে প্রমাণ করার চেষ্টায় যেন রীনার আকর্ষণকে একটু ক্ষুণ্ন করে ফেলেছে .... হঠাৎ এ সাধুপুরুষ হবার ইচ্ছে হল কেন? ঐ এক বাহাদুরি ...। যাকগে ...।

কল্যাণ বুঝল, রীনা পুরনো স্মৃতির খপ্পরে পড়েছে। আগে আগে সেই বিয়ের প্রথম যুগে, অফিস থেকে এসে আদরের ঘটা চরম সীমায় গিয়ে পৌঁছত। সেই স্মৃতির সঙ্গে আজকের ঠাণ্ডা সংযমের তুলনা করেই রীনা ক্ষুব্ধ হয়েছে। তা আর কী করা যাবে।

রীনা ক্ষুব্ধ হয়েছে ভেবে কল্যাণও ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। রীনার সম্পর্কে একটু ক্ষুব্ধ বা ক্রুদ্ধ হলে কল্যাণের কেমন যেন একটু আনন্দ হয়—একটা নিষ্কৃতি পাবার পথ খুঁজে পায়। এ সময় রমাকে মনে পড়ে। এ সময় রমাকে মনে পড়ায় আত্মগ্লানি অনেক কম থাকে। আজ রমা বলছিল... তোমার দেরি হয়ে যাচ্ছে। ... দেরি হয়ে গেল আমার, দেরি হয়ে গেল ... এমনি কথা বারবার বলে আমার মনে সত্যিই অপরাধবোধ জাগিয়ে তুলেছিল। খাঁটি ফ্যাসিস্ট পদ্ধতি। শেষ পর্যন্ত দেরি করে ফেলবার মানসিক অশান্তি নিয়ে বাড়ি এলাম। এমন কিছু দেরি হয়নি। সন্ধ্যের সময় বাসায় ফিরতে হবে—এমন কোন নিয়ম নেই। সন্ধের সময় অফিস থেকে বাসায় ফেরা একটা ছা-পোষা প্রথা মাত্র—কোন প্রাকৃতিক নিয়ম নয়। মাত্র কিছুক্ষণ আগে রীনা ফিরেছে। ....রমা বারবার ওকে বাড়ি যেতে বলে ওর বাড়ি যাবার আগ্রহ ও স্ত্রীর ওপর আকর্ষণ মাপতে চায়, তা কল্যাণ বোঝে। তবু ভেতরে ভেতরে কেমন অস্থির হয়ে ওঠে যদিও তা প্রাণপণে গোপন থাকে। নিতান্ত রমার বারবার অনুরোধে একান্ত অনিচ্ছা নিয়ে যাচ্ছে এমন ভাব করেই চলে আসে কিন্তু রওনা হবার সঙ্গে সঙ্গে একটা প্রবল আত্মগ্লানি ও অপরাধবোধ মনকে দারুণ উদ্বিগ্ন করে তোলে। বারবার ভাবে, আর নয়। তাছাড়া ফিরে আসতে আসতে ভাবে, রমার কাছে অত গেলে, এতক্ষণ থাকলে নিজের মূল্য বড় কমে যাচ্ছে। ওর সঙ্গে একটু বিরহ হবার দরকার। ক'দিন ছুটির পর একসঙ্গে না কাটিয়ে দেখা যেতে পারে রমা কী করে। কিন্তু রমাকে ছুটির পর না দেখলে ওর যে চলে না, তা নয়। ভরসা পায় না। মনে হয়, দু'দিন দেখা না হলেই রমা আর রমা থাকবে না। রমাকে পরীক্ষা করা যায় কিন্তু সাহস হয় না। সাহস হয় না ফলের দিকে তাকিয়ে। যদি রমা ফেল করে। যদি প্রমাণ হয়, ওর উপর রমার আকর্ষণ নেই। তখন? ... রীনার ক্ষুব্ধতা কল্যাণের মনে শক্তি সঞ্চার করে—ওর অমন উপমা মাঠে মারা যাওয়ায় কেমন যেন একটু বঞ্চিতও বোধ করে। বঞ্চনার বেদনা ও ক্ষুব্ধতা থেকে শক্তি জোগাড় করে কল্যাণ ভাবে, আগামীকাল থেকে যখন খুশি তখন ফিরব। রমার সঙ্গে যদি অতক্ষণ থাকতে না পারি, রাস্তায় রাস্তায় ঘুরব। ঠিক সময়ে বাসায় না ফেরবার একটা ট্র্যাডিশন তৈরি করতে হবে—অভ্যাসও। কোনদিন ছ'টা কোনদিন ন'টা। ... কেমন একটা ক্ষোভও জাগে। রমার কথাবার্তার মধ্যে কেমন যেন আমাকে কৃতার্থ করছে এমনি একটা ভাব—কেমন যেন একটা অহংকারের সূক্ষ্ম প্রাচীর সবসময় ওকে ঘিরে থাকে—তা ভাঙা যায় না। এখন কল্যাণের মনে হয় যেন অনেক কষ্টে রমার মনোযোগ আনতে হয়। টেনে ধরে রাখতে হয়। যেন রমার মনোযোগ অনেকটা ইলাস্টিক—কল্যাণ ছেড়ে দিলেই অমনি নিজের অহংকারের প্রাচীরে গিয়ে আত্মরক্ষা করবে। কল্যাণ যখন সামনে থাকে তখন এত ওকে নিয়ে ব্যস্ত ও তন্ময় হয়ে থাকে—রমার মনোযোগ যে জোর করে ধরে রাখছে তা খেয়াল হয়নি। এখন মনে হয়—এ যেন একটা কষ্টকর অভ্যাস—কতকাল চলবে কে জানে। ...রীনার কাছে নিজের কথাগুলোর বিনা প্রশংসায় বাতিল হয়ে যাবার স্মৃতি হঠাৎ মনে অন্যমনস্কভাবে খেলে যায়—তা থেকে যে ক্ষোভের সঞ্চার হয়—সেই তাপে কল্যাণ ভাবে রমাকেও বুঝিয়ে দিতে হবে কল্যাণ চ্যাটার্জি হ্যাংলা নয়—একটু ইনডিফারেন্ট আর না হলেই চলছে না। কিন্তু নিজের ভেতরে ইনডিফারেন্ট হবার কোন রকম জোর

অনুভব না করতে পেরে কল্যাণ বারবার বলতে থাকে ইনডিফারেন্ট হতেই হবে—না হয়ে উপায় নেই—ও-ই বাধ্য করছে—রেসিপ্রসিটি থাকা চাই-তো। ইনডিফারেন্স, ওনলি সলিউশন।

ঠিক এমনি সময় রান্নাঘর থেকে রীনার গান ভেসে আসে—'আনন্দধারা বহিছে ভুবনে'। সঙ্গে সঙ্গে কল্যাণের মন আনন্দে সক্রিয় হয়ে ওঠে। গানের সিমবলের মধ্য দিয়ে রীনা জানাচ্ছে—ও রাগ করেনি—রাগের ছলনা ছিল। খুশি হয়ে কল্যাণ ভাবে—রমার ওপর ইনডিফারেন্ট নয়—একটু অভিমান দরকার—ঠিক মেয়েলি ধরণের মুখভার করা অভিমান—একটু পুরুষের মতো অভিমান—যেন কল্যাণ নিরাশ হয়ে পড়েছে, রমার মন পাবার আশা ছেড়ে দিতে বাধ্য হচ্ছে—অভিমানের মধ্যে একটু হতাশা থাকবে, নিরাশা থাকবে—ছেড়ে চলে আসবে এমনি ভয় দেখানো ভাব থাকবে—মানে সূক্ষ্মতর ইঙ্গিত থাকবে। গান ভেসে ভেসে আসতে থাকে। ওর মনে রীনার জন্যে স্নেহ জেগে ওঠে। ও যে রাগ করেনি—গানের মধ্যে দিয়ে সেই আবেদন জানাচ্ছে। পুওর গার্ল। রীনার ওপর কৃতজ্ঞতা হিসেবে কল্যাণ ভাবল, দেখতে গেলে রীনাই বেশি সুন্দরী। রীনার রঙ কেমন উজ্বল—চোখ, নাক, মুখের গঠন—সেই তুলনায় রমা হয়তো রীনার মাথায় মাথায়—কিন্তু অমন স্পষ্ট রূপ যেন রমার নেই। রমাকে হঠাৎ দেখলে ভালো লাগে—খুঁটিয়ে দেখলে অতো ভালো নাও লাগতে পারে। কিন্তু রীনাকে দেখলে মুহূর্তেই মুগ্ধ হতে হয়—খুঁটিয়ে দেখলে মুগ্ধ হবার কারণ পাওয়া যায়। নিরপেক্ষভাবে রমার সৌন্দর্য বিশ্লেষণ করতে পেরে কল্যাণের আনন্দ হয়—কাউকে ভালোবাসলেই তাঁর সম্পর্কে নিরপেক্ষ হতে পারার দুর্লভ ক্ষমতা নিজের মধ্যে অনুভব করে চাপা আত্মতুষ্টি বোধ করে। সঙ্গে সঙ্গে ভেবে নেয় রীনার গানও প্রথম শ্রেণীর নয়—ঘষলে মাজলে মন্দ নয়—চলনসই—খুব খারাপ নয় অবশ্য—কণ্ঠ-লাবণ্য আছে—ভালোই লাগে... রেডিওতে অনেক গানই এর চেয়ে খারাপ হয় তা ঠিক...তবে রবীন্দ্রসঙ্গীত হবে—উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত কতটা হবে বলা শক্ত ... এটা অবশ্য মালকোষ। মন্দ হয়নি। গান শেষ হতে চলল। বেশ মেজাজ এসেছে গানে। এখুনি উঠে গিয়ে কল্যাণের তারিফ করে আসা উচিত-শুধু গান তো নয়- এযে আত্মসমর্পণ—প্রায় মুখ ফুটে বলবার মতো। রাগ করিনি। কিন্তু কল্যাণ উঠতে পারছিল না। কেমন যেন ইচ্ছা করছিল না। গানের সুরে ওর মধ্যে যে নেশার সঞ্চার হয়েছিল তাতে ভাবতে ইচ্ছে করছিল—রমাকে কোথাও একা নিয়ে চলেছে—হয়তো ট্রেনে ফার্স্ট ক্লাসে একা—কিংবা ট্যাক্সিতে কলকাতা থেকে ডায়মন্ডহারবার—লম্বা পথ। কিন্তু চিত্রটি আঁকতে পারছিল না ভালো করে, ভেতর থেকে বাধা পাচ্ছিল। এক হচ্ছে এখুনি উঠে রীনার কাছে যাবার প্রয়োজন—এখুনি উঠলে ছবিটি ভেঙে ফেলতে হয়। দুই হচ্ছে, রমার রূপের আন্তরিক স্বীকৃতি দিতে না পারবার জন্যে যেন রমার সঙ্গে যাবার ছবিটি, কেন যেন ঠিকমতো আঁকবার প্রেরণা পাচ্ছিল না। তিন নম্বর, গানটি কল্যাণের বেশ ভালো লেগেছিল—তাই উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত হবে না বলে একটু আগেই যে রায় দিয়েছিল মনে মনে—সেই রায় ওকে লজ্জা দিতে শুরু করেছিল। চার হচ্ছে, শীতকালে এক জায়গায় বসলে সেই গরম করে নেওয়া জায়গা থেকে উঠবার অনিচ্ছা। ভাবল কল্যাণ—নিরপেক্ষ হতে গেলে হয়তো সত্য পাওয়া

যায়, সবাইকে চটিয়েও দেওয়া যায় কিন্তু স্বস্তি পাওয়া যায় না। শান্তি দূরে থাকে। গান যখন শেষ হল—তখন গান শোনবার আনন্দের চেয়ে—গান শোনবার দায়িত্ব ওকে রীতিমতো ক্ষুব্ধ করে তুলল।

আজকাল স্কুলে যাওয়া রীনাকে নেশার মতো পেয়ে বসেছে। সকাল থেকেই সমস্ত দেহ-মন অধীর হয়ে ওঠে। বরং সকালে কাজ বেশি থাকাতে ওর ভালোই লাগে। যাবার আগ্রহকে ভুলে থাকা যায়। আবার সন্ধ্যা হতে হতে বাড়ি ফেরবার জন্যে একটি প্রবল আগ্রহ ও আশঙ্কা বোধ করতে থাকে। ভয় ও আতঙ্ক ওকে স্কুল থেকে বাড়ির ফ্ল্যাটের দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দেয়। ফ্ল্যাটে ঢুকেই অনেক সময় ইচ্ছে হয় ঝপ্ করে সোফায় বসে অনেকক্ষণ ধরে ভাবে। নিজেকে একটু শান্তি ও আরাম দেবার ইচ্ছে হয়। নিরাপদে ও নির্বিঘ্নে একটু কল্পনা করতে ইচ্ছে হয়। কিন্তু এই সময় রীনা নিজেকে একটুও খাতির করে না। প্রায় ঝড়ের বেগে ওবেলাকার অগোছালো ও অপরিচ্ছন্ন ঘর দুটোকে একটু ভদ্রস্থ করে তক্ষুণি স্নানের জন্য বাথরুমে চলে যায়। কোনও মতে স্নান সেরে, সাজ-পোশাক শেষে ওর কল্পনা ও বিশ্রাম করবার সময় অনেক সময় বেশ কিছুক্ষণই জোটে। কিন্তু কল্পনা বা বিশ্রামের কথা তখন মনেও আসে না। বরং কল্যাণের জন্যে তখন অধীর হয়ে অপেক্ষা করতে থাকে। কল্যাণের অনেক আগে এসেছে একথা প্রতিষ্ঠা করবার জন্যে ঘর গোছানো, স্নান সারা, সাজ-পোষাক করা। বিশ্রাম না করা—অথচ কল্যাণকে দেখেই খুশি হয়ে ওঠে—তখন এতক্ষণের সমস্ত উদ্যোগকে ধূলিসাৎ করে দিয়ে বলে—আমিও এই এলাম। একটু আগে। ....গ্যাসে রান্না বসিয়ে রীনা মনে মনে ভাবতে থাকে, আগামিকাল বিমলেন্দুকে বলতে হবে- কর্তা শুধু গান নিয়ে থাকতে বলেছেন- মাস্টারি ছেড়ে দেবার জন্যে জেদ করছেন। যথাসম্ভব গম্ভীর ও বিষণ্ণ হয়েই বলতে হবে। কল্পনায় বিমলেন্দুর নিষ্প্রভ হয়ে যাওয়া চেহারা দেখে মন খুশি হয়ে ওঠে—সেই খুশির বেগে রীনা ভাবল, তখন কথা না বলে আসা ও তাকাতে না পারাকে রাগের লক্ষণ বলে ভেবে বসে আছেন। ভাবছেন হয়তো, আদরের খিদে না মেটাতেই গোঁসা করেছি—হয়তো আরো ভেবেছেন—আদরকে ঐ পর্যন্ত না নিয়ে যাওয়াতেই .....ছিঃ ছিঃ। রাগ মিটিয়ে ফেলবার জন্যে সঙ্গে সঙ্গে রীনা গান ধরল—'আনন্দধারা বহিছে ভুবনে।'

গান করতে করতে নিজের খুশিতে নিজেই উচ্ছসিত হয়ে ওঠে—অনেকগুলো অসংলগ্ন চিত্র ওর চেতনায় ভেসে তক্ষুণি মিলিয়ে যায়। মনে হয়, যদি সত্যি সত্যি কোনদিন রেডিওতে চান্স পায়—কল্যাণ হয়তো প্রোগ্রামটি শুনে মুগ্ধ হয়ে ওর দিকে এমন ভাবে তাকাবে—কিন্তু মুগ্ধ দৃষ্টি বলতে যেন বিমলেন্দুর চেহারাটাই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। প্রোগ্রাম শুনে বিমলেন্দুর মুগ্ধতা, হা হুতাশ সেই ক্রনিক অনুযোগ। গান করতে করতেই রীনা গভীর ভাবে ভেবে নেয়। ভাবতে ভাবতে একই সঙ্গে একটা তৃপ্তি বোধ করে—তৃপ্তির মধ্য থেকে একটা সূক্ষ্ম অস্থিরতা বের হয়ে আসে। এখন যেন বিমলেন্দুর মুগ্ধতা অনেকটা নিশ্চিন্তে ও নিরাপদে অনুভব করা যায়—নিজেকে অনেকটা আশ্বস্ত করে ওর মুখোমুখি হতে পারা যায়। কিন্তু এমন নির্বিঘ্নে এখানে বসে অনুভব করবার মধ্যে ঠিক তৃপ্তি নেই—সঙ্গে সঙ্গে কল্যাণের চিন্তা এল। বিমলেন্দুর চেহারা ও সঙ্গলাভের মধ্যে যে উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা, দুশ্চিন্তা ও ভয় থাকে—ঘরের মধ্যে বসে গান করতে করতে

নিশ্চিন্তে নির্বিঘ্নে বিমলেন্দুকে মনে করতে পারা যায় বটে, কিন্তু ভয়, উৎকণ্ঠা, দুশ্চিন্তা ও উদ্বেগকে বাদ দিয়ে বিমলেন্দুকে মনে পড়ায় যেন বিমলেন্দুর স্বাদটি চলে যায়। ভাবনায় ও স্মৃতিতে ঠিক রস পাওয়া যায় না। তাই বিমলেন্দুকে মনে পড়বার সঙ্গে সঙ্গে দুশ্চিন্তার স্মৃতি সঙ্গী হয়ে যায়ই। কল্যাণের কথা ভিড় করতেই অস্বস্তি আরো বেড়ে যায়। গান যখন শেষ হয়—তখন রীনা ভালো করে গান করবার আনন্দের চেয়ে গান শেষ করে একটা বোঝা ঘাড় থেকে নামাবার নিষ্কৃতি বোধ করে। সঙ্গে সঙ্গে মনে হয় ওকে দেখে কল্যাণের মুগ্ধতা বুদ্ধিগত, কেমন একটা নাটক যেন চোখে মুখে ফুটিয়ে তোলে, কল্যাণ যেন মুগ্ধতাসচেতন। কখন মুগ্ধ হতে হয় জানে—মুগ্ধ হওয়া ওর ইচ্ছাধীন। ইচ্ছে করলে যে কোন মুহূর্তে মুগ্ধ হয়ে যেতে পারে। কিন্তু বিমলেন্দুর মুগ্ধতা প্রবৃত্তির জিনিস—আন্তরিক ইচ্ছা-অনিচ্ছার বাইরে—অকৃত্রিম কিছুটা গেঁয়ো। কেমন একটা অমার্জিত ভাবও আছে সেই সঙ্গে। অন্যদিকে রীনা তাকিয়ে থাকলেও বিমলেন্দুর একদৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে থাকবার জন্যে অস্বস্তি বোধ না করে পারে না। ঘাড় ফিরিয়ে বিমলেন্দুর দৃষ্টিকে ঠিক স্বীকৃতি না দিলেও অগ্রাহ্যও করতে পারে না। .....ঠিক এমন সময় কল্যাণকে উঠে আসতে দেখে একই সঙ্গে কল্যাণ ও বিমলেন্দু উভয়ের জন্যে বিতৃষ্ণা দেখা দেয়। কল্যাণকে আসতে দেখে সেই নেশাকে জোর করে দূরে সরিয়ে দিতে হল বলে কল্যাণকেও সেই মুহূর্তে কেমন অবাঞ্ছিত মনে হল। মধুর হেসে কল্যাণকে আসতে দেখে। সহজ ভাবে মধুর করে হাসতে পারবার সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু মন থেকে বিতৃষ্ণার গ্লানিও চলে যায়।

রীনার মধুর হাসিতে কল্যাণও তৃপ্ত। মুহূর্তে এক ঝলক তুলনা কল্যাণের চেতনায় ভেসে যায়। রমার হাসিকে মনে পড়ে। রীনার হাসি কেমন মিষ্টি, আন্তরিক—হাসিটি যেন ওর মুখে মানায়। সমস্ত মুখ যেন হাসে। আর রমা যেন দয়া করে হাসে। হাসি যেন ঠোঁটের একার দায়—চোখ-মুখের কোন যোগ তাতে নেই। যেন কৃপা করে হাসে, যেন হাসির মধ্যে দিয়ে আমাকে কৃতার্থ করবার একটা সজ্ঞান চেষ্টা। রীনার হাসি সহজ, মধুর, সাবলীল, অফুরন্ত। রমার একটু কৃপা-করা হাসি যেন কল্যাণকে অনেকবার নিষ্প্রভ করে দিয়েছে—রমাকে ভয়ংকর ম্লান মনে হচ্ছে। কল্যাণ কথা না বলে ছোট্ট একটা চুমো ওর কপালে এঁকে তাড়াতাড়ি রীনার কাছ থেকে পালিয়ে আসে। রমাকে অমন ম্লান করে দেওয়ায় রীনার সামনে বেশিক্ষণ থাকতে কল্যাণ সাহস পেল না।

ছোট্ট একটুখানি চুমোর মধ্যে দিয়ে গানের যে প্রশংসা কল্যাণ করে গেল—রীনা খুশি হয়ে সেই মুহূর্তটিকে আস্বাদ করে। বরং একটু পরে কল্যাণের চুমো প্রশংসার চেয়ে কল্যাণের সেই মুহূর্তে চলে যাবার জন্যে রীনার খুশির সঙ্গে কিছু নিষ্কৃতিবোধও দেখা দেয়। রীনা অবশ্য সে সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন নয়। এই মুহূর্তে একা থাকা ও যে কতটা চাচ্ছিল—কল্যাণের চলে যাবার মধ্য দিয়ে যে একটা স্বস্তির ভাব এসেছে, তাতেই বুঝতে পারল। কিন্তু বুঝতে পারলেও বুঝতে চাইল না। মনে মনে চুমো-প্রশংসার মধ্য দিয়ে কল্যাণের যে মার্জিত শিল্পবোধ ও রুচি প্রকাশ পেল তাই অনুভব করতে ইচ্ছে করল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই মনে পড়ল প্রশংসাটির অভিনবত্বই, নতুনত্বই কল্যাণকে আকর্ষণ করেছে—গান নয়। গান কেন—যে কোনও একটা তুচ্ছ উপলক্ষেই কল্যাণ ঐ চুমো-

প্রশংসা দেবার বাহাদুরি নিত। নিজের সূক্ষ্ম মার্জিত রুচির ও সমঝদারের প্রশংসা শুনবার আকাঙ্ক্ষায় কল্যাণের এই চুমো-প্রশংসা আবিষ্কার। ...বিমলেন্দু গানে বোঝে না—গান শুনতে হয় শোনে। চমৎকার বলতে হয় বলে। মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকে গানের সময়, গান যে কানে ঢোকে মনে হয় না। সেই দিন কবে? ঐ যে আগের শনিবার বলল—তোমার...গলা ভালো, গানও ভালো কর নিশ্চয়ই—আমি খুব একটা গান বুঝি না—তবে গান করবার সময় তোমাকে বড় সুন্দর লাগে—তোমার সৌন্দর্যের সঙ্গে গাম্ভীর্য মিশে এমন .... ঠিক বলতে পারি না। এরপর, রীনার মনে পড়ে, ক'দিনই গান করবার সময় নিজেকে আয়নায় দেখেছে। বিমলেন্দুর চোখেও দেখেছে, কল্যাণের চোখেও দেখেছে। বিমলেন্দুর প্রশংসায় কোন উচ্চাঙ্গের হাসি ঠোঁটে মানানসই হত তারও মহড়া দিয়েছে, মনে মনে বিমলেন্দুর কণ্ঠস্বর আবৃত্তি করে। একটু আগে কল্যাণের চুমো-প্রশংসার মধ্য দিয়ে যে প্রসন্ন মনের চেহারা প্রকাশ পেয়েছিল তারই ভরসায় ও প্রশ্রয়ে বিমলেন্দুর কথা ভাবতে ইচ্ছে করছিল। কিন্তু কল্যাণ চলে যাবার স্বস্তিবোধের জন্য মুহূর্তে অপরাধবোধও রীনার অন্তরে দেখা দেয়।

নিজের এ ধরনের গ্লানির সঙ্গে রীনা পরিচিত। বিমলেন্দুর কথা ভাবতে শুরু করলেই কখনোই সম্পূর্ণ করা যায় না। কল্যাণ প্রসন্ন থাকলেও নয়। বরং প্রসন্ন মুহূর্তে রীনা বিশ্বাসঘাতকতা করছে এমনি একটা যন্ত্রণা দেখা দেবেই। তাছাড়া রীনা যেন অচেতন ভাবে ঠিক করে নিয়েছে সন্ধ্যা বা রাতের সব চিন্তা-ভাবনার অধিকার কল্যাণের। এখানে বিমলেন্দুকে প্রবেশ করতে দিয়ে যেন কল্যাণের অধিকারকে ক্ষুণ্ণ করছে। একটা স্বস্তি জাগে। পাশের ঘরে গিয়ে কল্যাণের প্রসন্ন মনের খানিকটা স্বাদ নিয়ে আশ্বস্ত হতে ইচ্ছে করে। কল্যাণকে প্রসন্ন দেখলে কেমন একটা ভরসা পাওয়া যায়। ভিড়ের মাঝে মধ্যে মধ্যে পকেটে হাত দিয়ে মানিব্যাগ ঠিক আছে দেখবার মতো আশ্বাস। কোন একটা উপলক্ষে কল্যাণের এই মন্তব্যটি যেন রীনার এখনকার মনোভাবের যথাযথ রূপ।

রীনার কাছ থেকে পালিয়ে এলেও, কল্যাণের মনে রীনার হাসি কাজ করতে শুরু করে। রীনার মধুর উজ্জ্বল হাসিকে কল্যাণ মনে মনে এড়িয়ে যেতে পারে না। কেবল রীনাকে আদর করবার একটা খিদে বোধ করে। এরকম খিদে হওয়াতে কল্যাণ খুশি হয়ে ওঠে। এরকম খিদে যেন রীনার ওপর ওর সুবিচারের একটা আন্তরিক লক্ষণ। নিজের কাছে রমাকে গোপনও করতে চায়—পাছে পাশাপাশি বিচার করে, তুলনা চললে রমা নিষ্প্রভ হয়—সেই জন্যে নিজের কাছে রমাকে এখন আড়াল করে রাখতে হয়। রীনাকে আদর করবার খিদে নিয়ে রমাকে ভাবলে, পাছে রমা নিষ্প্রভ হয়ে ওঠে—পাছে রমার আকর্ষণ শক্তি কমে যায়—সে জন্যে কল্যাণ যেন ব্যস্ত হয়ে ওঠে। প্রায় নিজের অগোচরেই ঠিক করে ফেলে, রীনাকে আদর করবার ইচ্ছেটা পূর্ণ হলে সেই পরিতৃপ্ত মন নিয়ে রমাকে ভাবা যাবে। কিন্তু উঠতে ইচ্ছে করে না বা রীনাকে ডাকতেও আলস্য লাগে।

আদর করবার ইচ্ছেটা কতক্ষণ থাকবে তাও এক সমস্যা। আদর করবার ইচ্ছেটিই যেন নিজের কাছে রীনার ওপর অনুরক্তির একটা প্রমাণ—ডাকুক না ডাকুক, আদর করা না করা ইমম্যাটিরিয়েল। বিবেক অনেক পরিষ্কার লাগে। কিন্তু রীনার উপর আকাঙ্ক্ষা

দেখা দিলে বিবেক কেমন পরিচ্ছন্ন হয়, নিজেকে কেমন সুস্থ লাগে। রমাকে ভুলে যাবার ভয় মনে উঁকি দেয়। রমাকে ভুলে যাবার আতঙ্কে মন অস্বস্তিতে ভরে ওঠে। এবার মন যেন রমার পক্ষ নেয়। কল্যাণ ভাবে চুমু দেবার পর ডেকে এনে আদর করা বড্ড গ্রস্ হয়ে পড়ে—অতটা মার্জিত ও রুচিসম্পন্ন ভাবে ওর গানের সাড়া দেবার পর এখুনি প্রবৃত্তিকে মুক্ত ভাবে কাজ করতে দিলে আগের সেই সুন্দর মুহূর্তটির অপমান করা হবে। তাছাড়া, কল্যাণ নিজেকে জানাল, কিছু আগেই আদর করা থেকে নিজেকে সংযত করেছি—এখন রীনা সেই সংযমকে হিপোক্র্যাসি ভাববে।....কেমন ক্লান্ত লাগে কল্যাণের, মনে হয় রমার চিন্তা যেন কিছুতেই ওর চেতনায় পথ করে আসতে পারছে না। রমার চিত্র ও রমার ভাবনা ওর চেতনায় প্রবেশ করবার জন্যে সংগ্রামে যেন কল্যাণ ক্লান্ত হয়ে ওঠে। কিন্তু মনে মনে খুব খুশিই হবে। নিজেকে ক্লান্ত ও অবসন্ন, মনে হচ্ছে অথচ কল্পনায় রীনার আদর-তৃপ্ত প্রসন্ন চেহারা দেখে মনে মনে কল্যাণ এবার যেন বিরক্ত হয়ে ওঠে। বিরক্তি ওর মনে কিছু জোর এনে দেয়—ঠিক করে, এখন আদর থাক। মনে হয় রীনা যেন জুলুম করে আদর খায়। রীনার ওপর বিরক্তি আনবার ঝাঁজ রমার ওপর গিয়ে পড়ে। হঠাৎ মনে হয়, রমা এমন কিছু মেয়ে না হয়েও, এমন কিছু সুন্দরী না হয়ে, ওকে আকর্ষণ করছে ক্রমাগত—এ আকর্ষণ যেন এক ধরনের বঞ্চনা মাত্র। রমা যেন আকর্ষণ করে ওকে ঠকাচ্ছে। রমার চিন্তাও প্রবেশ নিষেধ হয়ে যায়। কল্যাণ মহা বিরক্তিতে গুম হয়ে বসে থাকে।

গ্যাসে রান্না বসিয়ে রীনার মনে হয়, সন্ধেবেলা বা রাত হলে মন যেন অনেকটা শান্ত হয়। নিজেকে খানিকটা উদ্বেগমুক্ত, খানিকটা তৃষ্ণার অত্যাচার থেকেও মুক্ত মনে হয়। দু'একটা ঢেউ উঠলে স্কুল থেকে ফেরবার পর সময়টা মোটামুটি নিস্তরঙ্গ। অবশ্য আগামিকাল সকালের জন্য মন-উন্মুখ হয়ে থাকত তা নয়। তবে সকালে যেমন থাকে তেমন নয়। অন্যমনস্কভাবে সকালের কথা স্মরণ করে রীনা। সেই সাত সকালে উঠে ওর কাজ আরম্ভ হয়ে যায়—স্কুল যেন ক্রমাগত ওকে আকর্ষণ করতে থাকে। স্কুলে যাবার জন্য দারুণ উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা ওকে অস্থির করে তোলে। কিছুই ভালো লাগে না। ঝড়ের বেগে ঝিকে দিয়ে কাজ করায়, রান্না সারে। কল্যাণকে তৈরি হবার জন্য তাড়া দেয়, নিজেও তৈরি হতে থাকে। স্কুলে পৌঁছাবার তৃষ্ণা ওর দেহ মনকে আচ্ছন্ন করে রাখে। বাড়ি থেকে না বের হওয়া পর্যন্ত বিশ্বাস হতে চায় না যে ওর শেষ পর্যন্ত স্কুলে যাওয়া ঘটবে। অথচ স্কুলে গিয়ে বিমলেন্দুর সঙ্গে তক্ষুণি যে ওর কথাবার্তা হয়—তেমন নয়। তবু একটা উত্তেজনা ওকে এমন ভাবে চালিয়ে নিয়ে যায়—ওর পঞ্চ ইন্দ্রিয় তীক্ষ্ণভাবে সচেতন হয়ে থাকে। এখন বা এর আগে কখন সন্ধ্যেবেলায় রীনার মনে হয়েছে, বিমলেন্দুর আকর্ষণ সকাল বেলায় যেন অত্যাচারের মতো হয়ে দাঁড়ায়। অথচ সকালবেলার সকল কাজকর্মের মধ্যে একবারও বিমলেন্দুকে ওর স্পষ্ট মনে হয় না—চেহারার কথাও মনে আনে না। স্কুলে যাবার প্রবল আকর্ষণই বোধ করে—এ সময়ে বিমলেন্দুর কথা ও কাহিনিকে কিছুতেই মনে পড়তে দেয় না রীনা। পাছে অসময়ে মনে পড়লে বিমলেন্দুকে ভাববার স্বাদটি ফিকে হয়ে যায়। আরামে রয়েসয়ে বিমলেন্দুর সামনেই বিলেন্দুকে অনুভব করতে চায়—আগাম ভেবে বিমলেন্দুকে কমিয়ে দিতে ফুরিয়ে দিতে

রীনা চায় না। হাজার কাজের ফাঁকে ফাঁকে মনে মনে বিমলেন্দুকে বার বার উঁকি দিতে দেয় না রীনা, পাছে বার বার উঁকি দিয়ে বিমলেন্দু নিজেকে সস্তা করে দেয়, নিজের আকর্ষণ কমিয়ে দেয়।

সত্যিকারের বিমলেন্দুকে অনেক ছাঁটাই-কাটাই করে রীনা মনে মনে যে বিমলেন্দুকে গড়ে তোলে—সেই বিমলেন্দুর সঙ্গে স্কুলের বিমলেন্দুর মিল মাঝেমধ্যে খুঁজে বেড়ায় রীনা। কখনও কখনও কল্যাণের মার্জিত ভাবটি বিমলেন্দুর মধ্যে ফুটিয়ে তুলতে চায় অন্যমনস্কভাবে—কিন্তু তাতে বিমলেন্দুকে আর বিমলেন্দু মনে হয় না। এমনই আরোপের ফলে মন কেমন যেন বিতৃষ্ণ হয়ে ওঠে। অথচ আগে আগে স্কুলে গিয়েই বিমলেন্দুকে দেখলেই ওর যে কেবল আশাভঙ্গ ঘটত তাই নয়—সমস্ত উদ্বেগ ও উত্তেজনাকে পণ্ডশ্রম মনে হত। বিমলেন্দুর দিকে তাকালেই সেই সাধারণ সতৃষ্ণ চোখ দু'টো এলে ওকে তুচ্ছ মনে হয়—নিরাশায় চোখ নামাতেই হত। অথচ চোখ নামালে, বিমলেন্দুকে না দেখলে ওর দিকে না তাকালে রীনা কিন্তু আবার আকর্ষণ বোধ করতে থাকে। ....রীনা নিজেই মনে মনে হেসেছে—না দেখলে, না তাকালে তবু বিমলেন্দুকে সহ্য করা যায়—বিমলেন্দুর স্মৃতি বিমলেন্দুর চেয়ে সুসহ। যত দেখি—তার চেয়ে ঢের বেশি তো দেখি না, তাই বুঝি অমন করে। অথচ দেখবার মজা হচ্ছে তা সুন্দর হোক বা অসুন্দর হোক তা কিছুক্ষণের মধ্যেই অভ্যাস হয়ে যায়। খারাপও আর কিছুক্ষণ পরে খারাপ মনে হয় না। খারাপ দেখবার নিরাশার জেরও একসময় ফুরিয়ে যায়। খারাপ লাগবার শক্তি ভালো লাগবার ক্ষমতার মতোই অল্পায়ু। বিমলেন্দুর তৃষ্ণা বিমলেন্দুকে আরো সাধারণ, আরো নগণ্য করে দেয়। অতি তুচ্ছ বলে সে সময়কে ওর মনে হয়। এমনই বর্ণহীন ব্যক্তিত্বশূন্য বিমলেন্দুর চেহারা যখন রীনাকে প্রায় ধিক্কার দিতে ওঠে—তখন রীনা আসন্ন অস্বস্তি বোধের গুমোট থেকে আত্মরক্ষার চিন্তা করে। অমন তড়ি ঘড়ি করে স্কুলে যাওয়াটাই—ওর ব্যস্তবাগীশতার জন্য—আর অমন উত্তেজনা উৎকণ্ঠা ওর হয়তো ভালো লাগে—অমন উৎকণ্ঠা উত্তেজনার লবণাক্ত স্বাদের জন্য স্কুলে গিয়ে মাস্টারি করার মতো একঘেয়ে কাজও করে চলেছে মুখ বুজে। ....বিমলেন্দুর কাছে মাঝে মধ্যে কল্যাণের নানা গল্প বলেছে—ওর মার্জিত রুচি, শিক্ষিত মন, তীক্ষ্ণ ও সরস কথা বলবার ক্ষমতা! এ রকম আর অনেক উদাহরণ সহযোগে স্বামী গরবিনীর ভাবটি যথাসম্ভব স্পষ্ট করে তোলে। অবশ্য বিমলেন্দুর কাছে যখন কর্তার গুণগান করছিল—তখন অন্যান্য শিক্ষিকারাও ছিলেন। বিমলেন্দু চুপ করে শুনেছে।

আশ্চর্য হয়ে রীনা আবিষ্কার করল, সেই সতৃষ্ণ দৃষ্টি ঈর্ষায় একটুও ধক ধক করে উঠল না। একটু অপ্রস্তুত বা অপ্রতিভ হয়ে গেল না। অন্য প্রসঙ্গে বিমলেন্দু ওর কর্তার গুনগপনার কাহিনির উত্তর দিয়ে ছিল ক'দিন পর, বলেছিল—আপনার কথা বলার ভঙ্গিমাটি আমাকে এমন মুগ্ধ করে দেয়—আপনি কী বলেন তা নিয়ে আমার মাথাব্যথা নেই। বিষয়বস্তু যাই হোক না কেন ও নিয়ে আমি মাথা ঘামাই না। আপনার চোখে মুখে স্বামীর গর্বে গর্বিতা ভাবটি এমন চমৎকার লাগছিল। দুঃখ হয় আপনার স্বামীর জন্য—অমন চমৎকার ভাবটি. তিনি দেখতে পেলেন না। তবে তিনি যে সব দেখতে পান...। মনে মনে সেদিন রীনা কিছুটা চমকে গিয়েছিল বইকি। মনে হয়েছিল সেই

দিন বিমলেন্দুর চোখ দুটোই বিমলেন্দুর প্রতিনিধি নয়। তৃষ্ণা বা পিপাসা ছাড়া আর কিছুর ভার যেন চোখ দুটো বহন করতে পারে না। ওর মন ওর চোখের আড়াল দিয়ে অনেক কাজ করে যায়। যে ঈর্ষা বিমলেন্দুর কাছে একান্তই প্রত্যাশিত ছিল তা সম্পূর্ণ গোপন করেছিল বিমলেন্দু। সহকর্মীদের মন্তব্য—কর্তার এমন করে কীর্তন করল নিজের স্বামীভাগ্য বলবার জন্য নয়—নিজের মূল্য বিমলেন্দুর কাছে জাহির করতে। এমন রূপবান গুণবান ওর কব্জায়। কী দরকার বিমলেন্দুকে তাতাবার। এখন রীনা নন্দিনীর সঙ্গে কথা বলে না। সেদিন স্কুল থেকে ফিরতে ফিরতে বিনীতা টিয়া পুষেছে সেই গল্প করছিল। সঙ্গে বিমলেন্দু ছিল। নন্দিনীর সেই মন্তব্য শোনবার পর থেকে রীনা বিমলেন্দুর সঙ্গেও কথা বলছিল না ক'দিন ধরে। হঠাৎ বিমলেন্দু জিজ্ঞেসা করে—আপনার তো পোষ মানাবার ক্ষমতা আছে—আপনি কিছু পুষছেন না? রীনা সোজাসুজি জিজ্ঞাসা করে—আমার পোষ মানাবার ক্ষমতা আছে আপনি জানলেন কী করে? বিমলেন্দু স্মিত হেসে বলল—সেদিন স্বামীর গল্প করছিলেন কী না তাই মনে হয় পোষ মানাবার ক্ষমতা আপনার অসাধারণ। বিনীতা হেসে উত্তর দিল—উল্টে বললে বিমলেন্দু। সেদিনকার কথায় রীনার কর্তারই পোষ মানাবার ক্ষমতা বেশি বোঝায়। রীনা একটু তিক্ত স্বরে বলেছিল- একটা দেশি কুকুর পুষব ভেবেছি আপনার নামে। বিমলেন্দু তেমনি সতৃষ্ণভাবে চিবিয়ে চিবিয়ে জবাব দেয়—আপনি আমাকেও পুষতে পারেন—কুকুর সব কাজ করে দেবে। এ লাইন আর ভালো লাগছে না। .....একথা বলবার জন্য রীনা সত্যি সত্যি দুঃখিত হয়েছিল। হয়তো বিনীতা সামনে না থাকলে রীনা এ কথা বলত কি না সন্দেহ। পরের দিন থেকে রীনা কথা বলা কমিয়ে দিল, প্রত্যাশাই রইল, বিমলেন্দুর নামে কুকুর পোষবার কথাটি নন্দিনীর কানে উঠবে। কিন্তু বিনীতা সে সম্পর্কে কিছু না বলায় রীনা খেপে যায়। অপরের কথা বিনীতা ওর কাছে বলে। সে বলায় তো কোন সঙ্কোচ বা নীতি নেই। কিন্তু রীনার কথা ওদের কাছে বলে না কেন? একী অন্যায়!

সেদিন ফ্ল্যাটে ফিরে রীনা যতই ওর মন থেকে বিমলেন্দুকে ঐভাবে অপমান করবার গ্লানি মুছে ফেলতে চাইল—ততই যেন তার মনে দারুণ চাপ অনুতাপ সৃষ্টি করতে লাগল। কল্যাণের কাছে কিছুক্ষণ বসে অন্য প্রসঙ্গে মন হালকা করতে গিয়ে দেখল, কাঁদার জন্য ওর সমস্ত চিত্ত ব্যকুল হয়ে উঠেছে। কল্যাণের সঙ্গ থেকে নিজেকে সরিয়ে নেবার জন্য যেন সমস্ত সত্তা হাঁসফাঁস করতে লাগল। এদিকে কল্যাণও বুঝতে পারল—কিছু একটা ঘটেছে। নিজের কোন অজানিত অপরাধের জন্য ঘটা করে ক্ষমা চাইল—যদিও মনে মনে স্থির বিশ্বাস ছিল, চাকুরির ক্ষেত্রে কোথাও কোন ঝগড়া হয়ে থাকবে—কোনও সহকর্মীর সঙ্গে কোন বিবাদ। তাই পরম নিশ্চিন্তে ক্ষমা প্রার্থনা করল। আশায় রইল রীনা বারবার প্রতিবাদ করবে। ভেবেও নিল, স্কুলের ঝগড়ার জন্য যে মনোবেদনা হয়েছে তারই জন্য হয়তো কল্যাণের কাছ থেকে কিছু বেশি আদর পেতে চায়। রীনা জানাল ওর মাস্টারি ছেড়ে দিতে ইচ্ছে করছে—বড্ড দূর, একঘেয়ে। কল্যাণ তখনই রাজি। যদিও কল্যাণ ও রীনা দুজনেই জানে, আগামীকাল সকালে এ প্রসঙ্গ কেউ তুলবে না। রীনা মাস্টারি ছেড়ে দেবে না—কল্যাণও ছাড়বার জন্য পীড়াপীড়ি করবে না।

দু'জনেই ইচ্ছে করে এ প্রসঙ্গ ভুলে থাকবে। আবার যদি কোনদিন রীনা একথা তোলে—তখন কল্যাণ মনে পড়বার ভান করবে আর তখনই রাজি। রান্না ঘরে গিয়ে রীনা একা কাঁদল। সারারাত দুঃস্বপ্নের মতো কেবল বিমলেন্দুর চেহারা ওকে তন্দ্রায় ও জাগরণে অস্থির করে তুলল। খুব সকালে স্থির করল বিমলেন্দুর কাছে ক্ষমা চাইবে ও যখন একা থাকবে। বিমলেন্দুর কাছে নিজেকে অভদ্র ও অমার্জিত বলে গালাগাল দেবে—এবং কতটা যে লজ্জিত ও অনুতপ্ত সে কথাও জানাবে।

রীনার উচ্ছ্বাস প্রকাশের ফলে বিমলেন্দু যে ক্ষমা করবে তা ঠিক—কিন্তু রীনা ভীত হয়ে ওঠে, ক্ষমা করতে গিয়ে বিমলেন্দু অশোভন না কিছু করে বসে। কিন্তু এই ভয় পাওয়াকে রীনা প্রশ্রয় দেয় না—অশোভন যদি হয়েই পড়ে তবে রীনা তাকে গতকালের অপরাধের অনিবার্য শাস্তি হিসাবে ধরে নেবে। যদিও সমস্তক্ষণ এই আশাও ছিল, বিমলেন্দুকে তিরস্কারের কাহিনি রটে গিয়ে ওর সম্পর্কে ধারণার কিছু বদল ঘটবে। যাই হোক, স্কুলে গিয়ে বিমলেন্দুর সঙ্গে মিটমাট না করা পর্যন্ত কিছুতেই স্বস্তি পাচ্ছিল না। কিন্তু স্কুলে গিয়ে বিমলেন্দুকে দেখামাত্র ওর মনে হল—বিমলেন্দুর কাছে ক্ষমা চাওয়া বাড়াবাড়ি। ওকে দেখেই বিমলেন্দু ঠিক তেমনি ভাবে সতৃষ্ণ ও চঞ্চল হয়ে উঠল। ওর সেই রকম চেহারা দেখে রীনা ক্ষমা চাওয়াই যে শুধু স্থগিত রাখল তা নয়—মনে হল গত রাতে অযথা কষ্ট পেয়েছে। অথবা নিজেকে কষ্ট দিয়েছে। গতকালকার কথায় বিমলেন্দু নিজেকে অপমানিত বোধ না করায় রীনার কাছে যেন ও অনেক ছোট হয়ে যায়। এমনিভাবে বিমলেন্দু ছোটো হয়ে যাওয়ায় ওর ওপর ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে। সারারাত নির্ঘুম কষ্ট বৃথা যাওয়ায়, ক্ষমা চাইবার মুহূর্তে একটু কাঁদবার লবণাক্ত স্বাদের প্রত্যাশা বাহুল্য মনে হওয়ায় অথচ মনকে ভারমুক্ত করতে না পারায়—রীনা যেন বিমলেন্দুর ওপর আর ক্রুদ্ধ ও বিরক্ত হয়ে উঠল। বিমলেন্দুর একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকবার শ্রমের কিছু মাত্র মূল্য আজ রীনা দিল না। অথচ রীনা জানে ব্যাপারটা একটা ফয়সালা করতে না পারলে বাড়িতে গিয়ে মন ভার হবে। নিজের রোজকার মনটি ফিরে পাবার জন্যে এরমধ্যেই ভিতর থেকে একটা তাগিদ ক্রমেই প্রবল হয়ে উঠেছে। অথচ হেসে বিমলেন্দুর সঙ্গে দু'চারটে সাধারণ কথাবার্তা বলে আড়ষ্টতাকে হাল্কা করে নিতেও রুচি হয় না। মন কেমন যেন বিমলেন্দুর দিকে বেঁকে বসেছে। নিজেকে বোঝায় রীনা—বিমলেন্দুর সঙ্গে মেলামেশায় সত্যই মাত্রা ছাড়িয়ে ফেলেছে—ও যে বিবাহিত এ যেন ওর খেয়াল থাকে না। বিমলেন্দুকে নিয়ে বড্ড বেশি চিন্তা ভাবনা চলছে—এগুলো ঠিক নয়। নিজেকে বিশ্লেষণ করতে অনুরোধ করে রীনা। কেমন যেন একটু সংযত হবার লোভও অনুভব করে। বিমলেন্দুর সঙ্গে পারতপক্ষে আর কথাবার্তা নয়—নন্দিনী, বন্দনা ওদের সঙ্গেও না। এই একটু পরচিতির হাসি হাসব—একটু প্রাণহীন কৃত্রিম হুঁ, হ্যাঁ—ব্যস্। নিজের মনে থাকব। ক্লাসে টাস্ক লিখতে দিয়ে নিজের ভাবী ব্যবহারের প্রোগ্রাম ঠিক করে। সঙ্গে সঙ্গে বা একটু পরেই ওর মনে হয়, নিজের কৃত্রিম প্রাণহীন ফর্মাল ব্যবহার আরম্ভ করবার আগে বিমলেন্দুর সঙ্গে ব্যবহারটা সহজ করে নেওয়া দরকার। বিমলেন্দু হয়তো ভাববে, ঐ দিনের ব্যবহারের ফলেই রীনা সরে যাচ্ছে। রীনা কোন কারণ দেখিয়ে সরে যেতে চায় না। অন্তত কোনও কারণ যেন বিমলেন্দু বুঝতে

না পারে। আস্তে আস্তে সরে যেতে চায়। নিজের সংসারের দিকে আর মন দেওয়া দরকার। তার আগে বিমলেন্দুর সঙ্গে সহজ হতে হবে। নিজের সংসারের দিকে আর মন দেওয়া দরকার। তার আগে বিমলেন্দুর সঙ্গে সহজ হতে হবে। নিজের মধ্যেই কেমন দ্বিধা দেখা দেয়—মনের একটা অংশ রাগ করেই থাকতে চায়—আড়ষ্টতাই বজায় রাখতে চায়—সকলের সঙ্গে কথাবার্তা বন্ধ করে একা থাকবার জেদকে প্রশ্রয় দিতে চায়—অপরদিকে আরো একটি অংশ যেন বিমলেন্দুর সঙ্গে সম্পর্ক সহজ করে নেবার জন্য উন্মুখ হয়ে ওঠে। নিজেকে বোঝায় রীনা, বিমলেন্দুর সঙ্গে ব্যবহারটি স্বাভাবিক করে নেওয়া দরকার আমার নিজের জন্যই—নইলে এনিয়ে ভেবে বড্ড অশান্তি হবে—কিছু আর ক'দিন ভালো লাগবে না। নিজের অশান্তিকে কৌশলে পাস কাটাবার জন্যেই বিমলেন্দুর সঙ্গে একটা কূটনৈতিক সহজ ব্যবহার মাত্র। তার পর আস্তে আস্তে দূরে চলে যাবে—নাটকয়ীয় ভাবে নয়। হঠাৎ নয়, আস্তে আস্তে। রীনা আস্তে আস্তে শীতল হয়ে গেল, দূরে আড়ালে কৃত্রিম ব্যবহারের পিছনে আত্মগোপন করলে ওরা কি রীনা অন্যমনস্ক হয়ে তা চিন্তা করতে থাকে। হঠাৎ মনে আসে, কল্যাণের এ ভাবে প্রশংসাটি একটু নির্লজ্জ হয়ে গেছে। একটু বাড়াবাড়ি হয়ে থাকবে হয়তো। হয়তো বিমলেন্দু নিজেকে ছোটো ভেবেছে—ভেবেছে, কর্তার প্রশংসা করে বিমলেন্দুকে হেয় করেছে রীনা। রীনা ঠিক করল—আজই, বিমলেন্দুর সঙ্গে সহজ ব্যবহার করে তবে ফ্ল্যাটে ফিরবে। কিন্তু সেদিন টিফিনের একটু আগে ক্লাস ছেড়ে দিয়ে স্টাফরুমে ঢোকবার আগেই দেখল, তেমনি সতৃষ্ণভাবে নন্দিনীর কথামৃত শুনছে। রীনা ঘরে ঢুকতেই বিমলেন্দু রীনাকে আসতে দেখে মনোযোগ বদল করে রীনার দিকেই ইন্দ্রিয়গুলোকে সচেতন করে তোলে। সঙ্গে সঙ্গেই রীনা ঠিক করে—না, ক্ষমা চাইব না। কী দরকার ওর সঙ্গে সহজ ব্যবহার করবার? ওর সঙ্গে স্বাভাবিক হওয়ার। ও আমল পাবার যোগ্য নয়। গালাগাল খেয়ে যে আহত হয়নি, যে দুঃখ পায়নি—তার কাছে ক্ষমা চাইবার কোনো দরকার নেই। অভদ্র ব্যবহারকে যে বিনা ক্রোধে বিনা উত্তাপে সহজভাবে গ্রহণ করে তার কাছে ক্ষমা চাওয়া দূরে থাকে, সে নিজেই ক্ষমার অযোগ্য। রীনা নিজেকে বোঝাল অপ্রিয় সত্য বলবার জন্যই ওর খারাপ লাগছে। বিমলেন্দুর কোনও প্রতিক্রিয়া হয়নি তো ওর বয়ে গেছে। যা একটা লোক তার জন্যে আবার ... বিমলেন্দুর 'পর বিতৃষ্ণাটিকে আন্তরিক মনে হওয়ায়, একটু খুশি খুশি লাগে—সহজভাবে প্রায় বিমলেন্দুর উল্টোদিকের চেয়ারে বসে। বিতৃষ্ণা ও রাগ যেন স্বল্পায়ু না হয়। ক্রোধ ও বিতৃষ্ণাকে জাগিয়ে রাখবার জন্যে মনে মনে বিমলেন্দুর সেই ব্যগ্র ও অশোভন চাহনিকে স্মরণ করতে থাকল। মনের বিতৃষ্ণাকে গোপন করবার জন্য মুখের সহজ হাসি হাসি ভাবকে অনেক কষ্টে ধরে রাখতে হচ্ছিল—আধঘন্টার টিফিন পিরিয়ড যেন আজ আর শেষ হচ্ছিল না। প্রসন্নতার ছদ্মবেশ শেষ পর্যন্ত টিকিয়ে রাখতে পারবে কি না একদিকে কেমন এই সন্দেহ ওকে পীড়িত করছিল। তেমনি রাগ ও ক্রোধ যাতে স্তিমিত হয়ে না যায় সেই আশঙ্কাও ওকে শঙ্কাতুর করে তুলেছিল। মনে মনে ভাবছিল বিমলেন্দুকে জানাবে, আমার কুকুরের যে পোস্টটি ভ্যাকেন্ট রয়েছে—তা একটা যথার্থ কুকুরই নেবে। দেশী তো নয়ই, ভণ্ড কুকুরও নেব না। তাছাড়া কুকুরের ক্যানডিডেচারে আপনাকে মানায় না—শেয়াল

পুষলে তখনই আপনাকে একটা চান্স দিতে পারি। .... কিন্তু শেয়ালের সঙ্গে ধূর্ত বিশেষণটা দিলে কেমন হয়? কিংবা যদি বলি নেকড়ে? কোনটাই রীনার মনঃপুত হয় না। এমন একটা পশু পাওয়া যায় না, যে বিমলেন্দুর মতো সতৃষ্ণ অথচ ধূর্ত। কুৎসিত অথচ মনোযোগ আকর্ষণ করে, দেখলে বিতৃষ্ণার উদ্রেক করে অথচ দূরে থাকা শক্ত। ঠিক কেমন যেন বলতে পারা যায় না। হঠাৎ রীনা ভাবে অন্য কোন উপলক্ষে ওকে জানিয়ে দেব—কোনও পশুর সঙ্গেই আপনার তুলনা চলে না, কারণ সব পশু, সব মানুষের মধ্যে কিছু কিছু ইম্‌পারফেকশন রয়েছে—আপনার মধ্যে পশুত্ব পারফেকশনে পৌঁছে গেছে। পশুত্বের বিবর্তন সম্পূর্ণ। ....এসব কথাগুলো বলে সম্পর্ক ঘুচিয়ে দেব। এরপর আর কোনো কথা নয়—মানে কথা বলা বন্ধ করাটা চোখে পড়বে। না, সে হয় না। নানা প্রশ্নের সামনে পড়তে হবে—আর কথা না বলা ওকে অনেক মূল্য দেওয়া। লোকে ভাববে একটা কিছু হয়েছে নিশ্চয়ই—নইলে কথা বন্ধ কিসের জন্য। না, কথা বন্ধ নয়—তবে আমল দেব না। ওর অস্তিত্বকে অগ্রাহ্য করা নয়—তুচ্ছ করা। নাটক করে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা নয়—সব সময় ওর 'পর রাগ ভাব নয়—ওকে নগণ্য ভেবে ভুলে থাকা। ওর মূল্য ভুলে যাওয়া—ও যে নগণ্য তাও ভুলে থাকা। তবে ওর শাস্তি হয়। টিফিন শেষ হল এক সময়। বাকি তিনটে ক্লাসও একরকম অন্যমনস্ক হয়ে কাটাল রীনা। একবার ভাবল, কদিন ক্যাজুয়াল লিভ নিয়ে ফ্ল্যাটে শুয়ে বসে কাটাবে—একদম ছুটি নেয় না বলে ওর যে বদনাম আছে তা কাটাবে। আগে ভাগে ছুটির দরখাস্ত দেবে না। রীনার চেতনায় একটা ছবি ভেসে গেল—বিমলেন্দু রোজ রোজ ওর অপেক্ষা করে কেমন হতাশ বোধ করবে। ওর ছবিটাই মাত্র রীনার চেতনায় ভেসে গল—কিন্তু রীনা তা নিয়ে কোনও চিন্তা করল না—ভাষাও ছবিটিকে দিল না। আবার ভাবল, নন্দিনী বা বিনীতা বা দুজনকেই ওর ফ্ল্যাটে নেমন্তন্ন করে নিয়ে আচ্ছা করে মিষ্টি ভাবে কড়া কথা শুনিয়ে দেবে। ওর সংসার দেখিয়ে ওদের বুঝিয়ে দেওয়া কল্যাণের মতো স্বামী যার—তার বিমলেন্দুর মতো লোককে তাতাবার কোনও স্পৃহা নেই। জঘন্য নীচ মন ওদের। একটু ওদের বোঝা উচিত রীনা সামনে থাকলে নন্দিনী, বিনীতার দিকে কেউ মনোযোগ দেবে না। ছোটবেলা থেকে এদের একটানা ঈর্ষা, ছোট কথা, নীচ স্বভাব দেখে এসেছি—নতুন কিছু নয়। রীনার দিকে কেউ একটু বেশি তাকায়—তখন কী করবে ও, নন্দিনী, বিনীতার জন্যে ঘোমটা দিয়ে থাকবে? অত সাধ নেই। না, নন্দিনী বা বিনীতার সঙ্গে কল্যাণের পরিচয় করিয়ে দিতে রুচি হয় না—যারা এতখানি শত্রুতা করে তাদের তোয়াজ করতে রাজি নয়—তাছাড়া বাড়ি ডেকে চা-লুচি খাইয়ে কড়া কথা তা যত মিষ্টিই হোক বলা উচিত নয়। রীনার ভদ্র রুচিতে বাধে। তাছাড়া কল্যাণ থাকলে—তার সামনে এসব ...। না, ওদের নেমন্তন্ন নয়, অত খাতির নেই। ফিফ্‌থ পিরিয়ডে ভাবল বিমলেন্দুকে নেমন্তন্ন করে নিয়ে ওর সংসার ও কল্যাণের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলে হয় না? বুঝুক ওর জন্যে রীনার কোনো মাথা ব্যথা নেই। ওর সঙ্গে কাজ করে বলে রীনা ওর দলের লোক নয়। প্রস্তাবটিতে উত্তেজনা বোধ করে রীনা—হাঁ, নেমন্তন্ন করার নানা অসুবিধা বোধ করতে আরম্ভ করে রীনার ক্লান্তি আসে। কল্যাণের সামনে যদি অমন করে তাকাতে থাকে—রীনা শিউরে ওঠে—না, না, বিমলেন্দুকে ফ্ল্যাটে নিয়ে

গিয়ে ... দুর দুর! একটু পরে ভাবল তাছাড়া এক বিমলেন্দুকে নেমন্তন্নও খারাপ দেখায় ... অবশ্য বিনীতাকে—যাকগে যাকগে। নেমন্তন্ন নেমন্তন্ন না। কোন সম্পর্কও ওদের সঙ্গে নেই। কোন কথাই ওই বিমলেন্দু, নন্দিনী, বিনীতার সঙ্গে নয়। তাতে যে যা ভাবে ভাবুক গিয়ে—তাতে যা হবার হবে—যার যা খুশি ভাবুক। আর পারি না এনিয়ে ভাবতে ...। রীনার কান্না এসে যায় ক্লাসের মধ্যে। মেয়েগুলো মাথা নিচু করে একমনে লিখছে। উদ্‌গত অশ্রুকে চেপে অন্যত্র মনোযোগ দেওয়ার জন্যে রীনা কোন মেয়ের মাথায় কত বড় বেণী, কত চুল তা নিয়েই ব্যস্ত থাকতে চাইল—মনে মনে ভাবল আজ এখন থেকেই আর কথা বলবে না। জিজ্ঞেস করবেও না। ...ছুটির পর স্কুল থেকে বের হতে গিয়ে দেখল, বিনীতা নন্দিনী ওরা আগেই বের হয়ে গেছে—ক্লাস আগে থেকেই ছেড়ে দিয়েছিল। একটা নিষ্কৃতির নিঃশ্বাস ফেলে রীনা। ওদের সঙ্গে কথা না বলবার অপ্রিয় ও অশোভন ব্যাপারটির সম্মুখীন হতে হল না বলে। একটু এগিয়ে যেতেই ওর বুক ধক করে উঠল—সামনের একটা সিগারেটের দোকানে সম্ভবত সিগারেট কিনে দোকানের দড়ি থেকে সিগারেটে আগুন ধরাচ্ছে। তাড়াতাড়ি পাশ কাটিয়ে একটু এগিয়ে যাবে না বেগ কমিয়ে বিমলেন্দুকে আগে যেতে দেবে, না যেমন যাচ্ছে মুখ ফিরিয়ে তেমনি করে চলে যাবে—এই ভয়ংকর সমস্যার সম্মুখীন হয়ে কিছু ঠিক করতে না পেরে কেবল ভাবল, আমার সঙ্গে দেখা করবার জন্যেই কি এখানে অপেক্ষা করছিল? ইতিমধ্যে আগুনে সিগারেট ধরানো শেষ করে বিমলেন্দু একটা কৃতার্থ হবার হাসি হেসে রীনার কাছে এগিয়ে এল। হাসিটি রীনাকে কেমন আশা ও ভরসা দিল। বিমলেন্দু রীনার সঙ্গে সঙ্গে চলতে লাগল। যেন বেশ ঘন হয়ে আসতে লাগল। বিমলেন্দুর হাত রীনার হাতে ঠেকে গেল—কেমন যেন গরম মনে হল বিমলেন্দুর শরীর। ঐ রাস্তার মধ্যেই বিমলেন্দু যেন কেমন নিবিড় হয়ে আসতে চাইল। চোখ মুখ যেন গরম হয়ে উঠতে লাগল। অবশেষে অস্ফুট কণ্ঠে রীনা বলল—সেদিন আমার ব্যবহার আমারই খুব বিশ্রী লেগেছে—এত মন খারাপ হয়েছিল ক্ষমা চাচ্ছি—এতক্ষণের উদ্বেগ, বিমলেন্দুকে দেখে বুকে ধকধকানিতে, ঘন হয়ে আসবার ভয়ে, আতঙ্কে, নিবিড় হবার উত্তেজনায় ও ক্ষমা চাইবার উদারতায় ওর কান্না পেতে থাকে—অন্য সময় এই কান্নাকে অভ্যর্থনা করে রীনা খুশিই হত—কিন্তু রাস্তার মধ্যে, তাছাড়া কান্নার বেগ যদি একবার লাগামছাড়া পায় তা হলে কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে সেই ভয়েও, কান্নাকে অস্বীকারের জন্যে রীনা একটু থামল। হয়তো বিমলেন্দুর প্রতিবাদের সময় নিজেকে সংবরণ করে নেবে এই প্রত্যাশার জন্যে থেমে রীনা আবার বলল—নিজের ব্যবহারে নিজেকেই প্রায় অ্যানিমাল মনে হচ্ছিল—ভাবছিলাম অ্যানিমাল হয়ে কি আর অ্যানিমাল পোষা যায়? পশুদের হিংস্রতা সরল—আমাদের মতো কুটিল নয়—নিজেকে আমার পারফেক্ট অ্যানিমাল মনে হচ্ছিল ... এবার বিমলেন্দু একটু হাসল, পরে বলল—ক্ষমা চাইবার কোন দরকার ছিল না। অন্তত আমার তরফ থেকে কোনও প্রয়োজন ছিল না—ক্ষমা চাওয়া আপনার বিলাসিতা -। আপনার পক্ষে রাগ করাই স্বাভাবিক—যে কেউ হলে আরো বেশি রাগ করতেন—ক্ষমা চেয়ে আপনি আমাকে প্রশ্রয় দিলেন। আপনার বিলাসিতার পরিণামের জন্যে পরে আমাকে দায়ী করবেন না। ...

সেদিন ফ্ল্যাটে ফিরবার সময় যেন সব মিটে গেছে এমনি একটু উৎফুল্লতাকে রীনা ধরে রাখতে চাচ্ছিল—যেন সব মিটমাট হয়ে গেছে এমন একটা স্বাচ্ছন্দ্য ভাব রীনা অনুভব করাবার জন্যে ব্যগ্র হয়েছিল কিন্তু মনের ভেতর থেকে কোন সায় পাচ্ছিল না। সব মিটে যাবার প্রফুল্লতাকে ও স্বাচ্ছন্দ্যকে নিজের মনের মধ্যে বারবার খুঁজে ব্যর্থ হলেও সেই ব্যর্থতাকে স্বীকার করতে চায়নি—বরং জোর করে প্রফুল্লতাকে মনের 'পর জোর করে চাপিয়ে দিতে চেয়েছে। বার বার মনের মধ্যে প্রফুল্লতার পরিবর্তে বেদনা ও আত্মগ্লানি আবিষ্কার করে একটা অর্ধসচেতন গোপন বিস্ময় বোধ করেছে। অন্তরে ও আত্মগ্লানি দেখে তক্ষুণি তাকে একটা প্রফুল্লভাব দিয়ে ঢাকা দিয়েছে। বিস্ময়বোধের দিকে ফিরে তাকায়নি। বাড়ি ফিরে যাবার সময় যতবারই একটা উৎফুল্লভাবকে অনুভব করতে গিয়ে বেদনা ও গ্লানির সম্মুখীন হয়েছে—ততবারই নিজেকে বলেছে, বিমলেন্দুর কাছে ক্ষমা চাইলাম—অপরাধ করেছি বলে নয়। বিমলেন্দুর প্রসন্নতা প্রত্যাশা করেও নয়, ওর সঙ্গে ভাব করবার এমন কিছু গরজ আমার নেই—শুধু এই ঝগড়া-ঝাটিতে মন কেমন বিগড়ে থাকে। মনকে ভারমুক্ত করার জন্যেই ঝগড়া মিটিয়ে ফেলা। সারাদিন পরিশ্রমে আর উত্তেজনায় আর বাসের ঝাঁকানিতে গভীর ভাবে ক্লান্তি বোধ করে রীনা ভাবে, মুখভার মনভার থাকলে ওর (কল্যাণের) সঙ্গে ঠিকমতো ব্যবহার করা যায় না। ওর কী দোষ? সারাদিনের ওই তো অতটুকু সময়—তাও যদি ভালো করে কাছে থাকতে না পারি ...। রীনা নিজে নিজে সিদ্ধান্ত করে, কল্যাণকে ভালো করে সঙ্গ দেবার জন্যে বিমলেন্দুর ব্যাপারটি মিটিয়ে নিল। নইলে মনভার মুখভার নিয়ে থাকলে কল্যাণের 'পর অবিচার করা হয়। রীনা ভাবতে যাচ্ছিল, নইলে বিমলেন্দুর সঙ্গে ভাব করতে ওর বয়ে গেছে ...কিন্তু রীনা একথা প্রকাশ্যে ভাবল না। বিমলেন্দুর সঙ্গে মিটমাট হবার পর ওর সম্পর্কে অপ্রিয় কথা ভাবতে রীনার রুচিতে বাধে—শুধু তাই নয়, একটা অপ্রিয় কথা পাছে ওর মনের গ্লানি ও বেদনা টেনে বের করে আনে—সে জন্যে রীনা বিমলেন্দু সম্পর্কে সকল অপ্রিয় সংবাদকে আলোচনা করা প্রায় অবৈধ চিন্তার মতো দমন করতে চাইল। বাসের ঝাঁকানিতে অন্তরের চিন্তাগুলোর ছিটকে আসাকে রোধ করা রীনার মধ্যে ছিল না—বিশেষ করে কৃত্রিম প্রফুল্লতা সম্পর্কে একটু অন্যমনস্ক হলেই মনে আসে—বিমলেন্দু ঠিক ক্ষমাকে গ্রহণ করেনি—তক্ষুনি ক্ষমা চাইবার জন্যে আত্মগ্লানিকে গোপন করে রীনা স্মরণ করতে চেষ্টা করল, আর বিমলেন্দুকে নিয়ে ভাবা নয়—অনেক ভেবে অনেক বেশি মূল্য দেওয়া হয়েছে—তবে আগামিকাল থেকে ওর সঙ্গে দেখা হলে ভদ্রতা করবে কিন্তু আমল দেবে না। রীনা নিজেকে শাসাল, যদি ওকে আমল দিই—তবে বুঝব আমি কল্যাণকে ভালোবাসি না। মন খচখচ করে, যার সঙ্গে সব মিটিয়ে দেওয়া হল তবে আবার আমল না দিলে মিটিয়ে ফেলবার ব্যাপারটির 'পর কোন শ্রদ্ধা থাকে না—ক্ষমা চাওয়ারও মূল্য দেওয়া হয় না। নিজেকে যেন এক ধমক দেয় রীনা, ও যদি ক্ষমা চাইলে ক্ষমা করতে না পারে—তবে আমি যে ক্ষমা চেয়েছি আমি তা মানব না। আমার ক্ষমা চাওয়া বাতিল করে দিতে বাধ্য হলাম। উত্তেজিত হচ্ছে দেখে রীনা বাইরের দিকে তাকিয়ে ভাবে ফ্ল্যাটে গিয়ে একা বসে একটু কেঁদে নিতে পারলে মনে হচ্ছে—মনটি আর হাল্কা হয়। কান্নাটি ওর পাওনা হয়ে গিয়েছে অনেকক্ষণ। হঠাৎ ওর মনে নন্দিনী

ও বিনীতার দিকে বিমলেন্দুর সেই সতৃষ্ণ দৃষ্টি ভেসে উঠতেই ওর মনে হল বিমলেন্দুর সেই কথাটি, আর কেউ হলে আরো বেশি রাগ করত রীনার চেয়ে। কথাটি মনে পড়তে রীনা উত্তেজিত হবার ভান করে, ভেবেছে কি বিমলেন্দু—রীনার স্বামীর 'পর দরদ কম—একথা বলবার কি অধিকার বিমলেন্দুর রয়েছে? কিন্তু উত্তেজিত হবার ভান করলেও রীনা যেন কিছুতেই রাগ করতে পারে না আন্তরিকভাবে। রাগ করতে যে পারেনা তাতে একটা গোপন ব্যথা অনুভব করে রীনা নিজেকে বোঝায়, কান্নার জন্য মন উন্মুখ হয়ে রয়েছে, তাই হয়তো ঠিক মতো রাগতে পারছি না। অস্পষ্ট ও অস্ফুটভাবে ঠিক এ ধরনের কথাই রীনা ভেবে নেয়। একটু কেঁদে নিলেই মনের প্রফুল্লতাকে ভালো করে অনুভব করা যাবে—নিজেকে সান্ত্বনা দেয়। কিন্তু আর কেউ হলে আরও বেশি রাগ করত রীনার চেয়ে এ কথাটি আবার যেন কানে বেজে ওঠে—কথাটি যেন ফিরে ফিরে আসতে চায় চেতনায়—যেন চেতনায় বাঁসা বাধতে চায়। এবার রাগ করতে চেয়েও রাগ করতে তো পারলই না—কেমন যেন সঙ্কোচ বোধ করতে থাকে। কেমন যেন একটা ধরা পড়ে যাবার অপ্রস্তুত ভাব ঐ সঙ্কোচের মধ্যে দিয়ে আত্মপ্রকাশ করে। রীনা ভাবে, ক'দিন ছুটি নেব—কত কাল ছুটি নিই না। ভালো করে সংসারের দিকে মনও দিই না—ওকেও বলব ছুটি নিতে। স্কুল ভুলে থাকব। ... ফ্লাটে সে কাজকর্মের মধ্যে মুহূর্তের জন্য নিজেকে ভুলে থাকে—শুধু প্রোগ্রাম ঠিক করে রাখে। স্নানের সময় বাথরুমে ঢুকে কেঁদে কল্যাণ আসবার আগে দেহ মনে হাল্কা হয়ে ঝরঝরে হবে। বাথরুমে ঢুকে মাথায় জল দেবার সময় ও কান্নার কথা একদম ভুলে গেল, মনে পড়ল বিমলেন্দুর সেই কথাটি—আমার কাছে ক্ষমা চেয়ে প্রশ্রয় দিলেন—এই বিলাসিতার পরিণামের জন্য আমাকে দায়ী করবেন না। কথাটি মনে পড়ামাত্র যেন মনটি বহুক্ষণ পরে একটা প্রসন্নতা ও প্রশ্রয়ের উচ্ছ্বাসকে দমন করে, মাথায় জল ঢালায় শরীরটিও স্নিগ্ধ হয়ে ওঠে। প্রসন্নতা ও প্রশ্রয়ের উচ্ছ্বাস মনের কালিমাকে মুছে দিয়ে যাবার ফলে একটু দুঃখী হয়ে রীনা ভাবে, বিমলেন্দুকে আমি সিরিয়াসলি নিই না — ওর কথার কিই বা মূল্য—ওকে আর আমল দেওয়া নয়। স্নান শেষ করে বেরিয়ে আসবার সময় হঠাৎ মনে হল—এই যাঃ, কান্নার কথা ছিল না!

রীনার রান্না প্রায় শেষ। এতক্ষণ ধরে স্মৃতির নানা চিত্র ওকে তন্ময় করে রেখেছিল। ও যে আগাগোড়া একটানা ভেবে চলেছিল তা নয়। চিত্রগুলো নানাভাবে ওকে এতক্ষণ ধরে তন্ময় করে রেখেছিল। এবার ওর খেয়াল হল কল্যাণ কী করছে? সেই যে কপালে চুমো এঁকে চলে গেছে আর একবারও খোঁজ নেয়নি। সেই আগের কথা মনে পড়ে যায়। অফিস থেকে এলে মুহূর্তে মুহূর্তে রান্না ঘরে এসে হাজির—ওকে রান্না করা দেখতে। একটু গল্প করে তক্ষুনি বসবার ঘরে গিয়ে একটু বসে আবার এসে হাজির হত—অধীর হয়ে অপেক্ষা করত—কতক্ষণে রীনাকে রান্নাঘরের 'বন্দীদশা' থেকে মুক্ত করে নিয়ে যাবে। যেদিন কল্যাণ বসবার ঘরেই বেশি থাকত—সেদিন রীনা মনে মনে ওর উপদ্রবের জন্যে অপেক্ষা করে শেষ পর্যন্ত কিছু একটা গরম ভাজা প্লেটে করে নিয়ে আসত। রীনাও আগে কল্যাণের রান্না ঘরে হানা দিতে দেরি হলে নিজেই দেখে আসত কল্যাণ কী করছে। এতক্ষণ ধরে রীনা যে কল্যাণের কোনও খোঁজখবর করেনি তা নিয়ে

অবশেষে রীনার কোন মনস্তাপ হল না। শুধু কৌতূহলী হয়ে ভাবল ভদ্রলোক এতক্ষণ ধরে করছেন কী? অথচ এমন তীব্র নয় যা রীনাকে কল্যাণের ঘরের দিকে ঠেলে নিয়ে যেতে পারে। কৌতূহল কিন্তু নিছকই কৌতূহল। একা চুপচাপ কল্যাণ কী করে থাকতে পারে—এই আশ্চর্যজনক নীরবতার জন্যে একটু সস্নেহ কৌতূহল। অমন চঞ্চল অস্থির ছটফটে লোকটি একা একা কী করে এতক্ষণ চুপচাপ রয়েছে কৌতূহল শুধু এইটুকুই। কিন্তু এজন্যে—শুধু এই কৌতূহলটুকু মেটাতে ওর উঠে যেতে অলস্য লাগছে। যেন এই কৌতূহলটুকু মেটাবার জন্যে বসবার ঘর পর্যন্ত যাওয়া অনেক পরিশ্রমের ব্যাপার। আসলে বিমলেন্দুর কথা ও আলোচনায় যে একটা স্বাদ এতক্ষণ ধরে পাচ্ছিল—ঠিক এখুনি উঠে কল্যাণের কাছে গেলে সেই স্বাদ ও স্বাদের রেশটুকু নষ্ট হয়ে যায়, রেশটি ফুরিয়ে যায়।—যেদিন মন খুব খারাপ থাকে, সেদিন অনেক কিছু রান্না করে—যাতে কল্যাণের সামনে কম যেতে হয়—যতক্ষণ রান্না ঘরে থাকা যায়। মন খুশি থাকলে রীনা খুব অল্প কিছু রান্না করে—কল্যাণের তাতে আপত্তি নেই। খাওয়া দাওয়া ব্যাপারে নির্বিকার। যদি অনেক রান্না করে—তবে চিনামাটির পাত্রগুলোর দিকে তাকিয়ে খুশিতে উচ্ছ্বসিত হয়ে বলবে, 'গ্র্যান্ড'- ফরাসি ভাষার রান্নার প্রশংসা জানে, তা বলবে।

সঙ্গে সঙ্গে রীনা সংকল্প করবে। রোজ রোজ অনেক পদ রাঁধবে। যেদিন একটা মাত্র পদ রান্না করেছে হয়তো সঙ্গে একটা ভাজা—পদটি মুখে দিয়েই বলবে, হিরোইন মানে নায়িকা পদ। আগে আগে একটি পদ হলে বলত, তেমনি ডানাকাটা পরী হলে একটি নারী নিয়েই জীবন কাটানো যায়—তেমনি রান্নার একটি মাত্র পদ যদি তৈরি করো আর তা যদি ডানাকাটা হয়—তবে তাকে নায়িকার পদ দেওয়া যেতে পারে। রীনা সস্নেহে কল্যাণের দিকে তাকিয়ে বলে, যেদিন পাঁচটি পদই ভালো হবে সেদিন? কল্যাণ মাথা নেড়ে বলত, বড় সুখকর সমস্যা-পাঁচটি সুন্দরী যদি একযোগে আত্মনিবেদন করতে চায়—সেই সুন্দরীদের গণতন্ত্রে সকলের সঙ্গে সমান ব্যবহার করতে হবে—সকলকেই সমান অধিকার দিতে হবে। .....রীনা চিন্তার মোড় ফেরাতে চায়—বিমলেন্দুর স্বাদও রেশ থেকে মন চলে যাচ্ছে ভেবে কল্যাণও রান্নার বিষয় আলোচনায় ছেদ টানতে চায় কিন্তু কল্যাণ ও রান্নার বিষয় ভাবতে গিয়ে মন সরস হয়ে উঠেছে—তাকে ছেদ টানতে চায় না। অন্তরে অন্তরে একটু সূক্ষ্ম অস্থিরতা বোধ করে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে কল্যাণের খাওয়ার দিকে মুগ্ধ হয়ে রইল। নিজেকে ওর অনেক ভালো লাগল। নিজের কোমল সস্নেহ দৃষ্টিতেই যেন নিজেকে আকণ্ঠ পান করল। নিজেকে ওর কল্যাণের ওপর মমতাময়ী, স্নেহময়ী মনে হল। কিন্তু নিজের এই ভালো লাগবার অনুভূতি নিজের সূক্ষ্ম অস্থিরতার জন্য বেশিক্ষণ ধরে রাখতে পারল না। .....কল্যাণ সম্পর্কে বেশিক্ষণ উচ্ছ্বসিত হওয়া ওর ঘটল না। মনে হল, কল্যাণ আজকাল কেমন আনমনা থাকে—তবে হঠাৎ তা ধরতে পারা যায় না—যথেষ্ট মনোযোগ ওর দিকে দিলেও, রীনার মনে হয় যেন রীনাকে দেখলেই ওর উচ্ছ্বাস ও খুশি প্রবল হয়ে দেখা দেয়। অথচ ওকে না দেখলে ওর সম্পর্কে ওর আগ্রহের কিছুমাত্র অনুভব করা যায় না। রীনাকে দেখলেই কল্যাণের রীনাকে মনে পড়ে—আর মনে পড়ে বেশ প্রবলভাবেই। এইতো এ বুধবারের আগের বুধবার, স্ট্রাইকের জন্যে স্কুল ছুটি হয়ে গেলেও বিমলেন্দু অনেকক্ষণ স্টাফরুমে বসে

ওকে আসতে দিল না—আড্ডা দিল। আরো অনেকেই ছিল শেষ পর্যন্তই। তবুও ঠিক পাশের চেয়ারে বিমলেন্দু যেন বেশ ঘনিষ্ঠ হয়েই বসে ছিল। মাঝে মাঝে রীনার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে গল্প করছে—রীনা অবশ্য বিনীতা বা নন্দিনীর দিকে তাকিয়ে কথার উত্তর দিয়েছে। তবু বিমলেন্দুর ঐ ঘনিষ্ঠভাবে বসা—যেন রীনা বিমলেন্দুর শ্বাস-প্রশ্বাস পর্যন্ত শুনতে পাচ্ছিল। ওর গরম হাত বহুবারই ওর হাতে লেগেছে—যেন ওর হাতে গরম ছ্যাঁকা লাগল। সেদিন সারা বিকেলে অস্থির করে তুলেছিল। শ্বাস-প্রশ্বাসও ওর যেন গরম হয়ে উঠেছিল! কেমন মাঝে মাঝে বুক কেঁপেছে। বাড়ী ফিরে কল্যাণের জন্য অধীর হয়ে অপেক্ষা করেছে। কলিং বেলের শব্দের জন্য সারাক্ষণ সাগ্রহে ছটফট করেছে।—কল্যাণ এত রাত করে। তবু রীনা তাতে কিছু মনে করেনি। এসে একটু সৌখীন আদর করে, দু'চারটে চটকদার কথা বলে পত্রিকা পড়তে শুরু করল। সঙ্গ পাবার আকাঙ্ক্ষা বুঝতে পেরেও কল্যাণ সেদিন না বুঝবার ভান করল। ক্ষুণ্ণ মনে অনেক রান্না করে যখন বিছানায় এল-তখন রীনা কল্যাণকে পাবার আকাঙ্ক্ষা ধরে রাখতে পারছিল না। কল্যাণ কিন্তু সেদিন ভয়ংকর ঘুম পাচ্ছে আজ বলে ক'টা চুমো খেয়ে ঘুমিয়ে পড়বার ভান করল। মাঝে মাঝে ও যেন কী রকম ঠাণ্ডা হয়ে যায়—যেমন আজ ...। হঠাৎ সংযমের বাতিক মাথায় চড়ে বসে। একটু পুরানো হয়ে গেলে এমনি হয়তো হয়—এমনি হওয়াই হয়তো অনিবার্য। অথচ এ নিয়ে মুখ ভার করতে লজ্জা করে, নিজেকে ছোট মনে হয়। তবু ঐ ঘটনার পরের দিন মুখভার মনভার যে হয়নি তা নয়—কিন্তু তা সামান্য, কারণ ভোরবেলা উঠেই ওর মনে হয়েছে স্কুলে যাব আজ। সঙ্গে সঙ্গে মন খুশি হয়ে আগের দিনের ব্যবহার নিজের অজান্তে ক্ষমা করে ফেলেছে। সেদিন রোববার হলে, মুখভার হওয়া থেকে অব্যাহতি ছিল না।

বিমলেন্দুর সঙ্গে মেলামেশা কিছুতেই সহজ ও স্বাভাবিক হয় না। দু'তিন দিন একভাবে গেল তো, চারদিনের দিন এমন কিছু কথা হবে—যার জন্যে বাড়িতে এসে কাজকর্ম সব কিছুই ওর বিস্বাদ হয়ে যায়। ছটফট করে ভাবে বিমলেন্দুর জন্যে এত অশান্তি আর ওর ভালো লাগে না। কতবার ভেবেছে চাকরি ছেড়ে দেবে কি অন্য স্কুলে চলে যাবে, কি ছুটি নেব, বিমলেন্দুর সঙ্গে আর জীবনে কথা বলব না। বিমলেন্দুকে আমল দেব না। ওর কথা ভাবব না, বা কথা বলব না দেখা হলে, মুখ রাখা হাসি হাসব এই পর্যন্ত। কিন্তু বিমলেন্দু সম্পর্কে কিছুতেই মনস্থির করতে পারেনি শেষ পর্যন্ত। পূজোর ছুটিতে কল্যাণ আর রীনা পুরী বেড়াতে গেছে। যদি কিছু জিনিস দেখেছে বা শুনেছে, মনে মনে ভেবেছে এ কথা বিমলেন্দুকে বলতে হবে। শেষ পর্যন্ত বিমলেন্দুর জন্যে একটা সিগারেটের ছোট পাইপ কিনল উপহার দেবে বলে। পাইপটি কেনবার পর থেকে একটা আত্মগ্লানি ওকে পেয়ে বসল। ওর মনে হল বড্ড বেশি প্রশ্রয় বিমলেন্দুকে দিচ্ছে—কল্যাণের 'পর অবিচার করছে—এ ভালো নয়, মনে হল পাইপ উপহার দিলে রীনা যেন বিমলেন্দুর কাছে ধরা পড়ে যাবে। যেন নিজের দুর্বলতার একটা স্থায়ী চিহ্ন বিমলেন্দুর হাতে তুলে দেওয়া হবে—যেন পাইপটি দিয়ে আর ওর বিরুদ্ধাচারণ করতে পারবে না—নিজের স্বাধীনতা নষ্ট করে দেবে—এটি উপহার দিলে যেন রীনার আর ফেরবার পথ থাকবে না। পাইপ উপহার দেয়া মানে রাগ, বিতৃষ্ণা, ক্ষোভও দূরে চলে

আসবার অধিকার নষ্ট করে ফেলা। রীনার স্বাধীনতাই যেন চলে যাবে। রীনা ঠিক করল, কল্যাণকে প্রেজেন্ট করবে আজ বিকেলেই। কিন্তু সত্যি সত্যিই কল্যাণকে দিতে পারল না। কল্যাণ পাইপের কথা কিছু জানলও না। ছুটির পর স্কুলে গিয়েও বিমলেন্দুকে দেখেও প্রেজেন্টেশন দেওয়া মনে হল বাড়াবাড়ি। নিজের তীব্র আপত্তি সত্ত্বেও পাইপটি নিয়ে তারপর স্কুলে গেল। কিন্তু বিমলেন্দুকে দেখেই ঠিক করল, দেব না। সারাদিন ভয়ে ভয়ে রইল, হঠাৎ ঝোঁকের মাথায় দিয়ে না দেয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেয়নি। আবার বাসায় এসে ট্রাঙ্কের তলায় ফেলে রাখল, মনে মনে ঠিক করল, একদিন গঙ্গায় ফেলে আসব। বিমলেন্দুকে যখন দিলাম না—কল্যাণকেও দেব না। কারুকে দেবার দরকার নেই—কেউ উপহারের যোগ্য নয়। সেদিন গডরেজের একটু নতুন আলমারি কিনে আনবার পর—কল্যাণ খাটের 'পর পা ঝুলিয়ে বসছিল—আর মেঝেতে রীনা বসে ট্রাঙ্ক থেকে শাড়িগুলো বের করে আলমারিতে রাখছিল—হঠাৎ একটা শাড়ির ভাঁজ থেকে পাইপটা মেঝেতে পড়ে যেতেই রীনা মুহূর্তের জন্যে একদম ফ্যাকাসে হয়ে গেল—কিন্তু তা বোধ করি মুহূর্তের জন্যে—তারপরই নিজের অপ্রস্তুত ভাবটি সামলে নিয়ে অথচ মুখে অপ্রস্তুত ভাবটা ধরে রেখে কল্যাণের দিকে তাকাল। কল্যাণ হঠাৎ চমকে গিয়েছিল—কিছুটা অবাক হয়ে দেখছিল। রীনা কৃত্রিম কাঁচুমাচু হয়ে বলল ইস্ দেখে ফেললে। তোমার জন্মদিনে প্রেজেন্ট করব ভেবেছিলাম—একটা সারপ্রাইজ দেব—সে জন্যে পুরী থেকে কিনেছিলাম। সঙ্গে সঙ্গে ক্যলাণ চোখ বুজে বলল—দেখিনি দেখিনি। তারপর একটু হেসে বলল, সারপ্রাইজ আজই হয়ে গেলাম—প্রেজেন্ট তুমি জন্মদিনে কোরো। তারপর পাইপটা হাতে নিয়ে উল্টে পাল্টে দেখে খুশি হয়ে বলল—আমি ছোট পাইপই পছন্দ করি—অনেকে এত বড় বড় পাইপ ব্যবহার করে—ঐগুলো পাইপ নয়—টিউব—টিউবের ভেতর দিয়ে যেন টিউবট্রেন যেতে পারে।

কল্যাণকে পাইপটি দেওয়াতে রীনার মনে কিছুমাত্র ক্ষোভ হয়নি—বরং কল্যাণ কিছু বুঝতে না পারবার জন্যে রীনা আরামবোধই করছিল। বিবেক অনেক পরিচ্ছন্ন মনে হয়েছিল। .....অল্পদিন আগের একটা ঘটনা আবার ওর মনে এল। রীনা স্কুল থেকে ফিরছিল—হঠাৎ ওর বুক কেঁপে উঠল—বিমলেন্দু ঠিক সেই সিগারেটের দোকানের দড়ি থেকে আগুন ধরাচ্ছিল। সিগারেট ধরিয়ে ওর কাছে আসতেই বুক কাঁপা সত্ত্বেও সপ্রতিভভাবে রীনা জানাল, আচ্ছা, আপনার তো দেশলাই পকেটে আছে, তবু ঐ দড়িতে মাথা ঠোকেন কেন? আমি একদম দেখতে পারি না।

বিমলেন্দু একটু হাসল। তারপর একসঙ্গে যেতে যেতে বিমলেন্দু বলল, আপনার সঙ্গে একটা কথা ছিল। বুক ভয়ংকরভাবে রীনার কাঁপতে থাকে, হাত-পা কেমন যেন অবশ হয়ে আসতে চায়—নিজেকে যেন একেবারে ভারসাম্যহীন মনে হয়। কেমন নেশার মতো লাগে। অথচ নেশাটি সহ্য করতে পারছে না কিন্তু নেশা চলে যাক তাও যেন ইচ্ছে নয়। কিন্তু বিমলেন্দু কিছুই বলছে না। কী কথা জিজ্ঞেস করতেও রীনার সাহস হয় না—পাছে সেই প্রশ্নের মধ্যে বিমলেন্দুকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়। অথচ নীরবতাও আস্তে আস্তে পাথরের মতো রীনার 'পর চেপে বসেছে। রীনা যেন আর সহ্য করতে পারছিল না—আর নীরবতার বোঝা বলে বুঝি ওর সহ্য হয় না। বুঝতে পারছিল বিমলেন্দু

সঙ্কোচবোধ করছে। বিমলেন্দু সঙ্কুচিত হচ্ছে ভেবে রীনার ভীতি যেন দশগুণ বেড়ে উঠছিল। যেন প্রাণশক্তির আদিম প্রেরণাতেই রীনা যাচ্ছে ওর আর সব উদ্বৃত্ত শক্তি নিঃশেষ হয়ে গেছে। বেপরোয়া কণ্ঠে যেন একটা ধমক দিয়ে রীনা বলল—চুপ করে থাকাটাই কি আপনার কথা? বিমলেন্দু একটু ম্লান হাসার ব্যর্থ চেষ্টা করে জানাল, না, বড্ড বিশ্রী লাগছে কথাটা বলতে। আপনি কী ভাববেন জানি না। তোমার গোটা পঞ্চাশেক টাকার দরকার—ছোট ভাইটার টাইফয়েড—হাত একদম খালি—তাই। ঘাম দিয়ে যেন জ্বর ছেড়ে যায়—যেন রাহুর গ্রাস থেকে রীনা বেঁচে গেল। সমস্ত দেহে মনে একটা মুক্তির উল্লাস বোধ করে—আবার পরিচিত জনতাকে ওর সুন্দর ও আপন মনে হয়। মনে হয়, সব ঠিক আছে—সব ওর অনুকূলে। বিমলেন্দু বলে চলে, আর কেউ দিতে পারবে বলে মনে হয় না—আপনারা দু'জনে রোজগার করেন। রীনা উল্লসিত হয়ে মুক্তির স্বচ্ছন্দ বাতাস সকল দেহে অনুভব করে, হাল্কা বোধ করবার আনন্দে উদ্বিগ্ন কণ্ঠে জানায়—টাইফয়েড? তাই তো। আচ্ছা টাকাটা আগামিকাল দিলে হয় না—এখন তো আমার কাছে ...। বিমলেন্দুও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে—হ্যাঁ, আগামিকালই দেবেন—কারো কাছে কি আর পঞ্চাশ টাকা নগদ থাকে। আপনার তো নিশ্চয়ই নিজের অ্যাকাউন্ট আছে তা থেকে তুলেই তো দেবেন—আগামিকালের আগে হবে কী করে? কিন্তু টাকা তুলতে গেলে তো ফাস্ট পিরিয়ডে আসতে পারবেন না? শেষ পর্যন্ত ঠিক হল—ব্যাংকের কাছে বিমলেন্দু দশটার সময় অপেক্ষা করবে। ওদের দু'জনেরই স্কুল কামাই হবে। রীনা জানাল, টাকা এখন না পেলে ওর অসুবিধে নেই। বিদায় নেবার আগে বিমলেন্দুর জন্যে আগামীকাল রীনার একটু ক্যাজুয়েল লিভ নষ্ট হবে এ জন্যে দুঃখ করতে করতে গেল। সেদিন রীনার দেহে-মনে যেন ঝরঝরে ও হাল্কা বোধ এমন সহজ সরল আন্তরিক খুশি খুশি ভাব দেখা দেয় বা বহুদিন হয়নি। রীনা সেদিন নিজে কল্যাণের সামান্য আদরের চাহনির উত্তরে যেচে চুমু খেল—চুলের ভেতরে অনেকক্ষণ আঙুল বুলিয়ে দিতে দিতে কেবল আবছা করে মনে হতে লাগল, এবার বিমলেন্দু যেন ওর সম্পূর্ণ দখলে এসে গেল। সম্পূর্ণভাবে বিমলেন্দুকে জয় করবার, অধিকার করবার—সম্পূর্ণভাবে সীমা জেনে ফেলবার, ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলো রীনার করায়ত্তে আসবার, বিমলেন্দুকে সম্পূর্ণ আয়ত্তে আনবার দুরূহ কাজ শেষ হবার একটা স্বস্তি ও আনন্দে রীনা কল্যাণের 'পর অনেক মধুর ও মমতাময়ী হয়ে ওঠে। সেদিন সামান্য রান্না করল—সারাক্ষণ কল্যাণের কাছাকাছি ঘুরঘুর করল। সেদিন আবার কল্যাণ ও রমার মধ্যে একটু মন কষাকষি হয়েছিল—কল্যাণের যাবার প্রস্তাব রমা ঈষৎ তিক্ততার সঙ্গে প্রত্যাখান করেই রমা অবশ্য তা শুধরে নেয়—এবং না যাবার অনেক কারণ মধুর কণ্ঠে জানায়। কিন্তু কল্যাণ সেই মুহূর্ত থেকে যে গম্ভীর হয়ে গিয়েছিল—তা আর টলানো যায়নি। ফিরে আসতে আসতে কল্যাণ কেবল ভাবতে লাগল, রমার কোনও একটি প্রস্তাবকে ঠিক এমনি ভাবে তিক্ত-বিরক্ত কণ্ঠে প্রত্যাখ্যান করে আজকের জবাব দিতে হবে। কিন্তু রমা যে কোন কিছুই প্রস্তাব করে না। বা কী কী প্রস্তাব করতে পারে বা কৌশলে রমার মনে কোনও প্রস্তাব শোনানো যায় কি না—সেই কথা বেশ আহত মনে জ্বালার সঙ্গে ভাবতে ভাবতে বাড়ি এল। যদিও নিজের মনের জ্বালাকে বাইরে কিছুমাত্র প্রকাশ হতে

দিল না—নিজের ভেতরে যে নিষ্প্রাণতা বোধ করছিল বাইরের কৃত্রিম আমুদে ভাবের মধ্য দিয়ে তা উদ্ধার করা সহজ ছিল না। সেদিন রীনার খুশি খুশি চেহারা, মধুর ও মমতাঝরা রূপে ওর মন যেন নিজের অজান্তেই রীনার কাছে আশ্রয় পেল। রীনার খুশি ওর অন্তরের নিষ্প্রাণ বিষণ্ণতার গ্লানিতে অনেক ধুয়ে-মুছে দিল। যদিও ভাবল, হয়তো রীনা ডি.এ. র টাকা পেয়েছে এই খুশিগুলো ডি. এ. টাকা পাবার মাধুর্য—সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে বোঝাল, রীনার 'পর আরো মনোযোগ দেওয়া দরকার—ও বেচারি স্কুল থেকে এসে হা-পিত্যেশ করে বসে থাকে আমার জন্যে। ওর তো আর কোনও ডাইভারশন নেই—আর কিছু তো জানে না! রীনার 'পর অমনোযোগ দেবার প্রায়শ্চিত্ত হিসেবে সেদিন কল্যাণও রীনার খুশি চেহারার জবাব দিল। রীনা নিজের নামে অ্যাকাউন্ট যেদিন থেকে স্কুলের প্রথম মাসের মাইনে পেয়েছে সেদিন থেকেই। বিয়ের অনেক আগেই স্কুলে ঢুকেছিল—যদিও খুব দরকার যে ছিল তা নয়। হঠাৎ সুযোগ ঘটে গেল। ঐ স্কুল থেকেই বি.টি. পড়তে গিয়েছিল—বি.টি. পাস করবার বছর দুয়েক পর এখানকার স্কুলে কিছুটা বেশি মাইনেতে চলে আসে। রীনার বাবা মার্চেন্ট অফিসের অফিসার। রীনার দাদা দু'জনও ঐ মার্চেন্ট অফিসেই কেরানি। একজন অফিসার হব হব করছেন। রীনার দিদির বরও মুনসেফ। রীনা মেজ বোন। ওর পরও দু'বোন দু'ভাই। প্রত্যেকের চেহারাই খুব সুশ্রী। তা দিয়ে রীনাদের পরিবারের মেয়েরা সচেতন—পুরুষরাও কম নয়। রীনার বাবার গর্বও সবচেয়ে বেশি। বিমলেন্দুর চেহারা সম্পর্কে রীনার বিতৃষ্ণা যতটা পারিবারিক সংস্কার ততটা হয়তো প্রবৃত্তিগত নয়। কল্যাণের চেহারা সম্পর্কে রীনা সপ্রশংস মনোভাব পারিবারিক সংস্কার, রূপের শর্তপূরণ হওয়ার তৃপ্তি, প্রবৃত্তিগত কি না বলা মুশকিল। কল্যাণের রূপের প্রশংসা শুনতে রীনা যতটা ভালোবাসে কল্যাণকে দেখতে ততটা ভালোলাগে কি না তা জোর করে বলা শক্ত। কল্যাণ যতটা গর্বের বস্তু—ততটা আকর্ষণের বিষয় কি না রীনার ব্যবহার বিশ্লেষণ করলে এর সঠিক জবাব চট করে পাওয়া ও দেওয়া কঠিন। তবে রীনার রূপ-সচেতনতা অহংকারে পরিণত হয়নি। নিজের সৌন্দর্য সচেতনতা নিষ্ক্রিয়—সক্রিয় নয়। দেখতে ভালো পরিবারের মধ্যে মানুষ হবার জন্যে বাপের বাড়ির রূপ নিয়ে যতটা গর্ববোধ করছে—নিজের সম্পর্কে ততটা নয়। স্কুল-কলেজে-বিশ্ববিদ্যালয়ে নিজের রূপের প্রশংসা শুনে খুশি হয়ে ভেবেছে, এতে ওর কৃতিত্বের চেয়ে ওদের পরিবারের কৃতিত্বই বেশি। নিজের প্রশংসা শুনবার সঙ্গে সঙ্গে মনে হয়েছে, তবু তো এরা আমার বড়দি আর অনুকে (সবচেয়ে ছোটো) দেখেনি। ওরা দু'জনই অসামান্য সুন্দরী। দেখলে না জানি কী বল তো। রীনার বাবা মেলামেশার ব্যাপারে ভারি খুঁতখুঁতে। টাকাপয়সা ও যাদের রূপ নেই তাদের সঙ্গে নিজেও মেলামেশা করতেন না—সংসারের কাউকে মিশতে দিতেন না। প্রত্যেকেই যে সংসারে অত্যন্ত দুর্লভ এ শিক্ষা তিনি দিয়ে এসেছেন। ফলে কেউ অহংকারী কেউ অসামাজিক, কারও মেশবার ক্ষমতা খুব কম—কেউ ইন্টারভিউতে সাফল্য লাভ করতে পারেনি। ছেলে দুটি পড়াশোনায় খুবই সাধারণ। কিন্তু বাবা তা স্বীকার করতে রাজি নন। বড় দু'জন বি.এ. পাশ করবার পর প্রথমে আই.এ. এস পরের সেশন ডবলু বি.সি.এস দিল। ব্যর্থ হবার পর বাবা বোঝালেন আজকাল গভর্নমেন্ট সারভিসে সেই

গ্ল্যামার নেই আর কিবা মাইনে দেয়—তাছাড়া এক্সিকিউটিভ হওয়ার ঝুঁকি খুব বেশি। তখন ছেলে দু'টি সেক্রেটারিয়েটশিপ পরীক্ষা দিল, তার পর রাজ্য সরকারের ক্লার্কশিপ পরীক্ষা। কিন্তু কোথাও লিখিত অংশেই পাশ করতে পারল না। তখন পিতৃদেব এদের নিয়ে এমপ্লয়মেন্ট একসচেঞ্জে নাম রেজিস্ট্রি করালেন—এবং তারই চেষ্টায় কোনও কোনও সওদাগরী অফিসে ইন্টারভিউ পাওয়া গেল। কিন্তু ইন্টারভিউতে ব্যর্থ হয়ে ফিরে এলে পিতৃদেব সান্ত্বনা দিলেন—ভিতরে লোক ছিল—কিন্তু এরা কোনওরকম প্রশ্নেরই জবাব দিতে পারেনি দেখে সেই ভদ্রলোক পক্ষে মুখ খুলতে সাহস করেননি। শুধু ইন্টারভিউ শুরু হবার আগে সেই ভদ্রলোক বলেছিলেন—ইউনিয়ন এদের সমর্থন পাবে না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি এদের সমর্থনে আর মুখ খোলেননি। তারপর রীনার বাবা নিজের কোম্পানির ম্যানেজিং ডিরেক্টারকে ধরাধরি করে ইউনিয়নের পাণ্ডাদের সাময়িকভাবে হাত করে ছেলে দুটোকে ঢুকিয়ে দেন। যদিও তখন কোম্পানিতে পরিবারের একজনের বেশি নেওয়ার প্রথা নয় বলে ঘোষণা করা হয়েছিল তবু, তা যখন একটা নতুন প্রথা—কোনও আইন নয়—মৌলিক অধিকারের বিরুদ্ধে যায় না—তখন কোম্পানি এদের এক জোড়াকে কোম্পানিতে ঢুকিয়ে শান্ত হয়। এদের এখন বিয়ে হয়নি—কারণ পিতৃদেবের মেয়ে পছন্দ নয়। বাবা নিজের গাড়ি করে ছেলেদের বাড়ি নিয়ে আসেন অফিস থেকে। ছেলেরা মহিলা স্টেনোগ্রাফার ও লেডিটাইপিস্টদের সঙ্গে গল্প অসম্পূর্ণ রেখে অসন্তুষ্ট মনে বাবার সঙ্গে গাড়িতে গিয়ে ওঠে। বাবা নিজে ড্রাইভ করতে করতে ঐ লেডিটাইপিস্টদের চেহারার নিন্দা শুরু করেন। ওদের দিকে বার বার তাকাতে ইচ্ছে করে। বাবার কথা শুনে তাদের মনে পড়ল, সত্যই তো একজনের চোখ দুটো ছোটো, আর একজনের নাকের গঠন মঙ্গোলীয়—দু'জনেই মুষড়ে পড়ে। দু'জনের ধারণা হয়—ওদের সঙ্গে কথা বলে নিজেদের সস্তা করে ফেলেছে। ওদের সঙ্গে কথা বলে নিজেদের মনে যে একটা কৃতার্থ ভাব ছিল তাকে এখন মনে হচ্ছে খেল হয়ে যাওয়া—নিজেদের দুর্লভ চেহারার মূল্য অন্যায়ভাবে ভুলে থাকা। রীনার বড়দিকে সিনেমায় নামানো রীনার বাবার খুব ইচ্ছা ছিল। একজন পরিচলকের সঙ্গে যোগাযোগ করলেন স্ক্রিনটেষ্ট ও ভয়েস টেষ্টের পর পরিচালক বললেন—চলতে পারে। পরিচালকের চোখে মুখে কিছু মাত্র মুগ্ধতা না দেখে বেজায় চটে গেলেন। যাই হোক মনে মনে পরিচালকের ঠাণ্ডা-সম্মতির প্রতিশোধ নেবার সংকল্প করলেন। ঠিক করলেন প্রথমে নামুক পরে নাম হলে অন্য পরিচালকের সঙ্গে কনট্রাক্ট করবেন। এ পায়ে ধরলেও তখন এর সঙ্গে আর নয়। কিন্তু সিনেমায় মেয়ের নামা হল না। মা ব্যাপারটি জানতে পেরে দারুণ বেঁকে বসলেন। মেয়ের নিজের ইচ্ছে ভাই-বোনেদের ইচ্ছে, বাবার ইচ্ছে- কিন্তু মা সবার বিরুদ্ধে দাঁড়ালেন। ধরতে গেলে এই পরিবারের সবচেয়ে সুন্দরী তিনিই। এতগুলো সন্তানের জননী, স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য এখনও তার অটুট। বড় ঘরের মেয়ে তিনি। স্বল্পভাষী, অন্যায় জেদ করেন না—যা ধরেন তা ছাড়েন না। নিজের মতো থাকেন—হৈ চৈ ভালোবাসেন না। শুধু বলেন—না মীনার সিনেমায় নামা হবে না। *ওর ঘর সংসার করতে হবে না? লেখাপড়া শিখেছে কী জন্যে? ওর বিয়ে দিতে হবে না—সিনেমায় নেবেছে শুনলে ওর বর ও'কে বিশ্বাস করতে পারবে? এখন পারলেও*

পরে পারবে না। মেয়ের জীবন নিয়ে ওমন ছেলেমানুষী আর করো না। এক সঙ্গে অতগুলো কথা তিনি বহুকাল বলেননি। তবু রীনার বাবা জেদ করতে লাগলেন। তবু কিছু হল না। তখন রীনার বাবা বাড়িতে খাওয়া দাওয়া বন্ধ করলেন। রীনার মাও খাওয়া বন্ধ করলেন। দেখাদেখি রীনার দিদিও খাওয়া বন্ধ করলেন। বাড়ির আবহাওয়া যাচ্ছেতাই হয়ে উঠল। রীনা অবশ্য অফিসে বা রেস্তোরাঁয় কিছু খেয়ে নিল। কিন্তু মা আর মীনা একদম উপবাস। দু'দিন প্রায় এমনি করে কেটে যাবার পর রীনার মা ও দিদির শরীরে উপবাসের চিহ্ন প্রকাশ্য হয়ে উঠল। রীনার বাবা অফিস থেকে ফেরবার পথে অবশ্য মিষ্টির দোকানে মিষ্টি খেয়ে আসেন। তবুও না খেয়ে একাদশী অভ্যাস করছেন। এদিকে রীনার তখন বি.এ. পরীক্ষা। রীনা নিজে ডাইনিং টেবিলে খাবার দিয়ে একবার বাবার হাত ধরে একবার মার হাত ধরে আর একবার দিদির হাত ধরে টানাটানি শুরু করে। কেউ আসে না। তখন নিজে হু হু করে কাঁদতে থাকে। ছোট ভাইবোনেরা ভয়ে চুপসে এদিক-ওদিক আড়ালে আবডালে থাকে। বড় দু'জন যেন কিছু জানে না এমনি ভাব করে এ ঝামেলার দায়িত্ব থেকে দূরে দূরে রইল। অবশেষে ভদ্রলোক নিজেই আত্মসমর্পণ করলেন—স্ত্রীকে ডেকে খাওয়ালেন—মীনাকে ডেকে খাওয়ালেন—নিজেও খেলেন। শুধু খাবার দাবার পর বললেন, তোমাদের যা কিছু মা কে বলবে। আমার কাছে যেন কেউ না আসে। মীনা প্রায় এক সপ্তাহ মা'র সঙ্গে একটি কথাও বলেনি। প্রায় মাসখানেক মা'কে এড়িয়ে এড়িয়ে থেকেছে—শেষে এ'নিয়ে একদিন মীনার সঙ্গে রীনার ঝগড়া হয়ে গেল।

এদিকে সেই স্বল্প-বাক শীতল পরিচালক প্রথমে রীনাদের বাড়িতে লোক দিয়ে সংবাদ দিলেন—অমুক তারিখে স্টুডিওতে আসতে। ক্ষুব্ধ চিত্তে রীনার বাবা তাকে ফেরত দিলেন। এরপর পরিচালক নিজে আসতে শুরু করলেন। তাকে প্রত্যাখ্যান করতে চাইলেন—কিন্তু প্রত্যাখ্যান—প্রতিশোধের আনন্দের চেয়েও নিজের মেয়েকে সিনেমায় নামতে না দেবার বেদনায়, ব্যর্থতাবোধে, কী করলে মীনার মা'র ব্যবহারের প্রতিশোধ নিতে পারেন সেই কল্পনায় অস্থির হলেন। পরিচালক ভালো করে ভেবে দেখবার সময় দিয়ে যাচ্ছেন। তার শীতল ব্যবহার ক্রমেই উষ্ণ হয়ে উঠতে লাগল। স্বল্প-ভাষণ, প্রায় বাগ্মিতায় রূপান্তরিত হতে লাগল। অবশেষে মীনার মা স্পষ্ট ভাষায় পরিচালককে বিদায় করে দিলেন। কিন্তু ক'দিন পর থেকেই পরিচালক মীনার বাবার অফিসে ফোন করতে লাগল—এমন প্রস্তাবও দিল—স্ত্রীকে না জানিয়ে নিয়ে আসুন—ছোট একটা রোল দিচ্ছি—তাতেই নাম হবে। চারদিক থেকে প্রশংসা শুনলে তিনি মত না পাল্টে পারবেন না ...

ক'দিন পরে আবার ফোন ... আপনার স্ত্রী তো সিনেমা দেখেন না—তিনি তো টেরই পাবেন না—অপরের কাছে শুনবেন? তা তখন শুনলে আর কী হবে—বলবেন, নেমে যখন ফেলেছে, হ্যালো, মেয়ে তো আপনার স্ত্রীর একার নয়—আপনিই ধরতে গেলে আপনার মেয়ের গার্জিয়ান—আরে আপনার স্ত্রীরও তো গার্জিয়ান ও গুরুজন। আপনার মতের কী? সেদিন বাড়ি ফিরে খিদে নেই বলে তিনি খেলেন না। তবে অনশনকে পরদিন সকাল পর্যন্ত টেনে নিয়ে যেতে সাহস করলেন না—পাছে স্ত্রী বদলা—অনশন নিতে

শুরু করে। সেই দিদি মুন্সেফ গিন্নি। সিনেমার প্রসঙ্গ উঠলে অস্বস্তিবোধ করে। এখন দু'টি সন্তান। মীনার মেজদা নিজে সেই পরিচালকের সঙ্গে দেখা করে নিজের অভিনয়ের বাসনা জানায়। পরিচালক বলে দেয়, আপনার মা'র তো মত নেই। আপনারা তো সব নাবালক—এমনকি আপনার বাবা পর্যন্ত—তা ছাড়া রোল নেই কোনও। যখন চলে আসছিল, তখন বলল, যদি বোনকে নিয়ে আসতে পারেন তবে হয়তো আপনাদের দু'জনের জন্যে একবার চেষ্টা করে দেখতে পারি—তবে কথা দিতে পারছি না। অনেক ভদ্রলোক তাদের পরমা সুন্দরী মেয়েদের নিয়ে সর্বদা আমাদের কাছে ধন্না দেন—আমরা আমলও দিই না—আপনার বোনকে দিতে রাজি ছিলাম—রোলটাতে ভালো মানাত—ট্যালেন্ট হল আসল কথা। আপনার মা আপনার বোনের ট্যালেন্টাকে নষ্ট করে দিল আমরা খুঁজি ট্যালেন্ট। সে জন্যেই আমরা ইন্টারস্টেডও ছিলাম—নইলে মেয়ের কি অভাব।

এরপর অফিসের বার্ষিক থিয়েটারে দু'একবার অভিনয় করেছে মীনার মেজদা। কিন্তু সবাই বলেছে, অভিনয় হবার নয়।

রীনার বিয়ে হয়েছে প্রায় তিনবছর। জামাই দু'জনের মধ্যে বাবা পছন্দ করেন কল্যাণকে—মা পছন্দ করেন বড় জামাইকে। কল্যাণের সুশ্রী চেহারা, আমুদে স্বভাব, চমকানো কথাবার্তার জন্যে মীনার বাবার খুব গর্ব মেজ জামাইয়ের জন্যে। বড় জামাই সে তুলনায় দেখতে ভালো নয়, ধীর, স্থির—বেজায় গম্ভীর ও রাশভারী। মা সে জন্যে বড় জামাইকে যেমন শ্রদ্ধা তেমনি স্নেহ করেন। দু'চারটে কথাবার্তা তিনি বড় জামাইয়ের সঙ্গে বলেন। বড় জামাই সম্পর্কে মীনার বাবার আপত্তি—মাথার চুল উঠে যাচ্ছে—রঙটা যেন দিন দিন পুড়ে যাচ্ছে—কেমন মোটা হয়ে যাচ্ছে। অথচ বিয়ের সময় এমন ছিল না। বড় জামাইয়ের চেহারার পরিবর্তনকে তিনি প্রায় বিশ্বাসভঙ্গের তুল্য অপরাধ বলে মনে করেন। বড় জামাইয়ের রূপ খারাপ হবার ক্ষোভে তিনি একদা বড় জামাইকে বলেই ফেললেন—মীনাকে সিনেমায় চান্স দেবার জন্যে একজন পরিচালক, এত ঝুলোঝুলি করেছিল। আমরা দেখলাম ভদ্রলোকের মেয়ে ঘর সংসার করবে—সিনেমায় নামা ঠিক হবে না। .... বড় জামাইকে তিনি জানিয়ে দিতে চান—তার মেয়ে কি দরের। বড় জামাই গম্ভীর হয়ে শুনে বললেন—ভদ্রলোকের মেয়ের সিনেমায় নামতে আমি আপত্তি দেখি না যদি সত্যিকারের শিল্পী হয়। মীনার অভিনয়ের কোনও ট্যালেন্টই নেই—দু'একটা বইতে নামবার পর আর চান্স পেত না—মধ্যখান থেকে খানিকটা কাদা মেখে ফিরে আসত। ওর অভিনয়ের ট্যালেন্ট নেই একথা বুঝতে কোনও পরিচালকের অসুবিধে হবার কথা নয়—তা সত্ত্বেও ঝুলোঝুলি করছিল যখন তখন .....। বলে তিনি থামলেন। ভদ্রলোক অপ্রস্তুত হয়ে বারবার বলতে লাগলেন—না, না ট্যালেন্ট আছে বৈকি—নিশ্চয়ই আছে। তার ছেলেমেয়েদের কোন গুণের অভাব আছে একথা স্বীকার করা অসম্ভব। তিনি বড় জামাইয়ের 'পর হাড়ে হাড়ে চটে গেলেন। তাঁর ধারণা, তার ছেলেমেয়েরা সকলেই রূপে ও গুণে অসাধারণ। তাঁর ছেলেমেয়েরা যে পরীক্ষায় সাধারণভাবে পাশ করে যাচ্ছে অসাধারণ হ'তে পারেনি—এজন্যে তিনি ক্ষুব্ধ নন। কারণ, এম.এ.বি.এ. তে স্ট্যান্ড করে সব রাস্তায় ফ্যা ফ্যা করে বেড়াচ্ছে—। তিনি নিজে সে

যুগের ম্যাট্রিকুলেট—তার নিচে কত বি.এ. এম. এ. বড় দুজন ও মীনা পাসকোর্সে পাশ করার পর রীনা যখন অনার্স নিয়ে বি. এ পাশ করল, এম. এ তে সেকেন্ড ক্লাশ পেল—তখন অবশ্য সে সংবাদ প্রচার করবার কিছু মাত্র ক্লান্তি তার ছিল না। তবে যেহেতু রীনা বাংলার এম.এ—শুধু আফসোস করতেন রীনার কাছে—তুই যদি ইংরেজি নিয়ে অনার্স পড়তিস আর এম. এ.তে সেকেন্ড ক্লাস পেতিস—গ্র্যান্ড হত। বাইরের লোকদের কাছে জানাতেন—বাব্বা, বাংলা ভয়ংকর কঠিন—এত বই পড়তে হয়—আর প্রশ্নপত্র পড়ে বোঝাই যায় না কী লিখেছে। আগে ভেবেছিলাম বাংলা বুঝি সোজা—মাইকেলের মেঘনাদবধ খুলে দেখলাম—মাই গড, একদম সানসক্রিট। রীনা যদি তখন কাছে থাকত—তবে বাবার সাহায্যার্থে বলত—যারা বলেন বাংলা সোজা তাদের সুধীন দত্তের কবিতার মানে করে দিতে বলোতো বাবা। সঙ্গে সঙ্গে বাবা লাফিয়ে উঠতেন—তুই আমাকে দেখিয়েছিলিরে বটে—সে ও এক সানসক্রিট। একটু থেমে তিনি রীনাকে জিজ্ঞেস করলেন—আচ্ছা ঐ কি দত্ত বললি যেন—হ্যাঁ, সুধীর দত্ত—ও মাইকেল মধুসূদন দত্তের নাতি টাতি হ'বে বোধ হয়, খোঁজ নিয়ে দেখিস তো—ঐ দত্ত ফ্যামিলিরই কেউ হ'বে। কী নাম বললি সুধীন দত্ত—সুধীন দত্ত। তিনি নামটি মুখস্ত করবার চেষ্টা করেন—অপরের কাছে বাংলা যে ভয়ংকর কঠিন সুতরাং হাই স্ট্যান্ডার্ডের একথা প্রমাণ করবার জন্যে ঐ নামটি মনে রাখতে হবে। অফিসের পারচেস সেকসনের পিওনের নাম সুধীন আর অ্যাকাউন্টস ডিপার্টমেন্টের হেডক্লার্ক দত্ত—অতএব পারচেসের পিওন অ্যাকাউন্টসের হেড—এভাবেই মনে থাকবে। .....রীনা যখন স্কুলে মাস্টারি নিল—তখন তিনি জানালেন—প্রফেসারি পাবার আগে বসে থাকতে চায় না—তা করুক—আপত্তি করিনি। অবশ্য মাস্টারি বিয়ের আগে মীনাও করেছে। ....রীনাকে কলেজে কাজ দেবার জন্যে ভদ্রলোক রোজ কর্মখালির বিজ্ঞাপন পড়তেন—রীনাকে দিয়ে দরখাস্ত করাতেন—যখন কিছুতেই কিছু হত না—তখন যদি কেউ জিজ্ঞেস করতো রীনা প্রফেসারি পেল কিনা, জবাবে বলতেন—মেয়ের নানা জায়গা থেকে বিয়ের সম্বন্ধ আসছে ভালো ভালো অফিসার ইঞ্জিনিয়ার সব—আমাদের ঠিক মনোমতো হচ্ছে না—ইঞ্জিনিয়ারদের বাজার পড়ে গেছে—আই. এ. এস দু'টি সম্বন্ধ ঝুলছে—সি.এ. আছে—যাই হোক, মেয়ের বিয়ে দিয়ে দেব—তাই কলেজে কাজ নিচ্ছে না—নইলে দু'টি মফঃস্বল কলেজ তো অ্যাপয়েন্টমেন্ট পাঠিয়ে রিমাইন্ডার দিয়ে অস্থির করে তুলেছে। আজ বাদে কাল বিয়ে দেব—তখন কোথাও না কোথাও যেতে হবে—তাই প্রফেসারি সম্পর্কে আর ইন্টারস্টেড নই। যে বড় জামাইকে আন্তরিকভাবে অপছন্দ করেন—মীনার পাশে এখন আর তাকে মানায় না বলে ক্ষোভের অন্ত নেই—পাছে অফিসের কেউ এখন মীনার বরকে দেখে ফেলে এই আতঙ্কে জামাই এলে যাকে আতঙ্কে পেয়ে বসে—সেই তিনি বাইরে মীনার বরের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। জামাতা বাবাজীর জাজমেন্টের 'পর হাইকোর্ট কলম ছোঁয়াতে সাহস করে না—এখনও সমাজে সত্যিকারের মান্য ওদের সবাই করে—জুডিসিয়াল সারভিসে যে এক্সিকিউটিভের চেয়ে অনেক বেশি ভালো একথা তার কাছে না শুনেছে এমন কেউ নেই—(এক এস.ডি.ও-র সঙ্গে মীনাকে বিয়ে দেবার জন্যে অনেক পেট্রোল পুড়িয়ে এত পণ দিতে রাজি ছিলেন না বলে পেছিয়ে

এলেন)- মীনার বর যে সাবজজ হল বলে তার কথা পরিচিতদের মুখস্ত। ....মীনার বর সম্পর্কে রীনার বড়দার ঈর্ষা কিছুতেই যে যায় না কারণ যে পাবলিক সার্ভিস একজামিনেশনে সে ব্যর্থ হয়েছে—সেই পরীক্ষায় ভগ্নীপতি উত্তীর্ণ—এ বেদনা গোপনে গোপনে তাকে আঘাত করে। যদিও মীনার বর এ খবর জানে না। রীনার মেজদা অবশ্য ভগ্নীপতিকে শ্রদ্ধাই করে—যে পরীক্ষায় বাবার ইচ্ছায় তাকে বসতে হয়েছে—যার মাথামুণ্ডু সে বোঝেনি সেই পরীক্ষায় ভগ্নীপতি উত্তীর্ণ—এতেই তার শ্রদ্ধা। অথচ দু'জনেরই যথাক্রমে ঈর্ষা ও শ্রদ্ধা গোপনে—বাইরের ভাবটি হচ্ছে তদের চাকরির তুল্য চাকরি হয় না—কারণ মার্চেন্ট অফিসে মাইনে সুযোগ—সুবিধে বেশি—চাকরি তো লোকে করে মাইনে-সুযোগ-সুবিধার জন্যেই—নয় কি? বড় ভগ্নীপতি একথা শুনে সাড়া দেয় না, বলে—মাইনে সুযোগ-সুবিধা বেশি এ কথার অর্থ কী? কেনবার ক্ষমতা বেশি এই তো? বেশি কেনা কাটাতে দরকার কী? নিজের তাতে সুখ হবে এই জন্যে তো? তা হলে সুখের জন্য সব করি আমরা। সুখ কিসে হবে নির্ভর করছে আপনার সুখ সম্পর্কে ধারণার ওপর। কারুর সুখ হয় কেনাকাটা করে, কেনাকাটা করবার ক্ষমতা অনুভব করে। কার দেশ ভ্রমণে, কারুর দেশ বা পার্টির কাজ করে, কার সেবা করে, পড়ালেখা করে। সুখ নির্ভর করে আপনার মেজাজ ও আকাঙ্ক্ষার উপর—শুধু মাত্র কেনাকাটা করবার ক্ষমতা আয়ত্ত করবার উপর নয়। কিন্তু সবটাতেই তো টাকা লাগে? তা লাগে। সব তাতেই যা লাগে তা একান্ত জরুরি এ ধারণাও ভুল। হলুদের গুঁড়ো সব ততেই লাগে—স্বাস্থ্য ভালো করা দরকার—তা বলে ভালো রাখাই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হতে পারে না। রীনার বাবা তাচ্ছিল্যের সঙ্গে যুক্তিগুলো না শোনবার ভান করে—কারণ শুনলে এর জবাবের দায়িত্ব এসে পড়বে। জামাইয়ের যুক্তির হাত থেকে ছেলেদের বাঁচানোর দরকার মনে করে ভাবখানা এমন করেন, যার মাথার চুল উঠে যাচ্ছে, চেহারা কদর্য হয়ে উঠেছে, তার কাছ থেকে কোনও যুক্তিই শুনতে চান না। সুন্দর চেহারার ধনবান ছেলে যদি টাকা-পয়সার বিরুদ্ধে বলে তবে মানায়।

রীনা শুধু বলে, জামাইবাবুর ভুঁড়ি কি মেজাজ ও আকাঙক্ষার 'পর ভর করে বেঁচে আছে? সবাই হেসে ওঠে—ভগ্নীপতি হাসতে হাসতে বললেন—মার্চেন্ট অফিসে বেশি মাইনে সুযোগ-সুবিধে না পেলে যে সুখে থাকা যায়—তার ভুরি ভুরি দৃষ্টান্ত তুমি দেখতে পাচ্ছ। রীনার পরিহাসে সবচেয়ে বেশি হাসেন রীনার বাবা। তাঁর সন্তান জামাইকে হারিয়ে দিয়েছে এই তৃপ্তিতে প্রাণ ভরে হাসেন—মনে মনে ভাবেন—এক কথায় একদম বসিয়ে দিল—রিয়ালি এমন টালেন্ট রীনার—আর দ্যাট ফেলো বলে কিনা আমার মেয়েদের ট্যালেন্ট নেই। রীনা ভগ্নীপতিকে পরাজিত করতে পেরেছে ভেবে অত্যন্ত প্রসন্ন মনে তিনি প্রকাশ্যে জামাইয়ের পক্ষ অবলম্বন করেন, বসে বসে জাজমেন্ট লিখতে হয়—এ তো কুলি মজুরের কাজ নয়—বসে বসে ব্রেন এক্সারসাইস করতে হয়—ওতে ভুঁড়ি হবেই—এসব ভুঁড়ি হচ্ছে অ্যারিস্টোক্র্যাসির লক্ষণ। টাকা করবার বিরুদ্ধে জামাই যে যুক্তিগুলো দিয়েছিল তা না শোনবার বা তাচ্ছিল্য করবার চেষ্টা করলেও, টাকা করবার পক্ষে থাকলেও, যুক্তিগুলো মন দিয়ে শুনেছিলেন, পরের সপ্তাহে অফিসের ইউনিয়ন থেকে যখন মাইনে বাড়াবার জন্যে দাবি-পত্র পেশ করা হল তখন তিনি জামাইয়ের

যুক্তিগুলোই সেখানে পেশ করলেন—টাকা করে কেন? কেনবার ক্ষমতা বাড়াবার জন্যেই তো ..... কোনাকাটা করে কেন? সুখ হবে বলে তো ..... তা হলে সুখই কাম্য—টাকা-পয়সা না ....। কিন্তু সেদিন স্বামীর চেহারার 'পর কটাক্ষ করেছে বলে মীনা মুখভার করে রইল—রীনার সঙ্গে ভালো করে কথা বলল না। মীনার মনোভাব বুঝতে রীনার কষ্ট হল না—তারপর মীনারা যে দু'দিন ছিল রীনা একদম ভগ্নীপতি ও মীনার সঙ্গে কথা বলল না। প্রতিজ্ঞা করল, ভগ্নীপতির সঙ্গে কোনও ঠাট্টা-হাসি করবে না—গম্ভীর হয়ে থাকবে। .... কল্যাণকে রীনার বাবা পছন্দ করলেও, কল্যাণ কিন্তু রীনার মাকেই বেশি পছন্দ করে। অত্যন্ত শ্রদ্ধাও করে। বোধকরি খুব অল্প বয়সে মাতৃহীন হবার জন্যে ও সকলের কাছে ছেলেবেলা থেকে শুনে এসেছে মা'র মতো কেউ হয় না—মা'র অভাবের তুলনা হয় না। তাই মার জন্যে একটা খিদে কিছুটা অন্তরের, কিছুটা শুনে শুনে ওর অন্তরে সবসময়ই ওকে অতৃপ্ত করে রাখত। একদিন রমা ওকে ঠাট্টা করে বলেছিল, সুন্দরী বউ ঘরে থাকতেও অন্য মেয়ের 'পর আপনার আকাঙ্ক্ষা কেন? অল্প বয়েসে মাতৃহীন বলে, মায়ের জাতের 'পর আকর্ষণ আমার আকণ্ঠ, আজন্ম। ......রীনা মাঝে মধ্যে বড় জামাইয়ের 'পর মা'র পক্ষপতিত্ব আছে আকারে ইঙ্গিতে এমন প্রচ্ছন্ন অভিযোগ করেছে—বরং বাবা কল্যাণকে বেশি পছন্দ করে তাও তারস্বরে জানিয়েছে—তবু ইঙ্গিতটি বুঝবার মুহূর্তে কল্যাণ দুঃখিত হয়েছে, যাকে অমন শ্রদ্ধা করে সে তাকে তেমন পছন্দ করে না। এ কথায় ও বেদনা বোধ করেছে—অমন ভগবতীর মতো মাতৃরূপে পক্ষপাতিত্ব থাকতে পারে ভেবে রীনার মা'র ইমেজ ক্ষুণ্ণ হওয়াতে নিজেরই অস্বস্তি লেগেছে, বরং ইঙ্গিতটি বুঝবার মুহূর্তে সংকল্প করেছে—শ্বশুরবাড়িতে যাওয়া কমিয়ে দেবে, শাশুড়ির সঙ্গে গম্ভীরভাবে কথা বলবে। কিন্তু ঐ পর্যন্তই। কিছু পরেই শাশুড়ির পক্ষপাতিত্বের কথা একদম ভুলে যায়। মনেও পড়ে না—মাথায়ও আসে না। মাছে মধ্যে রীনার বাবা সকন্যা আসেন। এসেই বিভিন্ন লোকের চেহারার নিন্দে করেন, লোক কী ভাবে টাকা করছে তার বিস্তারিত বিবরণ, কল্যাণ কোথা থেকে বাজার করে? বাজার ও মাসকাবারি মশলা বড়বাজার থেকে কিনলে অনেক কম পড়ে—টাটকা পাওয়া যায়—পাইকারিদের কাছ থেকে কিনলে .... ম্যানেজিং ডিরেক্টার বাড়িটি এয়ারকন্ডিশনড্ করে নিল সেদিন .....। লোকটি অসহ্য বিজ্ঞ বিজ্ঞ মাতব্বরী, শালিদের সঙ্গে ঠাট্টা তামাশা করবার আকাঙ্ক্ষায় কল্যাণ ভাবতে থাকে, বাইরে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে বলে চলে যাব নাকি। তাছাড়া রীনার বাবা যতক্ষণ থাকেন তিনি একাই কথা বলে যান—কারও কথা শুনতে রাজি নন—তাই বলতে হলে রীনার বাবাকে জোর করে থামিয়ে দিয়ে কথা বলতে হয়। কল্যাণের পক্ষে তা অসম্ভব। ক্রমাগত মাথা নেড়ে যায়। যখন সকন্যা বিদায় নেন—তখন কল্যাণ মনে মনে বলে 'হরিবল্'। বাইরে শুধু ডান হাত দিয়ে ঘাড়টা টিপতে থাকে—রীনার জিজ্ঞাসু দৃষ্টির উত্তরে জানায়—ঘাড় নাড়াতে নাড়াতে ব্যথা হয়ে গেল। একটু অপ্রস্তুত হয়ে রীনা বলে—ও কথা বোলো না বাবা কিন্তু তোমার সঙ্গে কথা বলতে বেশি ভালোবাসেন—জামাইবাবুর সঙ্গে তো একদম কথা বলেন না। মনে মনে কল্যাণ বলে—ভাগ্যবান তিনি—সকল দিক থেকে। মুখে বলে, তোমার জামাইবাবুর কথা হয়তো তোমার বাবা শুনতে ভালোবাসেন তাই

চুপ করে বলবার সুযোগ দেন। রীনা বারবার আপত্তি করে মোটেই না, মোটেই.....।

রীনার নিজের মূল সংসারের ফান্ডে দেড়শো টাকা জমা দিয়ে বাকি টাকা ব্যাঙ্কে দিয়ে দেয়। কল্যাণ পাঁচশো টাকা দিয়ে বাকি টাকা ব্যাঙ্কে রাখে নিজের অ্যাকাউন্টে। অবশ্য ব্যক্তিগত খরচের জন্যে ওর শ'দেড়েক টাকা লাগে—প্রতি মাসেই এই টাকাটা বড্ড বেশি লাগছে বলে ওর নিজের আফসোস। ব্যাঙ্কে রীনার কত টাকা আছে সে সম্পর্কে কল্যাণ খুব উৎসুক নয়—তবে একটা আন্দাজ ওর আছে। গোপনে কল্যাণের অ্যাকাউন্ট দেখেছে—প্রতি মাসে কত টাকা কল্যাণ তুলছে—কিন্তু সে সময় কীবা এমন খরচ থাকতে পারে বা কী করল রীনা একটু অবাক হয়ে ভাবে। যাই হোক, এনিয়ে রীনা কোনও প্রশ্ন করেনি। জানতেও চায়নি—শুধু ভেবেছে কী এমন খরচ হতে পারে—পুরুষ মানুষ হতেও পারে যাকগে ও নিয়ে আমি মাথা ঘামাব না—ওতো আমার টাকা কত রাখি—কী করি, কোনও দিনও জিজ্ঞেস করেনি .... ক্যান্টিনে খরচ করে থাকবে—তা বলে এত ....নতুন জামা-কাপড়ও তো করেনি ....যাকগে....হয়তো কাউকে পার্টি টার্টি দিয়েছে—তাহলে কি বলত না....এতগুলো টাকা প্রত্যেক মাসে কী করে, আশ্চর্য তো। যাকগে, যার টাকা সে বুঝুক। আমি কেন মাথা ঘামাই। শেষে একদিন রীনা নিজে কী কী খরচ করে তার একটা ফর্দ কল্যাণকে দিল—কত টাকা ব্যাঙ্কে রাখে তাও যখন বলতে চাচ্ছিল—কল্যাণ ব্যস্ত হয়ে রীনার মুখে হাত দিয়ে চেপে বলল—প্লিজ, ঐ জমা-খরচের ব্যাপারটি অফিসে এত করি—বাড়িতে ও নিয়ে চিন্তা করতে ইচ্ছে করে না। সংসারের ফিনান্স মিনিস্টার তোমাকে করেছি—তবে একটা শর্ত—বাজেট পেশ করতে পারবে না—যত ট্যাক্স দিতে বলবে দেব—কিন্তু হিসাব-নিকাশ চাই না। আমি ছোটোবেলা থেকে দেখেছি—যা খরচ হবার তা হয়েই যায়, মাঝ থেকে জমা খরচ আলোচনা করে শুধু অডিট ও অ্যাকাউন্ট ডিপার্টমেন্টের অঙ্ক করবার পারভার্টেড আনন্দ পাওয়া যায়। সমস্ত সংসারের তুমি ফিনান্স মিনিস্টার—কেবল আমার জন্যে তোমার আর একটা পোর্টফোলিও থাকবে, তা হচ্ছে মিনিস্টার অব লাভ অ্যাফেয়ার্স। .....কল্যাণ টাকা কিসে কিসে খরচ করে তা শোনবার আকাঙ্ক্ষা নিয়ে নিজে যেচে আয় ব্যয়ের হিসাব দেওয়ার পরিকল্পনাটি ব্যর্থ হয়ে গেলেও, কল্যাণের কথায় রীনার হাসি-ই পেল। শুধু বলল সংসারে তোমার পোর্টফোলিও কী? প্রাইম.....বাধা দিয়ে কল্যাণ বলল—পতি তো.....রাষ্ট্রপতি—তোমার হাতের পুতুল—আমার নির্বাচন আয়ু গতায়ত সব তোমার ইচ্ছে। রীনা জানায়, কিন্তু লোকে বলবে, কল্যাণবাবুর সংসার, কল্যাণবাবুর ফ্ল্যাট, তোমার নামে বাসা ভাড়ার রসিদ, ইলেকট্রিক বিল এমনকি আমার গার্জিয়েন হিসাবেও তোমার নাম। ....আমার নাম বটে, রূপ কিন্তু তোমারই—নাম রূপেরই সংসার। যাকগে, তোমার কথার উত্তর রাজনীতিতে নেই, শ্যামাসঙ্গীতে আছে—সব কাজ তুমি করো—অথচ আমার নামে—ঠিক—তোমার কর্ম তুমিই করো লোকে বলে আমি করি। লোকেও কিন্তু জানে তুমিই করো—আমি নই। তখনকার মতো রীনা খুশি হয়ে অন্য প্রসঙ্গে চলে গেছে। কিছু পরে আস্তে আস্তে ওর মনে হয়েছে, টাকা-পয়সার আলোচনায় বিতৃষ্ণার পেছনে কি কোনও অস্বস্তি আছে .... কেমন যেন অস্থির হয়ে উঠল না? তাছাড়া টাকা-পয়সা কত জমাতে পারে দু'জনে মিলে—কিসে কিসে খরচ

কমানো যেতে পারে—এ আলোচনা করতে রীনার খুব ইচ্ছে করে। নিজে নিজে একা একা ছুটির দিনে বাজেট করে—কোন খরচের জায়গা কমাতে হবে। চিন্তা করে, সংসারের জন্যে আর কী দরকার ভাবতে চায়—ইচ্ছে হয় ইনস্টলমেন্টে একটা টেপ রেকর্ডার কেনবার কথা বলে, এ প্রসঙ্গে সংসারের খরচের বিষয় নিয়ে কল্যাণের সঙ্গে আলোচনা করে। কিন্তু কল্যাণকে পথে টেনে আনতে পারা যায় না। তাছাড়া পাছে কল্যাণ ওকে গদ্যময়ী অতিরিক্ত বৈষয়িক বলে মনে করে এ জন্যেও এ সব আলোচনার ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও করতে পারে না।

কল্যাণই হয়তো অন্য মেয়েদের আলোচনা প্রসঙ্গে তাদের 'গদ্যময়ী' অত্যন্ত বৈষয়িক বাইরেটা সুন্দর, আকর্ষণীয় কিন্তু ভিতরটা অ্যাকাউন্টটেন্ট জেনরল অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল—ওই সব মেয়েদের এক্স-রে করলে ভেতরে একটি করে ক্যাশিয়ার আছে ধরা পড়ে যাবে। একদিন বয়েসের সঙ্গে সঙ্গে বাইরের রূপটি ঝরে যায়—ভেতরের ক্যাশিয়ার তখন বের হয়ে আসবে। রূপের চামড়ায় এয়ারকন্ডিশনে এক একটি হেড ক্যাশিয়ার। সুতরাং রীনার একান্ত ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও, সে যে সব মেয়েদের মতো নয় অধিকাংশ মেয়ের ভেতরের এই দুর্বলতার জন্যেই খরচপত্রের ব্যাপার নিয়ে রীনা আর কিছু জিজ্ঞাসা করে না—শুধু নিজেকে বোঝায়, যাকগে আমি সংসারের কি খরচ করছি না করছি টাকা দিয়ে তার হিসাব চাচ্ছি—কৈফিয়ত চাচ্ছি ভেবে না বসে। ....ওর বাবা প্রতিটি পয়সার হিসাব-নিকেশ করেন—ছোটোবেলা থেকে প্রতিটি পয়সা বুঝেসুঝে খরচ করবার পরিবেশের ভেতর দিয়ে রীনা বেড়ে উঠেছে। কারো প্রসঙ্গ উঠলে রীনার মনে সঙ্গে সঙ্গে এই দুইটি প্রশ্ন ওঠে—কিন্তু আস্তে আস্তে গোপনে বুঝে নিয়েছে, এভাবে জিজ্ঞেস করা সভ্য কাজ না। কল্যাণের হাবভাবে রীনা অনেক সভ্য ব্যবহার ও রীতিনীতি কৌশল শিখে ফেলেছে। কল্যাণের কাছে যে বিশেষ ধরা পরেনি এতে নিজের বুদ্ধিকে ধন্যবাদ দিয়েছে। বাপের বাড়ি এসেও ছোটো ভাইবোনদের জানিয়েছে—ওভাবে কত মাইনে, দেখতে কেমন জিজ্ঞেস করতে নেই—লোকে ভাববে কালচার নেই। যদিও এতে বাবাকে সমালোচনা করা হল—কিন্তু না করেই বা উপায় কী—ছোটো ভাই-বোনেরা কোনও আত্মীয়স্বজন সম্পর্কে প্রশ্ন উঠলে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে যদি বলে বসে, দেখতে তো হনুমানের মতো—মাইনে তো একশো টাকার লবডঙ্কা, তখন কল্যাণ কী ভাববে? আবার বাবার সঙ্গে কথা বলার পর কল্যাণকে বলে—বাবা যে খুব হিসাবী তা না কিন্তু টাকা-পয়সার কথা বলা যেন একটা নেশা—কেমন একটা বাতিক যেন। একটানা প্রায় এক ঘণ্টা শ্বশুরের নীরস বকবকানিতে নীরব কল্যাণ এতক্ষণ বেজায় দুর্বল হয়ে পড়েছিল—সেই ভয়ঙ্কর বাবার টপিক নিয়ে মেয়েও যদি আলোচনা শুরু করে, শ্বশুরবাড়ির বকবকানি শুনবার প্রবেশন—জেলে পরিণত হবে। রীনাকে আশ্বাস দিয়ে বলে—বুড়ো মানুষ—একটা না একটা বাতিক থাকবেই। ও নিয়ে বুড়ো মানুষের তরুণী কন্যাদের চিন্তা করতে নেই। রীনা আশ্বস্ত হয়—বাবাকে 'বুড়ো মানুষ' বললেও ক্ষোভ মনে ঠাঁই দেয় না। বহু পরে অন্য ছুতোয় জানিয়ে দেয়, কে ওর বাবাকে দেখে এখন চল্লিশের নিচে বয়েস ভেবেছিল। মনে মনে কল্যাণ ভাবে, কে ওর বাবাকে চল্লিশের নিচে ভাববে—ওর বাবা নিজে ছাড়া। যাই হোক নিজেকে প্রেমময়ী বা মিনিস্টার অফ

লাভ অ্যাফেয়ার্স হিসাবে প্রতিষ্ঠা করবার জন্যেই হিসেব করবার ক্ষিদেকে চেপে যায়।

ব্যাঙ্কের দরজার গোড়ায় বিমলেন্দুকে দেখতে পেল। একটু উদ্বিগ্ন ও ব্যস্ত, কেমন যেন কিছুটা অন্যমনস্কও। ব্যাঙ্ক তখনও খোলেনি। বিমলেন্দু বলল—খুলতে সাড়ে দশটা। বাবুরা আসবেন—একটু গল্পগাছা করবেন। জল খাবেন তারপর চেয়ারে বসে ঘাড় ফিরিয়ে একটু পলিটিক্স করবেন। রীনার অবশ্য খুব ভালো লাগছিল—এই পরিবেশে বিমলেন্দুর সঙ্গে অসংকোচে কথা বলতে ওর খুব স্বচ্ছন্দ বোধ হচ্ছিল—স্কুলের সেই পরিচিত পরিবেশে—সেই বিনীতা, নন্দিতা, করুণার শ্যেনদৃষ্টি নেই—নিজের ফ্ল্যাটের নিয়ম-কানুন কল্যাণ—সব কিছুর বাইরে ওর মনে হচ্ছিল একমাত্র বিমলেন্দু ছাড়া কেউ ও'কে চেনে না। নিজের উচ্ছল ব্যবহারে রীনা তন্ময় ছিল—নিজের খুশির বেগেই ছলছল করছিল। হঠাৎ যেন ওর মনে হয়,.আজ যেন বিমলেন্দুর দৃষ্টিতে কেমন একাগ্রতা নেই—ওর খুশি খুশি উচ্ছল ব্যবহার যেন ওর ঠিক অন্তর থেকে সাড়া দিতে পারছে না—আজকে যেন ওর মুগ্ধতাটি আন্তরিক নয়—মৌখিক—ঠিক যেন রীনার অনারে রীনার জন্যেই মুগ্ধ হচ্ছে। কেবল ব্যঙ্কের দরজায় বার বার তাকাচ্ছে। একটু পরে অবশ্য আসল কারণটি পাওয়া গেল—গতকাল খুব বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে। ওষুধ গতকালই খাওয়ানো উচিত ছিল—এমনিতেই বড্ড দেড়ি হয়ে গেছে—আজ এতটা সময় গেল। রীনা বুঝতে পারে, ওর উচ্ছলতা ও খুশি ভাব বেমানান হয়েছে। কিছুটা গুম হয়ে যায়—কেমন বিরক্তি আসে নিজের উচ্ছল ব্যবহারকে নাকচ করতে হয় বলে। জিজ্ঞেস করে—আগে বলোনি কেন? বিমলেন্দু একটু হাসে—ধার চাইবার আগে প্রতিটি ভদ্রলোকের যে সংকোচ ও দ্বিধা হয়—কোনওদিন ধার চাইতে হয়নি বলে আপনি তো বুঝলেন না। তবু আপনি কত সহজে রাজি হয়েছেন—অনেকে হয়তো টাকা ধার দেয়—কিন্তু মুখ গোমরা করে, গম্ভীর হয়ে। ভালো করে কথা না বলে, সবটা না শুনে—এমনি কত ভাবে অপমান করে তবে টাকা ধার দেয়। আমাকে অপমান করবার কতবড় একটা সুযোগ আপনি হাত-ছাড়া করলেন।

—কত দিন হল আপনার ছোটোভাইয়ের টাইফয়েড।

—জ্বর অবশ্য দিন বার হল বই কী!

—এতদিন কী করছিলেন?

—হোমিওপ্যাথি। হোমিওপ্যাথিতে যখন সারল না—তখনই......। কত বয়েস?—দশ-এগারো হবে। পরশুদিন ডাক্তার ডায়গোনইজ করলেন। তাও অবশ্য ব্লাড একজামিন করতে বলেননি। পুরোনো ডাক্তার—সেকালের এম.বি—পাড়ার লোক—তবু আট টাকাই ভিজিট নিলেন। ডাক্তাররা যে সমাজের কত বড় অ্যান্টিসোস্যাল এলিমেন্ট তা অবশ্য কারো বুঝতে বাকি থাকা উচিত নয়। গতকাল থেকে ডেলিরিয়াম বকছে। পাড়ায় যে ওষুধের দোকান থেকে ওষুধ ধারেনি—একটু দামী ওষুধ হলেই স্টকে নেই। অর্থাৎ দামী ওষুধ ধারে দেবে না। এক একসময় এমন প্রতিশোধ নিতে ইচ্ছে করে সবার 'পর। কিন্তু সবার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করতে হয়—খাতির রেখে চলতে হয়। আজকে ভাবছি, যাবার সময় ওষুধ কিনে নিয়ে গিয়ে দোকানে দেখিয়ে বলব দেখুন তো দামটা ঠিক নিয়েছে কি না।

রীনা গভীর মনোযোগ দিয়ে বিমলেন্দুর কথা শুনছিল। রীনার বাবার একটা আশ্চর্য ক্ষমতা ছিল কেমন করে যেন বুঝতে পারতেন—কেউ ধার চাইবে। আলাপের প্রসঙ্গ এমন জায়গায় পৌঁছতে পারে যাতে একটা খরচের ব্যাপার উঠতে পারে। তিনি তৎক্ষণাৎ সে প্রসঙ্গ পরিত্যাগ করতেন—পারলে বা সম্ভব হলে সে জায়গাও। এমনকী নিজের বাড়ি হলেও বাইরে যেতেন—হঠাৎ অযথা একটু বাইরে ঘুরে এসে ধার দেবার হাত থেকে বাঁচতেন। তিনি ছেলেমেয়েদের শিক্ষা দিতেন, যদি দেখো কেউ তোমায় তোষামোদ করছে—তোমার সব কথায় সায় দিচ্ছে—সঙ্গে সঙ্গে সতর্ক হয়ে যাবে—নিশ্চয়ই ধার চাইবে। ছেলেমেয়েরা এসব কথা শুনে নিজেরা কত চালাক হয়েছে প্রমাণ করবার জন্যে বাবার কাছে বানিয়ে বানিয়ে গল্প বলত—জানো বাবা, ক্লাসে একটা মেয়ে না—আমাকে খুব তোষামোদ করছিল, বলছিল, তুই খুব সুন্দর, কত বড় তোর চুল—তোর চোখ দুটি কেমন বড়—আমি বললাম পয়সা ধার চাস তো—মেয়েটা হেসে ফেলল। ভদ্রলোক এ কাহিনি শুনে সন্তুষ্ট হলেন—তার শিক্ষা যে কাজ করছে প্রমাণ পেয়ে খুব আত্মতৃপ্তির উচ্ছ্বাস বোধ করেন। কিন্তু বিমলেন্দু যখন টাকা ধার চাইল—তখন মন এমন এক জায়গায় কেন্দ্রস্থ ছিল, বিমলেন্দুকে নিয়ে এমন ভয় ও আতঙ্ক ওকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল—ওর এতকালের সংস্কার বিদ্যুতের মতো চমকাবার সুযোগই পেল না। তদুপরি ফ্ল্যাটে কল্যাণের সঙ্গে উচ্ছ্বসিত হয়ে সময় কাটাবার সময় ধার দেবার মুহূর্তকে বিমলেন্দুকে কেনবার মুহূর্ত বলে অবচেতন ভাবে মনে হয়েছে। তবু, প্রচলিত পারিবারিক সংস্কার ওর মনে এই ধারণাই অস্পষ্টভাবে এনে দিয়েছিল—এই টাকা আর ফেরত পাওয়া যাবে না। ফেরত পাবার ইচ্ছাও রীনার নয়। ....আজ সাড়ে দশটার সময় ব্যাঙ্কের বারান্দায় দাড়িয়ে বার বার রীনার মনে হচ্ছিল, মানুষের এমন অবস্থা আসে যখন ধার না চেয়ে উপায় থাকে না—সকলেই টাকা মেরে দেবার জন্যে ধার করে না। রীনার একটা সংস্কার টলে গেল।

—চলুন, কাউন্টার খুলেছে। বিমলেন্দুর ডাকে রীনার আচ্ছন্ন ভাব কাটে।

—যাই। ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে চেক বের করে রীনা ভেতরে যায়। তারপর চেক ও পাশবই জমা দিয়ে টোকেন নিয়ে দাঁড়ায়।

—আপনার বাসা কোথায়? এই প্রথম শান্তস্বরে রীনা বিমলেন্দু সম্পর্কে প্রসন্ন কৌতূহল প্রকাশ করে।

—পুঁটিয়ারিতে—খাল পেরিয়ে—কিছুটা যেতে হয়। আসবেন একদিন?

—আজও যেতে পারি—আপনার ভাইকে দেখে আসতাম। কোনো কাজ তো নেই।

চলুন—আপনি যাবেন—আমি সৌভাগ্যই বলতে পারি। আপনি কোনো দিন আসবেন ভাবতেই পারি না।

কাউন্টার থেকে টাকা নিয়ে বিমলেন্দুকে পঞ্চাশ টাকা দিয়ে উভয়ে বের হয়। রাস্তার মোড় থেকে একটা ফলওয়ালার স্টল থেকে ক'টাকার ফল কিনল। বিমলেন্দু বাধা দিল না—আপত্তি করল না। শুধু ফলের ঠোঙাটি নিজের হাতে নিয়ে নিল। তারপর বিমলেন্দু একটি ওষুধের দোকান থেকে ক্যাপসুলের একটা শিশি নিয়ে উভয়ে চার নম্বর বাসে উঠল।

রীনা লেডিস সিটে বসে বিমলেন্দুর হাত থেকে ফলের প্যাকেটটা নিতে চাইল—কিন্তু বিমলেন্দু ফল শুদ্ধ হ্যান্ডেল ধরে দাঁড়িয়ে রইল—ঠোঁট নেড়ে জানাল, এতে অভ্যস্ত।

টার্মিনাসে নেমে হাঁটতে লাগল। বিমলেন্দু সংক্ষেপে নিজের জীবনকাহিনি বলল—বাসায় ঢুকবার আগে আমাদের পরিবার সম্পর্কে দু'একটা কথা বলি। আমরা চার ভাই তিন বোন। আমি সকলের বড়—একমাত্র রোজগেরে। কত বয়স হয়েছে আমার বলুন তো? না, না ত্রিশ তো নয়ই—অনেক বেশি—আটত্রিশ। আজকের ছেলে ভেবেছেন—আমাদের ছোটবেলাকার গান ছিল ম্যান বনকে চিড়িয়া বনকে পাখি—আপনাদের বোধহয়—কোনো এক গাঁয়ের বধূর কথা তোমায় শোনাই রূপকথা নয় সে নয়। আটত্রিশ। আমি যেবার ম্যাট্রিকুলেশন দিই—বাবা সেবার রিটায়ার করেন—কেরানি ছিলেন—আজকের মার্চেন্ট অফিস নয়—তখন মাইনেও সামান্য ছিল। প্রভিডেন্ট ফান্ড ইত্যাদি মিলিয়ে সামান্যই টাকা হাতে এল। সমস্ত সংসার ধরতে গেলে আমার ঘাড়েই এসে পড়ল—বয়স আমার সতেরো। রাতে বড়বাজারে একটি খাতা লেখবার চাকরি—অহোরাত্রি টিউশনি—তারপর বাবার ছিল হাঁপানি—শেষদিকে চিররুগ্‌ণ হয়ে গিয়েছিলেন—বছর আটেক আগে মারা যান—তখন এই আমার ছোট ভাই—যার টাইফয়েড—দু'বছর—ওই কোলের। গ্যাপ দিয়ে দিয়ে আই.এসসি., বি.এসসি. তারপর আবার গ্যাপ, স্পেশাল অনার্স অঙ্কে—তারপর এম.এসসি. পাস করে বড়বাজারের চাকরিটা চলে যায়—রাতের কলেজে ক্লার্ক হিসেবে কাজ করছিলাম বেশ কিছুকাল—এম.এসসি.-র পর আপনাদের স্কুলে অঙ্কের টিচার—তাও তো পার্মানেন্ট নয়—শুনছি, মহিলা শিক্ষিকা পেলেই আমাকে চলে যেতে হবে।

—আপনি তো কলেজেও চান্স পেতে পারেন। অঙ্কে তো ভিড় কম। আমাদের সাবজেক্টের মতো নয়।

—পাই কই—অনেক দরখাস্ত করেছি—প্রাইভেট কলেজে—কতবার ফর্ম ফিলআপ করেছি। স্পনসর্ডে হচ্ছে কোথায়? আমার পরে পর পর দু'বোন—ওদেরও বিয়ে দিতে পারিনি—পড়াশোনাও ওদের হয়নি—বয়েসও হয়ে গেল। এই আয় .... এর পর একটা অসুখ বিসুখের খরচে যদি পড়তে হয়—তবে একেবারে নাকানি চোবানি। অনেকটা পথ—হাঁটতে কষ্ট হচ্ছে নাকি?

রীনা শুনতে শুনতে আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল—হঠাৎ প্রশ্নে জেগে উঠে ছোট ছেলেমেয়েদের মতো সরলভাবে বলল—না।

—ছোট ভাইরাও কেউ পড়াশোনায় ভালো নয়। মেজটি পি. ইউ. পাস করে দু'বার বি.এসসি. ফেল করল—তারপর নকল চালু হবার পর ভরসা আছে এবছর পাস করে যাবে। কলেজে গিয়ে ইউনিয়নের পাণ্ডা। এ বুর্জোয়া শিক্ষা ব্যবস্থা ওর মনঃপুত নয়। ফেল করে নাকি লজ্জা হয় না। চাকরি-বাকরির যা বাজার। পরের দুটো স্কুলে পড়ছে। পড়াশোনায় মাঝারি। ছোটবোনটারও বয়েস হল ষোলো-সতেরো।

—একটা কথা জিজ্ঞেস করছি, একটু অন্যপ্রসঙ্গ হচ্ছে, আপনাকে অপমান করবার সুযোগ হাতছাড়া করেছিলাম বলে হঠাৎ ব্যঙ্গ করলেন কেন বুঝলাম না। আমি কি আপনাকে অপমান করবার সুযোগ খুঁজে বেড়াই?

—ও নিয়ে আপনি ভাবছেন বুঝি। বললাম হয়তো এমনিই—। হয়তো আমাকে অপমান করবার সুযোগ হাতছাড়া করছেন এ কথা বলে আমাকে অপমান করবার পথ তাড়াতাড়ি আতঙ্কে বন্ধ করে দিলাম।—আপনি হয়তো অপমানই করতেন না—তবু আগের অভিজ্ঞতার দাম তো মানুষ। হয়তো কেন—আপনি নিশ্চয়ই অপমান করতেন না। হয়তো আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ঐ একটা পদ্ধতি। ঠিক কী যে আমার মনে ছিল জানিনা—আত্মজ্ঞানী তো নই।

আসলে কথাটি যখন বিমলেন্দু বলেছিল—তখন খচ্ করে রীনাকে আঘাত দিয়েছিল কিন্তু পরমুহূর্তে কথার তোড়ে সেই যন্ত্রণা বোধ হয়নি। বাসে কথাটি বারবার মনে পড়তে থাকে কিন্তু ঠিক করে বিমলেন্দুর মাথার ঠিক নেই। কী বলতে কী বলেছে—এ নিয়ে এই মুহূর্তে কিছু বলবে না। পরে, ভাই ভালো হোক—তখন ওকে এত ছোটভাবে কেন সেই কথা জিজ্ঞেস করবে। কিন্তু কথাটি মন থেকে যায় না—মাঝে মাঝেই অস্বস্তি উঁকি দিতে চায়। কিন্তু আজ রীনা প্রসন্ন মনে থাকতে চায় বলেই কথাটি গায়ে মাখতে চায় না—নিজেকে সান্ত্বনা দেয়—এত বিপদের মধ্যে রয়েছে, কী বলতে কী বলেছে—ও নিয়ে ভাবতে নেই। তার পর বিমলেন্দু যখন নিজের জীবনের দুর্গতির ইতিহাস বলছিল—তখন এত তন্ময় ও এত ব্যথাতুর হয়ে উঠেছিল যে শেষ অব্দি আর সহ্য করতে পারছিল না। পাছে বিমলেন্দু আরও দুঃখের ইতিহাস শুরু করে, এই ভয়ে প্রসঙ্গ পরিবর্তনের জন্যে রীনা কিছুটা ঝোঁকের মাথায়, কিছুটা নিরুপায় হয়েও বলে ফেলল। কিন্তু বলবার সঙ্গে সঙ্গে নিজের কণ্ঠের অপ্রসন্নতাকে বড্ড বেমানান ও বিশ্রী লাগে। মনে হয়, বিমলেন্দুর দুঃখের কথার সঙ্গে কোনরকম সহানুভূতি না দেখিয়ে ওকে কি কখন বলেছে সেই কথা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে। বিমলেন্দুর দুঃখের ইতিহাস শোনবার সময় নিজের অহংকার ক্ষুণ্ণ হওয়াকে ভুলতে না পারার স্বার্থ-বুদ্ধি যেন রীনাকে ছোট করে দিচ্ছে। তাড়াতাড়ি ভেবে নেয়, বিমলেন্দু হয়তো একথাও ভাবতে পারে, রীনা সরল বলেই মনের কাঁটাকে প্রকাশ করে দিল। যা ভাবে মুখের উপর বলে।

—কথাটি আপনাকে বললাম বলে না জানি আপনি কী ভাবছেন। রীনার ইচ্ছে ছিল কথাটি একটু জড়িয়ে জড়িয়ে আড়ষ্ট করে বলে—কিন্তু উচ্চারণের সাবলীলতায় কথাটির অর্থ রীনার ইচ্ছার বিরুদ্ধে চলে যায়। রীনার সংকোচ প্রকাশই উদ্দেশ্য ছিল, একটু কাঁচুমাচু ভাব। ওর ধারণা হল, ওর বলবার মধ্য দিয়ে যেন এ কথাই প্রকাশ পেল—বিমলেন্দুর মন সহজ নয়—হয়তো যা-তা ভেবে বসতে পারে। বিমলেন্দুর কুটিল মনের প্রতিক্রিয়ার ভয়ই প্রকাশ পেয়েছে বলে রীনার ধারণা হয়। যেহেতু একথা রীনা বলতে চায়নি সে জন্যে একথা ভেবেই মুহূর্তের মধ্যে একটা চাপা উত্তেজনা বোধ করে। বিদ্যুৎ ঝলকের মতো তাড়াতাড়ি ঠিক করে নেয়। এ রকম কিছু বললে মুখের উপর বলে দেবে—আপনার মনের প্রতিক্রিয়া আমি ধরতে পারি না—কারণ একবার কর্তার একটু প্রশংসাকে আপনি সহজভাবে নিতে পারেননি—অথচ সহজ ভাবেই বলেছিলাম। একথা বলতে গেলে এবং যে অপ্রিয় ভাব ও গুম হবার সম্ভাবনা অনিবার্য, রীনা যেন গুম ভাব ও অপ্রসন্নতা আগাম বোধ করে। মুহূর্তে রীনা কল্পনার প্রত্যক্ষ করে—গুম হয়ে নীরস হয়ে রীনা বিমলেন্দুর অসুস্থ ছোট ভাই ও সংসারের লোকদের সঙ্গে মামুলি প্রাণহীন

কথাবার্তা বলছে। আর ফেরবার পথটি দু'জনে একটি কথাও আদান-প্রদান করছে না।

—আমি কি ভাবছি, সত্যি বলব?

—বলুন। আসন্ন অপ্রিয় কথা শুনাবার ও বলার ঝড়ের আতঙ্কে 'বলুন' কথাটি এত মৃদু জড়িয়ে যায় যে, কথাটি বিমলেন্দুর কর্ণগোচর হয়েছে কি না রীনার সন্দেহ হয়। রীনা শুধু সম্মতি দেবার নৈতিক দায়িত্ব পালন করে। এখন বিমলেন্দু শুনল কি না তা যেন বিমলেন্দুর ব্যক্তিগত ব্যাপার—ওনিয়ে রীনা মাথা ঘামায় না। শুধু মুহূর্তের জন্য নিজেকে মনে করিয়ে দেয়, বিমলেন্দুর 'পর এখন রাগ করা বা অপ্রসন্নতা বাইরে কিছুতেই প্রকাশ করা চলবে না।—গুমও নয়, মন আড়ষ্ট হলে তাকে মনেই রাখতে হবে—কারণ বিমলেন্দু ভাববে, আসলে কিছু নয়—টাকা দেবার অনুতাপেই এখন মেজাজ খারাপ হচ্ছে—কিংবা ধার দেবার জন্যেই হয়তো ...।

বিমলেন্দু যাই বলুক আজ রীনা তা সহ্য করবে। রাগ ও ঝগড়া না করবার সংকল্প নিতেই রীনার মন অনেক সহজ ও হাল্কা হয়ে আসে। যেন একটু খুশিও লাগে। একটা কথা বলবার পর কিছুক্ষণ থামা বিমলেন্দুর অভ্যাস—রীনা তা জানে। এ নিয়ে নন্দিতা বলেছিল, প্রতিটি কথার শেষে বিমলেন্দু টায়ার্ড হয়ে পড়েন—কথাগুলো ভয়ঙ্কর ভারী তো—তাই প্রতিটি বোঝা বইবার ক্লান্তির জন্যে প্রত্যেকটা কথায় বিমলেন্দুবাবু কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেন—প্রতিটি কথার শেষে টিফিন পিরিয়ড। পড়ান কী করে? সঙ্গে সঙ্গে বিনীতা বলে—ওঁর পড়ানো সবচেয়ে সোজা। একটা অঙ্ক বোর্ডে লিখে বাকি পিরিয়ডটা ঘুম আর তন্দ্রার মিক্সচার বানিয়ে কাটিয়ে দেন—এবং ঘন্টা শেষ হবার পাঁচ মিনিট আগে অঙ্কটি কষে দেন।

একটু একটু অনেকক্ষণই বিমলেন্দু হাসছিল—এবার তাকাতেই ওর পরিচিত সেই সতৃষ্ণ দৃষ্টিকে রীনা চিনতে পারে—একই সঙ্গে বিমলেন্দুকে চেনবার আনন্দে ও কেমন একটা সূক্ষ্ম বিতৃষ্ণা ও এতক্ষণকার বিমলেন্দুকে ছেড়ে আসবার একটা অতি সূক্ষ্ম দীর্ঘশ্বাস যুগপৎ রীনা বোধ করে। পরিচিত বিমলেন্দু ওকে আঘাত দিতে পারে সহজেই—সুতরাং কথাটি যে অপ্রিয় হবে এ বিষয়ে ওর মনে কোনও সন্দেহ রইল না। হাসিটিও কেমন ক্রূর বলে মনে হচ্ছে। বিমলেন্দুর হাসির মধ্যে ওর মনের আনন্দ প্রকাশ পায় না—প্রসন্নতাও খুঁজে পাওয়া যায় না—ওর মনের কুটিল ও হিংস্রতার আগাম লক্ষণ ওর হাসি। এমন নিরানন্দভাবে লোকটি হাসতেও পারে—হাল ছেড়ে দিয়ে রীনা ভাবে। নিজেকে ক্ষীণস্বরে রাগ না করবার অনুরোধ করে।

—আজ আপনি আমার 'পর প্রসন্ন। এই প্রসন্নতাকে বজায় রাখবার জন্যেও আমাদের বন্ধুত্বের সম্পর্ককে সহজ করে নেবার জন্যে আপনি সরলভাবে ব্যাপারটি বোঝাপড়া করে নিলেন। কথাটি আপনাকে আঘাত করেছিল—আমার বলাও শুধু ভুল নয়, অন্যায়ও হয়েছিল—অপাত্রে তো বটে—কথাটি আপনি মিটিয়ে নিলেন—আমাকে অপরাধ স্বীকার করবার সুযোগ দিলেন। ঐ কথাটির জঞ্জাল থেকে আমাদের বন্ধুত্বকে রেহাই দেবার জন্যে ও সহজভাবে রাখবার জন্যেই কথাটি আপনি বলেছিলেন।

—আপনার নারীজ্ঞান তো খুব দেখছি—আত্মজ্ঞান অবশ্য নেই। বলেই ছল ছল করে রীনা হেসে ওঠে। মন ওর খুশি হয়েছিল, আশ্বস্ত হয়েছিল, নিষ্কৃতির আনন্দে

উচ্ছ্বসিত হয়েছি ইচ্ছে করেই—এ হাসিটি বিমলেন্দুর ব্যথাকে প্রকাশ্যে স্বীকৃতি দেবার জন্যেই।

বিমলেন্দুর ব্যাখ্যাকে গ্রহণ করবার জন্যে হাসি। এই উচ্ছলতার মধ্যে যে চেষ্টা ছিল, কৃত্রিমতা ছিল—তা বাইরে থেকে বোঝা দুঃসাধ্য—রীনা হাসির মধ্যে দিয়ে শুধু বিমলেন্দুকেই স্বীকার করল তা নয়—জোর করা হাসির মধ্যে দিয়ে যেন নিজের প্রসন্নতাকে নিজের কাছেই জোর করে প্রতিষ্ঠা করা—যাই হোক রীনা তা নিয়ে মাথা ঘামায় না—বিমলেন্দু উচ্ছল হাসিতে খুশি হয়ে ওঠে।

—নিজে নারী বলেই নারীজ্ঞান আছে। নিরপেক্ষভাবে মেয়েদের দেখতে পারি।

—ছেলেরা মেয়েদের সম্পর্কে নিরপেক্ষ?

—মেয়েরাও মেয়েদের সম্পর্কে নিরপেক্ষ নয়।

দু'জনে একটা গলির মোড়ে এসে পড়ে। বিমলেন্দু বলে—ঐ বাঁদিকে টিনের বাসাটি। কি মনে হচ্ছে হাজার হাজার বছর ধরে আমি পথ হাঁটছি ...।

—ও মা, এও জানা আছে অঙ্কের মাস্টারের।

—প্রাইভেট টিউশনি যারা করে—সর্বশাস্ত্রে তাদের পণ্ডিত হতে হয়।

রীনা পেছনে পেছনে আগে বিমলেন্দু। রীনাকে নিয়ে বিমলেন্দু প্রথম ঘরটিতে ঢোকে। মেঝেয় একটা বিছানায় অসুস্থ ভাইটি আচ্ছন্নের মতো—পাশে মা। তিনি রীনাকে দেখে ভারি অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকেন। বিমলেন্দু ফলগুলো রোগীর পাশে রেখে মাকে জানাল—এই ফলগুলি উনি দিলেন—আমাদের স্কুলে পড়ান—রীনা ব্যানার্জি—আর মা—ওষুধ এনেছি—এক্ষুণি খাইয়ে দাও একটা ক্যাপসুল—কেমন আছে এখন?

ওষুধ এনেছিস—মা ধড়মড় করে ওঠেন—ভালো নেই—কেমন আচ্ছন্নের মতো পড়ে আছে।

তাড়াতাড়ি ব্যগ্রভাবে খুলতে গিয়ে বিমলেন্দুর দিকে তাকিয়ে বললেন—কীভাবে খোলে এগুলো—তুমি বোসো মা—তুমি করেই বললাম—ওরে নীতু, বসবার একটা আসন দে। কম্বলের আসনটি নিয়ে আয়—অনেকটা পথ মা—হেটে এসেছ—কটা করে ওষুধ—দিনে তিনবার। প্রাণে জল এল ওষুধ দেখে—এখন ভগবান ভরসা। মার কণ্ঠে একটা শুকনো কান্নার আভাস। কণ্ঠটা যেন কেঁদে উঠল—কিন্তু চোখমুখ তাতে যোগ দিল না। কান্নাকে সংক্রামিত না হতে দেবার ক্ষমতা রয়েছে। নিজের স্নায়ুগুলোর 'পর অধিকার অনেক। বিমলেন্দু ওষুধের শিশির মোড়ক খুলে দিয়ে একটা ক্যাপসুল মার হাতে দিল। মা ব্যগ্রভাবে তা নিয়ে বাচ্চা ছেলেকে যেভাবে ওষুধ খাওয়ায় ঠিক সেইভাবে ক্যাপসুলটি খাইয়ে দিলেন। ঠিক এসময় আরো দুটি মেয়ে ঘরে এসে হাজির হতেই মা বললেন—এই ফলগুলো ইনি দিলেন—কই রে আসন—পেতে দে—বোস মা। ছেলেমেয়ে ক'টি—ও হয়নি—ক'বছর বিয়ে হয়েছে—শাশুড়ি আছেন?—বাপের বাড়ি এখানেই? বাবা-মা আছেন তো? বেশ—বড় সবচেয়ে—বেশ স্বামী কোথায় কাজ করেন?

বিমলেন্দু বাইরে বের হয়ে যায়। মেয়ে দুটি রীনার পাশে মেঝেতে বসে পড়ে। একজন আসনের পাশে রাখা গগলসটি তুলে দেখে। আরেকজন রীনার কাপড়, কানের দুল-

গলার হার-হাতের চুড়ি তীক্ষ্ণভাবে পর্যবেক্ষণ করতে থাকে। মেয়ের এভাব দেখা মার নজরে যেতেই তিনি রীনাকে বলেন—এসব পরে একদম বের হবে না মা—যা দিনকাল—রাস্তাঘাট যা হয়েছে—তিনি রীনার লকেট ধরে হারটি পরীক্ষা করে বলেন—বিয়ের আগেই নিশ্চয়—হবেই—তা যত পাতনাই হোক—রাস্তায় পরে বের হবে না।—যা গেল তাই গেল। কিরে বাবা—একটু জল খাবি—জল দেব? তিনি তৎক্ষণাৎ ছেলের দিকে সবকিছু ভুলে মনোযোগ দেন।

ঠিক এসময় যে মেয়েটি ঘরে এল—বোধ করি বয়সে সেই সবচেয়ে বড় হবে বলে রীনার মনে হল। বেশ শান্ত—কেমন একটা ক্লান্তির ভাব সর্বাঙ্গে। এসে রীনার পাশে চুপ করে বসে একবার মার দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে—অর্থাৎ রীনা কে—একথা চোখে চোখে জিজ্ঞেস করে—মাকে প্রকাশ্যে জিজ্ঞাসা করল—দাদা ক্যাপসুল এনেছে—খাইয়ে দিয়েছ? দিনে তো তিনবার।

মা জানালেন—এই ফলগুলো ইনি দিলেন—বিমলেন্দুর সঙ্গে কাজ করে।—এই হচ্ছে আমার বড় মেয়ে—কাউকেই বিয়ে দিতে পারিনি—যা কপাল করে সব এসেছে।

বড় মেয়েটি হাত তুলে নমস্কার করতেই রীনা তাড়াতাড়ি প্রতি নমস্কার করে। হঠাৎ নমস্কার করবে রীনা ভেবে উঠতে পারেনি। যে মেয়েটি রীনার গয়না ও চেহারা এতক্ষণ ধরে বিশ্লেষণ করছিল এবার মুখ খুলল—বড়দির নাম গীতা, মেজদির নাম রীতা আর আমার নীতা—আর বড়দার টাইটেল তো আপনি জানেন তাই আর টাইটেল বললাম না—আপনার নামটি কী ভাই?

সস্নেহে রীনা নীতার দিকে তাকিয়ে বলল—রীনা চ্যাটার্জি।

মা মাথা নাড়েন। নীতা নাম জিজ্ঞেস করবামাত্র—তিনি মনে মনে নামটি খুঁজছিলেন। নামটি তাঁর নিজেরই বলবার দায়িত্ব বোধ করছিলেন। নিজের নাম রীনা বলা মাত্র তাঁরও মনে হয়—এ নামই বটে। নাম মনে পড়বার জন্যে তিনি মাথা নাড়তে থাকেন।

- ভাই বললাম বলে আবার রাগ করলেন না তো? আপনি আবার দিদিমণি কি না। তবে আজকাল দিদিমণিরা তো স্টুডেন্টদের ফ্রেন্ড—তাই না?

রীনা সকৌতুকে নীতার দিকে তাকিয়ে হাসতে থাকে।

সংস্কার মতো রীনার প্রথমেই মনে হয়েছে, এরা কেউ দেখতে সুশ্রী নয়। মা-ই বরং দেখতে ভালো এদের মধ্যে। কেউ তাঁর চেহারা পায়নি। বোধ হয় বাবার মতো চেহারা পেয়েছে সবাই। ঐ অসুস্থ ছেলেটির চেহারার সঙ্গে ওর মার মিল আছে। ওরা যে বিমলেন্দুর বোন মুখের দিকে তাকিয়ে তা আর বলে দিতে হয় না। দেখতে ভালো নয় বলে একটা গোপন সঙ্কোচবোধ এসবের জন্যে ওদের চেহারার 'পর বিতৃষ্ণাটি এখন রীনার কাছে সচেতন হয় না। বরং বিমলেন্দুর চেহারার সঙ্গে মিল থাকাতে কেমন যেন ওদের সঙ্গে আলাপ করবার স্বাদ গ্রহণ করে। রীনা ভেতরে ভেতরে আলাপ করবার আগ্রহ বোধ করে। যেন বিমলেন্দু সম্পর্কে কৌতূহল কিছু পুরণ করবার আগ্রহ। রীনা গরিব আত্মীয়-স্বজনের বাড়ি এর আগে যায়নি তা নয়—কলেজ জীবনে বিশেষ করে ওর দু'একজন গরিব বান্ধবী ছিল। যখনই গরিব বান্ধবী বা আত্মীয়-স্বজনের বাড়ি গেছে—দেখেছে। ওকে ঘিরে একটা সম্ভ্রম বোধ। ও যে ওদের চেয়ে ভিন্ন, আলাদা এই

বোধটি সবসময় উগ্রভাবে সচেতন হয়ে থাকত। ও যে নিজে থেকে তাই ভাবত তা নয়—ওদের ব্যবহার ও পরিবেশ ওকে তা মুহূর্তের জন্যেও ভুলতে দিত না। গরিব আত্মীয়-স্বজন ও বান্ধবীদের আত্মীয়-স্বজন ওর সঙ্গে এমন সম্ভ্রম ও মর্যাদাকর ব্যবহার করত, এমন মাপা কথাবার্তা বলে নিজেদের রীনার যোগ্য করে তুলতে চাইত যে, এই সম্মান ও সম্ভ্রমবোধ ওর নেশার মতো লাগত—একটু একটু লজ্জা করত তবে ভালোও লাগত। এতখানি গুরুত্ব পাবার আনন্দ ওর মনে কেমন আত্মবিশ্বাস এনে দিত। ইচ্ছে হত আরও মাঝে মধ্যে গিয়ে এই গুরুত্ব পাবার নেশাটি অনুভব করে আসে—কিন্তু পাছে বার বার গেলে গুরুত্ব ও আদর কমে যায় এ জন্যে, প্রবল ইচ্ছে থাকলেও যেত না। এখন বড় হবার পর আর বিয়ে হবার পর রীনা গরিব বন্ধু ও আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে যদি গিয়ে দেখা করে—তবে সেখানে সহজ হবার ও কৃত্রিমভাবে আন্তরিক হবার চেষ্টা করে—কিন্তু রীনার বেশভূষা শাড়ি-গহনা কথাবার্তার ধরনে এমন একটা স্বাতন্ত্র্য উগ্র হয়ে থাকে যে ওর আন্তরিক ও সহজ ব্যবহার যেন ওর দয়া করবার একটা উদাহরণ হয়ে থাকে। ও যেন বিনয়ও দয়া করে নিতান্ত কৃপাপরবশ হয়ে সহজ ও আন্তরিক ব্যবহার করছে। এগুলো ওর পক্ষে না করাই স্বাভাবিক। অবশ্য চেষ্টা করেও ওদের সঙ্গে এক হতে পারেনি বলে রীনার দুঃখ নেই। বরং নিজের স্বাতন্ত্র্যকে বোধ করে অন্তরে খুশিই থাকে। তবু সহজ, সরল ও আন্তরিক ব্যবহার করতে পেরেছে বলে নিজের বিবেককে সাফ রাখে। বিমলেন্দুর বোনদের চোখেমুখে সেই সম্ভ্রম-সঙ্কোচ বিশেষ দেখতে পেল না—এখানেও ওর বেশভূষা শাড়ি-গহনা গগলস বেশ বেমানান—তবু ওরা যেন মর্যাদা জনক ব্যবহার করে দূরে থাকতে চাচ্ছে না। ওদের চোখেমুখে দীনভাব, হয়তো দারিদ্র্যের জন্যে হীনম্মন্যতাও আছে, কিন্তু তা ছাপিয়ে যেন রীনা সম্পর্কে কৌতূহল ও আগ্রহই প্রবল হয়ে উঠেছে। ওরা যেন রীনার আত্মীয়-স্বজনের মতো রীনার কাছে মর্যাদা ও সম্ভ্রমজনক ব্যবহার করে নিজেদেরও যে শিক্ষাদীক্ষা আছে তা যেন বলতে চায় না—ওরা সহজ ও সরলভাবে রীনার জন্যে কৌতূহলী। রীনার সঙ্গে ওদের পার্থক্যকে যেন ওরা সহজভাবে মেনে নিয়ে রীনার সঙ্গে আলাপে উৎসুক হয়ে উঠেছে। যদিও ওর সম্পর্কে সেই প্রচলিত সম্ভ্রম ও মর্যাদা দেখতে না পেয়ে মনে মনে একটু হতাশ হলেও ওদের কৌতূহলই যেন রীনাকে এক ধরনের মর্যাদা দেয়। রীনা খুশি হয়ে ওঠে।

ইতিমধ্যে রীনা চারদিক দেখে নিয়েছিল। দুটি ঘর, টিনের, তবে মেঝে সিমেন্টের। দুটি ঘরের মধ্যে দরজা—তবে দরজাটিতে কপাট নেই—পুরনো শাড়ির একটা পর্দা দড়ির 'পর গোটানো। ফলে ঐ ঘরটির প্রায় অনেক কিছু নজরে আসে। এ ঘরে কোন তক্তাপোষ নেই—পাশে একটা জলচৌকির 'পর বিছানা পত্র সাজিয়ে তারপর একটা চাদর দিয়ে ঢাকা। একটা আলনা—জামা-কাপড়-শাড়ি ভাঁজ করে সাজিয়ে রাখা হয়েছে। বেড়ার দেওয়ালের এক জায়গায় একটা ছোট আয়না ও আয়নার সঙ্গে বড় একটা মেয়েলি চিরুনি—বেড়ার দেওয়ালের গায়ে একটা কাঠের থামে একটা কাঠের তাক লাগানো—তার ওপরে পাউডার, লক্ষ্মীর ঝাঁপি, নানা টুকরো-টাকরা জিনিস। এককোণে দুটি বাক্স—দোতলা করে রাখা—তার 'পর পুরোনো শাড়ির ঢাকনা। আরেক কোণে একটা সেলাইয়ের মেশিন—তাতেও পুরোনো শাড়ির ঢাকনা—পাশে কাগজের মোড়কে

বোধ হয় নতুন কাপড়। ঐ ঘরেও কোনও খাট বা তক্তাপোষ নেই—তবে একটা টেবিলচেয়ার আছে। দেওয়াল—বেড়ার গায়ে একখণ্ড চার পাঁচ ফুটের মতো লম্বা তক্তা লাগিয়ে বুকশেলফ করা হয়েছে—সেখানে বই রাখা। বোঝা যাচ্ছে ঐখানেই বিমলেন্দুর আড্ডা। ঐ ঘরের এক কোণে লক্ষ্মী, সরস্বতী, কালী, রামকৃষ্ণ ইত্যাদির ফটো সমেত একটু পুজোর জায়গা। অবিবাহিত মেয়েদের ঘরে যা হয়—এখানে তাই—কোনও অপরিচ্ছন্নতা নেই—সবকিছু মোটামুটি সাজানো-গোছানো ধোয়া-মাজা। বেশি বয়েস পর্যন্ত বিয়ে না হলে আর সংসারটি যদি অভাবের হয়—তবে বেশি বয়সী মেয়েদের চেহারায় যে একটা শুকনো শুকনো ভাব চলে আসে—এখানে বড় মেয়েটির চেয়ে মেজ মেয়েটিকে যেন বেশি শুকনো আরও বয়স্ক মনে হয়। রঙ কারোরই উজ্জ্বল নয়—বড় মেয়েটির রঙ শ্যামবর্ণ, তবে শ্যামবর্ণ রঙের স্নিগ্ধতা নেই—কেমন একটা কালচে ভাব এসে গেছে। মেজ মেয়েটির রঙ হয়তো এক সময় শ্যামবর্ণই ছিল কিন্তু এখন কেমন যেন বিবর্ণ মনে হয়। ছোট মেয়েটির রঙ কালো—কিন্তু উজ্জ্বল—ওরই কথাবার্তায় চাহনিতে প্রাণের স্পর্শ রয়েছে।

রীনা জিজ্ঞেস করে—তুমি কী পড়ছ?

আগের যুগের মেয়েদের কাছে এর বাঁধাধরা উত্তর ছিল—বাড়িতে পড়ি। অর্থাৎ মা-বাবা স্কুলে পড়ানো পছন্দ করে না—অ্যালজেব্রা জিওমেট্রি শিখে হবেটা কী—অর্থাৎ মার আন্তরিক অসম্মতিতে বাবা যুক্তি দিয়ে প্রতিষ্ঠা করতেন। গান? ঐ বিয়ের পর গান তো শিকেয় উঠবে—তখন বছর বছর নতুন বাচ্ছা-কাচ্চার গান শুনতে শুনতে নিজের প্রাণ ওষ্ঠাগত হবে। রীনা মাসিদের কাছে কাকিমাদের কাছে এসব পুরোনো দিনের গল্প অনেক শুনেছে। তাই তুমি কী পড়ো জিজ্ঞেস করেই বুঝল—আগের যুগের মতো এরা হয়তো উত্তর দেবে না—হয়তো নিজেদের পড়াশোনা করতে না পারবার জন্য লজ্জা পাবে—বিমলেন্দুর উদ্দেশ্যে যে ক্ষোভ অন্তরে চাপা রয়েছে তাকে এই প্রশ্ন করে জাগিয়ে তুলল।

—গতবারই তো স্কুল ফাইনাল দেবার কথা ছিল—তবে এবার দেব—কিন্তু ফিস্ দাখিল হয়ে গেছে। মেয়েটির উৎসাহ দেখে মনে হয় সত্যিই কথা বলছে। বড়বোনটি মেজ বোনটির দিকে তাকিয়ে বলে—বেশ ফিট করেছে না—রুবিয়া ভয়েল। অর্ডার দিয়ে তৈরি।

মেজ মেয়েটি তক্ষুণি বলে—দিদি সব কিছু তৈরি করতে পারে—ব্লাউজ, শায়া, ফ্রক। আমাদের এ অঞ্চলের সকলের বাড়ির ফ্রক, শায়া, ব্লাউজ দিদি করে দেয়। ঐ দেখুন কতো অর্ডার এসে পড়ে আছে। রীনাকে সেলাই কলের পাশে রাখা খবরের কাগজের মোড়কগুলো দেখায়।

বড়দি মেজ ও ছোট বোনের ব্লাউজদুটির ঘাড়ের কাছে হাত দিয়ে দেখায়—রীনা দেখে ও প্রশংসা করে।

মা বলেন—সেলাই-ফোড়াই বলো, কাজে কর্মে বলো গুণ তো সবই ছিল—পাথর চাপা কপাল। কী করবে বলো মা? যে কপাল নিয়ে জন্মেছে।

বড় মেয়েটি মেজ মেয়ের দিকে তাকিয়ে বলে—কী কাজ করেন?

মেজ মেয়েটি জিজ্ঞেস করেন,—কর্তাও স্কুলে....?

রীনা কল্যাণের অফিসের নাম ও পদের নাম উৎসাহের সঙ্গে কিন্তু সংযতভাবে জানায়।

মা সোজাসুজি জিজ্ঞেস করে, কত বেতন পান মাস গেলে?

তিনকন্যাই মায়ের এই প্রশ্নে কৃত্রিম অস্বস্তির ভান করে—মার যেমন কথা—এসব কথা বুঝি জিজ্ঞেস করতে আছে? যদিও শোনবার জন্যে সকলেই উৎসুক। রীনা মাথা নিচু করে মাইনেটি বলে।

একসঙ্গে মা ও মেয়েরা অবাক হয়। সব চেয়ে বেশি চঞ্চল ও বিচলিত হয় ছোট মেয়েটি—বাব্বা, আমাদের ধারণাতেই আসে না—আমি শুনেছি খুব মাইনে ঐসব অফিসে?

বড় মেয়েটি এবার মেজ মেয়েটির দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করে কী পাস?

মেজ মেয়েটি আবার জিজ্ঞেস করে—কর্তা নিশ্চয়ই এম.এ.—আপনি নিজেই যখন?

রীনা জানায়—হ্যাঁ আমরা দুজনেই—ও এম.কম., সি.এ.—আমি বাংলায়।

বড় মেয়েটি রিলে করে—তাহলে আপনি চাকরি করছেন কেন?

—মাস্টারি আমি বিয়ের আগেও করতাম—যদিও তখনও দরকার ছিল না—এখনও নেই। কেমন নেশার মতো হয়ে গেছে। তাছাড়া সময় কাটাব কী করে?

মা জিজ্ঞেস করেন—রান্নার লোকজন আছে?

বড় মেয়ে, সেজ মেয়ের দিকে তাকিয়ে বলে—বাপের বাড়ি?

মেজ মেয়ে রিলে করে—বাপের বাড়ি কোথায়? বাবা কী করেন?

ছোট মেয়েটি সোজাসুজি অনুযোগ দেয়—কিন্তু আপনার দরকার নেই তবু আপনি একটা পোস্ট দখল করে রেখেছেন—এতে একজন নিডি লোকের তো ক্ষতি হতে পারে—কত বেকার আমাদের দেশে -

মা মেয়েকে থামিয়ে দেয়—টাকার আবার দরকার-অদরকার কী? যতই আসুক ঠিক লেগে যায়। তা মা রান্নার জন্যে লোক রেখেছ—রাখোনি তো? ঠিক করেছ—দুজনের সংসার, কী দরকার। ঠিকে ঝি তো। সেই বেশ মা।

ছোট মেয়েটি বলে—রান্নার লোক রাখলে তবু আপনি একজন লোককে এমপ্লয়েড করতে পারতেন।

রীনা ছোট মেয়েটির হাত ধরে বলে—তুমি কমার্স পড়বে—বি.কম., এম.কম.—তোমার ঠিক হবে।

—স্কুল ফাইনালই হয় না—তা একম-সেকম।

বড় মেয়েটির এবার একবার রীনার সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে যায়—চোখাচোখি হয়ে যাওয়াতে যেন বড় মেয়েটি রীনাকে দেখে ফেলবার লজ্জায় মুহূর্তের জন্যে অপ্রস্তুত হয়ে যায়। নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই যেন মুখ দিয়ে বের হয়ে যায়—গান? মেজ মেয়েটি ভাষ্য করবার আগেই রীনা উত্তর দেয়—একটু একটু।

এবার ছোট বোনটি নিতান্ত তিক্ত-বিরক্ত হয়ে যেন ধমকে ওঠে—তোরা দেখি কনে দেখার প্রশ্ন করছিস—থাম তো একটু। পিটপিট করে সেই থেকে প্রশ্ন শুরু হয়েছে।

দুবোনই যেন কেমন অপ্রস্তুত হয়ে যায়। ওদের অপ্রস্তুত ভাবটি ঠিক যেন লজ্জা পাবার সঙ্কোচ নয়। ঠিক যেন প্রাণশক্তিতে ছোট বোনের কাছে পরাজয়ের অপ্রস্তুত ভাব। ওর সঙ্গে না পারবার হাল ছেড়ে দেওয়া অপ্রস্তুত ভাব। যুক্তিহীন আবেগসর্বস্ব ও হইচই করা লোকের অযৌক্তিক কথার বিরুদ্ধে যুক্তিবাদী লোকের যখন নিজেদের উপযুক্ত যুক্তিকে আর বলতে না চেয়ে চুপ করে থাকার নীরবতাকে মেনে নেয়—ঠিক সেইরকম নিষ্ক্রিয় নীরবতার অপ্রস্তুত ভাবের মধ্যে যেন দুই বোন নিজেদের গুটিয়ে নিল।

হঠাৎ ছোট বোনটি খিল খিল করে হেসে লুটিয়ে পড়ল। মুখ বুজে দমকে দমকে হাসতে লাগল। দুইবোন নিরুপায় দর্শকের মত বসে রইল। কেবল মেজ বোনটি মেঝেতে রাখার রীনার গগলসটি আরো একটু সরিয়ে রাখে—পাছে পড়ে ছোটবোনের উঠবার সময় হাতে লেগে ভেঙে না যায়। বড় বোন যেন ব্লাউজ ফ্রকের মোড়কের দিকে এমনভাবে তাকিয়ে থাকে—যেন ওর জীবনের একমাত্র সান্ত্বনা ও আশ্রয়স্থল ঐ সেলাইকল ও আশপাশের কাপড়ের কাছে। মা যেন এই মুহূর্তটুকুর সুযোগ নিয়ে ছেলের দিকে নিশ্চিন্তচিত্তে মনোযোগ দিলেন।

হঠাৎ ওর হাসি বন্ধ হয়ে যায়। ক'মুহূর্ত যেন স্থির হয়ে থাকে। তারপর উঠে বসে চোখের জল মুছে বলে—হাসতে হাসতে চোখে জল এসে গেল। না, বাবা আর হাসব না—চিনতুর আবার অসুখ। তারপর রীনার দিকে তাকিয়ে বলল—দেখলেন কেমন ধমকে সব ঠাণ্ডা করে দিলাম। আবার এক দমক হাসি হাসতে যেয়ে থেমে গেল। তার পর আবার চোখের জল মুছে—এক মুহূর্ত রীনার গগলসটার দিকে তাকিয়ে রইল। মুহূর্ত মধ্যে রীনার গগলসটি হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়ায় এবং দেওয়ালে টাঙানো সেই আয়নার সামনে গিয়ে গগলসটি পরে এবং পরলে কেমন দেখায় দেখবার জন্যে আয়নার সামনে গিয়ে হাজির হয়। নিজেকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে।

রীনা ভাবছিল মেয়েটির কথা। ওর ভেতরে ব্যক্তিত্বও রয়েছে আবার ছেলেমানুষিও যায়নি—দুজনেই পালা করে রাজত্ব করছে। নিজের ভেতরে ব্যক্তিত্ব প্রকাশ পেলে নিজেই তাতে হেসে অস্থির—ওর নিজের ভেতরে ব্যক্তিত্ব যেন এক মজার জিনিস। রীনার নিজের মনে খটকা লাগছিল—এ হয়তো ঠিক ব্যক্তিত্ব নয়—এই বয়সের প্রাণপ্রাচুর্য। ওর উচ্ছ্বসিত হাসির আবেগ রীনাকেও প্রভাবিত করে। রীনাও সস্নেহে একটু হাসে—যদিও মেয়েটি ঠিক কী কী কারণে হাসছে রীনা বুঝে উঠতে পারেনি। তবুও হাসে। ভাবখানা প্রকাশ করে, ওর হাসির পাগলামি দেখে সস্নেহে ও প্রশ্রয়ে হাসছে। তার পর রীনা ঘড়ি দেখে সময় দেখবার জন্যে নয়, এখন স্কুলে কোন পিরিয়ড চলছে জানবার জন্যে—ভাবল, এমন সময় রোজ আমি ক্লাস নাইনে—থার্ড পিরিয়ড শুরু হয়েছে।

বড় মেয়েটির চোখে একটা আগ্রহ প্রকাশ পায়। রীনার মনে হয়, ছোট বোনের রীনার গগলস পরা আগ্রহের সঙ্গে লক্ষ্য করেছে। হয়তো ওরও ইচ্ছে করছে কিন্তু লজ্জায় হয়তো গগলস পরতে পারবে না। রীনার জিনিস কেউ ব্যবহার করে তা কোনদিনও পছন্দ করে না।

ওদের বাপের বাড়িতে কেউ তা করে না। ওর দিদির একটা অভ্যাস ছিল—সকলের

শাড়ি পরতে চাইত—হয়তো নিজের পুজোর শাড়ি দু'বার একবার পরে রীনার পুজোর শাড়ি একদিনের জন্য পরতে চাইবে—পরিবর্তে সেদিনের জন্যে রীনাকে নিজের পুজোর শাড়ি পরতে দেবে। রীনার তা ভালো লাগত না। রীনা কেন প্রায় কোনও বোনই দিদির এ অভ্যাস পছন্দ করত না। বৈচিত্রের 'পর এমন কাঙালপানা রীনার কোনদিন ভাল মনে হয়নি। ভাবল, এখন আর গগলস পরব না—হাতে রাখব—তার পর রাস্তায় গিয়ে ভ্যানিটি ব্যাগে পুরব। বাসায় গিয়ে ডেটল দিয়ে মুছে তবে পরব।

ওর ঘড়ি দেখাটি মেজ মেয়েটি দেখে ফেলে। রীনার মনে অস্বস্তি জাগে, হয়তো, মেজ মেয়েটি ভাবছে ঘড়ি দেখবার নাম করে রীনার ঘড়ি যে আছে তা জানাচ্ছে। এবার রীনার বিমলেন্দুকে মনে পড়ে? কোথাও গেল নাকি?

বোনদের জিম্মায় আমাকে গচ্ছিত রেখে টিউশনি সেরে আসতে গেছে না কি?

দিদিদের ধমকানোর জন্যে ছোট মেয়েটির উচ্ছ্বসিত ও প্রাণবন্ত হাসি যেমন সবাইকে কিছুক্ষণের জন্যে স্তব্ধ করে দিয়েছিল—হাসি বন্ধ হবার পর কেউ যেন কোনও কথা খুঁজে পাচ্ছিল না। কেবল মা-ই এই হাসির জন্যে কিছুমাত্র অপ্রস্তুত হননি—গ্রাহ্যও করেননি—বরং এই সুযোগ অসুস্থ ছেলেটির একটু সেবা করে নিলেন। মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে হঠাৎ ক্লোরো-মাইসিটিনের ফাইলটি হাতে নিয়ে শ্রদ্ধার সঙ্গে একবার পরীক্ষা করে রীনাকে উদ্দেশ করে বললেন—হ্যাঁ মা, এসব ওষুধ তো তক্ষুনি-তক্ষুনি কাজ আরম্ভ হয়ে যায়—তাই না? অবশ্য কাজ যে হচ্ছে একথা কিছু পরে বোঝা যায়। তাই তো? একটা কথা মা তোমাকে না বলে পারছি না—কাকেই বা বলি—তুমি তো লেখাপড়া জানা মেয়ে। আচ্ছা, আমরা শুনতাম, টাইফয়েড সেরে গেলে একটা না একটা অঙ্গ নষ্ট করে দিয়ে যায়—তা এসব দামী দামী ওষুধ নিশ্চয়ই অঙ্গ নষ্ট হতে দেবে না—তুমি কী বলো মা?

দু'বোন উৎসুকভাবে রীনার দিকে তাকায়। ছোট মেয়েটিও গগলস খুলে রীনার দিকে দারুণ মনোযোগ দেয়।

—না। আজকাল টাইফয়েড হলে—ওসব কিছু হয় না। আমি অনেক দেখেছি। আপনি কিছু ভাববেন না।

—বাঁচালে মা—তুমি দেখেছ, কিছু হয় না—তাই না। অনেক জায়গাই দেখেছ। যাক বাঁচালে। হ্যাঁ, এত দামী ওষুধেও যদি.....। ছেলেটি পাস ফিরতেই তিনি সব ভুলে ছেলেটির দিকে তাকিয়ে থাকেন। মাথায়, হাতে পায়ে হাত বোলাতে থাকেন।

কেমন একটা সুক্ষ্ম বিতৃষ্ণা কিছুটা অর্ধসচেতনভাবে রীনা বোধ করতে থাকে। ছোট মেয়েটির অভিভাবকের মতো ধমক ও ও'কে অভিভাবক বলে মেনে নেবার জন্যে প্রবল উচ্ছ্বসিত হাসি, ওর প্রাণপ্রাচুর্য ও প্রাণাবেগে ছটফট করে। ছোটমেয়েটির মতো অমন প্রাণ ভরে হাসতে না পারবার অক্ষমতায় রীনা যেন যৌবনের কোনও ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত হবার একটা লজ্জামিশ্রিত ক্ষোভ কিছুটা অস্থিরভাবে বোধ করে। ও সেই ক্ষোভকে ভুলবার জন্যে অধীর হয়ে ওঠে। ছোট মেয়েটি নিজ প্রাণপ্রাচুর্যে সকলের মনোযোগ কেড়ে নেবার ফলে রীনার নিজেকে ভারি গৌণ মনে হচ্ছে। ছোট মেয়েটির কাছে নিজেকে ম্লান মনে হবার একটা সুক্ষ্ম গ্লানি অর্ধসচেতন ভাবে অনুভব করবার

সঙ্গে সঙ্গে সব কিছুর 'পর বিতৃষ্ণার অনুভূতি দেখা দেয়। সব কিছুর 'পর বিতৃষ্ণাকে আঁকড়ে ধরে—চেতনা থেকে যেতে দিতে চায় না। বিমলেন্দুকে মনে পড়ে। বিমলেন্দুর সতৃষ্ণ দৃষ্টি মনে পড়বার সঙ্গে সঙ্গে চেতনায় ছবি ভেসে ওঠে। বিমলেন্দু সতৃষ্ণভাবে নন্দিনীর দিকে তাকিয়ে রয়েছে। মনে মনে স্কুল কামাই করবার জন্যে রীনা নিজেকে দোষী করে। তদুপরি হঠাৎ ঝোঁকের মাথায় এখানে চলে আসবার জন্যে নিজের হঠাৎ ঝোঁকের মাথায় কাজ করবার স্বভাবকে দায়ী করে। সঙ্গে সঙ্গে সিদ্ধান্ত করে—আর ঝোঁকের মাথায় কাজ করব না। সিদ্ধান্তকে শপথের মতো অনুসরণ করবার প্রতিশ্রুতিও নিজেকে দেয়।

—জানো মা—বলতে থাকেন, ওর শরীরে কিছু নেই, বার্লির জল খেয়ে বড় হয়েছে—বড্ড পেটরোগা ছিল কিনা ছেলেবেলায়—এমন এসব ওষুধ অঙ্গ নষ্ট হতে দেবে না ঠিকই—কিন্তু আর পাঁচটা ছেলে শরীরে যেমনভাবে কাজ করে, ওর শরীরে কি তেমনভাবে কাজ করবে—কিছুই তো ওর শরীরে নেই। তবে অবশ্য ডাক্তারবাবু কি আর না পরীক্ষা করে দিয়েছেন? কী বলো মা?—ছেলেটি আবার ও পাশ হতেই মা ঝুঁকে পড়েন—একটু ফল খাবি বাবা—ভালো ফল আছে। পুষ্টিকর। মেজ মেয়েটির দিকে তাকিয়ে বলে, দে তো মা একটু মৌসাম্বীর রস করে—আর একটু আপেল কেটে—তা, মা, পেট অবশ্য ভালো নেই—তা ফলের রস দেওয়া যেতে পারে—কী বলো মা?

রীনা একটু কুণ্ঠার সঙ্গে জিজ্ঞেস করে, স্কুলের থেকে আর কেউ এসেছিলেন কি? রীনার প্রশ্ন শুনে ছোট মেয়েটি এগিয়ে আসে। ইতিমধ্যেই মেজ মেয়েটি মাথা নেড়ে না জানায়। ছোট মেয়েটি বলে, দাদার সহকর্মীর মধ্যে আপনিই ফার্স্ট এলেন।

মেজ মেয়েটি বলে, আপনাকেই তো প্রথম দেখলাম। বড় মেয়ে মাথা নেড়ে সায় দেয়। মাথা নেড়ে সায় দিতে পেরে বড় মেয়েটি যেন স্বাভাবিক হয়ে ওঠে। মাথা নেড়ে দিয়ে যেন নিজের অস্তিত্ব অনুভব করে বড় মেয়েটি এতক্ষণ পরে। মাথা নেড়ে বড় মেয়েটি এতক্ষণ পরে সকলের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত বলে অনুভব করে।

ছোট মেয়েটি আবার বলে, সহকর্মী বোধ হয় কারেক্ট হল না—সহকর্মিনী হবে। এবার রীনা রীতিমতো লজ্জা পায়। ভাবল, ওরা মনে করছে, আমিই শুধু একা আসবার কর্তব্যবোধের জন্যে বাহাদুরি নিচ্ছি। হয়তো সামাজিক দায়িত্ব পালন করে ওদের মুখে নিজের প্রশংসা।

ভদ্রমহিলা বলতে থাকেন—তা তোমাদের মতো জ্ঞানীগুণীরা যদি এসে খোঁজখবর করো তবে কত যে বলভরসা পাই আমরা। একে একা কত দুশ্চিন্তা মাথায় আসে—কার সঙ্গে একটু পরামর্শ করি বলো? গোটা মৌসাম্বীর রস আবার করিসনে—আচ্ছা কর—পেটে তো ক'দিন কিছুই পড়ছে না—আপেলের সিকিভাগ-কুচি কুচি করে—বড্ড টাটকা ফল এনেছ না—তোমার পছন্দ আছে। তা মা—এই ফলের রসটস পেটে পড়লে গায়ে বল পাবে—তখন ওষুধ ভালো ভাবেই কাজ করবে, কী বলো মা?

এবার ছোট মেয়েটি বলে, আমাদের এরিয়াতে একা আসবেন না কিন্তু—তা হলে হয়তো আর ফিরতে হবে না—আর কাউকে নিয়েও আসবেন না—শুধু এখানকার লোকাল কোনও লোকের সঙ্গে আসবেন। এটা মিক্সড এরিয়া—দু'পক্ষই তালে থাকে—

সুবিধা পেলেই ব্যস খতম।

মা ধমক দিয়ে বলেন—তুই থাম তো একদিন এসেছে তো, ভয় দেখাতে শুরু করেছিস—তা মা দিনকাল এমন হয়েছে নিজের দেশের ছেলেদের ভয় করতে হচ্ছে। আমরা ছেলেবেলায় গোরাদের ভয় করতাম, সাহেব দেখলে প্রাণে জল থাকত না। এখন নিজের দেশের ছেলেদের ভয়ে রাস্তাঘাটে চলা যায় না—এ পাড়া ওপাড়া করা যায় না—সব যেন ওর বাপের মুলুক।

রীনা বলল—শুধু আপনাদের এখানে নয়, বহু জায়গাই এমন হয়েছে। অচেনা লোক দেখলেই সন্দেহের চোখে দেখে। একজন ভাবে শত্রুদলের লোক, একজন ভাবে ছদ্মবেশী আই বি.আর ছদ্মবেশী আইবি ভাবে, অপরিচিত লোকটি সন্দেহভাজন বা হয়তো আত্মগোপনের জন্যে এখানে এসেছে। হয়তো তিনদলের হাতেই বিপন্ন হতে পারে।

মেজ মেয়েটি জানায়, কোন্ বাড়ির লোক কোন্ দলের সমর্থক তা সকল দলের লোকদের মুখস্ত।

বড় মেয়েটি মেজ বোনের দিকে তাকিয়ে বলে, নিজের দলের লোক ছাড়া কেউ কথা বলতেও .....

মেজ বোন ভাষ্য করে—নিজের দলের বাইরে আর সবাইকে এখন শত্রু মনে করা হয়।

—ঠিকই করে—ছোট বোনটি মেজ বোনের মুখের কাছে এসে বলে। শাসক দলের দালালদের কোনও খাতির নেই। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, এমন অবস্থা করল কারা—কারা আজ বিশ-বাইশ বছর ধরে শোষণ করে আসছে—প্রথমে তাদের আমরা নিন্দে করতে পারিছ না কেন? এ অবস্থা কি একদিনে এসেছে? কেন এতগুলো ছেলে খেপে উঠল? কেন তারা সব কিছু ত্যাগ করে বোমা বানাতে লাগল? গোড়াকার কারণটি কী? গোড়াকার কারণটি না বুঝে আবোলতাবোল বললে তো চলবে না?

মেজ মেয়েটি বলে, দেখ, মুখস্থ বুলিগুলো আওড়াবি না তো? কতগুলো কথা মুখস্থ করে নিজেকে মহাপণ্ডিত ভাবছিস্—গোড়াকার কারণ—শুনে শুনে কান পচে গেল।

মা বললেন—হ্যাঁ মা, কাজের লোক পেয়েছ—বিশ্বাসী টিশ্বাসী তো? নইলে যা দিনকাল—তোমরা দুজনেই তো বাইরে থাক—লোকটা ভালো তো?

—আমি কিছু বললেই মুখস্থ—আর তুই ভয়ংকর ওরিজিনাল, না? মুখস্থ করছিস, মুখস্থ করছিস—এই কথাগুলোই তোরা মুখস্থ করে বসে আছিস—আর কিছুই জানিস না, বুঝিসও না,—আর বোঝালেও বুঝবি না—এত কুসংস্কার তোদের। ছেলেরা পাশ করে চাকরি পাচ্ছে না কেন? কৃষকরা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে ফসল ফলাচ্ছে আর জোতদাররা সব লুটে খাচ্ছে কেন? কারখানায় কারখানায় লক আউট, ছাঁটাই হচ্ছে কেন? জিনিসপত্রের দাম এত বেড়ে যাচ্ছে কেন—নাগালের বাইরে?

মা বললেন—হ্যাঁ মা, তোমাদের বাজার করে কে? তোমার তো যদুবাবুর বাজার? আচ্ছা তোমাদের ওখানে বেগুনের সের কত? সের তো আবার আজকাল চলে না—কিলো হয়েছে—আমাদের পুরোনো অভ্যাস। নিজেরাই বাজার করো তো? ঝি করে? না, মা, ঝিকে দিয়ে করানো ঠিক নয়—ওরা পয়সা মারবেই—বিকেলে না হয় হাঁটতে

হাঁটতে বাজারটা তিনি করে আনবেন—কি অফিস থেকে ফেরবার পথে? জিনিসটাও ভালো আসে—দামও বেশি পড়ে না—নিজে বাজার করলে ভালো জিনিস খাওয়া যায়।

ঠিক এমনি সময় বিমলেন্দু দরজার বাইরে থেকে আলগোছে ঘরে উকি দিয়ে মেজ বোনকে হাতছানি দিয়ে ডাকল। বিমলেন্দুকে এক ঝলক দেখেই রীনা বুঝতে পেরেছিল ওর জন্যে খাবার আনতেই বিমলেন্দু গিয়েছিল—এখন বোধ হয় খাবার নিয়ে ফিরে এসেছে। বিমলেন্দুকে দেখা মাত্রই ছোট বোনটি যেন চুপসে যায়। রীনা বুঝতে পারে। ওর দাদাকে ভয় করে। রীনা বুঝতে পেরেছিল। ছোট বোনটির রাজনীতি আলোচনা রীনাকে শোনাবার জন্যেই। জবাব দেবার জন্যেই মনে মনে তৈরিও হয়ে উঠেছিল। বিমলেন্দুকে দেখামাত্র অন্তরে অন্তরে একটা চাঞ্চল্যের অনুভূতি ওকে খুশি করে। বিমলেন্দুকে দেখবামাত্র বোধ করে এতক্ষণ ধরে বিমলেন্দুকে দেখবার একটা তৃষ্ণা ওর ছিল—তবে তৃষ্ণার কথা সচেতনভাবে বোধ করেনি—তৃষ্ণার কথা ভুলে ছিল—বিমলেন্দুর দর্শনমাত্র তৃষ্ণার কথা মনে পড়ল। হঠাৎ রীনার মনে এল, বিমলেন্দু সতৃষ্ণ দৃষ্টি কি সংক্রামক? ওর অন্তরকেও সতৃষ্ণ .....। মুহূর্তে রীনা এই সতৃষ্ণ হবার চিন্তাকে অস্বীকার ও অগ্রাহ্য করে। অস্বীকার ও অগ্রাহ্য করবার মধ্যে একটু জোর অনুভব করে আনন্দবোধ করে। বিমলেন্দুকে দেখবার খুশি তৃষ্ণাবোধ করবার খুশিতে পরিণত হয়—আর এই খুশিকে জোর করে অগ্রাহ্য করবার মধ্যে নিজের আত্মবিশ্বাস অনুভব করে সেই খুশিকেই আত্মপ্রতিষ্ঠার খুশি হিসেবে অনুভব করে। এই অনুভূতিটিকে চলে যেতে দেয় না—মনে মনে ভাবে, কি ছেলেমানুষ রে বিমলেন্দু, এই একঘন্টা হয়নি ভাত খেয়েছে—এখন কি কেউ মিষ্টি-টিষ্টি খেতে পারে। তবু মিষ্টি আনবার মধ্য দিয়ে যেন নিজের এক ধরনের মর্যাদাবোধ করে। কি মানুষ রে বাবা, আমার থেকে ধার করে আমাকেই বাড়িতে এনে মিষ্টি খাওয়াচ্ছে। অঙ্কের লোকের এত হিসেব ভুল।

ছোট মেয়েটি প্রায় চাপা গলায় ফিসফিস করে—যে সমাজ শিক্ষিত ছেলেদের অনাহারে মারতে চায়—সেই সমাজকে ধ্বংস করবার জন্যে ছেলেরা বোমা বানাবেই, সেই সমাজে জোতদার মরবেই, কলকারখানায় স্ট্রাইক হবেই, যেখানে শোষণ আছে অথচ শোষণকারীদের শাসন নেই—শাসন কেবল তাদেরই 'পর যারা শোষণের বিরুদ্ধে কথা বলবে। এমন সমাজের জন্যে আমার দরদ নেই। যে সকল দালালরা এই সমাজের ওকালতি করে—আর শোষণকারীদের পার্টিতে দলবাজি করে—তারা মরলে দুঃখ হয় না। এই সমাজে মৃত্যুই ওদের একমাত্র পাওনা, দেনা মিটিয়ে দেওয়াই তো দরকার। কমার্স যখন আমার সাবজেক্ট—তখন এই আমার রায়।

রীনা গম্ভীর হয়ে বলে, সমাজের পরিবর্তন দরকার এই বিষয়ে আমিও একমত। খুচরো দু'পাঁচ জন কনস্টেবল আর মুদিকে খুন করলে সমাজ পাল্টাবে না—আর সমাজ পরিবর্তনের একটা নিয়ম আছে—সেই নিয়মের ছন্দে চলতে হবে—তবেই না বিপ্লব আসবে। লোকের মনে আতঙ্কের সৃষ্টি করে নিরাপত্তার অভাব জাগিয়ে বিপ্লব আসে না—লোকের মনে এই সমাজ সম্পর্কে প্রবল বিতৃষ্ণা দরকার। পরিবর্তনের জন্যে অধীরতা দরকার। নিরুপায় বিরক্তি দরকার—না হলে পরিবর্তন আসবে না। খুন, জখম, আতঙ্ক, ভয় হতে থাকলে নিরাপত্তার অভাব বাড়তে থাকলে লোকে তখন খুন, জখম,

আতঙ্ক ভয়ের হাত থেকে বাঁচবার জন্যে ব্যাকুল হয়—বিপ্লবের জন্যে হয় না। নিরাপত্তার জন্যে ব্যাকুল হয়ে ওঠে। যা হয়েছে এখন। যারা আতঙ্ক, ভয়, নিরাপত্তার অভাব বাড়িয়েছে তারা বিপ্লবের শত্রু—সজ্ঞানে হোক বা অজ্ঞানে হোক। তারা মূর্খ—কারণ মানুষের মন সম্পর্কে কোনও জ্ঞান তাঁদের নেই। কাণ্ডজ্ঞানহীন কারণ তাদের কাজের ফলাফল তারা জানে না। গোঁয়ার কারণ তারা ভাবে দুর্বৃত্ত হওয়াই বিপ্লবী হওয়ার একমাত্র লক্ষণ।

বলতে বলতে রীনা উত্তেজিত হয়ে ওঠে। একটা ক্ষুব্ধতার অনুভূতিতে ছোট মেয়েটির দিকে তাকাতে পারে না।

—তাছাড়া সমাজ হচ্ছে জনগণের, ক'জন অসামাজিক, দুর্বৃত্ত, কাণ্ডজ্ঞানহীন মূর্খ গোঁয়ারের নয়, যারা নিজেদের বিপ্লবী বলে বাড়ির দেওয়ালে পোস্টার মেরে নিজেদের বিজ্ঞাপন দেয়।

মা সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটির দিকে তাকিয়ে বলে, দ্যাখ, কত জ্ঞান রাখে।

মেজ মেয়েটি সঙ্গে সঙ্গে বলে, ঠিক বলেছেন আপনি। আমি আপনার সঙ্গে একমত। ছোটবোনটি চাপা গলায় মেজদিকে ভেঙিয়ে বলে, আমি আপনার সঙ্গে একমত—কী বুঝেছিস তুই? ছাই।

ঠিক এমনি সময় বিমলেন্দু ঘরে ঢোকে—বেশ চমৎকার বাংলা বলেন—খুব ফ্লুয়েন্ট। শুনছিলাম স্তব্ধ হয়ে।

মা ও দুবোনই একসঙ্গে সায় দেয়। দাদার সামনে ছোট বোনটি বেশ সংযতভাবে আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করে, পাস করে চাকরি না পেলে ছেলেরা কী করবে?

মুহূর্তে বিমলেন্দু কঠোর স্বরে বোনকে বলে, সে সব ছেলেদের জন্যে তোমার মাথা ব্যথার প্রয়োজন নেই—তাদের মাথা খাবার জন্যে অনেক কমরেড দাদা আছেন।

রীনা একটু হেসে বলল—এ আপনার অন্যায় শাসন—আজকালকার ছেলেদের জন্যে ওর মাথাব্যথা খুবই স্বাভাবিক—ওর ভবিষ্যৎ তো আজকালকার ছেলেদের সঙ্গেই জড়িত।

দাদার ধমকে মেয়েটি চুপসে গিয়েছিল। চোখমুখ ওর লাল হয়ে উঠল। একবার রীনার দিকে তাকিয়ে চোখ নত করল। রীনার মনে হল, ওর ঠোঁট দুটো কাঁপছে।

মেজ বোনটি বলে, বোমা ছুড়লেই কি চাকরি পাওয়া যাবে?

রীনা বলে, যারা চাকরি বাকরি করেন তাদের 'পর ছুঁড়লে অবশ্য কিছু কর্মখালি হবে। সেখানে বোমাবাজদের হয়তো চাকরি জুটতেও পারে।

ছোট মেয়েটি আবার মুখ খোলে—স্বরে কেমন কান্নার আভাস—সে জন্যেই তো বলেছে, স্বামী আর স্ত্রী দুজনের চাকরি মিলবে না। ওভারটাইম বন্ধ করতে হবে। সেখানে নতুন লোক নিতে হবে—পার্ট-টাইমও বন্ধ করে সেখানে নতুন লোককে ফুল-টাইম দিতে হবে। এসব না শুনলে তখন বাধ্য হয়ে বোমা.....। মেয়েটি দাদার দিকে তাকিয়ে চুপ করে।

মা এবার ছোট মেয়েটিকে বলেন—তোর এত কথায় থাকবার দরকার কী? খা, দা নিজের পড়াশোনা কর—এবার পরীক্ষা দিবি—নিজের মনে নিজে থাক।

রীনার মনে হল মা ছোটমেয়েকে বিমলেন্দুর হাতে আরেক প্রস্থ ধমকের হাত থেকে উদ্ধার করবার জন্যে ধমক কাম উপদেশ দিতে তাড়াতাড়ি শুরু করলেন।

মেজ মেয়েটি এবার মিষ্টি ও জল রীনার জন্যে নিয়ে এল।

—ওমা, আমি তো এইমাত্র এলাম—এখন এসব খাবে কে? আচ্ছা, আপনি আমার সঙ্গে এত ফর্মালিটি করছেন কেন?

বিমলেন্দু, মা, দু'বোনের পীড়াপীড়িতে রীনা একটা মিষ্টি তুলে নেয়।

চলে যাবার জন্যে রীনা উঠে দাঁড়ায়। মাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলে, ভালো হয়ে যাবে—কিছু ভাববেন না।

মেজ বোন জানায়, আবার আসবেন কিন্তু।

বিমলেন্দু আগে বের হয়ে যায়। রীনা যখন ঘর থেকে বেরুচ্ছে তখন ছোটবোনটি ফিসফিস করে তর্জনী দেখিয়ে মেজ বোনকে শাসাচ্ছে—আর যদি একটাও সেলাইয়ের অর্ডার এনে দি তো দেখিস। রীনা যে শুনতে পেয়েছে তা বুঝতে পেরে দু'বোনই লজ্জায় লাল হয়ে ওঠে। ইতিমধ্যে ছোটবোনটি দু'বোনকে ঠেলে পেছনে ফেলে রীনার কাছে এসে তেমনি ফিসফিস করে বলে, মাঝে মধ্যে যদি পড়াশুনার জন্যে আপনার কাছে যাই—ইংরেজি বাংলাটা একটু দেখিয়ে দেবেন। আপনার অ্যাড্রেসটা—দাদা অবশ্য জানবেন নিশ্চয়ই—কিন্তু দাদার কাছে চাইবে কে?

রীনা ঠিকানা বলে।

—যাব তাহলে? কিছু মনে করবেন না তো?

—নিশ্চয়ই না—নিশ্চয়ই যাবে।

রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে রীনা বলে, আপনার ছোট বোনটির মধ্যে বেশ তাপ আছে। বিমলেন্দু একটু চুপ থেকে বলে, আপনার মতো লোকের টাকা শোধ দেওয়া উচিত নয়। একটু উদারভাবে হেসে রীনা বলে, আপনিও আপনার ছোটবোনের দলে নাকি? ফেরত দিতে ইচ্ছে করছে না? কেন, চিরকাল কৃতজ্ঞ থাকতে ইচ্ছে করছে? চিরঋণী?

—না, সে সব নয়? টাকা শোধ না দিলে বার বার তাগাদা দিতে আপনি আমার বাসায় আসবেন—আপনাকে বার বার আমার বাসায় দেখতে পাব—এই লোভেই টাকা শোধ দিতে ইচ্ছে করছে না।

—কী হবে অত দেখে। পরস্ত্রীকে অত দেখে না।

একটু চুপ থেকে রীনা যেন জোর করে নিঃশ্বাস ছাড়ে। রীনার যেন হাতে পায়ে জোর কমে আসছে—কী বলছে ঠিক বুঝতে পারে না। কেমন জড়িয়ে জড়িয়ে বলে, আজও তো এসেছিলাম—কই, ফেলে রেখে কোথায় উধাও হয়ে গেলেন।—রীনা ঠিক বুঝতে পারে না কী এখন ও বলতে চায়। হাত, পা, কেমন কাঁপছে ভেতরে ভেতরে, বুকের তোলপাড় যেন রীতিমতো গন্ডগোল বলে মনে হয়। ভয় ভয় করছে—অথচ এই ভয়, আবেগকে ঠিক স্বীকারও করতে পারছে না অথচ এই মুহূর্তের ভয়, আবেগ, বুক কাঁপা, হাত-পার অবশ হয়ে যাওয়া চলে যাক্—তাও যেন রীনার ইচ্ছে নয়। রীনা তাড়াতাড়ি গগলসটা পরে—এতক্ষণ যা হাতে ছিল—যেই গগলসকে ভ্যানিটি ব্যাগে পুরবার ইচ্ছে একটু আগেও ছিল। নিজেকে লুকোবার একটা চেষ্টা এই গগলস পরবার

মধ্যে অনুভব করতে থাকে।

রীনার কথার মধ্যে যে প্রচ্ছন্ন প্রশ্রয়ের আভাসও শেষে প্রকাশ্য প্রশ্রয় প্রকাশ পেল, তা বুঝতে বিন্দুমাত্র দেরি হয়নি বিমলেন্দুর। বিমলেন্দু পুলকিত হবার চেষ্টা করে—কিন্তু হতে পারে না।

রীনার কথা পলকের মধ্যে ওর অন্তরে এক অভিমানের ঝড় এনে দেয়। চেতনাকে প্রায় ঝাপসা করে তোলে। ছেলেবেলা থেকে যত অবহেলা ও অবিচার পেয়েছে, মেয়েদের অবহেলা ও ঔদাসীন্য যত সহ্য করেছে, এমনকী রীনা ওকে কুকুর পর্যন্ত বলতে দ্বিধা করেনি—সব কিছু একসঙ্গে যেন ওর চেতনায় ভিড় করে বিশৃঙ্খলভাবে হাজির হতে থাকে। আজকের রীনার এই মনোযোগ ও আকর্ষণকে ওর মনে হয়, এ যেন রীনার ভালোবাসা পাওয়া নয়। উপর্জন করা। রীনার অনিচ্ছুক আকর্ষণকে কিছুটা পোষ মানিয়েছে মাত্র। তাছাড়া রীনার আকর্ষণ কতটা মুগ্ধ স্তাবকতার, দয়া করে স্বীকৃতি মাত্র। কতটা স্বতঃস্ফূর্ত তা বিমলেন্দু ঠিক করতে পারে না। ওর মন বিশৃঙ্খল হয়ে যায়। মনে হয়, স্তাবকতার ফলে রীনার মনে হচ্ছে সাময়িক একটা উচ্ছ্বসিত ভাবালুতা মাত্র, আবার বিমলেন্দু নিজের সিদ্ধান্তও বিশ্বাস করে না। ওর মনে হয়, এমন আত্মনিবেদনে যার কাছ থেকে এল—আমার ভাগ্যে তার কাছ থেকেই টাকা ধার করতে হয়—মর্যাদা নিয়ে পাশে দাঁড়াবো এমন ভাগ্যও আমার নেই। সঙ্গে সঙ্গে বিমলেন্দুর এও মনে হয়, নিছক বিবাহিত বলেই আমার ’পর এই করুণা—এই প্রশ্রয়—কুমারী থাকলে কথাও বলত না। ওর মনে পড়ে, আজই ভালোবাসা এল—যখন আমার বয়েস হয়ে গেছে—যৌবনের এই বিকেলে। কিন্তু বিমলেন্দু পূর্ণ মাত্রায় সচেতন—রীনার প্রশ্রয়ের সুযোগ হারানো চলবে না—ধন্য হয়ে গেছি—এমনি কিছু ধরনের জবাব দিতে হবে। অভিমানে গলা সজল ও কিছুটা রুদ্ধ কিন্তু বিমলেন্দু ঠিক করে, এই সজলতাকে ও রুদ্ধতাকে ধন্য হয়ে যাবার, কৃপা পাবার আনন্দাশ্রু বলে চালাতে হবে। ওর ক্ষুব্ধ অন্তর বার বার ক্ষোভ জানায়, কুমারী মেয়ের পরিপূর্ণ ভালোবাসা কোনও দিনও ওর ভাগ্যে নেই—অনেক কষ্টে যা উপার্জন করেছে তা হচ্ছে বিবাহিত মেয়ের সাময়িক প্রশ্রয়। আবার বিমলেন্দু নিজের এই ধরনের চিন্তায় নিজের স্বভাবের ’পরই বিরক্ত হয়ে ওঠে—ভাবে, সারাজীবন ব্যর্থতা পেতে পেতে মনের গড়ন এমন হয়েছে যে, কোনও সাফল্যই বিশ্বাস করে না। প্রতিটি প্রাপ্তির পেছনে একটা কুটিলতা আবিষ্কার করে প্রাপ্তির আনন্দ ওর নষ্ট হয়েছে। ভাবল, মন কোন কিছু পাওয়াকেই নিরাশার সঙ্গে না নিয়ে পারে না—ওর জন্যে কোনদিন যদি কিছু ভালো ভাবে নিতে পেরে থাকি।

- আপনাকে আমি কিছুতেই ভুলতে পারব না—সব সময় প্রতিটি মিনিট—চেষ্টা করেছি ভুলতে—কিন্তু সম্ভব হয়নি—আপনি আমার অবসেশন।

বিমলেন্দু গলার স্বর নিজের ইচ্ছের বাইরে কেমন যেন বিশ্রী ও বিকৃত হয়ে যায়। গলা প্রায় ভেঙে আসছিল। অনেক কষ্টে নিজেকে সংযত করে। আবার পরমুহূর্তে *নিজের অজান্তে ও অনিচ্ছায় বলে, আপনিই আমার জীবনে প্রথম ..... । বাকিটা বলতে* পারে না—গলার স্বরের ’পর বিশ্বাস রাখতে পারছিল না। কথা কটি বলে বিমলেন্দু যেন অভিভূত হয়ে যায়। একটা কান্নার রুদ্ধ আবেগ বুকের মধ্যে পাথরের মতো চেপে

গলার দিকে এগিয়ে আসছে। নিজের কথা বলবার ক্ষমতার 'পর সব বিশ্বাস চলে গেছে। এতটা অভিভূত হয়েছে রাস্তায় পরিচিত লোক কিছু জিজ্ঞেস করলে কথা বলতে পারবে না সেই দুশ্চিন্তাও মনে আসছে না।

রীনা মাথা নিচু করে হাঁটতে থাকে। বিমলেন্দুও পাশে পাশে। আসবার সময় সুন্দরী নারীর পাশে চলবার গর্ব বিকিরণ করতে করতে এসেছিল—ফেরবার'বেলায় অপ্রাপনীয় হাতের কাছে ধরা দেবার ইচ্ছে প্রকাশ করা সত্ত্বেও গ্রহণ করতে না পারার অক্ষমতায় মুহ্যমান হয়ে চলতে থাকে। অথচ এক ধরনের আনন্দের অন্তঃস্রোত ঠিক চেতনার নিচেই বয়ে যাচ্ছিল তার স্নিগ্ধ-সান্নিধ্যও চেতনায় অনুভূত হচ্ছিল। দুজনেই বুঝছিল, সহজভাবে কথাবার্তা বলা দরকার। কিন্তু কেউ-ই সহজ হবার ঝুঁকি নিতে চাচ্ছিল না। বিমলেন্দু যে উদ্বেগ অনুভূতিতে রুদ্ধ-বাক, রীনার মন থেকে এই ধারণা'সহজভাবে কথা বলে নষ্ট করে দিতে চায় না। তাছাড়া সহজভাবে কথা বলতে গেলেই বলতে পারবে কি না এই আত্মবিশ্বাসও নেই।

তাই চুপ করে নীরব অস্বস্তিকেই নিজের ভালোবাসার গভীর প্রমাণ হিসেবে দাখিল করতে চাইল। রীনা কথা বলছিল না ভয়ে। পাছে সহজভাবে কথা বললে বিমলেন্দু মনে করে, ওর অনুভূতির 'পর রীনার কোনও সহানুভূতি নেই। রীনা ওকে প্রশ্রয় দিয়ে এখন প্রশ্রয় প্রত্যাহার করে নেবার ছুতোয় অন্য প্রসঙ্গে মনোযোগ দিতে চাচ্ছে। রীনা কথা বললে যদি বিমলেন্দু আরো কিছু গভীরভাবে বলতে শুরু করে—যদি কোনও বিশ্রী দৃশ্য সৃষ্টি করে ফেলে। যদিও রাস্তায় এসব কথা বলবার জন্যে যেমন ভালো লাগছিল না তেমনি রীনার আবার মনে হচ্ছিল, ভাগ্যিস রাস্তায় ছিলাম। রীনার কেবল মনে হচ্ছিল, যদি সহানুভূতি জাতীয় কিছু বলে তাতে হয়তো আরো উদ্দাম হয়ে উঠতে পারে। রীনার শুধু মনে হয়, ও কিছু বললে যেন সেই ছুতোয় বিমলেন্দু আরও কিছু বলে বসবে। রীনা লক্ষ্য করে বিমলেন্দু বরাবর বড্ড গা ঘেঁসে চলে। আসবার সময়ও সেই ভাবেই এসেছে—কিন্তু এখন বেশ কিছু তফাতে যাচ্ছে—সত্যি বড্ড অভিভূত। অথচ অভিভূত বিমলেন্দুর মুখ থেকে আবেগ-তপ্ত কথা রীনার শুনতে যে ইচ্ছে করছে না তা নয়। কিন্তু সেরকম সুযোগ দিতে আবার ওর সাহসে কুলাচ্ছে না—কোথায় গিয়ে যে বিমলেন্দু দাঁড়াবে তা অনুমান করতে ওর ভরসা হচ্ছিল না। কেমন ভয় ভয়ও করছে। সাহসেও কুলাচ্ছে না—আবার ভয় ভয় করাটিকে ওর ভালোও লাগছিল।

হঠাৎ দূরে কোথাও পর পর কটি বোমা ফাটার আওয়াজ হল—একটু থেকে আবার বোমা ফেটেই চলল। চটপট বাড়ির দরজা বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ দেখা গেল বেশ কিছু দূরে কিছু লোক দৌড়ে রাস্তা পার হয়ে যেতেই তাদের কাছে বোমা পড়ল। একটু পরেই পর পর দুটো পুলিশ ভ্যান সেই দিকে ছুটে গেল।

রীনা আতঙ্কে বিমলেন্দুর দিকে তাকাতেই দুজনেই থেমে পড়ে।

বিমলেন্দু শুধু বলে—আবার শুরু হল।

একটা রিকশা যাচ্ছিল। বিমলেন্দুর চেনা মনে হল—তবু লোকটি বলল—এক টাকা লাগবে কিন্তু।

বিমলেন্দু পেছিয়ে যায়—বলিস কি, এক টাকা। ত্রিশ পয়সা তো রেট—না হয়তো

আরো পাঁচ বা দশ পয়সা নিবি। বলিস কী?

—চলুন, বলে রীনা উঠে বসে।

—এসে গিয়েছিলাম কিন্তু আমরা। আপত্তি করতে করতে বিমলেন্দু গিয়ে রীনার পাশে বসে। বিমলেন্দু ধরা ধরা গলায় বলে, এখন যারা বোমা ফেলল—আর একটু পরে এদের বিপক্ষ দল এসে বোমা ফেলে বদলা নেবে। তারপর আসবে সি.আর.পি। একদিন দুদল এমন বোমা চালাচালি করছিল—আমার রান্নাঘরই উড়ে গেল—উঠোনে তিনটে শাড়ি তারে শুকোচ্ছিল—একেবারে পুড়ে যা তা হয়ে গেল। আমি বোমাবাজদের বলায় তারা সরেজমিন তদন্তে এসে সব দেখে শুনে বললেন, যাক আপনার শোবার ঘরগুলো বেঁচে গেছে। যেন শোবার ঘরগুলোর দারুণ ভাগ্য—এ যাত্রা টিকে গেল বলে।

বিমলেন্দু কথা বলছিল এমন ভাবে যেমন ভাবে অনেক শোক বা কান্নার পরে চোখের জল মুছে কিছুটা স্বাভাবিক হয়ে শোকগ্রস্তরা কথা বলে। কিন্তু রীনা এমনভাবে ভয় পেয়েছিল বিমলেন্দুর দিকে আর ওর মনোযোগ দেবার মতো মনের অবস্থা ছিল না।

দূর থেকে বাস-টার্মিনাসে বাস দেখে রীনার প্রাণে জল আসে। কিছুটা সুস্থভাবে বলে, আপনার ছোটবোন ঠিকই বলেছিল, এখানে একা আসতে নেই—লোক্যাল লোক ছাড়া।

সাইকেল -রিকশা থেকে নেমেই বিমলেন্দু আপত্তি করতে পারে ভেবেই আগেভাগে রীনা টাকা দিয়ে দেয়।

বিমলেন্দু নিজে ভাড়া দেবার গরজ দেখায় না—শুধু শেষবারের মতো রিকশাওয়ালাকে অনুরোধ করে, কিছু কম নে—এমন গলা কাটিস নে।

—সে হয় না—রিকশাওয়ালা টাকাটা নিয়ে মানিব্যাগে পুরতে পুরতে জানায়।

রীনা তাড়াতাড়ি বাসে ওঠে। যত শীঘ্র এ জায়গায় ছেড়ে দূরে যাওয়া যায়। এখন বাস ছাড়লে হয়। অনেক লোক বাসে উঠে পড়েছিল। বিমমেন্দু বলে, আমি কি আপনাকে এগিয়ে দেব? রীনা ঝোঁকের মাথায় উৎসাহের সঙ্গে বলে, দিন্ না। রীনা লেডিস সিটে জায়গা পেয়ে যায়। বিমলেন্দু জায়গা না পাবার জন্যে রীনার কাছেই দাঁড়ায়। একটু পরেই বাস ছেড়ে দিল। রীনা যেন এতক্ষণ পরে বুক ভরে শ্বাস নিতে পারল। চলন্ত বাসের ঠাণ্ডা বাতাস ওকে স্নিগ্ধ করে তুলল। একটা শান্তি ও আরামে ভাবল, বিমলেন্দুকে একটু আগে বলল, আপনাকে আর একটু এগিয়ে দেব। এ যেন এগিয়ে দেবার নাম করে অনিচ্ছুক ভদ্রতা মাত্র নয়—অর্থাৎ এগিয়ে দেবার প্রয়োজন নেই—তবু ভদ্রতা করে বলা। কিংবা রীনা বলবে দরকার নেই—এই ভরসায় ভদ্রতা করে যাবার ইচ্ছে প্রকাশ করা, জানে যেতে হবে না নিশ্চয়ই। আপনাকে আরেকটু এগিয়ে দেব—এ যেন রীনার আরেকটু সঙ্গ পাবার কুণ্ঠিত ইচ্ছে। রীনা ভয় পেয়েছে এই ছুতোয় রীনার সঙ্গে আরেকটু থাকবার সঙ্কোচিত ইচ্ছে। অবশ্য রীনা রাজি হয়েছিল এ জন্যে যে, এই ভয়ংকর জায়গাতে যতক্ষণ একটা লোক থাকে ততক্ষণই ভরসা। কিন্তু গাড়ি ছাড়তেই, লোকজনের স্বাভাবিক কথাবার্তা, ওঠা নামাতে ওর ভয় অনেকটা চলে যায়।

রীনা বিমলেন্দুকে ডাকল, মা তো ওষুধ খাওয়াবেন—বোনেরা সেবা শুশ্রূষা

করবে—আপনার তো কোনও কাজ নেই—চলুন আমার সঙ্গে নিউমার্কেটে—কেমন?

বিমলেন্দু ঘাড় নেড়ে সায় দেয়। কিন্তু রীনা বুঝতে পারে বিমলেন্দুর নজর রয়েছে পাশের সিটের একটা লোকের 'পর—হয়তো লোকটা উঠলেই বিমলেন্দু তা দখল করে বসবে।

রীনার মনে হয় আজ কল্যাণকে দেবার মতো—মজা করে দেবার মতো অনেক খবর দিতে পারবে। বড় বোনের কথা বলার ধরন—সঙ্গে সঙ্গে মেজ বোনের ভাষ্য। রীনা মানসচক্ষে দেখতে পায়, আগামিকাল থেকে কল্যাণ বড়বোনের নকল করে আধখানা করে কথা বলতে শুরু করবে। ছোট মেয়েটির আক্রমণ—রীনা যা বলল তাও সবিস্তারে বলে কল্যাণকে মুগ্ধ করে দেবে। যদিও পয়েন্টগুলো কল্যাণের কাছ থেকে নেওয়া কিন্তু রীনার ভরসা আছে তা কল্যাণ ভুলে গেছে—কারণ কল্যাণ এত অজস্র পয়েন্ট হেলাফেলা করে ছড়িয়ে দেয় যে ওর মনে থাকবার কথা নয়। হয়তো বলবে, আজ থেকে তোমাকে 'বাক্যবিভূষণ' দেওয়া গেল। রীনা একবার কল্যাণকে 'বচনশ্রী' বা 'বচনরত্ন' উপাধি দিয়েছিল। কল্যাণ সঙ্গে সঙ্গে বলেছিল, কিন্তু তুমিই হচ্ছ এ ফ্ল্যাটের সেরা রত্ন—ফ্ল্যাটরত্ন। তারপর বোম পড়বার কথাও সবিস্তারে বলবে। কল্যাণের দুশ্চিন্তাগ্রস্ত মুখ যেন রীনা পরিষ্কার দেখতে পায়। এক্ষুণি গিয়ে কল্যাণকে বলতে ইচ্ছে করছে। অবশ্য বিমলেন্দু সঙ্গে ছিল তা বলা চলবে না। কল্যাণের চিন্তায় যে স্নিগ্ধতা বোধ করছিল বিমলেন্দুকে মনে পড়ায় কেমন যেন একটু অসুবিধা ও অস্বস্তি বোধ করে। একটা তিক্ত স্বাদও অনুভব করে। কেন যেন এতটা পথ বিমলেন্দুকে টেনে আনবার জন্যে অনুতাপ বোধ হতে থাকে। একটা ধিক্কার আসন্ন দেখে রীনা জানলার দিকে তাকিয়ে দেখল মোটে হাজরা জংশনের কাছে এসেছে। মুখ ফিরিয়ে দেখল, বিমলেন্দু চোখ বুজে হেলান দিয়ে রয়েছে—হয়তো ঘুমুচ্ছে। কিংবা কিছু চিন্তা করছে। বিমলেন্দুর মুখখানা যেন বড় করুণ ও বিপন্ন। একটা মমতায় রীনার বুক ভরে উঠল—মমতা যেন কান্নায় গিয়ে পৌঁছতে চায়। কোনও দিন কারো ভালোবাসা পায়নি—আজ এত অভিভূত—যেন ভেঙে পড়েছিল—কি দারিদ্র ও কত সংগ্রামে। রীনার মনে হয়, বিমলেন্দুকে প্রশ্রয় দিয়ে যেন ওর 'পর অবিচার করছে—ওকে আশা দিয়ে যেন ওকে বঞ্চনা করবার পথ তৈরি করছে। এ ভালো নয়—এ ঠিক নয়—এ খারাপ—এ ভুল। রীনার চোখে জল এসে যায়—গলায় ডেলা আটকে আসে। ইচ্ছে হয়, এক্ষুনি নেমে ফ্ল্যাটে চলে যায়। যেন বিমলেন্দু এত কাছে আসবার পথ করে দিল—এ'তে যে বিমলেন্দুকে আরও দুঃখ দেবার ব্যবস্থা করেছে। ইচ্ছে করে বিমলেন্দুর সামনে আর কোনও দিন আসবে না। কিন্তু এমন সিদ্ধান্তে কোনও জোর অনুভব করে না। বিমলেন্দুর মুগ্ধ দৃষ্টির বাইরে থাকা যেন আজ আর রীনার শক্তিতে কুলোবে না। ঐ মুগ্ধ দৃষ্টি, ঐ তন্ময় দৃষ্টি ঐ নিজেকে ভুলে থাকবার চাহনিকে অগ্রাহ্য করবার শক্তি রীনার যেন নেই। ঐ মুগ্ধ দৃষ্টিকে যেন রীনা অত্যন্ত গভীর থেকে পছন্দ করে, প্রত্যাশা করে—রীনাকে দেখে বিমলেন্দুর মুগ্ধতায় যেন রীনা কেমন নেশার আকর্ষণ বোধ করে। অসহায়ভাবে নিজেকে সান্ত্বনা দেয়। এখন মন খারাপ বলে মনে হচ্ছে বুঝি বিমলেন্দুকে এড়ানো সম্ভব নয়। সম্ভব মন ভালো হলেই ....। কিন্তু মন ভালো হলেই বিমলেন্দুকে

এড়ানোর চিন্তা—সম্ভব এ কথা ভাবতে রীনার কষ্ট হয় নিজেকে স্বার্থপর নিষ্ঠুর-নিষ্ঠুর লাগে। তাছাড়া এ ধরনের ভাবনায় যেমন ভার তেমনি এই সামান্য চিন্তার ভয়ংকর বোঝা বহন অত্যন্ত কষ্টকর। রীনা ফিরে আবার বিমলেন্দুর দিকে তাকায়। যেন বিমলেন্দুর মুগ্ধ দৃষ্টি সমস্যা করেছে, বিমলেন্দুর করুণ মুখ যে আলোড়ন তুলেছে এবার তাকানোর মধ্যে বিমলেন্দুর কাছ থেকে সমাধান পাবার প্রত্যাশায় ঘাড় ফিরে বিমলেন্দুর দিকে তাকাতেই বিমলেন্দু ইঙ্গিত করে—এবার নামতে হবে। রীনা মাথা নাড়ে। নামবার জন্য তৈরি হয়। বাস স্টপেজ আসতে দেখে কিছু লোক ছুটে বাস ধরতে আসে। সঙ্গে সঙ্গে রীনার মনে ছুটোছুটি, বোম, দৌড়াদৌড়ি, পুলিশ ভ্যান—সব মনে পড়ে যায়। মনে পড়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে রীনা যেন নিজের কাজের একটা কৈফিয়েত খুঁজে পায় কেমন করে—মনে হয় এতদূর পর্যাপ্ত বিমলেন্দুকে টেনে আনা ওকে প্রশ্রয় দেওয়া নয়। অন্যত্র মন দিতে পারায় মন হাল্কা লাগে। বুকে বোঝার ভার সহ হয়ে আসে। নামবার সময় নিজেকে সহজ লাগে।

নিউ মার্কেটে রীনা নিজের জন্যে দু'একটা টুকিটাকি জিনিস কিনে বিমলেন্দুর জন্যে একটা ছোটো পাইপ ও লাইটার কেনে। বিমলেন্দু প্রথমটা বুঝতে পারেনি—ভেবেছিল কর্তার জন্যে গিন্নির মতো মনোযোগ দিয়ে পাইপ কেনা। সঙ্গে সঙ্গে একটা অদ্ভুত ঈর্ষায় বিমলেন্দু স্বভাবসিদ্ধ নৈরাশ্য বোধ করে। ওর মনে হয়, একটু আগে পুটিয়ারীর রাস্তায় মুহূর্তের দুর্বলতায় রীনা ওকে প্রশ্রয় দিয়েছে—এখন কর্তার দিকে কেমন তন্ময়। পাইপলাইটার হচ্ছে পুটিয়ারীর রাস্তায় রীনার দুর্বলতার প্রায়শ্চিত্ত। ঐ বস্তু দু'টোর মধ্য দিয়ে রীনা তার অনুগত্য জানাচ্ছে আর বিমলেন্দুকে নিজের সীমা বুঝিয়ে দিচ্ছে। মুহূর্তের নৈরাশ্যে রীনার সমস্ত সৌন্দর্য যেন ওর কাছে আকর্ষণ হারিয়ে ফেলে। ভাবল ডি. এর টাকাটা পেয়েই রীনার টাকাটা শোধ দিয়ে দিতে হবে। কারণ তা হ'লে রীনাকে কঠিন কথা বলবার অধিকার পাবে। কিন্তু দাম দেবার পর রীনা যখন বিমলেন্দুর দিকে ফিরে বলল—অনেকদিনই আপনাকে একটা পাইপ প্রেজেন্ট করবার ইচ্ছে ছিল। তাই আজ কিনলাম—আর লাইটারও। কারণ ঐ দড়ি থেকে সিগারেট ধরানো আমি দু'চোখে দেখতে পারি না। অভিভূত বিমলেন্দু আমতা আমতা করে বলল, কর্তার জন্যে কিছু কিনছেন না। একটু পরে নিজেকে সামলে জানাল, আজকের দিনটি আমার জীবনের একমাত্র স্মরণীয় দিন—অনেক কিছু পেলাম। আমি তো সারাক্ষণ সিগারেট খাই—সব সময় পাইপটি লাগবে—প্রতিবার পাইপ দেখলে ... আপনাকে ভুলবার আর কোনও পথ রইল না।

নিউমার্কেট থেকে চৌরঙ্গী রোডে আসবার পথটিতে লোকজন বিশেষ ছিল না—দুজনেই ঘেঁষাঘেঁষি করে আসছিল।

রীনা বলল—আপনাকে এই যে সামান্য জিনিস দুটো প্রেজেন্ট করলাম—এখবর শুধু আপনার আর আমার।

বুঝেছি। জানি, তবে আমি বলতেও পারব না।—না বলে থাকা খুবই কষ্টকর হবে আমার পক্ষে। ঐ একটা রবীন্দ্রসঙ্গীত আছে, অঙ্কের মাস্টারের তা শোনা আছে। কি যেন 'পরতে গেলে লাগে আর খুলতে গেলে বাজে'।

—ওঃ রীনা খুব আস্তে গুনগুন করে ঐ গানের সুরটি ভেঁজে নিল একবার চারদিক তাকিয়ে।

রীনা বলল—চা বা কফি হবে? চলুন না?

বিমলেন্দু রাজি হয় না। একে ওর হিসেবী মন। এমনিতে রীনা ওর জন্যে এত খরচ করছে দেখে সঙ্কুচিত হয়ে আছে, তাই আর খরচ করতে দিতে চায় না। তাছাড়া হয়তো চা কফি এসব জায়গায় খেতে অনেক খরচ—ওরও নিজের থেকে কিছু খরচ দেবার জন্য অফার করা উচিত। নইলে নিজেকে বড্ড অনুগৃহীত মনে হয়। অথচ ওর পকেটের প্রতিটা পয়সা হিসেব করা। সেখান থেকে কিছু খরচ করা সম্ভব নয়। আবার চা কফির জন্যে ওর কোনও লোভ নেই—শুধু কিছুটা রীনার সঙ্গ পাবার লোভ রয়েছে—হয়তো চা বা কফি খেলে তা পাওয়া যাবে—হয়তো আর একটু ঘনিষ্ঠতা। কিন্তু বেশিক্ষণ থাকতে লোভও যেমন হয়, তেমনই আবার ভরসাও হয় না। হয়তো রীনা কর্তার সম্পর্কে এমন গুণগান করে বসবে যার ফলে এতক্ষণের সব মোহ ধূলিসাৎ হয়ে সেই নৈরাশ্য দেখা দেবে। নিজের পুরোনো সঙ্গী এই নৈরাশ্যকে বড় ভয় বিমলেন্দুর। তাছাড়া ভেতরে ভেতরে রীনার হাত ধরবার একটা ব্যকুলতা ওকে পীড়িত করছিল। কিন্তু হাত ধরতে গেলে রীনার প্রতিক্রিয়া কী হবে তা ঠিক করতে পারছিল না। শুধু এটুকু বুঝেছিল, এখনো সেই অধিকার আসবার সময় হয়নি—ধৈর্য ধরতে হবে। কিন্তু এখন, কতক্ষণ পর্যন্ত, ওর আত্মসংযম থাকবে তাতে ভরসা পাচ্ছিল না, তেমনি মনের 'পরও না। হঠাৎ রীনার কোন সহানুভূতিতে অভিভূত হয়ে যদি আবেগে কথা বলতে গিয়ে স্বরভঙ্গ হয়, কি কণ্ঠে কান্নার আভাস ফুটে ওঠে, কি কথা বন্ধ হয়ে যায় আর তা যদি রীনা বুঝতে পারে—তবে বড্ড বিশ্রী ব্যাপার হবে। অথচ, সভয়ে বিমলেন্দু লক্ষ্য না করে পারছিল না। রীনার কাছ থেকে আরো কিছু প্ররোচনা বা উস্কানি পাবার জন্যে একটা প্রত্যাশাও রয়েছে। চলে না যাবার অনিচ্ছাও আস্তে আস্তে দৃঢ় হয়ে উঠছে। মনে হচ্ছে, এই মুহূর্তে রীনার সঙ্গ থেকে বঞ্চিত অবশ্য হওয়া যায়। যে কোন চার নম্বর বাস দেখলে লাফিয়ে উঠলেই হল—এ আর এমন কী কঠিন—তারপর যে একা সেই একা—বরং রীনার সঙ্গই দুর্লভ অভিজ্ঞতা। ওর কাছ থেকে চলে যাবার পরের শূন্য মুহূর্তগুলো শুধু বিমলেন্দুর মন নিঃসঙ্গতার উপর বিতৃষ্ণাই জাগিয়ে তোলে না বরং সেই অনিবার্য ও আসন্ন নিঃসঙ্গতাকে যতক্ষণ সম্ভব দূরে ঠেলে রাখা যায় ততক্ষণই লাভ। মনে হয়, রীনা ওর জন্যে এত করেছে তাই চা বা কফির অফার অমন ভাবে প্রত্যাখ্যান করা ঠিক হয়নি—হয়তো না খেলে দুঃখ পাবে। হয়তো প্রস্তাব প্রত্যাখ্যানের জন্যে অপ্রস্তুত হয়েছে। কিন্তু রীনাকে আরও খরচ করতে দিতে বিমলেন্দু চায় না। নিজের কিছু দেওয়ায় তো সম্ভব নয়—

এখানে চা কফি খাওয়া তো আর দু'চার দশ পয়সার ব্যাপার নয়। রীনার জন্যে এর আগে এতগুলো মিষ্টি কিনল—অথচ রীনা খেল না—পয়সাগুলো বৃথা গেল। ওটাও হিসেবের বাইরে। বিমলেন্দু নিজেকে বোঝাল, অফার করলেই তক্ষুণি রাজি হয়ে যাওয়া কাঙালের লক্ষ্মণ। রীনা মিষ্টি না খাবার ফলে অর্থ অপব্যবহারের শোক বিমলেন্দুর মনে আবার উঁকি দেয়। ঠিক করে, চা বা কফি না খেয়ে তার বদলা নেওয়া যেতে পারে।—

এমনি একটা প্রস্তাব বিমলেন্দু যেই মুহূর্তে করতে যাচ্ছিল ঠিক সেই সময়েই একটা প্রায় খালি চার নম্বর বাস এসে দাঁড়াতেই বিমলেন্দু খালি বাস দেখে লোভ সামলাতে না পেরে 'আচ্ছা চলি' বলে প্রায় অর্ধচেতনভাবে দৌড়ে এসে বাস-এ ওঠে। বাসের সিঁড়ির ওঠবার সময় রীনার দিকে তাকাতেই রীনা হাত নেড়ে বিদায় সম্ভাষণ জানায়। হাত নাড়ার পরিবর্তে বিমলেন্দু কী করবে ভেবে না পেয়ে মাথা নাড়ে। বাস খালি ছিল—বিমলেন্দু ময়দানের ধারের দিকে জানলার কাছে সিট খালি দেখে সেখানে ছুটে যেতেই মনে পড়ে এধারে রীনা রয়েছে—তক্ষুণি এধারে একজনের পাশে বসতে গিয়ে মনে হয় রীনাকে মাত্র একমিনিট দেখা যাবে তার জন্যে জানলার কাছে সিট ছাড়া—উঁকি দিয়ে রীনাকে দেখতে গিয়ে দেখল রীনার উজ্জ্বল সিঁদুরের রেখার 'পর রোদ পড়ে চক্‌চক্ করছে—বিমলেন্দু তাকাতে ভরসা পাচ্ছিল না। চা বা কফি খাবার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে রীনাকে ম্লান করে দেওয়া হয়েছে, বিদায় না নিয়ে চলে আসবার কিছুমাত্র প্রস্তুতি না করে, এভাবে চলে আসা নিতান্তই অশোভন হয়েছে। তারপর রীনার হাতনাড়ার উত্তরে মাথা নাড়াও এক ধরনের গ্রাম্যতা—তাও বিমলেন্দু করেছে—রীনাকে অপ্রতিভ করেছে, রীনার কাছ থেকে এভাবে চলে আসায় অভদ্রতা করেছে। অথচ রীনা ওর জন্যে অনেক করেছে—এমনকি আজ এত দামী উপহার পর্যন্ত দিয়েছে—ধার থেকে উপহার সবই দিয়েছে—কেউ ওর জন্য এত করেনি। চরম সুযোগ নষ্ট করবার একটা গ্লানিতে বিমলেন্দু ছট্‌ফট্ করতে থাকে। বার বার রীনার চক্‌চক্ করা সিঁদুরের রেখা মনে করে বৃথাই আত্মপক্ষ সমর্থনের চেষ্টা করে। আবার তারিফ করে পাইপ ও লাইটারটা দেখে। লাইটার একবার জ্বালিয়েও দেখল। তারপর চোখ বুজে ঘুমোবার চেষ্টা করল—লম্বা পথ। মনে পড়ল, পুঁটিয়ারীর রাস্তায় রীনার কাছ থেকে পাওয়া একটি দুর্লভ মুহূর্ত। লম্বা পথে বিমলেন্দু বসবার জায়গা পেলে তক্ষুণি ঘুমিয়ে যাবার ক্ষমতা ওর আজন্ম। আজ কিন্তু ঘুম এল না—সমস্ত রাত ভাই-এর পাশে জেগে থাকা সত্ত্বেও আজ ওর ঘুম এল না। পুঁটিয়ারীর রাস্তায় ওকে কাছে পাবার আনন্দ ও ধর্মতলায় বিদায় বেলার অস্বস্তি পালা করে ওর চেতনায় ঢেউ তুলতে থাকে। অবশেষে একসময় তন্দ্রার মতো আসে কিন্তু আধা-স্বপন ও আধা জাগরণে রীনার উজ্জ্বল চক্‌চক্ করা সিঁথির সিঁদুরের রেখা ওকে আতঙ্কে জাগিয়ে দেয়।

রীনা ভারি আশ্চর্য হয়। না, হঠাৎ বিমলেন্দু ওভাবে দৌড়ে বাসে উঠে পালাবার জন্যে নয়। ওর আশ্চর্য লাগে, ওতো অনায়াসে বিমলেন্দুর সঙ্গে যেতে পারত—ফেরবার তো একই পথ—শুধু রীনা অনেক আগে নেমে যেত এই যা। কিন্তু বিমলেন্দু একবার বলল না। এড়াতে চাচ্ছে? চা বা কফিওতো খেল না? কী হল? হঠাৎ চকিতে পুঁটিয়ারীর রাস্তায় বিমলেন্দুর আবেগে কথা বলতে না পারবার চিত্র ওর মনে ভেসে ওঠে—সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎ বিমলেন্দুর চলে যাবার একটি কারণ যেন রীনার মনে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। ওর প্রশ্রয়ে বড্ড বেশি কাতর হয়ে পড়েছিল—নিজের দুর্বলতাকে আর প্রকাশ হতে না দেবার জন্যেই পালিয়েছে। রীনার সামনে নিজেকে ঠিক রাখতে না পারবার ভয়ে দৌড় দিয়েছে। বীরপুরুষ! বেচারী। পুঁটিয়ারীর রাস্তার মুহূর্তগুলো মনে পড়বার সঙ্গে সঙ্গে পুঁটিয়ারীর বোমা, পুলিশ, রিকশা সব একসঙ্গে ভেসে ওঠে। কল্যাণকে বলতে হবে।

বাব্বা কি বিপদেই না পড়া গিয়েছিল। জনবহুল চৌরঙ্গিতে দাঁড়িয়ে অনেক নিরাপদ মনে হয়। কল্যাণকে বলতে হবে। কল্যাণ শুনে কী রকম ভয় পাবে তার আগাম চিত্র ওর মনে উঠতে গিয়ে উঠতে পারল না। দুবার চেষ্টা করেও কল্যাণকে ভাবতে পারল না। ওর কেমন ভয় হতে লাগল। হঠাৎ মনে পড়ল, বিমলেন্দুকে পাইপ কিনে দিয়েছে, লাইটার দিয়েছে, বিমলেন্দুর সামনে অন্তরঙ্গভাবে গুনগুন করে গান করেছে। ধরা পড়ে গেছে বিমলেন্দুর কাছে। প্রকাশ্য ভাবে ওর রূপের সমঝদারিতে বিমলেন্দুকে নেমতন্ন জানিয়েছে। ওর সব জেনে ফেলেছে বিমলেন্দু। বিমলেন্দুর কাছে ও প্রকাশ হয়ে গেছে। বিমলেন্দুর কাছে নিজেকে ওর বেজায় নির্লজ্জ মনে হয়। আর এই নিজের নির্লজ্জ হবার চিন্তা মুহূর্ত মধ্যেই অসহ্য মনে হচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে মনে হয়, কল্যাণ হারিয়ে গেছে—দূরে চলে গেছে—ওর নাগালের বাইরে চলে গেছে। চেষ্টা করেও কল্যাণের চিত্র মনে আনতে পারছে না। যদি বা কল্যাণের হাসিমুখ মনে এল—তাও যেন হারানো অতীতের স্মৃতি বলে মনে হয়। কেবল মনে হয়, কল্যাণকে পাওয়া যাবে না। কল্যাণের হাসি মুখ ওর মনে আরও অধীরতা এনে দেয়। এক্ষুনি কল্যাণের হাসিমুখ দেখে কল্যাণকে ফিরে পাবার ও নিজের নিরাপত্তার জন্য গভীরভাবে উৎকণ্ঠিত হয়ে ওঠে। বিমলেন্দুর স্মৃতি পুঁটিয়ারীর স্মৃতি, বাসের স্মৃতি,পাইপ-লাইটার দেবার স্মৃতি, চা কফি খাবার স্মৃতি সব কিছু যেন কল্যাণের 'পর অবিচার, অন্যায়, বিশ্বাসঘাতকতা। চা কফির নেমতন্ন করে রীনা যেন বিমলেন্দুর সঙ্গ কাঙালভাবে কামনা করছে। ভালোই হয়েছে বিমলেন্দু চড় মেরেছে—চলে গেছে। না, এখন বাসায় যাওয়া যায় না। গিয়ে কী করব? বিমলেন্দুর স্মৃতির হাত থেকে বাঁচবার জন্য এক্ষুনি কল্যাণকে দেখে আসা দরকার। কল্যাণ ঠিক আছে দেখে রীনা আশ্বস্ত হতে চায়। নিরাপত্তা বোধ করতে চায়, ওর সংসার ঠিক আছে এ বিষয়ে নিঃসংশয় হ'তে ইচ্ছে করে। কল্যাণের হাসিমুখ দেখে বিমলেন্দুর স্মৃতিকে মিথ্যা ও মায়া করতে চায়। স্বীকার করতে চায় না। কাছেই কল্যাণের অফিস। খুব আশ্চর্য হবে। ক্যলাণের হাসিখুশি চেহারা এখন রীনার পক্ষে খুব দরকার। ওর হাসিখুশি চেহারা ও উজ্জ্বল কথাবার্তার মধ্য দিয়ে রীনা স্বাভাবিক হতে চায়। ধর্মতলার তিক্ত দুপুরের হাত থেকে আজকের পুটিয়ারী আর বাস-যাত্রার নির্লজ্জ সকালের হাত থেকে কল্যাণের স্নিগ্ধ শীততাপ-নিয়ন্ত্রিত পুরু কাচের অভ্যর্থনা ঘরের আশ্রয় ওকে হাতছানি দিতে থাকে প্রবলভাবে। এই শেষ। অনেক অন্যায় কল্যাণের 'পর করেছি। আর নয়, এই শেষ। বিমলেন্দুর সঙ্গে আজকের দুপুরই শেষ দুপুর। না হয় চাকরি ছেড়ে দেব, গান-বাজনা নিয়ে থাকব। আর নয়। বিমলেন্দুকে আর নয়। এ দুপুরই শেষ দুপুর। গভীর আবেগ, স্নেহ ও উৎকণ্ঠা নিয়ে রীনা কল্যাণের অফিসের দিকে রওনা দিল।

রীনাকে দেখে কল্যাণ শুধু আশ্চর্য হল না—শঙ্কিত হল। হঠাৎ স্কুল ছেড়ে অফিসে যে! কী ব্যাপার! অফিস থেকে কেউ কিছু জানায়নি তো? কোন বেনামী চিঠি টিঠি—বা ফোন টোন? স্কুলে ফোন নেই, ফ্ল্যাটে ফোন নেই—ওর বাচাল বাপ অবশ্য কিছুকাল হ'ল ফোন নিয়েছে—সেই গল্পও কল্যাণ অনেকের কাছে করেছে—অবশ্য শ্বশুরের গর্বে গর্বিত হবার জন্যই—আর কেউ কেউ ওর শ্বশুরের নামও জানে—আর না জানলেও কোন অফিসে কী পোস্টে চাকরি করে তা অনেকেই অনেকবার কল্যাণের কাছে

শুনেছে—সুতরাং এখান থেকে ফোন করে রীনার বাবার অফিসে যোগাযোগ করা অসম্ভব কিছু নয়। বাড়িতে ফোন করে থাকলে আর ফোন পেয়ে যদি কোনও কুটুম্ব স্কুলে গিয়ে সংবাদ দেয়। দেবার লোকের অভাবতো নেই অফিসে। লোকের সর্বনাশ করবার ইচ্ছে হচ্ছে এক ভয়ঙ্কর ইনসপিরেশন। ..... কিন্তু মেজাজ তো বিষণ্ণ, বিরক্ত, ঈর্ষার জ্বালায় দগ্ধ মনে হচ্ছে না। কৌশলে মাথা ঠাণ্ডা রেখে সব কিছু জেনে নিতে চায়। যদিও কল্যাণ মনে মনে সায় দেয় না। তবুও সায় না দেওয়াকে নিছক ইচ্ছাপূরণের চিন্তা হিসাবে অগ্রাহ্য করে। বাপের যা দারোগাগিরি করা স্বভাব—আর মেয়েদের কাছে বাবা হচ্ছে পুরুষের মডেল। রীনার মা'র কাছে রীনার বাবা পুরুষের মডেল কি না বলা শক্ত।

—খুব আশ্চর্য হয়েছ না?

—মনোরম ভাবে আরাম করে ঠকে গেলাম।

—ভাবতেই পারছ না?

—আশ্চর্য হবার প্রেমে পড়ে গেছি। রীনা স্নিগ্ধভাবে কল্যাণের দিকে তাকায়।

কল্যাণ এবার কপট স্বরে জানায়—স্কুল পালিয়ে প্রণয়ীর অফিসে হানা দেওয়া হচ্ছে গার্জিয়ানের কাছে রিপোর্ট করতে হয়।

গার্জিয়ান কী করবে? শাসন করবে?

খুব গলা নামিয়ে কল্যাণ জানায়—হ্যাঁ শাসনই তবে সোহাগ করে।

রীনার চোখ মুখে কেমন একটা ক্লান্ত হাসি খেলে যায়। সে হাসিতে যেন কোনও আনন্দ ছিল না। পরিষ্কার বুঝতে পারছিল ও হেসেছে কথাটির চমৎকারিত্বের জন্যে, ভিতরকার ইঙ্গিতের জন্যে নয়। কিন্তু রীনার সব কিছুই এলোমেলো গণ্ডগোল মনে হয়। ওকে দেখে কল্যাণ যে আশ্চর্য হয়েছে, আশ্চর্য হয়ে খুশি হয়েছে—একথা যেন তৃপ্তভাবে অনুভব করতে পারছিল না। গোড়াতেই কল্যাণের আশ্চর্য হয়ে খুশি হওয়াকে মেনে নিয়েছে—অথচ ভেতরে তাকে না পারছে মেলাতে, না ভেতর থেকে পাচ্ছে সায়, না পাচ্ছে খুশি হওয়াকে মেনে নিতে—অথচ ভেতরে তাকে না পারছে মেলাতে, না ভেতর থেকে পাচ্ছে সায়, না পাচ্ছে খুশি হওয়াকে অগ্রাহ্য করতে। আজ কল্যাণের কথাগুলোর ভেতরে যেন ঠিক প্রাণ পাচ্ছে না, চোখ মুখের সেই উত্তাপ যেন নেই। অথচ কী যে কল্যাণের ভেতরে নেই তাও রীনা ঠিক বুঝে উঠতে পারছিল না। বিমলেন্দুর যে নিরব ও মুগ্ধতায় এতক্ষণ অভ্যস্ত হয়েছিল তাই যে কল্যাণের মধ্যে খুঁজছিল ঠিক তাও না। কল্যাণকে দেখবার পর থেকেই, কল্যাণ ঠিক আছে এ কথা অবচেতন প্রতিজ্ঞায় যেন কাহিল হয়ে পড়েছিল—তদুপরি ওর অন্তরের বন্দি খুশিকে যেন কল্যাণ ঠিক উদ্ধার করতে পারিছল না। তাই কল্যাণকে দেখে আশ্বস্ত হয়েছিল কিন্তু খুশি হতে না পারায় যেমন আশ্চর্য তেমনি অস্বস্তি বোধ করছিল। বিমলেন্দুকে পরিত্যাগের চিন্তায় যন্ত্রণা বোধ করছিল অথচ কল্যাণের অভ্যর্থনার মধ্যে প্রাণ না পেয়ে নিজের অক্ষমতাকেই দোষী মনে করে ব্যথা পাচ্ছিল। অথচ স্পষ্ট করে কিছু বুঝতেও পারছিল না। তাই নিজের অস্থিরতা ঢাকবার প্রয়োজনে তাড়াতাড়ি এখানে আসবার কারণ বলতে শুরু করল। যদিও বিমলেন্দুর জায়গায় প্রথম বলল 'কোলিগ' তারপর

ভাবে বোঝাল কোন সহকর্মিনী। শেষ ওকে ধর্মতলা পর্যন্ত এগিয়ে দিল। একটু নিউমার্কেট ঘুরে শিক্ষিকা বিদায় নিল। ওর এখনও বুক কাঁপছে। যে ভাবে পটপট করে বোমা ফাটাল—পুলিশের ভ্যান—মানুষের দৌড়াদৌড়ি—সত্যি আমাদের এরিয়াটা অনেক পিসফুল। হাতে-পায়ে যেন জোর ছিল না—কি বুক কাঁপুনি। বাব্বা! যা ফাঁড়া একটা গেল। বলতে বলতে ওর মনের স্বাভাবিক উজ্জলতা ফিরে পায়—মনের জটিলতার অস্থিরতা ও বেদনা আস্তে আস্তে নেপথ্যে অন্তর্হিত হয়—তবুও তাদের অস্তিত্বের ক্ষত একটু একটু খচখচ করে—কিন্তু রীনা সেদিকে নজর দেয় না। নিজের খুশি হওয়াকে প্রাণপণে আঁকড়ে ধরে নিজের খুশির মুহূর্তে কল্যাণ খুশি কি না তা চিন্তা না করে কল্যাণকেও খুশিতে উদ্বুদ্ধ করতে চায়।

মধুর হয়ে বলে, আমি বুঝতেই পারছিলাম না, কেন ফ্ল্যাটে না গিয়ে এসপ্ল্যানেডে এলাম—কেন অযথা নিউমার্কেটে ঘুরলাম—শেষে এখানে এসে বুঝলাম কেন এসপ্ল্যানেডে আসা প্রয়োজন ছিল। বুঝলাম কোথায় আমার শেলটার রুম। বুঝলাম কোন ঠিকানার জন্য নিউমার্কেটে অযথা কি যেন খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম—কথা ক'টি রীনা আন্তরিকতার সঙ্গে বলল। নিজেও বিশ্বাস করল এই মুহূর্তে সত্যি কল্যাণের কাছেই আসবার জন্যেই এসপ্ল্যানেডে এসেছিল—বিমলেন্দুর জন্যে পাইপ কিনতে নিউমার্কেটে আসেনি। বিমলেন্দুরও পাইপ কিছুই ওর মনে এল না। কল্যাণের 'পর নিজের অনুগত্য গভীর ভাবে অনুভব করে রীনা নীরবেই উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। উচ্ছ্বাস মনের মধ্যে অবাধে চলাফেরা করতে থাকায় রীনা ভারি নিশ্চিন্ত ও নিরাপদ বোধ করে। উচ্ছ্বাসের নির্বিঘ্ন যাতায়াতে মন স্বাধীন হবার আনন্দ উপলব্ধি করে তৃপ্ত হয়।

কল্যাণের মন আজ লাঞ্চের পর থেকে ভালো ছিল না। লাঞ্চের সময় রমার সঙ্গে দেখা করতে গেলে—তখন রমা শুধু এক টুকরো মুখ রাখা রিসেপসনিস্টের হাসি হেসে তক্ষুনি মুখ থেকে হাসি মুছে ফেলে অন্যদিকে মন দিল। কল্যাণ দাঁড়াল না। পাশ দিয়ে চলে গেল। অপমান ও অর্ন্তর্জালায় ঘরে এসে বসে জর্জরিত হতে লাগল। রমা শুধু একজন সিনিয়ার অফিসারকে যতটুকু মূল্য দিতে হয় ততটুকুই দিচ্ছে—এ বিষেয়ে রমার ভুল হয় না কখনো। কিন্তু তার বেশি কিছু দিতে আজ আর রাজি নয়। নিজে রমার এতটুকু প্রসন্ন মনের প্রত্যাশায় ওর কাছে গিয়েছিল ভেবে নিজেকে ভারি খেলো ও হ্যাংলা মনে হচ্ছিল। ঠিক আজকে রমা ওকে যেমন অপমান করেছিল তেমনি ভাবে কী করে রমাকে অপমান করা যায়—কীভাবে রমাকে তুচ্ছ ও প্রকাশ্যে অগ্রাহ্য করা যায় সেই চিন্তায় কল্যাণ অধীর হয়ে উঠেছিল। রমা নিষ্ঠুরভাবে প্রকাশ্যে মুখ থেকে হাসিকে মুছে ফেলে দিল—হাসি মুছে ফেলাটি ইচ্ছে করেই ওর অপ্রসন্নমনের প্রচার—ওর আগামী ব্যবহারের আগাম সংবাদ। তবুও তো আমি আবার যাব—ওর একটু খুশির জন্যে, ওর একফোঁটা কৃপণ হাসির জন্য, ওর একবিন্দু কৃতার্থ করা চাহনির জন্যে ..... কোথাকার সোফিয়ালরেন .....আমি ওর মূল্য বাড়িয়ে দিয়েছি.....আমি ওর দম্ভ আকাশে তুলে দিয়েছি....ঠিক আছে আমিই আবার তা মাটিতে নামাব ....আমার নামও কল্যাণ চ্যাটার্জি। অবশ্য কল্যাণ কী করে যে ওর দম্ভ গুঁড়িয়ে দেবে তা অবশ্য ভাবতে না পেরে আরও ক্ষুব্ধ ও উত্তেজিত হয়। নিজেকে বোঝায়, মাথা ঠাণ্ডা করে ওকে জব্দ করবার প্ল্যান

করতে হবে—বুদ্ধিমান লোক ধীরে-সুস্থে ঠাণ্ডা মাথায় সুযোগের অপেক্ষা করে—সুযোগ এলেই ক্যাক করে টুটি টিপে ধরে। অনেক সহ্য করেছি—আরও যদি ওকে সহ্য করি—তবে অপমানিত হওয়াই আমার উচিত—ওর কাছে লাঞ্ছনাই অবহেলাই আসা উচিত। আর আমল দেবে না—তাই প্রচার করে অগ্রাহ্য করা....কে ওর আমল চায়...কোথাকার কে...বড্ড বেশি মূল্য দিয়ে ওর মাথা গুলিয়ে দেওয়া হয়েছে আর সবচেয়ে বেশি আমিই করেছি....সব প্রশংসা ওকে করেছি সবগুলো বিশ্বাস করেছে...এই তো হচ্ছে ওর কালচার....মেন্টাল স্ট্যামিনা। বেশ খোঁচা মেরে কথা বলতে জানে—যেন বিশ্বশুদ্ধু সকলেই ওর কাছে গরুচুরি করেছে। বিশ্বশুদ্ধু সকলেই ওর মূল্য বুঝতে পাচ্ছে না—কল্যাণ কি বিবাহিতা না হলে রমার কাছে ঘোরাফেরা করত? ঠিক এমন ধরনের ইঙ্গিত প্রায় কথাতেই থাকত। ওঃ, আমি যে বিয়ে করেছি এই ক্রাইম একবিন্দুও রমা ভুলতে পারে না। হঠাৎ রীনার কথা মনে পড়ে। স্কুল-স্কুল করেই গেল—ওর মনের সবটা যেন স্কুলেই পড়ে থাকে—সেখানে আর পাঁচটি মেয়ের সঙ্গে আড্ডা দিতে না পারলে—গয়না অলংকার ফ্রিজ আর গ্যাসের গল্প আর মার্কেটিং-এর গল্প করতে না পারলে তো জীবন বৃথা—এক জায়গায় ক'দিন গিয়ে আড্ডা দিলে এমন নেশা হয়—চাকরির নামে রীনাকে এমনি নেশায় পেয়েছে—এ জন্যেই চাকরি করা মেয়ে বিয়ে করলে....। কল্যাণ মুহূর্তে সচেতন হয়ে ভাবল, রীনার সঙ্গে রমার কোন তুলনাই চলে না—রীনা যেমন সুইট, তেমনি শান্ত, ভদ্র—ওর চোখ দু'টো সুন্দর তাই ওর সুন্দর চোখে বিশ্বও সুন্দর—ওর চোখের ভেতর দিয়ে দেখলে এক শান্ত সুন্দর ভালো পৃথিবীর সন্ধান পাওয়া যায়। আস্তে আস্তে কল্যাণের তাপ কমে। হয়তো কোনও কারণে রমার মনও খারাপ হতে পারে। হয়তো কোনও কারণে কারো কাছে অপমানিত হয়েছে সে জন্যই হয়তো আমার 'পর অভিমান করল—আজকের হাসিকে মুছে ফেলা হয়তো ভবিষ্যতে আমল না দেবে—হয়তো আপনার 'পর ক্ষোভ আমার 'পর অভিমানের প্রকাশ করেছে—হয়তো বাড়িতে আজ ঝগড়া করে এসেছে—হয়তো বিয়ের সম্বন্ধ এসেছিল, রমা হয়তো নাকচ করে দেবার জন্য বাসায় ঝগড়া...। এমনি সময় রীনা স্লিপ পেয়ে শঙ্কিত হয়ে উঠল। মুহূর্তে মনে হল—একদিকে রমার প্রকাশ্য অগ্রাহ্য করা, ওর সঙ্গে সম্বন্ধ ছিন্ন করার বিজ্ঞাপন অন্যদিকে সেই অফিসেই রীনার আবির্ভাব? কোন ষড়যন্ত্রটন্ত্র হয়নি তো? হয়তো রমা তা জানতে পেরেই রীনার আগে থেকেই সম্পর্ক ছিন্ন করল—কিংবা কৌশলে আমল না দিয়ে কল্যাণকে সতর্ক হবার জন্যে ইঙ্গিতে জানিয়ে দিল—কিংবা রমার অগ্রাহ্য করা হয়তো শত্রুদলের কাছে রমার আত্মসমর্পণ—তাদের কাছে ভালো থাকতে চাইল—কিংবা তাদের কাছে দেওয়া কোন প্রতিশ্রুতি পালন অর্থাৎ আর কল্যাণের সঙ্গে না মেলামেশার প্রতিশ্রুতি পালন। কিন্তু রীনা কী করতে এল—রমাকে দেখতে? রমার সঙ্গে আমার মেলামেশার তদন্ত করতে? রমার সঙ্গে বা আমার সঙ্গে ঝগড়া করতে অফিসে কেন?

গভীর স্বস্তিতে কল্যাণ জানায়, কি টাইফয়েড রোগীর বাড়ি। এ বছর এখনও টি. এ. বি. সি নাওনি যে! —তুমিও নাওনি তো।

—গুড। ঠিক বলেছে তোমার হলে আমারও হবে—শোধবোধ। তা যাকগে তুমি

আমার মত পুরোনো স্বামীকে নিউমার্কেটে খুঁজছিলে কেন? আমরা তো ওল্ড কোর্ট হাউস স্ট্রিটের কোটিং করা লোক —

—যাঃ।

কল্যাণের মন থেকে যে দুশ্চিন্তার ও শঙ্কিত হবার অনুভূতি চলে গেল তাই নয়, রীনার আবেগ ওর অন্তরঙ্গ অশ্রু-সজল করে তুলল। নিজের অশ্রু-সজল মুহূর্তগুলোতে ভারি অস্বস্তি ও নিজেকে বেজায় অপরিচিত লাগে বলে কল্যাণ তাড়াতাড়ি যা হোক কিছু রসিকতা শুরু করেই বুঝল, রীনাও কিছু আবেগতপ্ত মাধুর্যের প্রত্যাশায় রয়েছে।

- আজ অফিসকে সুন্দর মনে হচ্ছে।

রীনা একটু সস্নেহ হাসি হাসল। সেই হাসিতে যেন অনুরাগ বা আবেগের ছোঁয়া ছিল না। ঠিক আবার মামুলি হাসিও ছিল না—হাসিতে প্রাণের ঔজ্জ্বল্য ছিল না ঠিকই—কেমন যেন একটু বিষাদ হাসি, বিষণ্ণ হাসি। তারপর সেই বিষণ্ণ-হাসি মুখেই রীনা যেন ভাবতে ভাবতে বলে, যত সুন্দরই হোক—ক'দিন দেখলে সুন্দরও গা-সওয়া হয়ে যায়। কল্যাণ সঙ্গে সঙ্গে বলে, সেজন্যে কিছুক্ষণ বাদ দিয়ে দেখা দরকার—ঘোমটা ছিল সেইজন্যেই বোধ হয়। সুন্দরকে দেখবার পর একটু ইন্টারভেল দরকার—আমাদের অফিস হচ্ছে সেই ইন্টারভেল। মেয়েরা আর ঘোমটা দেয় না, বদলে অফিসে যায়। স্কুলে, কলেজে চাকরি করতে যায়। ফলে ইন্টারভ্যাল লম্বা হয়ে যাচ্ছে—ঘোমটার পর্দা উঠতে উঠতে ছ'টা বেজে যায়।

মাথা নাড়ে রীনা—সুন্দরের হাত থেকে কোথাও রেহাই নেই—অফিসে, স্কুলে, কলেজে সব জায়গায় ছড়িয়ে রয়েছে।

ইন্টারভ্যাল নেই—শুধু বৈচিত্র রয়েছে।

কল্যাণ যেন কেমন একটু ম্লান হয়ে যায়—দূর—কোথায় সুন্দর—সে সব সুন্দরের নকল—ইমিটেশন। আসলে সুন্দরের মতো সুন্দর হ'লে সেখানে ইন্টারভ্যাল দরকার হয় না, ওভারটাইম ক্লান্তি নেই। যেমন—বলেই কল্যাণ নিচের ঠোঁট দিয়ে রীনাকে দেখিয়ে দিল।

প্রসন্ন ও উজ্জ্বল মুখে হাসতে হাসতে অস্বীকার করে রীনা। কিন্তু অস্বীকারের মধ্যেই কল্যাণের প্রশংসার স্বীকৃতি মধুরভাবে স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

কল্যাণের একটু অবাক লাগল। রীনা সাধারণত কথাবার্তা একটু কম বলে মানে আর পাঁচটা মেয়ের তুলনায় বকবক করে অনেক কম। তর্ক করেই না। মাঝে মধ্যে অবশ্য রীনার কথা বলবার মুড থাকে—তখন যেন প্রাণের আবেগে একটু উত্তেজিত হয়ে বেশ কিছুক্ষণ এক সঙ্গে বলে যেতে পারে। সেই কথাবার্তায় কল্যাণ লক্ষ্য করেছে, বেশ কাণ্ডজ্ঞান ও যুক্তিবুদ্ধি থাকে। কিন্তু আজ লক্ষ্য করল, রীনা প্রয়োজনে বেশ তর্ক করতেও পারে। তাছাড়া যেন কল্যাণের প্রশংসার একটা প্রতিবাদস্পৃহাই ছিল আজকের সকল কথার মধ্যে লুকিয়ে। অন্যান্যদিন কল্যাণের অতিশয়োক্তিগুলোর চমৎকারিত্বই শুধু অনুভব করবার—প্রশংসাগুলো গ্রহণ করবার নয়। এমন ভাব থাকত। কিন্তু আজ যেন একটা প্রচ্ছন্ন প্রতিবাদ। কল্যাণের অতিশয়োক্তিগুলোকে চ্যালেঞ্জ করবার ইচ্ছে। ব্যাপার কী?

প্রশংসাগুলোর অযৌক্তিকতা দেখবার নাম করে রীনা কি বোঝাতে চাচ্ছে কল্যাণের প্রশংসাগুলো আন্তরিক নয়! না, এ হচ্ছে বিনয় করে সলজ্জ প্রতিবাদ? তাও নয়। কেমন একটা খেদ ও বিষণ্ণতা রয়েছে রীনার গলায়? রীনার কি ধারণা হয়েছে, ওর রূপের প্রশংসার নাম করে কল্যাণ যে কত সুন্দর কথা বলতে পারে—কত চমকানো চমকানো কথা বলতে পারে তারই পরীক্ষা শুধু হয়—রীনার রূপের প্রশংসা করবার সুযোগ নিয়ে নিজের আত্মপ্রচার করে কল্যাণ—এসব কি ভাবছে রীনা? কিংবা কল্যাণের বিদ্যাবুদ্ধির আধিপত্য এতকাল সহ্য করবার পর এবং রীনা নিজেও এবার নিজের বুদ্ধি ও যুক্তির প্রতিষ্ঠায় সচেতন? অতি তাড়াতাড়ি কল্যাণের মনে এ চিন্তাগুলো খেলে গেল। কিন্তু কল্যাণের প্রশংসাগুলোকে বিচার করার অদরদী মনোভাবে কল্যাণ একটু দমে গিয়েছিল। এই দমে যাবার অনুভূতি ওকে মুহূর্তে রমার কথা মনে করিয়ে দিল। নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছে রীনাকে, হয়তো চেনেও। রীনাকে খুঁটিয়ে লক্ষ্য করে রমা নিশ্চয়ই ইনফিরিওরিটি কমপ্লেক্স বোধ করছে। আজকে কল্যাণকে অগ্রাহ্য করবার একটা জবাব পেয়ে নিশ্চয়ই জ্বলে যাচ্ছে রমা—একথা ভেবে কল্যাণ একটা শান্ত উচ্ছ্বাস বোধ করে, সঙ্গে সঙ্গে রীনার 'পর প্রসন্ন হয়ে ওঠে। কিন্তু এক মুহূর্ত পরই ওর মনে পড়ে, একে আজ হয়তো ওর মন খারাপ ছিল বলে আমার 'পর অভিমান ছিল—তারপর রীনাকে দেখে হয়তো হীনতাবোধ আর ঈর্ষার যদি আমার 'পর আরও....। রমা হয়তো আরও কঠিন ও শীতল হয়ে যাবে রীনাকে দেখবার পর থেকে—একথা ভেবে কল্যাণ অশান্তি বোধ করে। আর আগের মুহূর্তের উচ্ছ্বাসটিকে মনে মনে খুঁজে বেড়ায়।

রীনা একটু ক্ষুণ্ণ হয়েছিল গোড়া থেকেই। এমন একটা বিপদ গেল—বোম-পুলিশভ্যান- দৌড়দৌড়ি—সেই জন্যেই কি ভীষণ বুক কাঁপুনি রীনার অথচ তাতে কল্যাণের কোনও প্রতিক্রিয়া নেই। অথচ কত কী হবে—মধুর শাসন, আন্তরিক উৎকণ্ঠা, কত প্রশ্ন—কত রকম উদ্বিগ্ন ও ব্যস্তসমস্ত প্রতিক্রিয়া। অথচ কল্যাণ এবিষয়ে একদম নীরব, শীতলভাবে নীরব। যেন, এসব কিছুই ঘটেনি। যেমন সবিস্তারে বলবার এমন উদাসীন প্রতিক্রিয়া রীনার মনে হতে থাকে সূক্ষ্মভাবে। সেই বঞ্চনার বেদনা চেতনার অগোচর ছিল বলেই কল্যাণের রূপের প্রশংসাগুলোকে ওর ভালো লাগলেও আমল দিতে ইচ্ছে হচ্ছিল না। তাই একটু বিষণ্ণতার সঙ্গে প্রতিবাদ করল। প্রথমে মনে হল—একথা মনে করে লজ্জা পেল—কিন্তু মুহূর্তে তা ভুলেও গেল। শেষে মনে হল, মনে করে তৃপ্তিই পেল। ওকে দেখলে ওর সৌন্দর্য কল্যাণকে এত অভিভূত করে—ও আর অন্য কিছু ভাবতে পারে না। বড্ড সুন্দর সুন্দর করে, বাবার বাতিকে। রীনা স্নেহে ও অনুরাগে কল্যাণকে অভিসিক্ত করে।

—তোমার তো ছুটি হতে সেই পাঁচটা।

—তোমার অনারে আজ আগেও ছুটি হতে পারে।

—সত্যিই?

কল্যাণ মাথা নেড়ে সায় দেয়।

সঙ্গে সঙ্গে কল্যাণের মনে হয় যদি রীনাকে নিয়ে রমার চোখের 'পর দিয়ে গটগট করে কল্যাণ বের হয়ে যায়—তবে রমার আজকের ব্যবহারের বেশ একটা মুখের মতো

জবাব হয়। চিত্রটি কল্যাণকে বেশ উল্লসিত ও উত্তেজিত করে তোলে। নিজের এই উল্লাস ও উত্তেজনা কতক্ষণ থাকবে ঠিক নেই—কল্যাণের ইচ্ছে এই মুহূর্তেই রীনাকে নিয়ে বের হয়ে যায়। কিন্তু এই মুহূর্তে চলে যাবার কথা না পারে রীনাকে বলতে, না পারে চলে যাবার ইচ্ছেটির কাছে আত্মসমর্পণ করতে। রমাকে এমন আঘাত দিতে সাহস হয় না। যদি রমা আরো কঠোর হয়ে যায়। আরো শীতল? যদি এই ঘটনার জন্যে ওর সঙ্গে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করে? পরিষ্কার করে স্পষ্ট ভাষায় একথা কল্যাণ ঠিক যে চিন্তা করল তা নয়—বিদ্যুতের মতো চিন্তাগুলো এক একবার দেখা দিয়েই চেতনা থেকে বিদায় নিল। কল্যাণ আর উঠতে পারে না। শুধু তাই নয়, রমার উপর রাগ করবার সময় মনের যে জোর ছিল—এখন তা অনুভব করতে না পেরে নিজেকে ভারি অসহায় লাগে। একটু ক্ষোভ অবশ্য আছে—কিন্তু ক্ষোভও ঠিক ক্ষোভের মত নয়—রমার সঙ্গে সম্পর্কটি ঠিক করবার জন্যে ইতিমধ্যেই ব্যকুলতা দেখা দিয়েছে। রীনার জন্যে যদি আজ ওকে অবহেলা করে চলে যেতে হয়—তবে জটিলতা বাড়বে। কল্যাণের সাহস হয় না। এরই মধ্যে রীনার সঙ্গে এতক্ষণ কথা বলবার জন্যে যেন রমার কাছে নিজেকে অপরাধী মনে হতে থাকে। যদিও এই অনুভূতিও অস্পষ্ট। তবুও অপরাধ চেতনার অস্তিত্ব কল্যাণ অগ্রাহ্য করতে পারে না।—তবে স্পষ্ট করে স্বীকারও করে না। কেবল ভয় হতে থাকে—রমা কি ভাবছে? কি যেন মনে করছে?

রীনা সপ্রসংশ কণ্ঠে বলে—একঘরে একা—কেমন আরামে অফিস করো—আমাদের মতো একগাদা মেয়ের সামনে বসে -

একগাদা মেয়ের সামনে- আমার খুব খারাপ লাগত না।

- লাগত না আবার। সব রোমান্স ফার্স্ট পিরিয়ডেই উড়ে যেত।

- এসো না বিনিময় করি। তুমি এসে বসো এই চেয়ারে—আমি তোমার ক্লাসে।

সপ্রশংস ভাবে ভীত হয় রীনা—ওরে বাবা—এই চেয়ারে আমি? তুমি অবশ্য আমার চেয়ে ভালোই পারবে। মেয়েরা তোমাকে পছন্দই করবে—অন্তত আমার চেয়ে বেশিই।

—আমাদের পুরুষ ডিরেক্টারও তোমাকে আমার চেয়েও বেশি পছন্দ করবে এমন গ্যারান্টি আমি দিতে পারি।

—আমাদের স্কুলে নেবে কি না বলতে পারি না—নিলে তুমি ছাত্রী-প্রিয় হবে—একথা জোর দিয়ে বলতে পারি।

—আমাদের অফিসেও নেবে কি না বলতে পারি না—নিলে তুমি অফিস-প্রিয়া হবে—এমন কথা জোর দিয়েই বলতে পারি তবে বলতে মন চায় না কারণ তাতে আমার বেজোড় হবার সম্ভাবনা।

—বলেছে তোমাকে।

পুঁটিয়ারীর রাস্তায় সেই বোমাবিস্ফোরণের সময় থেকে নিজের ফ্ল্যাটে গিয়ে নিরাপদ একটা অবুঝ তাগিদ রীনার অগোচরেই সক্রিয় ছিল। যতবারই রীনা অফিসে আরাম করে কুশনে হেলান দিতে চেয়েছে বা রাস্তায় বিমলেন্দুকে রেস্তোঁরায় বসে চা কফি খেতে ডেকেছে—ততবারই অশান্ত চিত্তে ফ্ল্যাট ওকে আকর্ষণ করেছে। অথচ যতবার ফিরবার সচেতন পরিকল্পনা করেছে তখনই শূন্য বাসায় নিজেকে কল্পনায় একা দেখতে বিতৃষ্ণা

লাগায় বাসায় ফিরবার কল্পনাকে গ্রহণ করেনি। তবুও ফ্ল্যাট আকর্ষণ করে চলেছে। সাধারণত স্কুল থেকে ফেরবার পথে যখন দেখতে পয়েছে, বিভিন্ন বাড়ির ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে গৃহিনিরা চুল বাঁধছে, বা রাস্তায় ওদের যারা দেখছে অথবা সদর দরজায় দাঁড়িয়ে কিছু কিনছে—তাদের মৃদুমন্দ চাহনি, অলস ভাবভঙ্গি, ঢিলেঢালা ভাবে ঘরোয়া করে শাড়ি জড়ানো—তখনই নিজের ফ্ল্যাটের ওপর তীব্র আকর্ষণ বোধ করেছে—নিজের সংসার মুহূর্তের জন্যে ওকে তীব্রভাবে হাতছানি দিতে থাকে -নিজের বাসা মধুময় হয়ে ওঠে। অবশ্য বাসায় পৌঁছতে পৌঁছতেই এ অনুভূতির কথা ভুলে যেত। আবার সারা দুপুর কাজকর্ম নেই—বসে বসে ঘরের রান্নাবান্না টুকিটাকি কাজ—এ যেন রীনা ভাবতেই পারে না। সকাল থেকেই স্কুলের দিকে টানতে থাকে—ভিড় ঠেলে বাসে উঠতে হয় তখন মুহূর্তের জন্যে নিজেকে সৌখিন গঞ্জনা দেয়—আমার কপালে এই ভিড় ঠেলা আর শেষ হবে না। অথচ একা একা ফ্ল্যাটে বসে অলসভাবে দিন গুজরান—একথা চিন্তা করতেই ওর অন্তর বিতৃষ্ণায় ভরে যায়। আবার টিফিনের পরের পিরিয়ডগুলোতে—ফিফথ-সিক্সথ পিরিয়ডে নিজের ফ্ল্যাট ওকে হাতছানি দিতে থাকে। ছুটি নেয় না বলে আফসোসের অন্ত নেই অথচ ছুটি নেবার পরিকল্পনা কতবার যে ত্যাগ করেছে তার সীমা নেই। কল্যাণ একটা ফাইলে কী যেন নোট নিতে থাকে। রীনা কিছুক্ষণ সেইদিকে তাকিয়ে রইল। ওর মনে হল—মনের তাপ উত্তাপ যেন কমে আসছে—সেই বিমলেন্দুর সঙ্গে ব্যাঙ্কে দেখা পাওয়া, পুঁটিয়ারী যাওয়া, অসুস্থ ভাইকে কেন্দ্র করে সেই গল্পগাথা, পুঁটিয়ারীর পথে বিমলেন্দুর আবেগ-স্তব্ধ রোমান্টিক মুহূর্ত, সেই বোমা-পুলিশ ভ্যান—রিকশায় ঠাসাঠাসি করে বসা, বাসের সেই দীর্ঘপথ—নানা চিন্তা নিউমার্কেট—বিমলেন্দুর হঠাৎ অন্তর্ধান—কল্যাণের অফিসে প্রবেশ করার সময় নার্ভাসনেস, কল্যাণের সঙ্গে তর্কবিতর্ক—এতক্ষণের একটানা উত্তেজনা এবার যেন জুড়িয়ে যেতে বসেছে—মন যেন ঝিমিয়ে আসছে। চারদিক কি নীরব, নিস্তব্ধতা। কী শান্তি। প্রচণ্ড ঘর্মাক্ত গরমের পর ফ্যানের বাতাসে দেহ যেমন আস্তে আস্তে জুড়াতে থাকে—দেহ যেমন শান্ত হয়ে আসে তেমনিভাবে জুড়ানো মন রীনাকে একটা শান্তি এনে দেয়। এতক্ষণের উত্তেজনায় হয়রানির হাত থেকে অব্যাহতি পেয়ে রীনা একটা অনাস্বাদিত শান্তি পায়। এই শান্ত শীতল মুহূর্তটি রীনা একটু একটু করে আস্বাদন করতে থাকে। ওর ভারি ভালো লাগে। এই ভালো লাগাটিও উগ্র নয়—যেমন নম্র, তেমনি মৃদু। কিন্তু রীনার অগোচরেই এই জুড়িয়ে যেতে দিতে মনেরই কোথায় যেন আপত্তি রয়েছে, ভিতরকার কটা সূক্ষ্ম বাধা একেবারে জুড়িয়ে যেতে দিতে চাচ্ছিল না। রীনা সে সম্পর্কে সচেতন ছিল না। এই মুহূর্তটি দীর্ঘ করবার একটা বাসনাও জাগে। সূক্ষ্ম বাধাটি আত্মপ্রকাশ করল। হঠাৎ রীনার মনে হল—ফ্ল্যাটে একা একা বসে বিমলেন্দুর কথা ভাবা যাবে। ঠিক যে এই ইচ্ছাটিকে রীনা ভাষার সাহায্যে ভাবল তা নয়—ফ্ল্যাটে একা বসে বিমলেন্দুর কথা ভাবছে এই চিত্রটি অস্ফুটভাবে বিদ্যুতের মতো চেতনায় প্রকাশ পেয়েই নেপথ্যে চলে গেল। রীনা সঙ্গে সঙ্গে লুব্ধ হল। একা ফ্ল্যাটে ফেরবার আকাঙ্ক্ষা বোধ করতে লাগল। অথচ কল্যাণের সঙ্গে ফিরবার লোভও ত্যাগ করতে ইচ্ছে হচ্ছিল না। যদিও সেই ইচ্ছার আকর্ষণ অনেক শিথিল হয়ে গিয়েছিল—তবুও সেই দুর্বল আকর্ষণ প্রাণ ধরে ছেড়ে

দিতে রীনা পারবে না। রীনার জুড়ানো মনে আবার অস্বস্তি ও অস্থিরতা অল্প অল্প মৃদু মৃদু আন্দোলিত হতে থাকে। আপনা থেকেই বিমলেন্দুর কণ্ঠ যেন শুনতে পায় 'আজকে আমার জীবনের এক স্মরণীয় দিন, সঙ্গে সঙ্গে প্রলুব্ধ মন কথাটি নিয়ে একা একা ভাববার জন্য রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে। পুঁটিয়ারীর রাস্তায় বিমলেন্দুর মুখ মনে এল—বাসে বসে রীনা বিমলেন্দুর জন্যে যে আন্তরিক বেদনা ও সহানুভূতি অনুভব করেছিল তা মনে পড়ল—এই দুটি মুহূর্ত ভালোভাবে অনুভব করবার জন্যে ফ্ল্যাটের একা ঘরটিকে দারুণ ভাবে টানতে লাগল। অথচ কল্যাণকে না নিয়ে ওঠবার ইচ্ছাকে ছাড়তে মন চায় না।

কল্যাণ নোট লিখতে লিখতে বলে—ছাত্রীরা আজ তাহলে তোমার দর্শন থেকে বঞ্চিত হল।

রীনা ঘড়ি দেখল এখন ফিফথ পিরিয়ডের মাঝামাঝি—ক্লাস 'সেভেন। রীনা বলল—বঞ্চিত হবে কেন? আমার পিরিয়ডে আর কেউ যাবেন। বরং নতুন মুখ দেখবে মানে ঠিক নতুন মুখ নয়—অন্য পিরিয়ডে অবশ্য তাকে পায়। তবু আমার পিরিয়ডে নতুন—এই অর্থে।

- হুঁ, রোজকার দেখা সুন্দর মুখ, না, নতুন অসুন্দর মুখ কোনটি মানুষ, মানে মেয়েমানুষ চায়? অবশ্য একটু আগে তুমি বুঝিয়ে দিয়েছ—সুন্দরও গা সওয়া হয়ে যায়—সুতরাং তুমি নতুন মুখের ফেভারেই।

—আমি কিন্তু —

রীনা কী যেন প্রতিবাদ করতে যাচ্ছিল। পিয়ন এসে একটা ফাইল দিয়ে গেল—কল্যাণ তাকে দুটো ফাইল দেখিয়ে দিল। ফাইল দুটো নিয়ে পিয়ন চলে গেল।

—আমি বোধ হয় তোমার কাজের ক্ষতি করছি।

—কোন চিন্তা নেই, তুমি রোজ অফিসে আসছ না।—তোমার ব্যস্ত হবার কোনও কারণ নেই। অফিস রোজ থাকছে। আমিও বহুকাল থাকছি—কাজও এখনই ফুরিয়ে যাচ্ছে না।

—আজ আমার জীবনের এক স্মরণীয় দিন। রীনা বলে ফেলল। কথাটি বলবার একটা ব্যাকুলতা অনুভব করছিল—কথাটি আত্মপ্রকাশের তৃপ্তি খুঁজছিল। বলবার ঠিক আগের মুহূর্তে ঠিক করল, বোমা খুন এসব অর্থেই যেন বলল কথাটি।

কল্যাণও তাই বুঝল—দিনটি এখনও শেষ হয়নি।—রাতটি আগাগোড়া বাকি। বুঝলে স্মরণীয় চ্যাটার্জি?

রমা হয়তো ভাবছে, স্বামী-স্ত্রী খুব গল্প করছে—বেশ ভাব আছে—গাছেরও খাবে তলারও কুড়াবে। কল্যাণ মনে মনে অস্থির হয়ে ছটফট করে রীনার সঙ্গে বাসায় ফেরবার প্রস্তাবকে কী করে পাশ কাটানো যায়—কী করে রীনাকে এখনকার মতো বিদায় দেওয়া যায়—অথচ তা নিষ্ঠুর হবে না—ক্রুর হবে না—অত্যন্ত সহজ ও স্বাভাবিক হবে—এমন কিছু মতলব বের করবার জন্যে কল্যাণ একটা ব্যাকুলতা বোধ করে। কিন্তু পরিবর্তে ওর মাথায় আসে এক চিত্র—ও যেন রমাকে আগামিকাল বলছে, মিসেসের বাপের বাড়িতে একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেছে—তাই আমাকে সঙ্গে নিয়ে যাবার জন্যে অফিসে এসে বসেছিল—ঐ মিসেসের এক ভাই মোটর সাইকেলে চড়ে যাচ্ছিল সে

সময় একটা ট্রাম—পা অ্যামপুট করতে হবে কি না আটচল্লিশ ঘণ্টা না গেলে বলা যাচ্ছে না। মুখখানাকে সিরিয়াস করে রাখতে হবে। চিত্রটি ওকে উল্লসিত করে তোলে। নিজেকে মনে মনে বলে বেচারী রীনা ভয় পেয়ে আমার কাছে এসেছে—নিজের মুখেই বলেছে শেলটার রুম—এত করে আশ্রয় চেয়েছে, না ওকে একা যেতে দিতে দেওয়া যায় না—অসম্ভব। আবার রীনার সঙ্গে ফ্ল্যাটে সেই ঘ্যান ঘ্যান প্যান প্যান—ভাবতেই কল্যাণের চিত্ত বিতৃষ্ণায় ভরে ওঠে।

—তোমার অফিসে এ বোধ হয় আমি দ্বিতীয়বার এলাম, তাই না?

—প্রথমবার ছিল অবিস্মরণীয় দিন। দ্বিতীয়বার হল স্মরণীয় দিন। তৃতীয়বার কী হবে? রমণীয়, না দুর্দিন?

এ সময় একটা ফোন এল। কল্যাণ ফোনটি ধরে কাকে যেন আসতে বলল। তার পর ফোনটি নামিয়ে বলল—অন্যান্যদিন এত ফোন আসে—আজ তুমি আছ বলে কেউ ফোন করছিল না। আমি যে একটা কাজের লোক তা তোমাকে দেখাতে পারছিলাম না কোন ফোন না আসায়। এতক্ষণে -

এ সময়ে একজন কেতাদুরস্ত ভদ্রলোক ঘরে ঢুকে বলল—হ্যালো কেসি, আজকের ডেসপ্যাচে—

কল্যাণ আগন্তুক ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচয় করাল—মিঃ মৃত্যুঞ্জয় ব্যানার্জি—অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার—মিসেস।

ভদ্রলোক হাতজোড় করে একই সঙ্গে নমস্কারও 'কে' করলেন।

রীনা হাতজোড় করে প্রতিনমস্কার করল।

ভদ্রলোক বলতে লাগলেন—মিসেস চ্যাটার্জি আমি একই সঙ্গে ইংরেজি ও বাংলায় আপনাকে গ্রিট করলাম। আপনি এই বো ও নমস্কারের যে কোনও একটি নিতে পারেন—দুটোকে নিলে আমি খুশি হব আরও—আমার ডিম্যান্ড কমপ্লিটলি ফুলফিল হচ্ছে। আমি দুটোই করে থাকি—শুধু বিভিন্ন রকম রুচির মানুষকে স্যাটিসফাই করবার জন্যেই নয়। ঐ দুটো কেন করলাম তার ব্যাখ্যা করেই প্রথম আলাপের কাজটা বেশ এগিয়ে যায়।

ছলছল করে রীনা হেসে ওঠে।

মৃত্যুঞ্জয় ব্যানার্জির বয়েস পঞ্চাশের ওপিঠে। উজ্জ্বল-কালো চেহারা মাথার সামনের দিকে ইউ-কাটের আকারে এক বিরাট টাক। খুদে খুদে চোখের সঙ্গে বেমানান এক বিরাট লম্বা নাক ঠোঁটের 'পর আছড়ে আছড়ে পড়েছে। ফিটফাট পোশাকের মধ্যে দিয়ে যেন নিজের কালো রঙের সংশোধনের আপ্রাণ চেষ্টা।

—থ্যাঙ্ক ইউ, ধন্যবাদ—আপনি আমার অ্যাটিচ্যুড অ্যাপ্রুভ করেছেন। প্রতিনমস্কার করে আমার নমস্কারকে অনার করেছেন—'বো' যদিও ফেরত দিলেন না—অতটুকু লস আমার সইবে কেন না আপনি বেশ রেসপনসিভ। রীনা সলজ্জ মুখে সম্মতির হাসি হেসে ভদ্রলোকের দিকে তাকাল। ভদ্রলোক সলজ্জ হাসির সৌন্দর্যটুকু সম্পূর্ণ উপভোগ করলেন।

কল্যাণ যেন মৃত্যুঞ্জয় ব্যানার্জির চোখ দিয়ে রীনার সৌন্দর্য দেখতে লাগল। এইটে

কল্যাণের একটা অভ্যাস। বাইরের বন্ধু বান্ধবের সামনে রীনাকে রেখে রীনাকে দেখতে অনেক ভালো লাগে। তাদের মুগ্ধ চোখে রীনাকে দেখেও যেন রীনাকে নতুন করে আবিষ্কার করে। পর-পুরুষের চোখ দিয়ে কল্যাণ রীনাকে নতুন করে দেখে। এই দেখায় রীনাকে ওর অনেক ভালো লাগে।

আপনার সঙ্গে এই প্রথম আলাপ। আপনাদের বিয়েতে যেতে পারলে ঐ একগাদা লোকের মধ্যেও আমি বো ও নমস্কার করে আপনার সঙ্গে পাকা পরিচয় করে নিতুম—বো আর নমস্কার হচ্ছে আমার সাইনবোর্ড। বাই-দি-বাই কেসি. তোমার ফ্ল্যাটের জন্যে ফোন স্যাঙ্‌শন হয়ে গেছে।

—ইস ইট—?

এবার রীনা উজ্জ্বল মুখে একবার কল্যাণের দিকে তাকায়।

কল্যাণ মুখে ফোন আসবার সংবাদে এমন ভাব করল খুশি হয়েছি তবে খুশি হওয়াকে প্রকাশ করলে হ্যাংলামো হবে বলে গম্ভীর থাকলাম। কিন্তু খবরটি সত্যি কল্যাণকে অপ্রসন্ন করে তুলল। এরপর থেকে কোন কিছু হলে বেনামী ফোন করে যে সে রমাকল্যাণ সম্পর্ক সম্বন্ধে রীনাকে ফ্ল্যাটে ফোন করে জানাতে পারে। ফোন অফিস থেকে ওর পাওনা ছিল। তা নিয়ে মামুলি চেষ্টা ছাড়া আর কোনও উদ্যোগই কল্যাণ করেনি। যদিও ফোন আসবে একথা ভাবতে ভালো লেগেছে। কিন্তু ফোনের এই বিপদ সম্পর্কে ও সচেতন ছিল। অবশ্য রীনাও স্কুলে থাকে দুপুরে—তাও অফিসের অনেকেই জানে—বিকেলেও করতে পারে। অফিস শেষ হবার পরে যে কোন জায়গা থেকে কল্যাণের ফ্ল্যাটেই ফোন করতে পারে—তখন তো রীনা এসে যায়—রীনা কত আগে আসে—তাছাড়া দুপুরেও তো রীনার পরিচয় করে দিতে আগে ওর আপত্তি ছিল না—কিন্তু এখন আছে। মৃত্যুঞ্জয়দাকে ওর ভয় নেই—তাকে আসতে দেখে ওর কোন দুশ্চিন্তাও হয়নি—অন্য অনেকের বেলায় তা আছে। একটা আতঙ্ক ও অপ্রসন্নতা কল্যাণকে আস্তে আস্তে গ্রাস করছে। কল্যাণের মনে হচ্ছে, অফিসে রমা-কল্যাণের সম্পর্ক ফাঁস করে দেবার জন্যে ফোন যেন চর হিসাবে, স্পাই হিসাবে ওর ফ্ল্যাটে যাচ্ছে।

—আমি তো বেশ বিনা চেষ্টায় ফোন পেয়ে যাচ্ছি—কী ব্যাপার?

—যে কটা ফোনের জন্যে রিকুইজিসন ছিল—বড়সাহেব নাকি টেলিফোন অফিসে ফোন করে জেনেরাল ম্যানেজারকে এক কড়া রিমাইন্ডার দিয়েছেন—ফলে ম্যাজিকের মত....।

—স্টাফের রেসিডেন্স ফোনের জন্যে বড় সাহেব পারসনালি রিমাইন্ডার দিয়েছেন, স্ট্রেঞ্জ।

—পাগলা সাহেবের পক্ষে আশ্চর্য বলে কিছু নেই। আমার মনে হয় সেলসের মিত্তির ফোনের জন্যে তাগাদা দিচ্ছিল—হয়তো বড় সাহেবের কানে গেছে—বুড়ো তক্ষুনি...।

—সম্ভব। কল্যাণ ভয়ংকর গম্ভীর হয়। ওর অস্বাভাবিক গাম্ভীর্য মুহূর্তে রীনার চোখেও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। রীনা আশ্চর্য হয়। কিন্তু কল্যাণের গম্ভীর হওয়ার কারণ থাকতে পারে না বলে নিজের আশ্চর্য হওয়াকে রীনা স্বীকার করে না। ও নিয়ে মাথা ঘামায় না। রীনা একটা কথা বলবার জন্যে ছটফট করছিল। কবে পর্যন্ত ফোন আসতে পারে। কিন্তু

জিজ্ঞাসা করাটা ভদ্রজনোচিত হবে কি না—কল্যাণের পক্ষে মর্যাদাজনক হবে কি না বুঝতে না পেরে চুপ করে থাকে। ফোন আসবে শুনে ওর এত আনন্দ হয়েছে—যখন তখন বাপের বাড়ির সঙ্গে কথা বলা যাবে—ফ্ল্যাটে থাকলে কল্যাণের সঙ্গে অফিসে—উঃ স্কুলের ওরা—নন্দিনী মিনতি শুনলে হিংসেয় জ্বলে পুড়ে মরবে। রীনা একা একা ফ্ল্যাটে বসে বিমলেন্দুর কথা চিন্তা করবার আকাঙ্ক্ষায় ভুলে গেল। শুধু মনে হয়, গ্র্যান্ড হবে—উঃ কবে আসবে ফোন। বাবাকে জানাতে হচ্ছে। খুব খুশি হবে।

—কে.সি. ক্যাল গ্যাসের যে নোটিসটা দিয়েছে—এখনও যা ডেসপ্যাচে রয়েছে—সেই বিলের কপিটা ওরা পাঠিয়ে দিয়েছে—এখন ডেসপ্যাচ থেকে চিঠিটা ফেরত আনতে পার অথবা—

তার চেয়ে ওদের ধন্যবাদ দিয়ে নোটিসটা ক্যানসেল করে আরেকটা চিঠি দিয়ে দিচ্ছি ডেসপ্যাচে দেওয়া চিঠি ফেরত আনতে—

—হ্যাঁ অনেক কাটাকাটি করতে হবে। তোমার প্রোপজালই বেটার। যাকগে আরেকটা কথা, তুমি বোধ হয় ঘেরাও হচ্ছ। উল্লাসে উত্তেজনায় কল্যাণ সোজা হয়ে বসে—কবে, কবে?

মুহূর্তে রীনার মুখ শুকিয়ে যায়। ঘেরাও, সর্বনাশ। টেলিফোন প্রাপ্তির আনন্দময় সংবাদ মুহূর্তে মন থেকে মুছে যায়। মনের আনন্দময় চিন্তাটি চলে গেল—কিন্তু অনুভূতির রেশ তখনও লেগে রয়েছে—সেই জায়গায় দুশ্চিন্তাকে ঠিক গুরুত্ব দিয়ে উপলব্ধি করতে পারছে না অথচ বুক কাঁপতে শুরু করেছে।

—সত্যিই মৃত্যুনদা ঘেরাও না হলে আর স্ত্রীর কাছে প্রেস্টিজ থাকছে না।

ভদ্রলোক রীনার দিকে তাকিয়ে ওর বিবর্ণ মুখ দেখে হাসতে গিয়ে থেমে গেলেন—আমি দুঃখিত মিসেস চাটার্জি এই সংবাদটি আজ প্রথম দিনেই আপনাকে দেবার জন্যে। তবে আজকাল অফিসারদের স্ত্রীরা ঘেরাওকে খেলোয়াড়ীসুলভ মনোভাবে মানে স্পোর্টসম্যান স্পিরিটে নিয়ে থাকেন।

—তুমি ঘেরাওকে স্পোর্টসম্যান স্পিরিট মানে খেলোয়াড়ীসুলভ দৃষ্টিভঙ্গিতে নেবে। ডিটেলস বলুন মৃত্যুনদা।

—চারজনকে ঘেরাও করবার কথা ইউনিয়ন চিন্তা করছে। তুমি একেবারে শেষে, ফোর্থ। কবে ঘেরাও করবে আর কতক্ষণ ঘেরাও করবে তা এখনও ওরা স্থির করেনি। তার আগেই তোমার রেসিডেন্সে ফোন এসে যাচ্ছে—ঘেরাও এর সময় ঘন্টায় ঘন্টায় বুলেটিন মিসেসকে জানাতে পারবে। তাছাড়া তোমার তো অ্যাটাচড বাথরুম রয়েছেই।

—তা হলে আমরা চারজন অফিসারই ঘেরাও হচ্ছি। ডিম্যান্ড অবশ্য বুঝতে পারছি—কিন্তু ওদের নেওয়া হবে না। ওরা তিনজনই একস্ট্রা টেমপোরারি—ডেলি বেসিসে অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল—ট্রাইবুনালে এই কেস টিকবে না। তাছাড়া ওরা তিনজনেই পার্টির ফুলটাইম ওয়ার্কার—অফিসে হাজিরা দিয়েই—

—সে আমি সবই জানি—বরং তুমি যা জানো না তাও জানি। তবু ওদের ধারণা ওদের সরকার -। কেরানিরাও জানে ওদের নেওয়া হবে না।—তবু দেখাতে চায় আমরা ঘেরাও করলাম, স্ট্রাইক করলাম—টিফিনে স্লোগান দিলাম—পোস্টার দিলাম—যত

হাতিয়ার আছে সবই ছুড়লুম। ট্রাইবুনালে ওরা যাবে না। তাছাড়া আসেপাশের সব অফিসে ঘেরাও হয়ে গেছে—আমাদের অফিসে শুধু টিফিনে ও ছুটির পর নিরামিষ স্লোগান—ওদের আর প্রেস্টিজ থাকছে না। শুনলাম, টুমরো একজন ভেটারেন ট্রেড ইউনিয়ান লিডার আসছেন।

রমা শুনে কী করবে? ঘেরাওয়ের দিনে কল্যাণ রমার চোখে কী রকম হবে? কল্যাণ বার বার মনে মনে ছবি আঁকল মুহুর্মুহু কল্যাণের সংবাদ নিচ্ছে। আজকে ঘেরাওয়ের বিষয় নিয়ে আগাম রমার সঙ্গে কথা বলা যেতে পারে। রমা নিশ্চয় শুনে থাকবে। ও তো ইউনিয়ানের মেম্বার। এ কথা চিন্তা করার সঙ্গে সঙ্গে রমার সাথে অফিসের পর আলাপ করবার জন্যে ওর চিত্ত উদ্দাম হয়ে উঠল। বরং রীনাকে আজকে ফেরত দেওয়া যেতে পারে। ঘেরাও এর ব্যাপারে ডিরেক্টারেদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে এমন কিছু বললে রীনা নিশ্চই মনে কিছু করবে না। তা ছাড়া রীনার দুশ্চিন্তা ও ভয়কে আর একটু বাড়িয়ে দিলে ও একা বাড়ি ফিরতে কিছু মনে করবে না। বুঝবে, একান্ত ইচ্ছা থাকলেও ওর সঙ্গে যেতে পারলাম না। মনে মনে কল্যাণ নিজেকে প্রতিশ্রুতি দেয়। আজ ছুটির পর রমার সঙ্গে আধঘন্টার বেশি কিছুতেই নয়। রমাকে বলব, রীনার বাপের বাড়ি একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। সেই সংবাদ দিয়ে আমাকে নিতে এসেছিল। ওবেলার একটা বিষণ্ন মুখ আমাকে যেতে দিল না।

তার হাসিমুখ দেখবার জন্যে চার-পাঁচ ঘন্টা ধরে ছটফট করে এসেছে। বিষণ্ন সকাল যেন প্রসন্ন বিকেলে শেষ হয়। অনেকক্ষণ পর কল্যাণ স্নিগ্ধ ও মাধুর্য বোধ করে আরাম পায়।

রীনার ভয় ভয় করে। পুটিয়ারীর রাস্তায় যেমন করে ছিল। এই অফিস ওর কাছে আর এক মুহূর্তের জন্যে নিরাপদ মনে হয় না। পারলে এক্ষুনি কল্যাণকে নিয়ে উঠে পড়ে। আর এক মুহূর্ত কল্যাণকে এখানে থাকতে দিতে এর মন চায় না। ওর ইচ্ছে হয়, এই বিপদের কথা এক্ষুনি গিয়ে বাবাকে বলতে। কেমন করে রীনা অবশ্য বুঝে নিয়েছে কল্যাণ বাবাকে তেমন পছন্দ করে না—কিন্তু বাবা ওকে এত ভালোবাসে। কল্যাণের এই আচরণ রীনার অদ্ভুত লাগে। এত খেয়ালি—যার 'পর সন্তুষ্ট তো আর কথা নেই—যাকে ভালো লাগল না তো তার কোনও গুণ থাকতে পারে স্বীকারই করবে না। রীনার বুঝতে বাকি থাকে না, নিছক রীনার মুখ চেয়ে কল্যাণ বাবাকে নিয়ে ঠাট্টা করে না। একথা রীনা স্পষ্ট করে চিন্তা করে না। কিন্তু এরকম অবচেতন ধারণা থেকে অব্যাহতিও পায় না। মা'র টান যে জামাইবাবুর দিকে। তা বলে কি মা ওকে পছন্দ করে না। এই যে ফোন আসছে—মা শুনলে খুশি হবে—কিন্তু বাবা চারদিকে প্রশংসা করে বেড়াবে। নিজে বরং বাড়িতে এসে সব দেখাশোনা করে দেবে। বাবার মতো এমন খুশি কে হবে। রীনা ফোনের আনন্দ আরেকবার অনুভব করেত গিয়ে বাধা পেল—বাবা শুনলে ভারি দুশ্চিন্তায় পড়বে। ওকে ঘেরাও করবে। বলছে বটে ঘেরাও তো ভয়ের কিছু নেই—ও তো বেশ খুশি। ওর খুশিতে দুশ্চিন্তাটি কেটে যাক রীনা তা চায় না। হয়তো আমাকে প্রবোধ দেবার জন্যে, সান্ত্বনা দেবার জন্যে এই লোকদেখানো জোর করা হাসি খুশি। .....ওরা পুরুষ মানুষ .....একটা উত্তেজনা হলেই হল—অন্য কিছু ভাবে

না। ফোনের আনন্দ পাছে ঘেরাও করবার ভয়কে তাড়িয়ে নিয়ে যায় সে জন্যে রীনা নানা রকম দুর্ভাবনার কথা চিন্তা করতে থাকে। ঐ যে বিমলেন্দু—ও কি ভয় পেল? পায়নি তো। রিকশা করতে চায় না।

রীনা ঠিক করে ফেলে, এই অফিস থেকে কল্যাণকে নিয়ে এখনই বের হতে পারলে কিছুটা নিরাপদও হওয়া যায়। যেদিন ঘেরাও হবে সেদিন ছুটি নিতে হবে। সেদিন স্কুল করতে পারব না। বিমলেন্দু বারবার কেন ছুটি নিচ্ছি জিজ্ঞেস করবে—হয়তো বলবে কাজের মধ্যে থাকলে মন ভালো থাকবে—বরং একা একা বাড়িতে অযথা ছটফট করবেন। রীনা ঠিক করে খারাপ লাগলেও একাই বাসায় থাকতে হবে—তা বিমলেন্দু যাই মনে করুক। সেদিন স্কুলে গেলে কল্যাণ কী মনে করবে? স্কুলই বড় হল। না বাপু, সেদিন স্কুলে যাওয়া কিছুতেই হতে পারে না। না, যাব না। বাবাকে খবর দিতেই হয়। কখন উঠবে? ওকে নিয়ে বের হতে পারলে বাঁচি .....হঠাৎ নিজেকে রীনার কেমন অপয়া মনে হয়। বিমলেন্দুর বাসায় গেলাম সেখানে বোমা, এখানে এলাম, এখানে ঘেরাও একটু মুষড়ে যায় রীনা।

—মিসেস চ্যাটার্জি, আপনি কিন্তু সেই থেকে একটা কথাও বলেননি। শ্রোতা স্ত্রী পাওয়া শুনেছি দুর্লভতম সৌভাগ্য—শ্রোতা হওয়া তো স্বামী হবার নূন্যতম যোগ্যতা। কে.সি. তো সবদিকেই ভাগ্যবান।

কল্যাণ জানায়—মৃত্যুনদা তাহলে আপনি এতক্ষণে স্বীকার করলেন মিসেসের মধ্যে কিছু পুরুষের ভাব রয়েছে।

—নো, নো,—একেবারেই না—মিসেসের নারীত্ব অত্যন্ত মুখর। আই মিন লাউড এন্ড ইলকোয়েন্ট।

—মৃত্যুনদা, ঘেরাওয়ের কোন টেনটেটিভ ডেট ফিক্সড করেনি তাহলে?

—তুমি তাগাদা দিয়ে তারিখ ঠিক করে নাও।

তিনজনেই হেসে উঠল।

রীনা জানায়—তুমি হাসছ, আমার ভীষণ ভয় করছে।

রীনার চোখে চোখ রেখে কল্যাণ বলে সেদিন আমার স্মরণীয় দিন হবে। ঘেরাও তোলবার পর বাকি দিনটা বাকি রাতটা স্মরণীয় হবে কি না বলা যাচ্ছে না।

তন্ময় হয়ে যেন মৃত্যুঞ্জয়বাবু এদের দেখছিলেন। এবার জানালেন—ঘেরাও কতক্ষণ চলবে তা তো বলতে পারছে না।

রাত হতে পারে—রাতভোর হতে পারে। তবে রিলে ঘেরাও হবে। ঘন্টায় ঘন্টায় এক এক দল এসে ঘেরাও করবে—আরেকদল বিশ্রাম করবে।

—ঘন্টায় ঘন্টায় ওরা এক এক জনকে ঘেরাও করুক না। একদল একজনকে ঘেরাও করবে—সেই দল তখন বিশ্রাম করবে—তখন যাকে ঘেরাও করছিল তিনি বিশ্রাম করবেন—আরেক দল এসে আরেক জনকে ঘেরাও করবে। ভদ্রলোক মাথা নাড়ল—আপনি তো বেশ লজিক্যাল কথাবার্তা বলতে পারেন। ঠিকই—যা বলেছেন তাই রিলে ঘেরাওয়ের লজিক্যাল পরিণতি হওয়া উচিত। কিন্তু মিসেস চ্যাটার্জি আমাদের পলিটিক্সে যুক্তি বলে কোনও জিনিস নেই।

কল্যাণের হাসিখুশি ভাব দেখে ঘেরাওয়ের ভয়কে রীনা রয়ে সয়ে আস্বাদন করে। ঘেরাওয়ের ভয়কে একটু একটু ভালোও লাগে। আমার তো ভয় করছে বাপু—এ যে এক কী হয়েছে দেশে? স্কুলে বলতে হবে—হেডমিস্ট্রেস—বিনীতা নন্দিনী....হিংসেয় ফেটে পড়বে—একে যখন শুনবে বাসায় ফোন আসছে ....আবার ঘেরাও ....মনে মনে ঘেরাওতে এমন কিছু হোক এ প্রার্থনা নিশ্চয় করবে। না, ঘেরাও হয়ে যাবার পর ওদের বলব। ....আগে বললেই বা কি। বেড়ালের শাপে যদি শিকে ছেঁড়ে তো হয়ে ছিল আর কি। বাসায় ফোন .....স্বামী ঘেরাও....বিমলেন্দ কি ভাববে? দমে যাবে? সঙ্গে সঙ্গে রীনার মনে পড়ল, বিমলেন্দু টাকা ধার নিয়েছে। মনে পড়বার সঙ্গে সঙ্গে রীনার মধ্যে একটা অদ্ভুত আনন্দ বিদ্যুতের মতো চকিতে দেখা দিল। ধার, ফোন ও ঘেরাও এর সংবাদ—রীনা যেন বিমলেন্দুর 'পর অধিকারের একটা তৃপ্তি ও উচ্ছ্বাস অনুভব করে। তবু বিমলেন্দুর অপ্রসন্ন ও বিমর্ষ মুখ—কেমন নিভে যাওয়া অপ্রস্তুত মুখ ওর কল্পনায় ক'বারই হানা দেয়। রীনা অস্বস্তি বোধ করে, ভাবে কখন যে কল্যাণ উঠবে তার যদি কিছু ঠিক থাকে। ওর আর এক মুহূর্ত থাকতে ইচ্ছে করছিল না।

রীনা ঘেরাওকে ভয় করছে দেখে কল্যাণের তৃপ্তি হয়। রমার প্রতিক্রিয়া জানতে ইচ্ছা করে। রমার সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছেকে মনে মনে স্বীকৃতির ফলে মন অনেক লঘু ও হাল্কা হয়। ঘেরাও হবার সুযোগে যদি রমার সঙ্গে ছুটির পর বেশ কিছুক্ষণ কাটানো যায়। রীনাকে বলতেই হবে, ফিরতে একটু দেরি হবে বুঝতেই পারছ—ঘেরাওয়ের ব্যাপার নিয়ে বড় সাহেবের সঙ্গে ডিরেক্টারদের সঙ্গে একটা কনফারেন্স করতে হল। মুখ-চোখে রীনা কনফারেন্সের কথা শুনে একটু অভিমান—অভিমান খেলা করবে। কল্যাণ মনে মনে ছুটির পর রমার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে ব্যস্ত হয়। রীনাকে একা যেতে দিতে এখন আত্মগ্লানি হচ্ছে না। শুধু ব্যাপারটি যেন নিষ্ঠুর না হয়—রীনা যেন কিছু মনে না করে—এটুকু হ'লেই কল্যাণ খুশি। শুধু তাই নয়, রীনাকে তুলে দেবার একটা ব্যগ্রতাও ওর মধ্যে বেশ সতেজ হয়ে উঠেছে।

—কে.সি. চলি তাহলে। চলি মিসেস চ্যাটার্জি। মৃত্যুঞ্জয়বাবু রীনাকে বো ও নমস্কার এক সঙ্গে জানিয়ে বিদায় নিল।

মৃত্যুঞ্জয়বাবু অন্তর্হিত হতে কল্যাণ একটু হেসে বলে, লোকটি একটু কমিক্যাল তাই না। তবে বড় ভালো। মেয়েদের দেখলে এত সম্মান ও সম্ভ্রমের সঙ্গে কথা বলে যেন বয়স্ক অবিবাহিত লোক।

—বিবাহিত না?

—নিশ্চয়ই। মৃত্যুনদারা হচ্ছে সেই রকম লোক যারা পরনারীর কাছে হাজির হলেই নিজেদের অবিবাহিত ছাড়া অন্য কিছু ভাবতে পারে না। পরস্ত্রী দেখলেই নিজে যে বিবাহিত একথা মনে থাকে না। আবার উল্টো কেসও আছে। হরিশবাবু অ্যাকাউটেন্ট মুখে সর্বদা স্ত্রীর কোটেশন—কথায় কথায় স্ত্রীর রেফারেন্স—হিজ্ মিসট্রেসস ভয়েস। এক মুহূর্ত স্ত্রীকে ভুলতে পারেন না। শেষ পর্যন্ত স্ত্রীর অবসেসনে তিনি ভুগছেন।

—মেয়েরা কিন্তু স্বামীর কথা একটু বেশি বলে।

—তারা তো সব কুমারী।

দু'জনেই চোখে চোখ রেখে হাসল।

খুব আদরের সুরে রীনা টেনে বলে—এই ও-ঠো।

—চলো। সঙ্গে সঙ্গে কল্যাণ উঠে দাঁড়ায়। অথচ বিশ্বাসই করতে পারছে না যে সত্যি সত্যি যাচ্ছে—সত্যি সত্যি উঠে দাঁড়িয়েছে।

- মাথা নেড়ে সাড়া দিয়ে রীনাও উঠে দাঁড়ায়। শাড়ি একটু টেনে টুনে যাবার জন্যে তৈরি হয়ে কল্যাণের দিকে তাকায়।

কল্যাণ আবার ধপাস করে বসে পড়ে—কেউ হাঁচি দিয়েছে বলে মনে হচ্ছে। বোসো বোসো।

—বাঁধা পড়ল? রীনা কিছু শুনতে পায়নি তা ছাড়া এরকম ঘরের বাইরে থেকে কিছু শোনা সম্ভব কি না তাও ওর ধারণা নেই—আমি তো কিছু শুনতে পাইনি। তা হোক বসি। আজকে কার মুখ দেখে বেরিয়েছিলাম—এখন ভালোয় ভালোয় বাসায় ফিরতে পারলে বাঁচি। যা একখানা দিন যাচ্ছে।

—স্মরণীয় দিন।

—বাকি দিন ও গোটা রাতটা তো বাকি পড়েই আছে।

কল্যাণের অস্থিরতা বাড়ে। কী করে রীনাকে কাটানো যায়? কিছুই মাথায় আসছে না। এবার আমি হাঁচি কাশি মানি এ ধারণাও রীনাকে দিয়ে দেওয়া হল। হয়তো ভাবছে, এতদিন কুসংস্কার নিয়ে হাসিঠাট্টা বক্তৃতা দিয়ে এখন ঘেরাও এর নামেই হাঁচিতে বিশ্বাস এসে গেল। কী করে রীনাকে এড়ানো যায়? না হয় ও বাপের বাড়ি গিয়েই ....। কল্যাণ ঘন ঘন রীনার পিত্রালয়ে যাওয়া পছন্দ করে না বলে আজকাল রীনা খুবই কম যায়। একটা পথ বের করতেই হয়। ওকে সোজাসুজি বাপের বাড়ি বিনা কারণে যেতে বলতেও কল্যাণের শুধু আত্মসম্মানে বাধে তাই নয়, ভয় হয়। হয়তো কিছু সন্দেহ করতে পারে। তাছাড়া এভাবে যেতে বললে রীনা এতো আশ্চর্য হবে—ভাববে হয়তো কল্যাণের কোন প্রিন্সিপল নেই।

—কেন বসলাম? কেউ হয়তো হাঁচি দিয়ে থাকতে পারে। নিশ্চয়ই দিয়েছে।

—সেকি, শোনোনি?

—না তো। কিন্তু এত দু'শ কোটি নাক পৃথিবীতে তাতে কেউ একটা হাঁচি এখন দেবে না—স্ট্যাটসস্টিক্যালি তা তো হবার নয়।

—এই কী হচ্ছে?

—হাঁচি দেবে আর তুমি শুনতে পাবে একেই যদি বাধা বলে তাহলে হ্যালুসিনেশানেও হাঁচি শুনতে পারি—নাক না থাকলেও চলে। তাহলে আর চেয়ার ছেড়ে ওঠা হবে না জীবনে কোনোদিনও।

—চলো—যাবে না? রীনা এবার উঠে দাঁড়ায়। আদেশের সুরে বলে—এই ওঠো তো ওঠো—ওয়ান টু—

লাফিয়ে চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ায়---নো থ্রি—তোমার আমার মধ্যে তৃতীয় পক্ষ নেই—স্টার্ট।

দু'জনেই একসঙ্গে বের হতে থকে। রীনা মৃদু স্বরে চোখ নামিয়ে বলে—থ্রি'এর

অন্য একটা মানে আছে।

—সে জন্যে খুব ব্যস্ত নাকি?

একটু হেসে রীনা চুপ করে থাকল।

মুহূর্তে কল্যাণের চোখে একটা ছবি ভেসে যায়। রীনার কোলে একটা ফুটফুটে বাচ্চা। রীনা তা হলে খুব ব্যস্ত থাকে—রীনাকে একেবারে নিমগ্ন করে দেবার পক্ষে এর চেয়ে ভালো কিছু হ'তে পারে না। রীনা চুপ করে থাকল—ওর ইচ্ছে আছে—যদিও ঠিক হয়েছিল আর কিছুকাল পরে, তবু রীনার ইচ্ছে রয়েছে, সম্মতি রয়েছে—মৌন রীনাই তার প্রমাণ। রমা কী ভাববে? মুহূর্তে শিউরে ওঠে কল্যাণ। ভাববে খুব খাতির স্ত্রীর সঙ্গে। কল্যাণ আর ভাবে না। ভাবতে চায়ও না। মুহূর্তে এই চিন্তাকে বাতিল করে দেয়।

বাচ্চা? নতুন অতিথি? রীনার সমস্ত শরীর রোমাঞ্চিত। ভয় ভয় করে—খুব দুর্বল লাগে। দিদি যখন ঐ ফুটফুটে বাচ্চা দুটো নিয়ে বাপের বাড়ি আসে। চলতে চলতেই রীনা মুহূর্তের জন্যে চোখ বোজে। বড্ড ভয় লাগে ....ওদের সন্তান ...নিশ্চয়ই সুন্দর হবে ...কার মতো দেখতে ....অনেকদিন স্কুলে যেতে পারবে না ...অনেক আদর বেড়ে যাবে ....ও কি করবে? বাচ্চা নিয়ে খুব হইচই নাচানাচি করবে তা তো এখনই বলা যায়। খরচ বেড়ে যাবে অনেক আর আয় কমে আসবে—ম্যাট্রিমনিয়াল লিভ....। এতদিন না দেখলে বিমলেন্দু খেপে যাবে ....মুহূর্তে মনে পড়ে ওর অনুপস্থিতিতে বিমলেন্দু তৃষ্ণার্ত দৃষ্টি নিয়ে নন্দিনীর দিকে ....ওর খেপে যাওয়াতে আমার বয়েই গেল....তার জন্যে আমার মা হতে বুঝি দেরি করতে হবে ....মনে একটা বিরক্তি আসবার জন্যে রীনা আগের ভয় করা দুর্বল ও ভালো লাগা অনুভূতিকে নিজের মধ্যে খুঁজতে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে মনে আসে। বিয়ের পর থেকেই ওর মা ও দিদি এমনকী ছোট বোনেরাও এমনি ধরনের একটা খবরের প্রত্যাশায় রয়েছে—উৎসুকভাবে মাঝে মধ্যে ওর দিকে তাকায়। বুঝতে পেরেও না বুঝবার ভান করতে হয়। কল্যাণের মনের কোন কথা আঁচ করা যায় কি না দেখবার জন্যে রীনা পূর্ণদৃষ্টিতে কল্যাণের দিকে তাকাল।

রীনার একঝলক পূর্ণ দৃষ্টিতে কল্যাণ অস্বস্তি বোধ করে। রমার পাশ দিয়ে যাবার সময় রীনা অমন করে তাকাল কেন? রমার দিকে একটা প্রসন্ন হাসি হেসে কল্যাণ রীনাকে নিয়ে বের হয়ে আসতে চাচ্ছিল। প্রসন্ন হাসিটি কল্যাণের তরফে এক ধরনের সিজ ফায়ার প্রপোজাল, প্রসন্ন হাসি দিয়ে রমাকে যেন মিনতি করছে ওর 'পর অসন্তুষ্ট না হতে—স্ত্রী নিয়ে যাবার জন্যে রমা যাতে কিছু মনে না করে প্রসন্ন হাসি হচ্ছে তারই ঘুষ। প্রসন্ন হাসি দিয়ে বোঝাতে চাচ্ছে রমা যে রাগ করেছিল কল্যাণ তা ভুলে গেছে। প্রসন্ন হাসির আবেদনের মধ্যে দিয়ে রমাকে সব মিটিয়ে ফেলতে অনুরোধ ও আবেদন। কিন্তু প্রসন্ন হাসির উত্তরে রমা শুধু একটু মাথা নেড়ে হাসিটি স্বীকার করল মাত্র—রিসেপশনিস্টের হাসি ছাড়া তাতে আর কিছু ছিল না। প্রসন্ন হাসির আবেদন নাকচ হবার অপমানে মুহূর্তে শক্ত হয়ে যায় কল্যাণ। যেন অপমানিত হয়নি এমন ভাব করে রমার দিকে আবার তাকায়। ততক্ষণে চোখ নামিয়ে নিয়েছে রমা। হাসিকে প্রত্যাখ্যান করবার অপমান যে কল্যাণ স্বীকার করেনি—ওর দেওয়া অপমানকে কল্যাণ স্বীকার করেনি—ওর দেওয়া প্রত্যাখ্যানের অপমানকে অস্বীকার করে ওকে বুঝিয়ে দেওয়া দরকার কল্যাণ চ্যাটার্জিকে

অপমান করা অত সোজা নয়। অপমানিত না হবার ভান করে রমার অপমানকে ব্যর্থ করে দেবার জন্যে দ্বিতীয়বার তাকাল। ততক্ষণে চোখ নত করেছে রমা। কিন্তু রমার অপমানকে বাইরে প্রত্যাখ্যান করবার চেষ্টা করলেও ভেতরে ভেতরে গুম হয়ে গেল। কিন্তু গুম হবার অবকাশ বিশেষ জুটল না। রীনার পূর্ণদৃষ্টিতে ওর গুম ও কঠোর হয়ে যাওয়া মনে মুহূর্তে আতঙ্ক দেখা যায়। রীনা কিছু সন্দেহ করল না তো .... করে করুকগে ... কী আর করা যাবে .... হেসে রমার দিকে তাকানোর চেয়ে আর নির্বুদ্ধিতা কিছু হয় না—ওকে শুধু অপমান করার সুযোগ দেওয়া হচ্ছে। হঠাৎ কল্যাণের মনে হয়, হয়তো স্ত্রীকে নিয়ে যেতে যেতে অতখানি প্রসন্ন হাসি হাসা ঠিক হয়নি—হয়তো রমা ভেবেছে, স্ত্রীকে পেয়ে খুব খুশি। একথা ভেবে কল্যাণ এককোঁটা ঠাণ্ডা হাওয়া মুহূর্তের জন্যে অনুভব করে। ....স্ত্রীর সঙ্গে অতক্ষণ গল্প করা হয়তো লক্ষ্য করেছে—ওর দেওয়া অপমান বুঝতে পারিনি এ কথা ওকে বোঝাবার আগেই চোখ নামিয়েছে—ওকি ভেবেছে যখন খুশি ইচ্ছে মতো আমাকে অপমান করবে .... এত সস্তা হয়ে গেছি .....স্ত্রীর সঙ্গে গল্প করতেই .....হঠাৎ কল্যাণ রীনার 'পর মনে মনে জ্বলে ওঠে ..... কোন টাইফয়েড রোগীর বাড়ি থেকে এসে সেই থেকে ..... আবার কি জুলুম .... ওর সঙ্গে বাসায় ফিরতে হবে .... রমাকে যেমন প্রশ্রয় দিয়েছি রীনাকেও তেমনি প্রশ্রয় দিয়েছি ....এদের সন্তুষ্ট করবার জুলুমে জীবন আমার অতিষ্ঠ হয়ে উঠল .... বোঝা যাচ্ছে রমা সম্পর্ক রাখতে চাচ্ছে না .... তা অত নাটক করে অপমান করবার জন্যেও অধিকার ওকে দেওয়া হয়নি। আজকে এর জন্যে জবাবদিহি করতে হবে। সংকল্প স্থির করবার ফলে একটু আশ্বস্ত হয়। রমার সঙ্গে দেখা করবার সংকল্প আন্তরিক হতেই একটু আরাম ও আশা বোধ করে। তবে জেদ ও রাগ যাতে চলে না যায় সে জন্যে সতর্ক থাকে। রাগকে মন থেকে চলে যেতে দেওয়া হবে না। রমাকে কিছু কড়া কথা বলতেই হবে।

—এখন বাসায় ফিরবে, এখন সাড়ে তিনটে—তিনটে পঁয়ত্রিশ—শীতের দুপুর তো সন্ধ্যার ছদ্মবেশে থাকে—এখন বাসায়। রাস্তায় বের হয়ে কল্যাণ জিজ্ঞেস করে।

কল্যাণের শুকনো কণ্ঠস্বরে রীনা চমকে কল্যাণের দিকে তাকায়। এ রকম শুকনো, নিরাসক্তি যেন বিরক্তির কাছঘেঁষা কণ্ঠস্বর বড় শোনেনি। সঙ্গে সঙ্গে ভেবে নিল, সত্যিই তো এখন বাসায় ফিরে কী করব? কল্যাণের চিন্তার সঙ্গে নিজের চিন্তা মেলাতে পেরে কল্যাণের শুকনো কণ্ঠস্বরে অস্বাভাবিকতাকে স্বাভাবিক বলে মেনে নেয়।

—কোথাও যেতে চাও? একই সঙ্গে কোথাও যাবার লোভ ও অফিস থেকে বের হবার নিষ্কৃতিতে উৎফুল্ল রীনা।

—তোমার ইচ্ছে কোথায়? বালিগঞ্জ? তাহলে এক কাজ করো তুমি বালিগঞ্জ যাও, আমি রমেশদার সঙ্গে দেখা করে ফিরব। অনেকদিন দেখা হয়নি—কেমন লক্ষ্মীটি—ঐ যে ট্রাম একদম খালি।

রীনা কিছু আপত্তি করবার আগেই কল্যাণ রীনাকে ট্রামে তুলে দেয়।

রীনা জানলা দিয়ে বলে, বেশি রাত হবে না তো?

—রমেশদার পাল্লায় পড়লে বুঝতেই তো পারছ?

ট্রাম ছেড়ে দিল। নিঃসঙ্গতার বেদনায় রীনা অভিভূত হয়ে পড়ে। হঠাৎ কল্যাণ ওকে

এভাবে ত্যাগ করে যাবে ভাবতেও পারেনি। আসলে বালিগঞ্জ যেতে চাচ্ছি এতেই চটে গেল? আমি কি চেয়েছি বালিগঞ্জ যেতে? যদি পছন্দ করো না তো বালিগঞ্জের নাম বলতে গেলে কেন? আপত্তি করবারও সময় পেলাম কই? বোকার মতো ট্রামে উঠে এলাম—আপত্তি করলাম না এতে হয়তো আরো চটবে? একই সঙ্গে অপমান ও অপরাধবোধে জর্জরিত হতে হতে রীনা ভাবল, নেমে পড়ব? কিন্তু এতক্ষণে হয়তো রমেশদার অফিসের দিকে চলে গেছে। আর রমেশদার অফিস কোথায় তা তো জানি না। বাপের বাড়িতে এতগুলো সংবাদ নিয়ে যাবার সকল আনন্দ রীনার ম্লান হয়ে যায়। অভিমানের চেয়েও ভয়ই বেশি হতে লাগল। বালিগঞ্জ যেতে রাজি হলাম বলে নিশ্চয়ই রাগ করল—কেমন বোকার মতো ...ট্রামে গেলাম .... এত তাড়াহুড়া লাগাল .... বলবে আমি তো তোমার জন্যে অফিস কামাই করলাম তুমি তো আমাকে বাদ দিয়ে বাপের বাড়িতে যেতে চাইলে। আমি চাইলাম কোথায়? জোর করে তো তুমি দিলে ....। তবুও বাপের বাড়ি যাবার আনন্দ, অভিমান ও অপরাধবোধের মধ্যে পথ ঠেলে একটু আবির্ভূত হতেই রীনা যেন বিলাস করে দুঃখ করল। বিমলেন্দু ও কল্যাণ দুজনেই ওকে বিদায় দিয়ে দিল—কাটিয়ে দিল। একজন হঠাৎ করে বাসে উঠে পালাল কোন ভূমিকা না করে আর একজন জোর করে তাড়াহুড়া করে ওকে ট্রামে তুলে দিল একজন চলে গেল আর একজন ওকে জোর করে বিদায় দিয়ে থেকে গেল। রীনা নিঃসঙ্গ। বাপের বাড়ি যাবার আনন্দ একঝলক দেখা দিতেই সেই আনন্দে রীনা দুঃখ করে ভাবল, কেউ ওর নেই, ওর পাশে কেউ থাকে না—ও একা, নিঃসঙ্গ। একঝলকের মতো মনে হল ..... যদি কোলে কোনও তৃতীয় পক্ষ—নতুন অতিথি? হঠাৎ রীনা যেন দেহ মনে সেই নবাগত অতিথির জন্যে এক পলকের একটা প্রচণ্ড খিদে অনুভব করল।

এক দৃষ্টিতে রীনার ট্রামের দিকে কল্যাণ তাকিয়ে রইল। রীনাকে কী ভাবে তুলে দেবে সে জন্যে ভিতরে ভিতরে দুশ্চিন্তা ও উদ্বেগের, সঙ্কোচের ও উৎকণ্ঠার সীমা ছিল না। কিন্তু রীনা চলে যেতেই কিছুমাত্র নিষ্কৃতি বোধ করলই না বরং একটা প্রবল অনুতাপে কল্যাণের অন্তর উদ্বেলিত। .... কল্যাণ আগে থেকেই মানে অফিস থেকে বের হবার আগেই ঠিক করেছিল, রীনাকে বাপের বাড়ি পাঠাবে আর নিজে রমেশদার অফিসে যাবার নাম করে নিজের অফিসে আবার ফিরে আসবে। ফিরে এসে ছুটি পর্যন্ত কাজ করে ছুটির পর রমার সঙ্গে দেখা করবে। কিন্তু কল্যাণের হাসিকে প্রত্যাখান করবার ফলে কল্যাণ এত অস্থির ও ক্ষুব্ধ যে রীনাকে বাপের বাড়ি যাবার ব্যাপারটির জন্যে যে ভূমিকা ও রীনার বাপের বাড়ি যাবার দুর্বলতার সুযোগ নেওয়া দরকার ছিল—কল্যাণ তা কিছুই করতে পারল না। এক রকম জোর করে অনেকটা যেন গায়ের জোরে রীনাকে কথা বলবার সুযোগ না দিয়ে এবং রীনা যে আপত্তি করতে যাচ্ছিল তা সবটা বুঝতে পেরে .... আমার সঙ্গে ছাড়া বাপের বাড়ি যেতে রাজি হচ্ছিল না তা জেনেও, আমি না গেলে বাপের বাড়ি যাবে না এ আপত্তি করবার সুযোগ না দিয়ে এবং রীনা যে আপত্তি করতে যাচ্ছিল তা সবটা বুঝতে পেরেছে ওকে আমি চাচ্ছি না ....এত করে আমার অফিসে এল ....গণ্ডগোলে আজ বড্ড ভয় পেয়ে গিয়েছিল ....ওকে পশুর মতো আবার একা ছেড়ে দিলাম। কেন? না, ঠোঁটে রঙ মাখা পাঁচফুট দুই ইঞ্চি হাড়সার একটা

মেয়ের সঙ্গে দহরম মহরম করবার জন্যে। আমার মুখোশ খুলে পড়া দরকার। ঐ ঠোঁটে রঙমাখা হাতকাটা ব্লাউজের পাশে রোগা বগল দেখবার জন্যে আমি সকল রকম সম্মান বিসর্জন দিয়েছি, খেলো করেছি নিজেকে, নিজের মূল্য নষ্ট করেছি আর তিনি? এখন পাঁচ গ্রামের হাসি কমে এক গ্রামের হাসিতে পরিণত হয়েছে। আমার সব নষ্ট করে এখন তুমি হাসিকে রেশন করতে থাকবে তা হবে না। আমি যদি নিচে নেমে যাই—তোমারও পরিত্রাণের পথ নেই। আজকে আমাকে অপমান করার কৈফিয়ত দিতে হবে। ফেরবার সময় কল্যাণ আবার না তাকিয়ে রীনার 'পর সুবিচার করবে ঠিক করেছিল তা আর হলো না। রমা ফিরেও তাকাল না।

অফিসের প্রায় সবাই-ই চলে গেছে। দিনকাল খারাপ বলে মফঃস্বলের ডেলি প্যাসেঞ্জাররা চারটে বাজতে না বাজতেই সেকশনের ইনচার্জকে বলে, আর যদি বড়বাবুর সঙ্গে ভাব থাকে তবে না বলেও যে যার চলে যেতে থাকে। সাড়ে চারটার মধ্যেই অফিস প্রায় ফাঁকা হয়ে যায়।

এখন সাড়ে পাঁচটা। কল্যাণ ড্রয়ারগুলো বন্ধ করে চাবি নিয়ে উঠে দাঁড়ায়। দু'চার জন অফিসার এখনও আছেন। আর রয়েছে কয়েকজন পিয়ন। এতক্ষণ রমার থাকবার কথা নয়। নিজের ঘরে এসেই রমাকে ফোন করে খুব গম্ভীরভাবে ছুটির পর থাকতে বলেছে। রমা সম্মতি দিয়েছে। গম্ভীরভাবে থাকতে বলাটা কতটা আদেশের মতো হয়েছে কতটা অনুরোধের মতো হয়েছে ঠিক বুঝতে না পেরে কল্যাণ রমার সম্মতির জন্যে নিজেকে খুশি হতে মানা করে চলছিল। নিজের রাগ, অপমানবোধ ও রীনার জন্যে অনুতাপকে মন থেকে যেতে দিতে ওর ইচ্ছে ছিল না। মনের এই জটিল উত্তেজনাকে নিয়ে নাড়াচাড়া না করে ফাইল নিয়ে ডুব দিয়েছিল। একসঙ্গে কিছুক্ষণ একটানা কাজ করে গেল।

যদিও কাজের ফাঁকে নানা সংশয়, উত্তেজনা, ভয়, অনুতাপ এক একটা লাইনের মতো চেতনায় ভেসে উঠেছে—কিন্তু তাকে আমল দেয়নি—তাকে আশ্রয় করে চিন্তা জাল বিস্তার করেনি। দুশ্চিন্তাকে প্রশ্রয় দেবার দুর্বার লোভকে সংবরণ করেছে, রীনাকে অন্যায়ভাবে প্রায় তাড়িয়ে দিয়েছে আর রমা সম্পর্ক ছিন্ন করতে চাচ্ছে সুতরাং এখন ওর একটা সংকট সময় চলছে অতএব এর গুরুত্বের জন্যে কাজ আজ না করাই ঠিক।—এই চিন্তাকেও কল্যাণ প্রশ্রয় দেয়নি।—দুশ্চিন্তার ছুতোয় কাজ বন্ধ রাখবার ইচ্ছাকে আত্মপ্রতারণা হিসেবে গণ্য করে কল্যাণ কাজ বন্ধ করেনি। বেশ কিছুক্ষণ কাজ করবার পর এক সময় ফাইল বন্ধ করে উঠে দাঁড়ালো। মন এখন অনেক শান্ত। নিজের দিকে তাকাতে সাহস হয় না। পাছে দেখতে পায় উত্তেজনা নিভে গেছে। রমার উপর রাগ নেই, রীনার জন্যে অনুতাপের জোর কমে গেছে। অন্তরকে নিয়ে নাড়াচাড়া করতে, নিজের মনের খবরাখবর নিতে ওর সাহস হচ্ছিল না আরো এইজন্যে যে, এতক্ষণ মনোযোগ দেবার জন্যে যে একটুখানি শান্তি লাভ করেছিল, তন্ময় হয়ে কাজ করবার জন্যে যে একটুখানি সুস্থ বোধ করছিল হয়তো এখনই দুশ্চিন্তার ভাইরাস মনে ঢুকে এই একঘণ্টার শান্তি ও স্বাস্থ্যকে অসুস্থ করে তুলবে। তাই নিজের মনকে এড়াবার

জন্যে, নিজের দুশ্চিন্তাকে কোন অবসর না দেবার জন্যে কল্যাণ আস্তে আস্তে রমার কাছে রিসেপশনরুমে এসে হাজির হয়। নিজেকে গম্ভীর গম্ভীর লাগছিল। নিজের গাম্ভীর্যকে যেতে দিল না।

কল্যাণ এসে দাঁড়াতেই রমা উঠে দাঁড়ায়। তারপর ভ্যানিটি ব্যাগ নিয়ে ওর সঙ্গে বের হতে থাকে।

—আচ্ছা মিসেস এসেছিল না? রমা সহজভাবে জিজ্ঞেস করে।

রমাকে সহজভাবে জিজ্ঞেস করতে দেখে মুহূর্তে কল্যাণের ক্ষোভ চরমে ওঠে। এতক্ষণ ভুগিয়ে এখন সহজ হতে চাচ্ছেন—এতক্ষণ অপমান ও অগ্রাহ্য করে এখন সহজ হয়ে আমাকে বখশিস দিচ্ছে। কল্যাণ একবার আড়চোখে ওর হাত ও বগলের দিকে তাকাল। ফুল হাতা সোয়েটারে রমা আবৃত।

—ঠাণ্ডা পড়ছে দেখে এই ফুল হাতার সোয়েটারটা আজ নিয়ে এলাম—বেমানান লাগছে? তারপর, মিসেসকে তো দেখলাম?

—হ্যাঁ, আজ এসেছিল।

রমা আরও শুনবার জন্যে কল্যাণের দিকে তাকায়।

—একজন সহকর্মীর ছোটভাই টাইফয়েডে ভুগছে—তাকে দেখতে গিয়ে স্কুলে যায়নি। রাস্তায় কোথায় কী গণ্ডগোল হয়েছিল—একটু গল্প করে গেল।

নিরসভাবে কল্যাণ বলে। রমাকে সহজ দেখে ওর অভিমান কানায় কানায়। রাগ ও অভিমানে কল্যাণ ঠিক করে, সত্য কথাই বলবে—তাতে রমা রাগ করে করুক। তবুও নিজের অনিচ্ছা সত্ত্বেও রীনা সম্পর্কে একটা তাচ্ছিল্য রীনার আসবার ব্যাপার—কোনও গুরুত্ব নেই এমনি একটা তুচ্ছ তুচ্ছ ভাব ও রীনার আসবার জন্যে কল্যাণ যে দায়ী নয় ও এখানে আমাকে ঠিক চোখে দেখেনি, এমনি একটি ভাব কল্যাণের কণ্ঠে ফুটে উঠল। তবে বলেই কল্যাণ একটু ভীত হয়। নীরস ভাবটি যদিও ওর অনিচ্ছাসত্ত্বেও এসে গিয়েছিল তবুও তাকে স্বীকার করে কল্যাণ ভাবে, আবার রমা যদি ভাবে বিরক্তি মানে রমার প্রশ্নে কল্যাণের বিরক্তি লাগছে—বা, রমার সঙ্গে কথা বলতেই ওর বিরক্তি লাগছে। কিংবা হয়তো ভাবছে ডেকে এনে নিজের বিরক্তি দেখানো হচ্ছে? ভাবে ভাবুক গে—যার যা খুশি ভাবুক—অত মন যুগিয়ে চলা যায় না। আমি কারো দাস নই—সবসময় মন রেখে কথা বলতে হবে। যার যা খুশি ভাববার স্বাধীনতা আছে আর আমার শুধু অপরের ভাবনার সঙ্গে তাল রেখে অপরের ভাবনার তোষামোদি করে চলতে হবে। অত পরাধীন নই আমি। উত্তেজিত হয়ে কল্যাণ একটু জোর পায়।

কল্যাণ জানে ও যে রাগ করেছে এ কথা বুঝতে পেরেও রমা বুঝতে না পারবার ভান করবে। ওর রাগ বা অভিমান নিয়ে একটা প্রশ্ন বা কৌতূহল বা সান্ত্বনাও প্রকাশ করবে না। ঐ রাস্তায়ই হাঁটবে না। প্রত্যক্ষভাবে আক্রান্ত না হয়ে রমা কল্যাণের রাগকে স্বীকার করবে না। ওর রাগের কোনও স্বীকৃতি রমার কাছে নেই—ওর বেমানান গাম্ভীর্য যেন নিত্যকার ঘটনা—কল্যাণ যেন চিরকালই এমন গম্ভীর। গাম্ভীর্যের কোন মূল্য ঐ চলন্ত স্ট্যাচুর কাছে নেই। হাসি বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করে তার কাছে আর কি আশা করা যায়? .... একটু একটু খচখচ করে, রীনা অফিসে আসবার জন্যে ওর যে

বিরক্তি ঘটেছে তা হয়তো রমা বিশ্বাস নাও করতে পারে—ভাবতে পারে রমার মন জোগাবার জন্যে এ এক মিথ্যা বিরক্তি মাত্র। কল্যাণ ছটফট করে।

দুজনে হাঁটতে থাকে। অফিস ফেরত যাত্রীদের ভিড় তখনও একটুও হাল্কা হয়নি। সবাই ট্রাম ধরবার জন্যে ব্যস্ত। টেলিফোন ভবনের সামনে ডালহৌসির মোড়ে রাইটার্স বিল্ডিংয়ের মোড়ে তখনও প্রচণ্ড ভিড়। কোথাও কোন ট্রাম দেখা যাচ্ছিল না। মাঝে মধ্যে দুএকখানা ঠাসা বাস এসে থামছে—কাতারে কাতারে লোক অযথা তার পেছনে পেছনে দৌড়াচ্ছে।

অস্ফুট স্বরে রমা বলে, ট্রাম বন্ধ হয়ে গেছে। আর ট্রাম বন্ধ হলে ভিড়ের জন্যে বাসে ওঠা যাবে না—ট্যাক্সি পাওয়া অসম্ভব।

—আমি পৌঁছে দেব। যখন ডেকে এনেছি—তখন পৌঁছে দেবার দায়িত্ব আমার।

এক পলক কল্যাণের দিকে তাকিয়ে চোখ নামিয়ে নেয় রমা। তারপর দুজনেই চুপ করে হাটতে হাটতে এসপ্ল্যানেডের দিকে আসতে থাকে। রাস্তায় প্রচণ্ড ভিড় ঠেলে একটু করে অগ্রসর হয়।

কিছু পরে রমা একটু অসন্তুষ্ট কণ্ঠে বলতে থাকে, আজ আমার অনেক কাজ ছিল—সেগুলো সব নষ্ট হল। যা হবার হল। এরপর কিন্তু যা শুনবার ফোনেই আমি শুনতে চাই—রোজ রোজ দেরি করে ফেরা। রোজ রোজ কাজ নষ্ট আমার সইবে না। আমি তো একটা সংসারে বাস করছি—তা দেখছি কারো মনে থাকে না।

—কাজ নষ্ট হবে আমাকে তখনই বলোনি কেন—যখন ফোন করলাম?

—বললে কোনও ফল হত না—আগেও অনেকবার বলেছি, কোন বিবেচনা দেখিনি।

—ঠিক আছে, এক্ষুণি পৌঁছে দিচ্ছি—মেট্রোর উল্টোদিকে প্রাইভেট কার ভাড়া পাওয়া যাবে—পৌঁছে দিচ্ছি।

—একাই যেতে পারব। পৌঁছে দিতে চাইলেই তার উপকার আমি নিতে চাইব কেন? আমার ভদ্রতাবোধকে কেউ যেন সস্তা মেয়ের কৃতার্থবোধ মনে না করে।

কল্যাণের চোখ মুখ গরম হয়ে ওঠে—কান দুটো যেন ঝাঁ-ঝাঁ করতে থাকে। নিজেকে সংযত রাখতে পারবে না বলে ভীত হয়ে ওঠে। গলা যেন একদম শুকিয়ে গেছে।

শুষ্ক কণ্ঠে কল্যাণ যেন জড়িয়ে জড়িয়ে বলে, আমি যাচ্ছি।

—কিন্তু যে জন্যে আমার কাজ নষ্ট হল—কী জন্যে আমাকে এখানে ডাকা হল, তা আমি জানতে চাই।

—আর বলবার আগ্রহ নেই।

দুজনেই একসঙ্গে হাঁটতে থাকে। কেউ যায় না।

মেট্রোর উল্টোদিকে এসে কল্যাণ এক পলক রমাকে দেখে বলে, এ ভিড়ে যাওয়া সম্ভব নয়। প্রাইভেট গাড়ির কাছে যাব ....। আমি নিজে পৌঁছে দিচ্ছি—আর কোনওদিন ....।

—বাইরের লোকের সঙ্গে বাড়িতে ফিরলে আমার খুব সম্মান হবে—আদর হবে,

তাই না। অত ছোট ...।

—তোমার এই রুচিহীন কথার উত্তর দিতে পারলাম না—পারব না। কারণ রুচিহীন কুৎসিত কথা আমার মাথায় আসে না। রুচিহীন বা রুচিহীনাদের সঙ্গে ঝগড়া করবার প্রস্তুতি নিয়ে বড় হইনি—তাই গালাগালের উত্তরে আমি গালাগাল দিতে পারি না—মাথায়ও আসে না—জিভও তা উচ্চারণ করতে পারবে না। এখনও বলছি, এ ভিড়ে তুমি যেতে পারবে না—বৃথাই একা যাবার অহঙ্কার করছ। আমি তা বলিনি তোমার বাড়ি আমি যাব। আমি তোমাকে নামিয়ে দিয়ে চলে যাব ঐ গাড়িতে—গাড়ি থেকে নামবও না। তোমার একজন সহকর্মী ভিড়ের জন্য তোমাকে পৌঁছে দিয়ে গেল—এই সত্য কথাটুকু তাদের জানাবে।

রমা চুপ করে থাকে। কল্যাণ মোটর ভাড়া করতে যায়।

একটু চেষ্টা করে কল্যাণ একটা মোটর পেয়ে যায়। এসপ্ল্যানেড থেকে পাম এভিন্যু পনেরো টাকা। বিপদে পড়লে কে না সুযোগ নেয়? ভেবে কল্যাণ নিজেকে সান্ত্বনা দেয়। কিছুটা রেস্টুরেন্টে সময় কাটিয়ে দিলেই ভীড় হাল্কা হয়ে যেত—তখন অনায়াসে বাসে জায়গা পাওয়া মুস্কিল ছিল না—হয়তো ইতিমধ্যে ট্রামও চলতে শুরু করে দিত—অযথা পনেরো টাকা ব্যয় হত না—একথা অন্যদিন হলে কল্যাণ হয়তো ভাবত। আজ কল্যাণ পনেরো টাকা ব্যয়ের জন্য কিছুমাত্র চিন্তিত নয়। ঐ কালনাগিনী সাপের হাত থেকে নিস্তার পাওয়া দরকার .... স্পর্ধা কত .... কেন আমি ডাকলাম কৈফিয়ত চাচ্ছে ..... আমার ম্যানেজিং ডিরেক্টার এসেছেন .... এই শেষ .... আজই শেষ .... রেস্টুরেন্টে খেয়েও তো টাকা যেত না হয় সেই টাকা মোটরে গেল .... কম টাকা ওর পেছনে ....। হঠাৎ কল্যাণের মনে হয় রীনা এসে এতক্ষণ বসেছিল, ওকে এক কাপ চা, কফিও তো অফার করা হল না। বের হয়ে অন্তত একবার রেস্টুরেন্টেও তো নিয়ে যাওয়া উচিত ছিল। মনের মধ্যে ঝড় ওঠে .... ঐ ঐ মেক আপ দেওয়া মুখের জন্যে কি করেছি আমি কেউ তা বুঝবে না .... এখন টেম্পার দেখানো হচ্ছে .... আজই শেষ। আগামিকাল থেকে সুপিরিয়র অফিসার ... সুপিরিয়র অফিসার কাকে বলে বুঝিয়ে দেব। এই আপদকে আজই বিদেয় করে দেব .... আর নয়। এই সিদ্ধান্ত করে কল্যাণের মনে হয় পৃথিবী যেন ওর কাছে নিঃস্ব হয়ে গেল। সমস্ত রঙ যেন ফাঁকা, শূন্য। ভালোবেসে বেশ চমৎকার প্রতিদান পেলাম—চেনা হয়ে গেল পৃথিবীটা।

কল্যাণ এসে রমাকে নিয়ে গাড়িতে ওঠে। রমা শান্তভাবে বেশ গা ঘেঁষে বসে। কল্যাণ একটু সরে বসল। গাড়ি ছাড়তেই কল্যাণ ড্রাইভারকে জিজ্ঞেস করে—আজকে ট্রাম বন্ধ কেন?

—আজ্ঞে কালীঘাটে একজন ট্রামের কন্ডাকটারকে মেরেছে তাই সব কনডাকটার স্ট্রাইক করেছে বিকেল থেকে। ঐ তো কিছুক্ষণ আগে সব মিছিল করে শ্লোগান দিতে দিতে গেল। যাত্রীদের হয়রানি করে।

কল্যাণ বলে, আমি ভাবলাম কোথাও বোমা পড়েছে, হয়তো ট্রাম পুড়িয়েছে।

—এক একদিন এক একটা হুজ্জৎ হচ্ছে স্যার—সব মিলে স্যার ট্রামের ড্রাইভার কনডাক্টারদের খুব একটা খাটতে হয় না—একটু বৃষ্টি হলে ট্রাম চলে না, তার ছিঁড়লে

ড্রাইভার কনডাকটার ফাস্টক্লাসে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। জ্যাম থাকলে ট্রাম চালাতে হয় না, মিছিল রাস্তা দিয়ে গেলে পর পর ট্রামের কনডাকটার ড্রাইভার মিলে খোশগল্পে ঘন্টার পর ঘন্টা আড্ডা দেয়। ট্রাম পোড়ালে তো কথাই নেই। মাস-মাইনে তো দিব্যি আছে স্যার। তারপর হরতাল ধর্মঘট হলে ওরা একদম নিশ্চিন্ত—কোনও কাজ নেই। মাস-মাইনে মাস গেলেই, তারপর ওভার টাইম।

—কেন, ট্রাম-বাস বন্ধ হলে তো আপনাদের লোকসান নেই বরং ...।

—আমাদের স্যার ওদের সঙ্গে তুলনা করবেন না। ক্ষেপ পাই বা না পাই মালিককে টাকা গুনে দিতে হয়। তারপর রয়েছে পুলিশ, একটু বাগে পেলেই .... ট্যাক্সিও পারলে আমাদের ধরিয়ে দেয় .... কমপিটিশনে আমাদের শেষ করে দিতে চায়। একদিকে মালিক গনগন করে, আরেকদিকে পুলিশ তাক মেরে রয়েছে। ট্যাক্সি ড্রাইভারগুলো হাঁ করে আছে—দেখলেই ধরিয়ে দেবে .... আর মাসের শেষে প্যাসেঞ্জারের ফাঁকা পকেট ... মালিক তা শোনে না। আমাদের সঙ্গে ওদের তুলনা হয় না স্যার। তারপর দলবেঁধে উঠে ভাড়া দেয় না। কিছু বললে উল্টে গাড়ি পোড়াতে চায়। কত কি মতলবে গাড়ি ভাড়া করে—কে ভদ্দরলোক, কে ডাকাত চেহারা দেখে তো কিছু বোঝা যায় না। অথচ পুলিশ তো গাড়ির নম্বরই টুকে নেবে—মালিক তখন তম্বি করবে—অন্যকে গাড়ি দিয়ে দেবে। ঠিক খদ্দের চেনা স্যার আজ এক মহাসমস্যা ব্যাপার।

কল্যাণ সায় দেয়—তা ঠিক। হয়তো গাড়ি ভাড়া করে ব্যাঙ্ক ডাকাতি করতে গেল।

—বলুন, বলুন দেখি স্যার—তখন গাড়ি না চালালে প্যাসেঞ্জার গুলি করবে—থানাতে লটকে দেবে।

—ডাকাতদের নিজেদেরই মোটর থাকে। ব্যাঙ্ক-ট্যাঙ্ক যারা—

—নিজেদের গাড়িই যদি থাকবে তবে কোন দুঃখে ডাকাতি করবে? তবে হ্যাঁ, অনেক সময় ড্রাইভারের সঙ্গে ষাঁট থাকে বইকি। থাকতে পারে। ড্রাইভার বুঝতেই পারছেন ... সব মানুষ তো আর ভালো হয় না স্যার।

—তা তো বটেই।

সাধারণত কল্যাণ ড্রাইভারদের সঙ্গে কখনো একটি কথাও বলে না। আজ এই বাচাল ড্রাইভার পেয়ে স্বস্তি লাভ করে। পাশাপাশি আড়ষ্ট হয়ে বসে থাকা—গুম হয়ে নিশ্চল হয়ে যাওয়া—তাও বাইরের একজন লোকের সামনে বেজায় অস্বস্তিকর। আবার দুজনে চুপচাপ বসে থাকা আরেক দিক থেকে বিপজ্জনক। আবার রমা হয়তো ড্রাইভারের সামনেই কি না কি বলতে শুরু করবে। রমাকে কথা বলতে না দেবার জন্যে কল্যাণ যেন অতিশয় মনোযোগী হয়ে ওঠে ড্রাইভারের ওপর। যদিও কতটা ড্রাইভারের কথা শুনছিল তা বলা শক্ত। অপমানের একটা গরম স্রোত শিরায় শিরায় ওকে উত্তপ্ত করে তুলেছিল। রমাকে কঠোর আঘাত দিতে ওর দেহ-মন প্রতি রক্তবিন্দু যেন উন্মাদ হয়ে উঠেছিল। আবার রমার সঙ্গে ঝগড়া করতে ওর কেমন ভয় ভয় করছিল—যদিও ভয়কে কল্যাণ স্বীকার করছিল না—তেমনি যেন রুচিতে ও অভিমানে বাধছিল। .... তেমনি ভাবছিল, ওর এই শীতল নীরবতায় নিশ্চয়ই রমা ভয় পাবে—ঝগড়া করা তো নিজেকে অনেকখানি খুলে ধরা ও খেলো করা। কিছু না বললেই হয়তো আরো বিপদের আশঙ্কা

থেকে রমা ভয়ে ভয়ে থাকবে। আবার মনে হয়, রীনা ওর কাছে আশ্রয় নিতে এসেছিল তাকে তাড়িয়ে দিল যার জন্যে সে চরম অপমান করল—অপমানের পুরস্কারে পনেরো টাকা খরচ করে তাকে গাড়ি চড়ানো হচ্ছে। ... ওর শীতল নীরবতাকে হয়তো রমা ভয় নাও করতে পারে। .... যেমন মিহিগলায় কাঁদো কাঁদো স্বরে প্রতিবাদ করেছি তাতে হয়তো রমা ভাবছে ওর ভয়েই আমি চুপ রয়েছি। ভাবছে, দিয়েছি ঠাণ্ডা করে, যখন তখন ওদের ডাকা চলবে না। আসলে সম্পর্ক রাখতে চাচ্ছে না। যে-কোন ছুতোয় ঝগড়া করছে .... ঠিক আছে .... আমার শিক্ষা হল .... তবে রমাকে ছেড়ে দেব না। কিন্তু কীভাবে রমাকে শাস্তি দেবে। এই মুহূর্তে তা মাথায় না আসায় এবং পরে ভেবেচিন্তে ঠিক করবে এই চিন্তা দুর্বলের আত্মপ্রবঞ্চনা ও পরিহাসের মতো লাগবে বলে তা ভাবতে গিয়েও ভাবল না—এই চিন্তাকেই পরিত্যাগ করল। পাশে রমা নড়ে চড়ে বসেছে, কখনো ড্রাইভারের দিকে কখনো কল্যাণের দিকে, কখনো রাস্তার দিকে তাকাচ্ছে। কিন্তু কল্যাণ নিঃসাড়। আড়ষ্ট। পাশে যে কেউ আছে বা থাকলেও তাকে যে কল্যাণ চেনে তা মনে হয় না। হঠাৎ কল্যাণের মনে হল—ড্রাইভার ভাবছে হয়তো এই মহিলার সঙ্গে শেয়ারে আমি যাচ্ছি—অন্তত একে নামিয়ে দিয়ে আমি বালিগঞ্জ ট্রামডিপোতে নামব বলেছি বলে আর কথাবার্তা বলছি না। ভাবে ভাবুক .... ড্রাইভার যদি ভাবে তো আমার কী এসে যায়? ড্রাইভারের চোখে ছোট হয়ে যাচ্ছি? অভিমানে কল্যাণ দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে ....রমাই যদি ওকে এমন করে হেয় করে তবে ড্রাইভার কী ভাবল না ভাবল তা নিয়ে ভাবনা বিলাসিতা।

পার্কসার্কাসের আমীর আলি এ্যাভিনুর মোড়ে দেখা গেল একটি হাওড়াগামী স্টেটবাস খারাপ হয়ে গেছে—সেই যাত্রীবোঝাই স্টেট বাস থেকে হুড় হুড় করে লোক নেমে অগণিত অপেক্ষারত যাত্রীদের ভিড়কে সমুদ্রের মত ব্যাপক করে তুলছে। মোটরের ড্রাইভার লোলুপ চক্ষে সেই ভিড়ের দিকে তাকিয়ে গাড়ির স্পিড বাড়াতে বাড়াতে পরম পরিতৃপ্তির সঙ্গে বলে—ঐ স্টেটবাস হয়েছে আরেক গ্যাঁড়াকল। দেখুন স্যার, বালিগঞ্জ ট্রামডিপো থেকে একটুকু পথে এসেই গাড়ি বিগড়ে গেল—গাড়ি বের করবার আগে কি চেক করে না? একগাদা মিস্ত্রী থাকতে ....।

হঠাৎ কল্যাণ স্পষ্ট করে শুষ্কমুখে রমার দিকে তাকাল : একবিন্দুও আমি ভালোবাসিনি ওকে। ওর ওপর আমার কোন ভালোবাসা নেই। নিজেকে ওর সম্পূর্ণ মমতাহীন—প্রেমহীন মনে হয়। মুহূর্তে রীনার ছবি মনে দেখা দিতেই কল্যাণ অচেতনভাবে ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল। রীনার ছবি মিলিয়ে গেল।

—কেউ কাজ করে খাবে না স্যার—লোকে চাকরি চায় মাইনের জন্যে—কাজের জন্যে নয়—কাজ করতে বললেই মাথায় বাজ ভেঙে পড়ে। এই আমি সার বুঝেছি স্যার। চাকরিতে কাজটা ফালতু।

বিনা প্রেমে রমাকে কি শুকনো, কি হাড়সার কি জঘন্য লাগে দেখতে—হোপলেসলি আনঅ্যাট্রাকটিভ। নিষ্কামভাবে দেখলে রমাকে রীতিমতো কুৎসিত লাগে—রঙটুকুর জন্যে ক্যামোফ্লেজ যদি এড়ানো যায় তবে তো রীতিমতো প্যাথেটিক। রমাকে কুৎসিত লাগবার অনুভূতিটি আন্তরিক মনে হতেই মনে একটু বল পায়। একটু তৃপ্তি লাগে।

—কাজকে মনে করে অন্যায় আবদার—মামাবাড়ির আবদার। মাইনে পাবার জন্যে চাকরি পেয়েছে—কাজ করবার জন্যে নয়। এই হচ্ছে স্যার আসল কথা।

—হু—।

অনেকদিন রমার বাসা সম্পর্কে কল্যাণ অনেক কিছু জিজ্ঞেস করেছে। রমা যেন অস্বস্তি বোধ করত প্রশ্নে। কোনদিন রমা ওকে বাড়িতে আসতে বলেনি। বহুদিন কল্যাণ তা লক্ষ্য করেছে। তাই তখনই কল্যাণ ঠিক করেছিল যেতে বললেও কল্যাণ যাবে না।—নিমন্ত্রণ করলেও যাবে না। এখন মনে হল, কল্যাণ আজ রমাকে ওর বাড়িতে পৌঁছে দিচ্ছে কোনদিন আর না আসবার জন্যে। আজ রমার বাড়ি চিনে নিচ্ছে শুধু এ জন্যে যে আর কোনওদিন আসতে হবে না বলে .... বাইরের লোক কল্যাণ .... তা আমি যে বাইরের লোক তা আমি বরাবরই জানতাম .... তবু বাইরের লোকের সঙ্গে ঘন্টার পর ঘন্টা কাটাতে অসুবিধা হয়নি। .... রেস্টুরেন্টে যেতে .... আর কোনদিন আসব না জেনেই আজ ওর বাড়ির দরজার কাছ পর্যন্ত আসতে দিল .... কাজ নষ্ট .... কাজের ছুতো অবশ্য রোজই থাকে .... কাজ নষ্ট ....। কল্যাণ ঠিক করে ফেলে, এখনই বাড়ি ফিরে যাবে ..... তারপর অন্ধকারে শুয়ে শুয়ে সব ভেবে দেখবে ....। একটু একা থাকবার দরকার .... রমেশদার ফ্ল্যাটে যাবে না। হঠাৎ একা থাকবার একটা আকাঙ্ক্ষা বোধ করে।

মোটর বন্ডেল গেটের দিকে ঘুরে গেল।

একটু পরে রমা জানায়—বাঁ দিকের রাস্তায়।

রমার কণ্ঠস্বরে কল্যাণের সমস্ত শিরা-উপশিরাগুলো কেঁপে ওঠে। বুক যেন ধড়াস করে উঠল। ওর কণ্ঠস্বরে একটু সুরের রেশ থাকে—কল্যাণের তা মনে পড়ল। কল্যাণ নিজেকে জিজ্ঞেস করে—গালাগালগুলো তাহলে সুরেলাই হয়েছিল? আজকের মতো রমাকে কোনদিন এত কর্কশ লাগেনি। এত নীরস মনে হয়নি। এই হচ্ছে আসল রূপ। হাসি যার কমোডিটি—

এখানেই থামবে। বলেই রমা কল্যাণের দিকে স্নিগ্ধ দৃষ্টি বিকিরণ করে বলে, তুমি এখানে নামবে কিন্তু।

কল্যাণ মাথা নেড়ে অস্বীকার করে। অভিমানে, ক্ষোভে কণ্ঠরুদ্ধ। মনে তক্ষুণি এসেছিল, বাইরের একজন লোকের সঙ্গে নামলে তোমার বাড়ির লোক যা তা ভাববে না? কিন্তু স্বরভঙ্গ ঘটতে পারে ভয়ে কল্যাণ কিছু বলতে সাহস করে না। কল্যাণের হাত ধরে রমা টানতে থাকে—এই-কি হচ্ছে—এসো এসো বলছি। এখান থেকে ফিরে যাবে তা কি হয়? এসো। জোরে কল্যাণের হাত আকর্ষণ করে।

কল্যাণ আবার অস্বীকার করে। অন্যদিকে তাকিয়ে মাথা নাড়ে। ওর মুখের বাঁ দিকে রমার পূর্ণ দৃষ্টি অনুভব করেও তাকায় না; কোন সম্পর্কে আর নেই—সব ঘুচিয়ে দিয়েছি আবার কেন? সম্পর্কটা কি রমার ইচ্ছাধীন।—ওর ইচ্ছায় থাকবে, ওর ইচ্ছায় চলে যাবে?—কল্যাণ নিজেকে জিজ্ঞেস করে। কিন্তু ভয়ে ও আতঙ্কে সঙ্কুচিত হয়ে যায়। এই মুহূর্তে বাচাল ড্রাইভার হয়তো তাড়া দেবে, না হয়, রমার পক্ষ নিয়ে অনুরোধ করবে।

ড্রাইভার রাস্তার দিকে তাকিয়ে হয়তো মনে মনে ওদের ন্যাকামির তামাশা দেখছে। অন্য যাত্রীর কাছে আবার একথা বলে বেড়াবে।

—এসো এসো—এবার যেন রমার গলায় অশ্রুর আভাস।

নামতে নামতে কল্যাণ নিজেকে জানায়, ড্রাইভারের সামনে বলে রমা ওর ভদ্রতাবোধের সুযোগ নিচ্ছে।

কল্যাণ নেমে ড্রাইভারকে পনেরো টাকা ভাড়া দিয়ে দেয়। মনে মনে নিজেকে শোনায়—এই মেয়েটা শুধু আমার ক্ষতি করবার তালে আছে।

—তা হলে বালিগঞ্জ ডিপোতে যাচ্ছেন না—দু'মিনিটের রাস্তা অবশ্য। ড্রাইভার চলে যায়।

খপ্ করে কল্যাণের হাত থেকে মানিব্যাগটি ছিনিয়ে নিয়ে বলে, কেমন জব্দ—এইবার এসো—এই রাগ করে না—কখন থেকে গুম হয়ে বসে আছ ভাবো দেখি। এসো, তোমায় সঙ্গে সবার আলাপ .... না হয় ঘরে গিয়ে আমাকে জুতো মেরো—আমি গাল পেতে দেব—এসো, এসো, এইবার একটু হাসো তো—হাসো বলছি ....।

কল্যাণ আস্তে আস্তে রমার পেছনে ওর বাড়ির দরজার দিকে যায়।

পুরোনো ভাঙা সাঁতস্যাতে একটি একতলা। তিন-চারখানা ঘর। ঘরগুলোর দেওয়ালের চুনকালি খসা। চটের পর্দা। অল্প পাওয়ারের বাল্ব। ভেতর থেকে যেন একটা অস্ফুট গোঙানী। কিন্তু সামনের ঘরটি সম্পূর্ণ আলাদা। দেওয়াল প্রায় অর্ধেক পর্যন্ত নানা সুন্দর সুন্দর কাজ করা পেপার দিয়ে ঢাকা—মেঝেতে কার্পেট—একটা সোফা সেট—কোণে একটা বুক সেলফ্—তাতে কিছু ইংরেজি সাহিত্যের বই। দেওয়ালে গোটা দুই তেল চিত্র—একটা পিকাসোর আর একটি অবনীন্দ্রনাথের ভারতমাতা। নিওনলাইট সবুজ কাগজে মোড়া। রমা বাবা-মা'র একমাত্র সন্তান। বাবা বেশ কিছুকাল হল হাঁপানিতে অচল। বিকেল থেকেই টান উঠেছে। সংসারের কাজকর্ম সব মা-ই করেন। বহুকাল এ অঞ্চলে আছেন। বাসাটির ভাড়া কুড়ি টাকা।

সকালে উঠে মা বাজারে যান। বাজার থেকে এসে খাবার তৈরি করে রমাকে দেন। রমা দুপুরে অফিসের ক্যান্টিনেই লাঞ্চ করে। মা-ই অসুস্থ বাবাকে সেবাযত্ন করা, ওষুধপত্র নিয়ে আসা—দরকার পড়লে ডাক্তার ডাকা সব করেন। তবে মহিলার মেজাজ কিছুটা উগ্র। সুস্থ থাকলে রমার বাবাও মেজাজের কাছে হার মানতে চান না। অসুস্থ থাকলে রাগ করে ওষুধ খান না। রমা সকালে দুটি মেয়েকে পড়ায়। ওরা বাসায় এসে পড়ে যায়। আটটা পর্যন্ত। সাড়ে আটটার মধ্যে রমাকে তৈরি হয়ে অফিস যেতে হয়। সন্ধ্যায় রমা বন্ডেল রোডের কাছে এক টিউটোরিয়ালে পড়ায়। একদিন ঐখানে না গেলে সেদিন মাইনে কাটা যায়। ক্লাস প্রতি দু'টাকা থেকে আড়াই টাকা পায়। রমার ইংরাজিতে অনার্স। সেকেন্ড ক্লাস অনার্স পাবার পর স্পোকেন ইংলিশেও ডিপ্লোমা নিয়ে নিয়েছে। এই সংসার ওর আয়ের উপর নির্ভরশীল। কল্যাণের পাল্লায় পড়ে রাতের টিউটোরিয়ালে কামাই হচ্ছে। টিউটোরিয়ালের মালিক মুখ ভার করে থাকে। মা-মেয়েতে ঝগড়া শুরু হলে বাবা এসে মেয়ের পক্ষ নিয়ে মার ওপর পুরোনো আক্রোশ মেটাতে থাকে। মহরম শুরু হয়ে যায়। ঝগড়া শেষে মা রাগ করে সংসার ছেড়ে সামনের চিলড্রেনস পার্কে গিয়ে বসে থাকেন। তারপর একটু রাত হলে রমা গিয়ে জোর করে মাকে টেনে নিয়ে আসে। গরমকালে বাবা-ই যান মা'র অভিমান ভাঙতে। শীতকালে টান উঠবার ভয়ে তিনি

বের হন না।

যেমন সেদিন কল্যাণকে একরকম জোর করে বিদায় দিয়ে আসতে আসতে দেরি হয়ে গেল। লোয়ার চিৎপুরের মোড়ে এসে ট্রাম দাঁড়িয়ে পড়ল। সামনে যতদূর দেখা যায় সারি সারি জনশূন্য ট্রাম। বাসে ওঠা অসম্ভব। ঐখান থেকে পায়ে হেঁটে ওকে বাসায় ফিরতে হয় টিউটোরিয়ালে নটা পর্যন্ত ক্লাস থাকে। ঘড়ি দেখল আটটা কুড়ি। লাস্ট পিরিয়ড শুরু হয়ে গেছে।

ন'টার এত আগে ওকে আসতে দেখেই মা অনুমান করলেন—আজ টিউটোরিয়ালে যায়নি। তবু ভরসা করে জিজ্ঞেস করেত পারছিলেন না—পাছে শুনতে হয়, গেছে। তাহলে জব্দ হতে হয় বড্ড। তারপর যখন মনে পড়ল, মেয়ের মেজাজের ভয়ে তিনি জিজ্ঞেস করতে পারছেন না, তখন জিজ্ঞেস করলেন—আজ টিউটোরিয়াল না করবার গ্লানি তদুপরি তাকে অনেক আগে দেখে মার অপ্রসন্ন ও ভার মুখ—রমার মাথায় আগুন জ্বলে যায়। তবু গম্ভীর ভাবে জানায়—না।

মা তখন কিছু বললেন না। একটু পরেই রান্নাঘর থেকে শুরু করলেন—এ বাড়িতে দাসীবাঁদী আমি রয়েছি—সকলেই মেজাজ দেখাচ্ছে—আমি তো কেনা গোলাম—বিনে পয়সার ঝি—আমার 'পর তম্বি করবার জন্যে সকলে রয়েছে। আমি সহ্য করলাম—আর কেউ সহ্য করবে না। অত মেজাজ .... অফিসে চাকরিও যাবে একদিন—ঠোঁটে মুখে হাজার রঙ ঘষলেও আর একটা চাকরি জুটবে না .... তা না জুটুক ... চোখের সামনে বাপ-মা না খেয়ে মরবে .... যেন তাদের বুঝিয়ে দেবে, কেমন আমার উপর নির্ভর করেছিলে তো .... তখন হাতে পায়ে খালাস হবে .... ঐ টিউটোরিয়ালের চাকরি তো থাকবেই না .... অত না গেলে চাকরি থাকে .... ওখানে তো রঙ মাখা মুখ দেখে শুধু চলবে না। তাও যদি চেহারা ....।

এবার রমা ঘর থেকে বের হয়ে আসে। ঝগড়ার গন্ধ ওকে উন্মাদ করে তোলে। এতক্ষণের ক্লান্তি গ্লানি ক্ষোভ যে প্রকাশের পথ খুঁজছিল তা হুড়মুড় করে বের হয়ে আসতে চায়।

—আমি চাকরি পাবার পর একদিনও না খেয়ে থেকেছো?

—আমি তো বাপু তোমাকে কিছু বলছিনে—গায়ে পড়ে ঝগড়া করতে এস না।

—আমাকে বলছ না তো কাকে বলছ? আমার সম্পর্কেই তো বলছ।

—কি, তুই রোজগার করিস বলে নিজের মনে একটা কথাও বলতে পারব না—এত বাড় হয়েছে তোর। হে ঈশ্বর তুমি যদি সত্য হও—তবে তেরাত্রিরও যেন ওর চাকরী থাকে না—কোথাকার মহারানিরে—অ্যা- আমাকে হুকুম করতে আসিস ....মহারানি শাকচুন্নী দেখলে ভয় পায় .... আমার মহারানি।

—তুমি জানো আমি কেন টিউটোরিয়ালে যাই নি। লোয়ার চিৎপুর থেকে হেঁটে এসেছি—চারদিকে বোমা খুন—লোকে চারটের পর রাস্তায় থাকে না আর আমি হেঁটে একা একা এতটা পথ—রমার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসে। কিন্তু উদ্‌গত অশ্রুকে দমন করে আবার বলে—বাবা-মা সকলের চিন্তায় ব্যাকুল হয়ে থাকি—আর তোমরা? মেয়ে একদণ্ড বাড়ি বেশি থাকলে .... এমন মা যদি কারো ....রাস্তায় ঘাটে কিছু ঘটলে তখন

পেটভরে খেও—শাকচুন্নী তো আমি .... রমা কাঁদতে থাকে। মাও এবার ডাক ছেড়ে কেঁদে ওঠেন—এমন স্বামী যার .... এমন বেতো হাঁপানী রোগী যার স্বামী তার কপালে .... একটা কথা জিজ্ঞেস করবার উপায় নেই—খেতে দিয়ে কী খোঁটারে বাবা .... আর যদি ওর রোজগার যাই আমি মরা বাপের পিণ্ডি ....।

রমা ও মা একসঙ্গে কাঁদতে ও গালাগাল করতে থাকেন। ....

এবার রমার বাবা এসে জিজ্ঞেস করেন—কী হচ্ছে কী?

রমা আঁচলে চোখ ঢেকে কাঁদতে থাকে।

এবার মা তেড়ে ওঠেন—কী হচ্ছে কী? জজ এসেছেন বিচার করতে? কী হচ্ছে—পাশের ঘরে বসে সব শুনে এসে ন্যাকামি করা হচ্ছে—কী হচ্ছে কী? তোমার .... তুমি ....লাই ....দিয়ে ....নিজে অক্ষম অপদার্থ বলে আমাকে আজ যা শুনতে হয়।

—তোমাকে না আমি নিষেধ করেছি শাকচুন্নী বলবে না?

—ওরে আমার গুরুঠাকুর রে—তুই নিষেধ করবার কে রে .... দেব একদিন বিষ ঢেলে ....হারামজাদা বেতো রুগী .... রোজগারী মেয়ের তোষামোদ করতে এসেছিস।

—চোপরাও .... কোথাকার রূপসী এসেছেন .... রূপ দিয়ে টাকা রোজগার করতে না পারার দুঃখ তো আমি বুঝি?

—বদমায়েসী করতে না পারবার দুঃখ ....খবরদার তুই তোকারি করবি তো তোর মাথা ভেঙে দেব।

কি মাথা ভেঙে দেবে .... বাবা-মেয়ে দুজনে মিলে রুষছে- ছেঁচ্ছে...থাকব না এ সংসারে আমি ...বলে তিনি হন হন করে বের হয়ে যান।

—যা তোর কোন বাপের বাড়ি যাবি যা—।

—তোর মরা বাপের বাড়ি যাব হারামজাদা....হাঁফ উঠলে কুঁই কুঁই করে ....খেয়ে এখন গায়ে তেল হয়েছে।

তিনি বের হয়ে যান। রমা ক্লান্ত হয়ে ভাবে, এতটা পথ হেঁটে এসে আবার বাসা থেকে বের হয়ে চিলড্রেনস পার্ক পর্যন্ত যেতে হবে।—আর শরীরে দেয় না।

স্ত্রী বের হয়ে যেতেই বাবা আবার তম্বি শুরু করেন যেমন মা—তেমনি মেয়ে। দেখা হলেই ঝগড়া। বাড়িতে এক বিন্দু শান্তিতে তিষ্ঠোতে দেয় না—আমি একটা অসুস্থ লোক তা যদি কারো মনে থাকে—কেবল রাগ আর রাগ—কার কী হল না হল তা নিয়ে কারো ভাবনাচিন্তা আছে?—কেবল রাগ। ভদ্রলোক ঘরে গিয়ে হাঁফাতে হাঁফাতে বলতে থাকেন—কোনওদিন তো শুনলাম না এসে জিজ্ঞেস করছে, আজকে বাবা কেমন আছে? কোনওদিন তো শুনলাম না—এটা বাবা ভালোবাসে—বাবার জন্যে নিয়ে এলাম। ঝগড়া করুক গালাগাল করুক তবু ঐ মেয়েছেলেটা ছিল বলে তবু মুখে জল দেবার লোক ছিল—নইলে উপোস করে মরে থাকতে হত। উঃ একটা কপাল করে এসেছিলেম বটে—মেয়ে মানুষ স্বামীকে এমন গালাগাল দেয় কেউ যদি ভূ-ভারতে ....জানে যখন সকলেই রাগ করলে জ্ঞান থাকে না তখন কি একটু সহ্য করলে মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যায়।

মা-বাবা বুড়ো মানুষ ....দুঃখে কষ্টে আছে, কী বলতে কী বলে, না হয় একটু সহ্য

করলাম ....তা সহ্য এ বাড়িতে যদি কারো থাকে ....সপ্তমে চড়ে আছে সবাই। এবার ভদ্রলোকের মনে হয় বুকটা বড্ড বেশি তোলপাড় করছে—রাগ যেন বেশি করে ফেলেছেন। হাত-পাগুলো যেন একটু একটু কাঁপছে। হাতটা সামনে ধরে পরীক্ষা করলেন, না, কাঁপছে বলে তো মনে হয় না। বড্ড ক্লান্ত লাগছে। বুকটা এমন কাঁপছে। ভদ্রলোক এবার রমাকে ডাকলেন—সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বরকেও ডাকলেন—মা, এদিকে আয় তো—হরিবোল হরি। ভদ্রলোক একটু শরীর খারাপ হলেই অ্যাডভান্স হরিকে ডেকে নেন যাতে হঠাৎ মৃত্যু ঘটলে হরিকে ডেকে উঠতে না পেরে মরবার সময় হরির নাম করবার চান্সটা নষ্ট না হয়—তাই আগেভাগে শরীর খারাপ হলেই .....।

—দুফোঁটা কোরামিন দে তো ....বুকটা কেমন করছে। আয় বোস আমার কাছে .... লেখাপড়া শিখেছিস, জ্ঞান হয়েছে, তুই ঝগড়া করিস কেন? সারাদিন তোর মা তোর জন্যে কী ভাবে কাটায় তা যদি দেখতিস .... শোকে তাপে মানুষটার মধ্যে কিছু আছে নাকি .... অত বড় একটা সোমত্থ ছেলে মরে গেল ....হ্যাঁ হ্যাঁ দুফোঁটা ....জলটা ফ্লাস্কে ছিল তো? ওষুধটা খেয়ে তিনি একটু চোখ বুজে থাকেন—আজকে বন্ডেল গেটের অবিনাশ কাকা এসেছিল .... বলল, ক্রিটেগরাস হোমিওপ্যাথির একটা ওষুধ ....হার্ট পেইন উঠলে নাকি অব্যর্থ ....খুব দাম নয় ....মাইনে পেলে ....জানি আনবি, তুই কেমন করে সব করিস আমি তো ভেবে পাই না .....হ্যাঁরে তোর ইংরেজি শুনে খুব তাক লেগে যায় না সবার .....তর তর করে যখন বলিস .... দেখ এক কাজ কর, এ মাসে বরং মাকে কিছু কিনে দে ....একটা ভালো দেখে শাড়ি দিস না হয় ....ভালো শাড়ি বোধ হয় ওর একটাও নেই ....আমার ক্রিটেগরাস না হয় নাই দিলি, তার বদলে তোর মাকে ....ওকে ডাক্তার দেখানো দরকার এত মাথা গরম ..... রাগের মাথায় যেমন করে রাস্তা দিয়ে ছোটে .....গাড়ি ঘোড়া চারদিকে। আজকাল নাকি আবার বোমটোম পড়ছে বলছিলি তুই ....একা একা পার্কে বসে থাকা .... না না পাজি লোক চারদিকে।

বাবা একটু দম নিতেই রমা চলে আসে। নইলে বাবা এখন থামবেন না।

স্ত্রীকে বেশিক্ষণ না দেখলে ভারি অসহায় বোধ করেন। চিলড্রেনস পার্কটা যদি না থাকত .... কী যে এক ব্যামো হয়েছে রাগ হলেই বের হয়ে যাবে ....। ভদ্রলোক দেখলেন, রমা ঘরে চলে গেল। .... কী সব গালাগাল করে ওর মা .... শাকচুন্নী ..... সোমত্থ মেয়েকে শাকচুন্নী .... রমার রাগ পড়বে কখন কে জানে .... পার্কে বসে একা ..... শীতকাল-হিম পড়ে ..... অসুখ বিশুখ করলে কে দেখে .... যা তা বলে আমাকে .... রাগলে অন্য মানুষ হয়ে যায় .... কেমন যেন হয়ে গেল .... কখনও হাসে না .... সব সময় ছনছন ....অথচ এমন ছিল না .... যেন হাসিটিও এক লজ্জার ব্যাপার .... প্রথমদিকে বেশি দেরি করে এলে অভিমানে বুকে মুখ লুকিয়ে কাঁদত .... আর সেই এখন কথায় কথায় হেঁপো বেতো .... এমনি সংসার বটে।

তিনি নিজে যে কী ভীষণ পাল্টেছেন তা কিন্তু তাঁর মনে এল না। তিনি, প্রদ্যোৎবাবু ছিলেন। পূর্ববঙ্গে বিক্রমপুরে অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলেই ছিলেন। ম্যাট্রিক পাশ করে আর্ট স্কুলে এসে ভর্তি হন। চমৎকার আঁকবার হাত ছিল।

আর্টস্কুলের শেষ বছর প্রতিবেশী এক মেয়ের সঙ্গে ভাব হয়। প্রদ্যোৎবাবু ছিলেন

কায়স্থ আর মেয়েটি ছিল ব্রাহ্মণ। সুতরাং স্বাভাবিক বিয়ের পথ ছিল না। একদিন তিনি মেয়েটিকে নিয়ে কাশী চলে যান। সেখানেই বিয়ে করেন। মেয়েটির বাপের বাড়ির অবস্থা খুব ভালো ছিল—প্রদ্যোৎবাবুদের তুলনায় অনেক ভালো। তিনি ও তাঁর স্ত্রী আর কোনদিন মেয়ের মুখদর্শন করেননি। ভাই-বোনেরা কোনও সম্পর্ক রাখেনি। রমার মার বাপের বাড়ির দরজা চিরকালের জন্যে বন্ধ হয়ে যায়। তবে নানা সূত্রে খোঁজ খবর পায়—ওরা তিন বোন ছিল—তার মধ্যে রমার মাই সবচেয়ে সুন্দরী। আর দুবোন ভালো জায়গায় বিয়ে হয়েছে—একজনের প্রফেসরের সঙ্গে অপরজনের এস.ডি.ও.-র সঙ্গে। পরপর দুটি সন্তান হয়—প্রথমে ছেলে নিন্টু, পরে রমা।

এদিকে নিজের মতে বিয়ে করবার জন্যে প্রদ্যোৎবাবুর বাবা মাসোহারা বন্ধ করে দিলেন। প্রদ্যোৎবাবু তখন বাবাকে এক কড়া চিঠি লিখলেন—লিখলেন ব্রাহ্মণের মেয়েকে বিয়ে করে তিনি বংশের মর্যাদা বাড়িয়েছেন—ভবিষ্যতেও শিল্পী হিসাবে তার সুখ্যাতি হবে তাতে বংশের গৌরবই বাড়বে। এমতাবস্থায় তিনি যদি মাসোহারা বন্ধ করে দেন—তবে প্রদ্যোৎবাবু নিজের পিতার পরিচয় স্বীকার করবেন না অর্থাৎ বাবাকে ত্যজ্য করবেন। বাবাকে রমার মার গুণের কথা নিয়ে—কত যে সুন্দরী তার প্রমাণ হিসেবে স্ত্রীর একটি চিত্র এঁকে বাবাকে চিঠির সঙ্গে পাঠালেন। বাবা টাকা পাঠালে তিনি সস্ত্রীক বাবার শ্রীচরণদর্শন করতে যাবেন তারও প্রতিশ্রুতি চিঠির শেষে দিয়ে শতকোটি প্রণাম জানিয়ে পত্র শেষ করলেন। বাবা কোনও উত্তর দিলেন না। বন্ধুরা বললেন, স্ত্রীর ফটো বাবার কাছে পাঠানো ঠিক হয়নি। প্রদ্যোৎবাবু তখন বাবার একটি ছোট 'পোট্রেইট' এঁকে বাবাকে পাঠিয়ে দিলেন। বাবার তরফ থেকে কোনও সাড়া-শব্দ নেই।

এদিকে রমার মা বের হয়ে আসবার সময় হাতে একগাছি করে চুড়ি ছাড়া আর কিছু আনেননি। কারণ পাছে সাজগোজ করলে কিছু সন্দেহ করে এজন্যে নিতান্ত সাধারণ আটপৌরে ভাবে বের হয়ে এসেছিলেন। একটা পরিষ্কার শাড়ি পরে ঠিক দুপুরে সকলের অলক্ষ্যে বাড়ি থেকে বের হয়ে ট্রাম রাস্তায় এসে হাজির হন—সেখানে গম্ভীরভাবে পাইপ মুখে বড়ুয়া কাফের শার্ট ও শান্তিপুরী ধুতি ও পাম্প শু পায়ে প্রদ্যোৎবাবু পায়চারী করছিলেন—তখন রমার মার বয়েস সতেরো আর প্রদ্যোৎবাবুর বাইশ কি তেইশ। তক্ষুণি দুজনে একটি বাসে উঠে হাওড়া স্টেশন—সেখান থেকে বেনারস। সে সময় প্রদ্যোৎবাবু গোটা দুই অয়েল পেইন্টিং করে কিছু টাকা পেয়েছিলেন—তাই সম্বল। বেনারসে বিয়ে হল। বেনারসে একজন পাণ্ডা প্রদ্যোৎবাবুকে দিয়ে ছবি করিয়ে কোনও পয়সাই দিল না—কেবল ঘোরাতে লাগল। অবশেষে কলকাতা এসে শিয়ালদহের একটি হোটেলে উঠলেন। সেদিন এক বন্ধুর কাছে বাসার সন্ধান পেয়ে কুড়ি টাকায় বর্তমান বাসাটি ভাড়া নেন। একদিকে সামনেই আর্ট কলেজের পরীক্ষা। ওদিকে বাবার মাসোহারা বন্ধ। একদিকে সংসার চালানো ও অন্যদিকে মাস গেলে বাড়িভাড়া গুনে দেওয়া—প্রদ্যোৎবাবু অথৈ জলে পড়লেন। এ সময়ে তিনি প্রায়ই আফসোস করতেন, বাবাকে বিয়ের খবরটা না জানালে বোধ করি মাসোহারা বন্ধ হত না। ছায়া মানে রমার মার অনুরোধেই একাজ তিনি করেছিলেন বলে রমার মার নির্বুদ্ধিতাকেই প্রায়ই ধিক্কার দিতেন। কিন্তু বিয়ে করে তিনি এত খুশি ও উল্লসিত হয়েছিলেন যে সংবাদটি বাবাকে

দেবার জন্যে ছটফট করছিলেন—কিন্তু ভয়ে জানাতে পারছিলেন না। ছায়ার অনুরোধে তিনি সাহস পেয়েছিলেন মাত্র। তাছাড়া সাধারণ পুরুষদের যে কুসংস্কার থাকে অর্থাৎ মেয়েরা সংসারটা বোঝে ভালো, অনেক বেশি প্র্যাকটিকাল হয়—সেই ধারণার বশবর্তী হয়ে তিনি ভাবলেন, ছায়া আমার চেয়ে ভালো বোঝে বলেই বলেছে—ওরা প্র্যাকটিকাল জগতের—আমি আর্টিস্ট মানুষ—যদিও ছায়া নির্দোষ পবিত্র স্কাইলার্কের নারীমূর্তি। ছায়ার চলা বলা হাসি কান্না সব কিছুই অসাধারণ সৌন্দর্যের একটি বিকাশ বলে প্রদ্যোৎবাবুর কাছে মনে হত। বড়লোকের ব্রাহ্মণের মেয়ে তদুপরি দেবীদুর্লভ সৌন্দর্য, প্রদ্যোৎবাবু সবসময় অভিভূত হয়ে থাকতেন। এ সময়ে কতভাবে ছায়ার বিভিন্ন পোজের ছবি এঁকেছিলেন তার ঠিক নেই। তাকে নিয়ে প্রদ্যোৎবাবুর এই মাতামাতিতেও ছায়া মহাখুশি, সানন্দভাবে বিব্রত। সারা বিকেল হয়তো চলল ছবি আঁকা—ছায়া মডেল বলে ঢাকাই পরোটা ও ছোলার ডাল নিয়ে এল। ছায়াও এক কথায় রাজি। স্বচ্ছল ঘরের মেয়ে—বাপের বাড়িতে ঠাকুর চাকর ছিল—রান্না ঠিক ভালো আসে না।

অবশেষে সংসার চালানো যখন কঠিন হয়ে উঠল তখন প্রদ্যোৎবাবু মহাত্মা গান্ধীকে এক চিঠি লিখলেন। নিজের বাবা ও শ্বশুরের বিরুদ্ধে। অসবর্ণ বিয়ে করেছেন বলে তাঁর বাবা ও শ্বশুর তাদের পরিত্যাগ করেছেন—মহাত্মা গান্ধী যেন এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেন। সঙ্গে পাঠালেন অতি যত্নে আঁকা মহাত্মাজীর একটি ছবি। মহাত্মাজী তখন নোয়াখালিতে। তবু অবিলম্বে তিনি উত্তর দিলেন—স্বাধীনভাবে বিয়ে করবার যে সাহস তুমি দেখিয়েছ—সেই সাহসের 'পরই তোমাকে নির্ভর করতে হবে। বাবা বা শ্বশুরের অনুগ্রহে ভিক্ষা করা ঐ সাহস থেকে বিচ্যুত হওয়া।

পরীক্ষা দেওয়া হল না। তখন কমার্সিয়াল আর্টের এত চাহিদাও ছিল না—সুতরাং কমার্সিয়াল আর্টিস্ট হিসেবে প্রতিষ্ঠার সুযোগও ছিল না। তবু এখান সেখান থেকে অর্ডার জোগাড় করে কোনওমতে দিন চলতে লাগল। অনাহার অনশন নিত্যসঙ্গী হয়ে উঠল—এদিকে ছায়াও সন্তানসম্ভবা। সারাদিন এখানে ওখানে ছবি নিয়ে ও অর্ডারের জন্যে ঘুরে বেড়ান—নিজের হয়তো এককাপ চা এখানে সেখানে জোটে—কিন্তু বাড়িতে অভুক্ত আসন্ন প্রসবা নারীটির জন্যে প্রদ্যোৎবাবু পাগলের মতো ঘুরে বেড়ান। হঠাৎ ভাগ্য সদয় হল। প্রদ্যোৎ পিতার মৃত্যু সংবাদ পেলেন। যাইহোক পাশের বাড়ির এক ভদ্রমহিলার 'পর ছায়ার দেখাশোনার ভার দিয়ে নিজে দেশে গেলেন—শ্রাদ্ধের পর বাবার সম্পত্তির নিজের অংশটুকু অন্য ভাইদের কাছে বিক্রি করে কিছুকাল পরে আবার কলকাতা এলেন। কলকাতা আসবার তিনদিন পরে প্রদ্যোৎবাবুর ছেলে হল—প্রথম সন্তান। ছেলের নাম রাখলেন প্রদ্যোৎবাবুর পরমারাধ্য শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম অনুসারে অবনীন্দ্র সংক্ষেপে 'অবন'। বাড়ি ঘর দোরে অবস্থার উন্নতি করলেন—বাড়িভাড়া সব শোধ। ঢাকাই পরোটার দোকানে আর বাকি নেই। সারাদিন কাজকর্ম করবার জন্যে একটি মেয়েছেলে—ছায়ার হাতে গয়না, গলায় হার, সোনা বাঁধানো শাঁখা, দুটি সর্বদা পরবার শাড়ি আর দুটি ভালো শাড়ি। এবার প্রদ্যোৎবাবু অনেক চেষ্টাচরিত্র করে একটি প্রদর্শনী করলেন। প্রদর্শনীটি সুন্দর হয়েছিল—যাঁরা এসেছিলেন তারা আন্তরিকভাবেই প্রশংসা করেছিলেন। কিন্তু পত্রিকায় সমালোচনা যাঁরা করলেন—তাঁরা মোটেই প্রদ্যোৎবাবুর

উপর সুবিচার করেননি। একজন নিজের পাণ্ডিত্য দেখিয়ে শেষে দুচারলাইন নিতান্ত তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের সঙ্গে পিঠ চাপড়ালেন—আরেকজনও অত্যন্ত কৃপণ প্রশংসা করলেন। এই দুজন আর্ট সমালোচক প্রদ্যোৎবাবুর পরিচিত—এবং সমালোচনার সময় এঁরা মোটেই নিরপেক্ষ ছিলেন না। যাই হোক বেশ কটি ছবি বিক্রি হলেও এই প্রদর্শনীর মধ্যে যে নাম ছড়িয়ে পড়বে প্রদ্যোৎবাবুর এই অধীর আগ্রহ প্রায় ব্যর্থ হল। ছবি বিক্রির অর্থ সামান্যই এল—প্রদর্শনীতে খরচই হল বেশি—পত্রিকার দায়িত্বজ্ঞানহীন সমালোচনায় প্রদর্শনীটি দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হল। মোটের 'পর প্রদর্শনীটি ব্যর্থ হওয়ায় প্রদ্যোৎবাবু যেন দমে গেলেন। যদিও প্রদ্যোৎবাবু আজও জানেন না, কে কে তাঁর সমালোচনা করেছিল। তবু সবার উপর একটা অভিমান হল। ইতিমধ্যে টাকা নিঃশেষ হয়ে এল। প্রদর্শনীর সমালোচনা ভালো না হবার আরেকটা ফল খুব কম অর্ডার পেতে লাগলেন। বাড়িতে রান্না-বান্নার লোকটিকে ছাড়িয়ে দেওয়া হল—আবার বাড়িভাড়া বাকি পড়তে লাগল। ঢাকাই পরোটার দোকানে আবার একশো টাকার নোট রয়েছে খুচরো নেই ভাঙিয়ে দিয়ে যাব বলে বাকিতে ঢাকাই পরোটা ও ছোলার ডাল আসতে লাগল। ইলেকট্রিকের বিল দিতে না পারায় কানেকশন কেটে দিয়ে গেছে। অন্ধকার ঘরে সরষের তেলের সেঝ জ্বেলে স্ত্রী ও ঐ দুগ্ধপোষ্য বাচ্চা ঢাকাই পরোটা ও ছোলার ডাল খেতে লাগলেন।

অবস্থা চরমে উঠল—রঙ, কাপড়, কাগজ কেনবার পয়সাও ফুরিয়ে গেল—অনাহারে অনশনে ছায়া ধুঁকছে, বুকে দুধ শুকিয়ে গেছে, বাচ্চা সকাল থেকে খাবার জন্যে চিৎকার করছে—ছায়ার গয়নাগুলো এর আগেই বিক্রি হয়ে গেছে—তক্তাপোষটি বিক্রির জন্যে হয়তো খদ্দের খুঁজতে প্রদ্যোৎবাবু বেরিয়ে গেছেন—কী খাবেন, বাচ্চাটি কী খাবে কিছু স্থির নেই—এদিকে ছায়া আরেকটি সন্তানের জননী হবার জন্যে আতঙ্কে অনশনে অধীর হয়ে উঠছেন—বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজন সবাই পরিত্যাগ করেছেন—সে এক কঠিন দুঃসময়। অবশেষে প্রদ্যোৎবাবু কিছু চেষ্টাচরিত্র করে একটি স্কুলে ড্রইং টিচারের চাকুরি পেলেন। এ সময়েই রমার জন্ম। লক্ষ্মীকে বেঁধে রাখবার জন্যে নাম দিলেন 'রমা'। একটা প্রদর্শনী করেছিলেন আর্ট কলেজে ফাইনাল ইয়ার পর্যন্ত পড়েছিলেন—ম্যাট্রিক পাস করেছিলেন—ছবির সঙ্গে এসব দেখিয়ে চাকরি জুটল—অতি সামান্য বেতন। এক্সপ্রেসনইজম ও সিমবলইজম বাদ দিয়ে ক্লাসে ক্লাসে ডাব আর প্রজাপতি আঁকতে লাগলেন। আঁকানো শেখাতে লাগলেন।

নিচের ক্লাসে পড়াবার জন্যে দু-একটা প্রাইভেট টিউশনিও পেলেন সামান্য টাকায়। এদিকে স্কুলে ড্রইং টিচার হিসেবে কোনও সম্মান নেই—নিচের ক্লাসে পড়ান। প্রাইভেট টিউশনিতে বাচ্চাদের পড়াতে পড়াতে মাথা গরম হয়ে যায়—আবার গার্জিয়ানরা পাশে বসে থাকেন যাতে প্রদ্যোৎবাবু ফাঁকি না দেন। ড্রইং টিচার হওয়াতে বন্ধুবান্ধব ও শিল্পীমহলেও পরিচিত মহলে তার সম্মান কমে গেল বলে তিনি যাতায়াত কমিয়ে দিলেন। এ সময়ে প্রায়ই তিনি ঘন্টার পর ঘন্টা গুম হয়ে, স্তব্ধ হয়ে বসে থাকতেন, কখনো কখনো একা ঘরে দরজা বন্ধ করে কাঁদতেন। অবশ্য ছায়াকে জানতে দিতেন না। তবু তিনি না এঁকে পারতেন না। এ সময়ের বেদনা একটি ছবিতে উঠেছিল—তার ও রমার

পাশাপাশি দুটো কঙ্কাল চেহারা—আশেপাশে হৃষ্টপুষ্ট খুশি মানুষরা যে যার মত গুচ্ছে গুচ্ছে গল্প করছে এ সময়ে 'প্রেমের পূজায় এইলভিনুফল' নাম দিয়ে কটি ছবি এঁকেছিলেন—তিনি ও রমা পরস্পর আলিঙ্গনাবদ্ধ। প্রথম ছবিতে দুজনেই সুন্দর স্বাস্থ্যের অধিকারী পরের ছবিতে কিছুটা রুগ্ন, পরের ছবিতে হাড়সার, শেষে দুটি কংকাল শুধু আলিঙ্গনাবদ্ধ -। এ সময়কার ছবিগুলোতে একটা বিষণ্ণতার ব্যঞ্জনা অনায়াসেই পাওয়া যায়। ছবিগুলো যেমন সজীব তেমনি বাস্তব স্পর্শপুষ্ট, তেমনি ব্যঞ্জনায় তীক্ষ্ণ। তিনি আঁকতেন। আর রেখে দিতেন। মাঝে মাঝে দু-চার জায়গায় ঘুরে বেড়াতেন—এখানে সেখানে ছবি নিয়ে তদ্বিরও করতেন—কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় না—হল না। তাছাড়া উদ্যম যেন একদম নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। ঠিক এই সময় থেকেই তাঁর হাঁপানীর টান শুরু হয়। ....মাঝে মাঝে রাতে শুয়ে শুয়ে প্রতিজ্ঞা করতেন আবার সংগ্রাম করবেন—ফাইনাল পরীক্ষাটাও দিয়ে দেবেন—এ অবস্থাকে কাটাতে হবেই। কিন্তু সকালে উঠে জোর পেতেন না, উৎসাহ পেতেন না, ব্যর্থতা ও হতাশা নিয়ে স্কুলে ডাব আর প্রজাপতি আঁকাতে দশটার সময় চলে যেতেন। কখনো কখনো আত্মহত্যা করতে ইচ্ছে হত—কখনো কখনো যারা ওকে উঠতে দিল না তাদের খুন করতে ইচ্ছে হত—কিন্তু তার বদলে সন্ধ্যায় অভিভাবকের সামনে বসে ছাত্রদের পড়ান। বাড়িতে এসে একলা ঘরে একটু একটু অ্যাবস্ট্রাক্ট আর্টের চর্চা। এদিকে সংবাদপত্রে ছবি পাঠান দু-একটা। ফেরত আসে নিয়মিত। ছবি প্রায় না দেখেই ফেরত আসে। বুঝলেন সোর্স না থাকলে তাঁর কিছু হওয়া সম্ভব নয়। বন্ধুবান্ধবদের কাছে গেলে লম্বা-চওড়া বক্তৃতা শুনতে হয়। ইতিমধ্যে তাঁর চেনাপরিচিত অনেকেই নাম করে যেতে লাগলেন। প্রদ্যোৎবাবু বাড়ি থেকে বের হওয়া বন্ধ করে দিলেন। স্কুল ও টিউশনির সময় বাদ দিয়ে চুপচাপ শুয়ে থাকতেন। মেজাজও ভারি খিটখিটে হয়ে গেল। অন্তরঙ্গ দু'একজন হয়তো জিজ্ঞেস করতেন—এখন কী করছ? প্রদ্যোৎবাবু জবাব দিতেন—চূড়ান্ত পরাজয়ের জন্যে তৈরি হচ্ছি। .... স্কুলের সংস্কৃত শিক্ষক হাত দেখতে পারতেন—কোষ্ঠী করতে পারতেন। টিফিন পিরিয়ডে অনেকেই তাকে হাত দেখিয়ে সময় কাটাতেন। প্রদ্যোৎবাবু কতবার যে তাকে হাত দেখিয়েছেন—তাকে দিয়ে 'ছক' তৈরি করে তাকেই কতবার 'ছক' পড়তে দিয়েছেন তার ইয়ত্তা নেই। তাঁর বাড়িতে গেছেন—তাঁর বাচ্চাদের জন্যে মিষ্টি কিনে নিয়ে তাকে 'সুসময়' কবে আসবে সেই পুরনো প্রশ্ন নূতন আবেগে করেছেন: তার ভবিষ্যৎবাণী ব্যর্থ হলেও -তাঁর দেওয়া '১৭ জুন' বা '১৮ই নভেম্বর' যেদিন শনির বক্রী ছেড়ে গিয়ে প্রদ্যোৎবাবুর সুসময় আরম্ভ হবার কথা—তা কিছু না হওয়া সত্ত্বেও প্রদ্যোৎবাবুর মোহ কিছুতেই কাটাতে চায় না। বার বার এক প্রশ্ন—নিজের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সেই কৌতূহল। অথচ নিজে তিনি জানতেন, বুঝতেন, এমনকি বলতেনও—আত্মবিশ্বাস কি ভীষণভাবে কমে গেলে আপনার কাছে আসি তা আপনি বুঝবেন না পণ্ডিতমশায়। আমি ঠিক জানি আমার পরাজয় হয়ে গেছে, আমি হেরে গেছি—কিন্তু তা মানতে পারি না বলেই আপনাদের কাছে ছুটে আসি। গ্রহ-উপগ্রহ ও রাশি নক্ষত্র আমার ক্ষতি করেনি—আমার ক্ষতি করেছে মানুষ, কিছু আত্মীয়, বন্ধু, পরিচিত-অপরিচিত লোকেরা আর আমি নিজেও।

প্রথম প্রথম সহকর্মীদের কাছে নিজের আর্টজীবনের কথা, তাঁর প্রদর্শনীর কথা, তাঁর সম্পর্কে ষড়যন্ত্রের কথা ইত্যাদি বলতেন—অর্থাভাবে শেষ পরীক্ষা না দিতে পারবার কথা—(বিয়ে করবার জন্যে বাবা মাসোহারা বন্ধ করে দিয়েছিলেন সে কথা চেপে যেতেন) আর শীগগীর ফাইনাল পরীক্ষা দেবার ইচ্ছার কথাও জানাতেন। সহকর্মীরা এ নিয়ে পরোক্ষে যখন নানা পরিহাস ও ব্যঙ্গ করতে শুরু করলেন—তখন জানতে পেরে তিনি নিজের সম্পর্কে বাইরে কথা বলা বন্ধ করে দিলেন। পরে তিনি যে আঁকতেন একদা একথা সম্পূর্ণই চেপে গেলেন—তিনি একজন ড্রইং শিক্ষক আর কিছু নন। শুধু রবীন্দ্রনাথের একটা প্রতিকৃতি এঁকে তিনি স্কুলকে প্রেজেন্ট করেছিলেন। ছবিটি দেখে সবাই প্রশংসা করেছিলেন—কিন্তু তিনি আশ্চর্য হয়ে দেখলেন, প্রশংসা শুনবার যে অসীম আকাঙ্ক্ষা তাঁর অন্তরে রয়েছে তা যেন কিছুতেই এই প্রশংসা গ্রহণ করতে পারল না। পরন্তু প্রশংসা কতটা ব্যঙ্গ কতটা ভদ্রতামাত্র কতটা নিছক সৌজন্য এ বিষয়ে তার ঘোরতর সন্দেহ ছিল। তিনি বুঝলেন। প্রশংসা শুনে সুখী হবার মন তাঁর মরে গেছে। আর ছবি আঁকতে হয়—আঁকবার সময় একটুও আনন্দ পান না—শেষ করবার পর আনন্দলাভের চেয়ে শ্রান্তিই বেশি। বুঝলেন, আর বেশিদিন আঁকতে পারবেন না। আঁকতে ইচ্ছেও করত না। ঘন্টার পর ঘন্টা চুপচাপ শুয়ে ভাবতেন—বাইরের জগৎ আমাকে অস্বীকার করেছে এবং অন্তর জগৎ থেকেও তাড়িয়ে দিচ্ছে। ঘরে বাইরে আশ্রয়হীন। বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে মেলামেশা বন্ধ করে দিলেন। শিল্পী বন্ধু বান্ধবদের কাছে কখনও যেতেন না। দূর থেকে তাঁদের কাউকে দেখলে সামনে যে গলি পেতেন ঢুকে পড়তেন। যদি দৈবাৎ কোনও দলের সঙ্গে দেখা হত—এত নার্ভাস লাগত নিজেকে দু'মিনিট কথা বলে যে কোন ভাবে বিদায় নিয়ে চলে আসতেন। তাদের সমাজে তিনি যে অস্পৃশ্য, ত্যাজ্য, ব্রাত্য একথা প্রবল হীনতাবোধের সঙ্গে সে সময়ে তাকে অস্থির করে তুলত। কোনও মতে হাফ ছেড়ে বাঁচতেন। যদি কেউ তাঁর শিল্পচর্চার প্রসঙ্গ তুলতেন তবে তিনি একটু হাসতেন—ভাবখানা অল্প বয়সের খেয়াল—ও নিয়ে আর কে মাথা ঘামায় নিজের প্রদর্শনীর পর থেকে তিনি প্রদর্শনী এমনকি জানুয়ারি মাসের বার্ষিক প্রদর্শনীও যাওয়া ছেড়ে দিলেন। পত্রিকাতে শিল্পের সমালোচনাও খবরাখবর পড়াও বন্ধ করে দিয়েছিলেন—শেষে পত্রিকা পড়াও বন্ধ করলেন। পত্রিকা আর নেন না—স্ত্রীকে বললেন, খরচ কমানো দরকার—কাল থেকে পত্রিকা না দিতে বললাম। মনে মনে বললেন, জগৎ যখন আমার কোন খবর নিল না তখন জগৎ সম্পর্কে আমারও কোনও মাথাব্যথা নেই। আস্তে আস্তে আর্ট সম্পর্কে কেমন একটা বিদ্বেষ যেন ভেতরে ভেতরে গড়ে উঠল। এতদিন কোন আর্টিস্টই কিছু নয়—যত আর্টিস্ট নাম করেছে তা নিজের প্রতিভায় নয়—ব্যাকিং এর জোরে একথা সব সময়ই বলতেন। নাম খ্যাতি যশ অর্থ এগুলোর পেছনে প্রতিভা নয়—রয়েছে 'Source' ও 'Backing'। কিন্তু আজকাল তিনি আর্টের চেয়ে সাহিত্য, বিজ্ঞান এগুলোকে অনেক মূল্য দিতেন। তাঁর কথাবার্তায় আর্ট সম্পর্কে একটা অবজ্ঞা, অবহেলা ও তুচ্ছতাচ্ছিল্য প্রায়ই ফুটে উঠত। চিত্রাঙ্কন ব্যাপার এমন কিছু অসাধারণ প্রতিভার ব্যাপার নয়—একটু চোখ থাকলেই আর রঙের জ্ঞান থাকলেই ....। কবিতা, উপন্যাস—তার ব্যাপারে .... চোখ থাকলে আর কলম

থাকলেই কি হয়? শেষে আর্টের আলোচনা যেখানে হত সেখানে থাকতেনই না আর যদি বা আলোচনায় পড়ে যেতেন তার এত অস্বস্তি ও অস্থিরতা, এত বিদ্বেষ ও আক্রোষ আর্টের পর অনুভব করতেন যে চলে এসে শান্ত হতে সময় নিত। ছুটির দিনে গ্রীষ্মের ছুটিতে, পূজোর ছুটিতে শুধু দিন রাত শুয়ে থাকতেন—একেবারে নীরব, নিরুত্তাপ—হয়তো সারাদিনে একটি কথাও বলতেন না। হয়তো হঠাৎ সুন্দর একটি চিত্র—রচনার বিষয় মুহূর্তে মাথায় খেলে যেত—শুয়ে ছিলেন উঠে বসলেন—আবার শুয়ে পড়লেন। আঁকলেন না। তারপর আর প্রেরণাও আসে না—ইচ্ছেও হয় না। একদম ছবি আঁকা বন্ধ করে দিলেন। নিজের ছবিগুলো বাণ্ডিল করে তক্তাপোষের তলায় চালান করে দিয়েছেন—ঐগুলো যেন দু'চোখের বিষ। ঐ ছবিগুলো তাঁকে লজ্জা দেয়। গ্লানি দেয়। গলগ্রহ মনে হয়। ধুলায় ময়লায় মলিন, মাকড়ষার জালে জর্জরিত ছবিগুলোকে তক্তাপোষের তলা থেকে বেরও করেন না—পরিষ্কারও করেন না—কাউকে ধরতেও দেন না। তাঁর হাবভাবে মনে হত তিনি যে একদা ছবি আঁকতেন একথা যেন তাঁর জীবনের লজ্জাজনক ও গ্লানিকর অধ্যায়। এই নিষিদ্ধ কথা গোপন কথা যাতে প্রকাশ না পায় এজন্যে তিনি সর্বদাই নার্ভাস হয়ে থাকতেন।

ইতিমধ্যে কয়েকজন গুরুর সন্ধানও পেয়েছিলেন। কিন্তু অচিরেই বুঝলেন, গুরুর কাছে সমাদর লাভ করতে গেলে আরো অর্থ ও ডিগ্রির জোর দরকার। একজন ড্রইং টিচারের পক্ষে গুরুর পূর্ণ মনোযোগ আকর্ষণ করা সহজ নয়। তিনি ভাবতেন গুরু আমার ভিতরের ঐশ্বর্য কিছুই বুঝতে পারেন না—যিনি বাইরে সাফল্য ও সার্থকতা দেখে মানুষের মর্যাদা দেন, তিনি কিসের গুরু কিসের অন্তর্যামী? যতসব ....। সাধারণভাবে শ্যামাসংগীত শুনতে চোখে জল আসে। ভক্তিমূলক গান মনকে দোলা দেয়। ধর্মের জন্যে মন ক্ষুধিত থাকলেও তিনি গুরুদের কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারতেন না। শেষ পর্যন্ত গুরু খোঁজাও বন্ধ করে দিলেন। মনে মনে ধারণা হয়েছে। মন আশ্রয় চায় বলেই ধর্ম দরকার। সত্যিকারের ঈশ্বর টিশ্বর কিছু নেই। নইলে এত অবিচার অন্যায় কী করে সম্ভব? ভাগ্যবানরা সবচেয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত—আর দুর্নীতিপরায়ণ লোকেরাই সমাজে সবচেয়ে প্রভাব ও প্রতিপত্তি লাভ করে কেন? মৃত্যুর পরে কিছু নেই—এমন একটা ধারণা তাঁকে পেয়ে বসল। এই ধারণা তাকে যেন এক ধরনের শান্তি এনে দিল এই পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে—আজ যারা আর্টে নাম করেছে একদিন নামশুদ্ধ তাদের কীর্তি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে—কেউই টিকবে না যারা তাকে উঠতে দিল না তারাও রেহাই পাচ্ছে না এই ভাবনা এক ধরনের শান্তি দিত ক'মুহূর্তের জন্যে। কিন্তু তা বলে তিনি নাস্তিক হয়ে যাননি। বের হবার সময় দুর্গানাম করেন বাসায় লক্ষ্মী সরস্বতী পুজোও করেন শরীর অসুস্থ বোধ করলে তাড়াতাড়ি 'হরিবোল'ও বলে নেন অথচ মাঝে মধ্যে কেমন মনে হয়, এই ধর্ম, ঈশ্বর, গুরু এগুলো বোধ হয় মিথ্যে। মৃত্যুর পর কিছু নেই। এর ফলে ধর্মও গুরুর পেছনে ছুটোছুটি আস্তে আস্তে কমে আসে।

বিয়ের পর প্রথম প্রথম ছায়াকে মনে হত অসাধারণ—রূপ, লাবণ্য, সৌন্দর্য, নমনীয়তা ও কোমলতা ছায়ার ভেতরে যেমন ভাবে প্রকাশ পেয়েছে তেমনভাবে কোথাও বোধ হয় না। নিজের স্ত্রীভাগ্যে উচ্ছ্বসিত হয়ে থাকতেন। ছায়ার আনুগত্য, সরলতা,

ছেলেমানুষী ও নিষ্পাপ চাহনি তাঁকে বিভোর করে রাখত। অভাব-অভিযোগ শুরু হবার পর থেকেও ছায়ার পর উদ্দাম আকর্ষণ ও ছায়াকে নিয়ে বিভোরতা কিছুটা কমল বটে তবে গেল না। যা বাজার করে আনতেন—ছায়া এলোমেলো ভাবে তা খরচ করে ফেলতেন—এতে প্রথম দিকে কৌতুকবোধ করতেন—আস্তে আস্তে বিরক্তবোধ করতে শুরু করলেন। মনে হয়, নেই আর নেই সারাক্ষণই ছায়া একটা না একটা সমস্যা তুলে ওকে একটু শান্তিতে আঁকতে দেয় না। মুখে কিছু বলতেন না। স্ত্রী বাপ-মা-ভাই-বোন সচ্ছল সংসার সব ছেড়ে তাঁর কাছে এসে কষ্ট পাচ্ছে এতে তিনি স্ত্রীর কাছে কিছু লজ্জিত, সঙ্কুচিত ও কিছুটা কৃতজ্ঞ ছিলেন। তারপর আস্তে আস্তে স্ত্রীর বেহিসেবী চালচলনে বিরক্ত হতে আরম্ভ করলেন। তবু মুখে কিছু বলতেন না। ছায়া হয়তো এসে নিজের কান্ডজ্ঞানহীনতার জন্য দুঃখ প্রকাশ করতেন। প্রদ্যোৎবাবু নিরস কণ্ঠে হয়তো বলতেন ঠিক আছে, ঠিক আছে। কণ্ঠস্বরের পরিবর্তনে ছায়া একটু অবাক হয়ে প্রদ্যোৎবাবুর দিকে তাকিয়ে থাকতেন। আশা করেছিলেন হয়তো প্রদ্যোৎবাবু হেসে উড়িয়ে দেবেন। একের পর এক সন্তান, অভাব, অনটন, চাকরি খোঁজা তারপর ড্রইং টিচারের চাকরি—খ্যাতি প্রতিপত্তি থেকে বঞ্চিত হওয়া সব মিলে তখন একের পর এক একটি ঝড় প্রদ্যোৎবাবুর উপর দিয়ে যেতে লাগল। তখন ঘন্টার পর ঘন্টা শুয়ে শুয়ে কখনো কখনো ভাবতেন—ছায়া কেবল সমস্যার পর সমস্যা তুলছে—বাসায় একটু এসে বিশ্রাম নেবার উপায় নেই—দুদণ্ড চুপ করে শুয়ে থাকবার উপায় নেই—একটু চুপ করে বসে থাকতে দেখলেই অমনি ছেলের জন্যে মেয়ের জন্যে নানা অর্ডার নিয়ে এসে উত্যক্ত করবে। আগে যে স্ত্রীকে নিজের চোখ ছাড়া করতে পারতেন না এখন তাকে আসতে দেখলে ভয় পান। তবু অভাব-অনটন তিনি সহ্য করেছিলেন কিন্তু শিল্পী হিসেবে প্রতিষ্ঠা যখন ব্যর্থ হয়ে গেল তখন তিনি ভেঙে পড়লেন সবচেয়ে বেশি। বাইরের জগৎ যখন অস্বীকার করে তখন ঘরের অশান্তি প্রবল হয়ে ওঠে। তিনি আজকাল প্রায়ই ভাবতেন, ছায়া শুধু সমস্যাই নিয়ে আসে না, ছায়া নিজেই একটা সমস্যা। তিনি ভেবে দেখলেন ছায়াকে বিয়ে করবার পর থেকেই সমস্যার পর সমস্যা। শেষ পর্যন্ত এই সমস্যাই তাকে জীবনে ব্যর্থ করে দিল। ছায়াকে বিয়ে না করলে বাবা মাসোহারা বন্ধ করে দিতেন না—আর্ট কলেজের কোর্স শেষ করাও সম্ভব ছিল—একটার পর একটা এক্সিবিশন করতে পারতেন—কোথায় চলে যেতেন তিনি। আর আজ কোথায়? সঙ্গে সঙ্গে বুক ধক করে উঠল : হয়তো ছায়া অত্যন্ত অপয়া—ওর ভাগ্যের সঙ্গে জড়িত হয়েই তিনি আজ এ অবস্থায় ....। তিনি কঠোরভাবে নিজের আঁকা ছায়ার ছবিগুলোর দিকে তাকাতেন। ভাবখানা ছায়া অপয়া অলক্ষ্মী হয়ে তাঁর জীবনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে তাকে ব্যর্থ করে দিল। সঙ্গে সঙ্গে মনে হল ছায়ার কাজ কর্মে কোন শ্রী নেই, হাতে কোন আয়পয় নেই। যদি কখনো ছায়া নিজে বলতেন, আমাকে বিয়ে করেই তোমার সব কিছু নষ্ট হল তিনি চমকে যেতেন : যেন ছায়া তাঁর চিন্তাকে তার মুখে ধরতে পেরেছে। তিনি অস্বীকার করে বলতেন আমার জীবনে লাভ তোমাকে বিয়ে করাটুকুই—আর সবই তো বঞ্চনা। তোমাকে না পেলে সবকিছুই বঞ্চনায় ভরা থাকত। সোর্স আর ব্যাকিং না থাকলে এ পৃথিবীতে কিছু করা যায় না। কিন্তু ছায়ার মুখে নিজের মনের চিন্তা শুনতে পেয়ে তাঁর ধারণা যেন একটা

প্রবল ও দৃঢ় সমর্থন পেল। ছায়া যদি কখনো বলতেন, আমি নিজে একটা অভাগা, লক্ষ্মীছাড়া—প্রদ্যোতবাবু কেঁপে উঠতেন, এযে তাঁর চিন্তার প্রতিধ্বনি। তিনি সভয়ে বলতেন না, না, ভাগ্য টাগ্য মিথ্যে—ওসব কিছু নেই। কিন্তু ছায়া অলক্ষ্মী এ চিন্তাকে যেন তিনি আর রোধ করতে পারলেন না। একদিন এক শিল্পী বন্ধুর কাছে অবজ্ঞা ও অবহেলা সহ্য করে বিক্ষুব্ধ হতে হতে বাসায় এলেন। বাসায় এসে ছায়াকে বানিয়ে বানিয়ে বললেন—রণেন ঘোষ—ঐ যে সেদিন যার এক্সিবিশন হল—দেখা হল রাসবিহারীতে .... কথায় কথায় বলল, স্ত্রীভাগ্য দেখছি তোমার খুব ভালো .... বিয়ে করবার পর থেকে আর কিছু হল না দেখছি তোমার .... স্ত্রী তো খুব পয়া দেখছি .... কোথায় নামিয়ে দিল তোমাকে। ছায়া ব্যথিতভাবে প্রদ্যোৎবাবুর দিকে তাকিয়ে রইলেন। স্ত্রীর আয়তচোখে ব্যথা ও বেদনা আজ প্রদ্যোৎবাবুকে কিছুমাত্র সংযত করল না। তিনি বানানো অভিযোগের জন্যে কোন সান্ত্বনা স্ত্রীকে না দিয়ে নিজের ঘরে চলে গেলেন। রমার মা চুপ করে কলপাড়ে বসে রইলেন।

মন ভালো থাকলে ভাবেন, ভাগ্যটাগ্য কিছু নয়—সবই হচ্ছে চেনাজানার ব্যাপার। অনেক সময় চুপ করে ভাবতেন। তাঁর বন্ধু-বান্ধবরাও তো কোনও সাহায্য তাঁকে করল না—কত বন্ধু কত করে। কিন্তু তাঁর বেলায় আত্মীয়স্বজনের মতো বন্ধুরাও এত বিরাগ হল কেন? তাঁর নিজের ভেতরে কি তাহলে কোনও গোপন রূঢ়তা আছে যে জন্যে বন্ধুরা তাকে সেরকমভাবে ভালোবাসতে পারল না। তিনি কি অনুভূতি দিয়ে কোনও বন্ধুকে স্পর্শ করতে পারেননি? হয়তো শিল্পী বন্ধুরা তাঁর ভেতরে বন্ধুত্বের আকর্ষণের চেয়ে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিভাশালী শিল্পীকে বেশি করে অনুভব করে তাঁর কাছ থেকে দূরে থাকতে চাইতেন এবং তাকে সাহায্য না দেওয়া নিজেদের খ্যাতির পক্ষে অত্যাবশ্যক কর্তব্য মনে করেছিলেন। কিংবা সেই সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল তাঁর স্ত্রীভাগ্য—সেজন্যেও হয়তো বন্ধুদের ডবল ঈর্ষা ছিল—আছেও। আবার রাগ হলে ভাবতেন, বন্ধুরা, প্রতিদ্বন্দ্বী শিল্পীরা সব সময়ই ঈর্ষা করে—তার জন্যে কারো খ্যাতিযশ পাওনা বাকি থাকে না। বন্ধুরা সাহায্য না করলেও শিল্পীর আত্মবিকাশ ও আত্মপ্রসাদ রুদ্ধ থাকে না। আসলে পুরুষের হচ্ছে স্ত্রীভাগ্য। যে মেয়ে নিম্ন জাতিতে বিয়ে করে তার ভাগ্য নিশ্চয়ই ভালো নয়। উত্তেজিত হয়ে ভাবতেন, হঠাৎ রূপের মোহে পড়ে নিজের শিল্পী জীবনকে মাটি করেছেন—যে জীবন ছিল তাঁর চির আরাধ্য—আবাল্য একমাত্র কামনার বিষয়। তখন ছায়ার ছেলেমানুষী ও ভুলচুকগুলো অত্যন্ত গর্হিত ত্রুটি বলে মনে হত। অস্থির হয়ে ভাবতেন। বাপের বাড়ি পর্যন্ত নেই যেখানে বাচ্চা দু'টোকে নিয়ে দুদিন বেড়িয়ে আসে—প্রদ্যোৎবাবু একটা হাঁফ ছাড়তেন। তখন 'অবন' একটু কাঁদলে চড় কষিয়ে দিতেন। তিন বছরের রমা যদি দাদার চিৎকারে নিজেও কাঁদত তো রমাকে এক লাথি দিয়ে উঠোন থেকে ফেলে দিতেন। রমার মা ছেলে ও মেয়েকে সামলাতে সামলাতে অবাক হয়ে প্রদ্যোৎবাবুকে দেখতেন। তারপর আস্তে আস্তে কাঁপা কাঁপা গলায় বলতেন—মারতে ইচ্ছে হলে আমাকে মেরো—ওরা শিশু অবোধ ....। তিনি আর বলতে পারলেন না। বাচ্চা দুটোকে নিয়ে ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিতেন।

এক এক সময় প্রদ্যোৎবাবু অস্থির হয়ে চিন্তা করতেন—এই বাচ্চাদের ট্যাঁ ফোঁ

শুনবার জন্যে—এই অভাবের সংসার করবার জন্যেই তিনি নিজের শিল্পী জীবন বিসর্জন দিয়েছেন। ড্রইং টিচার হবার জন্যে আর প্রাইভেট টিউশনি করবার জন্যেই কি তিনি আজীবন শিল্পচর্চা করে এসেছেন। .... এক সময় ভাবতেন, ছায়া যদি ওর সঙ্গে পালিয়ে যেতে অস্বীকার করত—তবে হয়তো তিনি আঘাত পেতেন কিন্তু এমন করে আজ ডুবে যেতেন না। আক্রোশ ও ক্ষোভে চুপচাপ শুয়ে থাকতেন। ভাবতেন, মেয়েছেলেদের চরিত্রে আরো দৃঢ়তা ও সংযম প্রয়োজন। এ জন্যে শাস্ত্র ....। শুধু তাই নয় সন্তান হবার পর ছায়ার মনোযোগ ছেলেমেয়েরা অনেক বেশি কেড়ে নিয়েছে। ছায়ার সমস্ত দেহ-মন যেন সন্তানের দিকে পড়ে থাকত—এ তিনি প্রতি মুহূর্তেই অনুভব করে একটা বঞ্চনার বেদনায় গুম হয়ে বসে থাকতেন। তাঁর মনে হত—তিনি যে একটা মানুষ এ সংসারে আছেন তা কেবল ছেলেমেয়েদের জন্যে কিছু কেনবার সময়—সংসারের অভাব-অনটনের সময় মনে পড়ে। তিনি শিল্পী নন—স্ত্রীর বাজার সরকার। স্ত্রী আর বাচ্চাদের ভরণপোষণের জন্যেই তিনি জীবন উৎসর্গ করেছেন—সংসারে তাঁর আর কোনও প্রয়োজন নেই—ভূমিকা নেই। তিনি প্রেমিক নন—ফরমায়েস খাটা স্ত্রী-পুত্রের চাকর। তিনি শিল্পী নন—ড্রইং টিচার—সুরিয়ালিজম, এক্সপ্রেশনইজম তার চিন্তার বিষয় নয়—ভাবনার বিষয় হচ্ছে কার কাছ থেকে ধার পাওয়া যাবে। কোনখান থেকে বাকিতে জিনিস নেওয়া যেতে পারবে। .... অনেকসময় অবাক হয়ে ভাবেন, বাড়িতে কেচে জামাকাপড় পরেন—বহুকাল ধোপাবাড়ির জামা কাপড় পরেন না। ফার্স্ট ক্লাস ট্রামে চড়া ভুলেই গেছেন—রেস্টুরেন্টে ঢুকতে এখন ভয় করবে—আর কোনদিন হয়তো প্রবেশও সম্ভব হবে না। পরিচিত মানুষ থেকে দূরে এই ফেরারী জীবন আর কতকাল, কতকাল বহন করবেন? শুধু কি তাই, কিছুকাল পরে একজন নামী বা ধনী লোকের সঙ্গে দেখা হলে এত কৃতার্থবোধ করতেন, নিজেকে এত ধন্য মনে হত যে বেশ কিছুক্ষণ একটু গদগদ ভাব থাকত। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই যখন নিজের এই কৃতার্থ ভাব সম্পর্কে সচেতন হতেন তখন নিজের এই অধঃপতনে নিজের কাছে মুখ দেখাবার পথ পেতেন না। নিজের 'পর রাগে, ক্ষোভে, লজ্জায় ও গ্লানিতে টগবগ করতে থাকতেন। তখন একটানা নাম করা লোকদের প্রাণ খুলে নিন্দে করতেন যার তার সামনে। কোন নামী লোকের সঙ্গে তখন দৈবাৎ দেখা হলে বিনা কারণে বিনা প্ররোচনায় তাঁকে আঘাত দিয়ে কৃতার্থ বোধের প্রায়শ্চিত্ত করতেন, নিজের 'পর ধিক্কারের ক্ষতিপূরণ করতেন। নাম করা শিল্পীদের প্রকাশ্যে নিন্দে করায় লোকে যে মনে করতে পারেন তিনি ব্যর্থ হয়েছেন বলেই সফল শিল্পীদের 'পর তিনি ঈর্ষিত—এ কথা তাঁর মনে থাকত না। পরে যদি কেউ এ ধরনের ইঙ্গিত দিতেন তবে প্রদ্যোতবাবু হয়তো সংযত হতেন কিন্তু ক্ষুন্ন হতেন না। তিনি যে শিল্পী হতে চেয়েছিলেন—লোকে যে তাকে এতটুকু মূল্যও দেয় তাতেই তিনি আপাতত তৃপ্ত। যে পত্রিকার সমালোচনা একদিন তাকে এতখানি নামিয়ে দিয়েছিল সেই পত্রিকার সমালোচনার কাটিংই এখন তার সবচেয়ে বড় সার্টিফিকেট। সেই সময়কার কৃপণ ও দরিদ্র প্রশংসাপত্রগুলো তাঁর শিল্পী জীবনের পরিচয় বহন করেছে।

রমার মা দীর্ঘকাল প্রদ্যোতবাবুর নানা রকম পরোক্ষ রূঢ় ব্যবহারে কোনও জবাব

দেননি। প্রদ্যোতবাবু হয়তো বন্ধুদের নাম করে স্ত্রী যে অপয়া, অলক্ষ্মী, অয়পয়হীনা একথা জানাতেন কখনো কখনো অবশ্য তিনি যে এসব মানেন না তাও বলতেন। কখনো কোন জ্যোতিষীর নাম করে জানাতেন, স্ত্রী ভাগ্যেই তাঁর কিছু হল না একথা জ্যোতিষী বলেছেন। মেজাজ ঠান্ডা হলে জানাতেন, জ্যোতিষী ফতিষীদের কথা তিনি বিশ্বাস করেন না যতসব বুজরুকি। ছেলেমেয়েদের যখন তখন ধরে মারতেন—চিৎকার করে তখন বলতেন, স্ত্রী আর ছেলেমেয়েদের জন্যে হোটেলওয়ালা তিনি হয়েছেন। তিনি হয়েছেন, বাজার সরকার, চাকর। উঃ কি প্রতিভা আমার, একই সঙ্গে স্ত্রী ছেলেমেয়ের চাকর, বাজার সরকার, হোটেলওয়ালা। কোন ঘরের ছেলে আমি, আজ আমি ড্রইং টিচার, পাঁচটাকার টিউশনি করে—আমার ধ্যান-ধারণা শিল্পজীবন সব এদের জন্যে গঙ্গায় ভাসিয়ে দিয়ে এসেছি। তবু এদের খাই মেটে না—কেবল দাও আর দাও আন আন। দেখা হলেই শুনতে হবে, নেই আর নেই। নেই ছাড়া মুখে কোন বুলি নেই। তোতাপাখি শুধু একটি বুলিই জানে, নেই আর নেই।

রমার মা নিঃশব্দে চোখের জল ফেলতেন। কিন্তু ছেলেমেয়েদের 'পর মারধর সহ্য করতে পারতেন না। কোনো কথার জবাব দিতে তাঁর রুচিতে বাধত। মানুষটার দুঃখ তিনি বুঝতেন। সারা দুপুর একা একা চোখের জল ফেলতেন। রমার মা'র তরফ থেকে কোনরকম সাড়া না পেয়ে প্রদ্যোতবাবু আরও চটে যেতেন। রমার মা অলক্ষ্মী, অপয়া একথা যেন চুপ করে থেকে ছায়া স্বীকার করে নিচ্ছে। অলক্ষ্মী অপয়া হয়ে তাঁর জীবন এই নারীটি নষ্ট করে দিল বলে তাঁর রাগ আরো বেড়ে যেত। রমার মা প্রতিবাদ করলে হয়তো একটু স্বস্তি পেতেন। একবার রমার মা বললেন—মারতে হলে আমাকে মারো—ঐ নিরীহ শিশুগুলোকে কেন আমার 'পর রাগ করে মার—ওদের তো কোন দোষ নেই। আমাকে মারতে এখন আর তোমার রুচিতে কেন বাঁধছে। সেদিন প্রদ্যোৎবাবু ক্ষণিকের জন্যে থেমে গিয়েছিলেন—পরে জানালেন—খবরদার মুখে মুখে উত্তর দেওয়া চলবে না। এ ঘরে থাকতে হলে যার খাব পরব তারই বুকে চড়ে দাড়ি উপড়ে দেবো ....কখনো কখনো চিৎকার করে বলতেন—এমন অলক্ষ্মী মেয়ে বলেই তো বাপ আর নেয় না। পালিয়ে গেছে বলে হাঁফ ছেড়ে বেচেছে। আমার দুর্ভাগ্যে মজা দেখছে। .... এমনি এক গন্ডগোলের দিনে রমার মা প্রস্তাব দিলেন—দেখো, তুমি আমাকে খুন করো—আর ছেলেমেয়ে দুটোকে অনাথ আশ্রমে দিয়ে দাও—আমি লিখে যাব। আমার মৃত্যুর জন্যে কেউ দায়ী নয়। আমার আর সহ্য হয় না। সেদিন তিনি প্রদ্যোতবাবুর সামনেই হু হু করে কাঁদলেন। প্রদ্যোতবাবু তখুনি বাসা থেকে বের হয়ে গেলেন। যেদিন এমনি কিছু অশান্তি হত—সেদিন প্রদ্যোৎবাবু আর ছায়া কিছু খেতেন না। বাচ্চা দুটো ভয়ে জড়সড় হয়ে থাকত—মুখ বুজে খেয়ে চুপচাপ মড়ার মত শুয়ে পড়ত। ভয়ে মার মুখের দিকে তাকাতে পারত না। বাপের ত্রিসীমানায়ও ঘেঁষত না। .... মাসের শেষের দিকে ঝগড়া ঘনঘন হত। একদিন যখন শোনা গেল—চাল আনতে হবে, চা ফুরিয়ে গেছে—তখন প্রদ্যোতবাবুর মাথায় আগুন জ্বলে গেল। সেদিন এক সহকর্মী প্রদ্যোতবাবুকে বিদ্রূপ করে 'আর্টিস্ট' বলেছিলেন। সেখানে কোন উত্তর তিনি দেননি—কারণ লোকটি হেড মাস্টারের প্রিয়পাত্র ও সারাসময় হেড মাস্টারের আশেপাশে ঘুর ঘুর করে ও নানা

পরামর্শ দেয়। কিন্তু বাসায় এসে সেই 'নেই' সংবাদ শুনে যেন খেপে উঠলেন—এই তো সেদিন চাল আনলাম—এরই মধ্যে—সব রাক্ষুসে পেট .... দিনদিন খাওয়া বাড়ছে .... ইত্যাদি ইত্যাদি। একমনে বকে চলছেন হঠাৎ খেয়াল হল—অন্যান্য দিন বকা খেয়ে রমা বাচ্চা দুটোকে নিয়ে দরজা বন্ধ করে দেয়। কিন্তু আজ বাচ্চা দুটো বাইরে—আর ঘরের দরজা জানলাগুলো সব বন্ধ। হঠাৎ মনে হল দরজা বন্ধ করে রমা যেন কী বলছে। বার বার দরজায় ধাক্কা দিতে লাগলেন। ছেলে মেয়ে দুটো ভয় পেয়ে চিৎকার করে কেঁদে উঠল। পাগলের মতো প্রদ্যোৎবাবু দরজায় ধাক্কা দিতে লাগলেন। শেষ পর্যন্ত ধাক্কায় দরজার পুরানো পাল্লা খসে পড়ল। তিনি ঘরে ঢুকেই সেই অন্ধকারে দেখলেন ছায়া শুধু শায়া পরা—শাড়িটি কড়িকাঠে ঝুলিয়েছে আত্মহত্যা করবে বলে। প্রদ্যোতবাবুকে দেখে চোখ দুটো অস্বাভাবিক বড় করে অথচ শান্ত ভাবে বার বার বলতে থাকে—আমি মরব, আমি মরব, আমি মরব। প্রদ্যোতবাবু স্ত্রীকে জড়িয়ে ধরে টানতে টানতে বাইরে নিয়ে এসে বুক ভাঙা কান্নায় ভেঙে পড়লেন। স্ত্রী সেই শায়া পরা অবস্থায় কেমন অস্বাভাবিক হয়ে স্তব্ধ হয়ে শুধু মাঝে মধ্যে বলতে লাগলেন, আমি মরব, আমি মরব, আমি মরব। স্বামীর আর্তকান্না যেন তাকে স্পর্শও করল না। আশেপাশের বাড়ি থেকে লোকজন ছুটে এল। পাশের বাড়ির প্রৌঢ়া গিন্নি এসে ছায়াকে পাশের ঘরে নিয়ে গিয়ে শাড়ি পরালেন—তাড়াতাড়ি কড়িকাঠ থেকে শাড়িটি খুলে ফেললেন। সদর দরজা বন্ধ করে দিলেন। তখনও মাঝে মাঝে ছায়া যেন যন্ত্রের মতো বলে চলেছে। আমি মরব, আমি মরব, আমি মরব।

কিছুকাল চুপচাপ গেল। প্রদ্যোতবাবু ভয়ে ভয়ে রইলেন। কাজ-কর্ম সেরে বাসায় ফিরবার সময় রোজ বুক কাঁপত। ছায়া না কিছু করে বসে। সব সহ্য হয় কিন্তু বাচ্চাদের চিৎকার তিনি একদম বরদাস্ত করতে পারেন না। একদিন যখন 'অবনের' চিৎকার ক্রমে অসহ্য হয়ে আসছিল, তিনি সব ভুলে উঠে গিয়ে অবনকে এক লাথি মেরে উঠোনে ফেলে দিলেন। তারপর আবার অবনকে আরেক লাথি দিয়ে ঘরের দিকে ছুড়ে দিলেন। বাবার রণমূর্তি দেখে অবন পরিত্রাহী চিৎকারে মাকে ডাকছিল। কিন্তু ক'মুহূর্ত ছায়া চুপ করে রইলেন—তারপরে এক দৌড়ে রান্না ঘরে গিয়ে বঁটি নিয়ে এসে বঁটি উঁচু করে প্রদ্যোতবাবুর দিকে ধরে চোখ দুটো অস্বাভাবিক করে বললেন—খবরদার, আর একটি লাথি মেরেছ তো তোমাকে এক কোপে আমি শেষ করে দেব—বস্তির জানোয়ার—অকর্মণ্য অপদার্থ। প্রদ্যোৎবাবু বঁটি দাঁ দেখে যত না ঘাবড়েছিলেন—ঐ ভয়ংকর উগ্রমূর্তি—ঐ অস্বাভাবিক চোখ দেখে ক'মিনিটের জন্যে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। কিন্তু ক'মিনিটের জন্যেই মাত্র—যেই মুহূর্তে বুঝলেন স্ত্রীর আপাতত আত্মহত্যার প্রোগ্রাম নেই স্বামী হত্যার ইচ্ছা রয়েছে—তাতে আশ্বস্ত হয়ে গলা ফটিয়ে চিৎকার করে বললেন—আমি অকর্মণ্য, আমি অপদার্থ, বস্তির জানোয়ার। বস্তির জানোয়ারের সঙ্গে বের হয়ে এসেছিলেন কেন—বের হয়ে এসেছিলেন কেন—অলুক্ষণে রাক্ষসী—মারবই তো—দেখি তুই কী করে আটকাস -। সঙ্গে সঙ্গে 'দা' নিয়ে ছায়া এগিয়ে এল—এস, এস দেখি, মেরে দ্যাখ, এক কোপে তোমাকে শেষ করে দেব। এস, দেখি কেমন পুরুষের বাচ্চা। প্রদ্যোৎবাবু এগিয়ে আসবার ইচ্ছে থাকলেও ঝুঁকি নেন না। ওঃ আমি পুরুষের

বাচ্চা কিনা .... সেদিন যেদিন আত্মহত্যা হচ্ছে—কড়িকাঠ শাড়ি বেঁধে নিচে দাঁড়িয়ে মন্ত্র পাঠ করছিলেন—(ছায়ার গলার অনুকরণে) আঁমি মঁরব। আঁমি মঁরব। আত্মহত্যা, শাড়ি দিয়ে দোলনা বানিয়ে আত্মহত্যা—এখন এসেছেন স্বামীকে হত্যা করতে। হারামজাদী মেয়েছেলের বড় বাড় হয়েছে। শাড়ি দিয়ে আত্মহত্যা—আর যদি কোনদিন শাড়ি কিনেছি। কাপুরুষ—বলে রমার মা দা রেখে দেন। তারপর তেমন দৃঢ় কণ্ঠে বলেন—ছোট জাত তুমি—ছোট কথা তোমারই সাজে—কত শাড়ি কিনে দিয়েছ—কিন্তু খবরদার, কোনদিন যদি ওদের গায় হাত দাও—তবে সেদিন তোমাকে মেরে আমি আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করব—ফাঁসি যাব। ওদের ভগবান দেখবেন। স্ত্রী দা রেখে দেওয়ায় একবার দার দিকে তাকিয়ে নিজের ঘরের দিকে যেতে যেতে বললেন—আমি যদি পুরুষের বাচ্চা না হই—পুরুষ না হই—তবে 'অবন রমা' যার সন্তান সে খেতে দিক ...., আমি দায়িত্ব নেব কেন? রমার মার চোখে মুখে আবার তিরস্কার ফুটে ওঠে—ছিঃ ছিঃ এত নিচে নেমে গেছ—এত ইতর তুমি হতে পার। ঘরে গিয়ে প্রদ্যোৎবাবু হাঁপাতে থাকেন তারপর শুয়ে শুয়ে ঝগড়ার জবার দেন—এঃ ছিঃ ছিঃ নাটক হচ্ছে স্টার থিয়েটরে .... কোথাকার রানিবালারে আমার .... ইস্ট বেঙ্গলের ছেলে আমি, আমাকে ভাঙা বঁটি দিয়ে ভয় দেখানো .... মরচে পড়া বঁটি দিয়ে .... ঠিক আছে আমি তো ইতর এ বাড়িতে কেউ যেন আমার সঙ্গে কোন কথা না বলে .... কীসের জন্যে এ সংসার ....কী আনন্দ আছে এ সংসারে ..... ছোটজাত ..... কায়েতের ছেলে গর্ভে ধরে আবার জাতের বড়াই .... আমি আর্টিস্ট .... আমার জাত বুঝতে মগজ লাগে।

তিনি ঘর থেকে চেঁচাতে লাগলেন আর ছায়াও রান্নাঘর থেকে। যে ছেলেমেয়েকে দু'বেলা দু'মুঠো খেতে দিতে পারে না—ছেলেমেয়েবউকে খাওয়াবার যোগ্যতা যার নেই—তার আবার কি তেজ। ঐ যে বলে না ভাত কাপড়ের কেউ নয় ভাই—কিল মারবার গোঁসাই। মেরে মেরে রোগা ছেলেমেয়েকে দুটোকে ... অনেক সহ্য করেছি আমি কিন্তু আর না—অনেক হয়েছে। আমার জীবন তুমি নষ্ট করেছ সে জন্যে ভগবান তোমার কপালে ছাই লিখেছে ....'নিজের যোগ্যতা নেই আমি অলক্ষ্মী অপয়া .... আর নিজে বড় ভাগ্যবানরে .... ডাইনে আনতে বাঁয়ে কুলোয় না তার আবার ভাগ্যের বড়াই .... খাওয়া নিয়ে খোটা .... রাক্ষসী আমি .... নিজে রোজগার করতে পারে না আমি বেশি খাই .... এর পরও আমি বেঁচে আছি ... বাবা মার অভিশাপ এ আমার পাওনা ছিল—তাদের মুখে কালি দিয়েছি আর আমার মুখে কালি পড়বে না। আমার এরকম আক্কেল হবে এ তো জানা কথা। এই শাস্তি আমার দরকার ছিল। সেদিন চোখের জলের সঙ্গে ছায়া কিন্তু ভেঙে পড়ল না—কাঁদতে কাঁদতে প্রদ্যোৎবাবুকে যেমন কড়া কথা শোনাতে লাগলেন নিজেকেও ধিক্কার দিতে লাগলেন আর ওদের সংসারে জন্মগ্রহণের জন্যে বাচ্চা দুটোকে দোষারোপ করতে লাগলেন। এ রকম একটানা আক্রমণে প্রদ্যোৎবাবু রীতিমতো চমকে গেলেন যদিও উত্তর দিতে ছাড়লেন না। ঘন্টা দুয়েক কথা কাটাকাটির পর যখন ছায়া বাথরুমে চলে গেলেন তখন প্রদ্যোৎবাবু থামলেন। বাথরুম থেকে বেরিয়ে এসে ছায়াও আক্রান্ত হচ্ছে না দেখে চুপ করলেন। আপাতত সেদিনের মতো কলহ ক্ষান্ত হয়। কিন্তু এরপর থেকে প্রদ্যোতবাবু কিছু খোঁচা দিয়ে কথা বললেই যেন সঙ্গে সঙ্গে

ছায়া পাল্টা আক্রমণ করতে একটুও দেরি করতেন না। বরং আস্তে আস্তে দেখা গেল, ঝগড়া করে প্রদ্যোৎবাবু থেমে গেলেও ছায়া থামতে চান না। একদিন প্রদ্যোৎবাবু রাগে চড় মারবার জন্যে এগিয়ে এলে সঙ্গে সঙ্গে হাতের রুটি বেলবার বেলুন হাতে উঠে দাঁড়ালেন ছায়া। প্রদ্যোৎবাবু পরিষ্কার বুঝলেন ছায়া তাঁকে আর শ্রদ্ধা করে না, সম্ভ্রম করে না, সম্ভ্রম নেই আর তাঁর প্রতি, আছে ঘৃণা, অনুতাপ, বিদ্বেষ। প্রদ্যোৎবাবুর প্ররোচনায় বাপের বাড়ি থেকে বের হয়ে এসে তিনি যে পাপ করেছেন—নিজের বংশে কালি দিয়েছেন। চিরকালের মতো জাত দিয়েছেন—বাবা-মায়ের মুখ ভোঁতা করে দিয়েছেন—এই অন্যায়, ভুল আর পাপের প্রায়শ্চিত্তের বুঝি আর সীমা নেই। তারপর প্রদ্যোৎবাবু লক্ষ্য করলেন—ছায়ার মধ্যে একটা অসন্তুষ্ট ভাব। একটা বিরক্তি, গ্লানি, ক্ষোভ স্থায়ীভাবে বাসা বেঁধে আছে—সারাদিন যেন একটা ছনছন ভাব—অসন্তোষ—মুখে হাসি নেই, উৎসাহ নেই—সমস্ত চেহারায় কেমন যেন রুক্ষতা। এখন প্রদ্যোৎবাবু এক কথা বললে ছায়া পাঁচ কথা বলেন। তাঁর মনে হয় ছায়া যেন তাঁর কাছ থেকে কোনও প্ররোচনার জন্যে অপেক্ষা করে থাকে—একটু ঝগড়ার সুযোগ ঘটলেই ছায়া একটানা বলে যাবে। সেই শান্ত, নিরীহ, স্বল্পভাষী, পৃথিবী-অনভিজ্ঞা বালিকা যেন এখন ক্রোধে অহর্নিশি জ্বলছে, ঝগড়া শুরু করলে থামতে চান না। প্রচণ্ড একটা ঘৃণা ও বিদ্বেষ প্রদ্যোতবাবুর 'পর আর কোনও দিন যে তাদের অবস্থা ফিরতে পারে, শুভদিন আসতে পারে এ কথায় আর কিছুমাত্র আস্থা নেই। ছায়ার এই শুভ ভবিষ্যতের 'পর আন্তরিক অবিশ্বাস, হতাশা আর নৈরাশ্যই সবচেয়ে আঘাত দিত প্রদ্যোতবাবুকে। তারপর ঝগড়া বেশি হলে ছায়া ছুটে বের হয়ে যেতেন রাস্তায়—হনহন করে পাগলের মতো হাঁটতে থাকতেন—প্রদ্যোৎবাবু জোর করে ফিরিয়ে নিয়ে আসতেন। রাস্তায় রীতিমতো কৌতুকের সঞ্চার হত। তাঁদের দাম্পত্য কলহের কথা আশেপাশে অনেকেই জানতেন। পরে ঝগড়া হলে ছায়া কিছুক্ষণ আশেপাশের কারো বাড়ি চলে যেতেন। তাদের মা বউরা বুঝিয়ে সুঝিয়ে আবার ঘরে ফিরিয়ে দিতেন। এইসব ঘটনার পর থেকে প্রদ্যোতবাবু স্ত্রীকে রীতিমত ভয় করতেন। পারতপক্ষে ঘাঁটাতেন না। কিন্তু যেই স্ত্রীর জন্যে তাঁর এতবড় সর্বনাশ সেই যখন তাঁকে দোষারোপ করছে একথা ভাবলে মগজ আগুন হয়ে উঠত—তাছাড়া কারো মেজাজ নীরবে সহ্য করাও তার পক্ষে সম্ভব ছিল না। সুতরাং, রীতিমত কুরুক্ষেত্র বেধে যেত। স্ত্রীর নৈরাশ্য প্রদ্যোৎবাবুর ভেতরে আরো গভীর হয়ে দেখা দিত—সংসারের কেউ তাঁকে মূল্য দিচ্ছিল না—স্ত্রী তাঁকে মূল্য দিয়ে অনুতাপ করছে। এক ছিল স্ত্রীর ভালোবাসা, আজ তা থেকেও তিনি বঞ্চিত। বাইরের জগৎ তাঁকে অস্বীকার করেছে। অবহেলা ও অবজ্ঞা করেছে আর বিদ্রূপ করে চলেছে—নিজের সংসার তাঁকে ঘৃণা করে, বিদ্বেষ করে, আজ তিনি ছায়ার দু'চোখের বিষ। আমি কী ছিলাম—ঐ মাকড়সার জালে আর ধুলো ময়লার আদর মাখানো ছবিগুলো তা বলবে। সবাই যেভাবে আমাকে ঘৃণা করল—অত ঘৃণ্য আমি ছিলেম না। কতসময়ে প্রদ্যোতবাবুর দুই চোখ জলে ভরে উঠেছে—কিন্তু নীরবেই তাকে মুছে ফেলে দিয়েছেন। আজ ছায়াকে অন্তরের কথা বলেন না—কারণ যেটুকু দুর্বলতার কথা বলবেন পরদিন সেই দুর্বলতার জায়গাই ছায়া তাকে আক্রমণ করবে—কঠোরভাবে ব্যঙ্গ, বিদ্রূপ করবে। উঃ আর্টিস্ট, কত

দেখলাম আর কত শুনলাম—ওদিকে পেট ঠন ঠন—তাগদ থাকলে লোক মূল্য দেবে না কেন? বাপের জমিদারি থাকলে এসব ছেলেখেলা চলে—বছরের পর বছর বাচ্চা হবে আর তিনি ছেলেখেলা নিয়ে থাকবেন। ঝাড়ু মার আর্টের মাথায়—আই.এ.বি.এ. পাস করে কেরানী হলেও আজ এই হাল হত না—আর্টিস্ট—স্কুলের ড্রইং-এর মাস্টার—পরিচয় দিতে মাথা কাটা যায়—মাস গেলে পাওনাদারের গালাগালের অন্ত থাকে না—আর্টিস্ট। কে বলবে ছায়া একসময় কড়া কথার একটাও জবাব দিতে না পেরে অবাক ব্যথিত চোখে জল ভরা টলটল চোখে একদৃষ্টিতে প্রদ্যোৎবাবুর দিকে তাকিয়ে থাকতেন। সে সব স্বপ্ন—প্রদ্যোৎবাবু আর্টিস্ট হবার স্বপ্নের সতই মিলিয়ে গেছে। তবুও শুকনো বেণী, রুষ্ট দৃষ্টি, অসংযত শাড়ি, হাতে উদ্যত দা—ছায়ার এই ছবিটি তাঁর মৃতপ্রায় শিল্প-চেতনাকে একটা প্রেরণা দিয়েছিল। ছবিটি আঁকবার একটা প্রেরণা তিনি অনুভব করেছিলেন। বহুকাল পর এই প্রথম ছবি আঁকবার একটা প্রেরণা ও খিদে বোধ করেছিলেন। ভাবলেন, খিদে মরে যাওয়া তো আমার নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার। এই খিদেও যাক। ছবি আঁকবার প্রেরণাকে অনাহারে রেখে তিনি যেন এক ধরনের প্রতিহিংসার আনন্দও বোধ করলেন—নিজের 'পর প্রতিশোধও নিলেন। আবার এখনও শিল্পীমন মরে যায়নি দেখে কিছুটা তৃপ্তিও বোধ করেছিলেন। কিন্তু আসলে ভেতরের আরেকটা কারণও ছিল। যেই কারণটি নিজের কাছেও হয়তো তিনি স্বীকার করতেন না। যদি ছবি আঁকতে গিয়ে দেখেন তাঁর আগেকার মতো সেই ক্ষমতা নেই তাহলে যে পরাজয়ের গ্লানির সম্মুখীন হতে হবে সেই ভয়েই তিনি ঐ প্রেরণাকে ছবিতে রূপ দেননি। আত্মবিশ্বাসের অভাবেই যে ছবি আঁকেননি—একথা নিজের কাছে যথাসম্ভব গোপন রেখেছিলেন।

এর পরের ইতিহাস একটানা ঝগড়া—কথা বন্ধ—খাওয়া বন্ধ—আবার মিলন আবার ক'দিনের মাথায় ঝগড়া—কথাবন্ধ—খাওয়া বন্ধ—ও মিলনের ইতিহাস। ঝগড়ার সময় পরস্পর পরস্পরকে যতরকম ভাবে আক্রমণ করতে পারে করে। কেউ কাউকে ছেড়ে দেয় না। শান্ত মুহূর্তে প্রদ্যোৎবাবু অনেক সময় ভাবতেন, এত গালাগাল ছায়া শিখল কোথায়? একটু একটু ভেঙে কথা বলত। ছায়া—সেই ছায়ার গালাগালিতে কেমন অনর্গলতা ও সাবলীলতা এসে গেছে। দু'জন দু'জনকে যা নয় তাই বলে যা তা বলতেন ছেলেমেয়েদের সামনেই। ছেলেমেয়েরা ভয়ে ভয়ে পরীক্ষা করত কে জেতে কে হারে। কিছুকাল পরে দেখা গেল প্রদ্যোৎবাবুর স্বাস্থ্য ভেঙে যাচ্ছে। বিয়ের বছর সাতেকের মাথায় প্রদ্যোৎবাবুর হাঁপানি শুরু হল—টান উঠলে একদিন কখনো বা দুদিন থাকে। শুধু তাই নয়, হাতে পায়ে বাত দেখা দিতে লাগল। কিই বা বয়েস প্রদ্যোতবাবুর। হয়তো ত্রিশ হয়ে সামান্য কিছু বেশি—অথচ চুল কানের দুধারে পেকে উঠল। মুখেও বয়সের ছাপ স্পষ্ট হয়ে উঠল। দেখলে মনে হত হয়তো পঞ্চাশের কাছাকাছি। কিন্তু আশ্চর্য, এত দারিদ্র, অনটন, অশান্তি ও পরিশ্রমে ছায়ার স্বাস্থ্য কিন্তু ভাঙেনি—একটু শীর্ণ হয়েছেন—রঙ তেমনি ফরসা টকটকে তবে তার মধ্যে ফ্যাকাসে ভাবটি একটু বেশি। তবে চেহারায় কেমন রুক্ষতা এসে গেছে। চোখের কোলে বেশ কিছু কালিও পড়েছে। ছায়াকে এখন প্রদ্যোৎবাবুর পাশে অনেক ছোট ও অনেক নবীনা মনে হয়। নিজে বুড়ো

হয়ে গেলেন অথচ স্ত্রীর বয়সের বিশেষ রকম নড়চড় হল না—এই বিষয়টাও একটা প্রচন্ড অবিচার বলে প্রদ্যোৎবাবুর মনে হত। কখনো এই সাবজেক্ট ম্যাটারে ঝগড়াও হয়ে যেত এক পশলা।

অসুখের জন্যে স্কুলে অনুপস্থিতি, একটা বেপরোয়া নৈরাশ্য, সহকর্মীদের সঙ্গে অবনিবনা সব মিলে একদিন স্কুলে প্রদ্যোৎবাবুর চাকরি গেল। স্কুলে দলাদলি ছিল—একটি দল প্রদ্যোৎবাবুকে সমর্থন করেছিল। সেই দলেরই একজনের চেষ্টায় প্রদ্যোৎবাবু একটা ইনজিনিয়ারিং ফার্মে চাকরি পেলেন। ম্যাপ নকশা ইত্যাদি করা। বিল্ডিং ইত্যাদির পরিকল্পনার কপি করা মাইনেও অনেকটা বেশি। কিছুদিন চলল। কিন্তু নিয়মিত কাজে বের হন না—একটু শরীর খারাপ হলে টান উঠবার ভয়ে বাসা থেকে বের হতে সাহস পেতেন না। তবু, চাকরি ছিল। কিন্তু কিছুকাল চলবার পর কোম্পানিটাই উঠে গেল। প্রদ্যোৎবুবুকে বাত ও হাঁপানি জেঁকে ধরল। যে বৎসর প্রদ্যোৎবাবুর ইনজিনিয়ারিং ফার্মে চাকরি গেল সেই বৎসরই 'অবন' হায়ার সেকেন্ডারি পরীক্ষায় নকল করতে গিয়ে ধরা পড়ে আর রমা ফার্স্ট ডিভিশনে হায়ার সেকেন্ডারি পাস করল।

যে স্কুলে প্রদ্যোৎবাবু মাস্টার ছিলেন—সেই স্কুলেই অবন পড়াশুনা করত। অবন কোনকালেই পড়াশুনায় ভাল ছিল না। প্রায় প্রতি বৎসরই একটা না একটা বিষয়ে ফেল করত। ইংরেজি, অঙ্ক আর সংস্কৃতের মধ্যে একটা থাকতই। আঁকবার হাতটি ভালো ছিল। যাই হোক্, প্রদ্যোৎবাবুর ছেলে বলে একদিকে যেমন ফ্রিতে পড়তে পেত অপরদিকে ফেল করা সত্ত্বেও সহকর্মীরা পাশ করিয়ে দিতেন। প্রত্যেকবার প্রদ্যোৎবাবু গজরাতেন। সহকর্মীদের কাছে মুখ দেখাতে পারিনে—ফাইভ সিক্সেই ডাব্বা মারে—নিতান্ত আমার ছেলে বলে ....। অবন যখন সেভেনে—তখন প্রদ্যোৎবাবু স্কুলের চাকরি গেল। অবন কিন্তু সেবার পাশ করে গেল। প্রদ্যোৎবাবু একটু অবাক হলেন—এমনি করে ভালো নম্বর পেয়ে পাস করতে করতে হায়ার সেকেন্ডারি পরীক্ষায় নকল করতে গিয়ে ধরা পড়বার কারণ অন্য স্কুলে সেন্টার পড়েছিল। স্কুলের মাস্টাররাও জানতেন অবন নকল করে। কিন্তু প্রদ্যোতবাবুর ছেলে বলেই চোখ নাক মুখ বুজে থাকতেন। কিন্তু অন্য সেন্টারে সে খাতির ছিল না কাজেই ....। অবন নকল করে ধরা পড়ে যাবার সংবাদ আশে পাশে অনেকেই শুনেছিল·তাই রমা যখন ফার্স্ট ডিভিশনে পাস করল তখন অনেকেই বলতে লাগল ছেলেটা বোকা ধরা পড়ে গেল—মেয়েটা চালাক, ম্যানেজ করে ফার্স্ট ডিভিশনে ....। রমার পাসের আনন্দ ম্লান হয়ে গেল। রমা কলেজে ভর্তি হল। কিন্তু অবন আবার বই নিয়ে চুপচাপ বসে থাকত। এ সবের মাথামুন্ডু কিছুই ওর মাথায় ঢোকে না। বছর না ঘুরতেই হঠাৎ ক'দিনের জ্বরে ম্যানেনজাইটিস হয়ে অবন মারা গেল। ধরতে গেলে প্রায় বিনে চিকিৎসায়। অবন দেখতে ভারি সুশ্রী ছিল—ওর চেহারার সঙ্গে ওর মার আশ্চর্য মিল। অবনের মৃত্যুর পরে প্রদ্যোতবাবু বিছানা নিলেন। সেই বিছানা থেকে আর তিনি ওঠেন না, বের হন না। রমা কলেজে ভর্তি হল—কিন্তু অবনের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে প্রদ্যোতবাবু যে শুধু বিছানা নিলেন তা নয় কেমন নিশ্চল, নীরব, নিথর হয়ে গেলেন। রমার পার্ট ওয়ান পরীক্ষা সামনে—ওরই মধ্যে রমা টিউশনি শুরু করল—সকাল সন্ধ্যায়। একসঙ্গে তিনচার জনকে নিয়ে একঘন্টার

একটা গ্রুপ—এমনি বেশ কয়েকটি গ্রুপকে নিয়ে ওর রোজগার। ওই আয়েই সংসার খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলতে লাগল। রাত নটা পর্যন্ত টিউশনি করে প্রায় রাত দেড়টা দুটো পর্যন্ত রমা পড়াশুনা করত। যাইহোক, অনার্স পরীক্ষা হয়ে যেতেই রমা স্পোকেন ইংলিশ স্কুলে ভর্তি হল। অনার্স পাবার পর এই চাকরি—মোটামুটি মাইনে ভালো—বোনাস আছে। এতকাল পরে এই প্রথম সচ্ছলতার মুখ এই পরিবার দেখতে পেল।

প্রদ্যোতবাবু আর আঁকেন না। আঁকতেন যে একথা মনে করিয়ে না দিলে মনেও আসে না। মনে এলে বোধ করি বেদনাও জাগে না। হতাশাও আসে না, দীর্ঘনিঃশ্বাসও পড়ে না—এ যেন দূর অতীতের একটা স্মৃতি, একটা স্বপ্ন—তার সঙ্গে কোনও অনুভূতির যোগ-বোধ নেই। তা নিয়ে মাথাব্যথা নেই। আজ তাঁর একমাত্র চিন্তার বিষয় হচ্ছে রোগ। কখন কী ওষুধ খেতে হবে—কোন ওষুধের কী ফলাফল। কোন ওষুধ এনে তিনি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তার লিটারেচারটি পড়েন। বাইরের জগত নিয়ে মাথাব্যথা নেই—কেউ দেখা করতে এলে তিনি রাজনীতি, সমাজতত্ত্ব, বাজারদর ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করতে চানও না, ইচ্ছুকও নন—কেউ আলোচনা শুরু করলে অচিরেই তিনি প্রসঙ্গ পরিবর্তন করতেন। আর একটি মাত্র প্রসঙ্গ আলোচনাতেই তাঁর একমাত্র উৎসাহ—তা হচ্ছে তাঁর রোগ। নিজের রোগের সবিস্তার বর্ণনাই তার আলোচনার ও চিন্তার একমাত্র বিষয়। এছাড়া অন্য বিষয় মন দিতে তিনি পারতেন না। তিনি রাস্তায় বের হলে আতঙ্ক বোধ করতেন। বাইরের জগৎ আজ তাঁর কাছে অপরিচিত, আতঙ্ককর, শত্রু শয়তান রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। গরমের দিনে ঝগড়ার পর রমার মাকে যখন পার্ক থেকে গিয়ে নিয়ে আসতে হত—তখন রাস্তাঘাটে তিনি এত নার্ভাস আর অপ্রতিভবোধ করতেন নিজেকে এত পরদেশী ও অপরিচিত মনে হত—তিনি রীতিমতো আতঙ্কিত হয়ে থাকতেন। এমনকী নিজের ঘর ছাড়া রমার ঘর বা বৈঠকখানাতেও গিয়ে বসতে তিনি সাহস পেতেন না—নিজেকে নিরাপদ মনে করতেন না, অসহায় মনে হত—নিজের ঘরের বিছানায় গিয়ে বসবার জন্যে ভেতরে ভেতরে তাগিদ বোধ করতেন। এদিকে ছায়াকে একটু না দেখলে অস্থির হয়ে উঠতেন। হাঁপানির টানের সময় ছায়াকে এক মিনিটের জন্যেও কাছছাড়া করতে দিতে চাইতেন না। ছায়া যখন রাগ করে চিলড্রেনস পার্কে চলে যেত—তখন রমাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে ছায়ার কাছে পাঠাতেন কারণ বাইরের অপরিচিত জগতে ছায়াকে বেশিক্ষণ থাকতে দিতে ভরসা পেতেন না অপরদিকে বেশিক্ষণ ছায়াকে না দেখলে কেমন অসহায় বোধ করতেন। অথচ সুস্থ সময়ে ছায়ার রাগ রাগ ভাব কিছুতেই চুপচাপ মেনে নিতে পারতেন না। তখন যেন পরিষ্কার বুঝতে পারতেন ছায়া তাঁকে দেখতে পারে না, অপছন্দ করে, বিদ্বেষ পোষণ করে। এ চিন্তা মনে এলেই ছায়াকে আঘাত দেবার জন্যে ছুতো খুঁজতেন। ছায়ার সঙ্গে রমার কলহ বাধলেই তিনি রমার সপক্ষে হাজির হতেন ছায়ার অবহেলা ও অবজ্ঞার প্রতিশোধ নিতে। ছায়া যেই বাসা থেকে বের হয়ে যেত অমনি রাগ গিয়ে পড়ত রমার 'পর—কারণ ছায়াকে না দেখলে তিনি তক্ষুনি একটু একটু অসহায় বোধ করতে শুরু করে দিতেন। তাই আজ তিনি অন্য মানুষ সর্বক্ষণ নিজের অসুখের চিন্তা, ছায়ার কাছ ছাড়া হতে ভয় অথচ ছায়ার 'পর একটা আক্রোশ। আর রমার 'পর নির্ভরশীলতা। তাঁর

ভেতরের আর্টিস্টের যে মৃত্যু ঘটেছে—নিজের অতবড় ছেলের যে মৃত্যু ঘটেছে এসব কথাও মনে পড়িয়ে না দিলে মনে আসে না—এলেও বেশিক্ষণ থাকে না। সর্বদা ভয়, ওষুধ যদি ফুরিয়ে যায় আর রমা যদি মনে করে না আনে—তা হলে কী সর্বনাশ হবে? এতকাল ভয় ছিল পাছে কেউ তাঁর সামনে আর্টের কথা তোলেন—সে জন্যে আতঙ্কে থাকতেন। আজ নিজের আঁকা ছবিগুলোর কথা উঠলেই মনে পড়ে—তক্তাপোষের তলায় ধুলাবালিতে আচ্ছন্ন হয়ে আছে—ঐ ধুলাবালি এতদিনকার—সর্দি কি সে জন্যেই সারছে না? ওগুলো ঘাঁটাঘাঁটি করবার কথা ভাবতেই পারেন না—বাপরে তাহলে এমন হাঁপানির টান উঠবে—এমন নাক বন্ধ হবে ....। স্ত্রী যখন বাজারে যান—ততক্ষণ একা থাকা তাঁর কাছে রীতিমতো কষ্টকর। দু'জন লোক খাবে—কিনবে তো দু'পয়সার পটল আর এক পয়সার আলু—তার জন্যে মহারানির ন'শ পঞ্চাশ ঘন্টা সময় চাই। মনে মনে গজরান। ঐ বাজারের নাম করে বেড়িয়ে আসে একটু—তাই বাজারে এত গরজ। কখনও একটু দেরি হলে হয়তো একপশলা ঝগড়া হয়ে যায়। আবার ঝগড়ার দিন তখন রমা চিলড্রেনস পার্ক থেকে মা'কে বাড়ি ফিরিয়ে আনতে চায়—তখনও, ঐ রাত, বড় একা লাগে, এত বড় বাড়িতে একমাত্র একা—কোরামিনের শিশিটা হাতে নিয়ে বসে থাকেন—সময় কাটতে চায় না। যেমন মেয়ে তেমনি মা। কথায় কথায় বের হওয়ার ইচ্ছে—যাবার কোন চুলো আছে শুনি—বাবা-মা যার জন্মে খোঁজ নেয়নি—ঐ হয়েছে এক চিলড্রেনস পার্ক। পার্কটা না থাকলেই....। দরজায় ওদের আসবার শব্দ পেয়ে কোরামিনের শিশিটা যথাস্থানে রেখে দিয়ে মুখ গম্ভীর করে শুয়ে থাকেন।

রমার মা সচ্ছল ঘরের মেয়ে। ভালো গলা ছিল—বেশ গাইতে পারতেন—সুন্দর সুন্দর ছবিও আঁকতে পারতেন। পড়াশুনা খুব ভালোবাসতেন না। সেসময় মেয়েদের পড়াশোনার জন্যে অভিভাবকদের খুব গরজও ছিল না। তবে কুমারী ছায়া লুকিয়ে লুকিয়ে বিস্তর উপন্যাস পড়েছিলেন—বিশেষত শরৎচন্দ্রের। যেহেতু বাপের বাড়ির আর্থিক অবস্থা ভালোই ছিল—সিনেমায়ও যেতেন ঘন ঘন। প্রমথেশ বড়ুয়ার দেবদাস দেখে মন খারাপ থাকত—'প্রতিশ্রুতি' দেখে কাঁদতে কাঁদতে চোখ ফুলিয়ে ফেলেছিলেন। বাড়িতে ঠাকুর চাকর থাকতেও রান্নাবান্না একটু একটু শিখতেই হত। বাবা প্রশ্রয় দিয়ে বলতেন—ওকে এমন ঘরে বিয়ে দেব যেখানে কোনদিন রান্নাবান্নার কাজ করতে হবে না। মা আপত্তি করতেন—কোন কোটিপতির ঘরে মেয়ে দেবে শুনি? হাজার ঠাকুর চাকর থাকুক—বিধবা শাশুড়ি থাকলে তার হবিষ্যি রান্না করতে হবে না—তিন তিনটে মেয়ে তোমার .... সব কাজ সবাইকে শিখতে হবে—কার অবস্থা কখন কী হয় বলা যায় .... কোটিপতি ফকির হতে কতক্ষণ। বাবা সায় দিতেন—তা ঠিক বলেছ—জোয়ারের সময় সবাই নৌকো বাইতে পারে—নেয়ের পরীক্ষা হয় ভাটার টানে। আজ রমার মা মাঝে মধ্যে ভাবেন, চিরকাল ভাটার গানই গেয়ে গেলাম—জোয়ার কেমন জানলেম না। হয়তো নিশ্চুপ দুপুরে প্রদ্যোতবাবু ঘুমিয়ে পড়েছেন—সারা বাড়িতে একা একা বসে রমার মা ভাবেন—না বাবা দেখলেন অবনকে, না রমাকে। ওদের দেখলে কি তাড়িয়ে দিতে পারতেন। আর আমাকে—কে বেঁচে আছে আর কে নেই—কোন সংবাদই জানিনে। এঁটোকাঁটাগুলোর কাছে দুটো কাক উচ্ছিষ্টের জন্যে কাড়াকাড়ি করছে

সেই দিকে একমনে তাকিয়ে থাকেন—অবনের জন্যে প্রাণটা হু হু করে। বাবা মা ত্যাগ করলেন, ভাইবোনরা খোঁজ নিল না। অবনটাও আমার কোল খালি করে চলে গেল। কোনওদিন কিছু ভালো খেতে পেল না, পরতে পেল না। নকল করে ধরা পড়বার পর অবনের শুকনো মুখ মনে আসে। সঙ্গে সঙ্গে মনে আসে অবনের মৃত্যুর পরের পান্ডুর ফ্যাকাসে মুখ....। চোখের দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে যায়। কাক দুটোকে বড় ঝাপসা লাগে। .... নিজেকে তাড়া দেন—অনেক কাজ পড়ে আছে—তবু কাজ শেষ করতে ভয় হয়—পাছে কাজ শেষ হবার পর তখন বিনে কাজে এত বড় দুপুর—এত লম্বা সন্ধ্যা কী করে কাটাবেন—থাক কাক দুটো যা পারে খাক—পেটের জ্বালা বড় জ্বালা। ইচ্ছে হয় ঘরে গিয়ে অবনের ফটোটি আরেকবার দেখে আসেন—কিন্তু সাহস পান না। ফটোটি এত জীবন্ত—মনে হয়, এমন ফটো যার সে এখনও জীবন্ত—ফটোটি কেমন মিথ্যে আশ্বাস দেয় -নিরুপায় ভাব অধীর করে তোলে—ফটো দেখলে হয়তো নিজেকে সামলাতে পারবেন না। .... দূর দূর—এবার তিনি কাক দুটোকে তাড়া দেন—সারা উঠোন এঁটো ছড়াচ্ছে—দূর হ। উঠে দাঁড়ান।

পাশাপাশি বাড়ি ছিল প্রদ্যোতবাবুর আর ছায়াদের। প্রদ্যোতবাবু জানলার সামনে যেতেন—ছায়া উঠতেন ছাদে। যাতায়াত ছিল—দু'জনে দুজনের দিকে তাকাতেন। ছায়া একটু তাকিয়ে একটু হেসে চোখ নামাতেন আবার তক্ষুনি চোখ তুলে তাকাতেন—দেখতেন। তন্ময় হয়ে প্রদ্যোতদা তাকিয়ে রয়েছেন। একদিন লুকিয়ে প্রদ্যোতবাবু ছায়াকে ছায়ার একটি ছবি এঁকে নিচে শুধু লিখলেন 'ভালোবাসি'। ছবিটি দেখে ছায়ার সমস্ত শরীর শিরশির করে উঠল—আনন্দে, শিহরনে, আবেগে একবার প্রদ্যোতবাবুর দিকে তাকিয়ে ছবিটি ফেরত দিলেন। প্রদ্যোতবাবু বললেন—তোমাকে আমি প্রেজেন্ট করলাম। ছায়া দ্রুতবেগে মাথা নাড়েন—না, না, ছবি রাখবার কোন জায়গা নেই—কাঁপা কাঁপা লাগছিল—একসঙ্গে এত কথা ছায়া তখন বলতে পারতেন না—বলতেনও না। তার বাক্স প্যাঁটরা সবাই দেখে—এই-ই সংসারের নিয়ম। ছবিটি কী ভয়েই হাতছাড়া করবার ইচ্ছা ছিল নাকি? প্রদ্যোতদা তখন কেমন গম্ভীর হয়ে গেলেন। করুণভাবে ছায়া বললেন নিলে দেখে ফেলবে। 'ভালবাসি' কথাটির নিচে আঙুল দিয়ে প্রদ্যোতবাবু বললেন—একেও কী ফেরত দেবে। ছায়ার মাথা একেবারে ঝুঁকে পড়ল যেন মাটির সঙ্গে। প্রদ্যোতদা চুপ করে আছেন কিন্তু ছায়া মাথা তুলে তাকতে পারছেন না। সমস্ত শরীর কাঁপছে। হঠাৎ যেন কার পায়ের শব্দ শুনে ছায়া সন্ত্রস্তভাবে ভীত আয়ত চক্ষে বড় বড় করে তাকায়—বলে, কে যেন আসছে, আমি যাই। যাবার সময় প্রদ্যোতবাবুর হাত থেকে ছবিটি এক লহমার মধ্যে ছিনিয়ে নিয়ে বুকের মধ্যে গুঁজে ছুটে বেরিয়ে যান। ..... রমার মা বাসন মাজতে মাজতে ভাবেন—সেই মানুষ আজ বলে না এমন কথা নেই, শরীর একটু যদি ঠিক থাকে তবে তার তেজ দেখে কে, তুই তোকারি তো লেগেই আছে-অপয়া অলক্ষী রাক্ষুসী ......। একবার চারদিকে তাকান কী ছিল বাপের বাড়ি। ঘর বাড়ি জমজমাট। সারাদিন এখানে একটা কথা বলবার মানুষ নেই—ঐ মানুষ তো অষ্টপ্রহর কোকাচ্ছে—রোগের কাঁদুনি ছাড়া অন্য বাতিক নেই। বাপের বাড়ি-ভাই-বোন-বউদি-ঠাকুর-চাকর-হাসি ঠাট্টা-বেড়ানো সিনেমা দেখা। কী জীবন রমা অবন কী

ভাবতে পারে—খাবার দাবার বাড়িতে ছড়াছড়ি—মিষ্টি একদম খেতে পারতেন না। অবন একটা মিষ্টি পেলে কী খুসি হত—রমা ছাইভস্ম অফিসে কী খায় ওই জানে .....। নিজের মা'র কথা মনে পড়ে—সেই ফরসা কোঁকড়ানো কোঁকড়ানো চুল পিঠে চাবির গোছা—ঠাকুর চাকরের সঙ্গে নিজেই চলে যেতেন রান্না ঘরে বাবার জন্য জলখাবার করতে—বাবা অফিস থেকে এসে খাবেন। পুজোর সময় বাবা একগাদা শাড়ি ওদের সামনে ফেলে দিতেন—পছন্দ করে নিতে। তিনি যেবার চলে আসেন সেবার তিনি নিয়েছিলেন জর্জেট শাড়ি। বার বার তাঁর মা'র চেহারা সামনে ভেসে ওঠে। কলতলায় বাসন মাজা বন্ধ করে চুপ করে কখন থেকে যে বসে থাকেন নিজেই জানেন না। কতক্ষণ কেটে যায়। হঠাৎ খেয়াল হয়—পাশের ঘরে প্রদ্যোতবাবুর কাশির শব্দ শুনে। আবার বাসন মাজতে শুরু করেন। .... আগে আগে ভাই বোনদের খুব দেখতে ইচ্ছে করত—আবার লজ্জাও হত, এসে কী দুরাবস্থা দেখবে—কি দীনদশা দেখবে। অবনের মৃত্যুর পরে আর ওদের দেখতে ইচ্ছে করে না—দেখবার খিদে মরে গেছে—অবনই চলে গেল—আর তাঁর জীবনের সব কিছু আকর্ষণ যেন ফুরিয়ে গেছে। তবু বাপের বাড়ির কথা মনে আসে, মনে পড়ে, মনে পড়ে তন্ময় হয়ে যান—কিন্তু ওদের আর আগের মতো দেখতে ইচ্ছে করে না। আগের মতো টানও অনুভব করেন না। অবনের মৃত্যুর পরে বাপের বাড়ির স্মৃতির পরেও বিতৃষ্ণা এসে গেছে—জাতই ওদের কাছে বড় হল—মেয়ে ওদের কাছে কিছু নয়, বোন ওদের কাছে কিছু নয়। কখনও কখনও হঠাৎ বুক ধক করে ওঠে—তিনি পালিয়ে এসে বাবা-মার মনে যে দুঃখ দিয়েছিলেন সেই অভিশাপেই কী অবন গেল। গুরুজনের দীর্ঘ নিঃশ্বাস .....। একথা যখন মনে পড়ে, তখন নিজের 'পর ঘৃণা, ও প্রদ্যোত বাবুর 'পর বিদ্বেষ আর বাবা-মার চেহারাটির স্মৃতির পরও বিতৃষ্ণা এসে যায়। তখন বাবা মাকে ভাবতে আর ইচ্ছে করে না—কেমন অরুচি লাগে। .... আগে আগে কত কী মনে হত—ওর নাম আর্টিস্ট হিসেবে চারদিকে ছড়িয়ে পড়বে .... অর্থ আসবে, সম্পদ আসবে—ওদের গর্বে গর্বিত হবে—তখন বাপের বাড়ির কত আদর ....। আজ আর এসব স্বপ্ন যে শুধু নেই তা নয়—এক কালে যে এসব স্বপ্ন দেখতেন তাও আর মনে পড়ে না। বাসন মাজা শেষ, কলতলা পরিষ্কার হয়ে গেছে—দেখি এখন যদি সেই শাড়িটা একটু রিপু করা যায়। শীতের সন্ধ্যার তো আর দেরি নেই। রমার আসতে আসতে তো' সেই রাত ন'টা। ওর যদি আবার টান ওঠে তো হয়ে গেল বিশ্রাম। কাজকর্ম হয়ে গেলে শাড়ি রিপু করতে করতে তন্ময় হয়ে তাকিয়ে থাকতেন অবনের পড়বার টেবিলের দিকে হাতের কাজ বন্ধ হয়ে যেত। সুচ ও সুতো ঝাপসা।

উঃ কী দিন গেছে। বাড়ির সকলে যখন কেমন করে যেন জেনে গেল ছায়ার সঙ্গে প্রদ্যোতবাবুর সম্পর্কটি। দু'চারদিন প্রদ্যোতবাবু এসে শীতল ও গম্ভীর ব্যবহার পেয়েই আঁচ করে ফেললেন। ছায়াদের বাড়ির সামনে দিয়ে কারণে-অকারণে পদচারণা করতেন তিনি। আর সেই পায়চারির সময় ছায়ার সমস্ত শরীর, পঞ্চেন্দ্রিয় উন্মুখ হয়ে থাকত তাই নয়—সারাদিনের সেই সময়টি সবচেয়ে আতংককর ও লোভনীয় ও একমাত্র আকর্ষনীয় মনে হত তাই নয়, সেই পায়চারীর এক ফাঁকে প্রদ্যোতবাবু চট করে এক টুকরো চিঠি

জানলার পাশে ফেলে দিতেন—জানলা নির্দিষ্ট থাকত—সঙ্গে সঙ্গে ছায়া তা কুড়িয়ে বুকের মধ্যে লুকিয়ে রাখত। কতবার যে সেই চিঠি পড়া হত তার ঠিক নেই। তার পর আবার পদচারণার সময় ছায়া ঠিক সেই জানলার কাছে আসবার পালা যখন আসত—তখন ছায়া চিঠি ছুড়ে দিত, দু'জনকে এক পলক দেখবার, একটু কথা বলবার বা শোনবার কী আগ্রহ, কী উত্তেজনা কী অধীরতা ও অস্থিরতা। তারপর প্রতিবেশী এক বন্ধুর বাড়ি যাবার নাম করে প্রদ্যোতবাবুর বৈঠকখানায় এসে হাজির হতেন—তখন এত খুসি, এত আনন্দ হত কথাই বলতে পারতেন না আর এত আতঙ্ক হত বেশিক্ষণ থাকতে ভরসা হত না—চুমোয় চুমোয় ছায়াকে পাগল করে দিতেন প্রদ্যোতবাবু। ছায়ার এই লুকিয়ে অভিসারও ধরা পড়ে গেল। তখন ছায়ার বের হওয়া বন্ধ হয়—তখনই চলল পালাবার পরামর্শ। ছায়া চিঠিগুলো রেখে দিতেন পুরানো কটি ট্রাঙ্কের তলায়। ফটোটিই সেখানেই ছিল। পালাবার দিন ইচ্ছে ছিল সঙ্গে করে নিয়ে আসেন—কিন্তু এত ভয়ে, আতঙ্কে, বেপরোয়া হাত-পা কাঁপনিতে শেষ মুহূর্তে তা ভুলে যান। আজও কী সেগুলো সেখানে আছে না ধরা পড়ে গেছে? কত বছর হল। সে কী আর দু-পাঁচ বছর? কোথায় ভাইরা, কোথায় বোনেরা? আজ ওদের দেখবার খিদে যে শুধু নষ্ট হয়েছে তাই নয়—এককালে রমার মা চাইতেনও না ওদের সংবাদ ওরা কেউ জানুক। ওদের এই দীনহীন ভাঙাচোরা অবস্থা দেখে পাছে মনে করে বাড়ি থেকে পালিয়ে যাবার প্রায়শ্চিত্ত হচ্ছে, সুতরাং রমার মা যেন আত্মীয় স্বজন থেকে ফেরারী জীবন যাপন করছেন এমনি ভাবে থাকতেন। অবনের মৃত্যুর পর তাঁর আর নিজেদের দুরবস্থার জন্যে সঙ্কোচ লজ্জা গ্লানি সবই যেন চলে গেছে—নিজেদের দুঃখ দারিদ্র্য রোগ সম্পর্কে তিনি কিছু বলেনও না—জিজ্ঞেস করলে গোপন করবার ইচ্ছেও নেই। কেমন একটা উদাসীন অথচ নির্দয় সরল নিরুত্তাপ সত্যবাদীতা রমার মার মধ্যে এসে গেছে। একদিকে যেমন নিজেদের সম্পর্কে লজ্জা ও গ্লানি চলে গেছে, তেমনি নিজেদের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে হীনতাবোধও চলে গেছে—নিজেদের নিয়ে তাঁর আর আগের সঙ্কোচ নেই। আবার ভাই-বোন উচু অবস্থায় আছে বলে তাদের জন্যে দীর্ঘ নিঃশ্বাসও নেই। গর্বও নেই, এখন যেন সব আগ্রহও স্তিমিত হয়ে গেছে—বড় মনেও পড়ে না—চেহারাও কেমন যেন ঝাপসা হয়ে আসে। ছোট ভাই এর সঙ্গে অবনের মিল ছিল। ছোট ভাইটা বেঁচে থাক সুখে থাক। ...... এ পাড়ার ২৬ নম্বরে এক ভাড়াটে ছিল তাদের সঙ্গে ওর বাপের বাড়ি জানাশোনা ছিল—যতদিন ওরা ছিল -দু'চারটে খবরাখবর পাওয়া যেত। ওরা চলে যাবার পর সেই যোগটুকুও ছিন্ন হয়ে গেল। ওদের কাছে নিশ্চয় এখানকার ঠিকানা বাপের বাড়ির লোক জানত ..... বাবা-মা'র কিছু একটা হলে কী জানাত না? ওদের যে শাস্ত্রমত দায়িত্বও রয়েছে—তা থেকেও বঞ্চিত করবে; করতেও পারে। আজ আর কারো 'পর কিছুর 'পর বিশ্বাস নেই, ভরসা নেই, সেই ২৬ নম্বরের কাছ থেকে এখানকার খবর কী শুনেছে না শুনেছে কে জানে—ওরা অবশ্য দারিদ্র্য ও ঝগড়ার ইতিহাস এতটা জানত না আর তাছাড়া তখন অবস্থা শুধু খারাপের দিকে যাচ্ছে মাত্র—তা হয়ত ওরা জানত না। ২৬ নম্বরের ভাড়াটে চলে গেছে তাও কী আজকের কথা—তখন রমা তো স্কুলেই ভর্তি হয়নি। আজকের দৃষ্টিতে যখন নিজের সেই বাপের বাড়ির কুমারী লাজুক স্পর্শকাতর

চেহারাটি মনে আসে—তখন যেন সেই কুমারী লাজুক মেয়েটির স্মৃতি নিজের অতীত বলে মনে হয় না—আকর্ষণীয় কিন্তু পর হয়ে যাওয়া স্বপ্ন—ঘুম ভাঙলে স্বপ্ন যেমন মধুর ও একসঙ্গে পর হয়ে যায়—এ যেন পর হয়ে যাওয়া বহুদূরের একটি স্বপ্ন -অনেক কালের আগে দেখা, আর সেই পর হয়ে যাওয়া স্বপ্নের হয়ে, সেই বহুদূরের কুমারী জীবনের তরফ থেকে আজকের খিটখিটে বিরক্ত আশা ভরসাহীন নিজেকে দেখলে নিজেকেও চিনতে পারেন না। নিজের 'পরও কেমন বিতৃষ্ণা আসে। দুপুরে প্রদ্যোতবাবু যখন অঘোরে ঘুমোন, সব কাজ শেষ হয়ে শাড়ীর রিপু যখন শেষ হয়ে আসে অথচ সন্ধ্যা হয় না—তখন অবনের জন্যে প্রাণ হু হু করে, প্রদ্যোতবাবু যত গালাগাল দেন সেগুলো যেন উল্টে নিজেকেই বিঁধতে থাকেন—সারাদিনের পরিশ্রমের পর রমা এলে যে খিটখিট ব্যবহার করেন তার জন্যে দুঃখেও রমার 'পর সহানুভূতিতে প্রাণ কেমন করতে থাকে। ইচ্ছে হয় প্রাণ ভরে মাটিতে লুটিয়ে কাঁদেন কিন্তু কান্না আসে না—চোখে জল আসে—প্রাণ হু হু করে—বুকের ভেতরটা তোলপাড় করতে থাকে—কিন্তু হু হু করে কান্না আসে না। তেমন করে কান্না আসে না। দুঃখ, শোক, বেদনা, ব্যর্থতা সবই বুকের ভেতরে তোলপাড় করে—চোখে জল এসে ঝাপসা করে দেয়—কিন্তু বুক হালকা করে, হু-হু করে কাঁদতে পারেন না। এই কাঁদতে না পারবার কষ্ট তাকে একটুও স্বস্তি দেয় না, নিষ্কৃতি দেয় না—জোঁকের মতো লেগে থাকে। দারিদ্র্যের সংসারে ভাগ্য কৃপণ—তাই এককালে চোখের জলের প্রাচুর্য ছিল—আজ সেখানেও কার্পণ্য এসেছে। ভালো করে কাঁদতে না পারবার অস্থিরতা সারাদিন ধরে তাকে অশান্ত করে রাখে। নিজের 'পর সকলের 'পর বিরক্তি, বিতৃষ্ণা, মমতা, সহানুভূতি ও বেদনায় তাঁর ভেতরে কেমন একটা অস্থিরতা ও চঞ্চলতা এসেছে। চুপচাপ বসে থাকতে হয়—কিন্তু এই চুপ চাপও নীরবতাকে কাজ করে যত কমিয়ে আনা যায় ততই তার চেষ্টা—তাই সকাল থেকে রাত দুপুর কেবল কাজ আর কাজ।

রোববার রোববার যখন রমার মাথা ঘষতে বসেন তখন রমাকে প্রেমের অপকারিতা বোঝান। হঠাৎ ঝোঁকের মাথায় ভালোবেসে আজ তাদের কী দুর্গতি হয়েছে, রূপের মোহ যে দু'দন্ডের, যে মানুষটার জন্যে সব কিছু ছেড়ে এলেন সে আজ বলে না এমন কথা নেই, আর তোর বাবারই কী ভাল হ'ল? না পেল আর্টিস্ট হিসেবে নামযশ, না এল টাকা পয়সা—অথচ সংসারের বোঝা যদি ঘাড়ে তুলে না নিতেন .....। অর্থাৎ রমা যেন ভালবাসার ফাঁদে পা না দেয় এই হচ্ছে সমস্ত বক্তব্যের সার কথা। রমার মা প্রচ্ছন্নভাবে তা বলতেন না, প্রকাশ্যেই তিনি রমাকে বারবার সতর্ক করে দিতেন। বলতে বলতে তিনি যেন অনুতাপে বা বেদনায় ভেঙে পড়তেন না—কেমন উত্তেজিত হয়ে উঠতেন। অমন ভালবাসার কপালে নুড়ো জ্বেলে দিতে হয় ..... এখন অল্প বয়েস ..... কত মিষ্টি কথা শোনাতে হারামজাদারা সব আসবে—খবরদার কাউকে আমল দিবিনে। তোর বয়েস হয়েছে, কটা পাশ করলি, নিজে খেটে টাকা পয়সা আনছিস—তোর বাবার চেয়ে অনেক বেশিই আনছিস—তুই পুরুষের চেয়ে কম কিসে .... আমরা হাবাগোবা ছিলাম ... কিছু বুঝতামও না ... লেখাপড়াই বা কী জানতেম। তোরা তো তা নোস .... পুরুষের মিষ্টি কথায় তোরা ভুলবি কিসের জন্যে? পুরুষ মিষ্টি কথা ... ওসব বয়সের

প্রলাপ। ঐ যে মানুষটা—কেমন মিষ্টিকথা বলে শুনেছিস না এখন তুই তোকারি ছাড়া ...।

টাকাপয়সার সচ্ছলতা আসবার পর থেকে রমার মা'র অস্থিরতা যেন আরো বেড়ে গেছে। রমার বাবা যদি সুস্থ থাকেন—তবে তাঁর কেমন ঈর্ষা হয়—মেয়ের পয়সায় দিব্যি পায়ের 'পর পা তুলে খাচ্ছে—লজ্জাও করে না—যদি এমন ভাবে হাল ছেড়ে না দিত—তবে অমন বেঘোরে অবনটা মরত না। কতলোক ননম্যাট্রিক হয়ে কতটাকা রোজগার করছে আর তোমাকে কেউ আর্টিস্ট বলল না বলে তুমি সব ছেড়েছুড়ে বউ ছেলেকে উপবাসে রাখলে .... মাঝের থেকে ছেলেটা গেল .....। যদি দেখেন নিজের আঁকা ছবির দিকে তন্ময় হয়ে রমার বাবা তাকিয়ে আছেন—তবে তাঁর অসহ্য মনে হয়—ঐ ছবি আঁকাই তো কাল হলো—সংসার ছারখারে গেল কী এমনি এমনি .....। স্বামীকে সুস্থ দেখলে নিজের কেমন গা জ্বলে যায় সংসার নষ্ট করে ছেলেকে খেয়ে মেয়েটাকে গাধার মতন খাটিয়ে এখন দিব্যি পায়ের 'পর পা তুলে নিজের আঁকা আর্ট দেখছেন। স্বামীর মুখে নিশ্চিন্তভাব দেখে আঘাত দেবার একটা অদম্য ইচ্ছে জেগে উঠত—সুতরাং ঝগড়া বেধে যেতে দেরি হত না। আরও কারণ ছিল, স্বামীকে সুস্থ দেখলে যেমন একটা গোপন রাগ নিজের আগোচরেই আস্তে আস্তে চেতনায় সংক্রমিত হতে থাকত—তেমনি সেই রাগের পেছনে আরও একটা ইচ্ছেও আত্মগোপন করে থাকত—যা সব সময় তিনি টের পেতেন না অর্থাৎ গভীরভাবে কান্নার একটা ইচ্ছে। স্বামী বেশ গালাগাল করতে পারেন সুস্থ থাকলে—যদি সেই প্রবল গালাগালিতে তিনি খানিকটা কেঁদে নিয়ে সুস্থবোধ করতে পারতেন। স্বামীর গালাগালির আঘাতে যদি রমার মার অন্তরের কান্নার দরজা ভেঙে প্রবল অশ্রুপাত ঘটে—সেই প্রবল কান্নার প্লাবনের প্রতি লোভও তিনি ঝগড়ার জন্যে এগিয়ে আসতেন। কিন্তু স্বামীর গালাগালিতে ইতরামি আছে, ছোটলোকদের মতো অশ্লীলতা ও রুচিহীনতা আছে—আঘাত নেই, রমার মা'র অন্তকরণকে বিদ্ধকরে অশ্রুক্ষরণ করবার কত কোন সুতীক্ষ্ণ বেদনা ও অভিমানে সিক্ত কোনও আঘাত নেই। রমার বাবার গালাগালিতে উত্তেজিত হওয়া যায়—রাগ করা যায়—কিন্তু কান্না আসে না—কাঁদতে রুচি হয় না—তিনি যদি বা কাঁদেন তবে হয়তো রমার মা'র সেই অশ্রু আর ঝগড়া না করবার সজল ইচ্ছে; কিংবা হয়তো রমার সহানুভূতিকে টেনে রাখবার কৌশল, কিংবা স্বামীর কাছে গালাগালিতে হেরে যাবার গ্লানি, কিংবা স্বামীর আঘাতে তিনি যে কাঁদতে পারছেন নিজেকে সেই কথা বোঝানো—জোর করে কাঁদবার মধ্য দিয়ে নিজের কাঁদবার ইচ্ছেকে জোর করে প্রকাশ করে নিজেকে বঞ্চনা করা। কিন্তু স্বামী যখন জানান—কান্না দেখে দেখে তাঁর চোখ পচে গেছে—কান্নার কোনও মূল্য যখন তিনি দিতে চান না—তখন স্বামী তাঁর আরও একটা ন্যায্য পাওনা অর্থাৎ কান্নার ইচ্ছে থেকে বঞ্চিত করবার ক্ষোভে ও চোখের জলকে অপমানিত করবার ক্রোধে তখুনি কান্না থামিয়ে বা কাঁদতে কাঁদতেই জবাব দেন—পচে যাক তোমার চোখ—অন্ধ হলে তোমার শিক্ষা হয়—মজা দেখি আমি। হরি লুট দেব আমি।—আগে থেকে যদি অন্ধ হতে তবে আমার এ জায়গা হত না .... হারামজাদা বলে কিনা চোখ পচে গেছে—পচুক তোর চোখ গলে পচে যাক। ..... তাঁর চোখের জল যে কত সেধে আনতে হয়—কত কষ্টের

জিনিস—রমার বাবা তাকে অপমান করায় তিনি যেন ক্রোধে ও অপমানে দিশেহারা হয়ে যান—চিলড্রেনস পার্কে যাবার জন্যে তৈরি হন। প্রাণ ভরে কাঁদতে না পারার জন্যে স্বামীর 'পর নিজের প্রায় অগোচরেই অন্যান্য আরো ক্ষোভের মত একটা সুপ্ত বিতৃষ্ণাও রয়েছে। অন্যান্য অক্ষমতার সঙ্গে এই অক্ষমতাও তাকে উত্তেজিত করে, ক্ষুব্ধ করে, কিন্তু এ সম্পর্কে তিনি তেমন সচেতন নন। আবার রমার বাবা যখন অসুস্থ হয়ে পড়েন-টান ওঠে বাতের যন্ত্রণা তীব্র হয়ে দেখা দেয়—তখন তাঁর মনে হয় সারাজীবন রোগীর সেবা করতে করতেই গেল। তখন এত ক্লান্ত লাগে-মনে হয়, আর রোগের সেবা বুঝি করতে পারবেন না—একটা মানুষ কত সেবা করতে পারে বলো তো। একটু হাঁটাচলা করবে না তো বাত হবে না কেন ঐ বন্ধ ঘরে ধুলাবালির মধ্যে থাকলে টান উঠবে না? একটা দিন যদি শান্তিতে থাকা যায়—রোগ আর রোগ। মনে মনে গজরান আর অপ্রসন্নমুখে সেবা করেন। যখন প্রদ্যোতবাবুর হাত পা কেমন ঠান্ডা হয়ে আসে—মনে হয় টানের জন্যে বোধহয় প্রাণটা বের হয়ে গেল—যখন তিনি ছায়ার হাত নিজের বুকের মধ্যে টেনে নেন—তখন রমার মা'র বুক কাঁপতে থাকে—মানুষটার জন্যে কেমন একটা অদ্ভুত মমতা ও বেদনা—কেমন যেন অনুতাপ ও অনুশোচনা নিয়ে—তাড়াতাড়ি কোরামিন দেন। আবার যখন আস্তে আস্তে হাত পা গরম হতে থাকে—টান কমে আসে—রমা যখন উদ্বিগ্ন হয়ে বারবার অফিস থেকে এসেই বাবার কথা জিজ্ঞাসা করে—তখন তিনি রমার উদ্বেগের মধ্যে তিনি যেন রমার তিনি যেন রমার বাবার 'পর পক্ষপাতিত্বই বেশি দেখতে পান। তখন নিজের জ্বালা আবার দেখা দেয়—রমার বাবার 'পর—রমার 'পর কেমন একটা ম্লান ক্ষোভ দেখা দেয়। বার বার ভাবেন, অবনটাকে একটুও সেবাযত্ন করতে পারলাম না—ছেলেটা কারও কোন সেবাযত্ন নেয়নি—কেমন নিঃশব্দে চলে গেল। স্বামীকে সেবাযত্ন করে বাঁচিয়ে রাখছেন অথচ ছেলেকে সেবাযত্ন করে বাচিয়ে রাখবার কোনো সুযোগ পেলেন না বলে মনে হয় ভাগ্য আর স্বামী দু'জনে মিলে যেন তাকে প্রতারণা করে চলেছে। স্বামী একটু সুস্থ হলেই মনে মনে গজরান—ভালো করছি তো গালাগাল খাবার জন্যে? গায়ে তেল এলেই মেজাজ দেখ একবার ...... রমারও কী মেজাজ ..... অবনটা ছিল ঠান্ডা ..... নিরীহ .... কী মিষ্টি চেহারা .... অবনের কপালে একটা চুমো দেবার আকাঙ্ক্ষায় প্রাণটা হাহাকার করে। ..... আবার রমা যখন বাবার জন্যে ওষুধ বা টনিক কিনে আনে তখন বাবার 'পর রমার পক্ষপাতিত্বে ভেতরে ভেতের যেমন একদিকে জ্বালা হয় তেমনি নিজেকে বঞ্চিত ও একা মনে হয়। ওষুধগুলো নিতে নিতে অপ্রসন্নমুখে বলেন—তুই যদি আর কটা দিন আগে চাকরি করতিস তাহলে অবনটা অমন করে বিনে ওষুধে ....। অবরুদ্ধ গলায় বলেন .....তুই যদি বড়ও হতিস তা হলে অবনটা বোধ হয় ......। চোখের জল মুছে তিনি ওষুধগুলো ঘরে রাখতে চলে যান।

এক একবার টানের সময় প্রদ্যোতবাবুর অবস্থা এমন হয়, মনে হয় বুঝি আর টিকল না তখন ছায়ার মা ব্যস্ত সমস্ত ভাবে ওষুধ দিতে বা গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বার বার হাত পা কপাল কেমন ঠান্ডা পরীক্ষা করতে করতেই নিজের ভেতরে যেন একটা ভয়ের বোঝা ও কাঁদবার আকাঙ্খা ও দুঃসহ ক্লান্তি বোধ করতেন। ......

তবু যা হোক শুয়ে থাক বা অসুখে থাক তবু বাড়ীতে একটা পুরুষ মানুষ আছে নইলে দুইটি মেয়ে মানুষ একা ..... নিজেকে সত্যিই অপয়া অলক্ষীকে মনে হয় ..... ছেলেকে খেয়েছেন .... এখন স্বামীকেও বুঝি ..... গলার কাছে ডেলা আটকে আসে—খুব কাঁদতে ইচ্ছে হয় .... হয়ত এই সময় বহু আকাঙ্ক্ষিত কান্নাও আসতে পারে তবু এই সময় কান্না সম্ভব হয় না। মকরধবজ কেরে খাওয়ানো, কোরামিন দিতে হয়—হয়তো গরম জল বোতলে করে হাতে পায়ে দিতে হয়—আর মানুষটা তখন একটুও কাছ ছাড়া করতে চায় না—হাতটা চেপে ধরে রাখে—কাঁদতে দেয় কই? কান্না এলেও কাঁদতে পারা যায় না। বারবার টেবিলের অ্যালার্ম ঘড়ির দিকে তাকান কখন রমা আসবে। তাছাড়া মানুষটার এমন অবস্থা দেখলে এমন আতঙ্ক লাগে—সেই আতঙ্কের ফলে নিজেকে এত ক্লান্ত, এত শ্রান্ত মনে হয়, আর আমি পারিনে। কত আর উদ্বেগ, অশান্তি, ক্লান্তি সহ্য করি-ভগবান বোধকরি আমার পেছনে যেমন লেগেছেন, তেমন আর কারও পেছনে কোনওদিন লাগেননি—আমার সর্বনাশ ষোলো আনা পূর্ণ না করে তোমার আশ মিটবে না—তবু রমার মা সে সময় ভগবানের কাছে রমার বাবা সেরে উঠলে একটাকার ভোগ কালীঘাটে দেবেন তাও মানত করেন—মনে মনে হিসেব করেন—এই নিয়ে চার টাকা জমল—একটা রোববার দেখে রমাকে নিয়ে গিয়ে ভোগ দিয়ে আসবেন—এবার ঠিকই দেবেন—আর বাকি রাখবেন না। যদিও অবনের শেষ মুহূর্তেও তিনি মানত করেছিলেন—ঠাকুর শোনেননি—তা অবশ্য এখন আর মনে পড়ে না। উঃ কী সময় যায় এক একটা .... সময় আর যায় কোথায়? ..... তখন রমার 'পরও রাগ হয় .... এমনিতে তো মাঝে মধ্যেই টিউটোরিয়ালে কামাই দিস—আজই কাজ লেগেছে—আজ সব বিদ্যে উজাড় করে দেবে .... একা আমি ..... কতদিক সামলাই বলো তো .....। আস্তে আস্তে প্রদ্যোতবাবু ভাল হতে থাকেন—ঘুম আসতে থাকে—হাত পা গরম হয়। চোখে মুখের ফ্যাকাসে ভাবটা চলে যায়। বিপদ কেটে উঠবার সকল লক্ষণ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তখন রমার মা নিজেকে কেমন বঞ্চিত ও প্রতারিত মনে করেন। দারুণ সংকটজনক অবস্থা কাটিয়ে স্বামী ভাল হয়ে উঠল অথচ অবনটা ভাল হবে না—বাঁচল না স্বামীর অবস্থা ভালোর দিকে যাওয়ামাত্র তিনি স্বামীর কাছ থেকে একটা প্রতারণার একটা বঞ্চনার বেদনা অনুভব করেণ। অবন বাঁচল না অথচ স্বামী ভালো হয়ে ওঠবার একটা অস্পষ্ট ক্ষোভ তিনি অনুভব করেন। সেই ক্ষোভে রমা এলে পরে ওর বাবার যে সাংঘাতিক অবস্থা গেছে তা বলতেও ইচ্ছে করে না—নিজের মনের 'পর কী ঝড় বয়ে গেল তাও বলতে রুচি হয় না—শুধু বলেন—এতো লেগেই রয়েছে—কবেই বা ভাল থাকে ..... তুই আর কী বুঝবি—বাইরে বাইরে থাকিস—যত ঝামেলাতো শুধু তো আমার জন্যে থাকবে—এই তো আমার কপাল। মানতের কথাও বলতে ইচ্ছে করে না। .... মাঝে একদিন স্বপ্ন দেখেছিলেন, অবনের দারুণ অসুখ—রমার মা ব্যাকুল ও প্রাণ ভরে ওর সেবা করবার জন্যে যত বিছানার কাছে যাচ্ছেন ততই দেখেন অবনের জায়গায় রমার বাবা শুয়ে রয়েছেন—দারুণ বিরক্তি ও উত্তেজিত হতে থাকেন—রমার বাবার মধ্যে কিছুতেই যেন অবনকে খুঁজে পান না—তারপর হঠাৎ দেখলেন শ্বাসের টানে রমার বাবা হঠাৎ মারা গেলেন—তিনি চিৎকার করে রমার বাবার জন্যে কাঁদতে

গিয়ে দেখেন, দেখে স্তম্ভিত হন না, রমার বাবা নন—অবনের মৃতদেহ—ঠিক তেমনি পান্ডুর নীল ফ্যাকাসে হয়ে যাওয়া মুখখানি—তিনি রমার বাবাকে না দেখে অর্ধপথে কান্নাকে থামতে হল বলে ভারি চটে গেলেন। দমে গেলেন, কিন্তু অবনকে দেখা মাত্র সমস্ত মন প্রাণ যেন উল্লাসে ফেটে পড়ল—তিনি চিৎকার করে কেঁদে উঠলেন 'অবনরে', অবনকে দেখবার ও প্রাণভরে কাঁদবার দারুণ তৃপ্তিতে তিনি হু হু করে কাঁদতে লাগলেন। রমার ধাক্কায় স্বপ্ন ভেঙে যায়—মা তুমি কাঁদছিলে। স্বপ্নের রেশ তখনও যায়নি। আস্তে আস্তে বলেন, অবনকে স্বপ্ন দেখছিলাম রে। তখনও স্বর ভেজা। রমা বলে, আমি দাদাকে খুব স্বপ্ন দেখি—এক সঙ্গে বসে পড়ছি—দাদা যেন আমাকে প্রায়ই বলে, আমার ট্রানশ্লেসনটা করে দে তো। কখনও দেখি, দাদা, ঐ দিকের ফুটপাতে যাচ্ছে, কত ডাকছি, এদিকের ফুটপাতে আসছে না। মা কান পেতে শোনেন। বলেন, আমি খুব একটা অবনকে দেখি না, এত আজে বাজে স্বপ্ন দেখি ......। তোর ঘুম ভেঙে গেল না?—সারাদিন খাটিস খুটিস! রমা স্বপ্ন এমন করে ভেঙ্গে দেওয়ায় অবনকে দেখবার তৃপ্তি থেকে বঞ্চিত হবার ও বুকের মধ্যে জমে থাকা কান্নার কিছুটা ভার কমে যাবার হাত থেকে বঞ্চিত হবার জন্যে প্রথমে রমার 'পর ক্ষুব্ধ হলেও অবন তখনও চোখের সামনে ভাসতে থাকায় কান্নার তৃপ্তির রেশ ও ঘোর তখনও লেগে থাকায় তিনি রমাকে শুধু ক্ষমা করেন তাই নয়—অবনের 'পর স্নেহও যেন রমার 'পর অনুভব করেন। তারপর যখন রমার মধ্যে অবনের জন্যে স্নেহ ও ভালোবাসা দেখতে পান—তখন রমার জন্যে মমতায় বুক ভরে ওঠে। গলার স্বর আটকে আসে তবু বলেন—তোরা দুটি মিলেমিশে ছিলি—শত অভাবের মধ্যে সংসারের .....।

অবশ্য সব সময় তিনি রমাকে নিজের সহমর্মী মনে করেন তাও নয়। রমা যখন মাইনে পেয়ে হয়তো মিষ্টি নিয়ে আসে, কখনও প্যাকেট করা খেজুর নিয়ে আসে, আপেল বা মৌসম্বী নিয়ে আসে—তখন প্রদ্যোতবাবু খুসি হয়ে মিষ্টি ও ফলগুলো নেড়েচেড়ে দেখেন—তখন এসব আনবার জন্যে যেমন তিনি রমার মধ্যে নির্দয়তা ও অবনকে ভুলে থাকবার নিষ্ঠুরতা দেখতে পান, তেমনি রমার বাবার খুসিভাব তাকে ক্ষিপ্ত করে তুলত। যে অবন একটা মিষ্টি বা ফল কখনো খেতে পায়নি—যে অবন মরে গেল—সেই অবনকে ভুলে মিষ্টি ও ফল খাওয়াকে তিনি অবনের স্মৃতির 'পর অপমানকর মনে করেন তাই নয় অধিকারও নেই বলে মনে করেন।—এতকাল পর এখন মিষ্টি ও ফল খাওয়াকে তিনি অনেক দেরি হয়ে যাওয়া মনে করেন—মনে করেন, জীবনের সব কিছু থেকে বঞ্চিত হয়ে সামান্য ফল মিষ্টি খাওয়া নিজেদের অতীত জীবনকে অপমান ও নিকৃষ্ট রুচির পরিচয়। এ মিষ্টি আনবার জন্যে রমার মধ্যে নিজের মৃত ভাইকে ভুলে আনন্দ করবার নিষ্ঠুরতা ও নির্দয়তা দেখতে পান—রমাকে অত্যান্ত স্বার্থপর মনে হয় -নিজের টাকা রোজগারের আনন্দে মৃত ভাইকে ভুলে থাকবার হৃদয়হীনতা দেখতে পেয়ে যেন জ্বলে যান। ফল, মিষ্টি আনবার সময় ভাইকে একবার মনেও আসে না? রমার মধ্যে সেই সময় মৃত ভাইয়ের জন্যে স্বাভাবিক বিষণ্ণতা দেখতে না পেয়ে তিনি যেন কেমন হাড়ে হাড়ে চটে ওঠেন। স্বামীকে খুসি দেখে তিনি খেপে যান। তার সারাজীবন নষ্ট করে, অবনকে বিনা চিকিৎসায় মেরে এখন তিনি ফল মিষ্টি খেতে

বসেছেন। তিনি মুখ গম্ভীর করে দেখেন। একবার এসব ছুঁয়েও দেখেন না। রমা বেশ অবাক হয়ে মা'র মুখের দিকে তাকায়—তারপর নিজেই আরো গম্ভীর হয়ে বাথরুমে চলে যায়, রমার মা এসব ফল মিষ্টি কখনো খান না—রমা হাজার চেষ্টা করেছে—পারেনি—এজন্যে রমা কত চোখের জল ফেলেছে কিন্তু তিনি খাননি। রমা মিষ্টি ফল বাবার ঘরে রেখে বাথরুমে চলে গেলে—তিনি পরিতৃপ্ত স্বামীর দিকে অগ্নিদৃষ্টি নিক্ষেপ করে রমা শুনতে না পায় এমনি চাপা স্বরে বলেন—আমার জীবন খেয়েছ, ছেলেটাকে খেয়েছ—এখন মিষ্টি আর ফল খেয়ে মুখ শুদ্ধি করো।

প্রদ্যোতবাবুর সমস্ত আনন্দ মাটি হয়ে যায়। কিন্তু তিনি চটতে পারেন না। কেমন অপ্রতিভ ও অপ্রস্তুত হন—নিজেকে হ্যাংলা মনে হয়। স্ত্রীর জীবন নষ্ট করবার জন্যে কোন অনুতাপ সেই মুহূর্তে বোধ করেন না। তিরস্কার করে স্ত্রী রান্না ঘরে চলে যেতেই তিনি শুয়ে পড়েন। ফল ও মিষ্টির সঙ্গে কোন সম্পর্ক বোধ করেন না। ছেলেটাকে মনে আসে—কোনওদিন কিছু ভাল খায়নি—একথা তাঁর মনে হয় না। হঠাৎ ছেলেটি মরে গেছে হঠাৎ যেন কথাটি তাঁর মনে পড়ে বুকের মধ্যে কেমন তোলপাড় করে—মুহূর্তে নিজের আঁকা ভাল ভাল ছবিগুলো যা কোনদিন দর্শক পেল না—তাও চেতনায় ভেসে ওঠে। মুহূর্তে এই ভয়ংকর চিন্তার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্যে ব্যাকুল হয়ে ওঠেন। বুকটা কেমন করতে থাকে। শুয়ে পড়েন—নিজের নাড়ী দেখেন—কোরামিন খাবেন কি না স্থির করতে পারেন না। মনে হয়, হয়তো টান উঠতে পারে। জোরে জোরে নিঃশ্বাস টানতে থাকেন। জোরে জোরে নিঃশ্বাস টানবার মধ্য দিয়ে তিনি যেন হাঁপানিকে অনুভব করতে চান। একটু পরে ঠিক হাঁপানির টান এখন উঠবে না একথা যেন চেতনায় অস্পষ্টভাবে দেখা দেওয়ায় কেমন আশাভঙ্গ বোধ করেন। স্নান করে রমা যখন বাবার ঘরে এল—তখন প্রদ্যোতবাবু বললেন—দেখ রমা, এসব মিষ্টি ফলটল আনিসনে—হাঁপানি রোগীর এসব খাওয়া ঠিক কি না কে জানে—তুই বরং দুটো পয়সা রাখ—সারাটা জীবন তোর পড়ে আছে—আমার অবস্থা দেখছিস তো—পয়সা না থাকলে ..... আমাদের খরচের খাতায় রেখে দে .... কী করব আর ফল মিষ্টি খেয়ে ..... আমার দিন তো আর ফিরে ..... চাকরি বাকরিও তো করতে পারব না .... পয়সা বাজে খরচ না করে ...... এত বড় ভবিষ্যৎ। রমা আরো গম্ভীর হয়ে যায়।

রমার মা যেমন অবনের মৃত্যুর পর কোনো আনন্দ, কোনো ভোগ, কোনো ইচ্ছেকে পূরণ করা মৃত ছেলের স্মৃতির 'পর অপমান বলে মনে করেন—অন্যায় ও হৃদয়হীনতার লক্ষণ বলে চিহ্নিত করেন—রমার বাবারও এই ধরনের অনুভূতি ছিল যখন আর্টিস্ট হিসেবে মর্যাদা পেলেন না যখন তিনি সিনেমা দেখতেন না, থিয়েটারও দেখতেন না, পয়সা থাকলেও রেস্টুরেন্টে এক কাপ চা'ও খেতেন না—যখন স্কুলে চাকুরি করতেন তখন মাস্টারমশায়রা বছরে দু'তিনবার ফিস্ট করতেন—কিন্তু প্রদ্যোতবাবু যোগ দিতেন না মনে করতেন, আর্টিস্ট হিসেবেই স্বীকৃতি পেলাম না যখন তখন কোন আনন্দে আমার অধিকার নেই, রুচি নেই, তৃপ্তি নেই। তাই সিনেমা-থিয়েটার দেখা, রেস্টুরেন্টে খাওয়া বা ফিস্টে যোগ দিয়ে আনন্দ করতে শুধু ভেতর থেকেই যে সাড়া পেতেন না তা নয়—আবার সব সময় যে অনিচ্ছাও থাকত তাও নয়, তবু কোন আনন্দে বা প্রমোদে আমোদে

যোগ দেওয়াকে তিনি নিজের আহত শিল্পীসত্তার 'পর অবিচার ও অন্যায় বলে বোধ করতেন। এমনকী শেষের দিকে তিনি হাসতে পর্যন্ত কুণ্ঠিত হতেন। নিজের শিল্পীসত্তার অস্বীকৃতির জন্যে জগতের আর কোন আনন্দে যোগ দিতে তাঁর বাধত। তাই অবন যখন নকল করতে গিয়ে ধরা পড়ল—তখন তিনি সামান্য অপমান বোধ করলেও দুঃখিত হননি—সকল দুঃখ ও অপমানের জন্যে যেন তিনি তৈরি। অবনের মৃত্যুতে স্তম্ভিত হলেও—একেবারে হাল ছেড়ে দিলেও—ভেতরে ভেতরে তিনি যেন অবাক হতে পারেননি। তাই বাবার মাসোহারা বন্ধ হওয়া থেকে নিজের প্রদর্শনীর অসফলতা থেকে শুরু হয়ে অবনের মৃত্যু পর্যন্ত তাঁর দুর্ভাগ্যের এই ইতিহাস—এই-ই যেন জীবনের কাছ থেকে তাঁর পাওনা আদায় হয়ে যাচ্ছে। নিজের দুর্ভাগ্যের এই ললাটলিপির মধ্যে শুধু রমার পরীক্ষার ফল ও চাকরিকে তিনি মেশাতে পারেন না। এনিয়ে আজ আর তিনি ভাবেনও না। নিজের শিল্পীসত্তার অস্বীকৃতির জন্যে তাঁর যে কোনো কিছুতে আনন্দিত ও খুশি হতে নেই—এত কালের এই ভাবনাও যেন এতদিনের রোগে ভুলে গেছেন। তাই আজ রমা পুজোতে ধুতি পাঞ্জাবি আনলে, ফল আনলে, ওধুধ বা টনিক আনলে তিনি খুসি হয়ে ওঠেন। এতকালের আনন্দিত না হবার পণ ও খুসি না হবার কিছুটা আন্তরিক অনিচ্ছা কোথা থেকে যে থেমে গেল তা তিনি টেরও পাননি। তাই ফল ও মিষ্টি দেখে খুসি হয়ে তিনি রমার কাছ থেকে যে ঘৃণা ও তিরস্কার লাভ করলেন—একটু চেষ্টা করলেই রমার মার মা'র অনুভূতিকে তিনি নিজের অভিজ্ঞতা দিয়ে বুঝতে পারতেন। আজ অবনের মৃত্যুর জন্যে কোনো আনন্দ রমার মা করতে চান না—তিনিও শিল্প-জীবনে অস্বীকৃত হবার পর কোনো আনন্দে তাঁর অধিকার আছে বলে মনে করতেন না। কিন্তু একথা তাঁর মনে আসে না—অবনকে মনে পড়ে—ছেলেটির অকালমৃত্যুর কথা বুকের মধ্যে তোলপাড় সৃষ্টি করে—মুখ কাঁপতে থাকে। হাঁপানির টানের জন্যে অপেক্ষা করে করে এখন অধীর হয়ে ওঠেন। নিজের রোগের চিন্তা-ভাবনায় তন্ময় হয়ে যাবার জন্যে ব্যাকুল হয়ে ওঠেন।

রমার কিনে আনা ফল মিষ্টি দেখে রমার মা চটে যান—রমা যখন বাইরের ঘরে সোফাসেট কিনে আনল তখন মনে মনে তিনি খেপে ওঠে, রমা যখন পুজোতে বেশ দামি শাড়ি মার জন্যে কিনে আনে তখন বিরক্তিতে আর ক্ষোভে অসন্তোষ চাপ দিতে পারেন না—যদি দিতে চাও তোমার বাবাকে দিও—আমার জন্যে এত পয়সা খরচ করতে হবে না। এখন আর বয়েস নেই যে তোমাদের মতো সং সেজে রাস্তায় বের হব—চিরকাল যা পরছি—ঐ মিলের শাড়ি দিস একখানা ছুড়ে তাতেই হবে। অত সোহাগে আমার কাজে নেই। আজ যে সুদিন এসেছে একে রমার মা প্রসন্ন চিত্তে মেনে নিতে পারছেন না। তার জাত গিয়ে, যৌবন গিয়ে, ছেলে গিয়ে যে সুদিন ও স্বাচ্ছল্য এসেছে তাকে মেনে নিতে তার সমস্ত অন্তর কানায় কানায় ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। সমস্ত জীবনটা ব্যর্থ হয়ে এখন মরবার সময় দামী তাঁতের শাড়ি পরে মরতে আর দুটো ফল মুখে দিতে তাঁর রুচি হয় না। এখন এসব দামি শাড়ি, ব্লাউজ পরা, সুখে স্বচ্ছন্দে থাকা যেন নিজের এতকালের কষ্ট ও দুঃখকে ব্যঙ্গ করা, নিজের অতীতকে অপমান করা, নিজের সৌন্দর্য ও যৌবনকে যে দুঃখ দিয়েছেন তাকে যেন এখন বিদ্রূপ করা। না,

এসব তিনি পরতে পারবেন না। সমস্ত জীবন ব্যর্থ হবার পর এখন মরণকালে তিনি কোন সান্ত্বনা চান না। তাই প্রয়োজনের বাইরে একটু খরচ হলেই তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠেন।

পুজোর শাড়ি যখন তিনি টেনে একপাশে রেখে দেন—তখন রমার চোখে জল এসে যায়। জলভরা কণ্ঠে রমা বলে, অফিসের নিয়ম, তাই সঙ সেজে যেতে হয়—তাছাড়া আমি দেখতে ভালো নই এ আমার চেয়ে কে বেশি জানে? তুমি একটা ভালো শাড়ি পরলে তোমাকে এত ভালো লাগে ..... আমার তো মাকে দিতে ইচ্ছে .....। রমা চোখে আঁচল চাপা দিয়ে কেঁদে ওঠে।

ইতিমধ্যে প্রদ্যোতবাবু—সেদিন সুস্থ ছিলেন—হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন—ঐ মিলের শাড়িই দিস—ঐ তোর মার যোগ্য—মেয়েটা সাধ করে দুটো জিনিস এনেছে—খবরদার ঐ সঙ সাজাফাজা বলতে পারবে না।

আমি মিলের শাড়ির যোগ্য—যে ঘর থেকে আমি এসেছি—সেই বাড়ির চাকরের চাকরিও তুই পাবিনে—হারামজাদা, বেতো, হেঁপো কোথাকার।

ব্যস, দুজনে বেধে গেল। একটু পরেই মার চিলড্রেনস পার্কে গমন। চারদিকে তখন ষষ্ঠীর বাজনা বাজছে। চিলড্রেনস পার্কে বসে ষষ্ঠীর বাজনা শুনতে শুনতে মন উদাস হয়ে যায়। এমন দিনে একটা প্যান্ট শার্টের জন্য অবন কত অপেক্ষা করে থাকত, সামান্য একটা প্যান্ট-শার্টের জন্য কী ব্যকুল হয়ে উঠত—কি রকম অস্থির ও অধীর হয়ে থাকত ..... রমা মুখে কিছু বলত না। কিন্তু একটা সামান্য ফ্রক বা শাড়ির জন্যে অন্তরে অন্তরে আশা চেপে রাখত—তা কী তিনি বুঝতেন না। সার্ট জামা পছন্দ না হলে অবন হয় ছুঁড়ে ফেলে দিত, নয়তো মুখ গোমড়া করে বসে থাকত—রাতে খেতে চাইত না—জোরাজোরি করতে হত। রমার পছন্দ না হলেও প্রণাম করে শাড়ি বা ফ্রক নিত—পছন্দ হয়নি তবু তা নিতে রমা কখনও আপত্তি করেনি। তিনিই বরং অবনের 'পর চটে যেতেন—কত কষ্টে এত জামাকাপড় এল—কত দুশ্চিন্তা ছিল পুজোতে কিছু দিতে পারবেন কী না—সেদিকে খেয়াল নেই—বাবা মার কষ্ট বোঝে না .....। রমা দাদাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে রাতে খেতে নিয়ে আসত। পরদিনও অবনের রাগ পড়ত না। কিন্তু নিজে নতুন জামাকাপড় পরে রমাই দাদাকে জামাকাপড় পরিয়ে ঠাকুর দেখাতে নিয়ে যেত। দূর থেকে আবার ষষ্ঠীর বাজনা বাজতে থাকে। মন চলে যায় বিয়ের আগের দিনগুলিতে। বাবা একগাদা কাপড় এনে মেয়েদের পছন্দ করে নিতে বলতেন। তিনি বড় মেয়ে ছিলেন বলে তার পছন্দের দাম সকলের আগে। ..... অষ্টমীর দিন তাঁর মা গরদের শাড়ি পরে কালীঘাটে যেতেন মহাষ্টমীর পুজো দিতে। কিন্তু মন বেশিক্ষণ সেখানে থাকে না—মনটা যেন রমার জন্য হু হু করে ওঠে। ও যে দেখতে ভালো নয় একথা বলবার জন্যে প্রাণটা কাঁদতে থাকে—ওর দেওয়া জিনিস ঠেলে ফেলে দেবার জন্যে অনুতাপ হতে থাকে। বার বার রাস্তার দিকে তাকান—কতক্ষণে রমা আসবে। ঠিক করেন—এবার থেকে ওর সঙ্গে ভালো ব্যবহার করবেন। কিন্তু হাজার চেঁচালেও ওর বাবার কাছে যাবেন না। যদিও ভেতরে ভেতরে জানেন তা পারবেন না—তবু তা স্বীকার করতে চান না। একবার বুঝুক, তিনি না হলে ঐ হেঁপো বেতো .... বলে কিনা মিলের শাড়ির যোগ্য .... কিছুতেই আর সেবাযত্ন নয়—তবু রমা মার দিকে একটু ..... তা বাবাকেও তো কম দেয় না .... মেয়ের

পক্ষ নিয়ে ঝগড়া করতে ছুটে আসে—বাড়িতে মেয়ে কতক্ষণ থাকে শুনি? তিনি ঠিক করেন, রমা যতই কাঁদুক—রমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করবেন না ঠিকই—দেখতে খারাপ একথা আর বলবেন না—তবে পুজোর দেওয়া শাড়িও পরবেন না। রমার চোখে আঁচল চাপা দিয়ে কান্নার ছবিটা মনে ভেসে ওঠে—কথাটি কানে যেন ভেসে আসে—আমি দেখতে খারাপ একথা আমার চেয়ে আর কে বেশি জানে। রমার মার চোখেও জল আসে—রমা কাঁদছে এই ছবিটি মন থেকে যেতে দিতে ইচ্ছে করে না—মনে মনে ঠিক করেন একবার শুধু পরব শাড়িটা—নইলে মনে ব্যথা পাবে—হাজার হোক খেটেখুটে পয়সা আনে—সেই পয়সায় কেনা .....।

রমার সাজসজ্জা, স্লিভলেস ব্লাউজ, ঠোঁটে, গালে রঙ তিনি একদম দেখতে পারতেন না—রমার শাড়ির সঙ্গে ম্যাচ করা ব্লাউজ, রোজ রোজ চুলে শ্যাম্পু তাঁর অসহ্য মনে হত। মনে হত—অফিসে পরিস্কার ও পরিচ্ছন্ন হয়ে যেতে বলেছে বলে সেই অজুহাতে রমা ফিরিঙ্গি সাজ করবে। তিনি গনগন করতেন। মনে মনে গজরাতেন। তিনি কী-ই বা পোশাক-পরিচ্ছদ পরেছেন জীবনে। বাপের বাড়ি থাকতে যা দু'চারখানা ভাল শাড়ি ছিল—তাও কী সাজসজ্জার দিকে সাজপোশাকের 'পর কোনো লক্ষ্য ছিল নাকি? শেষের ক'বছর তো প্রদ্যোতবাবুর ধ্যানে চুল বাঁধতেও খেয়াল থাকত না। আর বিয়ের পর? জীবনে ক'খানা ভালো শাড়ি পরেছেন? কখানা ভালো শাড়ি দিতে পেরেছে? তিনি-ই বা চেয়েছেন নাকি? পেট চলে না তো বেনারসী শাড়ি! তেমন অবুঝ স্ত্রী হলে বুঝত রমার বাবা? কিছু চাননি কিনা, তাই দাম দেননি চাইবার। তিনি যেমন করে সাজ-পোশাক না করে সংসারের জন্যে সব কিছু দিয়েছেন—রমার মধ্যেও সেই ত্যাগের আদর্শ দেখতে না পেয়ে তাঁর গা জ্বলে যায়। রমার চেয়ে অনেক সুন্দর ও সুশ্রী হয়েও যদি সবকিছু ত্যাগ করতে পেরে থাকেন—তবে রমার অমন করে থাকা কি—অমন সাজপোশাক করাও কী নির্লজ্জতা নয়—পাড়ায় কথা উঠছে না? কেমন জ্বালা অনুভব করতেন—রমা তো দিব্যি সাজপোষাক করতে পারল—দামী দামী শাড়ি কিনতে পেরেছে নিজের জন্যে—কই তিনি তো ছেলে মেয়ে স্বামীকে বাদ দিয়ে নিজের জন্যে একা কিছু কিনতে পারেন নি বা চানওনি। রমা যা অনায়াসে পারল তা তিনি সারা জীবনেও পারলেন না একথা ভেবে নিজের মহৎ আত্মত্যাগের জন্য আত্মপ্রসাদ বোধ করতে গিয়ে কেমন আশাভঙ্গই বোধ করতেন। মনে মনে যেন স্বীকার করতেন—রমার কাছে তিনি ঠকে গেছেন—ঐ ভাবে চলতে না পেরে তিনি যেন নিজেকে বঞ্চিত বলেই নিজের অগোচরেই ক্ষুব্ধ হয়ে উঠতেন। হুঁ, আমি নিজের দিকে তাকালে এই সংসারে আর একটা প্রাণীকেও বাঁচতে হোত না। তবু এই সান্ত্বনায় প্রাণ ভরে ওঠেনা। মেয়ের রোজ রোজ শ্যাম্পু করা যে তিনি অপছন্দ করেন একথা তিনি প্রমাণ করতেন, নিজে কোনওদিন শ্যাম্পু না করে—যদিও রমার অনুপস্থিতিতে শ্যাম্পু কিরকম জিনিস তা হাতে ঢেলে দেখে নিয়েছিলেন আর রোববার রোববার রমার মাথা সাবান দিয়ে ঘষে দিয়ে রমাকে বোঝাতে চাইতেন ঐ ফ্যাশনওয়ালা সাবানের জলকে তিনি ফ্যাশন হিসেবেই নেন—বিলাসদ্রব্য হিসেবেই গণ্য করেন। চুলের পক্ষে প্রয়োজনীয় বলে বোধ করেন না। নিজের জন্যে রমার অত শাড়ি কেনা অসহ্য লাগত—কই, তিনি তো শাড়ি না চেয়ে ভালো

শাড়ী না পরে দিব্যি কাটিয়ে দিতে পারলেন—আর প্রত্যেক মাসে কিনা ....। তবু রমার অনুপস্থিতিতে রমার শাড়িগুলো মন দিয়ে দেখতেন—বাক্স গুছিয়ে রাখতেন—বাক্সের চাবি তাঁর কাছেই থাকত। যদিও রমা যখন প্রথম শাড়িটি কিনে আনত—তিনি সেই শাড়ির দিকে তাকাতেন না। রমা একবার বোনাসের টাকা পেয়ে চারগাছা সোনার চুড়ি করে দিয়েছিল। তিনি সেদিন অনেক কেঁদেছিলেন। 'অবন' যদি দিত—তিনি খুশি হতেন। তিনি চুড়ি ফেরত দিতে চেয়েছিলেন। শেষে দু'হাতে দু'গাছা পড়ে বাকি দু'গাছা তুলে রাখলেন। ঠিক করলেন রমার বিয়ের সময় চারগাছা-ই দিয়ে দেবেন। বাবাকে আংটি দিয়েছিল—বাবা অবশ্য তা পরেছিলেন। সোনার চুড়ি সম্পর্কে রমার মা কঠোর হতে পারেননি। এতকালের সংসারের অভিজ্ঞতায় জানেন—রমার চাকরি বাকরি না থাকলে তখন ঐ সোনার চুড়ি বিক্রি করেই ....।

রমার মা আরো ক্ষুব্ধ হন, অস্থির হন। আজকাল পার্ক থেকে ফিরিয়ে আনতে ইচ্ছে ইচ্ছে করে দেরি করে আসে—নিতান্ত দায়ে ঠেকে, নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও যেন ফেরত নিতে আসে রমা। প্রাণের টানে আসে না। তিনি বেশ বুঝতে পারেন, এই দেরি করে ফেরত নিতে আসা প্রাণহীন কর্তব্যমাত্র। এই দেরি করে আসবার মধ্যে দিয়ে যেন রমা তাঁর ব্যবহারের প্রতিবাদ করছে। ধীরে-সুস্থে গা ধুয়ে ভাল শাড়ি পরে রমা যেন বেড়াতে বেড়াতে তাকে নিতে আসছে। তিনি যে রাগ করে কতক্ষণ ধরে এই একলা পার্কে বসে আছেন—তাকে ইচ্ছে করেই কোন গুরুত্ব ওরা বাপ-মেয়েতে দিতে চায় না। যেমন এসেছে—তেমনি দেখি কত রাগ করে থাকতে পারে—এই হচ্ছে ওদের কথা। রাগে মাথা গরম হয়ে ওঠে—ইচ্ছে হয় অন্য কোনো পার্কে বা লেকে গিয়ে বসে থাকেন—খুঁজুক—একটু হয়রানি হোক—কিন্তু ভরসা হয় না। যদি ওরা খুঁজে না পায়—তবে তো লজ্জার মাথা খেয়ে তাকেই আবার একা একা বাসায় ফেরত আসতে হবে। মজা দেখবে তখন। অনেক সময় ইচ্ছে হয়—আর চিলড্রেনস পার্কে রাগ করে বসবেন না—অপর কোথাও গিয়ে বসবেন। কিন্তু সেই রাগের মাথায়ও তিনি যেন অন্যত্র গিয়ে বসতে সাহস পান না। রাগটা নিজের পর গিয়ে পড়ে। কেন তিনি বারবার ঐ এক জায়গায় গিয়ে গিয়ে যেন ওদের পরোক্ষভাবে কথা দিয়ে ফেলেছেন—রাগ করে ঐ চিলড্রেনস পার্কেই যাবেন। যদিও রাগের মাথায় অনেক সময় নিজেকে কথা দেন—একদিন বাপের বাড়ি ছেড়ে বের হয়ে আসতে পেরেছিলেন—তেমনি এদেরও ছেড়ে একদিন যেদিকে দু'চোখ যায় বের হয়ে যাব—তেমন মেয়ে আমি—বাপের বাড়ি যদি ছাড়তে পারি, স্বামীর ঘরও ছাড়তে পারব—মেয়ের সংসারে লাথি মেরে চলে যাব। কিন্তু এগুলো যে সবই শূন্যগর্ভ মিথ্যা আস্ফালন—নিছক আত্মপ্রতারণা তা তিনিও জানেন। পার্ক ছেড়ে অন্য কোথাও বসবার সাহস আজ আর তার নেই। শুধু তাই নয়, অনেক সময় ওদের দেরি দেখে রাগ একসময় ভয়ে পরিণত হয়। ওরাও যদি জেদ করে কেউ না আসে—না, আসুক—একাই থাকব এই পার্কে—একথা বলেন বটে, কিন্তু বুক কাঁপতে থাকে, গা ছমছম করে—কেমন কান্না পায়, এমন তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে ফেরত নিতে আসে—তবু রমার বাবা যেদিন আসে, তাড়াতাড়িই আসে—তবু লোকটার মনে এখনও .... হয়তো অবস্থা খারাপ যাচ্ছে—তবু তেজ দেখ না .... রমাটা তো জানেও না কোথায়

ওষুধ বিষুধ—আবার মনে হয়, মানুষটার অসুখ করলে—তেমন জোর কিছু হলে রমা দৌড়ে এসে নিজেই নিয়ে যেত—তবু, রমার বাবার জন্যে উদ্বিগ্ন হয়ে একটু স্বস্তি বোধ করেন—তাকে ওরা অবাঞ্ছিত মনে করে ফেরত নিতে আসছে না এই কষ্টটার চিন্তার হাত থেকে একটু অব্যাহতি পেয়ে কিছুটা বুকের ভার লাঘব হয়। রমার বাবার জন্যে উদ্বিগ্ন হতে পেরে একটু শান্তি পান .... তিনি যে সংসারের জন্যে কত প্রয়োজনীয় একথা রমাকে এর আগে ও পরে নানাভাবে জানিয়েছেন—বাজার করা, ওষুধ আনা, রান্না-বান্না, ধোলাই-মলাই—আর মানুষটার সেবা—একটা ঝি রাখলে তাকে পঞ্চাশ টাকা দিলেও কী তা করত? রমা বারবার ঝি রাখবার জন্যে বলেছে, জেদ করেছে মার সঙ্গে তর্ক-বিতর্ক করে হয়রান হয়েছে। তিনি রাজি হননি। একটা ঠিকে ঝিকে আট-দশ টাকা দিতে তার মন সায় দেয় না। তাঁর অমন যৌবন সৌন্দর্য কেটে গেল হাড়ি ঠেলে আর বাসন মেজে এখন তিনি আর সান্ত্বনা চান না—আরাম চান না—ঝি রাখবার বিলাসিতা করতে রুচি হয় না। তাছাড়া যেমন সুন্দর শাড়ি দিলে, গহনা দিলে তার অভিমান হয়—তেমনি ঝি রাখবার প্রস্তাবেও তিনি অভিমানে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠতেন—ঐ যে ছেলেবেলায় তাদের বাপের বাড়ির কলের গান শুনেছিলেন—জীবনে যারে তুমি দাওনি মালা—মরণে কেন তারে দিতে এলে ফুল। এখন আর তিনি ফুল নেবেন না। এখন আর তিনি ভাল সময় চান না—দুটো খেয়ে থাকতে পারলেই হল—তার চেয়ে বেশি কেউ কিছু করতে গেলেই তিনি অনর্থ বাধান। তা ছাড়া ঝি রেখে সংসারে তিনি অপ্রয়োজনীয় হয়ে যেতে চান না। রমা তাকে অপ্রয়োজনীয় ভাবতে পারে সংসারে ঝি রেখে—তা তিনি চান না। তাছাড়া সারা সময়ের জন্যে রমা একবার একটা মেয়েছেলে এনেছিল—তিনি তক্ষুণি বিদায় করে দিয়েছেন। কোন কাণ্ডজ্ঞান যদি রমার থাকে। সংসারের সব খবর তো জানবেই—পাড়ায় গিয়ে ঝগড়া ঝাটির কথা বলবে—খরচ বেশি করে ফেলবে—একটা আস্ত লোককে পোষা—দুটো লামা মাজবার জন্যে আর ঘর গোছাবার জন্যে—এই বুদ্ধি নিয়ে পরীক্ষায় পাশ করেছে—চাকরি করছে। 'আসলে আরও একটা ভয় ছিল, ঝগড়া হলে হয়ত রমা ঐ মেয়ে মানুষটাকে দিয়েই চিলড্রেনস পার্ক থেকে ফেরত আনতে পাঠাবে। তখন না এসেও পারবেন না—অথচ অপমানের আর শেষ থাকবে না। সেদিন মেজাজ ভালো ছিল—মেয়ে মানুষটাকে বিদায় দিতেই রমা রেগে যায়—তুমি কী খেটে এ কথাই বোঝাতে চাও—আমার রোজগারে না খেটে তুমি কিছু খেতে চাও না। রমার এই আক্রমণ ও রাগ তার মনকে অনাস্বাদিত আনন্দ এনে দেয়। তিনি হেসে বলেন, তুই ঝির দশ টাকা আমাকে দিস তো আমি জমাব, আর তোর বিয়েতে ঐ জমানো টাকা দিয়ে একটা কিছু কিনে দেব তোকে—মনে শান্তি থাকবে—নিজের পয়সায় মেয়েকে কিছু দিলাম। তুই দশ টাকা করে দিস, তুইও রোজগার করছিস—মনে মনে ভাবব, আমিও রোজগার করছি। রমার মুখ ব্যথায় ভরে যায়। রমার ব্যথিত মুখ সারারাত ধরে তাকে কষ্ট দেয়। কিন্তু তবু ভালো লাগে। কাঁদতে পারবেন না তেমন করে জেনেও মাঝেমধ্যে কেমন কাঁদবার চেষ্টা করে থাকেন, সেদিন তাও করলেন না। সারা সময়ের লোক না রাখবার আরও একটি কারণও ছিল—তা হলে চব্বিশ ঘন্টা ঐ রোগীর পাশে বসে থাকতে হবে—একটুও ছাড়বে না। এখন যা হোক কাজের জন্যে

অনেক সময় বাইরে কাটাতে পারেন, ঘরের কাজে কাটাতে পারেন, তখন? একথা চিন্তা করে তিনি সারা সময়ের লোক না রাখবার সিদ্ধান্তকে যেন বুকভরে সমর্থন করতে পারেন।

এতক্ষনে রমাকে দেখা যাচ্ছে। একই সঙ্গে যেন একটা আশ্রয় পাবার ভরসা ও অভিমানবোধ করেন। রমাকে দেখেই যেন তিনি বুঝতে পারেন এতক্ষন ভিতরে ভিতরে কেমন একটা অনিশ্চতার ভয় ছিল, যদি ওরাও জেদ করে কেউ নিতে না আসে। রমাও যদি জেদ করে নিতে না আসে, মেয়েটাকে ঠিক বুঝতে পারলাম না। ওর বাবার শরীর খারাপ, নিজে আসতে পারবেন না। হাজার বেতো, হেঁপো বলি, ঐ মানুষটাই ব্যস্ত হবে— কিন্তু ব্যস্ত হয়েই বা কী করতে পারবেন—মেয়ে যদি আসতে না চায়। তা হলে? এতক্ষণ এরকম একটা ভয়ও যে নিজের আগোচরে ছিল রমাকে দেখে সে ভরসা অনুভব করলেন। সেই ভরসা পাওয়ার মধ্য দিয়ে ভয়টিকে চিনতে পারলেন। সুপ্ত ভয় সম্পর্কে সচেতন হলেন। ভরসার সঙ্গে সঙ্গে অভিমান। নিতান্ত তুচ্ছ তাচ্ছিল্যের সঙ্গে নিতে এসেছে, বাপই ঠেলে ঠুলে পাঠিয়েছে, দায়ে পড়ে এসেছে। একদিন না এসে আমাকে জব্দ করবার ঠিক চেষ্টা করবে, এ আমি বলেদিলেম, এখনও মানুষটা আছে বলেই .....। তবু অভিমানকে গোপন করেন, কারণ অভিমান প্রকাশ করলেই বাসায় না যাবার জন্যে জেদ করতে হয় আর মেয়ে যদি উল্টো জেদ করে না নিয়েই চলে যায়, যা মেজাজ হয়েছে মহারানির মতো, চাকরি করে তো কেনা বাঁদি ছাড়া আর আমাদের কিছু ভাবেন না। পাছে অভিমান করলে বিরক্তি হয়, জেদ করে না নিয়ে চলে যায় কিংবা এখন রাগ করে কিছু বললে যাতে বাসায় ফেরা রমার মার পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ে সেজন্য তিনি অভিমানকে গোপন করে শান্তভাবে অপেক্ষা করেন। ভাবখানা-রাগ পড়ে গেছে তাই চলে আসছেন। ...... সেদিন ষষ্ঠীর বাজনা বাজছিল—রাস্তায় নতুন নতুন সাজপোশাকে দলে দলে ছেলে মেয়েরা হাত ধরাধরি যাচ্ছিল—দূরে মাইকে ষষ্ঠীর উদবোধন করে কোন বক্তা যেন চন্ডীর মাহাত্ম্য সম্পর্কে বক্তৃতা দিচ্ছিলেন—পার্কেও কিছু কিছু তরুণ তরুণী এদিক ওদিক বসেছিল—খুন, জখম, বোমা সবকিছুকে যেন কলকাতা কদিনের জন্যে ঝেড়ে ফেলে দিয়েছে। রমার মা'র ভালো লাগছিল। যদিও অভ্যাসমত ভেতরে ভেতরে বাসায় ফেরবার তাগিদ বোধ করছিলেন, তবুও ভালো লাগছিল। ঐ ক'টা ঘর, ঐ রোগী, ঐ গোমড়া মুখো মেয়ে, অবনটা নেই—এই আলো, ছেলেদের মুখের কচি কাঁচা আনন্দ, তাদের বকবকানি, ব্যস্ত সমস্ত কিছু কিছু ভাব, মাইকে চন্ডীর মাহাত্ম্য সব মিলে আজ আর উঠতে মন চায় না। রমার আসবার রাস্তার দিকে বারবার তাকাচ্ছিলেন যেমন, তেমনি আজ উঠতেও মন চাচ্ছিল না। আজ মান অভিমান করবার মত মনে জোর পাচ্ছিলেন। এখানে ভালো লাগবার জোরে যেন রমাকে অগ্রাহ্য করতে পারেন—এমন সাহস পাচ্ছিলেন। আজ যেন রমাকে বলতে ভরসা লাগছে— যাবেন না। যদিও রমাকে ফেরত দেবার শক্তি বোধ করছিলেন, এখানকার ভালো লাগাটাকে আরেকটু অনুভব করতে ইচ্ছে করছিলেন, তবুও ফেরবার জন্যে তাগিদকে অগ্রাহ্য করতে পারছিলেন না। এমন সময় রমাকে দেখা গেল। রমার মুখে কেমন চিন্তার রেখা। তাকে আনতে এসে অন্য কোন দুশ্চিন্তায় ভুগছে একথা চিন্তা করে তিনি

যেন না যাবার শক্তি আরো বেশি অনুভব করলেন। তাকে অন্যমনস্কভাবে নিতে এসেছে—অন্যমনস্কভাবে অবহেলার সঙ্গে নিয়ে যাবে একথা মনে আসতেই তিনি ঠিক করলেন, বলবেন, যাবো না। যাবো না কে সংশোধন করে পর মুহূর্তে ভাবলেন, বলবেন, এখন যাবো না। কিন্তু নিজের অজান্তেই ভাবলেন, আজকাল প্রায়ই রমা এত আনমনা কেন—অনেক রাতেই বাতি জ্বালিয়ে দেখেছেন, রমার ঘুম নেই—কেমন একটা দুশ্চিন্তার ছায়া। একদিন তিনি জিজ্ঞেসও করেছিলেন—চাকরি বাকরিতে কোন গন্ডগোল হয়নি তো—কী ভাবিস অতো। রমা যেন জেগে উঠল—না, পার্মানেন্ট হয়ে গেছি—চাকরি বাকরিতে কী হবে? চুরি না করলে আমাদের চাকরি যায় না। আর আমি যে পোস্টে চাকরি করি—ইচ্ছে থাকলেও চুরি করা যায় না। তিনি আশ্বস্ত হন। বুক থেকে গুরুভার যেন নেমে যায়। এবার নিশ্চিন্ত হয়ে জিজ্ঞেস করেন—তাহলে অত কী ভাবিস? রমা সামলে নিয়ে বলে, ভাবছিলাম—থাক গিয়ে, তোমাকে বললে কষ্ট পাবে, দাদা প্রায়ই আমার কাছে পয়সা চাইত—এর আগে তো পয়সা চাইত না। একদিন চার আনা পয়সা চেয়েছিল—সেদিন আমার কাছে ছিলই চারআনা—দিই নি। রমার গলা ভার হয়ে এল—চোখ দুটোও জলে ভরে এল। হঠাৎ চোখে আঁচল চাপা দিয়ে রমা কেঁদে উঠল। আজ ক'দিন কল্যাণের সঙ্গে দেখা করছে না—আমল দিচ্ছে না—ছুটির পর দূর দূর করে তাড়িয়ে দিচ্ছে—নিজের সঙ্গে যুদ্ধ করে করে আর যেন পারছে না। দাদার স্মৃতির মধ্য দিয়ে নিজের সংগ্রাম-ক্ষত মন, নিরুপায় আবছা ও কল্যাণের করুণ মুখের জন্যে একটু কেঁদে ফেলে বাঁচল। তিনি উঠে এসে রমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে ভাঙা গলায় বললেন—আমি ও কী সবসময় দিয়েছি নাকি—দূর দূর করেছি—দূর হয়ে গেল। ..... এর পরও তেমনি একটা দুশ্চিন্তার অন্যমনস্কতা তিনি রমার চালচলনে, কথাবার্তায় লক্ষ্য করেছেন। সবসময় যে 'অবন'-কে মনে পড়ে বা অবনের জন্যে মন ভার এ কথা মন বিশ্বাস করতে চাইলেও, শাড়ি গহনা কেনা, ফল মিষ্টি আনা এসব তবে কেন? নিজের অগোচরে ভেবেছেন, হয়ত এখন অন্যকিছুর জন্য মন খারাপ—মাঝে মধ্যে ভেবেছেন, হয়ত, বাবা—মা ঘাড়ের 'পর কী করে বিয়ে হবে একথা ভেবে মেয়ের মন খারাপ। তখন নানা কথার ফাঁকে বিয়ে করেও যে কোন মধু পাওয়া যায় না—কেবল দাসী বাঁদী হওয়া যায় মাত্র—এ কথাও যেমন জানতেন—মন ভালো থাকলে মেয়েকে যে ভালো করে বিয়ে দেবেন এ যে তাঁর অনেকদিনের স্বপ্ন তাও বলতে ছাড়তেন না। অবশ্য যা কপাল নিয়ে রমা জন্মেছে তাতে নিজের বিয়ের খরচ নিজেকেই বহন করতে হবে—সে জন্যেও তো কিছু জমানো দরকার—তাই তো তিনি ঝি বা রান্নার লোক রাখবার এত বিরুদ্ধে। আবার কখনো কখনো রমাকে বিয়ে না করবার জন্যে উৎসাহও দিতেন। এই তো বেশ আছিস—নিজে আনছিস, নিজে খরচ করছিস। বিয়ে করলে একদিকে অফিসে দৌড়াতে হবে—ঘরে স্বামী শাশুড়ির মন জোগাতে হবে—রান্না ঘরে হাঁড়ি ঠেলতে হবে—এসব পোশাক আশাকও পরতে দেবে নাকি ভেবেছিস? আর স্বামীর পেরেম—তিনি প্রেমকে অবজ্ঞায় পেরেম বলতেন, ঐ বিয়ের প্রথম ক'মাস—বাচ্চা হবার আগে সাধ খাওয়া পর্যন্ত—তার পরই নিজ নিজ মূর্তি ধরবেন। দেখলাম কত? পেরেম—তখন দেখবি দাসী

বাঁদীকেও সম্মান করবে—তবু তোকে দূর ছাই করতে ছাড়বে না। পেরেম—হঁ। এই তো বেশ আছিস। ভাবছিস, আমরা নিজের স্বার্থের জন্যে বলছি—আরে আমরা আর ক'দিন। না হয় গোটা কয় করে টাকা দিস—কাশী গিয়ে থাকব। কাশীতে ঝি বামনীর কাজ করেও এর চেয়ে ভালো থাকব। .... বিয়ে তোর দেবই .... তবে এই হচ্ছে সংসার ..... এই হচ্ছে পুরুষজাত .... বজ্জাতের হাড়ি সব জানবি .... বয়েসকালে খুব মিঠে বুলি আওড়াবে তারপর বাগে পেলেই ..... পেরেম ..... হঁ। রমা এমনিতে চুপচাপ—একটু গম্ভীর। তবু রমার মধ্যে খুশি খুশি ভাব দেখতে পান—ভারী চটে যান—অমন দাদাটা যার মরে গেল—বাবা যার চিররুগ্ন তার এত হাসি আসে রে কোথা থেকে বাপু—মনে মনে গজরান। নিজের সর্বদা অসন্তুষ্ট চিত্তের মধ্যে রমার হাসি খুশি ভাবকে চিনতে না পেরে আরও বিরক্ত হন। যদি রমার মধ্যে গাম্ভীর্য ও নিরানন্দ দেখতে পান—বা বিরক্তি বা ক্ষুব্ধ অন্যমনস্কতা একটু দেখেন—ভারি অস্বস্তিবোধ করেন—অসন্তুষ্ট হন। মনে মনে ভাবেন, বাপ-মাকে একটু খেতে পরতে দিচ্ছে তো—বিরক্তি দেখ না—কেমন গজগজ করেন সর্বদা। স্বামীর কাছে রমার বিরুদ্ধে বলেও লাভ হয় না—বলেছেনও বহুবার—কিন্তু তিনি যেন কেমন আতঙ্কিত হয়ে ওঠেন—কেমন ভয় পেয়ে যান—তিনি রমার অসন্তুষ্টভাবের কথা শুনলে এমন ঘাবড়ে যান -ওই অসন্তোষের মধ্যে যেন তিনি রমার চলে যাবার নোটিস দেখতে পান—রমা চলে গেলে .... সর্বনাশ এমনি একটা আতঙ্ক সেই আতঙ্কিত গলায় তিনি রমার মাকে অনুযোগ করেন—এমন গালাগাল তুমি দাও—শাঁকচুন্নি বলে ..... এখন বড় হয়েছে ..... এখন কী এসব। রমার মা খেপে ওঠেন, যত দোষ নন্দ ঘোষ। তুমিই তো রোজগার বলে লাই দিয়ে দিয়ে ....। এ নিয়ে ছোট খাট এক পশলা হয়ে যায়। তারপর স্বামীকে উপসংহারে বলে আসেন, রোজগার করে বলে তোমার মতো তোষামোদী করে আমি চলতে পারবো না—বাপমশাই করেও থাকতে পারব না। তা মেয়ে যত মহারানি হোক—নবাবজাদীই হোক সংসারের জন্য যে খাটাখাটনি করি—অন্যের সংসারে করলে বিশ-পঁচিশ টাকা মাইনে পেতাম—খাওয়া পরা ছাড়াই। আমার ভয় কী? অত দূর-ছাইও শুনতে হত না। আমার ভয় কী? আমি কেন খাতির করতে যাব পেটের মেয়েকে? যার কোন গতি নেই সেই করুক—মেয়ের পায়ের চরণামৃত খাক—আমার অত দায় পড়েনি—তিনকাল যার দুঃখে কাটল—যার সব শেষ হয়ে গেছে—শ্মশানে মরে পড়ে আছি—সবাই আছে মুখে আগুন দিতে—এখন আমার আবার কাকে খাতির? আজ তিনি রাগ করে কখন থেকে বসে আছেন—এত পরে নিতে এল কিনা—তাও দেখ না, দেখ না কেমন আনমনা—কেমন অগ্রাহ্য করা ভাব, লোকে তো হারানো কুকুরকেও এর চেয়ে মনোযোগ দিয়ে খোঁজে। নিজের উপমা নিজেকেই উত্তেজিত করে তোলে। রমা কাছে এসে দাঁড়াতেই তিনি ভাবছিলেন মুখ ঘুরিয়ে থাকবেন কী রমার আপাদমস্তক দেখে জানাবেন—আমাকে নিতে আসবার কর্তব্যটা আর তোমার করার দরকার নেই—অনেক কর্তব্য করেছ—আমরা বাপ-মা এমনিতেই তো গোলাম হয়ে আছি—আর কেন? কিন্তু রমা সামনে আসতেই তাঁর ভেতরে কেমন একটা লজ্জাও এল—ঠিক রাগ করে পার্কের এই বেঞ্চিটাতেই—আর বেঞ্চির এই ডানদিকের কোণটিতেই তিনি বরাবর বসেন। এতে তিনি যেন নিজের

ভেতরে একটা ভীরুতাই দেখতে পান। মনে হয়, বাসা থেকে রাগ করে বের হবার সাহস তাঁর আছে—কিন্তু অন্য কোথাও গিয়ে বসলে পাছে মেয়ে বিরক্ত হয়, রাগ করে সেই ভয়ে অন্য কোথাও গিয়ে বসতে পর্যন্ত পারেন না। মেয়েকে গালাগাল দিয়ে বাসা থেকে রাগ হয়ে বের হয়ে—এসে ঠিক সেই বেঞ্চের ডান কোনটিতে বসেন—পাছে খুঁজে না পেয়ে মেয়ে রাগ করে। তা হলে মেয়ের রাগকে তিনি এত ভয় করেন—কই গালাগাল দেবার সময় তো ভয় থাকেন না—এমনকী এই বেঞ্চের এই কোনটিতে আশ্রয় নেবার সময় পর্যন্ত রাগ তো বেশ তাজাই থাকে—তবে কেন? তা হলে ভিতর ভিতর কী তিনি মেয়েকে ভয় করেন? না, মেয়েকে যে বাসায় গালাগাল দিয়েছিলেন—অন্যত্র গিয়ে বসে মেয়েকে খুঁজতে বাধ্য করে হয়রানি করে তারপর চটাবার সুযোগ দিয়ে তাকে না নিয়ে বাসায় ফেরত যাবার সুযোগ দিতে চান না? এমন একটা ধারণাই অস্পষ্টভাবে নিজের অগোচরে খেলে গেল। তা ছাড়া মেয়েকে ভয় করেন এই ধারণাও তাঁকে আর উত্তেজিত করল না। কারণ এতক্ষণ ধরে বাচ্চাদের পোশাক, সুন্দর আনন্দ, চারিদিকের আলো উৎসব, চণ্ডী মাহাত্ম্যের দু'চারটে কথা মনের মধ্যে যে একটা শান্ত ভাব এনে দিয়েছিল—ঝগড়ার পর রাগ জুড়িয়ে এলে এমনিতে মন যেমন নিস্তেজ ও অবসন্ন হয়ে পড়ে—তাতে ঐ শান্ত ভাবটি ভালই লাগছিল। তবু, রমার দেরি করে আসা, অন্যমনস্ক ভাবে আসা, রমার মধ্যে একটা অবহেলার ভাব, অন্য বেঞ্চি বা অন্যত্র চলে যেতে না পারবার গ্লানি, রমাকে ভয় করি কিনা চিন্তার অপমান বোধ—এসব মিলে ঐ শান্ত ভাবটির অনেকটা নষ্ট হয়ে গেলেও, ঝগড়া করবার মতো জোর পাচ্ছিলেন না। আর রাগে উত্তেজিত হতে ইচ্ছে করছিল না। নিজেকে বোঝালেন, সমস্ত জীবনটা তার তো নষ্ট হয়ে গেল, ব্যর্থ হয়ে গেল, শেষ হয়ে গেল, অমন ছেলেটা যার রইল না—মেয়ের অপমানে তার আর কী ক্ষতি হবে—ছেলেবেলায় গাইতেন, দুঃখে যাদের জীবন গড়া, তাদের আবার দুঃখ কী করে। ঐ সব অলুক্ষনে গান করতাম বলেই বুঝি.....। মা নিষেধ করতেন গানটি করতে....। অন্যান্য দিন মেয়ে এলে শান্ত ভাবে দু'চারটে কথা বলে—বা মেয়েকে পাশে বসিয়ে স্বামীর বিরুদ্ধে উত্তাপহীন মামুলি অভিযোগ এনে তারপর মেয়ে বাড়ি ফেরবার কথা বললেই উঠে দাঁড়িয়ে পড়েন। ফেরবার পথে আজকাল একটা মিষ্টি পান নিজের জন্যে কিনে আনেন বা রমাই কিনে নেয়। আজ তিনি রমার দিকে তাকালেন না—রমা যে এসেছে একথা যেন নিজের অনিচ্ছা সত্ত্বেও অস্বীকার করছিলেন। আজ যেন ওর বাবা এলে তিনি কিছু স্বস্তি লাভ করতেন। আজ মন বলছে, এভাবে রমাকে দেখেও না দেখা ঠিক নয়, রমাকে এখন রাগ করবার সুযোগ কিন্তু দেওয়া হচ্ছে, তবুও যেন কিছুতেও তাকাতে পারছিলেন না। লজ্জা ও সংকোচ, অভিমান ও অবহেলার একটা বোধ যেন তাকে আড়ষ্ট করে দিয়েছে। রমা পাশে বসে পড়ল—মা'র অনুরোধ ছাড়াই। তারপর রমা আস্তে আস্তে বলে, ঐ বাঁদিকের কোনায় ঐ লম্বা জুলফিদার ছেলের সঙ্গে একটা মেয়ে বসে আছে না?—গত বছর টিউটোরিয়ালে ক্লাস নাইনে পড়ত—এরই মধ্যে রাত ন'টায় পার্কে আসা আরম্ভ হয়েছে—বাড়ির লোকই বা কী রকম। আরো ক'দিন দেখলাম—ভেবেছে আমি চিনতে পারিনি। নিজের অনিচ্ছা স্বত্ত্বেও যেমন রমার দিকে তাকাতে পারছিলেন না—

তেমনি নিজের অনিচ্ছা স্বত্ত্বেও মেয়েটাকে একবার না দেখে পারলেন না।—এখন আর টিউটোরিয়লে পড়ে না.... আজ না হয় পুজোর দিন বলে .... আরো ক'দিন দেখলাম। এদের ব্যাপার তো জানো না, টিউটোরিয়ালে যাচ্ছি বলে হয়তো ছেলেদের সঙ্গে পার্কে কাটায় বা সিনেমায় যায়। বাবার কাছ থেকে মাইনে এনে টিউটোরিয়ালে জমা না দিয়ে সিনেমায় যায় ছেলে বন্ধু নিয়ে। দু'তিন মাস বাকি পড়লে হঠাৎ টিউটোরিয়ালে যাওয়া বন্ধ করে দেয়—বাড়িতে গিয়ে বলে কিছু ক্লাস টাস হয় না—ওখানে আর পড়ব না। হাড়ে মাসে পাঁজি এই মেয়েগুলো—আর বাড়ির বাবা-মাও সেই রকমই.... এবার যেন তিনি নিজের অজ্ঞাতসারে বললেন—বাড়ির লোক আর কী করতে পারে। আমিও ধরতে গেলে ঐটুকুই ছিলেম—বা বড়ো জোর আরেকটু বড়ো ..... বাড়ির লোক কী করতে পেরেছে—বের হ'তে দিত না—চোখে চোখে রাখত—সবসময় সন্দেহ করত—কিছু করতে পারল কই? পারলে কী আর আমার এমন দুর্গতি হ'ত? রমার কথা শুনে প্রথমে ভালোই লাগছিলো—রমা প্রেমের বিরুদ্ধে। কিন্তু হঠাৎ মনে পড়ল, এই ছেলেমেয়েকে উদ্দেশ্য করে রমা তাকে ও তার বাবাকে কিছু বলছে না তো? কিংবা তাঁর বাপের বাড়ির উদ্দেশ্যে। তবুও এরকম ইঙ্গিতের কথা মনে এলেও তিনি ক্ষুব্ধ হতে পারেন না—রমা প্রেমের বিরুদ্ধে এতেই তিনি এতবেশি আশ্বস্তবোধ করেন যে উদারভাবে পারলেও নিজের দোষ স্বীকার করতেও কুণ্ঠিত হন না। কিন্তু রমার দিকে তাকিয়ে একথা বলা সত্ত্বেও নিজের মনের আড়ষ্টতা কাটতে চায় না।—তোমাদের কথা আলাদা। তোমাদের সময়ে ঐ বয়সে একটা সংসারের দায়িত্ব ক্রমে ঘাড়ে পড়ত—ঐ বয়সে তোমরা অনেক বড় হয়ে যেতে। আর ওরা? এমনিতে খুকু হয়ে থাকবে—ফ্রক মিনিফ্রক পরবে আঠারো বিশ বয়েস পর্যন্ত—ওদিকে হাজার গন্ডা ছেলের সঙ্গে ঘুরে বেড়াবে—একটা গ্রামারের নিয়ম মুখস্ত করতে বলো—মুখস্ত হয় না কিছুতেই অথচ কোন সিনেমা অভিনেতার জীবনী জানতে চাও—লেটেস্ট ইনফরমেশন তোমাকে দেবে। তোমাদের কাছে গীতা চণ্ডী যেমন—এদের কাছে তেমনি সিনেমা পত্রিকা। তোমাদের কথা আলাদা—সত্যিকারের ভালবাসা ছিল বলেই তো তোমরা সব কিছু ত্যাগ করতে পেরেছিলে। সেদিন ট্রামে আসতে আসতে ক'টি কলেজের মেয়ের আলোচনা শুনছিলেম—প্রথমে মারকেটিং, কোন শাড়ি এবার পুজোর স্পেশ্যাল এসবের পর, কী রকম আদর্শ স্বামী কার পছন্দ তাই নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল—ট্রামের মধ্যে, প্রকাশ্যে কত লোক যে ঐ আলোচনা শুনছে সেদিকে ভ্রুক্ষেপ না করে। রমার মা এবার অবাক হয়ে মেয়ের মুখের দিকে তাকান। বলিস্ কি? নিজের অজান্তেই মুখ দিয়ে বের হয়ে আসে।—শোন না, কেউ ডাক্তার, কেউ ইঞ্জিনিয়ার—আর ইঞ্জিনিয়ারের বাজার পড়ে যাওয়াতে মার্চেন্ট অফিসের অফিসারকে কেউ কেউ সেকেন্ড চয়েস হিসেবে রাখছে। দু'একজন এস.ডি.ও বা ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের নামও বলল। তবে অধিকাংশই ডাক্তার। ডাক্তারের আয় বেশি। আবার নিজেরাই বলাবলি করছে—ডাক্তারগুলোর চরিত্র নাকি ভাল হয় না—রাতের বেলায় যখন তখন 'কলে' যেতে হয়—তবু, অত বাছতে গেলে নাকি চলে না—ডাক্তারই দেখলেম মেজিরিটির চয়েস। অর্থাৎ স্বামীর আয় কী রকম সেইটেই স্বামী বিচারের আদর্শ মানদন্ড। আদর্শ স্বামী হচ্ছে

সেই স্বামী যার আয় সবচেয়ে বেশি।—তা একদিক দিয়ে ভালই। আমাদের মত মূর্খ নয়—কান্ডজ্ঞানহীন নয়। মুখের মিঠে বুলিতে ভোলে না। —মূর্খ নয়? কত বিদ্বান সব জানতে বাকি নেই—এতদিন পড়াচ্ছি। তা নয়, এই বয়সে টাকা কী রকম চিনেছে দেখ না? অথচ ওদের পোশাক আশাক দেখে মনে হল, কারো বাড়ির অবস্থাই খারাপ নয়। যে অভাবের জন্যে, দুঃখ কষ্টের জন্যে টাকার দরকার লোকে মর্মে মর্মে টের পায়—সেই অবস্থার ঘরের মেয়ে ওরা নয়। কিন্তু টাকার মাহাত্ম্য ঠিক বুঝে গেছে। ক্ষীণস্বরে রমার মা বলেন—তা চিনুক, সেয়ানা হোক—আমাদের মতো হাবাগোবা হয়ে বিপদে পড়বে না ভবিষ্যতে। কিন্তু তাঁর কণ্ঠস্বর ক্ষীণ ও মামুলি—নিতান্তই বলতে হয় বলেই যেন বললেন। মন্তব্য যে আন্তরিক নয়—নিজের দুর্ভাগ্যের জন্যে গতানুগতিক অভিযোগ নিস্প্রাণ ভাবে বলে মামুলীভাবে নিজেকে ধিক্কার ও নিজের ভাগ্যের পর একঘেয়ে অভিমান—একথা বুঝতে রমার অসুবিধে হয় না। রমা একটু হাসে।—আসলে কী জানো, এদের অবস্থা ভাল বলেই টাকা পয়সার আদর বোঝে। জানে, একমাত্র নিজের স্বাতন্ত্রও প্রকাশ করা যায় টাকা পয়সা থাকলে—আর স্বাতন্ত্র ও বলতে বোঝে কত দামের শাড়ি ব্লাউজ গাড়ি। আজকে রমা দেরি করে এসেছিল—সে বিষয়ে ছিল। একটুও বের হতে ইচ্ছে করছিল না। কল্যাণ সস্ত্রীক পুরী চলে গেল। দুরারোগ্য আত্মীয়ের মৃত্যু ঘটলে যেমন একটা শূন্যতার স্বস্তি আসে তেমনি একটা নিষ্কৃতির বোধ যা প্রায় অবসন্নতার কাছাকাছি—আজ রমা বোধ করছিল। আজ বোনাসের টাকাও পেয়েছিল। তবু নিরুৎসাহ হয়ে মার জন্যে, বাবার জন্যেও নিজের জন্যে কেনাকাটা করতে করতে অবসাদ ভাবটি অনেকটা কেটে গিয়েছিল। বাসায় ফিরে কোথায় বাবা মা'র মুখের প্রসন্ন হাসি দেখবে—যদিও মা'র খুশি হওয়া সম্পর্কে ঘোরতর সন্দেহ ছিল—আজ কল্যাণের চলে যাবার পর থেকে মন যেন একটা আশ্রয় চাইছিল। বাবা-মা'র খুশি হবার মধ্যে সেই আশ্রয় পাওয়া যদিও সম্ভব ছিল না তবু, মন যেন অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবার ক্লান্তির মধ্যে মুহূর্তের জন্যে বাবা-মার প্রসন্নতার মধ্যে একটু বসে একটু বিশ্রাম চাচ্ছিল। ট্রামে বসে নিজের স্টপেজে নামবার দু'স্টপেজ আগে। বসবার সিট খালি হলে যেমন মুহূর্তের জন্যে পা দুটোকে একটু বিশ্রাম দেওয়া—ঠিক তেমনি। ওরও ইচ্ছে ছিল, কোথাও বেড়িয়ে আসে। কিন্তু বাবা-মাকে রেখে কোথাও যাওয়া সম্ভব নয়। আর একা—প্রশ্নই ওঠে না—গেলে মা কী মনে করবে? তা হয় না—অসম্ভব। মনে পড়ে স্কুল-কলেজে সবাই এডুকেশন ট্যুরে গেছে—পিকনিক করেছে—কিন্তু রমা তাতে কোনও দিনও যোগ দেয়নি। জানে, কোথায় পাবে চাঁদা? বাসায় হাড়ি চড়বে কি না ঠিক নেই তো এডুকেশন ট্যুরের চাঁদা। দাদা বুঝত না—কান্নাকাটি করত—খেত না। তবু, দু'একবার পিকনিকের চাঁদা আদায় করে নিয়েছে। কিন্তু রমা জানত—ওর পক্ষে তা সম্ভব নয়। আজ টাকা-পয়সা আছে—তবু যেতে পারছে কই? হঠাৎ মনের মধ্যে খেলে যায়—বাবা মা'র এই দুর্বিষহ বোঝা চিরকাল ওকে বহন ..... না, চিন্তাকে চেতনা থেকে রমা নির্বাসিত করে। ও ছাড়া বাবা-মার কে আছে? ওরই মুখ চেয়ে দু'দুটো প্রাণী চেয়ে থাকে সারাদিন ..... কল্যাণ এখন পুরীর ট্রেনে। দুর্বলভাবে স্থির করে, এবার থেকে কল্যাণকে আর আমল দেবে না। মুহূর্তে মনে আসে, ওর দিকে

কল্যাণ যেভাবে তাকায় ঠিক সেইভাবে ওর স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে রয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে মন কঠিন হয়ে যায়। ভাবে, কল্যাণ সম্পর্কে আমার ফাইনাল ডিসিশন হচ্ছে—আর ওকে প্রশ্রয় দেওয়া নয়—ঘরের ও খাবে তলারও কুড়োবে—না, আর কোনও সম্পর্ক নয়। সঙ্গে সঙ্গে ভাবে, গেলেও হয় দু'তিন দিনের জন্যে দেওঘর বা কোথাও। বাজার টাজার তো সব মা-ই করে। কী এমন থাকা দরকার? ডাক্তার ডাকতে ও ওষুধ আনতে, বাজার করতে সবই মা পারেন—করেনও। দু দিন না থাকলে দিব্যি চলে যাবে—যত দায় ঘাড়ে নেবে তত দায় বেড়ে যাবে। অবিবাহিত রয়েছি তো কী হয়েছে—সারাজীবন বিয়ে না হলে কোথাও যাওয়া যাবে না—এ কেমন আবদার। বাসায় ফেরবার পরেই এক পশলা ঝগড়া—মা'র চিলেড্রেনস পার্কে যাওয়া—ঝগড়া করবার জন্যে বাবার অনুতাপ। কিন্তু স্নান সেরে আর রমার বের হতে ইচ্ছে করছিল না। ইচ্ছে করছিল টান হয়ে শুয়ে থাকে—নিজের জীবনের জটিল সমস্যা যা কোনওদিন সমাধান হবার নয়—নিজের এমন দুর্ভাগ্যের কথা চুপচাপ শুয়ে শুয়ে ভাবে। অন্যদিন কল্যাণের সঙ্গে বিরোধ করে হয়তো বাসায় এসে যখন ঝগড়ার মধ্যে পড়েছে—তখন ঝগড়ার স্বাদ ওকে অন্যমনস্ক করে দিয়ে—উত্তেজিত হবার আনন্দ দিয়ে—কল্যাণ প্রসঙ্গকে কিছুক্ষণের জন্যে ভুলে থাকতে সাহায্য করেছে। আজ যেন কল্যাণকে অগ্রাহ্য করা যাচ্ছিল না—আজ যেন কল্যাণ শুধু একটা দৃশ্য নয় যাকে চোখ বুজে অগ্রাহ্য করা যায়—আজ যেন কল্যাণ বাতাসের মতো নিঃশ্বাসের সঙ্গে মনে প্রবেশ করছে। তাকে ঠিক বোধ করা যাচ্ছে না অথচ কিছুতেই তাকে অস্বীকার করা চলছিল না। মা'র অসন্তোষে কল্যাণকে ভুলে থাকা গেল না—কেবল ক্লান্তি বাড়ল—বাবার অনুতাপ প্রেমের ভয়ংকর দুর্বলতায় নিজের মন যেন ভয়ে বেদনায় অবশ হয়ে যেতে চাইল। আর মন যেন এই দুর্বলতা, কাতরতা, অবসন্নতার মধ্যেই আশ্রয় চায়—একে ছেড়ে আসতে চায় না। চুপচাপ শুয়ে রইল অনেকক্ষণ। রমা যাচ্ছে না বলে বাবা উসখুস করছেন তা বুঝতে পেরেও রমা উঠল না। ভাবল, বাবা-মা ভাবুক, ওরও রাগ আছে—মা ভাবুক, রমাও রাগ করতে জানে। আরও কিছুক্ষণ শুয়ে থাকবার জন্যে নিজের কাছে এই কৈফিয়ত। কিন্তু বাবার মধ্যে যে উস্‌খুস্‌ ভাব—নিজের মধ্যেও তাই। মা'কে আনতে যাবার ইচ্ছে ওকে ভেতর থেকে কেবল তাগাদা দিচ্ছিল। শেষপর্যন্ত নিজের সঙ্গে রফা হল ... মা'কে এনেই বিছনায় শুয়ে থাকবে। আগামী পুজোর তিনদিন বের হবে না—কেবল শুয়ে থাকব। রাস্তায় বের হতেই জড়তা চলে যায়। আলো, ষষ্ঠীর বাজনা, মাইকের গান, নতুন পোশাকে ছেলেমেয়ের দল। রমা ভাবল, সবাই আনন্দোৎসব করে—কেবল দুঃখ ও বেদনা আমার 'পর—মা নাকি ছেলেবেলায় গান করতেন। দুঃখে যাদের জীবন গড়া .... গানটি যেন রিলে গান হয়ে মার জীবন থেকে ওর জীবনে চলে এসেছে। মা যেন নিজের দুর্ভাগ্যকে মেয়ের হাতে তুলে দিয়েছেন—এখন যে দুঃখ ভোগ করেছেন তা সত্যি কারোর দুঃখ নয়—এতকাল দুঃখ ভোগ করে জীবনকে অপচয় করবার আপসোস। মা'র ভেতরে এখন সত্যিকারের দুঃখ নেই—আছে আপসোস। আর বাবা যেন দুঃখের সমুদ্রকে রুগ্‌ণ আকাশের ঢাকনা দিয়ে আড়াল করে রেখেছেন ..... দেরি করে এসে মাকে শান্ত করতে সময় লাগবে তা রমা জানত। মা কী কি বলতে পারেন রমা তাও

জানত। কিন্তু পার্কে ঢুকতেই ঐ মেয়ে ও ছেলেটি দেখবার সঙ্গে সঙ্গেই রমা কেমন উষ্ণ হয়ে ওঠে। একই সঙ্গে মেয়েটির 'পর রাগ ও নিজের ভাগ্যের জন্য ক্ষোভ ও'কে উত্তেজিত করে তোলে। ওর ক্লান্তি ও অবসন্ন ভাবটি মুহূর্তে দূর হয়ে যায়। মেয়েটির স্বভাব-চরিত্র সম্পর্কে আলোচনা নিছক মা'র বিক্ষুব্ধ মনকে প্রসঙ্গান্তরে নিয়ে গিয়ে শান্ত করা নয়—এই আলোচনায় রমা একটা উত্তাপও অনুভব করছিল। পার্কে জোড়ায় জোড়ায় বসে আছে—কই রমা তো পারেনি—ঐ মেয়েটির চেয়ে পড়াশুনায় রমা ভাল ছিল—দেখতেও খারাপ নয়—তবু, রমার বেলায় পৃথিবী এত কৃপণ—পৃথিবীর দয়া দাক্ষিণ্য সব থেকে রমা বঞ্চিত। রমার কাছে সবাই কর্তব্য চায়—রমাকে কেউ কোনো প্রশ্রয়ের চোখে দেখবে না—রমার যদি ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকত তো কেউ তার স্নেহে অগ্রাহ্য করত না। রমার বেলায় পৃথিবী কঠোর—কঠিন, নিষ্ঠুর। নিজের ছাত্রী জীবনের নিঃসঙ্গতা, বাসায় বাবা-মা'র শাসনও ও নিজেকে বাবা-মার আদর্শমত হবার চেষ্টার জন্য রমার আক্ষেপ রমাকে ওর মার মতই ক্ষোভের দিকে ঢলে দেয়। সব ক্ষোভ যেন মেয়েটির 'পর রাগ হয়ে বের হ'তে থাকে। সেই সঙ্গে মেয়েটির নিন্দের সঙ্গে সঙ্গে মা'কে প্রচ্ছন্ন ভাব জানিয়ে দেওয়া রমা ঐ বয়সে কিরকম আদর্শ মেয়ে ছিল এবং মা'র কাছ থেকে তারই একটা স্বীকৃতির আকাঙ্ক্ষা ছিল ভেতরে ভেতরে। ..... কিন্তু মেয়েটির নিন্দে করা সত্ত্বেও, নিজের আপসোস ও ক্ষোভকে মেয়েটির নিন্দের ভেতর দিয়ে প্রকাশ করবার সুযোগ দেওয়া সত্ত্বেও, নিজের প্রথম যৌবনের অনশনকে নিতান্ত অপচয় হিসেবে গ্রাহ্য করবার জন্যে যে ক্ষোভ ও অনুশোচনা তা যেন ঐ নিন্দের মধ্য দিয়ে প্রকাশ না পেয়ে মনেই থেকে গিয়ে মনকে রীতিমতো ভারাক্রান্ত করে তোলে। জমাট দুঃখ যেন গলার ভেতরে বুকের ভেতরে অস্বস্তির মতো চলাফেরা করতে চায়। ঐ জমাট ক্ষোভের আকর্ষণ থেকে নিজের মনোযোগকে অন্যদিকে দেবার জন্যে আধুনিক মেয়েদের সম্পর্কে ওর যে অভিযোগ রয়েছে সেগুলো বলতে শুরু করে। মা'র চেহারায় আজকালকার মেয়েদের জন্যে যে ঘৃণা ফুটে উঠল—যদিও মুখে এদের বুদ্ধি ও সংসারজ্ঞানের জন্য প্রশংসা করতে ছাড়ল না—নিজের ওই বয়সের কাণ্ডজ্ঞানহীনতার সঙ্গে তুলনা করে—তবু মার মুখের ঘৃণা ওর পুরানো ক্ষতের যে ব্যথা শুরু হয়েছিল তাকে যেন সামান্য একটু আরাম দেয়। অনশন, বঞ্চনা ও বেদনা মেয়েটির নিন্দে ও মা'র মুখে আধুনিক মেয়েদের জন্যে ঘৃণা ওকে একটু সামান্য আরাম দিলেও—মেয়েটি ওর ভেতরের যে ক্ষোভ ও অনশনের চেতনাকে জাগিয়ে তুলেছিল তা অধিকাংশ প্রকাশের পথ না পেয়ে বোঝা বইবার ক্লান্তি ও বোঝা বইবার অবিচার মনকে ক্রুদ্ধ করে তোলে সঙ্গে সঙ্গে ঠিক করে ফেলে, না, বাবা মা'কে তামাশা দেখাব—আমার সম্মান কোথায় থাকবে? এদের কী কোন কান্ডজ্ঞান আছে না কি? সঙ্গে সঙ্গে এও ঠিক করে ফেলে, কল্যাণকে আর কিছুতেই প্রশ্রয় নয়। স্ত্রীর সঙ্গে পুরী কোনারক করে বেড়াবে, এসে নাকি কান্না কাঁদবে। রমাকে নাকি সবসময় মনে পড়ছে—ওখানে আরাম করে বেড়িয়ে আমার কাছে এসে বলবে, ওর নাকি পুরীর সমুদ্র, কোনারকের মন্দির সবই নিরস বিরস লেগেছিল রমাকে ছাড়া। মা ঠিকই বলে, এই-ই হচ্ছে পুরুষের জাত। সঙ্গে সঙ্গে বাবা মা'র 'পর মন ক্রুদ্ধ ও ক্ষুব্ধ হল। ভাবে—এদের ভালবাসা মুহূর্তের

জন্য এরা সানন্দে পান করেছে—কাশী গিয়ে হানিমুন করেছে—আনন্দ যা করবার করে নিয়েছে—এখন এদের পরিণতি ব্যর্থতা, ঝগড়া ও বিবাদের তিক্ততা আমাকে সহ্য করতে হচ্ছে। রমার মনে হয়, ভালবাসা হাজার হোক, তবু ঐ খারাপের দিকটা যদি ওকে এমন করে দেখতে না হত—তাতে যদি ওর সর্বনাশও হত—তবু এই ভালবাসার 'পর অবিশ্বাস, সতর্ক ও তিক্ততার চেয়ে তা ভাল ছিল। ভালবাসার মতো এমন সুন্দর জিনিসকে বাবা-মা কদর্যভাবে তার সামনে অবিরলভাবে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষে হাজির করে নষ্ট করে দেবার জন্যে ওর মন বাবা-মা'র 'পর বিতৃষ্ণায় ও বিদ্বেষে ভরে যায়। ছেলেবেলা থেকে বাবা-মা বিশেষ করে মা'র মনের মত হবার চেষ্টা করতে গিয়ে নিজের 'পর যে অবিচার, জুলুম করেছে, নিজেকে বঞ্চিত ও অনশনে রেখেছে সেজন্যে নিজের নির্বুদ্ধিতার 'পর হাড়ে হাড়ে যেমন চটে যায় তেমনি মা'র 'পরও ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। ইচ্ছে হয় বলে, তোমরা ঝগড়াঝাঁটি না বন্ধ করলে আমি ঠিক একদিন চলে যাব—ঝগড়াঝাটি বন্ধ না করলে আমি তোমাকে নিতে আসতে পারব না। মা'র কাছে নিজেকে খারাপ বলে প্রতিপন্ন করবার ইচ্ছে জাগে—ওর সম্পর্কে ওর মা'র মনে যে চেহারা রয়েছে তাকে নষ্ট করে দেবার একটা ব্যাকুলতা বোধ করে। একটু খারাপ হয়ে একটু চরিত্রহীন হয়ে যেন মা'র 'পর প্রতিশোধ নিতে চায়। এতদিন ভাল থাকবার প্রায়শ্চিত্ত করতে চায়। কিন্তু জানে তা অসম্ভব। নিজেকে ওর মনে হয় চারিদিক থেকে বন্দী—বের হবার পথ নেই—ভাল থাকলে কষ্ট—খারাপ হবার শক্তি চলে গেছে। বন্দী তো বটে—কাউকে গ্রাহ্য না করে বাবা-মা অনায়াসে যে কোন স্তরে নেমে ঝগড়াঝাটি করতে পারে—কল্যান স্ত্রীকে নিয়ে পুরী যেতে পারে আবার ওর কাছে প্রেমের বাহাদুরিও করতে বাঁধে না। কিন্তু রমার কিছু করবার উপায় নেই—মা পার্কে চলে আসতে পারে—বাবা মাকে ফিরিয়ে আনবার জন্যে উসখুশ করে ওকে নিঃশব্দে তাড়া দিতে থাকে। ওরই কিছু করবার উপায় নেই, স্বাধীনতা নেই। ঝগড়া থামানো আর কল্যাণের বাহাদুরি শোনা ছাড়া। নিজের নিরুপায় বন্দীদশার কথা ভেবে যখন অস্থির হয়ে ওঠে—তখন মা'র উঁসখুশ ভাব দেখে বোঝে—মা এখন বাসায় ফিরতে চাচ্ছে। রমা ঠিক করে মা'র এই ইচ্ছাকে মূল্য দেবে না। মা'র উসখুশ ভাবের মধ্যে রয়েছে বাবা একা বাসায় রয়েছে তার জন্যে চাঞ্চল্য। রমা মা'র এই ইচ্ছাকে মূল্য না দিয়ে নিজের বন্দীদশার একটা প্রতিশোধ নিতে চায়। সঙ্গে সঙ্গে এও বুঝতে পারে মা'র এই নিরব উসখুশের মধ্যে যে উদ্বেগ রয়েছে তা সংক্রামক। ওর মধ্যেও উসখুশ করে মা উদ্বেগের ভাইরাস ছড়িয়ে দিচ্ছে। তা কার্যকরী হল বলে। তবুও না বুঝে থাকবার মত করে রমা চুপ করে থাকে। অন্তত চুপ করে থাকবার জন্যে নিজের বাবা-মা'র ইচ্ছে বা চলবার এতদিনকার অভ্যাসের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে থাকে। দূরে মাইকে চণ্ডীর মাহাত্ম্য শেষ হয়ে চপল হিন্দি গান বাজছে। রাস্তায় লোকের চলাচল খুব একটু কমেনি—পার্কে যে ক'জোড়া তরুণ তরুণী বসে ছিল তারা প্রায় কেউ যায়নি। মেয়েটির জুলফিদার অতি কাছাকাছি বসে থাকবার যে দৃশ্যটি রমার মনে ক্ষোভ, বঞ্চনা, ঈর্ষা ও দুর্ভাবনা এনে দিয়েছিল তাছাড়া যে একটা গভীর তৃষ্ণা রমার মধ্যে জাগিয়ে দিয়েছিল তা ঠিক বুঝতে না পেরে অসন্তুষ্ট চিত্তে বসে থাকে। মা'র ইচ্ছের মূল্য না দেবার জন্যে সংগ্রাম

করে। কিন্তু উঠতে ইচ্ছে করে না। কল্যাণকে যদি পুরী যেতে নিষেধ করত কল্যাণ কী তা শুনত না? একথা বললে কল্যাণের 'পর জোর খাটানো হয়—কোনদিন কল্যাণের 'পর জোর খাটায়নি—জোর খাটালে কল্যাণের 'পর আসক্তিকে প্রকাশ্যে স্বীকৃতি দেওয়া হয়—হয়ত কল্যাণ যেত না—তবু কল্যাণ যখন চাইল—তখন আর রমা বাধা দেবে কেন? যদিও বারবার বলেছে যেতে ওর ইচ্ছে করছে না—স্ত্রী নিজেই বুকিং করেছে—নিতান্ত বাধ্য হয়েই যাচ্ছে। যদিও তা বিশ্বাস করেনি—এখনও করে না—তবুও, এই মুহূর্তে কল্যাণের সেই কথাগুলোও ওর বারবার মনে আসছে—মন যেন কথাগুলো ছাড়তে চাচ্ছে না। মা'র উদ্বেগকে মূল্য না দেবার জন্যে এই কথা-গুলোকে আঁকড়ে ধরে কিন্তু মনে হয়, এই উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা ও অসন্তষের মধ্যে কথাগুলো ভেবে কথাগুলো ভাববার মাধুর্য যেন নষ্ট করে ফেলছে। চুপচাপ এক একা নির্জন ঘরে শুয়ে শুয়ে ভাবলেই যেন কথাগুলোর আস্বাদ ঠিকমতো পাওয়া যায়। চলে যাবার ইচ্ছা নিজের ভেতরে আসতেই চলে না গিয়ে মাকে শাস্তি দেবার আকাঙ্ক্ষাটির সঙ্গে সংঘর্ষ বাধে। মা'র ইচ্ছেকে মূল্য না দিয়ে যে প্রতিশোধের আনন্দ পেতে চেয়েছিল—এক্ষুনি উঠে গেলে মা'র ইচ্ছাকেই তো মেনে নেওয়া হল। পার্কের আলোতে জোড়ায় জোড়ায় তরুণ-তরুণী যেন আগের চেয়ে আরো কাছাকাছি এসে গেছে—ওরা যেন পার্কের আর সবাইকে অগ্রাহ্য করছে। আলোকে আর শত্রু মনে করছে না—ক'টি বাজে টাইপের লোক একটা বেঞ্চে বসে দূরে কেমন সন্দেহজনকভাবে কখনও হৈচৈ করে হাসছে কখনও চুপ হয়ে যাচ্ছে—তাদেরও ওরা অগ্রাহ্য করতে পারছে। রমা যেন বোধ করতে থাকে ওর রক্ত একটু দ্রুত হয়ে আসছে। নিঃশ্বাস যেন আস্তে আস্তে কেমন গরম হয়ে উঠছে—কেমন যেন একটা জ্বর জ্বর ভাব। রমা উঠে দাঁড়ায়। মা ও মেয়ে দু'জন চলতে থাকে। রমা ভাবল, শেষপর্যন্ত মা'র ইচ্ছাই জয়ী হল। কোনওদিনও এদের অগ্রাহ্য করতে পারলেম না—এরা কিন্তু অনায়াসে আমাকে অবহেলা করে এসেছে, করবেও। যেতে যেতে ওর মনে ভেসে ওঠে যেন একটা ট্রেন প্রবলবেগে ছুটে যাচ্ছে। ট্রেনের ঝাঁকুনিতে কল্যাণ যেন বারবার কাছে এসে পড়েছে। কল্যাণের পাশে ওর স্ত্রী নেই—রমা, হ্যাঁ, অনেকটা রমার মতই কে যেন বসে আছে—যার অনুভব রমার অনুভব হতে পারে—যার কাছে কল্যাণের মুগ্ধ দৃষ্টি রমার কাছে মুগ্ধ দৃষ্টির মতো হবে। যার আনন্দে রমা সম্পূর্ণ যোগ দিতে পারে—এমন একজনের কাছে কল্যাণ বসে আছে। ঐ মেয়েটির হয়ে যেন রমা ট্রেনের ঝাঁকুনি ও কল্যাণের স্পর্শ অনুভব করে। মা'র দোকান থেকে পান কেনাটি কেমন অবাস্তব ও অসত্য হয়ে যায়। রাস্তার দু'পাশে প্যান্ডেলে যাবার দু'দিকের নিয়ন লাইন, মাইকের গান, রাস্তার ছেলেমেয়ে চলন্ত ট্রেনের গতির কাছে কেমন ঝাপসা, অস্পষ্ট, অসত্য, বহুদূরের শব্দের মত ক্ষীণ হয়ে যায়। রমার স্বাভাবিক গতি কমে আসে। একটা আড়ষ্টতা সর্বাঙ্গে ছেয়ে যায়। তৃষ্ণার আচ্ছন্নতায় ঘুম ঘুম ভাব নিয়ে রমা মা'র সঙ্গে সঙ্গে চলে। ......সেই রাতে রমা স্বপ্ন দেখে, যেন দাদা ওকে জড়িয়ে শুয়ে আছে—হঠাৎ দাদা যেন ট্রেনে পুরী চলে যাচ্ছে—আর কোনওদিন ফিরবে না—চিরকালের মতো চলে যাচ্ছে—দাদা যেন কল্যাণ হয়ে গেল কেমন করে—রমা এমনভাবে কল্যাণের চিরকালের মতো চলে যাবার জন্যে চিৎকার করে কাঁদছে—অথচ

ট্রেনের প্রবল ঝাঁকুনিতে যখনই রমার কাছে কল্যাণ এসে পড়ছে—কিন্তু কিছুতেই স্পর্শ করা যাচ্ছে না—কী করে স্পর্শ করা যাবে—যে মরে গেছে—যাকে পুড়িয়ে ফেলা হয়েছে শ্মশানে—যে ছাই হয়ে গেছে—কেমন বুক কাঁপতে থাকে—মনে হয় রিসেপশন রুমে রমা একা আর কেমন বিদেহি হয়ে ছায়া হয়ে দূর দিয়ে কল্যাণ হেঁটে যাচ্ছে—গা ছমছম করছে—কি ভীষণ ভয় ভয় করছে—গলা দিয়ে যেন স্বর বের হচ্ছে না......কল্যাণ এমন করে মরে গেল—কল্যাণ যে কেমন করে ওর দাদা হয়ে গেল.....একটা প্রবল কান্নায় যেন রমা ফেটে পড়তে চায়........মনে হচ্ছে প্রচন্ড শব্দ, একি ট্রেনের শব্দ—এত শব্দ কেন? শব্দে রমার ঘুম ভেঙে গেল। চিরাচরিত নিয়ম অনুযায়ী রাত শেষ না হলেই মাইক গর্জন করে উঠছে। রমা আবার ঘুমোবার চেষ্টা করে—কিন্তু ঘুমোতে কেমন ভয় ভয় করে। মাও জেগে গেছেন। রমাও জেগেছে অনুমান করে বলেন, তোর বাবার বোধহয় গেল ঘুম ভেঙে। তুই তো শুয়ে পড়লি—তারপর তোর বাবার টানের মতো উঠেছিল—অনেক কষ্টে একটার পর দেখি একটু তন্দ্রার মতো এসেছে—তখন বিছানায় এলাম। তোকে ডাকতে বলেছিল, ডাকিনি—সারাদিন খাটাখাটনি করেছিস দেখলাম, অঘোরে ঘুমোচ্ছিস। রমার মনে হয়, মা যখন কাজ করতে করতে কথা বলে যখন মা'র মুখের একপাশটা মাত্র দেখা যায়—তখন যেন দাদার আদল ফুটে ওঠে। পাশ দিয়ে মাকে দেখলে অনেকটা দাদাকে দেখবার তৃপ্তি পাওয়া যায়। হঠাৎ মনে হয়, এখন কল্যাণ ও ওর স্ত্রী ট্রেনে মা'র মধ্যে দাদাকে দেখবার চিন্তা ওকে যেমন তৃপ্তি দিয়েছিল—কল্যাণের চিন্তা তেমনি অশান্তি এনে দিল। হঠাৎ রমা বলে, মা, চল না আমরা তিনজনে ক'দিনের জন্যে—এই চার পাঁচ দিনের জন্যই দেওঘর থেকে ঘুরে আসি—দেওঘরে আমাদের কম্পানির হোম রয়েছে—না হয় হোটেলে উঠব। যাব? বাবার ওষুধপত্র সঙ্গে নেব? ডাক্তার কবরেজ তো সব জায়গাই রয়েছে—যাব? মা চুপ করে থাকেন। ভরসা পেয়ে রমা আবার বলে, তোমরা তো বহুকাল বের হওনি—আমি জীবনে শুধু একবার অফিস থেকে পিকনিকে কোলাঘাট গিয়েছিলেম—ঐ তো জীবনে একবার ট্রেনে চড়া—এবার চল একটু ঘুরে আসি? তাহলে আজকে টিকিট করে ফেলব। এবার মা মুখ খোলে—দেওঘরে বাবা বদ্যিনাথ আছেন। —হ্যাঁ, রমা উৎসাহের সঙ্গে বলে মন্দিরে পূজো দেব। আমি দেওঘরের বিষয়ে অনেক শুনেছি—নন্দনপাহাড়, ত্রিকূট, বালানন্দ ব্রহ্মচারীর আশ্রম—রোজ বেড়াব। মাত্র তো একবেলার পথ। তিনটে ফার্স্ট ক্লাসের টিকিট করব।—আমরা কাশীতে গিয়েছিলেম ইন্টারক্লাসে—ইন্টারক্লাসের টিকিট পাওয়া যায় না?—না, এখন ফার্স্ট ক্লাস, সেকেন্ড ক্লাস, থার্ড ক্লাস। একটু চুপ থেকে রমার মা ক্ষীণ স্বরে বলেন—অবনের যখন অবস্থা খারাপ তখন বাবা বদ্যিনাথের কাছে মানত করেছিলাম—তা তিনি শুনলেন কই? রমা বুঝতে পারে মাকে একটু জোর করলেই রাজি হবে। বাবা বদ্যিনাথ সাড়া দেননি তবু কী করে দেওঘর যাওয়া যায়—এরজন্যে মা রমার কাছে একটু যুক্তি, যাবার জন্যে জোরাজোরি ও সান্ত্বনা প্রার্থনা করছেন। রমা ঠিক কী বলবে ভেবে পাচ্ছিল না। দেওঘরে গেলে বা কোথাও গেলে যেন কল্যাণের পুরী যাবার একটা জবাব দেওয়া হয়। কল্যাণ সস্ত্রীক পুরী চলে গেল—আর রমা সেজন্যে শোক করে সময় কাটিয়ে দেয়নি—একথা

কল্যাণের কাছে ও নিজের কাছে প্রমাণ করা দরকার। কল্যাণ এলে যাতে বলা যায়—এবার পুজো খুব এনজয় করা গেল মিঃ চ্যাটার্জি। একটা ছোট্ট ট্রিপ দিলাম দেওঘরে। রমা উত্তেজিত হয়ে ওঠে : এইভাবে বেড়িয়ে এলে কল্যাণকে উইথ ফ্যামিলি বেড়িয়ে আসবার একটা চমৎকার ফিটিং রিপ্লাই.........রমা ভাবে, দেওঘর থেকে বাসে রাঁচি হয়ে আসব। বেড়ানোটা যাতে বেশ কালারফুল হয়। রমার মা আবার বলেন—তা বাবা বদ্যিনাথের দোষ-ই বা কী—কে-ই মানত শুনলেন। কাশীর বিশ্বনাথকে মানত করেছিলেম। কালীঘাটে মানত করেছিলাম, তারকেশ্বরে চুল দেব তাও মানত করেছিলাম—কোনও ঠাকুরই তো কিছু শুনলেন না। তাই আর কোথাও যেতে ইচ্ছে হয় না। মা যেতে রাজি হয়েছেন এখন নিতান্ত অবনের কথা ভেবে না যাবার জন্যে নিতান্ত মৌখিক মামুলি আপত্তি জানাচ্ছেন বুঝতে পেরে বেশ উৎসাহের সঙ্গে কিন্তু 'ধরাগলায় রমা বলে, দেবতারা বড়লোকের দলে। তোমার যদি অনেক টাকাপয়সা থাকত—প্রচুর টাকা মানত করতে পারতে—তবে হয়ত ঠাকুর দেবতার টনক নড়ত। কথায় বলে না, টাকার কাছে হরিও নাচে। সোনার বেলপাতা, কী ঠাকুরের গায়ের জন্য কোনও গহনা যদি মানত করতে তবে যদি.....মা জবাব দেন—তাতে যদি ঠাকুর কথা শুনবে জানতাম তাও না হয় মানত করতেম—না হয় অন্য বাড়িতে দাসিবৃত্তি করেও টাকা করে ঠাকুরকে সোনাদানা......তখন তো তুই আর রোজগার করছিলিনে.......কালীঘাটে জোড়া পাঁঠা দেব মানত করেছিলেম—বাবা বিশ্বনাথকে কাশীর পেয়ারা.......কিছুই হ'ল না। দেশ বেড়িয়ে আর কী হবে? আমাদের নিয়ে গিয়ে কেন পয়সা নষ্ট করবি?—দাদা যদি নিয়ে যেতে চাইত তবে কী তুমি যেতে না? আমার কী তোমাদের নিয়ে যেতে ইচ্ছে করে না? মা চুপ করে থাকেন। একটু একটু পরিষ্কার হতে থাকে। মাইক একটুর জন্য বিরতি দিয়েছে। এবার মহাসপ্তমীর বাজনা শোনা যাচ্ছে। এবার যেন মা স্বগতোক্তি করে প্রাণহীনভাবে, সাধ আমোদ যা করেছি এ জীবনে.......সাত জন্মের শত্রুও যেন এমন না করে.....।

কিন্তু বাধা এল অপ্রত্যাশিতভাবে বাবার কাছ থেকে। প্রস্তাব শুনে কেমন যেন আতঙ্কিত হয়ে ওঠেন কোথায় যাব? দেওঘর?—হ্যাঁ, শুকনো জায়গা—তোমার টানের পক্ষে হয়ত উপকারীও হতে পারে। আমরা তিনজনে যাব—মা, তুমি, আমি। তোমার সব ওষুধপত্র নিয়ে নেব। রমার মাও কাজ করতে করতে প্রদ্যোতবাবুর জবাবের প্রতীক্ষা করেন। বেড়াতে যাব বলছিস? চেঞ্জে? কেমন বিবর্ণ ও পান্ডুর হয়ে যান। কেমন ভয় ও আতঙ্ক হতে থাকে প্রদ্যোতবাবুর, বলেন—আমি চেঞ্জে গেলেও ভাল হব না। কিন্তু প্রদ্যোতবাবুর কেমন ধারণা হতে থাকে ভয় হতে থাকে, হয়ত চেঞ্জে গিয়ে তিনি ভাল হয়ে যাবেন—আবার হয়ত কর্মক্ষম হয়ে উঠবেন। সর্বনাশ! তিনি শুয়ে পড়েন। তিনি যে ভাল হয়ে উঠতে পারবেন না এবং কত যে দুর্বল একথা বোঝাবার জন্যে তিনি ক্লান্তভাবে শুয়ে পড়েন। একে একে অসংলগ্নভাবে মনে পড়তে থাকে, এক জ্যোতিষি তাকে বলেছিল, আপনার অষ্টমে বৃহস্পতি, তীর্থক্ষেত্রে মৃত্যু হবে। দেওঘর তীর্থক্ষেত্র। তিনি ঘোলাটে চোখে রমার দিকে তাকিয়ে বলেন—আমাদের এরিয়াটা ক্যালকাটা কত রে?—বোধহয় ক্যালকাটা টুয়ানটি সিক্স। যাক, কালীঘাটও তীর্থক্ষেত্র—কিন্তু কালীঘাট

পোস্টাল জোনালের বাইরে তীর্থক্ষেত্রের এলাকা থেকে দূরে থেকে তীর্থক্ষেত্রে—মরবার বিপদ কমে গেছে মনে করে একটু নিরাপদ বোধ করেন। আস্তে আস্তে মনে হয়, কাশীও তীর্থক্ষেত্র। কাশী থেকে আসবার পর থেকেই তার একটানা বিপদ হতে থাকে। অর্থাভাব, শিল্পী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবার সব সুযোগ নষ্ট, দুঃখ, দারিদ্র—রোগ। আরও একটা কী বিপদ ঘটে গেছে তা মনে আসছিল না। যদি বদ্যিনাথ যান—তবে হয়তো সেখানেই মৃত্যু ঘটবে—না হয়তো সেখান থেকে এসে আরও বিপদ বাড়বে—হয়তো রমার চাকুরি চলে যাবে—হ্যাঁ মনে পড়েছে, অবনটা মরে গেল—এইটে মনে আসছিল না। আর চিন্তা করতে ইচ্ছে হয় না। হয়তো তিনি ভাল হয়ে গেলেন.......রমার চাকরি চলে গেল। একবার কাশী গিয়ে নিজের শিল্পীর মৃত্যু ঘটেছে.....আর হ্যাঁ ঐ ছেলেটাও তো মরে গেল.......এবার গিয়ে হয়ত নিজেও মরবেন। একদিকে মরবার ভয়, একদিকে ভাল হবার ভয়, একদিকে অবনটা মনে পড়ার একটা অদ্ভুত অস্বস্তি—অপরদিকে মেয়েকে না বলে ফিরিয়ে দিতেও ভয়—মেয়েকে ক্ষুণ্ণ করতে আতঙ্ক। ওরই মধ্যে হঠাৎ কেন যেন তার মনে হল, হয়ত ওখানে বাড়াবাড়ি অসুখ করলে তাদের রেখেই যদি রমা অফিস খুলে গেছে বলে চলে আসে। বুক কাঁপতে থাকে, আর ভাবতে ইচ্ছে করে না—কেমন দুঃখ হয় এই সপ্তমীর ভোরেই মেয়েটা পর্যন্ত তাকে কষ্ট দেবার জন্যে একগাদা সমস্যা সামনে তুলে ধরল। একটু চুপচাপ পড়ে থাকতে দেবে না, ঘরের বাইরে—ওই চিলড্রেনস্ পার্কের পর—সমস্ত পৃথিবীকে তার যে কীরকম ভয়—মেয়েটা এত সহানুভূতিশীল হয়েও তা না বুঝতে পারায় নিজেকে নিঃসঙ্গ ও বড় একা মনে হয়। তিনি আস্তে আস্তে মাথা নাড়েন—আমাদের জন্যে অত খরচ করতে নেই—যা অসুখ বিসুখে দিচ্ছিস—তা কী সোজা। আর না—আর না। খাওয়াচ্ছিস—পুজোতে এতগুলো টাকা দিয়ে জামাকাপড় শাড়ি—না, নিজের ভবিষ্যতের জন্যে রাখ। আমাদের খরচার খাতায় লিখে রাখ। এরপর কিছু না বলে চোখ বুজে তিনি শুধু নিঃশব্দে মাথা নেড়ে না না করতে থাকেন। চোখ খুলতে ভরসা পান না। পাছে মেয়ের বিরক্তি দেখতে পান—দেখতে পেলে আতঙ্ক আরও বেড়ে যায়। রমা কিছু না বলে, আর কোনো পীড়াপীড়ি না করে গোমড়ামুখে নিজের ঘরে ফিরে আসে। তখনও প্রদ্যোতবাবু মাথা নেড়েই চলেছেন। রমার সঙ্গে মা'র চোখাচুখি হতেই মা ঠোঁট উল্টে এমন একটা ভাব দেখালেন যার তাৎপর্য হচ্ছে, এই হচ্ছে তোর বাবা—জীবনে কোনও সুযোগ সুবিধা—একটু বেড়ানো খেলানো কোনও কিছু করতে দেবে না। রমা বুঝতে পেরেছিল বাবার এই ব্যবহারে মা খুশি হয়েছিলেন। যদিও মা'র যাবার ইচ্ছে ছিল তবু বাবার জন্যে না যেতে পারায় খুশি। হাতেনাতে বাবা কেমন লোক একথা রমার কাছে ধরা পড়ে যাওয়াতে মা খুশি। মার মুখের ভাবখানা : এইবার দেখ, কে কেমন—বড় যে বাবার পক্ষ নিস্—দেখলি তো। সবসময় আমাকে দোষ দিস, ঝগড়া হলে বাবার পক্ষ নিস—তা কী আমি বুঝিনে। এইবার হল তো—বুঝলি তো—কেন মা এত চটে যায়—এমনি মানুষ। রমা কিন্তু মা'র এই ভাবকে বেশি আমল দিতে না পেরে নিজের ঘরে এসে শুয়ে পড়ে। রমা যে মা'র এই ভাবকে আমল দিল না—মা'র সহানুভূতিকে গ্রাহ্য করল না—তা অবশ্য কতকটা এই ব্যাপারে মা প্ররোচিত হয়ে বাবার সঙ্গে আবার ঝগড়া না বাধায়

কতকটা আশা ভঙ্গ যে ঘটেছে সেই রাগ দেখাবার জন্যে। বাবার সম্পর্কে মা'র সঙ্গে আলাপ করতে রুচিতে বাধছিল বলে ঘরে চলে আসো। জানে মা'র সঙ্গে এখন কথা না বললেও মা আজ ক্ষমা করবেন। ওর যে যেতে না পারায় রাগ হয়েছে—অন্তত বাবার 'পর রাগ হয়েছে এ কথা ধরে নিয়ে আজকের এই ব্যবহার মা লঘুভাবে দেখবেন বরং এই রাগে খুশি হয়েছেন। সবচেয়ে রমা আশ্চর্য হল, নিজের ভেতরে যেতে না পারবার জন্যে কোন আশাভঙ্গ না দেখে, অবাক হল ক্ষুণ্ণ না হতে পারার জন্য। যদিও মুখে রাগ হয়ত ছিল, মনেও রাগের ভান ছিল—রমা যে ক্ষুণ্ণ হয়েছে, রাগ করেছে নিজেকেও একথা জোর করে রমা বোঝাতে চায়। ভোরের আলো ফুটে ওঠবার পর থেকেই আকাশটি রমার কেমন ম্লান হয়ে আসে—অসুস্থ বাবা, বদমেজাজী মা এদের নিয়ে যাওয়া যেন একটা দায়িত্ব ও বোঝার মত নিজের কাছে লাগছিল—মনে মনে নিজের অগোচরেই চিন্তা ভেসে গেছে। কল্যাণ গেল আনন্দ, ফুর্তি করতে আর আমি যাচ্ছি রুগণ বাবা ও মাকে নিয়ে কঠোর দায়িত্ব পালন করতে। তাছাড়া সবসময় বাবা-মা'র সঙ্গে থাকাকেও ওর কেমন পীড়াদায়ক মনে হতে আরম্ভ করছিল। বাড়িতে থাকতে হবে বলে ক্যাসুয়াল লিভ পর্যন্ত নেয় না। এই বাড়ির পরিবেশ তাও তো দেওঘরে যাবে। যাবার আনন্দ যেন দায়িত্বের শুষ্ক বোঝায় পরিণত হয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু যাওয়ার উত্তেজনাকে রমা জোর করে ধরে রেখেছিল ও এসব চিন্তাকে আমল দেয়নি—স্বীকার করেনি। কিন্তু বাবা নিজেই যখন নাকচ করে দিলেন—তখন রমা ভেতরে ভেতরে, নিজের অনিচ্ছাসত্ত্বেও কেমন নিষ্কৃতি বোধ করে এই মনকে বোধ করবার আনন্দ ও নিষ্কৃতি বোধ করবারও বোঝা মুক্ত হওযার গোপন খুশীতে রমা যেতে না পারবার জন্যে রাগকে ধরে রাখে, রাগ যে করেছে নিজেকে ও সকলকে সেই কথা বোঝাবার জন্যে গুম হয়ে বসে থাকে। নিজের গুম হওয়াকে, রাগ করাকে একটু একটু করে আস্বাদন করে তাই নয়—নিজের এই রাগের মধ্যে দিয়ে যেন নিজের প্রাধান্য ও বাবা মার কাছে নিজের গুরুত্ব প্রভাব প্রতিপত্তি অনুভব করতে পেরে এক ধরনের প্রশ্রয় পাবার আনন্দ বোধ করে। তবুও নিজের ভেতরে ভেতরে কেমন ভয় করতে থাকে, এক, মা যে মেয়ের পক্ষে একথা বোঝাতে বাবার সঙ্গে একটা ঝগড়া না বাধায়, দুই, তার আগেই বাবা আবার মত পরিবর্তন না কারণ অর্থাৎ মেয়েকে খুশি করবার জন্যে দেওঘরে যেতে রাজি না হয়ে যান! তিন মা আবার রমাকে প্রবোধ দিতে, সান্ত্বনা দিতে এসে ও একা থাকবার ইচ্ছে গুম হয়ে থাকবার বিলাসকে নষ্ট না করে দেয়। নিজে যে রাগ করেছে—একথা গোমড়া মুখে বসে নিজেকেও বাবা মাকে বোঝাতে ভাল লাগছে। ভাবল রাগ যে করেছে এই ছুতোয় অফিসের মত পোশাক পরে—অর্থাৎ পূজোয় কেনা শাড়ি না পরে—ঐ সিভ্লেস ব্লাউজ পরে ঠোঁটে লিপস্টিক মেখে বরং মেট্রো বা লাইট হাউস থেকে মর্নিং শো দেখে আসবে। চিন্তাটি উৎসাহব্যঞ্জক। এই পোষাকে গেলে বাবা-মা'র বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করা হয়। মা হয়তো সন্দেহ করবে—এই পোশাকে গেলে মা'র মনে ভাল মেয়ের যে চেহারাটি রয়েছে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা হয়। যেই বিদ্রোহের ফলে গতকাল ভেবেছিল সিনেমা যাওয়ার ইচ্ছে ও ঐ পোশাক পরে যাবার যৌক্তিকতা নিজেকে বোঝালেও নিজের ভেতর থেকে কোনও

তাগিদ বোধ করে না। নিজেকে বোঝায়, ঐ পোশাকে গেলে হয়ত মা'র রাগ গিয়ে পড়বে বাবার 'পর। রমা চোখ বুজে কল্পনা করে, সিনেমায় যাওয়ার জন্যে বাসা থেকে বের হয়ে গেলেই মা হয়তো তক্ষুনি গিয়ে বাবার ঘরে ঢুকে ঝগড়া শুরু করবে। ভাবল, পুজোর শাড়ি পরেই না হয় সিনেমা দেখে আসি। মন অনেকটা হাল্কা হবে—কিছুক্ষণ অন্যদিকে মন দিলে মনের ভার কমে। চোখ বুজে রমা শুয়ে থাকে, অন্যান্য দিন এসময় অফিসে যাওয়ার তাড়া শুরু হয়ে যায়। আজ তাড়া নেই। আজ ছুটির দিনে বাসায় থাকতে ইচ্ছে করে না—অথচ রোজ রোজ অফিস করে বলে বাসা থেকে বের হতেও মন চায় না। শাড়ি পরা, ব্লাউজ পরা—মনে হয় অনেক উদ্যাম—অনেক প্রেমের ব্যাপার। অফিসে ঢুকে রিসেপশন রুমে ঢুকতেই—রমার মনে আপনা থেকেই ভেসে ওঠে—কল্যাণ সুপ্রভাত জানিয়ে মধুর হেসে যেতে যেতেই একটু স্থির ভাবে তাকিয়ে চলে যায়। এতক্ষণে পুরী পৌঁছে গেছে.....এবার এলে আর কোনও প্রশ্রয় নয়.....কল্যাণ বেশ কদিনের ছুটি হিসাবে—কালীপুজোর দুদিন আগে জয়েন করবে। রমার মনে হয়, সমস্ত অফিসের আকর্ষণ যেন চলে গেছে—অথচ বাসায় থাকতেও মন চায় না। ছুটি হলে বাসায় থাকতে হয়—তা ওর কাছে এক বিভীষিকা—এখন অফিস কেমন যেন নিঃস্ব ও আকর্ষণহীন হয়ে যায়। ওর কত ছুটি পড়ে আছে। হঠাৎ মনে পরে, ছুটি নিয়ে রমা যদি এখন পুরী যায়—কল্যাণের কী অবস্থা হবে—দেখা যাক কী হয়—স্ত্রী যতই কাছে থাক—রমাকে ফেলতে পারবে না—সমুদ্রের ধারে যখন দেখা হবে—কল্যাণকে একবার এরকম টেস্ট করে দেখলে হয় না? কল্পনাটি রমার ভাল লাগে—যেন রমার কল্যাণের স্ত্রীকে সোজাসুজি চ্যালেঞ্জ করা—এটা ডুয়েলের মতো হয়ে যায়—হাত-পা ছেড়ে কেমন শিথিল হয়ে আসে, ওর যাওয়া হবে না। এসব ভেবে কী লাভ? উপায় থাকলেও কী যেতে পারত? কল্যাণ কী ভাবত না ওকে দেখতেই ছুটে এসেছে? একথা কী ওকে ভাবতে দেওয়া যায়। কেন আমার জীবনে এল—ওর জীবনে অভিশাপের তো কিছু কমতি ছিল না, কেন এল? দুই চোখে রমার জল ভরে আসে। নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই যেন কল্যাণকে জিজ্ঞাসা করে কেন এলে? ঠিক এমনি সময় মা এসে ঘরে ঢোকে। আর এককাপ চা খাবি? জল চোখে মাথা নেড়ে রাজি হয় রমা। চোখের জল মুছে উঠে বসে। মা একটু দাঁড়িয়ে তারপর বের হয়ে যেতে যেতে বলে—এমন ঘরে জন্মেছিস—এখানে শুধু দায়-দায়িত্ব বয়ে বেড়াতে হবে—বেড়ানো খেলানো—হুঁঃ—ফ্রক ছাড়বার আগেই চাকরিতে ঢুকেছিস—জোয়াল কাঁধে দিয়েছিস—এ সংসারের কাছে কোন কিছু পাওয়ার আশা করবিনে—পাবি গালাগাল, অনুযোগ, অভিযোগ .... আর কিছু সাধ আহ্লাদের আশা করেছিস কীজন্যে? এ সংসারে জন্মেছিস কত যে চোখের জল বাকি রয়েছে....।

আজ যখন রীনা দুপুরে বেশ হন্তদন্ত ও ব্যস্তসমস্তভাবে কল্যাণের কাছে এল, তখন রীনার চোখে মুখের মধ্যে যেন একটা গম্ভীর আনুগত্য—কল্যাণের 'পর তন্ময়তা ও মুগ্ধতা লক্ষ্য করছিল। রীনাকে দেখামাত্রই চিনতে ওর দেরি হয়নি—মুহূর্তের জন্যেও অফিসে কল্যাণ সম্পর্কে ওর যে কোন সন্দেহ, অবিশ্বাস বা সংশয় নেই। ও যেন বড় ঘরের আবদারি মেয়ে ও বিত্তমান ব্যক্তির আহ্লাদি বউ—ওকে দেখামাত্রই তা বোঝা

যায়। ওকে দেখামাত্রই রমা গম্ভীর হয়ে গিয়েছিল—তবু অফিসে স্ত্রী হানা দেবার কারণটি জানবার কৌতূহল সেই সঙ্গে ওকে পীড়ন করছিল। তারপর কল্যাণ যখন স্ত্রীকে নিয়ে ওর পাশ দিয়ে চলে গেল তখন দুজনকে একসঙ্গে দেখবার প্রতিশোধ হিসেবে কল্যাণকে গ্রাহ্য করেনা। যদিও দুজনকে আসতে দেখেই ভেবেছিল স্ত্রীর সঙ্গে কল্যাণ আলাপ করিয়ে দেবে। কল্যাণ কয়বার ওর দিকে তাকাল—তা না তাকিয়েও বুঝতে পারল। অর্থাৎ স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবে না—তবুও স্ত্রীর মাথার 'পর দিয়ে চোরা দৃষ্টিতে তাকাবে। ওর দিকে তাকাচ্ছে বুঝতে পেরেও অফিসের ভদ্রতার নিয়মকে উপেক্ষা করেই চোখ নিচু করে থাকে রমা। রীনার পাশে নিজেকে কেমন যেন রঙচঙ মাখা সঙ মনে হবার যন্ত্রণা বোধ করছিল। মনে হল, কল্যাণ একেবারে স্ত্রীর পাশে রেখে ওকে মিলিয়ে, তুলনা করে দেখে নিল। নিজেকে রঙ চঙ মাখা সঙ মনে হবার গ্লানি শুরু হতেই মনে হয় সামান্য একজন রিসেপশনিস্টের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলে প্রেস্টিজে বাধবে। মাত্র দু'মিনিট আগেই যে ভেবেছিল, সামান্য একজন রিসেপশনিস্টও কল্যাণকে গ্রাহ্য করে না—একথা স্ত্রী বুঝুক—রমা অবশ্য তা ভুলে গেল। নিজের মনে দুজনের চেহারা যতই মনে হতে লাগল—যতই নিজের অনিচ্ছাসত্ত্বেও মনে না করে পারল না—দুজনকে মানিয়েছে ভাল—ততই নিজেকে নির্মম পরিহাস করে থাকে : দুজনে রাত কাটাচ্ছে বিকেল কাটাচ্ছে তো অফিসে দু মিনিট কাটালো তো কী হয়েছে! কল্যাণ ফিরে আসবার আগেই ঠিক করে ফেলে, কল্যাণকে আর প্রশ্রয় নয়—আর এক মুহূর্তের জন্য নয়। আজকাল বিকেলে এক জায়গায় শর্ট হ্যান্ড ও স্টেনোগ্রাফি শেখে—প্রায়ই কল্যাণের জন্য কামাই হয়—সন্ধ্যায় টিউটোরিয়ালেও রোজ যেতে পারে না—মা তাতে ভারি হৈচৈ করে। অফিসে অবসর মুহূর্তগুলোও শর্টহ্যান্ড ও স্টেনোগ্রাফি করে—অফিসের সময় অঢেল—ইচ্ছা ছিল ইংরাজিতে এম.এ টা দিয়ে নেবে। কিন্তু এত রাতে বাসায় ফিরে আর কোনও এনার্জি থাকে না। অথচ কল্যাণকে স্টেনোগ্রাফারি শেখে তাও বলতে পারে না—যদিও ওকে রিসেপশন রুমে কল্যাণ প্র্যাকটিশ করতে দেখেনি এমন নয়। কিন্তু কল্যাণ কোনও উৎসাহ বা আগ্রহ দেখায়নি। কল্যাণকে দেখেই পেন্সিল, বই, খাতা যখন ড্রয়ারে রেখে দিয়েছে তখন কল্যাণ যেন ওর সবটা মনোযোগ পাওয়ার খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে—কোন্ বিষয় থেকে মনোযোগ ওর দিকে দেওয়া হল এ নিয়ে যেন কোন মাথাব্যথা নেই। যদিও শর্টহ্যান্ড শেখে একথা কল্যাণ জানতে পারবে বা হয়ত পেরেছেও রমা যেন একটু অস্বস্তিবোধ করে—তবুও রমা চেষ্টা করে রমা নিজেকে উন্নত করবার দিকে কী কী করতে চায় জানতে চাইলে রমা হয়ত খুশি হত। কেউ ওর সম্পর্কে কোন দিন বিশেষ কোন মনোযোগ দেখায়নি। কল্যাণ যখন ফিরে আবার অফিসে ঢুকল—ও রিসেপশন রুমের পাশ দিয়ে তাকাতে তাকাতে একা গেল—তখন রমা কল্যাণকে চিনতে চাইল না। কল্যাণের দৃষ্টি বারবার ব্যর্থ হয়ে ফিরে গেল তখন ওকে সন্তুষ্ট করবার চাহনি অনুভব করতে ওর অসুবিধে হয়নি। কল্যাণকে যেন কেমন ছোট ও হীন মনে হতে থাকল। মনে হতে থাকা, স্ত্রীকে প্রসন্ন করে এবার আমাকে প্লিজ করতে এসেছে। ভেবেছে ওর সুশ্রী চেহারা যখন ওর কাছে এসে দাঁড়াবে তখন আমি একেবারে অবলাইজ হয়ে যাব। কল্যাণকে মেয়েমানুষপ্রিয়হীন পুরুষ বলে মনে

হতে থাকে। সুশ্রী চেহারাটা ক্যাপিটাল করে ফুলে ফুলে মধু চেখে বেড়ানোই ওর কাজ। আর আমি ওর তুলনায় সুশ্রী নই বলে ভেবেছে বুঝি আমি একেবারে কৃতার্থ হয়ে যাব। রমা ঠিক করে, এবার থেকে ছুটির পরে একটুও সময় নষ্ট নয়, শর্টহ্যান্ড আর টিউটোরিয়াল একটিকেও অবহেলা নয়। ভাববে, অফিসে স্ত্রী আসতেই গোসা হয়েছি—বাঃ, যা খুশি ভাবুক গিয়ে তাতে আমার কী? তারপর যখন দুজন স্টেনো ও রিসেপশনে বসে ঘেরাও নিয়ে আলোচনা করতে করতে কল্যানের প্রসঙ্গ আসতেই দুজনেই একসঙ্গে রমার দিকে তাকাল—তখন যদিও রমা বাইরে কিছু বুঝতে দিত না—কিন্তু ভেতরে ভেতরে সেই চাউনিদুটো যেন ওকে বলতে থাকে, এখন, এর চেহারা ভাল নয় সেই ইনফিরিওরিটির সুযোগ নিয়ে কল্যাণ তাকে খেলাচ্ছে। রমা স্থির করে, কঠোর ভাবে প্রতিজ্ঞা করে, আর নয় অফিসিয়াল রিলেশন ছাড়া কল্যাণের সঙ্গে আর কোনও পরিচয় নেই। নিজের অজ্ঞাতে মনে পড়ে মা'র কথা—এই হচ্ছে পুরুষজাত—এই হচ্ছে পেরেম। ঘরে বউ বাইরে রমা নিশ্চিন্তে দুজনকেই খেলাতে চায়। আরও আছে কিনা কে জানে? স্টেনো মেয়ে দুটোই সুশ্রী। মনে মনে রমা ওদের অহঙ্কার শুনতে পায় : ওদের কল্যাণ খেলাতে পারবে না। ওর চোখমুখ গরম হয়ে ওঠে। কিশোর থেকে এতকাল পর্যন্ত অনশনে থেকে নিজের সম্পর্কে মনে মনে যে একটা ভাল চেহারা গড়ে তুলেছে—যার জন্যে আশেপাশে ওর সীমা নেই, মা বাবার 'পর রাগ করে নিজের এই কুমারী চেহারাকে ভেঙে ফেলতে চেয়েছে—মেয়ে দুটির দৃষ্টির মধ্যে সেই ভাঙা চেহারার, ক্ষতবিক্ষত কুমারী মূর্তির প্রতি যেন একটা তাচ্ছিল্যপূর্ণ কৌতুক দৃষ্টি দেখতে পায়। মনে মনে একদিকে কল্যাণের 'পর রাগ, নিজের জন্য ধিক্কার আর মেয়ে দুটোর উদ্দেশে মনে মনে গরম হয়ে বলতে থাকে, সুন্দর চেহারার দেখানোর জন্যে আছে, কল্যাণ একটু 'তু' করলেই ছুটে আসবে। আমি কল্যাণের কাছে যাইনি—কল্যাণ আমার কাছে এসেছে। একটু পরেই ফোন করে এখন ওকে ছুটির পর অপেক্ষা করতে কল্যাণ বলল—তখন রাগে, উত্তেজনায় রমার হাত পা কাঁপতে থাকে। সহজ ও স্বাভাবিক হতে রীতিমতো সময় নেয়। এভাবে ফোন করে ওকে বলবার মধ্যে দিয়ে যেন ওর আত্মসম্মানকে ইচ্ছে করে নষ্ট করা হয়েছে তাই নয়—আজও টিউটোরিয়ালে যাওয়া নিতান্তই দরকার—শর্টহ্যান্ড কলেজেও মিথ্যে মিথ্যে মাসে মাসে মাইনে গুনতে ওর গা জ্বলে যাচ্ছিল—ঠিক করেছিল ঠিক চারটে বাজতেই চলে যাবে। ঠিক সেইরকমই বন্দোবস্তও করেছিল। একে তো দিনকাল খারাপ বলে মফঃস্বল থেকে যারা আসে তিনটের পরই তাদের চলে যাওয়া শুরু হয়। মেয়েদেরও বলে দেওয়া হয়েছে—তাদের 'পর এমন বাধ্যবাধকতা নেই।—ওকে কল্যাণের জন্যে বসে থাকতে হবে হা-পিত্যেশ করে রাত পর্যন্ত। বেয়ারাগুলো পর্যন্ত চলে যায়—পিওনরাও থাকে না শুধু অফিসাররা থাকেন প্রয়োজনমতো। অফিসের দারোয়ানগুলো দেখে। স্টেনো মেয়েদুটোর দৃষ্টি ওর চোখের সামনে ভেসে ওঠে। ইচ্ছে হয়, ফোন করে বলে দেয়—আজ অতক্ষণ পর্যন্ত ওয়েট করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু ফোন করতে পারে না। নিজেকে বোঝায়, উপরের অফিসার মহলে কল্যাণের অনেক হাত ..... তবু থাকগে আজকে হেস্তনেস্ত করব। কল্যাণকে আঘাত দেওয়ার লোভে, কল্যাণের সঙ্গে সকল সম্পর্ক চুকিয়ে

দেওয়ার প্রলোভনে রমা গুম হয়ে বসে থাকে। যদিও ভেতরে ভেতরে বুঝতে পারছিল, স্ত্রী এসেছে বলেই ওকে সন্তুষ্ট করবার জন্যে কল্যাণ ব্যাকুল হয়ে উঠেছে—স্ত্রীকে দেখে রমা ক্রুদ্ধ হবে রমার মন সম্পর্কে এমন খারাপ ধারণা করা—একথাই যে ওকে সন্তুষ্ট করবার মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পাচ্ছে কল্যান কী তা বুঝতে পারে না? যদিও রমা এসব চিন্তাকে আমল দিল না। শুধু তাই নয়, কল্যাণের স্ত্রী হঠাৎ কেন অফিসে এল—তাও জানবার একটা কৌতূহলের পীড়ন মনের মধ্যে ছিল—কিন্তু রমা সেই কৌতূহলকে স্বীকার করল না। কিছুতেই স্বীকার করতে চাইল না, অফিসের সারাদিন খাটুনির পর কল্যাণের একটু সঙ্গ পাওয়ার জন্য মন কীরকম সাগ্রহে অপেক্ষা করে থাকে। অফিসের পর শর্টহ্যান্ড আর টিউটোরিয়ালের ছাত্রী পড়ানোর নামে গায়ে যে জ্বর আসতে চায়—কল্যাণের জন্যে তা করতে পারছে না বলে যে দিব্যি আত্মপ্রবঞ্চনা করা যায়—রমা সেই কথা কিছুতেই স্বীকার করতে আজ পারল না। আজ কল্যাণের সঙ্গে শেষ বোঝাপড়ার নামে ওর জন্যেও অপেক্ষা করতে করতে রাগ যতই কমে আসতে থাকে—ততই ভীত হয়ে ওঠে—ওই রীনাকে মনে করে রাগকে জীবিত রাখবার চেষ্টা করে। অফিস জনশূন্য হয়ে আসতে থাকে।

শেষ পর্যন্ত নিজেকে শান্ত করবার জন্যে রমা শর্টহ্যান্ড প্র্যাকটিস করতে শুরু করল। মাঝে মধ্যে এক এক বার মনে হচ্ছিল, আর যদি কেউ ওর অনুরক্ত হত—আর কল্যাণকে বেশ শিক্ষা দেওয়া চলত। কিন্তু নিজের রূপ সম্বন্ধে এমন একটা অবুঝ হীনতাবোধ রয়েছে—যদিও নিজের সম্পর্কে এই ধারণা ওকে যে শুধু পীড়ন করে তাই নয়—এ ধারনা অনেকটাই অতিরঞ্জিত একথা জেনেও ওই ধারণার হাত থেকে ওর পরিত্রাণ নেই। এখানে সকলের মুখেই সৌজন্যের কৃত্রিম হাসি—কিন্তু কল্যাণের মুগ্ধ দৃষ্টি তো কারও মধ্যে দেখতে পাওয়া যায় না। তাছাড়া রমা জানে সত্য মিথ্যা বলতে পারবে না কারণ কল্যাণের কাছে শোনা ওর অভ্যর্থনার হাসিটি ভদ্র ও মর্যাদাব্যঞ্জক। সাহেব ও অফিসাররাও নাকি ওর হাসির মধ্যে একটা গাম্ভীর্যের আড়াল লক্ষ্য করেছেন এবং তার জন্যে খুশিও। ঐ গাম্ভীর্য নাকি ব্যক্তিত্বের ছাপ বহন করে। কল্যাণ অবশ্য অভিযোগটি তুলেছিল ওর আড়াল থাকা নিয়ে। বলছিল, একথা ওর একার নয়। সাহেব অফিসারও লক্ষ্য করেছেন—যদিও তাদের অভ্যর্থনাকারিণীর ব্যাক্তিত্ব ও গাম্ভীর্য আছে বলে তারা তো খুশি কিন্তু কল্যাণ চায় অভ্যর্থনা যে করবে সে তো কাছে টেনে নেবে—ব্যক্তিত্ব ও গাম্ভীর্য তো দূরে ঠেলে দেয়—তার হাসি ভদ্র, মার্জিত—তা তো আপন করে নেওয়ার হাসি নয়। ইষৎ বিদ্রূপের কণ্ঠে রমা বলেছিল—অভ্যর্থনাকারিণী সবাই কে আপন করে নেবে। আশাকরি এতো আর কেউ আপত্তি না করলেও একজন তো নিশ্চয়ই বারোয়ারী অভ্যর্থনায় আপত্তি করতো—সে হচ্ছে যে অনুযোগ করেছে সে। কল্যাণ মাথা নেড়ে নিজের ভুল খুশি হয়ে স্বীকার করছিল। কথাটা অবশ্য রমা বিশ্বাস করেছিল। ও যে ছেলেবেলা থেকেই গম্ভীর—একথা অনেকের কাছেই শুনেছে। দিদিমণিদের কাছেও এই প্রশংসাপত্র পেয়েছে। সুতরাং দিদিমণি থেকে সাহেব অফিসারদের কাছেও এই একই কথা শুনতে পেয়ে খুশি হয়েছিল। বিশ্বাসও করেছিল। আরও খুশি হয়েছিল—উপরমহল ওকে সস্তা ভাবেন না দেখে। অবশ্য কল্যাণের অনুযোগেও

প্রশংসারই ছদ্মবেশ। রমা তা বুঝতে পেরে অথচ বুঝতে না চেয়েও, খুশি হয়ে উঠেছিল। খুশির স্মৃতির নানা কথা মনে আসায় ও বেশ কিছুক্ষণ শর্টহ্যান্ড প্র্যাকটিসে মন দিতে পারায় অনেকটা শান্ত হয়ে আসে রমা। মনে হয় আজ অনেকটা কাজ করা গেল। কাজ সম্পূর্ণ করার তৃপ্তিকে যেন চারিদিককার নীরবতার সঙ্গে মিলিয়ে অনুভব করে। যদিও কিছুক্ষণ আগে রাগ করবার উত্তেজনা কখন যে নিস্তেজ মনকে ক্লান্ত করেছিল—সেই ক্লান্তি নানা খুশির স্মৃতির প্রশংসার মধ্যে দিয়ে শেষপর্যন্ত কাজ সম্পূর্ণ করবার তৃপ্তিতে পরিণত হয়েছিল। রমা তা খেয়াল করল না। শুধু নিজেকে যে কথা দিয়েছিল—আজই কল্যাণের সঙ্গে একটা হেস্তনেস্ত করে ফেলবে—সেই কথাটি শান্তমনে একবার আবৃত্তি করে নিজেকে জানিয়ে দিল রমা—নিজেকে দেওয়া কথা রাখতে জানে। যদিও শান্ত মনকে আরও ক্ষুব্ধ ও ক্রুদ্ধ করতে ওর যে একটা প্রচণ্ড অনিচ্ছা মনের একটু আড়ালেই ছিল তা জানতে পেরে রমা শুধু নিজেকে বল্‌ল—ঝগড়াঝাটি নয়—শুধু ট্রামে উঠবার সময় বলে দেব। কী বলে দেব—একথা রমা ভাবতে সাহস পায় না। পাছে একথা নিজেকে বললে মন আবার ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে—এতক্ষণে অর্জিত শান্তি নষ্ট হয়। পাছে কী বলবে একথা এখন নিজেকে বলে নিজের কাছে কথা দিতেও মন চায় না। তারপর সেই কথা অনুযায়ী চলতে না পারলে নিজের কাছে নিজের ইমেজ নষ্ট, ছোট হয়ে যাওয়া, আত্মগ্লানি। কল্যাণের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদের মুহূর্তটি সম্পর্কে স্পটাস্পষ্টি নিজেকে কিছু জানাতে রমা চায় না। যদিও এরই মধ্যে বারকয়েক মনে হয়েছিল, আজকের দিনটা থাক। মনে করবে স্ত্রীকে দেখেই ঈর্ষাকে তাছাড়া শান্ত মনটিকে ঝগড়াঝাটি বা কাটানো ছেড়ানের মধ্যে এনে নষ্ট করা....। কিন্তু রমা এ চিন্তাকে প্রশ্রয় দেয়নি। যেন আলগোছে ভেবে নিল, ঝগড়াঝাটি নয়, ট্রামে বা বাসে উঠবার সময় বলে দেব। ঝগড়া করব কেন? কী বলে দেবে—তা যেন রমা নিজের কাছে ফাঁস করে দিতে চায় না। কী বলবে তা জানিয়ে দিয়ে নিজের মনকে নানা জল্পনা-কল্পনা উপদেশ পরামর্শ দেওয়ার সুযোগ দিতে চায় না। কী বলবে সেই সময় তা কী রমা সাহস করে ভাবতে পারছে না বা ভাবতে চাইছে না একথাও রমা স্বীকার করতে রাজি নয়। রোজ এমনি কাজ সম্পূর্ণ করবার তৃপ্তির পর কল্যাণের সঙ্গে মিলিত হওয়ার লোভ, ও সম্পর্ক ছেদ করে দিলে অপরিসীম শূন্যতা ও অপরিমেয় নিঃস্বতা, আবার চারদিকে লোকজন নেই সবাই চলে গেছে অথচ ওকে বসে থাকতে হয়—এমনি করে বসে থাকবার গ্লানি, অ্যাকাউন্টস ডিপার্টমেন্টের মেয়ে দুটোর চাহনি, রীনার চেহারা, রীনাকে দেখে নিজের সেই সময়কার হীনতাবোধ, রীনার পাশে কল্যাণ—নানা ধরনের চিন্তা ওর মনে বারবার উঁকি দিলেও কাউকেও শেষ পর্যন্ত রমা ঢুকতে দিল না—প্রভাব বিস্তার করতে দিল না। শুধু মনে করবার চেষ্টা করল। সবাই চলে গেলে—কী শান্ত হয়ে যায় চারিদিক। এই শান্তির কী একটা সুন্দর আবেদন রয়েছে। চিরকাল নিরিবিলি থাকতে চেয়েছে—একা একা থাকতে থাকতে ভাবতে ওর ভারি ভাল লাগত। নিজের বাসায় অবশ্য হৈ হট্টগোল নেই—কিন্তু ঠিক শান্ত নয়—কেমন থমথমে। যে কোনও মুহূর্তে হয় ঝগড়া, নয় বাবা টান উঠবার সেই আতঙ্ক দেখা দিতে পারে। ফলে বাসাটা ঠিক শান্ত নয়, টান না উঠলেও—ঝগড়া না বাধলেও মন অশান্ত ও আতঙ্কিত হওয়ার জন্য সবসময় কেমন যেন উদ্বিগ্নভাবে অপেক্ষা

করে। নিজের বাসায় কোনও আকর্ষণ নেই—এ চিন্তাকেও মনে মনে স্থান দিত না। ভয় হতে থাকে, এই চিন্তার সূত্র ধরে এখনই কল্যাণকে বাদ দিলে ঐ থমথমে ঝগড়াটে বাসাই ওর একমাত্র অবলম্বন করতে হবে—এই চিন্তাটিও চট করে ঢুকে কেমিকেল অ্যাকশন শুরু করল। ঘড়ি দেখল, মন বিরক্ত হওয়ার আগেই তাড়াতাড়ি রমা ভেবে নিল, হয়ত কল্যাণের কোনও কাজ নেই—শুধু রমার সামনে আসবার সাহস সঞ্চয় করতে পারছে না। একথা মনে হতেই একটা স্নিগ্ধ প্রশ্রয়ের হাসি ওর ঠোঁটে নিজের অজান্তেই খেলে যায়। মনের সরসতায় দেহও যে সায় দিল রমা তা জানতেও পারল না।

বেশ ঠান্ডা পড়ে গেছে। এবার ফুল হাতা সোয়েটারটি গায়ে দেয়। মা বুনে দিয়েছে। যে কজন দেখেছে, সবাই প্রশংসা করেছে। সত্যি, এতকাল বাবার সঙ্গে থেকে থেকে রঙ সম্বন্ধে মা'র চমৎকার রুচি গড়ে উঠেছে। নারীর সহজাত সৌন্দর্যবোধের সঙ্গে মিশেছে শিল্পীর কাছ থেকে পাওয়া রুচিবোধ। লক্ষ্মীপূজোয় ওদের বাড়িতে মা যে আল্পনা দেয় তা দেখবার মতো। এই আল্পনা বাবার কাছে শিখেছেন। জানলার পর্দার রঙ বিছানার চাদরে মা যে অবসর সময়ে সেলাই তুলেছে তাতে রঙের কম্বিনেশন দেখবার মতো। বাইরের ঘরটি রমা নিজের মতো করে সাজিয়েছিল। বাইরের ঘর সাজাবার বিরুদ্ধেও ওর মার প্রবল আপত্তি ছিল—সোফা সেট কিনতে হাড়ে হাড়ে চটে যান—বুকশেল্ফ দেখে তেলেবেগুনে জ্বলে ওঠেন—তোমার পয়সা তুমি নষ্ট করবে আমি বলবার কে? কার্পেট দেখে খেপে ওঠেন—বাপের বাড়ি সাজিয়ে কী হবে—পয়সা রেখে দাও বিয়ের পর নিজের ঘর সাজিও। দেওয়ালে ঢাকা দেওয়ার জন্যে ওয়াল ডেকরেশনের জিনিস আনতে মা ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞাসা করেন এগুলো কী? তুই কী সব পয়সা এভাবে ওড়াবি? কলের জল খেয়ে, ফ্যান-ভাত খাওয়ার কথা কী ভুলে গেছিস? না আবার তা খেতে চাস? কোন লাটসাহেব আমাদের বাসায় আসবে শুনি? তারপর একদিন ঘরের পর্দা কিনে আনতেই মা প্রায় তেড়ে আসেন—তুই কী আরম্ভ করেছিস? এই রঙের পর্দা আর ঐ রঙের কার্পেট—আর ঐ তোর সোফার ঢাকনা—অবনের রুচি ছিল, রঙ চিনত কোন দোকান থেকে এনেছিস? দেখি ক্যাশমেমোটা—তুই কোন আক্কেলে শড়িয়াহাটার ঐ দোকানটা থেকে জিনিস এনেছিস। বড়লোক হয়েছেন? একদিন রমা আশ্চর্য হযে দেখল—মা সেই কাপড় পাল্টে শুধু নতুন কাপড়ই এনেছে তাই নয়—তাতে অতি সুন্দর সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কাজ করে দিয়েছে। দেওয়াল ঢাকা পড়তেই মার মুখ দিয়ে হাসি বের হয়—একেই বলে চুল দিয়ে কাটা কান ঢাকা। ভাঙা বাড়ি, চুন বালি খসা ঘর তাতে আবার সোফাসেট। হুঃ, হ্যাঁ ভাল কথা—বড়লোকগিরি দেখাতে গিয়ে বাড়িওলাকে আবার তোমার ঘরে বসাতে যেও না—তাহলেই ভাড়া বাড়াতে বলবে। বললেই হল—এতবছর ধরে না করেছে চুনকাম—না সাজিয়েছে কিন্তু—রান্নাঘর দিয়ে জল পড়ে—সব ঘরে ছাদ ফাটা। ওরে অকৃতজ্ঞ, যখন মাসের পর মাস ভাড়া দিতে পারিনি—তখন তো তুলে দেয়নি। একটু গজগজ করে চলে গেছে—এমন কিছু বড়লোক ওরা নয়। বাপের মতই অকৃতজ্ঞ হয়েছিস। রমা ভাববার চেষ্টা করে, এই সোয়েটারটাকে দেখে কল্যাণ কী বলবে? ইতিমধ্যে সোয়েটার পরবার পর থেকেই একটু গরম লাগছিল—

মনে হচ্ছিল এখনও সোয়েটার পরবার সময় আসেনি। ভাবল, রাস্তায় বের হলেই এই গরম ভাবটা চলে যাবে। আবার ঘড়ি দেখল। আজকে কল্যাণ পরীক্ষা করে দেখছে, কতক্ষণ পর্যন্ত রমা অপেক্ষা করতে পারবে। নিজের ইনফ্লুয়েন্স কতটা তাই কী পরীক্ষা করে দেখছে? না, স্ত্রীকে নিয়ে যাবার সময় তাকায়নি তারই শাস্তি হিসেবে এখন ডিটেন করানো? রমা বুঝতে পারে, এতক্ষণ ধরে মনে যে তৃপ্তি ও শান্তি ছিল তা চলে যাওয়ার জোগাড় হয়েছে। চিন্তার মোড় ফেরাবার জন্য নিজের সোফা-সেট সজ্জিত ঘরের কথা আবার চিন্তা করতে চাইল। ছুটির দিনে সকালে রমা ঐ ঘরেই আগে আগে যেত। এখন কেউ না এলে আর ঐ ঘরে যাওয়াই হয়ে ওঠে না। মা কিন্তু রোজ ঘরটি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে আর বলে, সখ করে ঘর সাজানো হয়েছিল—সখ তো দুদিনেই মিটে গেছে—এখন আমার হয়েছে শাস্তি। এদের সখ হল আমার শাস্তি। গম্ভীরভাবে কল্যাণকে আসতে দেখে রমা উঠে দাঁড়ায়। ভ্যানিটি ব্যাগ হাতে নিয়ে বের হয়। এরই মধ্যে কল্যাণ যে গোপনে ওর সোয়েটার একবার দেখে নিয়েছে তা বুঝতে পেরেও বুঝতে দেয় না। খুশি হয়। ইচ্ছে হয়, মার কথা বলে। ইচ্ছে হয় বলে, বাবা আর্টিস্ট—মা সুন্দরী কিন্তু বাবা জীবনে স্বীকৃতি না পাওয়ার জন্যে না পেল স্বাচ্ছন্দ্য, না জুটল সাচ্ছল্য, না এল শান্তি। অমন ভাই অবন—তাকেও অকালে চলে যেতে হল। নইলে রঙ মেখে আজ বারোয়ারী হাসি হেসে ওকে অর্থউপার্জন করতে হত না। হয়ত অধ্যাপিকা হয়ে যেত এতদিনে। কিন্তু নিজের জীবনের বেদনার অংশ রমা কাউকে দিতে পারেনি। ছেলেবেলা থেকে কেউ ওর বন্ধু হয়নি। বড়লোকের মেয়েদের সাজসজ্জা আর গরিব ঘরের মেয়েদের তা দেখে মুগ্ধভাব—দুই ওকে পীড়া দিয়েছে—দুজনকেই অবিশ্বাস করেছে। নিজের ফ্রক, শাড়ীর হীনতা, নিজেদের অবস্থা সম্পর্কে সচেতনতা ওকে একদিকে যেমন কঠোর ও দৃঢ়সঙ্কল্প করে ওদের অগ্রাহ্য করবার শক্তি দিয়েছিল তেমনি ওকে শুধু নিঃসঙ্গই করেনি—কেমন ওর ধারণা হয়ে গেছে, দুনিয়ার কেউ বন্ধু হয় না। অথচ একজন দরদী বন্ধু—মেয়ে বন্ধু ও স্কুলজীবনে এমনকী কলেজ জীবনেও কত কাম্যই না ছিল। অন্তত একজন সখীর কাছে অন্তরের কথা বলবার কত আগ্রহই না ছিল। বাস্তব ক্ষেত্রে কোন মেয়েকেই দু'একদিন মেলামেশার পর আর অন্তরঙ্গ করে নিতে ইচ্ছে হয়নি। কেউ ওর প্রাচীর ভাঙতেও পারেনি। অন্তরঙ্গ হবার একান্ত আগ্রহ নিয়ে কিশোর ও যৌবনের প্রথমভাগ ওর নিঃসঙ্গ কেটেছে। আজ কল্যাণ এসেছে। কিন্তু কল্যাণ ওকে সামনে রেখে মুগ্ধ হয়ে ওর দিকে তাকিয়ে নিজের মুখে মুখে চতুর কথা বানাতে ভালবাসে। নিজেই চতুর কথা বলে রমাকে মুগ্ধ করে রমাকে দেখবার মুগ্ধতাকে যেন ফেরত দিতে চায়। রমা মুগ্ধ হয় না—সরল চমকে খুশি হয়। বরং ওর মুগ্ধ চাহনি ওর বুদ্ধিমান জিভে চেয়ে অনেক বেশি রমার মধ্যে আলোড়ন আনে। কল্যাণ শোনবার চেয়ে নিজে কথা বলতে ভালবাসে। বলেও বেশ। তাই ওর রমাকে নিয়ে যত আকর্ষণ—তত রমা সম্পর্কে কৌতূহলি নয়। রমা সম্বন্ধে খোঁজ-খবরে কোনও উৎসাহ দেখায়নি। হয়ত রমা নিজে না বললেও কৌতূহল দেখানো অশোভন এই ছুতো দিয়ে কল্যাণ নিজে রমা সম্বন্ধে কৌতূহলহীনতাকে গোপন করতে চায়। ভদ্রতাবোধের মামুলি সুযোগ নিয়ে নিজের আগ্রহহীনতাকে ঢাকতে চায়। হয়ত কল্যাণ যে অনাগ্রহী

একথা কল্যাণ নিজেও জানে না। তার স্বভাব এই। আসলে মানুষটি নিজেকে ভালবাসে—রমার একথা বারবার মনে হয়। রমার বাবা মা, ওর বাল্যজীবন, ওর ঘরের জীবন—ও কী হতে চেয়েছিল, কী হতে চায়, কী কতদূর হওয়া সম্ভব—এসব সম্পর্কে কোন খোঁজখবর বা কৌতূহল কল্যাণ দেখায়নি। রমা অনুমান করতে পারে, এ সম্পর্কে যদি যেচেও রমা কিছু বলতে চায়—তখন কল্যাণ হয় সাড়ম্বরে শোনাবার ভান করবে, নয়ত এমন নীরব হয়ে শুনতে থাকবে—সে নীরবতার মধ্যে হয় কল্যাণের অন্যমনস্কতা ফুটে উঠবে, নয় এই নীরবতাকে মেনে নিয়ে কল্যাণ যে একটা শাস্তিকে মেনে নিচ্ছে—সেই শাস্তির চেহারা কল্যাণের মধ্যে অচিরেই প্রকাশ্য হয়ে উঠবে। আর নিজে যেচে তো কিছুই বলবে না। বরং নিজের সম্পর্কে কল্যাণ আগ্রহ যদি দেখাত তবে রমা খুশি হলেও—সেই খুশির ঝলকে কিছু বলত কী না সন্দেহ। কারণ নিজের বাড়ি সম্পর্কে কিছু বলা মানেই কল্যাণ যে অন্তরঙ্গ তা প্রকাশ্যে স্বীকার করে ফেলা—সেই স্বীকারের মধ্যেও একটা প্রতিশ্রুতি, একটা কমিন্টমেন্ট, একটা ইনভলভ্মেন্ট আছে বলে রমা মনে করে। তাই বাবা-মার কথা বলতে চাইলেও বলত কী না সন্দেহ। তাছাড়া কল্যাণকে বাবা-মার কথা, নিজের সংসারের কথা জানানো মানেই কল্যাণকে একদিন ওদের বাসায় আসতে বলা। ওদের বাসার বাইরে ইট পাঁজর বার করা দরিদ্র চেহারা, ওর মার উগ্রমূর্তি, হয়তো যাওয়া মাত্রই কল্যাণের সামনেই ঝগড়া বেধে গেল, কী দুচারদিন যাতায়াতের পর একদিন কল্যাণের সামনেই কুরুক্ষেত্র তারপর পার্কে মার মহাপ্রস্থান, ছিঃ কী ভাবছি, মহাপ্রস্থান—মানে মার পার্কে যাওয়া—তাহলে কল্যাণ কী যা তা ভাববে? আর কল্যাণকে দেখলে যদি মা ভাবতে আরম্ভ করে তাহলে রমা 'পেরেম' করছে ডুবে ডুবে। বাবা-মা-ওর নিজের কথা কেউ কোনদিন শুনতে চায়নি—আজও কল্যাণ চায় না—চাইলেও ওকে নিজের ঘরে নিয়ে যাওয়ার—অন্তরঙ্গ হলে নিতেই হয়—উপায় নেই। কল্যাণের গম্ভীর মুখের দিকে তাকিয়ে আজ নিজের মার সোয়েটার বোনার সূত্র ধরে বাবা আর্টিস্ট বলবার আকাঙ্ক্ষাটি গোপন করল। কেউ ওদের কথা জানতে চায় না—আর চাইলেও বলবার উপায় নেই। বললেও বাসায় নিয়ে যাওয়ার উপায় নেই। অথচ বাবার ছবি, মার চেহারা অহঙ্কার করে দেখাবার মতো। সেই প্রসঙ্গে রমারও কত মর্যাদা বাড়ে। তা কী কেউ বোঝে না বুঝতে চায়। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস গোপন করে রমা কল্যাণের সঙ্গে চলতে থাকে। আসলে নিজের কথা অপরের কাছে বলতে পারবে না এই উদার দুঃখকে মন থেকে এক মুহূর্তে রমা যেতে দিতে চায় না। কল্যাণের সামনে রাগ না করবার জন্য মনকে এই উদার দুঃখে একটু সাঁতার কাটতে দিয়ে আটকে রাখতে চায়।

আজ মিসেস এসছিল না? রমা সহজ ভাষায় জিজ্ঞেস করে। নিজের পূর্ণ রাগ নতুন শাস্তি কোনটার দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে রমা যেন নিজের কাছে নিজের নতুন পরিচয় প্রতিষ্ঠা করতে চায়। রাগ ক্ষোভ, শাস্তি কোন কিছুর 'পর মনোযোগ দেয় না—দিতে সাহসও হয় না—চোখ বুজে নিজের এতক্ষণের চেহারা এতকালের রূপকে যেন চিনতে চায় না—ভরসা পায় না। কিন্তু কল্যাণকে গম্ভীর দেখে ওর ভয় হতে থাকে। কতক্ষণ পর্যন্ত নিজের মনের মধ্যে নিজেকে ঢুকতে না দিয়ে রাখতে পারবে—সেই ভয় হতে

থাকে। কল্যাণ আর একবার ওর গলাকাটা ব্লাউজ দেখতে গিয়ে সোয়েটার দেখল। এই দেখাকে দেখে একটু আশ্বস্ত হয়ে ওর শান্ত থাকবার জেদে এবং নিজের বিরক্তির বিরুদ্ধে নিজেকে অপমান করবার জন্য আবার জিজ্ঞাসা করে—ঠান্ডা পড়েছে—দেখে এই ফুলহাতা সোয়েটারটা আজ নিয়ে এলেম—বেমানান লাগছে? তারপর, মিসেসকে তো দেখলাম। রমা বুঝতে পারছিল, ওর এই কষ্ট করে উপার্জন করা শান্ত ভাবকে কল্যাণ কীভাবে নিচ্ছে। ওর এই শান্ত ভাবের মধ্যে দিয়ে এক ধরণের প্রশ্রয় কল্যাণকে অনিচ্ছা সত্ত্বেও দিয়ে দেওয়া হচ্ছে। ওর এই নিজের যেচে কথা বলাকে—এই অল্পস্বল্প প্রলভতাকে কল্যাণ রমার সহজ ব্যবহার না ভেবে সস্তা ব্যবহার ভাবতে পারে। তাছাড়া নিজের স্বভাববিরুদ্ধ আগ্রহ প্রকাশ ও অল্পস্বল্প প্রলভতাকে হয়ত কল্যাণ ভাবতে পারে, এই হচ্ছে রমার আসল রূপ। ওর মর্যাদা গাম্ভীর্য হচ্ছে ওর ছদ্মবেশ। তাছাড়া কল্যাণের এই গাম্ভীর্যকে যেন ঠিক অভিমান হিসেবে নিতে রমার কষ্ট হচ্ছিল। যেন এতকালের সহজ ব্যবহার হচ্ছে কল্যাণের কনসেশন—আর আজ গম্ভীর হয়ে কল্যাণ স্বরূপে ফিরে এসেছে—আর রমার সহজ ব্যবহার তথা সস্তা ব্যবহারই হচ্ছে রমার আসল ব্যবহার। নিজের গায়ে পড়ে কথাকে একটু হ্যাংলামি বলে নিজের কাছে মনে হচ্ছিল। ওর মনে হচ্ছিল, সহজভাবে জিজ্ঞাসার মধ্য দিয়ে রীনা-কল্যাণ সম্পর্কে ওর যে কোন কৌতূহল নেই, আড়ষ্টতা নেই, ঝাঁঝ নেই—একথা বোঝাতে চেয়েছে। সঙ্গে কণ্ঠ একটু বিদ্রূপ করল। কিন্তু তা বোধ হয়নি। উল্টে একটা হ্যাংলামো, একটা গায়ে পড়া ভাব দেখিয়ে কল্যাণকে বড় বেশি মূল্য দেওয়া হচ্ছে। ওর গাম্ভীর্যের সামনে সহজ কণ্ঠে কথা বলে অস্বীকার করবার তাৎপর্য বুঝতে কল্যাণ নারাজ। বরং গম্ভীর হওয়ার সময় সহজভাবে কথা বললে পেয়ে বসে দেখছি—ভাববে গম্ভীর হয়ে না জানি কী হয়ে গেছি। কল্যাণের গাম্ভীর্যের মধ্যে একটা তাচ্ছিল্যের ভাব অনুভব করে রমা রীতিমত উষ্ণ হয়ে ওঠে। ইতিমধ্যে রাস্তায় বের হয়ে দেখল শীত তো করছেই না, বরং আশেপাশের কোনও মেয়ের গায়ে গরম জামা নেই। নতুন কোনও সুন্দর সোয়েটার পরবার আগ্রহে ভাল করে শীত পরবার আগেই পরে ফেলেছে—এখন খুলে ফেলাটাও একটা পরাজয়, একটা বিশ্রী ব্যাপার—না খুলে থাকা আর কঠিন। সকলেই সোয়েটারের দিকে তাকাচ্ছে, তাকাবে। ঠিক এই সময়ে যখন দেখল, ট্রাম বন্ধ—বাসে ওঠা অসম্ভব—ওদিকে আর একজন মাতব্বরি দেখাচ্ছে—যার জন্যে শর্টহ্যান্ড ক্লাসে যাওয়া হয় না—টিউটোরিয়াল ক্লাসে আজ যাওয়া হবে না—আমার শনি এসেছে কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে। হয়তো মনে হল—হয়তো রীনার কাছে কোন প্রতিশ্রুতি দিয়েছে—হঠাৎ নিজের মনে মনে ঠিক করেছে এখন থেকে রীনার 'পর পূর্ণ মনযোগ দেবে। রমার শর্টহ্যান্ড, টিউটোরিয়ালের ক্লাস নষ্ট করে, মনে শান্তি নষ্ট করে—অযথা এতদিন ভুলিয়ে এখন স্ত্রীকে নিয়ে ভাল হওয়ার চেষ্টা করছে—হয়তো সেই কথা বলবার জন্যই আজ এত গম্ভীর। একটা অদম্য রাগে রমার গলা শুকিয়ে যায়। অন্যমনস্কভাবে তাকিয়ে দেখে একটা বাসের পেছনে কাতারে কাতারে লোক অযথা দৌড়াচ্ছে। মনে পড়ল বাসায় পৌঁছতে দেরি হলে—টিউটোরিয়ালে না গেলে—মার গনগন করা—হয়তো ঝগড়া করে পার্কেও চলে যেতে পারে। নিজে খেতে পরতে দেয় বলে মাকে কিছু বলতে পারে না। মা-বাবাকে খেতে

পরতে দিয়ে মা-বাবাকে ন্যায্য কথা বলবার স্বাধীনতা চলে গেছে। কল্যাণ হয়তো বলবে, আমরা দুজন এখন সাধারণ বন্ধুর মতো থাকব। রমা রাগে ও ক্ষোভে ঠিক করে ফেলে, আগেও তো আমি ঠিক করেছি সম্বন্ধ ছেদ করে দেব। সুতরাং কল্যাণকে কিছু বলতে দেওয়ার আগেই ওকে একটু কড়া করে জানিয়ে দিতে হবে—এভাবে মেলামেশা করা রমার সহ্য হচ্ছে না। তাই রমা একে একে জানাল—ওর অনেক কাজ নষ্ট হল—আর কোনদিন ও এভাবে দেরি করা সহ্য হবে না—যা শুনবার ফোনেই শুনব অর্থাৎ অফিসিয়াল রিলেশন ছাড়া কোন রিলেশন নেই—কল্যাণের কোনও বিবেচনা নেই—শেষে জানাল—একাই যেতে পারব। পৌঁছে দিতে চাইলেও তার উপকার আমি নিতে চাইব কেন? আমার ভদ্রতাবোধকে কেউ যেন সস্তা মেয়ের কৃতার্থবোধ মনে না করে। আর শেষে মরিয়া হয়ে কল্যাণকে চেপে ধরে—কিন্তু যেজন্যে আমার কাজ নষ্ট হল কীজন্যে আমাকে এখানে ডাকা হল তা আমি জানতে চাই। ঝগড়া সম্পর্কে রমার ধারণা ছিল—যে ধারণা মূলত ওর বাবা-মার কাছ থেকে পাওয়া—কেউ কিছু বললে আঘাত দিলে তার দুইগুণ বেশি আঘাত দিয়ে তা ফিরিয়ে দিতে হয়। ঝগড়ায় হারতে নেই—পরাজয় মানতে নেই—ঝগড়ার সময় যতদূর সম্ভব কড়া কড়া কথা বলে আঘাত দিতে হয়—নির্দয় নিষ্ঠুরভাবে কঠোর কথাকে ফিরিয়ে দিতে হয়। ঝগড়ার সময় যে যত নিষ্ঠুর কঠোর হতে পারে তারই হয় জিত। কিন্তু রমার কথায় তো কোন উত্তর কল্যান দিতে পারল না আর কল্যাণের মুখখানা ব্যথায় ভরে গেল। যেন একটা তীব্র বেদনা কল্যাণের সমস্ত মুখখানা নীরব যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে উঠল। এমনকী কল্যাণের কথা বলতেও কষ্ট হচ্ছিল—ওর বুক যেন বেদনার বোঝায় নির্বাক হয়ে গেছে। কল্যাণের ব্যথিত চোখ, শুকনো ঠোঁট ও আর্ত মুখ মুহূর্তে রমার মন সহানুভূতি ও অনুশোচনায় ভরে উঠল। রমার বিবেচনায় রমা সামান্যই আঘাত দিয়েছিল। কিন্তু এতক্ষণে ওর আঘাত যে একটা কোমল মনে কি বেদনা জাগাতে পারে তা বুঝল। সঙ্গে সঙ্গে বুঝল ঝগড়ার পরিবেশ থেকে রমা ভুলে গেছে, কঠোর কথা শুধু ক্রোধেরই সৃষ্টি করে না, গভীর বেদনাও সৃষ্টি করে। মা-বাবাকে ঝগড়ার সময় ঠিক বেদনাবোধ করতে দেখেনি—বরং কড়া কথা, বিশ্রী কথার প্রতিযোগিতা করতে ক্ষিপ্ত হতে দেখেছে। মা'র কাছ থেকে আঘাত পেয়ে রমা কেঁদেছে—নিজের চেহরার নিন্দে শুনেও কেঁদেছে কিন্তু সেই কান্নার মধ্যে বেদনার চেয়ে ক্ষোভ বেশি ছিল—নিজের ভাগ্যের জন্যে হতাশা অনেক ছিল—কিন্তু, এমন কোমল স্বভাব ওর কবে যে নষ্ট হয়ে গেছে তা টেরও পায়নি। কেবল ছেলেবেলায় স্কুলের একটা মেয়েকে সামান্য একটা কথা বলতেই মেয়েটির চোখে জল ভরে উঠেছিল। অত সামান্য গালিতে যে কেউ কাঁদতে পারে তা রমার ধারণাই ছিল না। মনে মনে আশ্চর্য হলেও, মুখে বলেছিল, আহ্লাদী। আজ কিন্তু লজ্জা পেয়ে বুঝল, কল্যাণের মন ওর চেয়ে অনেক বেশি নরম, কোমল, ওর চোখ দুটো আঘাতের বেদনা ও বিস্ময়কে যেভাবে প্রকাশ করছিল তাও কোন কৃত্রিমতা ছিল না। রমা লজ্জা পেয়েছিল ঠিকই কিন্তু কল্যাণের বেদনা ওর এক আশ্চর্য মমতায় ও সহনাভূতিতে, নিজের ব্যবহারের অনুতাপ ওকে অস্থির উদ্বেল করে তুলল। কল্যাণ যখন বলল, কাউকে গালাগাল দিতে ও পারে না—কারণ, সেই শিক্ষা ওর নেই। তখন একথার মধ্যে যে

প্রচ্ছন্ন আঘাত ছিল—তাতে রমা রাগও করল না, লজ্জাও পেল না, মনে মনে এই আঘাতটি ওর ন্যায্য প্রাপ্ত বলে স্বীকার করে নিল। কল্যাণ রাগ করে ওকে আঘাত দিলে হয়তো রমা এমন বিচলিত হত না—ক্রুদ্ধ হয়তো হত। কিন্তু এমনভাবে আঘাত পেয়ে কল্যাণ যেন রমাকে অনুতাপে ও স্নেহে ব্যাকুল করে তুলল। যখন কল্যাণ পনেরো টাকা দিয়ে প্রাইভেট একটা মোটর ভাড়া করল ওকে পৌঁছে দেবার জন্যে—তখন রমার রীতিমতো নিজেকে অপরাধী মনে হতে লাগল—ওর 'পর রাগ করেই যে কল্যাণ এই টাকাটা ব্যয় করল—তা বুঝতে রমার কোনও কষ্ট হচ্ছিল না। কিন্তু এটুকু পথের জন্যে পনেরো টাকা—টাকাটার জন্যে রমার মন খচ খচ করতে লাগল। আর কিছুটা দেরি করলেই ভীড় হালকা হত—তখন কটা পয়সাতেই......। কল্যাণকে প্রসন্ন করবার জন্যে রমা ব্যকুল হয়ে ওঠে—অবশ্য ওর জন্যে রাগের মাথায় খরচ করবার চেয়ে কল্যাণ ওর ব্যবহারে যে বেদনা পেয়েছে সেই বেদনাতেই কল্যাণের গা ঘেঁষে বসে। গা ঘেঁষে বসবার কোন সাড়া কল্যাণ দেয় না। আড়ষ্ট হয়ে—একবারও রমার দিকে না তাকিয়ে—শক্ত হয়ে ড্রাইভারের কথা শুনবার ভান করে। হঠাৎ ড্রাইভারের দিকে দারুণ মনোযোগী হয়ে ওঠে দেখে রমার হাসি পায়। ওর ড্রাইভারের 'পর মনোযোগের ভানটি যেন আরো গা ঘেষে আরো কাছ থেকে রমা দেখতে থাকে। বার বার পরিষ্কারভাবে কল্যাণের দিকে তাকালে কল্যাণ বুঝতে পেরেও যে সাড়া দেবে না ঠিক করেছিল তা রমার বুঝতে অসুবিধা হয় না।

কল্যাণের সঙ্গে আজ সম্পর্ক ছেদ করে দেবে—আজই শেষ মেলামেশা আবার কল্যাণকে কড়া কথা বলে ওর সঙ্গে ভাব করবার ব্যাকুলতা অর্থাৎ ব্যাকুলতা প্রায়ই হ্যাংলামিতে পর্যবসিত, এইসব পরস্পর বিরোধী চিন্তাগুলো কিছুই আজ রমার কাছে আমল পেল না। কী করে নিজের ব্যবহারগুলোর মধ্যে সামঞ্জস্য ও বোঝাপড়া করবে—করতে না পারলে ছোট হয়ে যাবে কী না এই সব দুশ্চিন্তাকে যে রমা সহজে দুরে রাখল তাই নয়—কাছেই ঘেঁষতে দিল না। এক একবার মনে পড়ল এই রকমভাবে ব্যথা পেয়ে কল্যাণ চলে গেলে সারা রাত ধরে ওকে কাঁদতে হবে—কষ্ট পেতে হবে—এমনকী নিজের মানসিক শান্তির জন্যেও কল্যাণের সঙ্গে মিটমাট একান্ত দরকার—নিজেকে যন্ত্রণা থেকে রক্ষা করবার জন্যেই কল্যাণের প্রসন্নতা প্রয়োজন—তবু এই চিন্তাও এর চেতনাকে সম্পূর্ণভাবে অধিকার করল না—এমনকী এই কথা মনে করে কল্যাণের সঙ্গে ভাব করবার আকাঙ্ক্ষাকে যুক্তি দিয়ে সমর্থন করবার কোন চেষ্টাই করল না। ওর মনে শুধু একই চিন্তা : কী করে কল্যাণকে প্রসন্ন করব। নিজের মনের এই অচেনা চেহারাটির সঙ্গে রমার কোনও পরিচয়ই ছিল না—তবুও এই অজানা চেহারাটি এত অন্তরের, এত আপন বলে মনে হল—এ যে অজানা—নিজের এই চেহারা যে ওর রোজকার চেহারা চেয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের সেই কথাও মনে এল না। রমা যেন নিজের অজান্তেই অন্য রমা হয়ে গেছে। ড্রাইভারের সামনেই এরকম জোর করে কল্যাণকে নামাল, খপ করে কল্যাণের হাত থেকে মানিব্যাগ কেড়ে নিয়ে এবং শেষে নিজের চোখের জল গোপন করে বলল, যদি রমার গালাগালির উত্তরে কল্যাণ জুতো মারতে চায়—তবে রমা গাল পেতে দেবে। এই কথা বলবার সময় রমার যে কান্না এসে গিয়েছিল তা কল্যাণ তো

বুঝতেও পারল না, বরং নিজের উচ্ছল ব্যবহারে নিজের গলাও যেন তা টের পেল না। আত্মমর্যাদা বিসর্জন দিয়ে কল্যাণের সঙ্গে ভাব করবার হ্যাংলামির জন্যে নিজেকে ধিক্কার, কল্যাণের কাছে আত্মসমর্পণের অশ্রু সজল সুখ, নিজের অপরিচিত উচ্ছল ব্যবহারের জন্যে এতদিনকার গম্ভীর স্বভাবের 'পর পীড়ন—কল্যাণকে সহজে প্রসন্ন করবার ফলে কল্যাণকে প্রসন্নত করা এমন কিছু নয় যার জন্যে এত ভেবেছিলাম, কল্যাণ আবার পুরনো পরিচিত হয়ে আসতেই নিজের এই মুহূর্তের চপল স্বভাবই যেন বিদায় নিয়ে পুরানো পরিচিত গম্ভীর স্বভাবকে জায়গা ছেড়ে দিতে চাচ্ছিল—নিজের এই ক্ষণিকের অতিথি মোহময় চপলস্বভাবকে বিদায় দিতে বেদনাবোধ—বাসায় কল্যাণকে নিয়ে ঢুকবার জন্যে একটি আকার প্রকারহীন দুশ্চিন্তার ঢেউ—সব মিলে-মিশে চেতনায় অশ্রুসজল আবেগ এনে দিয়েছিল—তাকে রমা অস্বীকার করতে না পারলেও—সেই দিকে মনোযোগ দিল না। কল্যাণকে নিয়ে বাসার দরজার কাছে দাড়ায়।

অত্যন্ত অনুরাগেও রমা ফিস ফিস করে: যে রাতে মোর দুয়ারখানি ভাঙল ঝড়ে। নিজের এই উচ্ছলতাকে রমা যেতে দেবে না। যেতে দিতে পারে না। অথচ চৌকাঠে পা দিলেই নিজের এই চেহারার ফেয়ারওয়েল দিতে হবে।

কল্যাণ যেন ওর ফ্যাকাসে হাসি ঝেড়ে ফেলে দিয়ে পুরানো উচ্ছল হাসি হাসতে চাইল। হাসির প্রথম দিকটা ছিল বিষন্ন, শেষ দিকটা উজ্জ্বল প্রসন্ন।

রমা একটু আগের অনুরাগের স্রোতের আরেক বাঁকে এসে জানাল—আজকের ব্যবহার তুমি কোনওদিন ভুলবে না তাই না? বলে মৃদুভাবে কল্যাণের হাত স্পর্শ করে।

উজ্জ্বল মুখে কল্যান জানায়—প্রথমাকে ভুলে যাব—দ্বিতীয়া অন্তরে থাকবে।

রমা দরজা খটখট করে। ঐ দরজা খটখট শব্দের মধ্যেই কল্যাণ বলে.... ঝড়ের রাতেই এলাম—ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার.... যে ঝড়ে হাল ভেঙে নাবিক হারায়েছে দিশা—সবুজ ঘাসের দেশ যখন সে চোখে দেখে....।

রমা হাত দিয়ে কল্যাণের মুখ চেপে ধরে।

ভেতর থেকে খিল খোলবার শব্দ হতেই রমা হাত নামিয়ে দেয়।

রমা ও কল্যাণ দু'জনেরই দেহ ও মন যেন হাল্কা হয়ে যায়। কল্যানের ইচ্ছে হয় বলে, আমরা দু জনেই এস্ট্রনাট—এইমাত্র মাদার স্যাটেলাইট থেকে ছোট্ট যন্ত্রযানে চড়ে পা দিয়েছি চাঁদের একদিকে। টেলিভিশনের কানেকশন গেছে ছিন্ন হয়ে। জগৎ আমাদের জন্যে উদ্বিগ্ন, দুশ্চিন্তিত, অথচ আমরা দু'জনে একা—অজানা উপগ্রহে। এই উপগ্রহ আমার দেশ—তোমার দেশ। আমার মনে হয়—দুজনেই আমরা উপগ্রহবাসী—তোমার জীবনে উপগ্রহ আমি—আমার জীবনে তুমি।

রমা তেমনি অনুরাগে—স্নিগ্ধ কণ্ঠে ফিস ফিস করে—এক মিনিট, ভেতরটা দেখে আসি—সব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন আছে কিনা—একটু, কেমন?

কল্যাণ স্মিতভাবে মাথা নাড়ে।

এক মিনিট না যেতেই কল্যাণকে ভিতরে নিয়ে যায় রমা। ভিতরে ঢোকবার সময় বাড়ি ঘরের দীনদশা কিছুই ওর চোখে ধরা পড়ে না—হয়তো অবচেতন মন সঙ্কুচিত হয়—কল্যাণ তা টের পায় না। রমার অনুরাগ স্নিগ্ধ দৃষ্টি যেন ওর চোখের 'পর রঙিন

চশমার মতো আটকে রয়েছে। রমার স্নিগ্ধ দৃষ্টি চোখের সামনে ভাসছে না—সেই দৃষ্টির মধ্য দিয়ে যেন কল্যাণ সবকিছু দেখতে পাচ্ছিল। ওদিকে এ্যাস্ট্রনাটের উদাহরণটিও আত্মপ্রকাশের জন্যে উন্মুখ হয়ে আছে। কল্যাণ ভেতরে এসে সেই সাজানো ঘরটিতে বসল। নিজের মনেই একটা ভাবনা রমা অনায়াসে ভাবল : আজ আমার ঘর সাজানো সার্থক।

না, নিজের উচ্ছল ব্যবহার যত অগভীর ও হাল্কা ভেবেছিল—এর উৎস তত কাছে নয়। নিজের উচ্ছলতা যত সহজে চলে যাবে মনে হয়েছিল—ঠিক ততক্ষণ ক্ষণস্থায়ী ছিল না। কল্যাণকে ঘরে বসিয়ে ওর বাবার আঁকা ক'টি ছবির দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল—তুমি একটু বসে বা দাঁড়িয়ে—অ্যাট ইওর প্লেজার—এই ছবি ক'টা দেখ—তারপর তোমার একটা অদ্ভুত গল্প শোনাব। আজকে না হয় মিসেসকে একটু দেরিতেই দেখবে—বলবে, সন্ধ্যায় অফিস ফেরত দেখবার অ্যাডভান্স কপি তো অফিসেই দেখেছি, আমি ততক্ষণে মা'কে ডেকে আনি।

—কিন্তু তোমার গল্পের একটা অ্যাব্‌স্ট্রাক্‌ট আগে দিলে হতো না? অতিথি সৎকারের ত্রুটি রেখো না।

—যে ঝড়ের রাতে, দুয়ার ভেঙে এসেছে—তাকে অ্যাবস্ট্রাক্ট নিশ্চয়ই দেবো—যে গল্পটি বলবো—তা বলতে না পারবার জন্যে একটা মহৎ অথচ ব্যর্থ জীবন কাহিনীর অ্যাব্‌স্ট্রাক্‌টই হবে। তা হবে শোকসাগরের আলুনা ও অক্ষম সারাংশ।

কল্যাণ একটু আশ্চর্য হয়ে ছবি কটাকে আবার দেখতে থাকে। উঠে দাঁড়িয়ে কাছে গিয়ে ছবির মধ্যে কোন তাৎপর্য খুঁজতে চায়।

ঠিক আছে, তোমার অতিথি আমি। আর গোড়াতেই তুমি ছবি কটা আমাকে দেখতে বলেছ আর ছবির 'পর গল্প বলবে বলেছ। মনে রেখ, দেখা আর শোনা আমার প্রোগ্রাম। নিশ্চয়ই ছবির তাৎপর্য জিজ্ঞেস করে বিশেষ করে মর্ডান আর্টের—অ্যাবস্ট্রাক্‌ট আর্ট তো আছেই—অতিথির বিদ্যেবুদ্ধি....।

—ছবি ক'টি দেখ। —ছবি ক'টি একটা গল্পের ভূমিকা। এই ছবি কটার মলাটে জীবনটি মোড়া। রমা বের হয়ে যায়।

কল্যাণ ছবি কটি দেখবার চেষ্টা করে ভান করে। চুপ করে ছবির দিকে তাকিয়ে থাকে। যাতে রমা এসেও দেখতে পায়—ওর নির্দেশমতো কল্যাণ ছবি দেখে চলেছে। এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকা ঠিক নয়। কল্যাণ আরেকটা ছবির কাছে এসে দাঁড়ায়। ইচ্ছে হয় বলে, আমি যে নিতান্ত শিশু—ছবি দেখিয়ে গল্প বলে তুমি তা অনায়াসে প্রমাণ করতে পারবে। কিন্তু ঢুকবামাত্র ছবি দেখবে ও রমা গল্প বলবে এই প্রতিশ্রুতি পেতে ওর একটা ভিতরকার আপত্তি ছিল। আজ এমন দিনে নিজেরা বসে বসে গল্প করবে—কল্যাণ বলবে—রমা শুনবে—রমা বলবে—কল্যাণ জবাব দেবে—বসে বসে একটা কাহিনী শোনা অন্তত আজকের দিনে এই মুহূর্তে। তবু রমা অনেকক্ষণ ধরে বলবে—ওকে এই অনেকক্ষণ ধরে দেখতে পাবে এই লোভই কল্যাণের একমাত্র ভরসাস্থল। আর গল্প শুনে রমার সান্নিধ্য বা হয়ত রমার অনেক কাছে আসা যাবে—এই বাই প্রডাক্‌টগেইনও যেন কল্যাণের সান্ত্বনার বিষয়। ছবিগুলোর দিকে মনোযোগ দেবার ব্যর্থ

চেষ্টা করে শেষে ছবি দেখবার ভান করতে থাকে। রমার দেরী দেখে অস্থির হয়। কিন্তু ছবির দিক থেকে চোখ ফেরাতে সাহস হয় না—পাছে দরজার দিকে তাকালে রমা এসে দেখতে পায়—ছবি না দেখে দরজার দিকে তাকিয়ে ওর অপেক্ষা করছে। এটুকু কেমন করে কল্যাণ বুঝেছিল—ছবি দেখে ওকে মুগ্ধ হতে হচ্ছে। যেমন রীনা মাঝে মধ্যে ভজন বা রাগপ্রধান বা খেয়াল রেওয়াজ করলে একটুকুও না শুনে রীনা কাছে আসামাত্র তক্ষুনি এতক্ষণ ধরে মুগ্ধ হয়ে শুনছিল তার ভান করতে হয়। এখানেও তাই করতে হয়। একজনের কাছে গানের অত্যাচার—একজনের কাছে ছবির উপদ্রব। কল্যাণের ধারণা হল—এ ছবিগুলো হয়তো রমারই আঁকা। রমা আর্টিস্ট হতে গিয়ে রিসেপশনিস্ট হয়েছে সেই ব্যর্থতার কাহিনীটি হয়ত শোনাবে। তবু, ছবিগুলোর দিকে তাকিয়ে প্রথমে ওর ধারণা হয়েছিল—এগুলো বুঝি বাজার থেকে কেনা। অক্শনে এমন ছবি বিক্রি হতে কল্যাণ দেখেছে। যাই হোক, রমা ভাল ছবি আঁকে একথা চিন্তা করে কল্যাণের কেমন অস্বস্তি বোধ হয়। কল্যাণের চেয়ে রমা যে শ্রেষ্ঠ যেন এই ছবিগুলোর মধ্য দিয়ে তাই প্রমাণিত। একটা হীনতাবোধ সূক্ষ্মভাবে কল্যাণের মধ্যে কেমন একটা নীরসতা এনে দেয়। ওর ধারণা, রূপে যেমন শ্রেষ্ঠ, তেমনি গুণেও কল্যাণ শ্রেষ্ঠ। কিন্তু দেখা যাচ্ছে রমা বোধহয় ওকে ছাড়িয়ে গেল। হ্যাঁ, রীনা অবশ্য গান করে। গান তো সব মেয়েই করে। কোন মেয়ে গান জানে শুনলে তাঁর গুণ কিছু বাড়ে না। কিন্তু ছবি আঁকা—এ যে পজিটিভলি একটা দুর্লভ গুণ—গানের মত একান্ত সুলভ নয়। রমা গুণে শ্রেষ্ঠ—একথা ভাবতে কল্যাণের ভালো লাগে না। কখন রমা আসবে কে জানে—অথচ দরজার দিকে তাকাতে সাহস হয় না।

রমা ঠিক তেমনি মধুর ও প্রগলভভাবে মাকে বলে, মা, এসো, তোমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দি। আমাদের অফিসের একজন অফিসার। ট্রাম-বাস সব বন্ধ—পনেরো টাকা দিয়ে একটা মোটর ভাড়া করে আমাকে পৌঁছে দিলেন। ভবানীপুর থাকেন—স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই চাকরি করেন। অবস্থা খু-উ-ব ভাল। তোমাদের চ্যাটার্জি।

ব্রাহ্মণ শুনলেই রমার মা চঞ্চল হয়ে ওঠেন। বাপের বাড়ি চ্যাটার্জি। চ্যাটার্জি পদের 'পর তার বিশেষ পক্ষপাত। ব্রাহ্মণ দেখলে বা শুনলেই মনে হয়, আজ তিনি জাতিচ্যুত—জীবনেও আর ব্রাহ্মণ হতে পারবেন না। একদিকে ব্রাহ্মণদের কাছে তিনি নিজে যে ব্রাহ্মণ ছিলেন তা জানাবার ব্যাকুল ইচ্ছে—তাদের সংস্পর্শে এলে যে তিনি একটা আত্মীয়তাবোধ করে সেই চাঞ্চল্য জানাবার একটা খিদে অথচ তা কোনমতে বলবার উপায় নেই জেনে নিরুপায় ক্ষোভ, অসহায় একাকীত্ব। রমা তাকে যে একে একে পরোক্ষে জানাল, যাকে নিয়ে এসেছে সে পুরুষ হলেও বিবাহিত—পনেরো টাকা দিয়ে মোটর করে পৌঁছে দিয়ে গেছে—বিবাহিত লোক—ভয়ের কিছু নেই—তদুপরি চ্যাটার্জি। কিন্তু রমার বলবার মধ্যে যে উচ্ছলতা ও সজীবতা ছিল যা সদা গম্ভীর রমার আচরণের মধ্যে কখনোই দেখতে পাওয়া যায় না—তা যে বেমানান লাগছিল একথা বুঝেও তা এড়াবার শক্তি রমার ছিল না। রমা যেন খুশির তোড়ে মাকেও ভাসিয়ে নেবে।

মা অবশ্য এই খুশিভাব ও আচমকা উচ্ছল ব্যবহার দেখে একটু আশ্চর্য হয়েছিলেন—কিন্তু সেই আশ্চর্য হওয়া সম্পর্কে সচেতন হবার খুব একটা সুযোগ পেলেন না। যখন

শুনলেন লোকটি বিবাহিত, চ্যাটার্জি। তখন মনে হ্‌ল—এ কাপড়ে এ অবস্থায় কী তার সামনে বের হওয়া উচিত। একজন মস্তবড় অফিসারের সামনে তিনি কী বলবেন—কি করবেন। সঙ্গে সঙ্গে খুশিও হলেন—রমা যে বাবার বদলে মাকেই ডেকেছে এজন্যে রমার উচ্ছল ব্যবহারকে ভেবে নিলেন—অফিসে তো আর গোমড়ামুখে থাকা চলে না তাহলে দেবে তক্ষুনি ছাড়িয়ে। বাসায় এরা সবাই গোমড়ামুখো—ওর বাবাও তাই ছিল—বাইরের লোক আসুক মুখে খৈ ফোটে। আর ঘরে যেন জেলখানায় বসে আছে।—এত করে অবশ্য তখন ভাবলেন না। কিন্তু এ ধরনের একটা চিন্তা যেন রমার এ ধরনের ব্যবহার সম্পর্কে মনের মধ্যে অস্ফুটভাবে খেলে গেল। তবে, কেন তিনি জানেন না, রমার এই হাসিখুশি ভাবটি কিন্তু তার ভাল লাগল। এই উচ্ছল তরল আচরণ যেন তাঁর মনেও দোলা দিল। এ আচরণ যে ভালবাসার লক্ষণ তা তাঁর মনেও হয়নি। ভালবাসার লক্ষণ যে তাঁর খুব মনেও আছে তাও নয়। তিনি অবচেতনভাবে মনে করলেন—এ হচ্ছে উপরওয়ালা বাড়িতে আসবার কৃতার্থবোধ, বা সেই কৃতার্থবোধের চাপা উচ্ছ্বাস।

—আমি গিয়ে কী করব? এই কাপড়ে?

—চলো, চলো। মাকে প্রায় ঠেলতে থাকে। এরকম জোর বা আবদার রমা জীবনে করেনি মার 'পর। আশ্চর্য হ'ল নিজে এরকম জোর, আবদার করতে পারে দেখে। আরো আশ্চর্য হয়, মা এই জোর বা আবদার মেনে নেয় দেখে।

—এই কাপড়টা পাল্টে ফেলো—আর কিছুর দরকার নেই।

—কোন কাপড়টা পড়ব? মা কাপড় পরবার সমস্যা এমনভাবে হাজির করেন যেন এই সমস্যা সমাধানের ব্যাপারেই মা যে অসহায়—বুদ্ধিতে কুলিয়ে উঠতে পারছেন না—একথা নিজের অজান্তেই প্রকাশ করে ফেললেন। মা'কে অসহায় ও বিহ্বল লাগে। মনে মনে ভাবে রমা, হয়ত অফিসারের সামনে কী বেশে যাওয়া উচিত তাতেই কী মা'র ভয়? আমার মত স্লিভ্‌লেস্ ব্লাউজ। রমা তাড়াতাড়ি সোয়েটার খুলে ফেলে। সত্যি ভেতরটা যে ঘেমে উঠেছে—এতক্ষণে খেয়াল হয়।

মা ভেতরের ঘরে ঢোকে বদলাবার জন্যে। রমা মা'র পিছু পিছু আসে। একা থাকতে ভরসা পায় না—মা'কে একা ছেড়ে দিতে ভয় হয় : যেন মা আবার বদলে নিজের মূর্তি না ধরে—সেই জন্যে মাকে পাহারা দেবার জন্যে মা'র পিছু পিছু ঘরে আসে। নিজেরও একা থাকতে ভরসা হয় না—নিজের মনের মুখোমুখী দাঁড়াবার সাহসও নেই। সেখানেও নিজেকে মা'র মতোই পাহারা দেওয়া দরকার। নিজেকে নিজের হাত থেকে রক্ষা করবার জন্যেও মা'র কাছে আসে।

মা কাপড় পাল্টালেন। কাপড় পাল্টালেই মা'কে কেমন সুন্দর ও শুভ্র মনে হয়। আজ কিন্তু রমার চোখে মা'র সেই শুভ্র ও সুন্দর চেহারা কেমন খোলে না। রমাকে দেখবার 'পর মাকে দেখে বা মাকে দেখবার পর রমাকে দেখে যে মন্তব্য চিরকাল শুনে এসেছে—মেয়ে দেখতে মা'র মতো হয়নি। অপরের এই আশাভঙ্গ ওর চিরকালের আশঙ্কা। তাই কল্যাণের চোখ দিয়ে মা'কে দেখতে গিয়ে দেখল, মা'র চেহারাও বেশ বদলে গেছে। মুখে কেমন একটা রুক্ষ রুক্ষ ভাব—কেমন যেন একটা বয়সের ছাপ

মুখে ফুটে উঠেছে। আগের সজীবতা ও নবীনতা আর নেই। রমা কেমন একটা আশাভঙ্গ বোধ করে। কেমন মনে হয়, ওঁদের একটি সম্পদ ছিল আজ আবিষ্কার করল তার অনেকখানিই নষ্ট হয়ে এসেছে। মা সুন্দর—এই ভাবনাটি যেন একটা নিছক অভ্যাস বা সংস্কার বলে আজ মনে হল। মা কোনও পাটভাঙা শাড়ি পরলেন না। শুধু যে শাড়িটি পরে হাট-বাজারে যা—ডাক্তার বা ফার্মাসিতে যান সেইটিই পরলেন। পরিস্কার ও ধোয়া। কিন্তু ইস্তিরি টিস্তিরি করা নয়। হাটে-বাজারে কখনও ভালো শাড়ি পরে যেতে আছে—ডবল দাম চাইবে না—বাজারে যাব রানি সেজে? এই বুদ্ধি নিয়ে তুই চাকরি করিস একটা কমদামী পরিষ্কার শাড়ি—এই হচ্ছে তার বাইরে বের হওয়ার কাপড়। আর রাগ করে যখন পার্কে যান তখন যে অবস্থায় থাকেন সে অবস্থায় চলে যান। আগে আগে রাগ পড়ে গেলে নোংরা ও ময়লা শাড়ির জন্য লজ্জা পেতেন—চলে আসবার সময় বুঝতে পারতেন রমারও সঙ্কোচ হচ্ছে ঐ নোংরা শাড়ির জন্য। কিন্তু রমার লজ্জা দেখে তার যেন জেদ চেপে যেত। আমি মা হয়ে যদি এই শাড়িতে বের হতে পারি—তোমার তাতে লজ্জা—কোন নবাব কন্যা তুমি? মনে মনে এইরকমভাবেই রমাকে সম্বোধন করে মা বলতে থাকেন। কোন ঘরের মেয়ে হয়ে আমি এই শাড়ি পরছি আর তুই তো হাড়হাভাতের ঘরের মেয়ে। তিনি ফেরার পথে পান কিনতেন—রমাকে নিয়ে চলে আসতেন—মনে মনে রমার উদ্দেশে গজরাতে গজরাতে। এই রাগটিকে তিনি চলে যেতে দিতেন না—নিজের নোংরা কাপড় পরবার লজ্জা ও সঙ্কোচকে এই রাগের আবরণ দিয়ে গোপন করে রাখতেন। আজকাল নোংরা কাপড়ে বের হওয়া কেমন অভ্যাসও হয়ে গেছে—খুব একটা গায়েও লাগে না। অনেকক্ষণ যখন পার্কে বসে থাকতে হত। তখন মেয়েকে মনে মনে বলতেন, মা নোংরা কাপড় পরে বসে থাকলে তোমাদের মর্যাদা বাড়বে? বুঝতে পারছি, আমি নোংরা কাপড় পরে বসে লজ্জা পাব—সেই লজ্জা দেওয়ার জন্যে, হেয় করবার জন্যে দেরি দেরি করে আসা আরম্ভ করেছ। ঠিক আছে আমি লজ্জা পাচ্ছিনে। একটু পরেই নিজের শাড়ি যথেষ্ট ময়লা নয় তা দেখবার জন্য বাইরের লোকের দৃষ্টি দিয়ে একবার নিজের শাড়িটি পরীক্ষা করেন। মনে মনে বোঝান, ভাল শাড়ি পরে এলে চোর-ডাকাতের চোখ পড়ত। আবার ভাবেন—ভাবছে সবাই ঝি চাকরানি—ভাবুক গিয়ে। স্বামী যার অকর্মণ্য। যার মেয়ে রোজগারে—আবার রমা আসবার পথের দিকে তাকান। হতাশ হয়ে ভাবেন—যা নোংরা শাড়ি পরে রয়েছে—পাঁচজনে যা দেখছে—ঝি চাকরানি ভাবছে—এ যাত্রায় তো তাড়াতাড়ি এসে নিয়ে যাওয়া উচিত। তাঁকে ফিরিয়ে নেওয়ার জন্যে নোংরা শাড়ির যুক্তিকে তিনি অবলম্বন করতেন। আবার কখনও ভাবতেন, নোংরা শাড়ি পরে আছি বলেই সেই সঙ সাজা মেয়ের মা'র কাছে আসতে লজ্জা হচ্ছে।

আজকে তিনি যে জলে ধোয়া একখানা সাধারণ পরিষ্কার শাড়ী পরলেন তা অন্য কিছুর জন্যে নয়। কে এসেছে তার জন্যে একখানা ধোয়ানো ইস্তিরি করা শাড়ি ভাঙতে প্রাণ চায় না। তিনি প্রাণ ধরে শাড়ি ভাঙতে পারেন না। ফ্যাশান করলে হয়ত বলবেন, বাড়িতে কেউ নবাব নন্দিনী সেজে থাকে না। শাড়ি ভেঙে পরে গেলে ভাববে সেজে এসেছি। আসলে কিন্তু তিনি পরিষ্কার ধোয়ানো শাড়ি ভাঙতে পারবেন না জেনে ঐ

কথা ওকে বলবেন। রমা বেশি সাজের পক্ষপাতী নয়। ওর শুধু মনে হচ্ছিল, চুল পাকেনি—দাঁত পড়েনি—বরং স্বাস্থ্য ও রঙ আগের চেয়ে ভাল। তবু কেমন যেন একটু ফুলো ফুলো মুখ—শিরাগুলো কেমন নীল নীল—এমন শুষ্ক, রুগ্ণ, নীরস মাকে লাগে। মা'র অসুখ বিসুখ করে না—তবুও চোখের কোণে কালো রেখা প্রায় গোলাকার। একটা অসন্তুষ্ট ভাব সমস্ত চেহারায়। মাকে গম্ভীর গম্ভীর লাগে না—বিরক্ত বিরক্ত লাগে—ঠিক বিষণ্ণতা মা'র মধ্যে নেই—কেমন একটা অসন্তোষ ভাব—মা'র মধ্যে ঠিক যেন কোনও দূরত্ব আছে বলে মনে হয় না—কেমন একটা ছলছলে ভাব—সব কিছুকে অপছন্দ—স্বাতন্ত্র নয়—যেন রাগ রাগ একটা চেহারা। নিজের অনিচ্ছাসত্ত্বেও ভাবল রমা। ভাবল, মার হাসিতে প্রাণ নেই—তাছাড়া হাসতেও ভুলে গেছে। হাসলে যেন নিজের কাছেই অপ্রস্তুত হয়ে যান। হাসি পাওয়া মার পক্ষে যে অনুচিত—এমন বোধ যেন মার মধ্যে টনটনে। হাসিকে মা স্বভাবধর্ম থেকে বিচ্যুত হওয়া বলে মনে করেন। মা হাসেন না—হাসতে পারেন না—হাসিকে অপচ্ছন্দ করেন—হাসিকে তাঁর পক্ষে অন্যায় বলে মনে করেন। নিজে হাসলে নিজের 'পর অসন্তুষ্ট হন। ইতিমধ্যে মাকে নিয়ে যাবার আকাঙ্ক্ষা কেমন ভাটা পড়ে এসেছে। তবে সেই ইচ্ছার ভাটার টানকে রমা আমল দেয় না। মা'র সম্পর্কে ওর মনে যে ভাবনা বয়ে যায় তাকে স্বীকার করে না—আমল দেয় না। মাকে নিয়ে যাবার সময় নিজের সহজ উচ্ছ্বাসকে এমন আঁকড়ে রইল যেন মা'র সম্পর্কে কিছুই ভাবেনি—মাকে নিয়ে যাবার আকাঙ্ক্ষা একটুও কমেনি। যেতে যেতে চকিতে নিজের আয়নায় দেখা নিজের চেহারাটা মুহূর্তে মনে পড়ে—সঙ্গে সঙ্গে কল্যাণের মুগ্ধ দৃষ্টি—আজই বিকেলে ওর কাটা বগলের দিকে লুকিয়ে তাকিয়ে সোয়াটারে বগলঢাকা দেখে মুহূর্তের জন্যে আশাভঙ্গের দৃষ্টি—সঙ্গে সঙ্গে মা'র চেহারা—মা'র শুষ্ক, রুক্ষ অসন্তুষ্ট চেহারা—এই ছবিগুলোর সঙ্গে সঙ্গে মা'র পাশে নিজেকে অনেক তরুণ ও তাজা মনে হল মুহূর্তের জন্যে। নিজেকে তরুন তাজা মনে হওয়া মাত্র—অনুভূতিটি ভাল লাগে। চিন্তাটি বাদ দিয়ে ভাললাগার অনুভূতিকে বোঝা করে শুধু অনুভব করতে লাগল। চিন্তাটি বাদ দিয়ে অনুভূতিকে বোবা করে অনুভব করতে লাগল—কেন ভাল লাগল তাকে ভুলে যেতে চাইব—ভুলে গেলও।

দু'জনের পায়ের শব্দ কানে যেতেই কল্যাণের যেন ঘুম ভাঙল। যেন তন্ময়তার ঘোর থেকে এখনও সজাগ হয়নি—যেন ছবির নেশা এখনও ওর চেতনাকে ছেড়ে একদম চলে যায়নি। বলতে যাচ্ছিল, স্প্লেনডিড—কিন্তু সঙ্গে রমার মাকে দেখে ভারি আশ্চর্য হয়ে গেল। সাক্ষাৎ মাতৃমূর্তি। মাকে মনে নেই—শাশুড়িকে মনে পড়ল—এমনি সাক্ষাৎ মাতৃমূর্তি। এর চেহারার মধ্যে যেন একটা ভারী গাম্ভীর্য রয়েছে—তা হলে রমার এই গাম্ভীর্য নিজের চারদিকে বেড়া দিয়ে দেওয়া—এ হচ্ছে মাতৃদত্ত সম্পত্তি।

রমা বলল—মা।

অমনি কল্যাণ তাড়াতাড়ি রমার মা বাধা দেবার আগেই পা ছুঁয়ে প্রণাম করে নিল।

রমা একটু হেসে বলল—মা কিন্তু ব্রাহ্মণ।

কল্যাণ হেসে রমার দিকে তাকিয়ে বলল—মা-রা সব সময়ই ব্রাহ্মণ—মেয়েরা ক্ষত্রিয়।

কল্যাণ আরো বলতে যাচ্ছিল, মেয়েরা প্রাণ নেয়—মা-রা নিজের প্রাণ দিয়ে প্রাণ সৃষ্টি করেন, কিন্তু বলা ঠিক হবে কী না বুঝতে না পেরে চুপ করে থাকল।

ছবি দেখবার তন্ময়তা মাকে দেখার মাত্র এমন তাড়াতাড়ি চলে যাওয়াতে রমার একটু আগের ভাললাগা অনুভূতিটি আর অনুভব করতে পারে না। তবু নিজের অগোচরে সেই ভাললাগা অনুভূতিটি খুঁজে বেড়ায়। কেন যে ভাললাগানো অনুভূতিটি মনে এসেছিল তাও ঠিক মনে করতে পারে না। মনে হয়, মাকে দেখে আশ্চর্য হওয়া অনেকক্ষণ স্থায়ী হচ্ছে। মাকে দেখে কল্যাণকে অবাক করে দেবার যে পরিকল্পনা ছিল—তা যে সার্থক হল—একথা রমার মনে এল না। বরং রমা যে মা'র মতো নয়—এই সংবাদটি শুনবার অপেক্ষায় থাকে—এমনকী কল্যাণের কাছ থেকেও। কল্যাণের কাছ থেকে এ কথা শুনবার যে অন্য অর্থ আছে তাও মনে আসে না। যাই হোক, রমা বলতে যাচ্ছিল—তা হলে ছেলেরা বা স্বামীরা ক্ষত্রিয় আর বাবারা ব্রাহ্মন—কিন্তু মা'র সামনে অত অন্তরঙ্গ ভাব দেখানো ঠিক নয় ভেবে চুপ করে রইল। তারপর বলল—ছবি কেমন লাগল।

—স্প্লেনডিড। অসাধারণ হাত তো। নিপুণ ও দক্ষশিল্পীর পরিচয় রয়েছে ছবিগুলোর মধ্যে। কল্যাণকে দেখেই রমার মা'র প্রথম যে অনুভূতি হয়—এতো ছেলেমানুষ। তাঁর ধারণা ছিল গুরুগম্ভীর কোনও বয়স্ক লোক—নিতান্ত ছেলেমানুষ ও মেয়ে বলে রমাকে মোটর করে বাসায় পৌঁছে দিতে এসেছে। কল্যাণের গায়ের রঙ, চোখ মুখ, চঞ্চল ও খুশি খুশি হাবভাবে তিনি মুহূর্তে মুগ্ধ হয়ে যান। এ যদি বিয়ে না করত—তাঁর নিজেদের হাজার অসুবিধা হলেও ওরই সঙ্গে রমার বিয়ে দিতে তিনি রাজি ছিলেন। ওর সঙ্গে রমার বিয়ে দেবার জন্যে সবকিছু ত্যাগ করা যায় এমনি একটা আবেগ মুহূর্তের জন্যে অনুভব করলেন। কিন্তু বিয়ে করে ফেলেছে—ব্রাহ্মণ। একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস মনে মনে ফেলেন। তেমন কপাল করে কী এসেছে? কিন্তু অদম্য ইচ্ছাকে কেমন গভীর করে অনুভব করছিলেন—ব্যর্থতাবোধ তেমন গভীর হল না। হঠাৎ ওর দিকে আরেকবার তাকাতেই মনে পড়ল—অবন বেঁচে থাকলেও আজ এমনি সুপুরুষ—এমনি অফিসার হয়ে উঠত—এমনি চেহারা—এমনি গায়ের রঙ.....। রমা যখন কল্যাণকে ছবিগুলোর কথা জিজ্ঞেস করল, তখন মার কেমন বিরস মনে হয় প্রসঙ্গটি। ঐ ছবি ছবি করেই সব গেল—সব ভেসে গেছে। সঙ্গে সঙ্গে মনে হয়, বড় অফিসার, হোক ছেলেমানুষ—তুমি করে বললে রাগ করবে কিনা? পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম অবশ্য করল—'তুমি' বললে আমার 'পর রাগ করে যদি সেই রাগ রমার 'পর পড়ে। তবে চাকরির ..... তবে দেখে মনে হয় না এ ক্ষতি করতে পারে। যদিও কল্যাণকে না দেখলে—শুধু সুপুরুষ ও হাসিখুশি ভাব শুনে তিনি কখনোই বিশ্বাস করতেন না যে, ক্ষতি করতে না পারে। চেহারা দেখে মানুষ চিনবে—তবেই হয়েছে—এ বুদ্ধি নিয়ে চাকরি—ঐ চাকরি গেল বলে। অথচ কল্যাণকে দেখে তার মনে কিছুতেই এল না—এ ক্ষতি করতে পারে। কেবল মনে হতে থাকে, এই সুন্দর সুপুরুষ ছেলে হাতছাড়া হয়ে গেল অথচ রমার বিয়ে হল না। সুপাত্রদের বিয়ে হয়ে যাচ্ছে অথচ রমার বিয়ে হচ্ছে না—এমন একটা কথা যেন আজ কল্যাণকে দেখে তাঁর মনে এল। মনে হয় রমার বয়স হয়ে যাচ্ছে, বিয়ের বয়স।

ছবির প্রশংসা শুনে রমার মনে হল : বাবা শুনলে বেশ হতো। বাবাকে এখানে আনা যায় না। বাইরের লোকদের সামনে বাবা কিছুতেই বের হতে চান না। ছবির প্রশংসা শুনলে খুশি হবেন কী নিজের জীবনের ব্যর্থতাকে বেশি করে মনে করবেন কে জানে? তাছাড়া বাবার শরীর কেমন আছে জিজ্ঞেস করা হয়নি। একটু ভালো থাকলেও, এসেই অসুখের গল্প আরম্ভ করবেন—বাত, হাঁপানি, মাথাঘোরা, ওষুধ—সব চেয়ে হোমিও প্যাথিতে সারে বটে—আর হোমিওপ্যাথ পাওয়া শক্ত। কল্যাণের এতটা সহ্য হবে না।

—ছবিগুলো আমার বাবার আঁকা।

—আচ্ছা—চমৎকার তো। কী নাম? নিশ্চয় বড় আর্টিস্ট—কোনওদিন বলোনি তো?

—বাবার নাম প্রদ্যোতকুমার মিত্র।

কল্যাণ বলতে যাচ্ছিল ভদ্রতা করে—ও, হ্যাঁ, তুমি আর্টিস্ট মিত্রের মেয়ে—।

কিন্তু ওর মুখ খুলবার আগেই রমা বলে, বাবা বড় আর্টিস্ট নিশ্চয়—তবে নাম করা আর্টিস্ট নন—বাবার রঙ রেখার সঙ্গে পাবলিকের এখন যোগাযোগ নেই।

রমার মাকে দেখে কল্যাণের ভাল লেগেছিল। মা ব্রাহ্মণ জেনে আরো ভাল লাগল : তাহলে রমার লভ ম্যারেজের ট্রাডিশন রয়েছে। ছবিগুলো রমার নয় শুনে আরো ভাল লাগল যখন শুনল—রমার বাবা আর্টিস্ট হলেও নাম করতে পারেনি—যাক, নাম করা আর্টিস্টের মেয়ে নয়! নাম করা আর্টিস্টের মেয়ে হলে বংশ গৌরবের দেমাকে রমা কল্যাণের চেয়ে নিজেকে শ্রেষ্ঠ মনে করত। আপাতত সেই সম্ভাবনা নেই। বেশ খোশমেজাজে কল্যাণ রমার বাবা নাম করা নয় বলে মুখে দুঃখের ভাব ফুটিয়ে তোলে।

কিন্তু রমা ঠিক বুঝতে পারে না—কল্যাণ বাবার জন্যে দুঃখিত হল—না, নাম করা নয় বলে দমে গেল। মুখের ভাবে ঠিক বোঝা যাচ্ছে না ঠিক কী জন্যে কল্যাণ বিমর্ষ। অথচ চোখ দুটো বেশ সজীব ও মধুর।

দাঁড়িয়ে কেন? রমা বসতে বলে আঙুল তুলে।

এরপর একটা সোফায় বসে—অনেকক্ষণ দাড়িয়ে ছিলাম।

যেন একটা আশ্রয় ও প্রশ্রয় পাওয়া গেল। রমার মা'র দিকে তাকিয়ে বলে—আমি একা বসব নাকি? আপনিও বসুন—সবাই মিলে বসা যাক। রমার মা কিছুটা অন্যমনস্ক ভাবেই বসে পড়েন। একটু আগেই যখন শুনেছিলেন, অফিসের বড় অফিসার। তাকে গিয়ে দেখা করতে হবে। তখন কেমন ভয় ভয় করছিল—নিতান্ত দায়িত্বের পূর্ণ বোঝা মনে করে যেন দুরূহ কর্তব্যের সম্মুখীন হবার মতো তিনি কল্যাণের সম্মুখীন হয়েছিলেন। তিনি দেখলেন ব্যাপারটা এমন কিছু নয়। মনটা বোঝাশূন্য হয়ে গেল কল্যাণকে দেখে। আর কল্যাণের কাছে রমার সহজ ব্যবহার দেখে তাঁর মনে হল অফিস এমন কিছু ভয়ংকর নয়—ঐখানে মেয়েদের চাকরি করা বাইরের থেকে কঠিন মনে হয়েছে—তত নয় হয়তো। এরা হয়ত সবাই ভালো মানুষ। সঙ্গে সঙ্গে রমার 'পর যে গোপন গভীর শ্রদ্ধা ছিল—তা যেন নিজের অজান্তেই কমে গেল। মনে হয় রমা অফিসে ভালো ব্যবহার পায়—অযথা তিনি ভেবে ভয়ে মরেন। তাঁর মনে হল, মেয়ে বেশ ভাগ্যবতী—নিজের রোজগারে স্বাধীন—নিজেকে হঠাৎ বঞ্চিত ও ভাগ্যহীনা মনে হয়। সঙ্গে সঙ্গে স্বামী তাকে

ভাগ্যহীনা বলতেন—সেই কথাও মনে এল। মন কেমন নীরস হয়ে যায়। মনে মনে ভাবেন, অফিস চাকরি এমন কিছু নয়—ঐ লোকটা এভাবে হাল না ছেড়ে দিলে—এমন হত না। একটা অফিসে চাকরি নিতে পারতেন—অফিসের সবাই তো আর বি.এ. এম.এ পাস নয়। মানুষটার জন্যে একটা সংসার ছারখার.....। কল্যাণ খুশি হয়ে ভাবল, রমার মা'র চেহারার মধ্যে একটা বিধবার পবিত্রতা আছে—মনে হয়, বিধবাতেই ভদ্রমহিলাকে মানায়। কপালে সিঁদুর নেই—সিঁথিতে ছোট্ট করে একফোটা সিদুঁর নিতান্তই অনিচ্ছায় নিয়ম বলে থেকে গেছে—আর চলে গেলেই স্বধর্ম হয়। কিন্তু শাশুড়ির কালোঘন কোঁকড়ানো চুলের মাঝে গভীর রাঙামাটির পথ—ফরসা কপালে সকালের সূর্য—দেখে মনে হয়, রীনার মা যে কুমারীও নয়—বিধবাও নয়। সধবাতেই ওঁকে মানায়। এক একটা জীবন এক এক জনকে মানায়—রমার মাকে বিধবায়—শাশুড়িকে সধবায়—রমাকে লাভার হিসাবে আর রীনাকে—কুমারীতে? না। প্রেমিকাতে? মন সায় দিতে চায় না বলে কল্যাণ চিন্তা করা বন্ধ করল। তবে রমার প্রসঙ্গ বাদ দিয়ে রীনাকে এ নতুন চিন্তাটি বলবে? আর রমাকেও—তা হলে ওর মা'র বৈধব্যকেও তো.....না, ওর মার জায়গায় রীনার মার কথা বলবে, বলবে, তোমার মাকে সধবায় আর রীনার মাকে বিধবায় আর তোমাকে—বলতো? শাশুড়িকে বিধবা ভাবতে কষ্ট হয়—শশুরের চিরতরে অনুপস্থিতির জন্যে নয়—শাশুড়ির এমন চেহারা বদলে যাবে এ জন্যে? ইচ্ছে হল—চোখ বুজে রমাকে বিবাহিত ভাবা যাক—কিন্তু এদের সামনে চোখ বোজা ঠিক নয়—তাকিয়ে তাকিয়ে আর রমার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ভাবতে গিয়ে দেখল: না, চোখ না বুজলে.....।

রমার মা জিজ্ঞেস করল—মা বাবা কেমন আছেন?

কেমন একটা হতাশ ভাবে মাথা নাড়ে কল্যাণ—কেউ নেই। যখন আমার তিন চার বছর—তখনই মাকে হারালাম—কলেজে পড়বার সময়—আঠার-উনিশে বাবাকে।

রমার মনে হল, কল্যাণের হতাশাটি কেমন যেন অভ্যস্ত, কিছুটা কৃত্রিম—কিছুটা যেন বাবা-মা না থাকবার জন্যে অপরের সহানুভূতি কেড়ে নেবার একটা পুরানো চেষ্টা—চেষ্টা করাও যেন একটা মামুলি ব্যাপার—হয়তো যন্ত্রের মতই।

মা'র মুখে বেদনার ছাপ ফুটে ওঠে। এই ছেলেটির মা নেই—আর এমনি একটি ছেলে তাঁর নেই—কোল খালি করে চলে গেছে। কেমন একটা সান্ত্বনা পান—জগতের সর্বত্র মানুষ নানা ভাবে দুঃখ পাচ্ছে জেনে একটা সান্ত্বনা হয়। আগে আগে কারো ছেলে মারা গেছে শুনলে কেমন একটা স্বস্তি সান্ত্বনা মনে আসত—জগৎ তাঁর ওপরেই শুধু অবিচার করেনি। কারো কোনো ছেলে মেয়ে মরেনি শুনলে তাঁর 'পর কোন সহানুভূতি হত না—মনে হত, নিয়তির আদুরে মেয়ে—সংসারের জানবি কী। তাই কল্যাণের মা নেই জেনে কেমন একটা ভাসা ভাসা বেদনাবোধ করলেন—ভেতরে ভেতরে একটা তৃপ্তি বোধও করলেন।

ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করতে চান ছেলেমেয়ে কটি—যদি আবার শুনতে হয়—ছেলে বা মেয়ে হতে গিয়ে মারা গেছে। মারা গেছে কিনা শুনবার লোভ আছে—অথচ জিজ্ঞাসা করতেও ইচ্ছে হচ্ছে।

—বিয়ে হয়েছে ক'দিন।

—বছর চারেক হল।

—বাচ্চা কাচ্চা?

চকিতে একবার রমার দিকে তাকিয়ে মাথা নামিয়ে জানায়—কিছু নয়।

বুক থেকে একটা বোঝা নেমে গিয়ে বুকটা শূন্য করে দেয় রমার মা'র। রমার মনে হয়, কল্যাণকে এখানে এনে তারপর মাকে আনবার পর এতক্ষণ ধরে ওর মধ্যে কেমন একটা চাপা উৎকণ্ঠা ও গোপন উদ্বেগ মনে বেশ চাপ সৃষ্টি করেছে—যেন অতি মনোযোগের একটা ক্লান্তি ও বোঝা ওকে পীড়িত করছে—অথচ রমা উদ্বেগের বোঝাকে এতক্ষণ অগ্রাহ্য করে চলেছে। এখন যেন একটু একটু শান্ত হচ্ছে। কল্যাণই বা মা'র সঙ্গে ওরকম ব্যবহার করবে—মা-ই বা কী বলবে—এ নিয়ে ওর ভেতরে যে একটা পরোক্ষ দুশ্চিন্তার বোঝা ওকে ভেতরে ভেতরে অস্থির করে তুলছিল—এবার সেই অস্থিরতার রূপটি ওর কাছে ধরা পড়ে। মনে হয়, মা'র আর কল্যাণের দেখাসাক্ষাৎ ওকে বড্ড ভাবিয়ে তুলে অত্যাচারের মতো হয়ে দাঁড়াচ্ছে। যখন সলজ্জভাবে কল্যাণ জানান, ওর ছেলেমেয়ে কিছু হয়নি। তখন রমার মনে হয়, কল্যাণ বয়স্ক মহিলাদের সঙ্গে ব্যবহার করতে জানে। চকিতে কল্যাণের স্ত্রীর চেহারা মনে আসে—বিদ্যুতের মতো মনে হয়, ছেলেমেয়ে হলে অমন ফিগার থাকত না। সঙ্গে সঙ্গে আবার উল্টো একটা কথাও মনে আসে—ওর এক কলেজ-বান্ধবীর সঙ্গে কিছুকাল আগে দেখা হলে বলেছিল—বে-থা না হলে তিরিশের আগেই চেহারায় শুকনো ভাব ধরে, তিরিশের পর শুকিয়ে কাঠ কাঠ চেহারা হয়। এমনিতেই রোগা গড়ন চেহারার কী দাঁড়াবে—ভাবতে রমার বুক হিম হয়ে যায়। মা আর কল্যাণের কথা ভালো করে কানে যায় না। এই আতঙ্কে নিজের ভেতরে কেমন শক্তি সঞ্চয় হয়—মনে হয়—মা আর কল্যাণ যা খুশি বলুক—ওদের নিয়ে অত দুশ্চিন্তা বা খাতির করবার কিছু নেই। কেমন একটা বিস্বাদ স্বাধীনতায় মন মুহূর্তের জন্যে উদাসী হয়ে যায়।

—আর্টিস্ট মিত্র কী অফিস থেকে ফেরেননি?

কল্যাণের ধারণা হল—হয়তো রমার বাবা কোনো অফিসে কমার্সিয়াল আর্টিস্ট। বা ছবিটবি একে এখানে সেখানে বিক্রি করে। হয়তো সংসার চালাবার দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে ছবি আর এখন আঁকেন না—কোথাও হয়ত চাকরি বাকরিও করতে পারেন। হয়তো ওভার টাইম খাটেন—এখনও ফিরতে পারেননি। যতক্ষণ ফিরতে না পারেন ততক্ষণই যেন কল্যাণের পক্ষে ভাল। এরকম একটা ধারণা ওর মনে মনে। হঠাৎ কল্যাণের মনে একটা ছবি উঁকি দেয়। ছিন্নবস্ত্র বড় বড় চুলওয়ালা একটি লোক ফুটপাথের 'পর নানা রঙ দিয়ে এক একটা ছবি আঁকছে—প্রচুর লোক পাশে দাঁড়িয়ে আঁকা ছবি ও ছবি আঁকা দেখছে—কেউ কেউ পয়সা দিয়ে যাচ্ছে। ছবিটি মনে আসতেই কল্যাণের কেমন তৃপ্তি বোধ হয়।

কল্যাণের বলবার ধরন দেখে রমার মনে হয়, যেন ওর বাবা একজন গন্যমান্য আর্টিস্ট—যেমন সম্ভ্রমের সঙ্গে উল্লেখ করছে—তাতে বাবা বাতের রোগী, হাঁপানিতে কষ্ট পাচ্ছে—একথা বলা যেন রীতিমতো নিজেদের ছোট করা। বাবাকে যে সম্মানের

আসনে কল্যাণ বসিয়েছে তা থেকে বাবাকে নামালে যেন কল্যাণের চোখে ছোট হয়ে যাবে—এমনি ধারণা রমাকে পীড়ন করতে থাকে।

'আর্টিস্ট মিত্র' শব্দটি শুনে মনে মনে রমার মা'র একটা বাংলা প্রবাদ মনে পড়ে—বিদ্রূপের ঝাঁঝে বাংলা প্রবাদটি মনে মনে আওড়ান। আজকাল রাগ হলে রাগটি তিনি বাংলা প্রবাদের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করেন। 'আর্টিস্ট মিত্র'—হু, আপনি বাঁচে না তো বাবার নাম।

—বাবা অসুস্থ—বেশ কিছুকাল থেকেই। বাড়িতেই আছেন—কার্ডিয়াক এস্‌মা—এরপর গাউটও রয়েছে—হার্টের কন্ডিশনও ভাল নয়।

—আই সি—তা হলে আজকাল আর আঁকতে পারেন না।

—রমা মাথা নাড়ে।

মা মনে মনে ভাবেন, যতই ইংরেজি করে বলিস—শাককে ইংরেজি করলে রুই মাছ দাঁড়ায় না। অতটুকু ছেলে কেমন ফিটফাট—অবনের বয়সী হবে কিনা সন্দেহ—কেমন দু'পয়সা লুটছে। আর তুমি? এজমা—গাউট—ইংরেজি বলে আর কত ঢাকবি। দুটো মেয়ে মানুষ মিলে সংসার চালাচ্ছে—একটা ঘরে খেটে মরছে—আর একটা বাইরে ঘুরে পয়সা আনছে—আর তিনি আছেন চিররোগা হয়ে সকলকে আতঙ্কে রাখবার জন্যে। হাঁপানির টান—কোমরে ব্যথা—হাত-পা ঠান্ডা কত নমুনা। কল্যাণের সহজ ব্যবহার দেখে তাঁর কেবল মনে হতে থাকে—এই রকম সহজ সরল লোক দু'পয়সা করে খাচ্ছে—চাকরির জগত এমন কিছু ভয়ংকর নয়—মাঝে থেকে লোকটা বসে থেকে সংসারটার সর্বনাশ করল।

—ই.সি.জি-র রিপোর্ট বোধহয় ভাল নয়। প্রেসার কেমন?

রমা অস্পষ্টভাবে মাথা নাড়ে। একটা অনুতাপও মুহূর্তের জন্যে মনে অতল থেকে উঠে আসে। কোনওদিন বাবাকে একটা বত্রিশ বা চৌষট্টি টাকাওয়ালা ডাক্তার বা স্পেশালিস্টও দেখানো হয়নি। পাড়ার সেই পুরানো এল.এম.এফ। তিনি জানান, হাঁপানি কেউ সারাতে পারবে না—টেমপোরারি রিলিফ দেওয়া যায় মাত্র—বাতেরও সেই একই ব্যাপাব। রমা এই কথাগুলো আগ্রহ নিয়ে শোনে। বড় ডাক্তার না ডাকবার জন্য আত্মগ্লানির ওষুধ হিসাবেই ডাক্তারের কথাগুলোকে রমা নিজের বিবেকের জন্যে জমা রাখে।—এখন চারটাকা করেছেন, তবে পুরানো পেসেন্ট বলে রমাদের কাছ থেকে দু'টাকাই নেন—তাঁকেও সব সময় ডাকা হয়ে ওঠে না। তাঁর দেওয়া ওষুধগুলো দিয়েই রমার মা কাজ চালিয়ে দেন। আর ডাক্তারও খুব একটা আসতে চান না। তাঁর যে আর নতুন ওষুধ নেইও। তিনি লেটেস্ট ইনফরমেশন রাখেন। রাত জেগে মেডিক্যাল জার্নাল পড়েন—আপ-টু-ডেট ওষুধ রোগীদের দেবার জন্যে। মাঝে মধ্যে ওষুধ অবশ্য বদলেও দেন। তবু, বড় ডাক্তারের নাম তাঁর সামনে বলা যায় না—চটে যাবেন। বড় ডাক্তার ডাকবার কথা অবশ্য রমাদের মাথায়ও আসে না। দু'একবার বিদ্যুৎ ঝলকের মতো রমার এসেছিল। রমা বুঝিয়েছিল, ঐ তো চিকিৎসে করে এসেছে। দাদাও শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ওর চিকিৎসায় ছিল। আমাদের ধাত বোঝে। বাবা অবশ্য ডাক্তার বদলের কথা বলেন না। তাঁর ধারণা হয়েছে, আসল ওষুধ আছে হোমিওপ্যাথিতে। এখন সত্যিকার

হোমিওপ্যাথ খুঁজে পাওয়াই শক্ত ব্যাপার। আজ হঠাৎ রমার মনে হল, বাবাকে অবহেলা করা হচ্ছে ঠিক করল, বড় ডাক্তার দেখাবে। ই.সি.জি করাবে। সব কিছু এগজামিন করাবে।

বাবা রুগ্‌ণ—মেয়ের 'পর নির্ভর। মাও মেয়ের 'পর নির্ভর। ভাবনাটি নিজের অজান্তে কল্যাণের খুব ভালো লাগে। রমা স্বাধীন—যা খুশি করতে পারে—নিজের খুশিমতো চলতে পারে। এ চিন্তাটি কল্যাণের মেজাজকে খুশি করে তোলে। সঙ্গে সঙ্গে মনে হয়, রমা হ্যান্ডিক্যাপড়্ও বটে—সংসারে ওর নানা ঝামেলা—বাবা-মা'র আদুরে আহ্লাদী মেয়ে নয়। এ চিন্তাও ওর ভাল লাগে। অর্থাৎ রমা যেমন বাড়ির কারো 'পর নির্ভরশীল নয়, স্বাধীন—এ চিন্তা যেমন ভালো লাগে, এ চিন্তায় যেমন খুশি আছে, তেমনি বাড়ির দায়িত্ব ঘাড়ে পড়ায় বাইরের জগতের 'পর রমা নির্ভরশীল—টাকা পয়সার জন্যে চাকরির জগৎ ওর চাই-ই—এ চিন্তায়ও, অর্থাৎ চাকরির 'পর রমা একান্তভাবে ভরসা—এ ভাবটিও কল্যাণকে আনন্দ দেয়। শুধু একটি অস্পষ্ট চিন্তা মুহূর্তের জন্যে কল্যাণের মধ্যে দেখা দেয় : যে মেয়ের বাইরের জগতের 'পর অত নির্ভর করতে হয়—অপরের মন জোগানো তাঁর যে নিতান্তই চাই। কিন্তু রমার মধ্যে বরং সবাইকে এড়িয়ে যাবার চেষ্টাই—স্বতন্ত্র থাকবার ইচ্ছে.....। কিন্তু এতগুলো ভালো লাগা চিন্তার মধ্যে এই চিন্তাকে কল্যাণ গ্রাহ্য করল না। তক্ষুনি চেতনা থেকে ফেরত পাঠিয়ে দিল।

কল্যাণ চ্যাটার্জি শুনে রমার মা'র ইচ্ছে ছিল: নানা প্রশ্ন দেখতে চায়—তাঁর সঙ্গে কোন আত্মীয়তা ওর আছে কী না। কিন্তু রমার সামনে কেমন সংকোচ হয়। অথচ ব্রাহ্মণ তায় চ্যাটার্জি শুনলে মন এত চঞ্চল হয়—এত সংবাদ জানতে ইচ্ছে করে।

—এখানে বাড়ি কোথায়?

—ভবানীপুরে।

—পৈতৃক বাড়ি?

—না, এখানে একটা ফ্ল্যাট নিয়েছি। আমাদের পৈতৃক বাড়ি নর্থ ক্যালকাটায়—আহরীটোলায়।

রমার মা একই সঙ্গে নিষ্কৃতি বোধ ও আশাভঙ্গের বেদনা অনুভব করেন। আহরীটোলায় কোন আত্মীয়-স্বজন তাঁর ছিল না। চ্যাটার্জি শুনে আর প্রথম দেখে কেমন তাঁর মনে হয়েছিল, চেহারার সঙ্গে অবনের মিল আছে। আহিরীটোলায় পৈতৃক বাড়ি শুনে মনে হল, না, কোনও মিল নেই। নিশ্চিন্ত হলেন, যাক দাদার ছেলেটেলে নয়—বাবা-মা হারিয়েছে অল্প বয়সে : না, তাঁর কোনও আত্মীয় নয়। এবার তাঁর মনে হয়, তাঁদের বংশের চেহারার ধাতের সঙ্গে কোনও মিল নেই। তবু, চ্যাটার্জি বলে ছেলেটির 'পর কেমন একটা আত্মীয়তাবোধ না করেও পারেন না।

—জানো মা, আজ আমাদের অফিসের চারদিকে বোমা পড়েছে—দারুণ হট্টগোল।

—বলিস্ কী? তিনি আতংকিত হন—অফিস উঠে গেল নাকি অর্থাৎ ওর বাবার সেই ঠিকাদারি অফিস যেমন উঠে গিয়ে চাকরি চলে গেল—সেই থেকেই তো....।

—মুহূর্তে বুঝতে পারে রমা মা কী ভাবছেন।

—তাই বলে ভেবো না, অফিস একটু আগেও ছুটি দেবে। শুধু গন্ডগোলের জন্যে ক্যানটিনে খাবার আসতে পারেনি। আমাদের আজ খাওয়া হয়নি।

মুহূর্তে রমার মা একই সঙ্গে আশ্বস্ত হন—আর রমার খাওয়া হয়নি শুনে ভারি খুশি হন। খুশি হন রমা খেতে চেয়েছে বলে। একটু বড় হবার পর রমা কোনও দিনও বলেনি—মা, খিদে পেয়েছে, খেতে দাও। কখনো বলে না, এটা করো, ওটা করো। এক বেলা তো খায়ই না—সে কী না খেয়ে রয়েছিস—আগে বলতে হয়।

কল্যাণ স্মিত মুখে রমার মিথ্যাচারণ দেখছিল।

মা উঠে দাঁড়িয়ে চোখের ইঙ্গিতে রমাকে বাইরে ডাকেন। মা ও রমা বাইরে যান।

বাইরে এসে মা বলেন, লুচি আর তরকারি করি—একটু মিষ্টি আনছি। আর তোর জন্যে ভাত ভাত চড়িয়েছি।

—আমাকেও লুচিই দাও।

—সারাদিন ভাত খাসনি—লুচি খেয়ে থাক্‌বি। আচ্ছা এখন তো খা। আমি ময়দা মেখে যাই দোকানে। একটু মিষ্টি নিয়ে আসি।

মা রান্না ঘরের দিকে চলে যান। রমা একটু চুপ করে দাঁড়িয়ে আবার কল্যাণের কাছে আসে। এবার এসে একেবারে পাশাপাশি বসে রমা।

—তোমার জন্যে মিথ্যে কথা বললাম। নির্জলা মিথ্যে।

—সে জন্যে কল্যাণ তোমারই হবে।

কল্যাণের ভরসা হয়, এবার দু'জনে মিলে যা খুশি—বিশেষতঃ ভালবাসার 'তুমি আমি' আলোচনা করবে। এতক্ষণ ধরে ভয় হচ্ছিল, হয়ত রমার বাবার আর্টিস্ট জীবনের বাইওগ্রাফি শুনতে হবে—শুনতে হবে এমন সুন্দর দুর্লভ মুহূর্তে। কিন্তু রমা মা কে সরিয়ে দিতেই বুঝল, রমাও চায় নীরবে একান্তে আলাপ। যদিও রমার বাবা কী করতেন, কেন নাম করতে পারলেন না—বা কেনই বা আর্টিস্ট জীবন কাটালেন না এসব জানবার ক্ষীণ ইচ্ছে যে হচ্ছিল না তা নয়—কিন্তু পাছে এসব প্রশ্নের উত্তরে একটা বড় মনটনাস ডিটেলস্ শুনতে হয়—এমন মুহূর্তকে নষ্ট করে একটা ব্যর্থ শিল্পীর ক্রনিক পরাজয়ের কাহিনী জোর করে শুনতে হয়—এই ভয়ে রমাকে ওর বাবা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে সাহস হয় না। মাকে সরিয়ে দিতে রমার 'পর মন প্রসন্ন হল। যদিও রমার মাকে কল্যাণের খারাপ লাগছিল না। বিশেষ করে, ওর সম্পর্কে যে সহজ সরল প্রশ্ন জিজ্ঞেস করছিলেন—রমা এমন সহজে সরল হয়ে কল্যাণ সম্পর্কে কোন প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেনি। কল্যাণ নিজে থেকে যা বলেছে তাই শুনেছে। অনেক সময় শোনবার ধরন দেখে মনে হয়েছে—ভদ্রতার খাতিরে শুনছে—যেন শুনতে চায় না—কষ্ট করে শুনছে। কল্যাণের কথা শুনে কল্যাণকে মূল্য দিতে চায় না। নিতান্ত গায়ের জোরে কল্যাণ যেন আত্মপ্রচার করে চলেছে—যেহেতু চা-চপ খাওয়াচ্ছে সেজন্যে উদাসীন। অনিচ্ছুক হয়ে রমা নড়বড়ে ভদ্রতার মুখোশ পরে তা শুনছে। রমা আমল দিতে চাচ্ছে না—কল্যাণ জোর করে আমল আদায় করে নিচ্ছে। যাই হোক, মার সহজ আগ্রহ, সুশ্রী চেহারা কল্যানকে খুশি করছিল। চলে যেতেই ঘর ফাঁকা হয়ে গেল। কিন্তু ঘরের নিঃস্বতাকে কল্যাণ চেতনায় স্বীকার করল না। রমাকে একা পাবার খুশিতে নিজেকে উৎসাহিত করতে চাইল। তবু, রমার মা'র

চেহারা কেমন চোখের সামনে ভাসতে থাকে। সেক্‌সি রমাকে কিছুটা ম্লান মনে হতে চাইলেও সেই চাওয়াকে অগ্রাহ্য করে কল্যাণ রমার দিকে আগ্রহ নিয়ে তাকায়। একটা দুর্লভ মুহূর্তের প্রত্যাশায় উন্মুখ হবার জন্যে নিজেকে তাগাদা দেয়।

মা কে রান্নাঘরে পাঠাবার কারণ : রমা ভয় পাচ্ছিল বাবা সম্পর্কে কোন কটূক্তি মা না করে বসে। মা যে কী বলতে কী বলবে কল্যাণের কাছে। ভয় এই নিয়ে। বাবার ছবি আর মা'র চেহারা লোককে দেখাতে ওর সাধ : কোন ঘরের মেয়ে দেখুক। কিন্তু বাবা মা'র সঙ্গে বেশিক্ষণ আলাপ করতে দিতে ওর ভরসা হয় না—হয়তো এমন কিছু বলবে—প্রেষ্টিজ থাকবে না। বাবার অধঃপতন ঘটে গেছে শিল্পী জীবন থেকে, মা'র স্বভাব বহুদূরে চলে গেছে তাঁর সুশ্রী চেহারার কাছে থেকে। আজ ছবি আর বাবা ভিন্ন মানুষ—মা'র চেহারা আর মা এক নয়। কল্যাণকে কাছে পাবার চেয়েও মা কী বলতে কী বলে বসে তা নিয়ে রমার দুশ্চিন্তাতেই মাকে রান্নাঘরে নির্বাসনে পাঠান। তাছাড়া ভয় ছিল, কেবল বাবার প্রসঙ্গ উঠতে থাকলে মা অসন্তুষ্ট হবে। সেজন্যে ক্ষুব্ধ হয়ে বাবা সম্পর্কে কিছু বলে না বসে। তাছাড়া আরো কারণও ছিল, মা কল্যাণের স্ত্রী-পুত্রের সংবাদ নিতে থাকায় ওর মনে আজ যে এক মধুর উচ্ছলতা এসেছে তা প্রায় বিরস হবার মুখে—সেই উচ্ছলতাকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্যে মাকে বাইরে পাঠান, মা'র কাছে আবদার করে খেতে চাইল ও মধুর হয়ে কল্যাণের কাছে এল।

রমা একদৃষ্টিতে কল্যাণের দিকে তাকায়। সেই তাকানোর মধ্যে কল্যাণের মুখশ্রী সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ্যে আস্বাদন করবার চেয়ে, সেই দৃষ্টির মধ্যে নিজের চোখদুটোকে কল্যাণের কাছে ধরা দেবার চেয়েও, নিজের অনিচ্ছাসত্ত্বেও—কল্যাণের রূপ প্রকাশ্যে চুমুক দেবার ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও, চোখ দুটোকে আত্মসমর্পণের নির্দেশ দিয়েও—রমার দৃষ্টির মধ্যে কল্যাণের রূপ বিশ্লেষণ করবার, ওকে খুঁটিয়ে দেখবার একটা মোহযুক্ত বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি ফুটে ওঠে। রমা কিন্তু এই দৃষ্টি দিতে চায়নি।

কল্যাণের দিকে তাকিয়ে বলে,—মিথ্যে কথায় মিথ্যে কল্যাণ। তা আমি জানি। পরের কল্যাণে আমার লাভ কী?

স্মিত মুখে একদৃষ্টিতে রমার দিকে তাকিয়ে থাকে কল্যাণ। রমাকে খুব ভালো করে বিনা সঙ্কোচে দেখতে চায়। মুগ্ধ হবার জন্যে দেখতে চায়। আজ রমা অনেক কাছে, প্রগলভ ও মোহময়ী। তবু রমার এ রূপ যেন কেমন মানায় না। কেমন ভেতরে ভেতরে রমার এই প্রগলভতার চেয়ে সংযতবাক গম্ভীর, নিজেকে আড়াল করা, গাম্ভীর্যের গন্ডি টানা আর ঔদাসীন্যের ঘোমটা দেওয়া রমা যেন অনেক টানে। কিন্তু নিজের ভেতরের এই সূক্ষ্ম তৃষ্ণা কল্যাণ কিছুতেই স্বীকারও করে না, আমলও দেয় না। ও জানে, রমার এই প্রগলভ ও ধরা দেওয়া চেহারাকে ভাল লাগাই নিয়ম। রমা যে ধরা দিতে চাচ্ছে—এতে খুশি হওয়াই নিয়ম—এই হচ্ছে প্রেমের সবচেয়ে সর্বজন স্বীকৃত প্রথা—এই প্রথাই দুর্লভ মুহূর্ত।

বিনা সঙ্কোচে দুজনেই দু'জনকে দেখে। দু'জনেই জানে এ সময় পরস্পরকে চমৎকার লাগে। চমৎকার যে লাগছে একথা প্রত্যেকেই নিজেকে বোঝাতে চায়। কিন্তু বিনা সঙ্কোচে বিনা দ্বিধায় পরস্পরের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকবার পুলকই—সঙ্কোচকে অগ্রাহ্য

করবার আনন্দই—অনুভব করে। কিন্তু সেই অনুভূতিকেই ভালবাসা ও ভালোলাগা আত্মসমর্পণ ও কাছে পাবার অনুভূতি বলে ভেবে নেয়। নিজেকে আরো উত্তেজিত করবার জন্যে কল্যাণের ঠোঁটের দিকে তাকায়। কল্যাণ ভাবল, ও যে মুগ্ধ হয়েছে একথা বোঝার জন্যে ওর ঠোঁটে একটা.....। বা মুহূর্তের জন্যে বুকের কাছে টেনে নিয়ে ..... পরে বলব হঠাৎ তোমাকে এমন লাগতে লাগল ...... সামলাতে পারলাম না। কিন্তু দু'জনেই বসে থাকে। আস্তে আস্তে যেন অনেকটা নিজের মনে নিজেকে শুনিয়ে শুনিয়ে রমা বলে, বাবা, মা দু'জন দু'জনকে ভালোবেসে সকলের বিরোধিতার বিরুদ্ধে বিয়ে করেছিলেন। বাবা তখন আর্ট কলেজের ফাইনাল দেবে—মা'র বাবা ধনে মানে বর্ণে—কী বলব—মানী লোক।

রমার এই মাথা নিচু করে কেমন সঙ্কোচে ও বিনয়ে, কেমন আরক্তিম হয়ে বলবার মধ্যে এক নম্র সৌন্দর্যের প্রবলতা বোধ করে কেমন উত্তেজিত হয়ে ওঠে কল্যাণ। কল্যাণের ভয় ছিল, এই বুঝি বাবার বাইওডাটা শুরু করে। কিন্তু সেই ভয়ের কথা ওর মনেও এল না। রমাকে কাছে টেনে নিয়ে অজস্র চুমোয় চুমোয় ওর এই নম্র সৌন্দর্যের আবেদন সাড়া দেবার জন্যে আকুল হয়ে উঠল। উদাসীন রমা, অহংকারী রমা, নিজেকে আড়ালকারী রমা, প্রগলভ রমা, এমনকী কর্কশ রমাকেও দেখেছে—আজই কতরূপে দেখল। কত রঙ পাল্টাল, এখনকার এমন কোমল নরম অথচ উগ্র নয় এমন চেহারা—কল্যাণ কেমন যেন আবেগে বিহ্বল হয়ে যায়।

কেমন বিহ্বল অথচ কতটা বেমানান গদগদ ভাবে বলে, তুমি ভালবাসার সন্তান।

কল্যাণের চেহারা ও কণ্ঠস্বরে একটা অস্বাভাবিকতা শুনতে ও দেখতে পেয়ে রমা একটা নম্র ও অবাক চাহনি দিয়ে কল্যাণকে অভিষিক্ত করল। ও নিজের হাত দিয়ে কল্যাণের হাত স্পর্শ করল। কল্যাণের হাত কাঁপছে। ঠিক বাইরে থেকে বোঝা যায় না—ভেতরে ভেতরে কাঁপছে। প্রায় কল্যাণের মুখের কাছে মুখ নিয়ে রমা জানায়, তুমি কাঁপছ।

কল্যাণ রমার হাত তুলে নিজের বুকে রাখে। সত্যি বুকের কাঁপুনি স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে।

প্রায় বিকৃত ও ছলছল চোখে কল্যাণ বলে, তুমি অসাধারণ, অসামান্যা।

রমার চোখ দুটো জলে ভরে এল, থরথর করে কেঁপে উঠল সমস্ত শিরা-উপশিরাগুলো—কিন্তু নিজের সমস্ত কাঁপুনি ও অলস অবশকে যেন প্রায় অগ্রাহ্য করে রমা কল্যাণের ডানহাতটি কল্যাণের বুক থেকে নিয়ে নিজের বুকের 'পর রাখল। চেপে ধরল। কল্যাণ যেন শিশুর মত নিজের হাতকে রমার হাতে ছেড়ে দিল। এক মুহূর্ত। তারপরে হঠাৎ কল্যাণ যেন বাঁ হাত দিয়ে রমার গলা জড়িয়ে তাড়াতাড়ি ওর ঠোঁট দুটোয় বার বার কয়েকটি চুমো খেল। দূর থেকে রান্না ঘরে তপ্ত তেলে কিছু তরকারি ছেড়ে দেবার শব্দ কানে আসতেই রমার মনে হয়, কল্যাণ যেন এখনই না থেমে যায়। কল্যাণের কাছে বলতে ইচ্ছে করে—তোমাকে সব দিচ্ছি, তুমি আমার চিরকালের রাজার রাজা, তুমি সব—তোমার জন্যে না দিতে পারি—না করতে পারি—আমার দাবি, তুমি আমার—আমার—শুধু আমার, কেবল আমার। কিন্তু রমা হঠাৎ ঠিক হয়ে বসে। নিজেকে ছাড়িয়ে নেয়। ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে রুমাল বের করে কল্যাণের হাতে দেয়।

কল্যাণ আবদার করে—তুমি মুছে দাও।

একটু ঢেকে রমার ঠোঁটের যে রঙ কল্যাণের ঠোঁটে লেগেছে—যদিও খুবই অস্পষ্ট, তবু, যত্ন করেই রমা প্রায় কাঁপতে কাঁপতে মুছে দিতেই, কল্যাণ আবার চুমো দিল। এবার রমা হেসে রুমালটি কল্যাণের কাছে দিয়ে বাইরে বের হয়ে আসে। পা দুটোয় তখনও যেন জোর নেই। রান্নাঘরে আসে। মা আলুচচ্চড়ি বসিয়ে লুচির ময়দা মাখছে।

একটা জয়ের আনন্দ যেন দেহের উত্তেজনার সঙ্গে কল্যাণের শরীরে একটা অদৃশ্য শীতের কাঁপুনি ধরিয়ে দেয়। রমার দেহের প্রতিটি অণু-পরমাণুর সঙ্গে মিলনের একটা শুকনো পিপাসা যেন রমাকে জয় করবার আনন্দের সঙ্গে মিশে ভিতরে ভিতরে, প্রতিটি স্নায়ুর অন্তরে অন্তরে আলোড়ন এনে দিয়েছে। তবুও, দেহের তৃষ্ণাকে কল্যাণ সচেতন ভাবে অনুভব করে না—কেমন রমাকে এতকাল পরে জয় করবার, ওকে আড়াল থেকে আবিষ্কার করবার, লুকোচুরি খেলায় ওকে ধরে ফেলবার একটা নিজস্ব চাপা উল্লাসে কল্যাণ যেন স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে। কিন্তু সেই সঙ্গে একটা আশাভঙ্গের বেদনাও যেন গোপন করতে পারে না—অস্বীকার করতে চায়—কিন্তু একটা মোহভঙ্গ যেন জোর করে চাপা উল্লাসের উৎস ধরে টান দিতে থাকে, উল্লাসের সঙ্গে একছটাক মোহ-ভঙ্গের মিশেল যেন সবকিছুকে ফিকে করে দিতে চায়। রমাকে চুমো অবিকল রীনার মতো। রমাকে চুমো খেতে যেরকম লেগেছে রীনাকেও তাই লেগেছিল। শুধু অজানা, উত্তেজনা বাদ দিলে কেমন রমার চুমোকে রীনার মতই মনে হয়েছে। রমার অত আড়াল করা আত্মগোপন, এত প্রাচীর, মহাপ্রাচীরের অন্তরালে সেই ঠোঁট—তেমনি ঠান্ডা নরম, ভেজা রীনার ঠোঁট। কেমন একটা ঠিক মোহভঙ্গের মুক্তি নয়, কিছুটা প্রত্যাশা খর্ব হবার মত দমে যাওয়া ভাব রমাকে জয় করবার উল্লাসের সঙ্গে মিশে যায়। আর সঙ্গে সঙ্গে রমার ঠোঁট রীনার ঠোঁট একরকম ভেবে নিজের অজান্তেই স্থির করে ফেলে, আজ চোখ বুজে রীনাকে রমা মনে করে ঠোঁটে......। রীনার ঠোঁট রমার মতো মনে হওয়ার রমার 'পর কেমন যেন কল্যাণের দাবিও বেড়ে যায়। দেহের 'পর আকর্ষণ বোধ করতেই কল্যান নিজেকে আশ্বাস দেয় আজ রীনাকে রাতে.....। সঙ্গে সঙ্গে বহুভাবে বহুরকমভাবে দেখা রীনার নগ্নদেহ চোখের সামনে ইচ্ছে করেই ফুটিয়ে তুলল। কিন্তু উত্তেজিত হতে পারল না। বরং কল্যাণের কোলের 'পর ফেলে হেসে রমার বাইরে বেরিয়ে যাওয়ার ছবিটি মনের মধ্যে একটা অফুরন্ত আরাম ও প্রশ্রয়ের মোহ এনে দেয়—রমার ঠোঁট রীনার ঠোঁট একরকম হবার একটুখানি ক্ষুণ্ণতার বোধ থাকা সত্ত্বেও ..... আরও একটা ভাললাগা কল্যাণকে তন্ময় করে দেয় রমা ওকে রুমাল দিল—কল্যাণের রুমালে ঠোঁট মুছলে পাছে সেই রঙ লাগা রুমাল রীনার মনে সন্দেহ এনে দেয় এ খেয়াল বুদ্ধিমতী রমার রয়েছে অবশ্য ওর মা হয়ত এখনি এসে যদি কল্যাণের ঠোঁটে রঙ দেখতে পায় সেজন্য তাড়াতাড়ি মুছতে বলল বটে, কিন্তু কল্যাণের নিজের রুমাল দিয়ে কল্যাণকে মুছে দিতে বলতে পারত বা কল্যাণের রুমাল দিয়ে রমাই মুছে দিতে পারত। কিন্তু রমা নিজের রুমালে নিজে মুছে দিল ওর ঠোঁট। শরীরে একটা শিহরন ঘটে যাওয়া উচিত অন্ততঃ কল্যাণের নিজের এরকম প্রত্যাশা থাকে। তবু, ইচ্ছে করেই। চেষ্টা করেই, কল্যাণ কিছুটা শিহরনের নামে নিজেকে খুব মৃদু ঝাঁকি দেয় ...... ঠোঁট মুছিয়ে দিয়ে রুমাল দিয়ে

গেল। রুমাল হাতে করে বসে থাকে। চুমো দেওয়া ও খাওয়ার চেয়েও যেন রুমালটির মধ্যে অনেকখানি প্রশ্রয় ও প্রচ্ছন্ন আত্মসমর্পণ দেখতে পায়। ঠোঁট মুছিয়ে দেওয়ার মধ্যে যেমন রমার প্রশ্রয়, আশ্রয় ও দুইজনের এক গভীর একান্ত গোপন আপন ব্যাপার আছে আজ রমা তা স্বীকার করে নিল—প্রমাণ দিয়ে গেল। জয়ের আনন্দ, প্রশ্রয়ের উচ্ছ্বাস, আশ্রয়ের ভরসা, ঠোঁটের স্পর্শ, রুমাল দিয়ে মুছিয়ে দেওয়ার যত্ন সব মিলে কল্যাণের চেতনায় যেন একটা ঘোর এনে দেয়। বসে থাকতে ইচ্ছে করছিল। কিন্তু পারল না। উঠে আবার ছবিগুলোর কাছে আবার দাঁড়াল। ছবির দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে ভাবল, রমার ও গলা জড়িয়ে ধরেছিল—কোনো বাধা দেয়নি। রমা নিজের বুকে ওর হাত ..... নরম তবে রীনার মতো অত গভীর নয় .....। এবার সত্যি সত্যি ওর শরীরে শিহরন খেলে যায়।

মাকে মনোযোগ দিয়ে ময়দায় ময়ান দিতে দেখে রমার অনুতাপ হয় আর একটু কল্যাণের কাছে বসলেও হত। মা'র দিক থেকে নিশ্চিত হয়ে নিজের ঘরে যায়। জামাকাপড়গুলো ছেড়ে সহজ স্বাভাবিক আটপৌরো সাজ সাজতে ইচ্ছে হচ্ছিল। মাকে নিশ্চিন্ত ও নির্ভাবনা দেখে একদিকে যেমন তাড়াতাড়ি চলে আসবার জন্য অনুতাপ হচ্ছিল। অন্যদিকে ঠিক কল্যাণের কাছে যেতে কেমন যেন সাহস হচ্ছিল না। নিজেকে প্রকাশের সঙ্কোচ, চুমো ও বুকে হাত দেওয়ার জন্যে লজ্জা, কল্যাণের দিকে কেমন করে তাকাবে সেই ভাবনা, আবার গেলে কল্যাণ কী করে বসে—মা কখন উঠে মিষ্টি আনতে যাবে—আবার কল্যাণের কাছে যাবার ইচ্ছা সব কিছু তালগোল পাকিয়ে পিন্ডাকারে অন্তত তাড়াতাড়ি রমার চেতনায় ঘূর্ণির মতো পাক খেতে থাকে। ওরই মধ্যে চুমো ও বুকে হাত দেবার চিত্রটি মনে ভেসে উঠতেই রমা শিউরে উঠল। সমস্ত শরীরে শিহরন প্রায় কম্পনের মতো। জামা-কাপড় না ছেড়ে রমা নিজের ঘরে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। মা'র কাছ থেকে যেতে সাহস হয় না—ঠিক এভাবে কিছুক্ষণের জন্য পালিয়ে থাকতেও ইচ্ছে হয় না, আর নিজের ভেতরের উচ্ছলতাকে শুকিয়ে দিতেও ভরসা হয় না। কল্যাণের হাত নিজের হাতে বুকের মধ্যে নেওয়ার শিহরনের চেয়েও, অত আপন করে কল্যাণের হাতটি ধরা, অত আপন করে ঠোঁট মুছিয়ে দেওয়া—কল্যাণকে অমন আপন করে নেওয়ার ভাবটিকে এই মুহূর্তে হারিয়ে যেতে দিতে ওর ইচ্ছে করে না অথচ বেশিক্ষণ নিজেকে একা রাখলে পাছে তা শুকিয়ে যায়, হারিয়ে যায়, জুড়িয়ে যায়, এজন্য ভয় করে। রমা নিজের কথা চোখ বুজে ভাবে, আজ আমি প্রথম চুমো পেলাম। কল্যাণের মুখ যেন ওর মুখের 'পর—সেই ফর্সা ঠোঁট, টিয়ার মতো নাকের গড়ন—সেই তপ্ত শ্বাস রমা আবার চোখ বুজে অনুভব করে। ভাবে, রাতে শুয়ে শুয়ে সব স্পষ্ট করে ভাবব। আজ প্রথম চুমো পেলাম—খেলাম। আজ আবার বুকে ..... রমা নিজের হাতকে কল্যাণের হাত করে বুকের 'পর রাখে। তারপর হঠাৎ আয়নার সামনে দাঁড়ায়। এখন নিজেকে কেমন লাগছে—তখন কল্যাণের চোখে কেমন লেগেছিল .... কেমন শুকনো শুকনো .... ঝগড়ার পর মনে কেমন অবসাদ আসে .... ওর চেহারার দেহের সেই অবসাদ অথচ মনে কোনও অবসাদ নেই ....। নিজের শুকনো চেহারা ভাল লাগে না। না চোখ মুখ ধোব না। ভাববে, আরও চুমো খাওয়ার জন্যে ঠোঁটের রঙ ধুয়ে এলাম।

হাত দিয়ে ঠোঁট ঘষে হাতটি দেখল কেমন রঙ আছে। যা আছে আছে। কেমন ভয় হতে থাকে, এতক্ষণ কল্যাণ বসে আছে। এতক্ষণে হয়ত পর হয়ে গেল। নিজের চিন্তার এই হাস্যকর অসঙ্গতি কিন্তু ওর চোখে ধরা পড়ে না। আবার ঘর থেকে বের হয়। ভাবে, কাপড়টি অন্তত ছেড়ে ফেলি—নইলে বাইরে কেন এলাম—কী বলব? যাক্‌গে, কিছুই বলব না। বাইরে এলাম, আমার ইচ্ছে। কোন কারণ, কাউকে আজকে নয়।

এবার মা রমার দিকে তাকান।

—সারাদিন খাসনি .....।

রমা মনে মনে বলে আজ যা খেলাম, কোনদিনও খাইনি। মা বলে চলেন, আগে এসে বলবি তো। ভাবছিলাম, ধর আজকে না হয় ছেলেটি এসে পৌঁছে দিল, রোজ রোজ কী আর পনেরো টাকা খরচ করে পৌঁছে দেবে?

রমা মনে মনে বলে, খুব দেবে রোজ দেবে। একথা ভাববার সঙ্গে সঙ্গেই যেন কল্যাণের 'পর অধিকার বোধ করে। সঙ্গে সঙ্গে যাবার জন্যে ব্যাকুল হয়। ব্যাকুলতা বোধ করে আনন্দিত হয়ে রমা মাথা নেড়ে মা'র কথায় সায় দেয়। ভাবখানা, ঠিকই তো—রোজ রোজ কে পৌঁছে দেবে?

মা'র কাছে আবার রান্নাঘরে রমা এসে দাঁড়াতেই—মা আরও একটু প্রসন্ন হন। মানি গুণী লোক এলে তখন যে ছুটে মা'র কাছেই আসতে হয়—সামাল দেবার জন্যে মারই ডাক পড়ে যতই বাপু আর্টিস্ট মিত্তির মিত্তির কর রমা তাকে স্মরণ করায় তিনি কিছুটা গর্ববোধ করে রমাকে প্রসন্ন দৃষ্টিতে দেখেন। বিপদে পড়লে তখন যে মাকে ছাড়া চলে না—যতই বাপের পক্ষ নিক—তখন ছুটে মাকে নিয়ে যেতে হয়—এ খেয়াল রমার আছে দেখে তিনি একটু প্রীত হন। কিন্তু বেশি সন্তুষ্ট হতে ভরসা পান না। কারণ যেদিন একটু মন ভাল থাকে সেদিনই রমার বাবার টান উঠবে—কি নিদেন একটা ঝগড়া হবে।

—তোর বাবা যদি চলাফেরাটা করত তবুও তোকে অফিস থেকে গিয়ে নিয়ে আসতে পারত। মেয়ের মুখে বাবার অক্ষমতা ও নিজের প্রশংসা শোনবার ইচ্ছেয় তিনি এ প্রসঙ্গটি তোলেন। রমা যেন তন্ময় হয়ে মা'র ঠোঁটের দিকে তাকায়। অজস্র চুমোয় চুমোয় একদা .... কী ভাবছি এসব ছিঃ। মা'র লালচে সরু পাতলা ঠোঁট ..... দাদার দেহ শ্মশানে নিয়ে যাবার আগে মা পাগলের মত ওকে চুমো খাচ্ছিলেন ..... কই, মা তো আমাকে কোনদিনও চুমো ...... না, মনে পড়ে না।

—আচ্ছা মা, ভদ্রলোকের চেহারার সঙ্গে দাদার মিল আছে না?

চ্যাটার্জি নয় শুনে তিনি যে সাদৃশ্য বাতিল করেছিলেন—রমার মুখে তা শুনে সঙ্গে সঙ্গে বলেন—আমার প্রথমেই মনে হয়েছিল।

রমাও জানে, কল্যাণের সঙ্গে ওর দাদার মিল নেই। একথা বললে, কল্যাণের 'পর মা যেন একটু প্রসন্ন হয়। কল্যাণ হয়ত আরো আসবে ..... তখন যদি মা সন্দেহ .... রমা আর ভাবতে চায় না। দাদার মতো বলে একদিকে যেমন কল্যাণ সম্পর্কে একটু মন ভিজিয়ে রাখল, অন্যদিকে তেমনি বাবার প্রসঙ্গ তোলাও বন্ধ করে দিয়েছিল। অভ্যাসবশত মা'র মুখে বাবার নিন্দে শোনবার ক্রনিক অনিচ্ছাতেও। আজ কিন্তু খুশির জোয়ার আর খুশিকে জিইয়ে রাখবার জন্যে রমা বলল—বাবা যেন কেমন হয়ে গেলেন।

বাবা ঠিক থাকলে কী আর আমাকে অফিসে যেতে হত।

খুশিতে মা অবাক হয়ে যান। এতকাল যাকে বাবার পক্ষের লোক জানতেন—ভেতরে ভেতরে তারও তবে বাবার সম্বন্ধে অভিযোগ আছে। রমার মা আজ উর্ধ্বে উঠলেন না। খুশির ঝলক গোপন করে শুধু বললেন—এ রকম পাত্র পেলে, আজও তোর বিয়ে দিয়ে দেব। ছেলেটি ব্রাহ্মণ, বিয়ে করে ফেলেছে।

খুশির জোয়ারে রীনার প্রশংসাও করে রমা—বউটি পরমা সুন্দরী, বড়লোকের মেয়ে, এম এ পাশ। রমার মা'র মনে হয়, ঐ ছেলেটির বউয়ের প্রশংসার নামে যেন রমা নিজের নিন্দে করে তাকে বলতে চায়, তোমাদের মেয়ের কিছু মূল্য নয়। তিনি নিজেই রমার চেহারার এত নিন্দে করেছেন—এখন সেই নিন্দে রমা ফিরিয়ে দিচ্ছে আত্মনিন্দে করে। তাছাড়া, রমা নিজের চেহারার নিন্দে করলে আজ তার রমাকে সান্ত্বনা দেওয়ার পথও নেই। তাছাড়া বড়লোকের মেয়ে কথাটির মধ্যেও একটা খোঁচা দেখতে পান। এরকম পাত্রের জন্য রমার মা'র প্রত্যাশা থাকা উচিত নয়—কারণ তারা গরিব। সবশেষে এম এ পাস। না জানি কেমন ইংরাজি বলে, হয়ত মেমদের মতো। একবার মনে হল, হয়তো রমা খোঁচা দেবার জন্যে বলেনি—শুধু জানিয়েছে—ওরা আমরা অনেক ফারাক। তবু রমার কথার মধ্যে খোঁচা আছে কী না ঠিক বুঝতে না পারলেও, রমা যে দেখতে সুন্দরী নয়—এ সম্পর্কে সে সচেতন—একথা যেন আজ তাকে একটু ক্ষুব্ধ করল। রমার জন্য যেন অনুতাপের একটা হালকা ছায়া অনুভব করলেন। নিজে রমার নিন্দে করলেও, কেমন ধারণা ছিল, পাত্রী হিসাবে রমা লোভনীয় হবে। আজ যেন সেই ধারণার প্রথম আঘাত পেলেন। হঠাৎ রমার খেয়াল হল, কল্যাণের স্ত্রীর প্রশংসা করায় মা হয়তো ভাবছে, পাত্র হিসাবে কল্যাণকে আমার পছন্দ—কেবল পরমা সুন্দরী বড়লোকের এম এ পাস মেয়ের সঙ্গে বিয়ে হয়ে যাওয়ায় আমি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলছি।

এবার স্বাভাবিক কণ্ঠে রমা জানায়—আমি অফিসে জয়েন করবার আগেই মিস্টার চ্যাটার্জির বিয়ে হয়ে গেছে।

কথাটি সত্য নয়, রমা কাজে যোগ দেবার পরই বিয়ে করেছে। তখন কল্যাণ বিশেষ কোনও মনোযোগ দিত না রমার 'পর। রমারও এই সুশ্রী অফিসার সম্পর্কে খুব একটা কৌতূহল যে ছিল তা নয়—সুশ্রী পুরুষ দেখলে যে আড়ষ্টতা ওর সহজাত ছিল, যে উদাসীনতা অভ্যস্ত ছিল—সেই আড়ষ্টতা ও উদাসীনতা ছাড়া কিছু ছিল না। আসলে রমাকে আবিষ্কার করেছে কল্যাণই। কল্যাণই রমাকে জাগিয়েছে। আনমনে কত ভেবেছে রমা, হয়ত স্ত্রী আসার পরেই নিজের জাগরণ ঘটেছে বলে কল্যাণ আর কতজনকে জাগিয়ে রাখতে পারে সেই শক্তির পরীক্ষা করছে। কল্যাণের ভালবাসা কী ওর রূপে প্রভাবের একটা রিপোর্ট? কতজনকে প্রভাবে আনতে পারে সেই সংখ্যাতত্ত্বের 'পর ঝোঁক? না, অন্তরের অনুভূতির বিস্তার? ভালবাসা একজনকে ছাপিয়ে অনায়াসেই অন্যজনকে, রমাকে উচ্ছ্বাসিত প্লাবিত করছে? কত সময়ে রমা ভেবেছে, ওর যদি অত রূপ না থাকত—তবে হয়ত রমার পক্ষে সাড়া দেওয়া আরও সহজ হত। তবুও, আরও কম রূপের কল্যাণ ধারণায় আসে না। মনও এমন কল্পনার যেন উৎসাহ বোধ করে না। রমা তো ভেবেছিল, ভাবত। এবার রমার মনে হয়, অনেকক্ষণ কল্যাণ একা। মনে

হল, অনেকক্ষণ এসেছি। নিজেকে সান্ত্বনা দেয়, আগামীকাল অবশ্য দেখা হবে। আগামীকাল বিকালে ..... আর আগমীকাল তো টিউটোরিয়াল নেই—তবে শর্টহ্যান্ডের ক্লাস .....। কিন্তু কল্যাণের কাছে গেলেই কেমন যেন ধরা পড়বার লজ্জায় পড়তে হয়। গেলে যদি স্বাভাবিক না হতে পারি, যদি স্বরভঙ্গ হয়, ওর চোখের দিকে তাকানো ....। নিজের লজ্জা ভুলবার জন্য একবার ভাবল, ওর কাছে ওর বউ এসেছিল, সেই কথা একবার ভাবি, তাহলে মন তেতো হয়ে যাবে। তখন অনায়াসে আগের চেহারায় ওর কাছে হাজির হতে পারব। ও দেখবে, অফিসের রিসেপশনিস্ট হাজির। কিন্তু রীনার কথা ভেবে ভেবে মনকে তেতো করতে আর্জকে রমার ইচ্ছে হল না। নিজের মনে এমন সুন্দর ভাললাগাকে হারিয়ে যেতে দিতে ওর প্রাণ চায় না। তাছাড়া রীনার কথা মনে হওয়া সত্ত্বেও যখন স্মৃতির ঐ একফোঁটা তিক্ততায় মন তেতো হল না—রীনার চেহারায় মনে ভাবান্তর হল না—তখন জোর করে ছাড়া মন বেসুর হবার উপায় নেই। জোর করে মনখারাপ করতে হয়। আজ রমা নিজেকে কষ্ট দেবে না—আজকের আধঘন্টা আগেকার কথা মনে আনবে না—আর কল্যাণ চলে যাবার পরেকার কথাও ভাববে না। আজকের এই মুহূর্তটি দ্বীপের মতো—অতীত আর ভবিষ্যতের সঙ্গে সকল রকম মাসি পিসি ভাইবোন বন্ধু সম্বন্ধহীন। একথা ভাবতে ভাবতে মনে একটা কেমন ভাললাগার জোর অনুভব করে। তারপর কল্যাণের কাছে যাবার খিদে বোধ করেই মাকে বলে—মিষ্টিটা আমি নিয়ে আসব দোকান থেকে?

—না, তুই বোস গিয়ে—একা রয়েছেন।

মা ভয় পান। হয়ত রমা একগাদা মিষ্টি নিয়ে আসবে। হয়ত ভদ্রতা করে একখানা একটু ভেঙে মুখে দেবে—বাকি পয়সাই নষ্ট। মিষ্টির কী দাম—আর কী ছোট্ট সাইজ। ছানা কন্ট্রোল। কাউকে মিষ্টি দিতে তার প্রাণ চায় না। মিষ্টি ফেললে দারুণ রাগ হয়। ছেলেটা একটা মিষ্টি মিষ্টি করে কেমন পাগল হয়ে উঠত। তিনি অন্যমনস্ক হয়ে যান। তিনি ছেলের জন্য যেমন ব্যাকুল হন—কই তার বাবা মা তার জন্যে এত ব্যাকুল হল না কেন? তিনি আছেন কী নেই কেউ তার খোঁজ করল না। সবাই তাকে অনায়াসে হারিয়ে যেতে দিল। মাও কী তার কথা ভাবলেন না। নিজের বংশের অহংকারই বড় হল। অনেক সময় মনে হয়, তিনিই হয়ত অত দুর্বল। দুর্বল বলেই রমার বাবার ভালবাসাকে উপেক্ষা করতে পারেননি, দুর্বল বলেই নিজের বাবা-মা-ভাই-বোনকে অহরহ মনে মনে কামনা করতেন। দুর্বল বলেই 'অবন'কে এক মুহূর্তেও ভুলতে পারেন না—দুর্বল বলেই রমার জন্যে সন্ধ্যে হলেই ব্যস্ত হয়ে ওঠেন—দুর্বল বলেই পার্ক থেকে আবার বেহায়ার মতো ফিরে আসেন। অথচ যারা ওঁকে জানে—ভাবে, কী শক্ত মেয়েমানুষ, অতবড় বাপের বাড়ি টাকা পয়সা ধনমান উপেক্ষা করেছে, দুঃখ দারিদ্র্যের মধ্যে—কতদিন কিছু না খেয়ে কাটিয়েছে—চাল অল্প থাকলে ছেলেমেয়ে বাপকে দিয়ে নিজে খায়নি—বলেছে 'ব্রত করেছি'। অমন ছেলেটা গেল। স্বামী চিররুগ্‌ণ—তবু, সংসার করে যাচ্ছি। 'ব্রত করেছি'—ব্রতের নামে মিথ্যে কথা বলা ঠিক নয়—ভগবান রাগ করেন। কম রাগ তো করলেন না—কম শাস্তি পেলাম না। বাপের বাড়ি ছেড়েছি বলে ভগবান কম শাস্তি দেননি—তবু কপালে আরও কত কী রয়েছে, কে জানে। আলু-

কপির চচ্চড়ি ঝাপসা হয়ে আসে। দরজার দিকে তাকান। রমা চলে গেছে। আঁচল দিয়ে চোখ মুছে আবার ময়দা মাখতে থাকেন। তীক্ষ্ণভাবে লক্ষ্য করতে চান, দুজনের তুলনায় ময়দা বেশি হয়ে যায়নি তো। ভাগ্যিস এবার রেশনে ময়দা ছেড়ে দেননি।

নিঃশব্দে রমা দরজার সামনে দাঁড়ায়। কল্যাণ টের পায়নি। একমনে ফটো দেখছে। নিজের অজান্তে রমার কণ্ঠ থেকে নরম একটা জিজ্ঞাসা বের হয়—কী দেখছ? কল্যাণ একটু চমকে যায়।

—তুমি খুব নিঃশব্দে আসতে পার-? এ আমি অনেকদিন আগেই টের পেয়েছি। কখন যে অন্দর মহলে এলে—টের পেলাম অনেক পরে—যখন প্রশ্ন করলে, কাকে দেখছ? যাক্, তাকিয়ে ছিলাম বটে—তবে যাকে দেখতে পেলাম এখন—দেখতে চাচ্ছিলাম এতক্ষণ। রমার মনে হল কল্যাণ চটপটে জবাবে অভ্যস্ত—এখন যেন আস্তে আস্তে প্রতিটি শব্দ অনুভূতি দিয়ে স্নান করে প্রকাশ করছে। মনে হল, কথাগুলো যেন অনেক গভীরের। ধপাস করে সোফায় বসে রমা যেন আবদারের মতো বলে—আজ যা বলবে—সব বিশ্বাস করব। —তবে হয়তো বিশ্বাসযোগ্য করে বলতে পারব না। অথচ অনেক গভীর থেকেই কথাগুলো আসছে। মর্ম থেকে কেটে কেটেই উঠে আসছে। উদাহরণটি আনরোমান্টিক—কয়লাখনির মধ্যে থেকে যেমন কেটে কেটে তোলা হয়—বেরিয়ে আসছি তাড়াতাড়ি লিফটে—জমেছিল কিন্তু বহুকাল। সোনার খনি দেখেছি—তাই কয়লা খনির কথা বললাম। কয়লার উদাহরণটি ভাল। কারণ কাঁচা কয়লার জ্বলতে হয়। আমাকেই হবে।

রমা বলতে যাচ্ছিল, আমাকে দেখে সোনার খনি মনে আসবে না—কয়লার খনিই আসবে। তুমি আজ বিশ্বাসযোগ্য কথাই বলছ। কিন্তু রমা নিজের অজ্ঞাতসারেই যেন বলে, আমি কয়লার খনিও দেখেনি। কিছুই দেখেনি।

আমিও যে বিশ্বরূপ দর্শন করেছি তা নয়, তবে যখন কেউ অপরূপ হয়—তখন আমি দেখবার সুযোগ পেলাম। আর আমার গর্ব—আমার নাছোড়বান্দা তাগাদাতেও অপরূপার প্রকাশ।

—কেন বলতে ভয় পাচ্ছ, তোমারই স্পর্শে পান্না হল সবুজ?

—না যা ছিল সবুজ মাত্র, আমার কাছে হল পান্না।

দু'জনেই দু'জনের দিকে তাকায়। কেউ চোখ নামায় না। যেন কতক্ষণ দু'জন দু'জনের দিকে তাকিয়ে থাকতে পারে তার প্রতিযোগিতা। আস্তে আস্তে রমার দৃষ্টি থেকে কল্যাণের নাক, মুখ, চিবুক সব মিলিয়ে গিয়ে দুটো উজ্জ্বল ও জ্বলজ্বলে, কেমন আমুদে, কেমন রঙ্গপ্রিয়, কেমন হাসি হাসি দুটো চোখ মাত্র থাকে। কল্যাণেরও দৃষ্টি থেকে রমার নাক, মুখ, চোখ, বগল, কপাল সব মিলিয়ে গিয়ে একটু ভেতরের টানা টানা দুটো বিষণ্ণ, ক্লান্ত, বেদনাতুর চোখ মাত্র থাকে। চুপচাপ কাটল। ঘরে এলাম দেওয়া টাইমপিসটা এবার নিজেকে জাহির করবার সুযোগ পায়। রমার মনে হল, কল্যাণের চোখ দুটোর মধ্যে কেমন একটা মাদকতা—চোখ দুটো জোর করে নিজেকে জাগিয়ে রাখবার জন্যে যেন নেশাগ্রস্ত হবার চেষ্টা করছে। এবার মনে হল, আড়ষ্টতা কাটিয়ে চোখ দুটো এবার পুরোপুরী নেশাগ্রস্ত হয়ে উঠেছে। কল্যাণের দৃষ্টি যেন নিজেকে ছাড়িয়ে এবার রমাকে

আচ্ছন্ন করতে চাচ্ছে—নেশায় রমাকেও সংক্রামিত করতে আরম্ভ করেছে। ওর দৃষ্টি যেন জোর করে চোখের পর ওকেও নেশা করাতে চায়। জোর করে মদ খাওয়ানোর মতো। ভিতরে ভিতরে দৃষ্টি নামিয়ে নেবার ইচ্ছা হয়—কিন্তু মন চায় না। কেমন একটা নিঃসঙ্কোচ, কেমন একটা বিবস্ত্র হবার, কেমন সব কিছু প্রকাশ করবার, হাল্কা অনুভূতি তলে তলে কাজ করে চলেছে—মনে হচ্ছে, দৃষ্টি নামিয়ে নিলেই তা শেষ হয়ে যাবে। এবার কল্যাণের মনে হয়, রমার দৃষ্টির বিষণ্ণতার ও ক্লান্তির অন্তরালে আস্তে আস্তে একটা শুকনো কঠিন তীক্ষ্ণতা যেন প্রকাশ পাচ্ছে। রমার দৃষ্টির মধ্যে যেন একটা তিরস্কার—ঠিক তিরস্কার না তৃষ্ণা বোঝা যায় না—তৃষ্ণা হলেও সেই তৃষ্ণার আগুন স্পর্শ করলেই কল্যাণ পুড়ে যাবে—অতখানি সাহস কল্যাণের নেই—এই জ্বলন্ত দৃষ্টি—যে দৃষ্টি বিষণ্ণতার, ক্লান্তির আড়ালে থাকে—তাকে টেনে নেওয়া যে যাবে না এ যেন একটা জ্বলন্ত সত্য—এ নিয়ে প্রশ্ন নেই—যদি তিরস্কারও হয়—তবু তার প্রতিবাদের পথ নেই—এই তিরস্কারের দৃষ্টি মাথা পেতে নিতে হবে। কল্যাণের কেমন ভয় করে। মনে হয়, চোখ বুজে রমাকে দখল করে রাখি—চোখ খুললে ওকে দখল করা যায় না। যখন চোখের সৃষ্টি হয়নি—তখনকার যুগে রমাদের দখল সহজ ছিল। আজ নয়। রমার দৃষ্টির তীব্রতা থেকে আত্মরক্ষা করবার জন্যেই সচেতন হয়ে ভাবল, রীনার সঙ্গে এমনি চেয়ে থাকবার কম্পিটিশন একদিন .....।

কিন্তু প্রথম চোখ নামিয়ে চোখের জল মুছে রমা বলল—টাইমপিসটার শব্দ যেন আমাদের হৃদপিন্ডের সিম্বল।

—চোখ নামিয়ে স্বস্তি লাভ করে কল্যাণ উত্তর দেয় অ্যালার্মিং সিম্বল।

—আবার স্পষ্ট করে তাকিয়ে রমা জিজ্ঞেস করে, কী দেখলাম আমরা—আমাদের চোখে?

—এই মুহূর্তে রমার দিকে তাকিয়ে কল্যাণের ভয় এল, আবার বুঝি এক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকবার প্রতিযোগিতায় যোগ দেবার জন্যে রমা নীরবে ডাকছে। একটু অন্যদিকে তাকিয়ে আবার রমার চোখের 'পর চোখ মেলে বলল—দুজনেই দুজনের কাছে যা চাই, তাই দেখলাম। দুজনেই দুজনকে যা মনে করি, যা ভাবি, যা ভাবতে চাই, তাই মনে করলাম, ভাবলাম, দেখলাম।

বলতে বলতেই কল্যাণ একবার রমার চোখের দিকে, হাতের দিকে, তাকাচ্ছিল। যদিও রমার মুখের দিকেই তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছা করছিল, কিন্তু পাছে আবার চেয়ে থাকবার কম্পিটিশনে নামতে হয় ....।

রমার কেমন একটা কান্না পেতে লাগল। ইচ্ছে হল—প্রাণ ভরে কাঁদে। এমন আন্তরিক কান্নার লোভ ওর কোনদিনও হয়নি। জীবনে কত কেঁদেছে—দাদার মৃত্যুতে কেঁদেছে, অনার্সে সেকেন্ড ক্লাস পেয়ে গোপনে কেঁদেছে, রূপের নিন্দে মায়ের কাছ থেকে শুনে এই তো সেদিনও কেঁদেছে। কিন্তু সে সব কান্নায় অপমান ছিল, অবহেলা ছিল, শোক ছিল, বঞ্চনা বেদনা ছিল। আজ ওর মনে হচ্ছে, আজকে কাঁদলে প্রাণে শান্তি আসবে, বুকের ভার কমে যাবে, আরাম পাবে। অন্যদিন অপরে ওকে কাঁদতে বাধ্য করেছে—আজ ও নিজে কাঁদবে। স্বেচ্ছায়, স্বানন্দে, লোভে, আরামে একা একা হু হু

করে প্রবলভাবে অবিরলভাবে, ঝড়ের মত, শান্ত ও স্রোতের মত যেন ইচ্ছে করে তেমনি কাঁদবে। অন্যদিনের কান্না পরাধীন—আজকের কান্না স্বাধীন। অন্যদিনের কান্নায় চোখের সামনে স্থূল কারণ থাকে—আজকের স্বতঃস্ফূর্ত কান্নার কোনও কারণ রমা দেখতে পায় না, দেখতে চায় না, খুঁজতেও চায় না। প্রশ্রয় পেয়ে একটা আকণ্ঠ কান্না গলার কাছে এসে ওর কথা বলবার শক্তিকে বিপর্যস্ত করে দিল। আজ কল্যাণের সামনেই কাঁদতে ইচ্ছে করছিল—ওকে কাঁদতে দেখে কল্যাণও তো সজল সহানুভূতিতে ভিজে উঠবে এমন একটা আন্তরিক ইচ্ছেও ওকে কাঁদবার লোভ দেখাচ্ছিল। কিন্তু সেই সঙ্গে আবার কল্যাণ ওর কান্নায় বিব্রত হতে পারে, অপ্রস্তুত হতে পারে, ওর কান্নাকে আপদ মনে করতে পারে সেই ভাবনাও ক্ষণে ক্ষণে মনে আসতে থাকে। সবচেয়ে বেশি মনে থাকে, কাঁদলে হয়ত ওকে বিশ্রী দেখাবে—কল্যাণের রিপালসিভ মনে হবে। রমার কেমন ধারণা—ওর চেহারায় কান্না মানায় না—কাঁদলে একা একা নিজের কাছে কাঁদতে হবে। তবু কেমন যেন মনে হয় আজ, হয়ত কল্যাণের কাছে কাঁদা যায়। না হয় মুখ ঢেকে কাঁদব। না, কখন মা এসে যাবে কে জানে। কাঁদা যাবে না। রাতে শুয়ে শুয়ে আজ একা .... আজ আকণ্ঠ কাঁদব ..... কিন্তু পাশে মা .... টের পেলে .... কোথায় কাঁদবে .... কার কাছে কাঁদব। রমার মনে হল কান্না উঠবে এক্ষুনি....। চোখে জল তবু এসে গেল। আঁচল দিয়ে তাড়াতাড়ি চোখ মুছে যেন আনমনে বলে—একটু একদিকে তাকলে চোখে এমন স্ট্রেন পড়ে।

কথাটি স্বাভাবিকভাবে বের হয়ে আসতেই কান্না এসে পড়বার ভয় প্রায় কেটেই যায়। একটু স্বাভাবিক হয়ে বসে কল্যাণের দিকে তাকায়।

কল্যাণের মনে হয়, চোখে জল আসাতে রমা বিরক্ত হয়েছে। এই বিরক্তি যেন পুরনো রমাকে ফিরিয়ে আনছে। রমা যেন আবার পুরনো রমায় ফেরত যাচ্ছে। কল্যান যেন একটু ব্যস্ত হয়ে ওঠে। ওর মনে হয়, এক্ষুনি চলে যাওয়া উচিত। যতদূর আজ এগিয়েছে—এর চেয়ে বেশি এগুনো রমার সহ্য হবে না, হয়ত ডোজ বেশি হয়ে যাবে। এখন যদি যাই—বাকিটা স্বপ্নময় হবে। মনে হয় একদা তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়বার কৈফয়ত হিসাবে বলেছিল, প্রেমে জাগরণ ও ঘুম দুইই দরকার—নইলে ভালবাসার স্বাস্থ্য নষ্ট হয়ে যায়। প্রেমে কিছুটা জাগরণ—বাকিটা স্বপ্ন দেখা চাই—এইই প্রকৃতি। নবজাতক ভালবাসার ঘুমটা বেশি হওয়া চাই—স্বপ্নই বেশি সময় জুড়ে থাকবে—এই ভালবাসার স্বাস্থ্যবিধি। আজও মনে হল, এক্ষুনি ওঠা দরকার। রমার মাধুর্য শেষ হওয়ার আগেই বিদায় নেওয়া দরকার। ভেতরে ভেতরে কল্যাণ ভয় পাচ্ছিল, আবার যদি রমা রুদ্রমূর্তি ওর কাছে ভি পি পার্সেলের মত হাজির হয়—তবে মাধুর্যের বিনিময়ে তা গ্রহণ করতে হবে। আসলে কল্যাণও রমার স্নেহময়ী, প্রেমময়ীর ছবি মনে নিয়েই আজ ঘরে ফিরতে চায়—আজ শেষ মুহূর্তটি সুন্দর করে বিদায় নিতে চায়। আর এক্ষুনি হচ্ছে সে মুহূর্ত। তবু, এখনও যেতে মন চায় না। শীতের রাত বলেই—নইলে রাত বেশি হয়নি। কল্যাণ ভাবল, চা না খেলে উঠতে দেবে না অথচ এরই মধ্যে যদি রমা স্বাদ বদলে ফেলে। মিষ্টি আসবার আগেই যদি রমা তেতো হয়ে যায়—ঝাল কটকটে হয়ে ওঠে।

চুপচাপ বসে থাকাও অস্বস্তিকর। কল্যাণের মনে হচ্ছিল অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে আছি। কিন্তু ওর চুপচাপ বসে থাকতে যে ইচ্ছা করছিল না তা নয়, কথার ঝোঁক যে খুব একটা অনুভব করছিল তা নয়—কিন্তু চুপ থাকা কেমন অভদ্রতা মনে হচ্ছিল—অথচ কথা বললেই যদি রমা আস্তে আস্তে পিছু হটতে হটতে ডালহৌসির মেজাজে ফিরে আসে ভয়ও ছিল সেজন্যে। কল্যাণের মনে হচ্ছিল, হয়ত ওর বাবা সম্পর্কে প্রশ্ন করলে রমা কোমল হয়ে উঠতে পারে। কিন্তু একজন ব্যর্থ আর্টিস্টের টিডিয়াস কাহিনী শুনে শুনে সময় কাটাতে হবে চা সিঙাড়া আসার আগে পর্যন্ত—ও হরিবল। .... একবার ইচ্ছে হল—নিজে থেকে জানায় এক্ষুনি চলে যাবে রমার আত্মনিবেদনের পর সেটি ওকে একধরনের অপমান করা যেন ওর এই সম্পর্ককে অল্প মূল্য দেওয়া হয়—তাড়াতাড়ি চলে গেলে। আবার ভয় হয়, যেতে চাইলে তক্ষুনি যদি রমা রাজি হয়ে যায়—তবে তো ভারি মুশকিল। হয়ত যেতে দিতে চাইবার পেছনে থাকবে—যদি তুমি যেতেই চাও—যেতে যদি ইচ্ছেই করে তবে আমি আটকাতে চাইনে। তখন যাওয়াও মুশকিল। আর না গিয়ে থাকাও বড্ড স্ত্রৈনতা—বড্ড হীনতা। তখন অভিমান ভাঙাতে গিয়ে নিজেকে এত ছোট লাগে—যেন ওর কোনও দাম নেই। চিন্তাটি বোঝা মনে হতেই কল্যাণ অস্থির হয়ে ওঠে। কেমন রমার 'পর একটা বিরক্তিও আসে। মনে হয়, ও যেন একটা সমস্যার মধ্যে ওকে ফেলে দিয়ে ওকে পীড়ন করছে অথচ যদি নিজের ইচ্ছে প্রকাশ করে অমনি ফোঁস করবে। হঠাৎ রমাকে কেমন শ্রীহীন মনে হয়। মনে হতেই কল্যাণের অন্তরে কেমন একটা জোর আসে—যেন সেই জোরের ফলেই সব কিছু অগ্রাহ্য করতে পারে—প্রথমেই রমাকে শ্রীহীন মনে হওয়ার চিন্তাকে দূরে ছুড়ে ফেলবার তাগিদ বোধ করে মুহূর্তের মধ্যে। মনের মোহময় মুহূর্তটি রক্ষা করবার জন্যে কিনা বা রমার 'পর আসক্তিকে বাঁচিয়ে রাখবার চেষ্টার জন্যে কী না এসব অগ্রাহ্য করে সাহসের সঙ্গে খুব আস্তে মধুরভাবে কল্যাণ বলে—তুমি এমনি মধুর কিন্তু চিরকাল থাকবে—যতকাল আমি থাকব। বলতে বলতে কল্যাণের গলা কেমন ভার হয়ে এল।

শান্ত ও ক্লান্ত চোখে রমা মাথা নেড়ে রাজি হয়। মধুরই থাকবে। কল্যাণের বলতে ইচ্ছা করছিল—তোমার মাধুর্য আমার জন্যে অ্যাডভান্স বুকিং আর বেদনাকে বয়কট, আর ঝগড়াকে পিডি অ্যাক্টে নির্বাসন—কিন্তু এমন মুহূর্তে এ অলঙ্কার বেমানান—এ বাগাড়ম্বরও বাচালতা ও অনুভূতির নিঃস্বতারই প্রমাণ হবে। অন্য সময় বলা যাবে বলে কল্যাণ কথাগুলো জমা রাখে ভবিষ্যতের কোন মুহূর্তের জন্য—হয়তো আজ এগুলো রীনাকেও বলা যেতে পারে। কল্যাণ কথাগুলো খরচ করবার পথ নিজেকে বাতলে দেয়, পরে রীনাকে—আরও পরে রমাকে।

কল্যাণও সুন্দর করে রমার মতো মাথা নেড়ে রমাকে অনুসরণ করে। রমা সজল চোখে হাসে—কল্যাণও সজল করে হাসে।

একটু পরে কল্যাণ বলে—অনেকক্ষণ আমরা চুপ করে রয়েছি। লোকে ভাববে, এরা বোধহয় মৌন হয়ে যোগ প্র্যাকটিস্ করছে—কিন্তু আমরা যে টেলিপ্যাথিক কম্যুনিকেশন করছি তা বুঝবে না? তুমি বিশ্বাস করো—ভা—অন্তর্যামী? যেন অপরিসীম ক্লান্তিতে রমা অস্বীকার করে ভা-তো অন্ধ? নইলে তোমার চোখে

আমার সবুজ কখনও পান্না হয়।

—তোমার কথা আমার বিরুদ্ধে গেল না। যদি অন্ধও হই—বাইরের কপাট যদি বন্ধও হয়ে থাকে—ভিতরে দুয়ার খোলা।

—ভিতরে কেউও দেখে না—বোঝে না—বুঝতে চায় না।

—তুমি নিঃসঙ্গ। তোমার দেহের মতো তোমার মনও কুমারী।

এবার যেন রমা আর কান্না চেপে রাখতে পারে না। মুহূর্তের জন্য আঁচল দিয়ে মুখ ঢেকে নিজেকে কান্নার ঝড় থেকে রক্ষা করে। শুধু বাইরে বের হয়ে আসা চোখের জলকে মুছে মুখ থেকে আঁচল সরিয়ে নেয়। যদিও ওর ইচ্ছা ছিল—কল্যাণই ওর মুখ থেকে আঁচল জোড় করে সরিয়ে দিক—আবার সেই সঙ্গে সঙ্গে ভয়। সত্যি সত্যি যদি কল্যাণ জোর করে আঁচল সরিয়ে নেয়। আরেকবার চোখের জল মুছে যেন নিজের মনকে খুলে ধরবার প্রলভনে রমা জানায়—জানো, আমি কাঁদলে আমাকে খুব বিশ্রী দেখায়।

—কাঁদলে তোমাকে বড় নরম লাগে। সুন্দর লাগে। তুমি যেন জলে ভিজে কেমন নরম আর তাজা হয়ে ওঠো। এই হচ্ছে আমার ধারণা। তবে এ কথাটি তোমাকে বলবার ইচ্ছে আমার ছিল না। কারণ, তুমি বারবার কাঁদলে আমার বড্ড অস্বস্তি লাগে—নিজেকে অপরাধী মনে হয়। হয়তো তুমি বেশিক্ষণ কাঁদলে আমি স্যাডিস্ট হয়ে যাব। আমি স্যাডিস্ট হতে চাইনে—দেখতে ভাল লাগলেও তুমি চোখের জলকে ....। কল্যাণ মাথা নেড়ে নেড়ে বাকিটা নিষেধ করে।

রমা এক দৃষ্টিতে কল্যাণকে দেখছিল—ওর পাতলা ঠোঁট—ওর উজ্জ্বল চোখ—সত্যি ওর চেহারার এমন একটা প্রভাব—এত কাছে এর আগেও দেখেছে—তবে নিজের ব্যবধান মুছে এর আগে কখনও দেখেনি।

—আমি জানি, কাঁদলে আমাকে ভালো দেখায় না—কুৎসিত লাগে। আর রাগলেও যে ভাল লাগে না তাও আজ তুমি দেখেছ? হয়ত কোনও অনুভূতিই আমার মুখে মানায় না। কল্যাণ মাথা নাড়ে—রাগ থেকে অনুরাগ। রাগ হচ্ছে ম্যাটার—সাবস্টেন্স আর অনুরাগ হচ্ছে রাগের অ্যাটমিক নিউক্লিয়াস। আজ ঘটনার নিউক্লিয়ার রিঅ্যাক্টার ভালবাসার এক্সপ্লোসন।

—কথা বানাতে তোমার ভারি শখ।

—তাহলে এর জবাব দেব বিজ্ঞানে নয়। দর্শনে—শব্দই ব্রহ্ম।

—আর নির্বাণ মৌন।

—শব্দেই বিশ্ব শুরু—প্রেমের সূচনা।

—নির্বাণেই সব শেষ। প্রেমের সমাধি। তোমাতে শুরু আমাতে সারা।

—তুমি যদি আরো বলতে শুরু করো—তবে আমি যে কথা বানাতে পারি এ আত্মবিশ্বাস টলে যাবে। তুমি এত ভাল কথা—

কল্যাণকে থামিয়ে রমা বলে—সবাই সুন্দর—সুন্দর কার—কেউ সুন্দর তোমার মত—কেউ সুন্দর নয়—আমার মতো। কেন সবাই সুন্দরই চায় বলো তো?

—তুমি সুন্দর নও—তোমার এই ধারণা নির্জলা মিথ্যে। কিন্তু কেন সবাই সুন্দর সুন্দর করে—এ জটিল প্রশ্ন। দেখো, আমি অল্প জলে এই বুক জলে—অর্থাৎ যেখানটায়

হার্ট রয়েছে সেখান পর্যন্ত নিশ্চিন্ত—তার পরেই আমি আনসেফ। আমিও জ্ঞান সমুদ্রের তীরে স্নান করেছি—তবে নুলিয়ার হাত ধরে অল্প জলে।

—প্রশ্নটি এড়িয়ে যাচ্ছ—মানুষ তো সুন্দর সুন্দর করে—তুমিও করো। আমিও করি। কত চেষ্টা করলাম তোমার রূপের হাত থেকে নিজেকে বাঁচার—রমার গলা ভার হয়ে এল। চুপ করল। চোখে জল ভরে এল।

এবার কল্যাণ চট করে রমার আঁচল দিয়ে চোখ মুছে দিয়ে—সেই একটু কান্নায় ভেজা আঁচল চুমো দিয়ে রেখে দিয়ে একটু চুপ করে রইল।

—মানুষ সুন্দর সুন্দর করে কেন—এ দর্শনের প্রশ্ন। তুমি আগেই বলেছ। আমি অন্ধ—তাই দর্শনের জবাব কী করে দেব? তাছাড়া আমিও বলেছি, শব্দই ব্রহ্ম—আমি শব্দের পূজারী—রূপের নই, কান আমাকে চালায়—চোখের চেয়েও। খিস্টানরা বলেছে আগে আলো—আমি আবার বলি, আগে শব্দ। এ বিষয়ে আমি হিন্দু।

—আর সকলের শেষে কী রোববার—নারী—প্যারাডাইস লস্ট—প্রলয়—নির্বাণ—মৌন।

—সৃষ্টির রোববার নিয়ে ব্যস্ত কেন? বরং জীবনের রোববার নিয়ে প্রোগ্রাম করি বলো, আগামি কী করবে? খুব একটা ফাইন প্রগ্রাম—তাতে জটিল প্রশ্ন বাদে সব থাকবে।

রমা কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে যায় : রোববার হয়তো সিনেমার নাম করে সকালের দিকে কিছুটা ঘুরে আসা যায়—কিন্তু সারাদিনের প্রোগ্রামে মা ভারি অসন্তুষ্ট হবেন। হয়তো এ নিয়ে বাবার সঙ্গে একটা ঝগড়া। হয়ত চিলড্রেনস পার্ক। সারাদিন কল্যাণের সঙ্গে কাটাবার পর বাকী রাতটা কেমন রঙিন স্বপ্নে ক্লান্ত হয়ে স্ফূর্তিতে ঘুমিয়ে পড়বে—তা—নয়, হয়ত এসেই এক ক্লেদাক্ত ঝগড়ার কামড়। সমস্ত মন বিষিয়ে যাবে।

তবু, ভাবতে ভাবতেই রমা জিজ্ঞেস করে—রোববার কখন?

—একটা টোটাল ডে—সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত—একান্তভাবেই আমাদের। সূর্য অন্ধকার থেকে বের হয়ে এসেই আমাদের দেখবে—অস্ত যাবার সময়ও আমাদের দেখতে দেখতে যাবে। সূর্যসাক্ষী রেখে আমাদের সারাদিনের মিলন।

—সাক্ষী বড় দূরের সাক্ষী—ন'কোটি তিরিশ লক্ষ মাইল দূরে। বিপদের সময় তো কাজে লাগবে না—একটি কথাও আমাদের হয়ে কইবে না। তোমার শব্দ ব্রহ্ম উপাসনায় সূর্য বাদ গেছে অনেকক্ষণ আগে। আলো, তাপ যতই থাক—যতই জ্বালাক—সূর্য কথা কয় না।

—তা হলে দেখছি, সূর্য তোমার দলে—তাপ তেজ আছে তবে মৌন।

—কল্যাণ, ভালোবাসার খাতিরে আমার সম্পর্কে আর মিথ্যে কল্পনা কোরো না—তাপ আছে মানছি, হয়তো তেজও আছে—দেখতে পেয়েছ—কিন্তু যে জ্বালার জন্যে পনেরো টাকা দিয়ে মোটর ভাড়া করলে তা কিন্তু মহামৌনের ভাষাহীন ইঙ্গিতে নয়। সূর্য আমার দলে নয়। আমার অনুগ্রহ পাবার জন্যে ন'দশটি গ্রহ ঘুরে বেড়ায় না অহরহ।

—তাহলে সেই কথাটিই বলতে হয়, তোমার উপগ্রহ আমি। নিজেকে উপগ্রহ ভাবাটি কষ্টকর—চাঁদ ভাবাটিও বড্ড বেশি কমপ্ল্যাসেন্ট—অতিরিক্ত আত্মপ্রেমের

লক্ষ্মণ। তার চেয়ে এস এই সৌর জগতে তোমার আমার উদাহরণ নেই—একে যথেষ্ট অল্প বলে ত্যাগ করে চলে যাওয়া যাক। আমাদের প্রতিবেশী আরেকটি যমজ নক্ষত্র রয়েছে—Binary Sun–যেখানে দু'টি সূর্যই দুটিকে প্রদক্ষিণ করে চলেছে অহরহ।

—অনেকদূরে চলে গেছ—অনেক আলোক বর্ষ দূরে। এখানেই তোমার আমার উদাহরণ রয়েছে—পাশের নক্ষত্রে নয়—প্রতিবেশী গ্রহে—মঙ্গলে। তার দুটি উপগ্রহ—শুনেছি রোজ পালা করে একটি অমাবস্যা—একটি পূর্ণিমা। আজ আবার পূর্ণিমা লেগেছে সন্ধ্যার পরে—পূর্ণিমা কতক্ষণ থাকবে? কতক্ষণে ছাড়বে?

উদাহরণের ভেতরের ইঙ্গিতে মুহূর্তে কল্যাণ কেমন হয়ে যায়। নিজেকে সেকেন্ড হ্যান্ড এই অপ্রীতিকর সংবাদটি ওর ভেতরে কেমন অস্বস্তি জাগায়। শুধু তাই নয়, রমা কুমারী, এই রমার প্রথম প্রেম, যেন এ বিষয়ে কল্যাণকেও ছাড়িয়ে গেছে—কল্যাণের চেয়ে ও শ্রেষ্ঠ। মুহূর্তে নিজের দাম কমে যাওয়াতে বরং নিজের যে দাম এত কম ছিল এই বোধোদয়ে রমার 'পর এক ধরনের ঈর্ষা পোষণ করে। বলতে ইচ্ছা করছিল রমাকে তোমার আকাশে কোনও কালপুরুষের কী ছায়া পড়েনি—না পড়া তো প্রকৃতির নিয়ম নয়। কিন্তু একটু আগেই রমাকে দেহে ও মনে কুমারী বলে কমপ্লিমেন্ট দেওয়ার পর একথা বলা চলে না। শুধু তাই নয়, রমার জীবনে কোনও পুরুষ এসেছে কী না একথা জিজ্ঞাসা করতে যেমন ভয়, রুচিতেও বাধে—শুধু কী তাই, রমা যদি বলে বসে এসেছিল কেউ—কেউ—হয়তো আমল দিইনি—তাহলে হয়ত কল্যাণের স্বপ্ন বড্ড বেশি শক পাবে—এমন মুহূর্তটি নষ্ট হয়ে যাবে। ভাবতে ইচ্ছা হচ্ছিল, কোন পুরুষ তোমার জীবনে অনুপ্রবেশ করেনি—তাই এত কুমারীত্বের জৌলুস। কিন্তু চিন্তাটির চেহারা মনে মনে চোখ বুজে কল্যাণ অস্বীকার করে। হঠাৎ কেমন ক্ষুব্ধতা যেন ওর চেতনায় হঠাৎ ঢুকে পড়ে। মনে হয়, এই মধুর মুহূর্তটি যেন বাঁচাবার সব দায়িত্ব একা কল্যাণের—অথচ একটু আগেই মধুর থাকবার প্রতিশ্রুতি রমা অনায়াসেই দিল। অথচ রীনার উদ্দেশে ইঙ্গিত করতে একটুও বাধল না। কল্যাণের মনে হতে থাকে মধুর মুহূর্তকে প্রটেক্ট করবার দায়িত্ব শুধু ওর একার যেহেতু কল্যাণ সেকেন্ড হ্যান্ড—যেহেতু কোনও পুরুষের সঙ্গে রমার খাতির আছে কী না এই সংবাদটি ওর জানা নেই সেই সুযোগে রমার প্রথম প্রেমের শ্রেষ্ঠত্ব দাবি করে বসে ওর ভালবাসাকে হেয় করতে বাধল না। কল্যাণের ভয় হতে থাকে, হয়ত বিরক্তি সব ওর মন জুড়ে বসবে। কিন্তু এদিকের কথায় রমা ওকে হারিয়ে দেবে এও অসহ্য। প্রেমিক কল্যাণ কুমার নয়—রমা কুমারী—এইদিকে জিতে গিয়ে এবার কথাতেও কল্যাণকে নির্বাণ করে দেবে—ওর এই মৌন নির্বাণে ঠেলে দিয়ে আরেক দফা জিতে যাবে এ অসহ্য। সঙ্গে সঙ্গে কল্যাণের মনে হয়, কথাতে যদি জিতেও যাই, তবু বলবে, কথায় জিততে পার—কথাতে রিয়ালিটি কী বদলায়? কল্যান একটু হতাশা বোধ করে। মনে করে, ওর মিষ্টি খাবার ছুতো করে বসে না থেকে ঠিক সময় চলে গেলেই হত। হয়তো আরো কী বলবে কে জানে? একবার যখন পরোক্ষ ইঙ্গিত করে রীনার কথায় মুখ ফুটেছে—বোল ফুটেছে, তখন গরম কুন্ডু থেকে ওঠা কী এত সহজ হবে?

—মঙ্গল গ্রহ বড্ড কাছে—একেবারে নেক্স্ট নেবার। এ যেন কাশ্মীরের বদলে

কোলাঘাট—হনলুলুর জায়গায় লিলুয়া—এ যেন নিউইয়র্কের বদলে নৈহাটি যাওয়া। দূরের আকর্ষণ—সুদূরের আকর্ষণ—অজানার হাতছানি—যেখানে যেতে অযুতনিযুত আলোকবর্ষ লাগে—কল্পনাই যদি করতে হয়—তবে অন্যকোনও গ্যালাক্সিতে।

কথাটি বলে কল্যাণের একটু তৃপ্তি আসে। অন্তত রমার ইঙ্গিত যে বুঝতে পারেনি একথা জানিয়ে দেওয়া হল। তবে রমা যে বুঝল, প্রশ্নটি এড়িয়ে গেল—এ কথাটি মনে আসতেই কল্যাণ তা অগ্রাহ্য করল—ভালকথা বলবার তৃপ্তি নষ্ট হতে দিতে রাজি নয়। কল্যাণের মুখ বিবর্ণ হতেই রমার বুক টনটন করে ওঠে। ওর নিভে যাওয়া মুখ রমার মনে যে বেদনা জাগায়। ইচ্ছে হয়, কল্যাণকে কষ্ট দিলেম এই নিয়ে একটু কাঁদি। বুঝতে চায় না জোর করেই যে, কল্যাণের অপ্রস্তুত হবার মুখ দেখে যে একটু বেদনা জেগেছে সেই ছুতো করে ওর কাঁদতে সাধ। কান্না ছুতো খুঁজে বেড়াচ্ছে। কল্যাণের চুপ করে যাওয়া মুহূর্তে যেন ওর কষ্ট দ্বিগুণ করে দেয়। আজ ওর অনেক অনেক কাঁদতে হবে। কোথায় কাঁদবে? কল্যাণের মুখে এবার বেদনা নেই—যেন একটু সূক্ষ্ম বিরক্তি। কল্যাণের এই বিরক্তি থেকে যেন রমা না কাঁদবার বা কান্না নিয়ে চিন্তা না করবার শক্তি সঞ্চয় করে। হঠাৎ মনে হয়, কল্যাণ চুপ করে থেকে যেন ওর অভিযোগ মেনে নিল। যেন দিনে কল্যাণের উপগ্রহ রমা—পূর্ণ পূর্ণিমায় অফিস—রেস্টুরেন্ট—আউটরাম ঘাট—তখন রীনার অমাবস্যা। আর রাতে রীনার পূর্ণিমা—ঘর সংসার বিছানা—পূর্ণিমা রাতেই খোলে ভাল—অমাবস্যাও। তাই রাতেই রমার অমাবস্যা—রীনার পূর্ণিমা। মুহূর্তে কল্যাণের গলা জড়িয়ে ধরা। ওর হাত নিজের বুকে দেওয়া—ওর কাছে নিজে যে দেখতে ভাল নয় এই দুর্বলতার সংবাদ জানিয়ে দেওয়া যেন অতিকায় দৈত্যের আকারে এক অনুশোচনা ওর মনে ঢুকতে চায়। ভয় করে কল্যাণ চলে গেলে কী করে নিজের কাছে মুখ দেখাবে—কী করে নিজের মুখোমুখী হব—এ গ্লানি, এ লজ্জা, এ হ্যাংলামো—আগামীকাল যে ওকে মুখ দেখাতে পারব না। এসব ন্যাকামি যে ওকে মানায় না—একথা যখন মনে পড়বে তখন রমা কী করবে। রমা যেন নিজেকে রক্ষা করবার জন্যে ব্যাকুলভাবে কল্যাণের দিকে তাকায়।

—কল্যাণ তোমার রোমান্টিকতা সংশোধনের অযোগ্য—প্রশ্রয় দেওয়া হাসি দিয়ে রমা কল্যাণকে উজ্জীবিত করতে চায়—নিজেকেও এড়াতে চায়।

—তোমার হয়তো হৃদয়ের বিস্তার একটু বেশি কল্যাণ।—ডাইলুটে হার্ট ডাইলুটেড লাভ একটা ভালবাসার ই.সি.জি করাও—বরং বলা ঠিক, এল.সি.জি—লাভ কার্ডিওগ্রাফ—ভালবাসার সঠিক অবস্থা জানতে পারবে।

কল্যাণ এবার হেসে উঠল।

—আজ তোমার কাছে আমার ডিফিট টোটাল। তোমার মতো তেজ আমার নেই—মাত্র পনেরো টাকা দিয়ে সে সন্ধান পেলাম, তোমার মতো কুমারী মন আমি পাইনি—যদিও মনের দিক থেকে আমি কুমারই—কল্যাণ কুমার, ঠোঁটের স্পর্শে (গলা নামিয়ে) এমন যাদু পাইনি—এমন চেয়ে থাকবার শক্তি—একনিষ্ঠ নজরও আমার নেই। আর কথায়ও হেরে গেলাম। এমন মধুর সফল পরাজয় আজ আমার সম্পদ।

কেমন কাঁপতে কাঁপতে যেন রমা বলে—কল্যাণ বানিয়ে বলবে না—আজ তোমার

সব কথা আমি বিশ্বাস করব—তোমাকে কথা দিয়েছি।

—কথা দিয়েছ মধুর থাকবে।

—থাকব। তবে কল্যাণ মধুর থাকা বা না থাকা নিজের বা পরের কারো ইচ্ছার পরেই কী নির্ভর করে? ভয় পেও না—আমি ঝগড়া করেছি—কড়া কথা বলেছি—ভদ্র ভাষায় তুমি তেজ বলেছ—আজ ঝগড়া করব না। যে সবচেয়ে আমার কাছে এল—সে যে আমারই। একথা আমাকে আজ প্রাণ ভরে ভাবতে দাও—ভাবতে সাহায্য করো। আজ আমি একা থাকতে ভয় পাচ্ছি। ভয় করছে আজ আমি হয়তো আর মিথ্যে বলতে—বানাতে—মানিয়ে নিতে পারব না—পারছি না।

কল্যাণ তাড়াতাড়ি রমার হাত ধরে। রমার চেহারার কেমন পরিবর্তন হয়ে যায়। কেমন যেন রুক্ষ শীর্ণ—কেমন তীক্ষ্ণ মনে হয় রমাকে।

—আজকের সন্ধ্যাটি যেন একটা খাপছাড়া সকাল। কে বলে সময়ে ছেদ নেই—টাইম কনটিনিউয়াস—আজকের সন্ধ্যাটি সময় থেকে ছিটকে বাইরে পড়ে গেছে—আজকের আমি অন্য আমি—মিথ্যা আমি, সত্য আমি নই। এ আমিকে চিনিনে।—একথা বলেই তাড়াতাড়ি রমা বাইরে চলে আসে। কী বলতে কী বলবে—নিজেকে আর বিশ্বাস নেই। নিজেকে অজানা লাগবার ভয়ে, নিজেকে অপরিচিত মনে হবার আতঙ্ক যেমন বেশিক্ষণ সহ্য হচ্ছিল না—ভরসা পাচ্ছিল না নিজের এই অন্যমূর্তি—অজানা চেহারা কী করতে কী করে ফেলবে। নিজেকে একটু পরিচিত মনে হওয়া দরকার। নিজেকে চেনা চেনা লাগা দরকার। দৌড়ে মার কাছে আসে। মার প্রসন্ন মুখ দেখে শান্তি লাগে—তবু, এই প্রসন্ন চেহারার জন্যে যেন মাকেও রোজগার মার মতো মনে হয় না। নিজের অভ্যস্ত মনের জন্যে, রোজগার চেহারার জন্যে, নিজের পরিচিত মুখকে ফেরত পাওয়ার জন্যে একটা অদ্ভুত ব্যাকুলতা রমাকে উদ্বিগ্ন করে তোলে। কিছুক্ষণ আগের চেহারাটা হঠাৎ হারিয়ে গেল তা যেন রমা ব্যাকুল হয়ে খুঁজতে লাগল।

খাবার সাজানো শেষ হয়ে গেছে। মা ইতিমধ্যে লুচি আলুর চচ্চড়ি আর দুটো সন্দেশ দিয়ে কল্যাণের খাবারের প্লেট সাজিয়েছে। আর রমার প্লেটে লুচি চচ্চড়ি—কেবল সন্দেশ নেই। একটু আগেও রমার ভেতরে ভেতরে একটা উৎকণ্ঠা ছিল : রমা কী করছে দেখে আসি অর্থাৎ মা ঠিক মতো কাজ করে যাচ্ছে—ওদের সম্পর্কে কোনও সন্দেহ করছে না—একথা জেনে কল্যাণের পাশে নিশ্চিন্ত বসবার একটা তাগিদ ভেতরে ভেতরে ছিল। কিন্তু মাকে প্রসন্ন দেখে কোন স্বস্তিবোধ করল না—মা যে কিছু সন্দেহবোধ করেনি—এ সংবাদ থেকে ব্যর্থ একটা নিশ্চিন্ততা বোধ করবার চেষ্টা করল। মনে হল -তাহলে মা কী এরই মধ্যে সন্দেশ নিয়ে এল—নিঃশব্দে—তাহলে মা কী ওদের তন্ময় হয়ে আলাপ করতে দেখেছে। কিন্তু এতেও বৃথা উদ্বিগ্ন হবার চেষ্টা করল। নিজের মনে আপনা থেকেই যেন জবাব এল : তাহলে মা'র মুখ এত শান্ত স্নিগ্ধ কেন? কিন্তু সন্দেশ আনবার চিন্তায় যেমন অপরাধ বোধ করতে পারেনি—তেমনি মার শান্ত মুখ থেকেও মুখে দুঃশ্চিন্তার ভার নেমে যাওয়ার শান্তি এল না। কেবল মনে হল, না, না, এ ভালবাসা চাইনে, মনের এ তোলপাড়—এমন নগ্নভাবে নিজের দুর্বলতা ..... না, না, এ আমি কী করে চলেছি। মনে হচ্ছে—অফিস থেকে মোটরে উঠবার পর থেকে যেন আমি হঠাৎ অন্য আমিতে

বদলে গেছি—এ আমার অপরিচিত একটা বিছিন্ন আমি—এ আমি যেন স্পিল্‌ট পারসনালিটির আমি। না, কাঁদতে ইচ্ছে করছে—কিন্তু কান্না আসবে না—বাবার কাছে যাব—। আর একা কল্যাণের কাছে যেতে পারব না। ও যেন আমাকে হিপনটাইজ করে যা খুশি আমাকে দিয়ে করে বেড়াচ্ছে। কেমন একটা প্রবল ভয়ে রমার অন্তর শুকিয়ে যায়। এবার রমাকে দেখে মা বলেন—হয়ে এসেছে—এবারই দেব। হ্যাঁরে, ওর ছোট ভাইটাই নেই—ভালো চাকরি করে, অফিসার। জিজ্ঞেস করে দেখব?

রমা মাথা নেড়ে জানায়—না। কথা বলতে ভয় করে—যদি গলা স্বাভাবিক না হয়। যদি গলার স্বরে অস্বাভাবিকতা দেখতে পেয়ে মা কিছু সন্দেহ করেন। তবু নিজের সমস্ত ভয়কে অগ্রাহ্য করে—নিজের চেনা গলার স্বর ফিরে পাবার জন্যে মাকে জানায়—এক দিদি আর ও। সন্দেশ কখন নিয়ে এলে?

—সন্দেশ তো বাসাতেই ছিল। জয়াদের আজ পূর্ণিমার পুজো ছিল না? কাঁচা প্রসাদের সঙ্গে দুটো সন্দেশও দিয়ে গিয়েছিল। আমি ভুলেই গিয়েছিলেম—হঠাৎ প্লেট খুঁজতে গিয়ে ওদের প্রসাদটা তো প্লেটেই ঢেলে রেখে ওদের প্লেটটা দিয়ে দিলেম—এখন চা এর জন্যে প্লেট ধুতে গিয়ে ....। প্রসাদ বুঝতেই পারবে না—গাঁদা ফুলের দু'একটা টুকরো ছিল—সন্দেশ থেকে তা তুলে মাথায় ঠেকিয়ে রেখেছি।

—পূর্ণিমার পুজো রাতে হয় না?

—দিনেও হয়। আজ তিনটে পর্যন্ত পূর্ণিমা ছিল। আজ পূর্ণিমা তোর বাবাকে জানাসনে যেন—শুনলেই বলতে শুরু করবে—এখানে বাতের ব্যথা—আজ পূর্ণিমা পা টেনে নিয়ে গেল—কেউ একটু টিপেও দেয় না। বাতিক কম নেই মানুষটার।

কল্যাণের কোনও ছোট ভাই নেই শুনে একটু দমেও যায় আবার আশ্বস্তও হয়। একটা পাত্র একে হাতছাড়া হল—তাও ভাই-টাই থাকলে চেষ্টা করা যেত। হঠাৎ একটা বিয়ের আবহাওয়ার জন্যে মন কেমন করছিল। রমার বিয়ে হবে—জামাই আসবে—লোক খাবে—বাজনা বাজবে—ভাঙা ভাঙা বিয়ের ছবিগুলো তাকে কেমন আনমনা করে দেয়। বিয়েবাড়ির মেজাজ অনুভব করবার জন্যে কেমন একটা আগ্রহ বোধ করেন। ইচ্ছে হয় রমার বাবার সঙ্গেও এ নিয়ে বসে একটু গল্প করেন—না হয় রমা মাসে মাসে কিছু দেবে তাতেই তিনি চালিয়ে নেবেন। আসলে রমার বিয়ের চেয়েও বিয়ে বাড়ির পরিবেশ ও মেজাজের জন্যে কেমন লালায়িত হয়ে ওঠেন। হঠাৎ মনে হল ভাই-টাই যদি থাকে—ভাবলেন খেতে দিয়ে জিজ্ঞেস করবেন। হয়ত এমনি দেখতে শুনতে এমনি অফিসার—রমার বাবার কাছে গিয়ে বসলেই তো রোগের ফিরিস্তি শুরু করবে—এত বড় মেয়েটা হল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ভয় করে, এ সব ব্লাউজ ট্রাউজ—ঠোঁটে রঙ মাখা মেয়ে কী নেবে সংসার। বাইরে যারা বের হয়—চাকরি করে—তাদের কী নিতে চাইবে ....। এ ভেবে মনটা দমে যায়—ভদ্র ঘরের বউ যে হবে কী আর এ রকম চালচলন কেউ পছন্দ করবে না। বিয়ের পর এ পোশাকে বের হতে দেবে। মনটা দমে যায়। রমার সাজসজ্জার জন্যে কেমন রাগ হতেই হঠাৎ মনে হল ছেলেটাও তো বিয়ে করেছে—ওর স্ত্রীও তো এম.এ. হয়ত মেমদের মতই ইংরেজী পড়ে—ঐ রকমই বেশভূষা—আজকাল অনেক মাথায় সিঁদুর দেওয়া মেয়েরও ঐ পোশাক—বিয়ের পরও

তো চাকরি করে। মনে হয়, বিয়ের পর যদি চাকরী করতে না দেয়—মন মুষড়ে যায় আবার উৎসাহ বোধ করেন—ওর বউও তো চাকরি করে। ভাবতে ভালো লাগছে—এমন মেয়ে—জামাইকে যদি বাবা-মাকে দেখাতে পারতেন। কে জানে আছেন না নেই ......। এবার চিন্তাকে এক পাশে ঠেলে লুচি ভেজে রাখতে থাকেন। ..... যখন রমার কাছে শুনলেন আর ভাই নেই—তখন রমাকে বিয়ে দেবার জন্যে বিয়ে বাড়ির মেজাজের যে লালসা হঠাৎ মনকে আচ্ছন্ন করেছিল তা চলে গেল মুহূর্তে। মনে হচ্ছিল, সেই রমার বিয়ের শেষ পাত্রটিরও সন্ধান কাজ শেষ হয়ে গেল। বিয়েবাড়ির মেজাজকে লালন করতে না পেরে দমে যান—কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে কেমন নিষ্কৃতিও বোধ করেন। রমা চলে গেলে কেমন শূন্য হয়ে—নিঃসম্বল হয়ে যাবেন—তবু রমা আসবে এই আশায় জীবনকে সহ্য করছেন—নতুবা সারা সময় রাত হাঁপানি, কোরামিন—ক্রিটেগোরাস। কল্যাণের ভাই আর নেই—শুনে যেন তিনি গোপনে বেঁচে গেলেন। রমাকে না হারাবার একটা আশ্বাসও বোধ করেন। সঙ্গে সঙ্গে ভাবেন, ভাই থাকলেও হয়তো রমার বয়সী ছোট হত—হয়তো বিয়ের কথাই উঠত না। সেই সঙ্গে নিজেকে তিরস্কৃতও করলেন 'অবন' নেই—বিয়ের আনন্দ, বিয়ে দেবার দায়িত্ব—এ সবের অধিকার তাঁর নেই। কিন্তু অবন না থাকবার বেদনা ভালো ভাবে বোধ করতে আবার শোককে গভীরভাবে ডেকে আনবার জন্যে ভাবলেন—একটা লুচি পেলে কী খুশিই না হত—জীবনে ক'দিন লুচি খেয়েছে—অথচ আজ তিনি গাদা গাদা লুচি ভাজছেন—সে হয়তো ভদ্রতা করে একটু ভেঙে খেয়ে বাকিটা পাতে রেখে যাবে। তেলে মাথায় তেল দিচ্ছেন। আর ছেলেটা লুচি লুচি করে ......। আজ যেন মাকেও ওর অপরিচিত—কেমন অজানা অজানা লাগে। আজ মা ওর বিয়ের জন্যে ভাবছে। আজ মা মা নয়, রোজগার সেই চেহারার মা নয়—যেন কোন পরিচিত প্রতিবেশিনী—যে রমাকে ভালবাসে, কেমন যেন কান্না আসে রমার। যেন মা'র বিয়ে দেবার প্রস্তাবের মধ্যে এমন এক সহানুভূতি—এমন এক বেদনার ভাগ নেবার দেবার লোক দেখতে পায়—রমার গলা যেন কে চেপে ধরে নিজেকে, মাকে, ঘরকে, রান্না ঘরকে সব যেন কেমন অন্য রকম অন্যরকম মনে হয়। এই রকম লাগাকে যেন রমা সহ্য করতে পারছে না যেন কেমন একটা দম আটকানো অপরিচিত। কল্যাণ যেন ওর শ্বাসরোধ করে ওকে মেরে ফেলতে চাচ্ছে—না, না,—সহজ, পরিচিত, এ গতানুগতিক সেই জঘন্য সংসারে ফিরে যাবার—ফিরে পাবার জন্যেওর ভেতরটা ছটফট করে। নিজের এই মুহূর্তের জন্যে পরিচিত জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়াকে ওর ভয় করতে থাকে—কী করতে কী করে বসবে—নিজেকে বিশ্বাস নেই—না, মা'র সঙ্গে কল্যাণের কাছে যাবে—একা নয়। কল্যাণকে ভয় নয়—নিজেকে ভয়। নিজেকে প্রকাশ করে ফেলার ভয়—নিজের দুর্বলতা, গোপন ব্যথাকে ফাঁস করে দেবার ভয়। আজ আর নিজেকে বিশ্বাস করা যায় না। এই মুহূর্তগুলো বিভীষণ—ভেতরের সমস্ত গোপনতাকে অপরের হাতে তুলে দেয়। একদৃষ্টিতে মা'র প্লেট সাজানোর দিকে চেয়ে মনে হয়। আজ ওর হাত নিজের বুকে—উঃ, ওকে জানালাম—আমি যে দেখতে ভাল নই—এ সম্পর্কে আমার ইনফিরিয়রিটি কমপ্লেক্স ..... এই বিশ্বাসঘাতক সরলতা আমাকে কোথায় নামিয়ে দিল। আবার রমার ভয় থাকে। এই যে অপরিচিত লাগা মুহূর্ত—

এই যে নিজেকে অজানা অজানা মুহূর্ত—যা কিনা প্রায় আত্মহত্যা দিয়ে তৈরি—তা হয়তো চলে যাচ্ছে। একে রমা সহ্য করতে পারছো কিন্তু একে যেতে দিতেও রমার ভরসা হয় না—ইচ্ছে হয় না। ভেতরে ভেতরে রমা টের পেয়েছে কিন্তু স্বীকার করছে না—মুহূর্তটি চলে গেছে—শুধু সদ্য যাওয়া মুহূর্তটির স্মৃতিকে মুহূর্ত মনে করে জোর করে নিজেকে ভুলাচ্ছে। এই মুহূর্ত চলে গেলেই—এতক্ষণের সমস্ত কাজের, আচরণের, ব্যবহারের কৈফিয়ত নিজেকে আজ নিজের কাছে দিতে হবে—এই মুহূর্তগুলোর আড়ালে থাকা কষ্টকর কিন্তু ওরা চলে গেলে আজ রমা কেমন করে নিজের মুখোমুখি হবে? এই বিভীষণ মুহূর্তগুলো—এই বিশ্বাসঘাতক পয়তাল্লিশ মিনিট—এই পৌনে এক ঘন্টা আত্মহত্যার এমন সময়গুলো চলে গেলে—যা কল্যাণ চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে চলে যাবে—দিয়ে যাবে অপূরণীয় অনুতাপ, আত্মগ্লানি, অনুশোচনা—হয়তো সমস্ত রাত ধরে। রাত হয়ত আগামী কাল অফিস—আগামি কাল বিকেল—হয়ত সে রাত কতদিন ধরে চলবে হঠাৎ মনে হয় দাদাকে শ্মশানে নিয়ে যাবার পরের ঘন্টাগুলো ক'টা দিন—হঠাৎ কেমন রাগ হয় ঐ সোয়েটারটার 'পর—ঐ সোয়েটারই আজ ওর মা তৈরি করে দিয়েছিল—মাকেও আর ভাল লাগেনা—ওর জীবনের এতটা খরচ করে এখন বিয়ের ভাবনার তোষামোদ। মাঝে মধ্যে মা যখন বাবার চেয়েও রমাকে বলে যেমন রমাকে দলে টানবার জন্যে তোষামোদ করে—করে অবশ্য বাবাকে ছোট করবার জন্যে এতে অবশ্য রমা লজ্জা পায়, সঙ্কোচিত হয়। আজ, এখনও ওর মনে হল—ওর জন্যে বিয়ের ভাবনাও মা'র এক ধরনের তোষামোদ—একটু পরেই হয়ত জানাবে—কই, এত বড় হলি—তোর বিয়ের জন্যে তোর বাবার কোনও চেষ্টা আছে?—তা থাকবে কেন—মেয়ের রোজগারে .....। বাবা মা'র তিক্ত কথাবার্তা ওর মনে হতে শুরু করতেই—রমা ব্যাকুল হয়ে সেই রোজকার জীবনের বাইরে থেকে আসা ক'টি লোভনীয় অবাঞ্ছিত অতিথি—মুহূর্তকে ধরে রাখতে চায়। সঙ্গে সঙ্গে কল্যাণের কাছে ফিরে যেতেও ব্যস্ত হয়ে ওঠে। কল্যাণের স্পর্শ যেন ওর জীবন থেকে ক'টি লোভনীয় মুহূর্তকে কেড়ে নেবে। ওর জীবনটা পড়ে থাকবে রোজকার জীবনে—কেবল রমা বাঁচবে ক'মিনিটের জন্যে ঐ ক'টি অতি ভীষণ, ভয়ংকর অপরিচিত অথচ সুন্দর ভূতে পাওয়া, নিশায় পাওয়া একটি মাত্র নিশ্বাসের মত পরমায়ু রয়েছে যে জীবনের সেই জীবনে। মা'র 'পর বিরক্তি আসবার সঙ্গে সঙ্গে একদিকে যেমন কল্যাণের কাছে যাবার জোর পায়—আরেক দিকে মা'র কাছে সেই চির পরিচিত অভ্যস্ত জীবনকে দেখতে পেয়ে কল্যানের কাছে সেই নিজের স্পিলট পারসনালিটিকে খুঁজতে যাবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

রমা জিজ্ঞেস করে—আমি বরং জলের গ্লাসটি নি। আর আমার প্লেটটা—

—তুই বোস গে। আমি সব নিয়ে যাচ্ছি।

কল্যাণের কাছে যাবার জন্যে যেমন ব্যস্ত হয়, ভয় পায়, সংকোচও যে রয়েছে তা নয়—কিন্তু যাবার ইচ্ছেটি ঠিক করা মাত্র মনে হয়, কল্যাণকে আঘাত করে এল, বলে এল, ওকে কেন্দ্র করে দুটো উপগ্রহ এক আকাশে রোজ একবার করে পূর্ণিমা, একবার করে অমবস্যা ঘটাচ্ছে। কথাটির ভেতরকার ইঙ্গিতের মধ্যে কল্যাণের জন্যে যে আঘাত রয়েছে তা যেমন ওকে পীড়া দিচ্ছে, তেমনি আঘাতের মধ্যে যে একটা সত্য রয়েছে

তাও রমাকে অশ্বস্তি দিতে শুরু করেছে। নিজের অনিচ্ছাসত্ত্বেও ভেসে উঠল, রীনাও কল্যাণের এক সঙ্গে রিসেপশন রুম দিয়ে যাওয়া—না কল্পনা করে পারল না, এই রীনার কাছেই এখন কল্যাণের যেতে হবে—যে হাত দিয়ে কল্যাণ রীনাকে বুক—রমা কিনা স্বেচ্ছায় সেই হাত .....। সঙ্গে সঙ্গে রমার মনে হল, আজ পূর্ণিমা ছিল তিনটে পর্যন্ত—তখন রীনা ছিল কল্যাণের কাছেই। কল্যাণকে দুটো উপগ্রহ সম্পদে ভাগ্যবান মঙ্গলগ্রহ বলে আঘাত দেবার জন্যে মনে একটু ছলছলে অনুতাপ এসেছিল—তা প্রায় সমূলে নষ্ট হবার যোগাড় হতেই রমা দু'দিক থেকে নিজেকে সাবধান করেও প্রলোভন দেখায়। ডালহৌসিতে আজ একটু রাগ করে মাত্রা ছাড়িয়ে অনুতাপ করলাম—যে নির্লজ অনুতাপের জন্যে হয়ত সারাজীবন অনুশোচনা করতে হবে—যে একটু রাগের জন্যে নিজের কুমারী দেহকে পর্যন্ত আহত করলাম—সেই অনুতাপের জন্যে কত না অনুশোচনা ভবিষ্যতে—মঙ্গলগ্রহ হলে আঘাত দেবার জন্যে এবার নিজেকে আর অনুতপ্ত হতে দেবে না—সঙ্গে সঙ্গে আবার মনে হয়, কল্যাণ বলেছে, ওরও কুমার মন—এই প্রথম প্রেমের স্পর্শ, চুমোর যাদু ....। একটু আশ্বস্ত হয়ে রমা কল্যাণের কাছে যেতে যেতে ভাবে, কথা বানাতে ভালবাসে ..... ও চলে গেলে নিজের সঙ্গে মুখোমুখি কী করে ..... বেশ ক'দিন ছুটি নেব—আগামী কাল থেকে ক'দিন কল্যাণের সঙ্গে দেখা করব না—যদি ক'দিন না গিয়ে গিয়ে আজকের দিনের স্মৃতিকে ক্ষয় করা যায় .... সঙ্গে সঙ্গে মুহূর্তে এও মনে হয়, কল্যাণকে না দেখে কতক্ষন থাকতে পারব। যেতে যেতে জটিল ও নিজের মনের মন্থনের দিকে তাকিয়ে ভাবে, আবার কল্যাণ আমাকে সব ভুলিয়ে, আমার ভালবাসার বিচ্ছিন্ন আমি আমাকে উপহার দিক। আগামী রোববার যেখানে বলবে যা একটা টোটাল ডে—যেখানে কঠিন প্রশ্ন ছাড়া সব থাকবে—মা'দের কী এমনি ভালবাসা ছিল যে জন্যে মা কক্ষপথ থেকে ছিটকে—হয়ত ছিল—তবে এমন জটিল ছিল না—কোথায় রমার সেই বয়েস—হয়ত মা'র আচরণের জোর অনেক রমা আর ভাবতে চায় না—ভালবাসার পরিণাম চোখের 'পর ভেসে উঠতে চাচ্ছে—রমা জোর করে ভাবে, কল্যাণকে সব দেব, না হয় অনুশোচনা করব—আবার ভাবল, না, আগামী কাল থেকে একদম ছুটি—শুধু একা একা বোঝাপড়া—রোববারের টোটাল ডে -মনে হল, আমি যদি না যাই তো রীনা যাবে—হবে টোটাল ডে—তাই হোক, তাই হোক, আমি দূরে চলে যাব—এ অফিস ছেড়ে অন্য জায়গায় চাকরি খুঁজব—পেলেই ছেড়ে দেব .... রোববার অবশ্য বাড়িতে যদি বলি, কোন বিয়েতে সারাদিন ধরে থাকতে বলেছে—এ কথা বলেও যাওয়া যায়। কতদূর যাওয়া যায় এক দুপুরে—এক খানা দুপুরে আর আধখানা সন্ধ্যা এই হচ্ছে ওর ভালবাসার বরাদ্দ। চমকে রমা দেখে বাইরের ঘরের আগে একটা জায়গায় চুপ করে দাড়িয়ে রয়েছে—এ দিকে মা আসায় রমা এগিয়ে জোর করে মা'র হাত থেকে জলের গ্লাসটা নিজের হাতে নিয়ে নেয়। ভাবে আরেকদিন দুপুরে ওকে খেতে বললে কেমন হয়....। সঙ্গে সঙ্গে কেমন হাসি পায়, ওর ভালবাসা হচ্ছে রোববারের দুপুরের ভালবাসা—হলিডে হোমের ভালবাসা—এই ওর জীবন, এই ওর জীবন, এই ওর কপাল। সঙ্গে সঙ্গে এক পলক অনুতাপ মা আসবার আগের একটু সময়—এই এক ঝলক, কল্যাণের সঙ্গে একা কাটানো যেত। এক দুর্লভ সুযোগে

হাতছাড়া হয়ে গেল—এমনি একটা মনোভাব নিয়ে মা'র সঙ্গে জলের গ্লাস নিয়ে রমা ঘরে ঢোকে—মা আগে রমা পরে। নিজেই রমা বুঝতে পারে অনুভব করে। এই ঘরের উজ্জ্বল নিওন লাইটে কল্যাণের উৎসুক চোখে মুখের চাউনিতেও ওর কেমন একটু লজ্জা করে—মা আছে বলে লজ্জা করছে, বা মা না থাকলে আরো লজ্জা করত সেই প্রশ্ন মনের মধ্যে চকিতে উঁকি মেরে চলে যায়। সঙ্গে সঙ্গে মনে হয়, কল্যাণকে একা একা বসিয়ে রেখে যেন ওর 'পর অবিচার করেছে। তাই এবার অনুতাপ আসতেই রমা সতর্ক হয়ে যায়। এক অনুতাপ করতে গিয়ে আজ কী যে হ'ল—এটা ভেবে নিজেকে অনুতাপকে বিশ্বাস না করতে অনুরোধ করে। কিন্তু অনুরোধে প্রাণও নেই, জোরও নেই আর চোখের সামনে কল্যাণ থাকায় অনুতাপ হবার জন্যে গ্লানিকে যেন সুদূর অতীতের কোন ধূসর অবাঞ্ছিত অধ্যায় বলে মনে হয়। কল্যাণকে দেখা মাত্র একান্ত আপন মনে হয়।

কল্যাণ যেন একটা আচ্ছন্নতাকে এড়িয়ে স্পষ্ট হয়। যেন গোপন তন্দ্রাকে গোপনে সারিয়ে দেয়। আগে মঙ্গল গ্রহের ভাগ্যবান পুরুষ বলবার সঙ্গে সঙ্গে ওর মন নিরস হয়ে গিয়েছিল : ওর যে বিয়ে হয়েছে—ওর ভালবাসা যে উচ্ছিষ্ট—এ ভালবাসার মধ্যে সদ্যজাত প্রাণের প্রথম জাগরণ নেই—এ নবজাতক কল্যাণ কুমার হলেও দ্বিতীয় কুমার—ওর ভালবাসার যেন নবজন্ম নয়—এ যেন দ্বিতীয় জন্ম। প্রথম জন্মের সজীবতা, নবীনতা নেই—এ কথা রমা তো ভুলতেই পারছে না শুধু নয়—ওকে মনে করিয়ে দিচ্ছে। তাতেও রীনাকে মনে পড়ে না, রীনাকে বিয়ে করবার জন্যে অনুতাপ হয় না—ভারি অপ্রস্তুত লাগে আর রমাকে ভালো লাগে না। এই অপ্রস্তুত লাগার মধ্যে একটা ধরা পড়ে যাওয়া যেন আছে—ওর যে দ্বিতীয় ভালবাসা—এ কথা রমা যেন ধরিয়ে দিতে চায়। কিন্তু নিজের অপ্রস্তুত ভাবটির মধ্যে ধরা পড়ে ভাবটিকে কল্যাণ স্বীকার করে না। ওর অনিচ্ছা সত্ত্বেও অপ্রস্তুত হয়ে যাবার মধ্যে যদি ধরা পড়ে যাবার ভাবটি ফুটে ওঠে—তবে তা কল্যাণের মনের ঠিক ঠিক ছবি মুখে ধরা পড়ছে না—এ হচ্ছে কল্যাণের বিরক্ত ধারণা—বিরল চিন্তা। কল্যাণের ধারণা—ওর অপ্রস্তুত ভাবটি হচ্ছে, ভালবাসার জায়গায় রমা যে ওর চেয়ে শ্রেষ্ঠ হয়ে গেল—অপ্রস্তুত হয়ে যাবার মধ্য দিয়ে হঠাৎ যেন এ কথাটিকে কল্যাণ স্বীকার করে ফেলে। রমা ওকে প্রথম ভালবেসে জিতে গেল—ভালবাসার প্রতিযোগিতায় সেকেন্ড হয়ে যাওয়াটি কল্যাণের অপ্রস্তুত হাসির মধ্য দিয়ে যেন অনিচ্ছা সত্ত্বেও প্রকাশ পায়—এই হচ্ছে নিজের অপ্রস্তুত হবার জন্যে নিজের কাছে কল্যাণের আত্মরক্ষা। ভাবতে কল্যাণের কেমন বিশ্রী লাগে বিয়ে না করে রমার এই জিতে যাওয়াতে যে ওর পরাজয় রয়েছে—এ কথা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়াতে ওর রমার রুচির 'পর বিতৃষ্ণা জাগে, তবু, রমা যে শ্রেষ্ঠ হয়ে গেল এ কথাই যেন ওকে সবচেয়ে পীড়া দেয়, অস্বস্তি জাগায়—কেউ ওর চেয়ে কোনও বিষয়ে শ্রেষ্ঠ হয়ে যাচ্ছে সেই ঈর্ষা। যে ঈর্ষার অনুভূতিকে কল্যাণ সবচেয়ে ঘৃণা করে—রমা তাই ওর মধ্যে জাগিয়ে দেওয়ায় ওর রমাকে রীতিমতো খারাপ লাগে। মনে মনে নিজেকে বোঝায়, যে নিজেকে অপরের কাছে খারাপ লাগায়—নিজেকে ভাল লাগানো যার সহ্য হয় না—নিজেকে খারাপ লাগিয়ে সে আত্মহত্যা করে। নিজেকে খারাপ

লাগানো—পরের মধ্যে নিজেকে খারাপ লাগিয়ে সে একটা পাপ করে—আত্মহত্যার পাপ। মনে মনে রমাকে বলে, ও বলবে ঠিক করে, আমার 'যে দুটো চাঁদ—দুটো উপগ্রহ—তা আমার মনে থাকে না—থাকে মাত্র একটি উপগ্রহের জন্যেই। তোমার কথা ছাড়া আমার কারো কথা মনে থাকে না—আমি যে একটা গোটা সংসার—ফ্ল্যাট, বাড়ি, গাড়ি সব ভুলতে পারি—এমন প্রবল ভুলে থাকবার শক্তিতে কিন্তু আমি তোমার চেয়ে জিতে গেছি। তোমার ভালবাসার যদি এমন করে সব ভুলিয়ে দিতে পারত—তোমার রিটেনটিভ পাওয়ার নষ্ট করে দিত—তবে বুঝতাম .....। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে কল্যাণের মনে হয়, রীনা আজ অফিসে এল, ওকে এক কাপ চাও খাওয়ালাম না—জোর করে, চাতুরী করে হঠাৎ ট্রামে তুলে দিলাম..... রীনার জন্যে ওর মন কেমন একটা ব্যথায় ভরে ওঠে..... সঙ্গে সঙ্গে দুশ্চিন্তা হয়, রীনা যদি ওকে ও ভাবে এড়িয়ে যাবার জন্যে অভিমান করে..... কল্যাণ ভাবে, আরো আগেই রমার এখান থেকে ওঠা উচিত ছিল—বেশিক্ষণ থাকতে ইচ্ছে করছে না অথচ উঠে যাবার মত শক্তিও নেই। রমার 'পর বিতৃষ্ণাও রীনার মুখের আকর্ষণ কোনওটার মধ্যেই এমন জোর অনুভব করে না যা ওকে তাগাদা দিয়ে বা আবেগ দিয়ে এখান থেকে তাড়িয়ে নিয়ে যেতে পারে। খেয়াল না করেই ভাবে রীনা নয়, নিজের ফ্ল্যাটে নিজের ঘরে যাবার আকর্ষণই অনুভব করছে। রীনাকে জোর করে বিদায় দেবার জন্যে রীনা রাগ করে অভিমান করে যদি রীনা গুম হয়ে থাকে—কল্যাণ এ কথা ভাবতেই রীনার জন্যে অনুতাপের বদলে বাড়ি যাবার অনিচ্ছা যেন নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে বোধ করতে থাকে। রীনার মুখের বদলে রমার মুখ ভেসে ওঠে। কল্যাণ চোখ বুজে যেন আজকের চেহারাটি মনে আনে—মনে আসে—আবেগ ও অনুভূতি ভালবাসা যেন ওকে কেমন তীক্ষ্ণ, রুক্ষ, শীর্ণ করে দিল আধ ঘন্টার মধ্যে। রমার মধ্যে কেমন একটা নিষ্ঠুর আত্মপীড়ন, একটা তীক্ষ্ণ আত্ম সমালোচনা—ওর আত্মসমালোচনার মধ্যে যেন আত্মগ্লানি, নিজের সম্পর্কে কমপ্লেক্স এ গুলোই প্রকাশ করছে। রমার আত্মসমালোচনায় নিজেকে কল্যাণের কাছে খুলে ধরবার মধ্যে যেন ঠিক নিজেকে সঁপে দিতে পারার আপন ভাবটি নেই—যেন আত্মসমর্পণ নেই, আত্মনিবেদন নেই। যেন রীনার মতো ঠিক মধুর তন্ময়তা নেই—বরং কল্যাণের আকর্ষণে ওর মধ্যে যে একটা ভয়ংকর তোলপাড় ঘটে গেছে, একটা আত্মবিপ্লব চলছে—যেন আজ ওর মধ্যে একটা মানুষের মাপের ভলকনিক ইরাপসন ঘটেছে—এইটেই যেন বড় হয়ে উঠেছে। রীনার মতো কল্যাণের বুকে নিজেকে সব ভুলে সঁপে দেবার চেয়ে—রমার মধ্যে কল্যাণের আকর্ষণে রমার প্রতিক্রিয়াই বড় হয়ে উঠেছে—নিজের পরিবর্তনেই যেন রমা ভয়ংকর উদ্বিগ্ন। নিজে প্রকাশিত হয়ে যাচ্ছে—ওর অন্তরের ঘোমটা কল্যাণের তীব্র আকাঙ্ক্ষার ঝড়ে উড়ে যাচ্ছে বলে যেন নিজেকে সামলানোই ওর বড় সমস্যা। কল্যাণের চেয়ে কল্যাণের তোলা ঝড় ওকে বেশি তোলপাড় করছে। .....তবু, এতে কল্যাণ একটা জয়ের আনন্দ বোধ করে। আনন্দটিকে আবার গভীরভাবে অনুভব করতে গিয়ে দেখে ঠিক যে রমাকে জয় করেছে সে যেন ওর পরিচিত—নিজেকে আড়াল করা, ঈষৎ বিদ্রূপ কণ্ঠ, শ্লেষ ভাষী রোজকার সেই দুর্লভ রমা নয় এ যেন অন্য রমা। যে রমাকে চাইল—আর যে রমা সেই রমার মধ্য দিয়ে বের হয়ে এল তা যেন এক নয়—এক নয় বড় কথা নয়—একটু রুক্ষ, শীর্ণ,

বিপদজনক ভাবে সরল রমাকে ওর কেমন মনঃপুত হয় না। যেন এ রমাকে কল্যাণ চায়নি। অবশ্য কল্যাণ রমার এ চেহারা যে মনঃপুত নয় এ কথা প্রকাশ্যে অর্থাৎ নিজের কাছে স্বীকার করে না—শুধু পরিচিত রমাকে দেখবার একটা ব্যাকুলতা নিজের ভেতরে ভেতরে বোধ করে—আর এই রমার সেই পুরনো চেহারার 'পর আকর্ষণও আছে তাও যেন ঠিক সচেতনভাবে অনুভব করে না। কেবল এখনকার রমার এই আত্মপ্রকাশ মুহূর্তে রমার এই বিপ্লবাত্মক পরিবর্তনের মধ্যে ওর পুরনো রমার চেহারাটাই কল্যাণের মনকে বার বার টানে। আনমনে অফিসের রমাকেই মনে পড়ে ঐ চেহারাটাই মনকে টানে। তবু, কিছুটা অচেতন ভাবে হলেও কল্যাণ যেন বুঝতে পারে ওর এখনকার এই মুহূর্তগুলোই ভাল লাগা উচিত—এই বুকে হাত রাখা—রুমাল দিয়ে ঠোঁট মুছিয়ে দেওয়া—এই ছবিগুলোরই শিহরন জাগানো উচিত—এ গুলোই জীবনে একান্ত দুর্লভ অনুভবের মুহূর্ত। কল্যাণের হাত নিজের বুকে রমা চেপে ধরেছিল, কল্যাণ চুমো খেয়েছিল—সচেতন ভাবে এই ছবি দুটোই কল্যাণ পছন্দ করে তন্ময় হয়ে ভাববার জন্যে—কিন্তু কল্যাণের মনে রমার হেসে রুমালটি কল্যাণের কোলে ফেলে দিয়ে পালিয়ে যাবার ছবিটিই স্পষ্ট হয়ে ওঠে—সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে রীনার ঠোঁট আর রমার ঠোঁটে—একই রকম স্পর্শ ..... একই রকম। এবার ঠিক আশাভঙ্গ হয় না—রমার 'পর যেন জোর খাটাতে পারে। এবার মনে হয়, অনেকক্ষণ একা বসে রয়েছে। ইচ্ছে হয় বলে, দুটো চাঁদের একটিও নেই—হয়ত একটি চাঁদের চলছে কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশী, অপর চাঁদের চলছে সেই সঙ্গে শুক্লপক্ষের প্রতিপদ—একটি শেষ হয়ে যাবার ক্ষীণ মুহূর্তে—আরেক শুরু হবার মুখে সূক্ষ্মতম সরু। দুইটিই অদৃশ্য। রমাকে এ কথা বলা যেতে পারে। বলা যেতে পারে, আজ কৃষ্ণা চতুদর্শী লেগেছে তিনটের সময় ডালহৌসিতে টালিগঞ্জের ট্রামে—আর শুক্লপক্ষের প্রতিপদ শুরু হয়েছে ৬টার সময় ট্যাক্সিতে পাম এভিন্যু যাবার মুখে। উপমাটি ওকে বেশ উত্তেজিত করতেই তা প্রকাশ করবার জন্যে একটা ব্যগ্রতা দেখা দেয়। কিন্তু ঘরের মধ্যে একা—আর ঐ কতগুলো ছবি—ওর পেছনে নাকি আবার ইতিহাস ভূগোল রয়েছে—হয়তো এবার শুনতে পাব—ওর মা হয়ত গান জানে তার পেছনে একটা কিছু ফিলজফি ইকনমিকস রয়েছে। হয়ত রমার আত্মীয় স্বজন যার সঙ্গেই পরিচয় হবে তারই জীবনে শুনবার মতো পড়বার মতো সিলেবাস রয়েছে। মনে পড়ল, রীনার বাবাকে—হরিবল। শুধু নিজে একা একা বকবে—প্রতিটি প্রসঙ্গকে শুরু করবার আগে কি বিরাট ভূমিকা, কি উদ্যোগ পর্ব, কি বিরাট আদিকাণ্ড, কত রেফারেন্স, যেন কোন শহরের কথা শুরু করবার আগে সেখানে যেতে যত স্টেশন আছে তার নাম প্ল্যাটফর্মের নাম্বার, প্ল্যাটফর্মের এডভারটাইসমেন্ট শুদ্ধ বলে—রাস্তার যত জংসন আছে—তার যত শাখা প্রশাখা—তাদের নাম, প্ল্যাটফর্মের নাম্বার—উঃ। কোন প্রসঙ্গকে এরা এমন ভাবে অযথা একঘেয়ে ডিটেলস্ দিয়ে খুন করে—এরা প্রসঙ্গ-হত্যাকারী। কথা বলবার মত সুন্দরকে এরা খুন করে। কথাকে এরা খুন করে—কথা-খুনী। অথচ শব্দ ব্রাহ্মের জগতে—এই সব কথা-হত্যাকারীদের কোন পাপ হয় না—এরা বোবা হয় না—এমন কী প্যারালাইসিস হলেও এদের জিভ সচল থাকে। একদিন রীনার বাবা সম্পর্কে এ জাতীয় একটা ক্ষীণ আভাস—অত্যন্ত ভদ্র ভাষায়

রীনাকে বলেছিল—বলেছিল, তোমার বাবা ঠিক আলাপী লোক নন—একটু বেশি কথা বলেন—রাগ কোরো না—ঠিক যাকে Good Conversationalist বলে তা নন—একটু Talkative। রীনা সেই থেকে সারাদিন গুম হয়েছিল—পরে জানাল, বাবাকে এরপর এখানে আসতে নিষেধ করে দেব—তারও পরে জানাল, বাবা এলে আমিই বাবার কাছে থাকব—তুমি ছুতো করে বাইরে চলে যেও তারও পরে মন্তব্য হল—দেখলাম যে যাকে পছন্দ করে—উল্টে সেও তাকে পছন্দ করবে জগতে এমন নিয়ম নেই—গুম হয়ে যাওয়াতে কল্যাণ প্রথমটা ভেবেছিল অযথা পরিবেশটা নষ্ট করলাম—রীনার বাবার কথা খুন করা বন্ধ তো হবেই না—আমাদের কথা বন্‌ধ হল—হয়ত চব্বিশ ঘন্টার জন্যে—হয়ত আটচল্লিশ ঘন্টার জন্যে। অথচ রীনা বোঝে না—ওর বাবাকে সহ্য করা কী কষ্টকর—তার প্রত্যেকটি সিটিং প্রায় ১৮ রিলের—অথচ তার মধ্যে কোন ইন্টারভ্যাল নেই। না কথা বলে রীনা বলুক গে। ইচ্ছে হয় বলে, তুমি কথা না বলে তোমার বাবা বাচালতার ক্ষতিপূরণ করতে পারবে না—সারাদিন বোবা থাকলে তাঁর দুটো সিটিংয়ের ক্ষতিপূরণ হবে না। তাবে সেদিন কল্যাণও কথা বলেনি। শেষে সন্ধ্যার পর রীনা একটু একটু করে অভিমান ভাঙতে থাকে। তখন কল্যাণ জানায় তোমার কাছেও যদি মন খুলে একটা কথা বলতে না পারি—ঠিক আছে আর বলব না। এবার রীনা ওর বুকের কাছে এসে ওর চুলে ঝাঁকুনি দিয়ে বলল—মন খুলে বলতে না করেছি—তারপর নিজে যেচে একটা চুমো খেয়ে জানাল—তুমি বুঝতে কেন পার না—তোমার মতো কথা সবাই বলতে পারে না। আমি পারি?—এখন পার। আমি তোমার কথার ঘোমটা খুলে ফেলেছি।—তোমার ধারে কাছেও না। আমিও হয়তো বাবার মতোই কথা বলতে জানিনে—বক বক করি। সারাদিনের অস্বস্তি কল্যাণেরও ভাল লাগছিল না। সেদিন রমা অফিসে আসেনি। মনটি এমনিতে ব্যাকুল ছিল। হয়তো রমা এলে রমার সঙ্গে আলাপ—আলোচনার স্মৃতিতে ও কল্পনায় বিভোর হয়ে থাকবার জন্যে রীনার 'পর অভিমানকে ধরে রাখত। বাইরে নিজেকে গম্ভীর, অভিমানী করে সেই অবকাশে রমার সান্নিধ্যের কল্পনায় তন্ময় হয়ে থাকতে চাইত। কিন্তু রমা অফিসে না আসায় রীনার কাছে একটা আশ্রয়ের প্রশ্রয়ের বাসনা ওকে ভেতরে ভেতরে তাগিদ দিচ্ছিল। রমা অফিসে না আসবার অভিমানের জোরে রীনার 'পর অভিমানকে জিইয়ে রেখেছিল। তবু তখন রীনা নিজে থেকে ভাব করল, ওর কথা বলবার প্রশংসা করল—তখন কল্যাণ জানাল,—তোমার বাবা সম্বন্ধে যদি কিছু বলি—অমনি, শুরু করবার সঙ্গে সঙ্গে তুমি তোমার ঠোঁট দিয়ে আমার ঠোঁট চেপে ধরবে। কল্যাণের বুকে মাথা ঘষতে ঘষতে রীনা জানায়—তুমি বলবে না। কল্যাণ মাথা নেড়ে সায় দিয়ে চুমো খেল। সঙ্গে সঙ্গে মনে মনে রীনাকে বলল—গোপন কথাটি রবে না গোপনে। রীনাকে চুমো খাবার কথা মনে পড়তেই রমার কথাও মনে এল। হ্যাঁ, একই স্বাদ। চোখ বুজে কিছুক্ষণ আগে যে জয়ের আনন্দ বোধ করা গেছে—তাকে আবার ফিরে অনুভব করতে চাইল। কিন্তু একটু আগের স্মৃতিকে কিছুতেই জীবন্ত অনুভূতিতে বোধ করা গেল না। গেল না তো গেল না। কল্যাণ সেই আশাভঙ্গকে অগ্রাহ্য করল। মনে হল, রমা যেমন হঠাৎ ঘর ছেড়ে গেছে আমিও যদি এমনি নিঃশব্দে চলে যাই—আমাকে একা বসিয়ে রাখবার

জন্য যদিও কল্যাণ জানে তা অসম্ভব—রমা ওর মার কাছে অপ্রস্তুত হবে বলেই নয় রমা এভাবে নিঃশব্দে চলে যাওয়াকে ওর আত্মনিবেদনের অপমান হিসেবে নেবে বলেই নয়, কোনও দিন ওর মুখ আর দেখাবে না বলেই নয়, এমনকী এতখানি অভদ্র কল্যাণের পক্ষে সম্ভব নয় বলেই নয়—আজ এখানে এমন এক চুম্বক শক্তি রয়েছে একে আজ কল্যাণের কিছুতেই অগ্রাহ্য করা সম্ভব নয়। তবু, কল্যাণের ভাবতে ইচ্ছে করছে—হঠাৎ কল্যাণ উঠে গেছে—এতে কল্যাণের যে একটা অভিমান আছে—ওকে একা বসিয়ে রেখে রমার হঠাৎ অন্তর্ধান—এ'কি রমা বুঝতে পারবে না? হঠাৎ মনে হয়, ও যেন শ্বশুরবাড়ির মানদণ্ডে এখানকার সব কিছু নিজের অগোচরেই সেই রকম আদর যত্ন—প্রত্যাশা—দূর যতসব বাজে চিন্তা। হ্যাঁ, রমাকে নিয়ে আগামী রোববার কোথাও যাবে—দু'জনে—টোটাল ডে—কিন্তু কোথায় যাওয়া যায়—দিনকাল এত খারাপ—নিজের একা কোথায় যাওয়া নিরাপদ নয়—তারপর আবার মেয়েছেলে সঙ্গে নিয়ে মনে পড়ল রীনাকে রীনা যেন কোন সহকর্মীকে দেখতে গিয়ে বোমাবাজি দেখে এসেছে—ভয় পেয়ে ওর কাছে এসেছিল হয়ত ওর সঙ্গে থেকে ভয় কাটাতে এসেছিল—আশ্রয়ের জন্যে এসেছিল—আর আমি কিনা নিষ্ঠুরতায় ওকে একা একা ট্রামে পাঠিয়ে—রমা যে একটুও অপমান করতে ছাড়ল না—ট্যাক্সি করে তাকে পৌঁছে এমনি সময় রমার মাকে খাবার নিয়ে ঘরে ঢুকতে দেখেই যেন কল্যাণ জেগে উঠল—নিজের অন্তর থেকে বেরিয়ে এল। পেছনে জলের গ্লাস হাতে রমাকে দেখে ওর মনে হল—এই রমাকে আজ রাত থেকে আগামীকাল সকাল সাড়ে ন'টা পর্যন্ত দেখতে পাব না—এ সময়টুকু কাটাব কী করে? রমাকে দেখা মাত্র রমার 'পর ওর তীব্র আকর্ষণ যেন অন্তরের সব জায়গায় একটা হাহাকার তুলে দেয়। রমা ও কল্যাণ মুহূর্তে দু'জনে দু'জনের দিকে এক পলক তাকিয়ে দু'জনেই আশ্বস্ত হয়। কল্যানের মনে হয়, রমার চোখ রমাকে ধরিয়ে দিল, জানিয়ে দিল, ও আমারই আছে। ও আড়ালে কিছুক্ষণের জন্যে গেলেও আমাকে ওর মনে নিয়েই গিয়েছিল। ওর চোখ ও আমাকেই দেখিয়ে দিল। ওর চোখের তারায় যেন আমি স্থায়ী বাসিন্দা। কল্যাণকে দেখে রমার মন উদ্বেল হয়ে ওঠে : যেন আজকের কোন আচরণই আমার অসঙ্গত হয়নি—ও'কে সব দেওয়া যায়—ও নিশ্চয়ই আমার আপন হবে। ওর চাহনি, ওর হাসি, আমাকে দেখে ওর মুখ যেমন আপনা থেকে নিজের অজান্তে খুশিতে জ্বলে উঠল : ও আমার, ও আমার। আর আমি কিছু ভাবতে চাইনে—পারিনে।

রমার মাকে দেখে আবার কল্যাণের ভালো লাগল। যেন ঘর আলো হয়ে গেল। এতক্ষণের উনুনের আগুনে তেতে কেমন লালও হয়ে উঠেছে—ওর শাশুড়ির এই চেহারা ওকে ভারি আকর্ষণ করে। আজও করল। রীনারও এ চেহারাটি ওর ভালো লাগে। যদিও ওর শ্বশুড়বাড়িতেও গ্যাস রয়েছে—তবু শাশুড়ি উনুনের পাট তুলে দেননি। বরং কদাচ গ্যাস ব্যবহার করেন। রীনাও বাপের বাড়ি এসে উনুনের 'পর তুচ্ছ তাচ্ছিল্য প্রকাশ করে—শেষে উনুনেই যখন কিছু রান্না করে নিয়ে আসে—তখনও ওকে এমনি ভালো লাগে। কল্যাণ ভাবল, লুচি খাবার ছুতোয় আরো কিছুক্ষণ থাকবার সুযোগ পাওয়া গেল। আর সঙ্গে সঙ্গে মা'র সঙ্গে মিলিয়ে রমাকে ভাল লাগছিল। একটু আগেই

পুরানো রমাকে ফেরত পাবার আকাঙ্ক্ষা ওর মধ্যে ছিল—তা যে ভুলে গেল তাই নয়—রমাও যখন একা ছিল—তখন রমার যে চেহারা, আচরণ তীব্র ভাবে ভালো লাগা উচিত বলে মনে হয়েছিল তা যখন—তখন নয়—পরে, স্মৃতিতে ভালো লাগছিল না—তা শুধু ভুলে গেল। কেমন রমাকে এবার জলের গ্লাস হাতে নতুন নতুন লাগছিল—এই জলের গ্লাস আনবার মধ্যে যেন কল্যাণের 'পর এক ধরনের আনুগত্য বোধ করে। রমাকে যেন রীনার মতো মনে হয়। সেই রকম সেবা পরায়ণতার একটা চেহারা। রমা যেন নতুন ধরনের রীনা। কিছুটা রীনার স্বাদ—কিন্তু রমার স্বাদ মিলিয়ে এখন যেন রমাকে কেমন অজানা নয়—জানা মনে হয়, আপন মনে হয়, আকর্ষণ করে। ওর রহস্যময়তা যেন জনের গ্লাস হাতে নিতেই চলে গেছে—আর সঙ্গে সঙ্গে যেন অনেক কাছে এসে গেছে—মা'র আড়ালে ওর লজ্জা সঙ্কোচ ও গোপন বিব্রতভাব সব মিলে এমন একটা আকর্ষন সৃষ্টি করেছে—কল্যাণ আপনা থেকে ভাবল, আজ রমা আর রীনা যেন এক নারী—ওরা দু'জন ভিন্ন নয়—এক জনেরই যেন দুটো দেহ। এ কথা ভাববার সঙ্গে সঙ্গে নিজের ভেতরের এক ভার যেন কমে গেল। অপরাধবোধ যেন অন্তর থেকে অনেকখানি বেরিয়ে মনকে অনেক হাল্কা করে দিল। মনের যে এমন হাল্কা ভাব হওয়া প্রয়োজন ছিল—আজ দরকার ছিল—কল্যাণ খুশিতে তা ভাবল। অপরাধবোধও যে মনে গোপনে ভার চাপিয়ে দিয়েছিল—আর ভার এমন অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল—তা যে কষ্টকর ছিল—মন হাল্কা হওয়া মাত্র তা টের পেল। মা সঙ্গে থাকায় রমাও আশ্বস্তবোধ করছিল। কল্যাণ ওরই রইল—অথচ মা'র আড়ালে ওকে বেশ দেখা যাবে—অনুভব করা যাবে—আর মা থাকলে কল্যাণের তীব্র চুম্বকের আকর্ষণ থেকে আত্মরক্ষা করাও যাবে। আজ যতটুকু এগিয়েছি, আর নয়—নিজের যে আচরণ এখন কল্যাণকে দেখে মনে হচ্ছে অসঙ্গত হয়নি—তা নিয়ে না হয় রাতে স্বপ্ন রচনা করা যাবে—কিন্তু আজ আর নিজেকে একা ছেড়ে দিতে ভরসা হয় না। মা রয়েছে। ওর ইচ্ছে হয়, কল্যাণকে বেশ অনেকক্ষণ পর দেখে মনে হচ্ছে অসঙ্গত হয়নি—তা নিয়ে না হয় রাতে স্বপ্ন রচনা করা যাবে—কিন্তু মা'র আড়াল থেকে—কিন্তু মা না থাকলে—দু'জনের সেই এক দৃষ্টিতে থাকিয়ে থাকা—সেই দৃষ্টি আগুন জ্বালিয়ে দেবে—মা'র আড়ালে, মা'র পাশে অনেকটা পর হবার মতো করে ভান করে প্রাণ ভরে দেখবে। তাছাড়া রমার ভেতরে আরো একটা ইচ্ছাও উঁকি দিচ্ছে। কল্যানের সামনে স্বাভাবিক হতে চায়—যদিও হতে ইচ্ছে করেনা—সেই অস্বাভাবিক, সেই অসঙ্গত আচরনের লোভ থাকা সত্ত্বেও—ভেতরে ভেতরে স্বাভাবিক হবার একটা ব্যাকুলতা ছিল—মা'র আড়াল থেকে কল্যাণের কাছে সহজ হয়ে উঠবে—মা'র পাশে ওকে আপন করে অনুভব করবার সঙ্গে সঙ্গে সহজ হবার চেষ্টাও করবে। যেন কল্যানের সঙ্গে সহজ হতে পারলে—কল্যাণ যে আপন এ কথা সহজে কল্যাণকে জানিয়ে যদি আজকের মতো কল্যাণকে বাড়ি যেতেদি— তবে আজ রাত অনেক সহজ, সুন্দর ও অপূর্ব হয়। রমা এখন একটু দূরত্ব থেকে আপন হতে চায়, সহজ হ'তে চায়—আপন করে পেতে চায়, সহজ করে কল্যাণকে আজকের মতো বাড়ি যেতে দিতে চায়। তবু মনে হয় যতক্ষণ থাকে—থাক। আগামীকাল সাড়ে ন'টা আগেতো দেখা হবে না—এখন পুরো রাত—

লম্বা সকাল শেষ হবে আগামী কাল সাড়ে ন'টায়। রমার ইচ্ছে করে অনেক অনেকক্ষণ কল্যাণ থাকুক।

স্তূপাকৃত লুচি-তরকারীর দিকে তাকিয়ে কল্যাণের ভয় হয় : এত কেন—এর অর্ধেক খেতে হলেও তো গেছি। কল্যাণ একদম লুচি পছন্দ করে না। তবে খাবার দাবার বিষয়ে নিজের পছন্দ অপছন্দ জাহির করবার একটা অনিচ্ছে ওর আছে। শ্বশুরবাড়িতেও সেই লুচি। তবু হাসি মুখে সেই অত্যাচার সহ্য করেছে। রীনা অনেক পরে টের পেয়েছে—কল্যাণ লুচি পছন্দ করে না—চপ, কাটলেট, মোগলাই পরোটা—এমন কি চায়ের সঙ্গে চানাচুর হলে চলে—বিস্কিট ওর দু'চোখের বিষ। কিন্তু রীনার জামাইবাবু লুচিতেই খুশি হন—হয়তো পছন্দও করেন। তবে খাবার দিলেই সঙ্কোচিত হন। কিন্তু কল্যাণকে খাবার দিলেই খুশি ভাব দেখাবে—জানাবে—মনে মনে খাবার আকাঙ্ক্ষা ছিল—কিন্তু জামাইদের নাকি কিছু চাইতে হয় না—খিদের কথা বলতে মানা। তাই চুপ করে সংযম করছিল। তবে বেশিক্ষণ সংযম করতে হয়নি। কিন্তু হয়ত মাত্র দু' একখানা খাবে—মিষ্টি একদম পছন্দ করে না—শালীদের ধরে ওর পাশে বসাবে। খাবার জন্যে পীড়াপীড়ি করলে জানাবে, ওর খিদে আছে—তবে খিদের পরিমাণ আর লুচির পরিমাণ অনেক ফারাক। লুচির পরিমাণে দ্বিতীয় পান্ডব খুশি হ'ত—দু'নম্বর জামাইয়ের কাছে তা হচ্ছে অভিমান্যুকে গন্ধমাদন পর্বত আনতে বলা। খুব একটা খেত না বলে রীনা কিছুটা বিব্রত হলেও, কল্যাণ খেতে চেয়েও খেত না—এতে গর্বই বোধ করত—জামাইবাবু নীরবে খেয়ে নেওয়া—আপত্তি না করা—এর মধ্যে কেমন একটা শীতল হ্যাংলামো আছে। জামাইবাবু মুন্সেফ হলেও—গরিবের ঘরের ছেলে—সুতরাং খেতেও চায় না—আবার খাবার দেখলে কল্যাণের মত খুশিও হয় না—আর কল্যাণের মত অত অল্পও খায় না। যতটুকু পারে—খেয়ে নেয়। কল্যাণের অল্প খাবারের মধ্যে রীনা আভিজাত্য বোধ করত। এমনকী মীনাও যেন স্বামীর খাবার দাবারের ব্যাপারে কোন আপত্তি নেই দেখে একটু অস্বস্তি বোধ করত। বিশেষ করে, যখন কল্যাণের মধ্যে বড় ঘরের ছাপ রীনার বাবা আবিষ্কার করতেন—ঐ অল্প খাবারের মধ্যে। শুধু রীনার মা বলতেন—বড় জামাই খাবার দাবারের বিষয় একটু নির্বিকার কিন্তু বাড়ির সবাই মনে করত—যাকে মা ভদ্র ভাষায় নির্বিকার বলছে তা হচ্ছে খাবার দাবার ইচ্ছা প্রকাশ না করা—সে কে আর শ্বশুরবাড়িতে খেতে চায় বল—সবাই তো আর কল্যাণদার মতো নয়। কল্যাণ শালীদের নিয়ে বেশি দামের টিকিটে সিনেমা দেখত—তাই থেকে কল্যাণের আত্মা যে বড় জামাইবাবুর চেয়ে বড় তা প্রতিষ্ঠিত ছিল। মীনা যখন শ্বশুরবাড়ি থাকত—তখন বোনদের নিয়ে বেশি সিনেমা দেখিয়েও নিজের স্বামীর আত্মার আয়তন একটুও বাড়াতে পারেনি।

আজ লুচি দেখেই কল্যাণের মনে পড়ল—শ্বশুরবাড়ির অভিনয় করতে হবে। অথচ কেমন একটা সূক্ষ্মবিতৃষ্ণা আছে শ্বশুরবাড়ির লুচির পরিমাণ দেখে সেই ব্যবহারের অনুকরণ করায়।

কল্যাণ জানায়—খিদের মাপের চেয়ে লুচির মাপগুলো অনেক বড়।

দ্বিতীয় পাণ্ডব আর অভিমুন্যের উপমা দেবার ইচ্ছে থাকলেও কেন যেন মনে হল—এখানে এই কথা ক'টি অসঙ্গত হত—কেমন মানাত না। আর মেজাজও যেন সেই রকম

নেই। এমন একটা পবিত্র ও সাম্য মুহূর্তে নিজের উচ্ছিষ্ট আচরনকে যেন বিতৃষ্ণার সঙ্গে মনে পড়ল।

মা জানান—সারাদিন খাওয়া হয়নি—খিদে মরে গেছে।

রমা জানাল—আরেক দিন কিন্তু ভাত খেতে হবে। শুধু লুচি খেয়ে চলে গেলে চলবে না।

কল্যাণের সমস্ত শরীরে যেন একটা শিহরন জাগে। এমন জোর—এমন আদর—এমন দাবি—রমা যেন আজ ওর। এই জোরের মধ্য দিয়ে রমা তা জানাল। মনে হল, চুমোর মধ্য দিয়ে বুকে হাত চেপে ধরবার মধ্য দিয়েও এতখানি আপন হয়ে রমা আসেনি। কল্যাণের মন সজল হয়ে আসে। এই জোরের মধ্যে দাবির মধ্যে দেহের উত্তেজনা নেই—যেন মন ভিজে ওঠে। এ যেন দেহকে তুচ্ছ করে মনকে জয় করে নেওয়া। রীনার জোর, দাবি, আবদার সবই কেমন মামুলি, গতানুগতিক, স্বামী'র 'পর স্ত্রীর কর্তব্য। এ যেন কর্তব্য নয়—দায়িত্ব নয়—এ যেন নিজের বে-আইনি অধিকারের বে-আইনীত্ব ভুলে গিয়ে অধিকারটুকুই বিস্তার করছে। এ যেন কর্তব্য করা নয়—এ যেন আপন হওয়া। এ যেন আমন্ত্রণ নয়—এ যেন আকর্ষণ। এ যেন সংসারের দেওয়া অধিকারকে প্রয়োগ করা নয়—আপন অন্তর থেকে যেন ভালবাসার অংশীদার হতে চাওয়া—হওয়া। এ নির্দেশ যেন গার্জেনের নাম করে নিজের আনুগত্য জানান—অথচ এ আনুগত্যে নিজেকে বিলিয়ে দেওয়া আছে—কিন্তু ব্যক্তিত্বকে বিসর্জন না দিয়ে।

মা জানালেন—সে তো খেতেই হবে। সারাদিনের 'পর এ'কি একটা খাওয়া? রমা ও কল্যাণ দু'জনেই খেতে বসল। মা পাশে দাঁড়ালেন।

রমার অল্প লুচির দিকে তাকিয়ে কল্যাণ জানায়—এক যাত্রায় পৃথক ফল কেন?

মা-ই উত্তর দিলেন—ও এখুনি ভাত খাবে। তাই বেশি দিলাম না। কিন্তু বাড়ি যেতে তো অনেক দেরি হবে।

—আপনি নিঃসঙ্কোচে আমাকে তুমি বলবেন।

—ছেলের বয়সী প্রায়। অবন বেঁচে থাকলে এরই মত হ'ত—হ'ত নারে রমা?

—অবন?

—আমার দাদা। স্কুল ফাইনাল দেবার সময় ম্যানিনজাইটিস্ হয়ে মারা যান।

—মাত্র তিনদিনের জ্বরে।

কল্যাণ শুধু বলল—ইস্।

মা জানান—যাই চা নিয়ে আসি।

এই মৃত্যু সংবাদ কেমন যেন কল্যাণকে আনন্দ দেয়। অর্থাৎ সংসারের 'পর দিয়ে এদের ঝড় বয়ে গেছে—বাবার আর্টিস্ট হিসেবে ব্যর্থতা, অত বড় ভাইয়ের মৃত্যু—নিজের রোজগারে রমা বাবা-মাকে প্রতিপালন করছে—সব মিলে কল্যাণের মনে হয়—এই সংসারের প্রকৃতিস্থতা নেই। এই সংরারের কেন্দ্র বিন্দু বিচলিত। এ কথা চিন্তা করে কল্যাণের কেমন এক ধরনের আনন্দ হয়। এদের অপ্রকৃতিস্থ সংসারে, এলোমেলো হয়ে যাওয়া সংসারে, শোকে-তাপে ব্যর্থতায় স্বাভাবিকতা নষ্ট হয়ে যাবার ফলে কল্যাণ যে একটা আনন্দানুভব হয় তা হচ্ছে—যে কতকটা অবচেতনভাবে বুঝে নেওয়া এদের

অপ্রকৃতিস্থ পরিবেশে রমার সঙ্গে মেলামেশাকে এরা গুরুত্ব দেবে না—কারণ নিজেদের বেদনার কেন্দ্রে এরা বন্দী। এই রকম পরিবেশের সুযোগ নিয়ে রমার সঙ্গে অন্তরঙ্গতা বাড়ানোতে অসুবিধে নেই, আর রমাও হয়ত বাড়ির এই পরিবেশ থেকে একটু সরে ওর কাছে আসতে চাইবে—তাছাড়া, এই অপ্রকৃতিস্থ পরিবেশে থেকে রমাও কখন মানসিক ব্যালেন্স ঠিক রাখতে পারে না। তাই যদি কখনও রাগও করে তাও আবার ওর অন্তরের স্বাদ ও ফিরে পাবে।

একটা গোপন আনন্দে কল্যাণ দুঃখ জানায়—তোমার মা তো তা হলে খুব বড় শক পেয়েছেন—ইস্—এতবড় ছেলে—ভাবতেই—আমিও মৃত্যুর সঙ্গে পরিচিত—অত্যন্ত অল্প বয়েস থেকেই....।

—মা পেয়েছেন একটা শোক—বাবার দুটো। আমি কত পাব কে জানে?

—তোমার কল্যাণ হবে।

রমা একটু ম্লান হেসে একটু চুপ করে রইল। তারপর যেন নিজেকে ঝাড়া দিয়ে বলল—না, খাবার সময় শোক-তাপ থাক। ও তো আছেই। এখন তুমি খেতে শুরু করোতো। আমি তোমার মুখ দেখে বুঝতে পারছি—তোমার খিদে পেয়েছে।

—তা পেয়েছে, তবে তা লুচির খিদে বোধ হয় নয়?

—আমি জানি তুমি লুচি পছন্দ কর না।

দু'জনেই দু'জনের দিকে দুষ্টুমি ভরা চোখে তাকাল। কিন্তু কল্যাণের ভয় হ'ল—আবার হয়ত একদৃষ্টিতে তাকাবার প্রতিযোগিতা না শুরু হয়ে যায়। তাড়াতাড়ি চোখ নামিয়ে লুচি তুলে নেয়। দুষ্টুমিভরা চোখে রমাকে কী ছেলেমানুষ লাগে! আমার একটু দেখবার ইচ্ছে ছিল কিন্তু প্রতিযোগিতার ভয় মুহূর্তে এমন পেয়ে বসল। একটু খচখচ করে—চোখ নামানোতে রমা অপমান বোধ করল না তো। আবার রমার দিকে তাকাতেই দেখল রমার চোখে সেই দৃষ্টি-দুষ্টুমি ও কৌতুক যেন মিশে রয়েছে। প্রথমটা ভাবল, তা হলে তো সত্যি রমা এক দৃষ্টিতে তাকাবার কম্পিটিশন শুরু করে দিয়েছে। তবু জোর কয়ে তাকিয়ে থাকল।

রমা এবার বলল—লুচির খাবার ভূমিকা হিসেবে কিছু খাওনি?

কল্যাণ তৎক্ষণাৎ সায় দিয়ে বলে—ভূমিকা অসাধারন—দুর্লভতম—কিন্তু লুচি খাবার পরিশিষ্ট এখনও বাকি।

রমা ঠোঁট উল্টে জানায়—সে তো চা—মা নিয়ে আসছেন।

আবার দু'জন দু'জনের দিকে সেই দুষ্টুমি ভরা চোখে তাকাল। এবার রমা আঙুল দিয়ে লুচির প্লেট দেখিয়ে দিল। কল্যাণ স্বস্তি বোধ করে হাতের লুচির সঙ্গে তরকারি তুলল।

খুশি হয়ে কল্যাণ বলে, আচ্ছা, তোমার বাবার ছবির তো এখনও একিসবিশন করা চলে। হল ভাড়া নিয়ে পেপারে অ্যাডভারটাইস দিয়ে কয়েকটা শো তো করানো যেতে পারে। আমাদের কিছু খরচ হবে—এই পর্যন্ত। মুহূর্তে রমা উৎসাহে উত্তেজিত হয়ে ওঠে—কী রকম খরচ হতে পারে?

কল্যাণ মাথা নেড়ে বলে—সে জন্যে তোমাকে ভাবতে হবে না—সামান্যই—হয়তো

বড় জোর—শক'য়েক টাকা—পত্রিকায় স্পেস্ ভাড়া করে—নিজেরাই বিজ্ঞাপন দেব—আর্ট ক্রিটিকদের মাতব্বরি না-ই সহ্য করলাম। তাছাড়া দু'একজন সমঝদারও কী পাওয়া যাবে না—নিশ্চয়ই যাবে। তাঁদের কমেন্টও পত্রিকায় দেব। ক'টি শো—আর কিছু পত্রিকার শো'র বিজ্ঞাপন—ব্যস্—দেখ কোথায় মি. মিত্রকে নিয়ে আসি। একজন আর্টিস্ট এভাবে নেগলেকটেড হবেন—এ সহ্য করা যায় না।

রমার কাছে হঠাৎ যেন এক চিরকালের অন্ধকারের মধ্যে আশার আলো এল। বাবার কিছু হবে না—এই বিশ্বাস ও সংস্কার নিয়ে বড় হয়েছে। বাবা জীবনে আর্টিস্ট হিসেবে ব্যর্থ হয়েছেন কিছু লোকের ষড়যন্ত্রে—সেই ব্যর্থতাকে কিছুতেই অতিক্রম করা যাবে না—রমার এ ধারণা যেন একটা সহজাত বিশ্বাস। হঠাৎ কল্যাণের কথা শুনে ওর সমস্ত জীবনে—সমস্ত সত্তায়—এমন একটা প্রবল ধাক্কা অনুভব করল—এমন ওর প্রচলিত বিশ্বাসে আঘাত পেল—মাত্র শ'কয়েক টাকা—একবার বোনাসের টাকায় বাবাকে আবার আর্টিস্ট হিসেবে দাঁড়া করানো যায়। আর কল্যাণ যা পরিকল্পনা দিল—সেই পরিকল্পনার মধ্যে কোনও অসম্ভব অবাস্তব কিছু নেই—অনায়াসে হ'ল ভাড়া নেওয়া যায়—অনায়াসে বিজ্ঞাপন দেওয়া যায়। অথচ ওর কোন দিনও মাথায় আসেনি—নইলে নিজের জন্যে চুরি, হার, বালা না করে—আর শ'কয়েক টাকা ..... .এতে.....। এতকালের চলে আসা ধারণায় ধাক্কা খাওয়ায় রমা ভয়ংকর বিচলিত হয়ে ওঠে—ইচ্ছে করে এক্ষুনি বাবাকে গিয়ে বলে, মা-কে বলে। যেন আজ রাতেই বাবার ছবিগুলো পরিষ্কার করতে লেগে যায়। ওর মনে হল ই.সি.জি না করে, স্পেশ্যালিস্ট না দেখিয়ে বাবার 'পর যেমন অবিচার করেছে—তেমনি বাবাকে কী করে আর্টিস্ট হিসেবে পরিচিত করা যায়—সেই জন্যেও কিছু না করে বাবার 'পর অবিচার করেছে। মা'কে বালা কিনে দিয়েছে—দামী শাড়ী কিনে এনেছে মা'র জন্যে—বাবার জন্যে শুধু ওষুধ—তাও খুব দামী নয়—কিছু ফল—একটা ধুতি, হয়ত একটা পাঞ্জাবি—বাবা তাতেই কত কৃতজ্ঞ, সংকোচিত। মা রূপের নিন্দে করলে বাবা-ই আপত্তি করেছে। রমা প্রথমে বাবা বিখ্যাত হয়ে পারলেন না—এই ধারণায় আঘাত পেয়ে চঞ্চল হয়ে উঠল, বাবার সম্পর্কে জীবনে এই প্রথম আশার আলো দেখতে পেয়ে রীতিমতো আনন্দে উদ্বেল হয়ে উঠল—এমন আশার আনন্দের গভীরতা জীবনে বোধ করেনি—তারপর বাবার জন্যে কিছু করেনি—এ কথাকে ওর মনে আশা, আনন্দ—আর আনন্দের অনুশোচনা মিলে যেন ওকে অস্থির করে তুলল। সব ভুলে কল্যাণের দিকে চেয়ে রইল।

তারপর গভীর আবেগে কল্যাণের দিকে তাকিয়ে বলল—শ'কয়েক টাকা আমি নিশ্চয় জোগাড় করতে পারব—আর সব তুমি ব্যবস্থা করে দেবে।

ওর এমন কাঁপা কাঁপা প্রায় জলে ভরা কণ্ঠ কল্যাণ শোনেনি কখনও। আজকের এত অভিজ্ঞতার মধ্যেও যেন এমন সুর রমার ছিল না। এখন যেন চোখে মুখে প্রাণে কল্যাণের কাছে আত্মনিবেদন করেছে—আত্মসমর্পণ করেছে। ওর আবেগ-আবেদনে কল্যাণের বুকও কেঁপে উঠল।

—তুমি আমাকে বলেছ—তোমার দায়িত্ব শেষ। এবার যা করবার আমি করব।

আনন্দে, আবেগে, উত্তেজনায় রমা কেঁপে ওঠে। ইচ্ছে হয়, বাবার যন্ত্রণা, বেদনা,

লাঞ্ছনার কথা একের 'পর এক বলে যায়। কিন্তু আবেগে ভেঙে পড়তে পারে এই ভয়ে চুপ রইল। শুধু জানাল—আজ। আমি আমার নিঃসঙ্গ জীবনে প্রথম একজন বন্ধু পেলাম।

—আর আমি তোমাকে পেয়েছি—তুমি পাবার অনেক আগে—অযুত আলোকবর্ষ আগে—আর সে আলো পুরানো আলো নয়—আগের দিনের বাসি আলো নয়। একেবারের প্রথম দিনকার আলো—যে দিন ভগবান প্রথম আলো সৃষ্টি করলেন—সেই নতুন জন্ম নেয়া আলো। অতদূর যেতে যদি আপত্তি থাকে—তবে প্রথম যেদিন আলো পৃথিবীতে পড়ল—সেই ভূমিষ্ঠ আলো—সদ্যজাত আলো আমার অনেকদিনের রোজকার আলো।

কল্যাণের কথা রমার কানে গেলেও একটা আনন্দের অস্থিরতা ওকে চঞ্চল করে তুলেছিল। তবু কল্যাণকে একটা প্রকাণ্ড উত্তর দেবার আকাঙ্ক্ষা দেখা দিল, জানাল—আমি জানতাম, যারা আদরে প্রশ্রয়ে বড় হয়—জগতকে তারা বোঝে না—বেশি আলোতে চোখ ঝলসে যায়—আর দুঃখ কষ্টের মধ্যে যাদের দিন কাটে জগতকে অনেক বেশি তারা বোঝে—অন্ধকারে চোখের সেনসিভিটি বাড়ে—তবে দু'দলই শেষে অন্ধ হয়—এক দল হয়ে যায় অযোগ্য আশাবাদী—অন্য দল নিরাশার শিকার। আগে ভেবেছিলাম আমার জীবনে আলো আসবে না—আমাকে আলো উপার্জন করতে হবে—হয়ত মজুরি হিসেবে কিছু আলো পাব। আজই প্রথম আলো পেলাম—বিনা মজুরিতে—বিনা চেষ্টায়—আলোকে এতদিন আলেয়া বলে ভুল করেছি। বাস্তব সত্য আর ইচ্ছাপুরণের কল্পনা এই দুটির পার্থক্য সম্পর্কে সচেতন থাকতে চেয়েছি।

এমন সময় দূর থেকে মা-কে চা আনতে দেখে দু'জনেই থেমে যায়। কল্যাণের মনে একটা ঈর্ষা ও আনন্দের মেশানো অনুভূতি পাক খেতে থাকে। পরিষ্কার বুঝতে পারে বাবার নাম হবে এই কল্পনায় রমা বিভোর হয়ে ওকে আজ প্রথম বন্ধু বলে স্বীকার করল। যেন বাবার নাম ছড়িয়ে দেবার ক্ষমতাই বন্ধুত্বের কষ্টিপাথর। তাছাড়া রমার বাবার 'পর এই প্রবল আকর্ষণে কল্যাণের কেমন ঈর্ষা হয়। বাবার 'পর এই অন্ধ আকর্ষণের প্রবলতায় রমা যেমন সেন্টিমেন্টাল হয়ে উঠেছে—তা কল্যাণের ভালো লাগে না। বাবার 'পর রীতিমতো একটা ঈর্ষা ওর মনকে কেমন কালো করে দেয়। আবার বাবাকে বিখ্যাত করে দিয়ে রমাকে হাতের মুঠোয় রাখা যাবে এই চিন্তাও ওকে আনন্দ দেয়। রমার প্রয়োজনে লেগে রমার সঙ্গে অচ্ছেদ্য ভাবে জড়িত হয়ে পড়বে—এই ভাবনাও ওকে আনন্দ দেয়। তাছাড়া রমার বলবার শক্তিও ওকে ভয় পাইয়ে দেয়। রীনা মুগ্ধ হয়ে শোনে। সপ্রশংস দৃষ্টিতে দেখে। শালা শালীরা বাহবা দেয়। শ্বশুরমশায় ভাবখানা হচ্ছে, দেখ, কেমন ছেলে। কল্যাণের কথা বলবার সময়টুকু চুপ করে থাকবার কষ্টকে স্মিত মুখে মেনে নিয়ে শ্বশুরমশায় প্রসন্নভাবে মাথা নাড়তে থাকেন। কিন্তু রমা সমঝদারও বটে, বেশ জবাবও দিতে পারে বটে। ওর ভয় হয় হয়ত ওর অহংকারকে রমা ধূলিসাৎ করে দেবে। রমার মাঝে সমঝদার পাবার চেয়েও যেন একজন সবল প্রতিযোগী পাবার একটা ক্ষীণ আতঙ্ক ওর মধ্যে দেখা দেয়। তবু রমার আত্মনিবেদনের সুরই জোর করে ধরে রাখতে চায়। রমাকে হাতের মুঠোর মধ্যে পাবার আনন্দকে সেই

সঙ্গে মনের মধ্যে খুঁজতে থাকে। এমনি সময় মাকে চা নিয়ে আসতে দেখে যেন নিজের ভেতরের ঈর্ষা-আনন্দ-আতঙ্কের আবর্ত থেকে পরিত্রাণ পেয়ে মনে মনে যেন রমার মা'র কাছে একটা আশ্রয় কামনা করে। সঙ্গে সঙ্গে কল্যাণ আশা করে, রমার বাবাকে যে বিখ্যাত করে দেবার পরিকল্পনা করেছে—রমা তা বলে মা'র কাছে কল্যাণের মূল্য বাড়িয়ে দেবে—আদর বাড়াবে—আর সেই সঙ্গে কল্যাণের 'পর আরেক দফা কৃতজ্ঞতা জানাবে। এই প্রত্যাশায় কল্যাণ মৌন হয়ে লুচি খায়। মা'কে আসতে দেখে কল্যাণ নিজে মৌন হয়ে রমাকে কথা বলবার সুযোগ দেয়।

চা পাশে রেখে কল্যাণের মা এবার যেন একটু ক্লান্ত হয়ে বসে। এক মনে কল্যাণকে দেখে। কী সুন্দর চেহারা—কী পোশাক। কত টাকা না জানি রোজগার করছে। অথচ একদম দেমাক নেই। বড় ঘরের ছেলে নিশ্চয়। আর বড় ঘর। নিজে কী কম বড় ঘরের মেয়ে ছিলেন। সারা জীবনে কেউ খোঁজ নিল না অবনকে দেখল না—অবনটা থাকলেও হয়ত এমনি অফিসার হত—এমনি ছেলের সঙ্গে রমার বিয়ে হয়ে যেত—এমন অফিসার জামাই—এমন অফিসার ছেলে—ভাল দেখে বউ আনতেন—নাতি নাতনী। বুক চিরে দীর্ঘ নিঃশ্বাস আসছিল তা গোপন করলেন। এমন ভাগ্য যার—তার পোড়া কপালে আবার এসব চিন্তাও আসে।

নিজেকে সামলাবার জন্যে এবং নিজের রান্নার একটু প্রশংসা শুনে নিজেকে অন্যমনস্ক করে দেবার জন্যে বললেন—কই, কিছু খাচ্ছ না তো?

একটা সংশয় ও সঙ্কোচে রমা উদ্বিগ্ন। কল্যান যা প্রস্তাব দিয়েছে—তা অন্তত মা'র সামনে বললে কল্যাণের 'পর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ হয়—হয়ত তা কল্যাণ প্রত্যাশাও করছে—প্রত্যাশা করা স্বাভাবিক আর রমার ও বলা উচিত। কিন্তু খরচের কথা তুললেই মা বেঁকে দাড়াবেন। তাছাড়া বাবার ছবির ব্যাপার তুললেই মা কেমন বিরক্ত হয়ে ওঠেন। আর বারবার বাবার প্রসঙ্গ তুললে মা কেমন অসন্তুষ্ট হন—একথা রমা কেমন করে যেন বুঝে গেছে। মা লুচি, তরকারি চা করে এনে দিল অথচ মেয়ের সে দিকে কোনও কৃতজ্ঞতা নেই—পেয়ারের বাপের আটের কথা হচ্ছে। বাবার কথা বললে মা অকৃতজ্ঞ মনে করবেন—আর এত বড় বিরাট—প্রায় ভাবা যায় না—এমন উপকার কল্যাণ করতে যাচ্ছে—কল্যাণ নিশ্চয়ই মনে মনে ওর মা'র কাছ থেকেও একটা আপ্রাণ কৃতজ্ঞতা প্রত্যাশা করছে—কল্যাণকে আশাভঙ্গ করতে দেওয়া যায় না। রমা ভারি দোটানায় পড়ে। তাছাড়া এত বড় একটা আশার কথা নিঃশব্দে বহন করা আরো কঠিন—এমন অপ্রত্যাশিত আলোর সংবাদ এ কী চুপ করে কাউকে অংশ না দিয়ে বসে থাকা যায়। তবু মুখ খুলতে ভয় হয়, মুখ না খুলতে কষ্ট হয়। মাথা নিচু করে লুচি খেতে খেতে হঠাৎ রমার মনে একটা ছবি খেলে যায়—এরপর যেদিন ঝগড়া হবে—সেদিন মা খোঁচা দিয়ে বলবেন—আমি তো বাড়ির ঝি, বামুনঝি মেয়ের, মেয়ের বন্ধুর জন্যে লুচি করে গিয়ে দিয়ে আসতে হবে বৈঠকখানায়। এদিকে রমা বুঝে গেছে বাবাকে শিল্পী হিসেবে খ্যাতি এনে দেবার যে প্রস্তাব কল্যাণ এনে দিয়েছে—যে উন্মাদনা কল্যাণ ওর মধ্যে সঞ্চার করে দিয়েছে—তাতে আজকের কল্যাণের সঙ্গে ওর যে আচরণকে এতক্ষণ অসঙ্গত মনে করে একটা বিরাট আত্মগ্লানির আবির্ভাবের ভয়ে অস্থির হচ্ছিল

ভিতরে ভিতরে—যা চাপা পড়ে যাচ্ছে, তা আর মাথা তুলতে পারবে না। বাবার খ্যাতি হবে—নাম হবে—যশ হবে। বাবা শুনলে না জানি কী খুশি হবেন। আরো কিছুকাল আগে যদি কল্যাণকে বলতো। তবু মনে হয় আজকের এই ওর দেহ মনকে যে কল্যাণকে স্পর্শ করতে দিয়েছে—এটুকু না পেলে কী কল্যাণ.....। তবু, আজ ওর কুমারী জীবন যে প্রথম চুম্বন পেল—ওর কুমারী বুক যে স্পর্শ পেল—আজ ওর বাবার জীবনেও এল প্রথম আশার আলো। যে সূর্য চিরকালের জন্যে নিভে গিয়েছিল—যে সূর্য কোনও সকালে ওঠেনি—সেই নিভে যাওয়া সূর্যকে কল্যাণ ধরিয়ে দিল—জ্বালিয়ে দিল। অতি সহজে সিগারেট ধরাবার মতো অনায়াসে কল্যান একটা নেভানো সূর্যকে ধরিয়ে দিল—সামান্য একটা পরিকল্পনার লাইটার দিয়ে। ইচ্ছে হয়, কল্যাণকে বলে, বাবার আবার ছবির একজিবিশন হলে, বিজ্ঞাপন হলে—নামটা ছড়িয়ে পড়লে—বেশ ক'টা প্রদর্শনী হলে আর প্রদর্শনীর বিজ্ঞাপন পত্রিকায় দিলে নাম ছড়াতে বাধ্য—এ হচ্ছে বিজ্ঞাপনের যুগ—সমস্ত বোনাসের টাকা বাবার জন্যে দেবে—তখন—তখন—কল্যাণকে জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে করে—তোমাকে একটা কিছু প্রেজেন্ট করবার অনুমতি দাও—অনুমতি কেন, জোর করে একটা কিছু প্রেজেন্ট করবে। সংশয়, সংকোচ, দ্বিধা, আশা, উন্মাদনা ও একটা মধুর অনুভূতিতে অভিভূত রমার মনে হয়—লুচি যেন গলার ভেতরে যেতে চাচ্ছে না—অথচ আরো লুচি দিলে আরও কিছুক্ষণ চুপ থাকা যেত। কিন্তু আর তো চুপ থাকা উচিত নয়।

কল্যাণ জানায়—কেন, বেশ খাচ্ছি—আপনার লুচি দেখেই বুঝতে পারলেম বেশ খিদে ছিল।

—তা হলে না হয় আরো ক'খানা—

কল্যাণ হা হা করে ওঠে—খিদে ছিল—কিন্তু আমি খুব বেশি খেতে পারিনে। এত গুলোই পারব না। মা মনে করলেন—ছেলেটি কী সরল। বড়লোকের ছেলে কখনও কী বেশি খেতে পারে? আরও ক'টা কম ভাজলে—এখন ওর পাতেরটা খাবে কে? ছেলেটির সরলতায় মন ভিজে যায়। কিন্তু বেশি লুচি ভাজার অনুতাপে কল্যাণের সরলতা বেশিক্ষণ অনুভব করতে পারেন না।

নিজের পুরনো ব্যবহারের অনুকরণ করতে যেয়ে কল্যাণ প্রাণ পায় না। নিজের এই সরলতার অভিনয়—এই খিদের কথা প্রকাশ করা—খাবার দেখে কৃত্রিম আনন্দ দেখানো বহুবার অভিনয় করেছে। কিন্তু আজ এই ব্যবহারকে কেমন উচ্ছিষ্ট লাগবে বলে মনে মনে ভয় করছিল—বলবার 'পরও নিজেকে কেমন উচ্ছিষ্ট, বেমানান ও অপবিত্র মনে হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল, আজ এই মুহূর্ত বড় পবিত্র—আজ ওদের দু'জনের মিলনের লগ্নে এই মুহূর্তটি পবিত্র, পূন্য ও ধন্য। এখন নিজের এই ব্যবহার—পুরনো ভন্ডামিকে কেমন অপবিত্র লাগছিল। মনে হচ্ছিল, এই পুণ্য লগ্ন যেন নোংরা করে দিলাম। মনে মনে জানায়—কেন যে একগাদা লুচি দিয়ে—সেই সঙ্গে কিছু জল-মঙ্গলের সুপ দিয়ে মানুষকে আবহমানকাল ধরে জবর কাটবার জন্যে বসিয়ে রাখে—ভাবে অনেক কিছু দিলেম—যেন বেশিক্ষণ খাওয়াই খাওয়া। কোথায় এমন দিনে গ্র্যান্ডে যেতে হয়—বাজনার সঙ্গে সঙ্গে একটার পর একটা কোর্স আসবে—তানা এখন বসে বসে তরকারির

মধ্যে বেগুন থেকে আলু বাছবার কাজ করতে হচ্ছে। এদিকে নীরবে রমাকে খেতে দেখে ওর ঈর্ষা হয়—কেমন নিঃশব্দে খাচ্ছে। অথচ চপ কাটলেট খাবার সময় কী আপত্তি—অত খেতে পারব না—ওরে বাবা এযে দোকানের সব চপ কাটলেট এনে এখানে জড়ো করা হল—অত খাবে কে? এখন নিজের বাড়িতে ডালডার লুচি আর আলু বেগুনের ঘন্টের 'পর কী নিষ্ঠা! তাকাচ্ছে না পর্যন্ত—পাছে খাবার ডিস্টার্ব হয়। অত লুচির সমস্যা ওর 'পর চাপানো হতেই কল্যাণ পীড়িত হয়ে বেপরোয়া হয় : যা পারব খাব। অত ভাবতে পারব না। সঙ্গে সঙ্গে এও ভাবল, এর বাবাকে বিখ্যাত করে দেব—শুনলে কৃতজ্ঞতায় লুচি না চায়—সেই সঙ্গে আলু বেগুনের কমপাউন্ড আর অ্যাটমিক সন্দেশ।

এবার কল্যাণ মুখ তুলে রমার বাবার ছবিগুলোর দিকে তাকায়। কাঁহাতক লুচির দিকে তাকিয়ে যোগাভ্যাস করা যায়। কাঁহাতক আলুবেগুনের ধাঁধা থেকে আলুকে উদ্ধার করা যায়। ছবিগুলোর দিকে তাকিয়ে হঠাৎ মনে হয়, আচ্ছা, এই ছবিগুলোর মধ্যে কী রমার মা'র ছায়া পড়েনি? রমার মা'র দিকে তাকায়। পরিষ্কার মনে হয় একদৃষ্টিতে কল্যাণের দিকে তাকিয়ে রয়েছেন—কিন্তু যেন কল্যাণকে দেখছেন না—কল্যাণের দিকে তাকিয়ে কোন চিন্তায় তন্ময় হয়ে গেছেন। কী সুন্দর বড় বড় চোখ—কি রঙ, নাকের গড়ন কী সূক্ষ্ম—তীক্ষ্ণ—পাতলা ঠোঁট। চোখ দুটো যেন বেশ জ্বলজ্বলে—অন্যমনস্কতায় যেন আরো উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। তবে চাহনির মধ্যে যেন কোনও কোমলতা নেই—সমস্ত দেহে, মুখে যে কোমলতা রয়েছে—দৃষ্টি যেন একটু কড়া, চোখ দুটো যেন রাশভারী—দেহ থেকে দৃষ্টি যেন ভিন্ন হয়ে গেছে। ঠিক বিষণ্ণও নয়, ক্রুদ্ধ নয়,—কেমন উদাসীনতার মধ্যে একটা গোপন বিরক্তি, কিছুটা নিরাশার ভাব মিশে আছে। কল্যাণের চেহারা অপরে মুগ্ধ হয়ে দেখছে—এই অভিজ্ঞতা ওর যত্রতত্র—আর এই অভিজ্ঞতার প্রত্যাশা ওর যে কোন নূতন পরিবেশে গেলেই শুরু হয়। আজ কিন্তু রমার মা'র তাকিয়ে থাকবার বৈশিষ্ট্য ওর মনে এল। তাকানোর বিশ্লেষণ নিজে থেকে করল না—আপনা আপনি মনে এল। স্নেহসিক্ত রূপ মুগ্ধতার যে প্রত্যাশা আহত হল—তাকে কল্যাণ মুহূর্তের জন্যে যেন ভুলে গেল। ভুলে গেল ছবিগুলোর যে মিল ওর মা'র মধ্যে খুঁজছিল সেই কথা। ভুলে গেল কিন্তু কিছু একটা যে ভুলে গেছে সেই কথা মনে থাকায়—কথাটা খুঁজতে থাকে। আর মনে হয়, রমাকে বলে, যে লুচি আর আলু বেগুনের ধাঁধা ওকে দেওয়া হয়েছে তা শেষ করতে করতে ওর জন্মশতবার্ষিকী এসে যাবে।

মার মনে এল : এই ছেলেটার বউও হয়তো বিকেলের খাবার করে রেখেছিল। হয়ত সেগুলো নষ্ট হবে। কারও খাবার নষ্ট হচ্ছে শুনলে ওর ভারি রাগ হয়। খিদের কষ্ট কী জিনিস ..... ওর নিজের বাড়িতে কী ফেলা ছড়া যেত—আর অপরের বাড়ির কিছু নষ্ট হলে ওর শরীরে রাগ ধরে যাবে হয়ত ঠান্ডা হয়ে গেছে—জলের মধ্যে বাটি দিয়ে রেখে দিতে পারে—আগামীকাল বাসি খাবে—নষ্ট হবে কেন? আজকাল ফ্রিজ বা ব্রিজ কী হয়েছে—তা থাকলে তো কথাই নেই—কিন্তু নামটা ফ্রিজ বা অন্যকিছু ঠিক মতো উচ্চারণ করতে পারবে না ভেবে জিজ্ঞেস করতে সংকোচ বোধ করল। হঠাৎ চোখ পড়ল রমার দিকে। ওর দিকে তাকিয়ে দেখল নিশ্চিন্তে খাচ্ছে। নিশ্চিন্ত

ভাবটি কেমন যেন একটা রাগ এনে দেয় রমার মা'র মধ্যে আজকে টিউটোরিয়াল ছিল—গেল না। থাকবে না। দুটো পয়সা বেশি আসা যে লক্ষ্মী তাও যদি না বোঝে। সারাদিন খায়নি শুনেও রাগ কমে না। নিজে কত দিন—তা কী দু'একদিন—একটানা উপোস করেছে—শুধু জল খেয়ে দিন কাটিয়েছে। তা আর কে জানে? রমার নিশ্চিন্ত ভাবটির জন্যে কেমন একটা গোপন ঈর্ষাও বোধ করে। কই, সারাজীবনে তিনি তো পারলেন না একদন্ড নিশ্চিন্ত হয়ে বসতে। যার বাপ অকর্মণ্য, অত বড় ছোট ভাইটা মারা গেল—বাপ আজ আছে কী কাল নেই ঠিক নেই, যার মা অত শোক পেল—সেই মেয়ে দুটো পয়সা রোজগার করে বলে নিশ্চিন্ত থাকবে? ভেতরে ভেতরে উষ্মা বোধ করেন।

রমা কী খাচ্ছে, কতক্ষণ ধরে খাচ্ছে—যেন ওর কিছুই মনে নেই। পরীক্ষা দেবার সময় যেমন অন্যমনস্ক হয়ে স্নান থেকে খেতে যাওয়া পর্যন্ত এমন একটা পর্ব সমাধা করত—যার কোন স্মৃতি ওর চেতনায় থাকত না। হয়ত সেই সময় মা ওরই টিউশনির টাকায় একটু ভাল-মন্দ রান্না করতেন—হয়তো সেই রান্নার জন্যে প্রশংসা পাবার আকাঙ্ক্ষায় অপেক্ষাও করে থাকতেন—কিন্তু এ সব কেমন যেন রমাকে তখন স্পর্শ করত না—হয়ত অবচেতনে একরকম বুঝতেনও—কিন্তু সেই চেতনা ওর মনে তখন কোন দাগ কাটতো না। মা হয়ত জিজ্ঞেস করতেন—আলু পোস্ত কেমন খেলি—তোর পরীক্ষা, একটুও যে ভাল মন্দ রাঁধব—না খেলে কী মাথায় জোর আসে—মনে থাকে। রমা মাথা নেড়ে কী যে সায় দিত—কিছুই বুঝত না। আজও তেমনি। ও জানে, হয়তো মা লুচি-তরকারী প্রশংসা শুনতে চাচ্ছেন হয়তো অবনের জন্যে ওদের কাছ থেকে একটু শোক-তাপ, একটু দুঃখ বেদনা প্রত্যাশা করছেন—না পেলে অবনের জন্যে দুঃখের চেয়ে, বোন হয়ে অবনের 'পর কর্তব্য করল না—সেই ক্ষোভ করবেন, হয়ত মা যে এই সংসারের সব কিছু করেন এ কথাও ওর মুখ থেকে শুনতে চাচ্ছেন—কল্যাণ শুনতে চাচ্ছে—যে উপকার—বাবার জন্যে যে একজিবিশন করা যায়—এই পরামর্শ ও দায়িত্ব নেবার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা। আজকের সন্ধ্যার অপূর্ব মুহূর্ত কল্যাণের ঐ নীরব সৌন্দর্য নিজের আত্মনিবেদনের জন্যে শিহরন ও পরে একা হবার পর আত্মগ্লানির ভয়, বাবার জীবনে পরিবর্তন আনবার সম্ভাবনায় এক আশ্চর্য-আবিষ্কারের আনন্দ, আর এখন মা'র কাছে এ কথা বলবার বিপদ—আর না বলবার জন্যে যেন কল্যাণকে কৃতজ্ঞতা থেকে বঞ্চিত করা। এই মুহূর্তের দায়িত্ব যেন ওর ঘাড়ে চেপে বসে। এই মুহূর্তের কর্তব্য যেন ওর গলা টিপে ধরে। এই মুহূর্তে এমন একটি লগ্ন যার দায় দায়িত্ব ওর, এর পরিণামের জন্যে জবাবদিহি ওর। এই মুহূর্তটি যেন ওকে গলা টিপে ধরল—এমনি ওর ভাগ্য—এমনি নিয়তি। অভিমানে গলা যেন আটকে আসতে চায়। তবু দায় দায়িত্বের দম আটকানো সিদ্ধান্তের তাগিদের চেয়ে এ অভিমান ওর নিজের অজান্তেই অনেক ভালো লাগে। অভিমানকে আকড়ে ধরে রাখতে চায়। ভয় হয়, দায়িত্বের ঝড়ে এমন অভিমানের মেঘ উড়ে না যায়। নিজের অভিমানকে গাঢ় করে আরো গভীর করে অনুভব করবার জন্যে, কিছুটা স্থায়িত্ব দেবার জন্যে নিজের জীবনের বঞ্চনার তালিকা তৈরি করবার তাগিদ বোধ করল। অভিমানের ঠান্ডা বাতাসে যে আরাম বোধ করল,

যে দায়িত্বকে আড়াল করবার সাময়িক সুযোগ পেল—তাতে ভেতরে ভেতরে যে একটা নিশ্চিন্ততা হল—হঠাৎ সেই গোপন আরাম আর অবচেতন নিশ্চিন্ততার মধ্য থেকে হঠাৎ আত্মরক্ষার আর এই পরিবেশ রক্ষার একটা পরিত্রানের চিন্তা মাথায় খেলে গেল আগামীকাল অফিসে বলব, জান, মা'র সামনে বাবার একজিবিশনের কথা বলিনি কেন? মা'কে হঠাৎ সারপ্রাইজ দেব—এমন চমকে দেব। তখন কল্যাণের আর কোনও ক্ষোভ থাকবে না। এখন যদি ক্ষুব্ধ হয়ে ও যায়—তখন মন আবার জ্বলে উঠবে। আজই না হয় যাবার সময় বলব,—ওকে তুলে দিয়ে আসবার সময় বলব—তা হলে আজই সব মিটে যায়। না হয়, তুলে দেবার সময় বলব, বাবার বিষয় কিন্তু আর বেশি আলোচনা করলাম না—মা-কে সারপ্রাইজ দেবার জন্যে চুপ করে রইলাম—জগতে—এ অন্য গ্যালাক্সিতে—তোমার বহু আলোকবর্ষ দূরের গ্যালাক্সিতে নিয়ে এলাম না—বুড়ো মানুষ—অত টানাটানি সহ্য হবে না। বরং তোমার আর আমার নামে একটা গ্যালাক্সি ঠিক করো—কি নাম দেবে, এ হচ্ছে আজকের তোমার হোম-টাস্ক। কল্যানের 'হোম' কথাটি মনে আসতেই রমা মনের এই জলন্ত উৎসাহ যেন অনেক নিভে আসে। নিভে আসতেই ওর কেমন একটা ভয় করে। মুহূর্তে ভয়কে এড়াবার জন্যে—এতক্ষণের পরিত্রাণের আনন্দকে বজায় রাখবার জন্যে রমা যা বলে তাতে নিজের অজান্তেই রমা অবাক হয়—তবে অবাক হওয়া স্বীকার করে না—বলে শুধু ভাবে—যা হবার হোক—আর পারিনে—সকলের মন জোগাবার জন্যে জন্মেছি কিনা?—জানো মা, কল্যাণবাবু বলছেন বাবার একটা এক্সিজিবিশনকরতে—মানে ও—উনিই সব ব্যবস্থা করে দেবেন—যা প্ল্যান দিলেন—তাতে মনে হয় এবার বাবা ঠিক পাবলিসিটি—বাবার ঠিক নাম হবে। মোটেই কঠিন কিছু নয়।

রমা বাকী সবটা ব্যাখা করে দেবার জন্যে কল্যাণের দিকে তাকায়। দারুণ ভয় করতে থাকে। খবরের কাগজে কথাটা যখন উঠবে.....। রমা মরিয়া হয়েও খবরের কথা মা'র প্রতিক্রিয়া কী হবে এ ভয়ে যেন একটা একটা করে মিনিট কাটাবার গ্লানি ও তীব্র যন্ত্রণার একঘেয়েমি বোধ করতে থাকে।

রমার চোখে-মুখে এক ধরনের উচ্ছ্বাস দেখে কল্যাণ ঈর্ষাবোধ করে। বাবার নামে যেন জেগে উঠেছে। কল্যাণের মূল্য রাবাকে নাম-যশ এনে দেবার জন্যে। কই এমন অনুভূতি তো ওর হয়নি কখনও রীনা যখন ওর বাবার প্রশংসা করত—তখন। তাছাড়া রমা তো কখনও ওর জন্যে উদ্বিগ্ন হয়নি—এমনকী ওর ঘেরাও হবার সংবাদ রয়েছে—যা নিশ্চয় রমা শুনেছে তা নিয়ে তো একটুও চিন্তা করতে দেখলাম না। তবু রীনা—যে উদ্বিগ্ন হল—তাকে এক কাপ চা না খাইয়ে...... হঠাৎ কল্যাণের অজান্তেই একটা চিত্র ভেসে ওঠে। রীনা বাপের বাড়ি গিয়ে গর্বের সঙ্গে ওর ঘেরাও হবার সংবাদ—টেলিফোন আসবার সংবাদ বলছে। নিজেকে ঝাড়া দিয়ে কল্যাণ ভাবে তবু রমার বাবার প্রশংসা এই আলু বেগুনের পাজন থেকে একটু ভাল। আপতত খাওয়া তো বন্ধ করা যাক। রমা ওকে কথা বলবার সুযোগ দিয়ে চোয়ালের এক্সাসাইজ থেকে বাঁচাল।

—একজন এত বড় আর্টিস্ট—এ ভাবে নেগলেকটেড হবেন—এতো ঠিক নয়। ক'টা শো করে—পেপারে অ্যাডভারটাইজমেন্ট দিয়ে। আমি তো আপনার মেয়ের 'পর

রেগে রয়েছি—এতকাল আলাপ—বাবা এত বড় আর্টিস্ট—তা কিনা আজ প্রথম আমি জানলাম। আপনি কিছু ভাববেন না—মিঃ মিত্রকে এবার পাবলিকের সামনে এনে হাজির করব। এটা হচ্ছে পাবলিসিটি—প্রচারের যুগ—এ যুগে গায়ে পড়ে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে না দিলে কেউ ওদের আদর বোঝে না।

এবার রমা বলল—আমার কিন্তু ধারণা—মানুষ মূলতঃ গুণীর আদর বুঝতে চায় না। কারণ, নম্বর এক হচ্ছে, নিজেই ইনফিরিয়টি, নম্বর দুই হচ্ছে গুণকে ভোগ করব, এক্সপ্লয়েট করব—কিন্তু যেহেতু গুণের জন্যে কিছু না কিছু দাম দিতে হয়—তাই গুণীকে মূল্য দেওয়া বেশি দেওয়া মনে করে—যদি না গুণীর 'পর কোন ফিকস্নেসন থাকে—যেমন থাকে খেলোয়াড়, সিনেমা একটর অ্যাকট্রেস্ গায়ক এদের 'পর। মানুষ যাকে দাম দেয়—তাকে মূল্য দিতে চায় না। অন্ততঃ ফিকস্নেসন না থাকলে।

—তুমি এই বয়সে তো বেশ পেসিমিস্ট হয়েছ -।

—আনলাইক ইউর অপটিমিজম...।

রমা শেষ করবার আগে কল্যাণ বলে, আমি পেসিমিস্টও নই, অপটিমিস্টও নই—সত্য অপিটিমিজিমেও নেই, পেসিমিজিমেও নেই—সত্য আছে প্র্যাকটিক্যাল মানুষের আমার কাছে। মানুষের মন মনস্তাত্ত্বিকদের চেয়েও অনেক বেশি বোঝে ব্যবসায়ীরা। একজন সাইকিয়াট্রিস্টের চেয়ে একজন বিজনেসম্যান মানুষের চরিত্র সম্পর্কে অভিজ্ঞ।

—বিজনেসম্যান বোঝে ব্যবসার সম্পর্কে, ইনরিলেসনস টু হিজ বিজনেস।

—সাইক্রিয়াট্রিস্ট বোঝে মানসিক রোগের সম্পর্কে—ইনরিলেসনস টু হিজ ওর হার কমপ্লেক্স।

—তাহলে কিন্তু খেলা ড্র।

—না। বিজনেস ম্যান অনেক বেশি সাকসেসফুল।

—সাফল্যের কষ্ঠিপাথর কী? নিজেকে নিজের আদর্শ মনে হওয়া, না পরের কাছে নিজেকে আদর্শ মনে হওয়া, অথবা পরের আন্তরিক প্রশংসা বা ঈর্ষাকেই নিজের সার্থকতার চরম লক্ষণ ভাবা? সাফল্য বলতে কী বুঝব? সেক্সপীয়র বলেছেন, কেউ মহৎ হয়ে জন্মায়, কেউ চেষ্টা করে মহৎ হয় আর কারো মহৎ হবার আকাঙ্ক্ষা থাকে। মিছে কথা, কেউ মহৎ হয়ে জন্মায় না—অসহায় শিশু হয়ে জন্মায়—যে বড়, ছোট বা মা বা বাবার মনোযোগ কেড়ে নেবার ঈর্ষায় ঈর্ষায় বড় হয়—কেউ মহৎও চেষ্টা করে হয় না—মহৎ হবার আকাঙ্ক্ষাও কারো নেই—আছে নিজেকে মহৎ বলে গোপনে বা প্রকাশ্যে আত্মপ্রচার করবার আকাঙ্ক্ষা। সেই মহৎ দয়া যার প্রচারের জন্যে তোমার ঐ ব্যবসায়ীরা অ্যাকটিভ থাকে। যে ব্যবসায়ীদের কাজে লাগে। মানুষ আত্মপ্রেমিক, আত্মপ্রচারই মানুষের একান্ত দরকার—আত্মজ্ঞান নয়। যতটুকু তবু আত্মজ্ঞান মানুষের হয়—তাও পাঁচজনের ঠেলায় পড়ে। তাই দেখা যায়, তাদেরই আত্মজ্ঞান বেশি যারা জীবন যুদ্ধে হেরেছে বা ঘা খেয়েছে।

কল্যাণ একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রমাকে বুঝতে চাচ্ছিল। রমার যুক্তির লাগসই জবাব দেবার একটা আকাঙ্ক্ষা ভেতরে ভেতরে ওকে প্রবল তাগাদা দিতে থাকলেও, রমার রক্তাক্ত মুখ যেন বিদ্রূপ-ঘৃণা আর তাচ্ছিল্যের অহংকারে অপূর্ব হয়ে উঠছিল—সেই

দৃষ্টি যেন ওকে অনেকটা অবশ করে দিয়েছিল তবু, রমার যুক্তির মধ্যে রমাকে খুঁজতে চাচ্ছিল। একটানা এতক্ষণ কথা বলতে রমা পারে এতেই যেন কল্যাণের ভারি আশ্চর্য লাগছিল। তবু, রমার মা'র সামনে নিজের কথা বলবার ক্ষমতা দেখাবার লোভও ভেতরে ভেতরে ওকে পীড়ন করছিল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এও ভাবছিল, রমার কাছে বরং হেরে গেলে রমাকে পাওয়া যাবে অনেক বেশি করে। রমার তত্ত্ব মেনে নিলে রমার আত্মপ্রেম তৃপ্ত হবে, রমা অনেক বেশি খুশি হবে। নিজের কথা বলা, না রমাকে খুশি করা কোনটি দরকার? রমার মা'র সামনে হেরে যাওয়া—এ চিন্তা কাঁটার মতো কল্যাণকে বিঁধছিল—তবু জানে রমার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত হলে, রমা খুশি হবে, রমার মা খুশি হবে। রমার মা খুশি হলে রমা আরও খুশি হবে। মনে মনে স্বীকার করে, রমার ধারণা দেখতে ও ভালো নয়, ইংরেজি অনার্স আর স্পোকেন ইংলিশের ডিপ্লোমা নিয়ে রিসেপসনিস্ট, বাবা ব্যর্থ আর্টিস্ট—তাই ওর আত্মজ্ঞান এসেছে মোটামোটি জীবন যুদ্ধে হেরেছে বা ঘা খেয়েছে এই ধারণা থেকে।

কল্যাণ না থামিয়ে দেবার জন্যে ও উস্কে দেবার জন্যে বলল—মানুষ তো মহৎ কারণের জন্যে প্রাণ দেয়, শহিদ হয়—অন্তত পরোপকারও তো করে? এ কথা কী অস্বীকার করা যায়?

এবার রমার মা মুখ খুললেন—মা নিজে না খেয়ে, দিনের পর দিন উপোস থেকে বাচ্চাদের, নিজের ছেলে মেয়েকে খাওয়ায়।

দু'দিক থেকে আক্রান্ত হয়ে রমা যেন বেশ শান্ত হয়ে যায়। তারপর তক্ষুনি শান্তভাবে ও দৃঢ়ভাবে বলে—মা বাচ্চাদের না খাইয়ে নিজে খেলে কী শান্তি পেত? নিজে খাবে আর বাচ্চাগুলো না খেয়ে শুকিয়ে মরবে এ জিনিস মা সহ্য করতে পারত—শান্তির জন্যেই মা'র আত্মত্যাগ। আর পরের জন্যে প্রান দেওয়া, শহিদ হওয়া—এগুলো কিন্তু বড্ড পুরনো তর্ক। এর একমাত্র জবাবই সত্য—নিজেকে জাহির করা, প্রচার করা, প্রতিষ্ঠা করা, নিজেকে চিরকালের জন্যে শ্রদ্ধেয় করা—এই আত্মপ্রচারই আত্মত্যাগের ছদ্মবেশে আসে—এই আত্মপ্রচারের জন্যে মানুষ মরতেও পারে। এই স্বার্থপরতা, আই মীন সেলফিসনেসই সব স্যাক্রিফাইসের মূল কথাটি ওকে অমর করবার জন্যেই মানুষ মরে, প্রাণ দেয়।

নিজের তর্কের উত্তাপে রমা ভাবে, বাবার ব্যর্থতার মূলে বাবার আর্টিস্ট হবার সাধ—নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করবার ব্যর্থ চেষ্টার প্রতিক্রিয়া, মা'র ক্ষোভের কারণ—তার রূপ আর বংশ বাবা নষ্ট করে দিয়েছে—কল্যাণের আত্মতুষ্টির কারণ, দু'জন নারী—দু'টি স্যাটেলাইট ওর চারদিকে ঘুরছে—একটা না একটার পূর্ণিমা ওর সব সময়ের সঙ্গী আর আমাদের উপকার করবার বাহাদুরি—আর আমি? আমার ক্ষোভ আমি যৌবন, সংসারকে বাঁচাতে খরচ করে ফেলছি—নিজেকে ভালবাসি বলেই নিজের রূপের অভাবের ব্যথা এত আমার, আজ তাই আমাকে এমন বেসামাল করে দিল। রমার মনে হল বাবা, মা, কল্যাণ ও নিজেকে—সকলকে ও ঘৃণা করে—কারো সঙ্গ ওর কাম্য নয়। একটা তীব্র বিতৃষ্ণা যেন ওর ঠোঁটকে পর্যন্ত তেতো করে দেয়।

এবার যেন রমার চিন্তার তাপ রমার কথাকেও তাতিয়ে দেয়—মানুষের ক্ষমতা আছে

তাই সে মহৎ?—এ কথা আমি জানিনে। মানুষের ক্ষমতা আছে—দুটো মানুষের দেহের ক্ষমতা এক নয়—মনের ক্ষমতার পার্থক্যও আকাশ-পাতাল হয়। হতে পারে। মানুষের ক্ষমতার রূপ আলাদা আলাদা। কারো চিন্তার ক্ষমতা বেশি—কারো সুন্দর করে কথা বলবার ক্ষমতা বেশি—এজ ইউ আর—কেউ মেসিন তৈরি করবার ক্ষমতা রাখে—মানুষের উপকার করবার ক্ষমতা কারো বেশি— এজ ইউ আর—ক্ষমতাকে মহত্ত্ব কেন বলব? কেউ গ্রেট নয়—গ্রেটনেস বলে কিছু নেই—সবাই নার্সিসাস—কেউ উগ্র, কেউ চাপা।

—আমাদের শব্দ ভাণ্ডারের .....

—হ্যাঁ, মহত্ত্ব কথাটি আছে—যেমন আছে অশ্বডিম্ব—। আকাশ-কুসুম।

কল্যাণ হো হো করে হেসে উঠল।

কল্যাণ দো-টানায় পড়ে। কোনও বিষয়ে ওর মতবাদ মনের গভীরে শিকড় গেড়ে যে বসে থাকে তা নয়। কোন মতবাদের 'পর মমত্ব ওর ততখানি নেই। যখন যে মতবাদ চলতি—তার বিরুদ্ধে একটু চমকানো ভাবে কিছু বলতে পারলেই খুশি। তাই বলে নিজে যা বলে তা বিশ্বাসও করতে হবে এমন সংস্কার ওর গড়ে ওঠেনি। মহত্ত্ব সম্পর্কে কথা উঠলে মহত্ত্বের বিরুদ্ধে কথা বলাই ওর স্বভাব। তাই রমা মহত্ত্বের অস্তিত্বকে অস্বীকার করায় ওর যে খুব আপত্তি আছে তা নয়—কিন্তু রমা মহত্ত্ব সম্পর্কে চলতি মতবাদের বিরুদ্ধে বলায় কল্যাণের প্রথম মনে হল, রমা যেন কল্যাণের মতামত চুরি করেছে—অন্তত মহত্ত্বের বিরুদ্ধে বলবার যে অধিকার কল্যাণের ছিল তা রমা, ওর মা'র সামনে হেরে যেতেও খারাপ লাগে, আবার এও বোঝে রমাকে হারিয়ে দিয়ে রমাকে পাওয়া শক্ত। মতবাদটি যেন ইমোশন-চার্জড। একা হলে হয়ত বলত, তোষামোদি করে বলত, আজ তোমার মধ্যে নিপূণ একজন তার্কিক আবিষ্কার করলাম—হয়তো গাল টিপে বলতাম, জীবন সম্পর্কে এত হতাশা হবার মতো বয়েস তোমার হয়নি—হয়তো বলতাম, তোমার সুন্দর চোখ দুটো কিন্তু তোমার মতবাদের বিরোধিতা করছে। গালটেপার চিন্তা করতে বা ওর সুন্দর চোখ দুটোর প্রশংসা করে নতুন উপায়ে ওর মতবাদকে ধূলিসাৎ করে দেবার চিন্তা করতেই কল্যাণের মনে কিছুটা স্বস্তি আসে। তবু রমার মা'র সামনে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব এখনও দেখান হয়নি—ওর প্রাপ্য প্রশংসা আদায় করবার মতো এখনও কিছু করেনি। নিজের দেহ-মনের এখন সেই পাওনা আদায়ের জন্যে কিছু করা হয়নি—আবছা ভাবে একথা চিন্তা করে কল্যান শান্তি পায় না। তাছাড়া, ওর বাবার প্রদর্শনী করে দেবার জন্যে যে প্রশংসা ও উত্তেজনা রমার মা'র কাছ থেকে আশা করছিল—হঠাৎ মাত্র তাঁর উল্লেখ করে রমা অন্য প্রসঙ্গে চলে যাওয়াতে কল্যাণ আরো বঞ্চিত বলে নিজেকে ভাবল। তাছাড়া রমার কথার মধ্যে বরং উল্টো খোঁচা রয়েছে—কেউ উপকার করে—বাহাদুরি নেবার জন্যে—অর্থাৎ কল্যাণের প্রদর্শনী করবার দায়িত্ব নেওয়া হচ্ছে উপকার করবার ইচ্ছে নয়—নিজের ক্ষমতার একটা পরিচয় বা প্রদর্শনী মাত্র। তবু, রমার দুটো কথা অর্থাৎ কল্যাণ সুন্দর করে কথা বলতে পারে এই কম্প্লিমেন্ট—ওর মার মুখের সামনে বেশ চতুর কিন্তু ইংরেজিতে বলল—হয়তো ওর মা ইংরেজি জানে না এ জন্যে, নয়তো 'তুমি' করে বলবার বলবার হাত

থেকে অব্যাহতি পাবার জন্যে। নিজের পাওনা না পাবার ক্ষোভ, রমার কাছে কথায় হেরে যাবার ভয়, ওর চমকানো মতবাদ রমা আগে বলে ফেলায় নিজের সম্পত্তি চলে যাবার নিঃস্বতা ও রমার কমপ্লিমেন্ট কারো সুন্দর করে কথা বলবার ক্ষমতা বেশি, অ্যাজ ইউ আর—বা কারো উপকার করবার ক্ষমতা বেশি অ্যাজ ইউ আর—একই সঙ্গে বিভিন্ন সুরের সঙ্গে কানে বাজতে থাকে। কেবল মনে হয়, ওর যে সুন্দর করে কথা বলবার ক্ষমতা আছে—এ কথা তো ওর মা'র সামনে প্রতিষ্ঠা করতে হয়।

রমা আবার বলল। যেন নিজেকে নিঃশেষ করতে পারছে না। হঠাৎ যেন একটা অফুরন্ত ক্ষোভের উৎস খুলে গেছে—এখন রক্তপাত বন্ধ হতে চাচ্ছে না। কল্যাণের মনে হল, যেন রমা হাফাচ্ছে।

—মহত্ত্ব আর যাই হোক প্রতিদানের সাহায্যের প্রত্যাশা রাখে না—এমনকী তথাকথিত নিঃস্বার্থ সাহায্যের পরও—প্রশংসা শুনবার জন্যে অন্তত কান খাড়া করে রাখে না।

এবারও কল্যাণ হেসে উঠল—নিজের অজান্তেই বলে উঠল—স্প্লেন্ডিড্।

—শ্রীকৃষ্ণ নিষ্কাম কর্মের উপদেশ দিয়েছেন—ফলের আশা না করে কাজ করতে বলেছেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে এই উপদেশ দিলেন কেন? নিশ্চয়ই এই আসা শ্রীকৃষ্ণের ছিল, অন্তত তাঁর উপদেশ অর্জুন শুনবেন—তাঁর উপদেশে অর্জুনেরও মানুষের নিষ্কাম কর্মের 'পর আকাঙ্ক্ষা জাগবে। অর্থাৎ তাঁর উপদেশে ফল হবে—এই ফল লাভের আশা নিয়েই শ্রীকৃষ্ণ গীতা রচনা করেছিলেন। নিষ্কাম ভাবে নয়। তাঁর উপদেশে ফল হবে—এমন আকাঙ্ক্ষাও ছিল—তাই গীতা রচনা করবার সময় তিনি ফলাকাঙ্ক্ষাহীন ছিলেন না—অথচ জগৎকে নিষ্কাম ফলাকাঙ্ক্ষার উপদেশ দিয়েছিলেন। অর্জুনের বিষাদ যোগ দেখে তিনি ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন—তাকে ঠিক স্থিত প্রাজ্ঞ বলে না। যে নীতিবোধ নিয়ে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ চালনা করেছেন আর তাঁর সমর্থনে গীতা রচনা করেছেন—তা একমাত্র গোয়েবলস্ পারত।

কল্যাণ বলে—থামলে চলবে না।

রমা হাসে শ্রীকৃষ্ণ যে যুদ্ধের সারথি—তাকে কিছুতেই ধর্মযুদ্ধ বলা চলে না। অন্তত কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে পান্ডব পক্ষের অন্যায়ের তুলনা হয় না। প্রত্যেকটি কুরু সেনাপতিকে অন্যায় যুদ্ধে হত্যা করা হয়েছে। ভীষ্মকে শিখন্ডীকে সামনে রেখে, দ্রোণকে মিথ্যা কথা বলে, কর্ণকে নিরস্ত্র অবস্থায়, জয়দ্রথকে ক্যামফ্লেজ করে—কাল্যকে পালাবার সময়—দুর্যাধনকে উরুভেঙে—এই পক্ষে অভিমন্যুও—যাদের সশস্ত্র অবস্থায় হত্যা করবার সামর্থ পান্ডব পক্ষের ছিল না—তাদেরই একজনের নাবালককে সপ্তরথী মিলে হত্যা করেছে এটা গোয়েবেল্সের রচনা—নিজেদের কলঙ্ক ঢাকবার সাধারণ কৌশল—তাছাড়া মহাভারত যখন রচনা হয়েছে—তখন পান্ডবেরা ক্ষমতায়—তাদের মুখ চেয়ে লিখতে হয়েছে। আমার মতে, গীতা হচ্ছে ক্ষমতালোভী ধুরন্ধর রাজনৈতিক নেতাদের ম্যানিফেস্টো। আর যদি পরে রচনা হয়ে থাকে গীতা—তবে হচ্ছে তা পসথুমাস ডিফেন্স। চতুর ডিফেন্স সন্দেহ নেই—তবে এই ব্যুহ ভেদ করা যায়। ভারতবর্ষ যুদ্ধেও নৈতিক নিয়ম মেনে চলত—সেই নৈতিক নিয়মকে কুরুক্ষেত্রে হত্যা করেছেন শ্রীকৃষ্ণ। কুরুক্ষেত্র

আর যাই হোক ধর্মক্ষেত্র নয়।

—বোঝা গেল তুমি বৈষ্ণব নও—গোপীদের আত্মীয় স্বজনও নও। আমার অসুবিধে হয়েছে এই গীতা আমার পড়া হয়নি—আমার ধারণা পঞ্চাশের 'পর রিটায়ারমেন্টের ঠিক আগে যখন এক্সটেনশনের জন্যে চেষ্টা শুরু করে—তখন গীতা পড়ে। আর মহাভারতও আমার ছেলেবেলায় পড়া। ছোটদের মহাভারত। আর মহাভারত সম্পর্কে ধারণা ছিল— ওটা বিধবাদের ব্যাপার। স্বামীর স্মৃতি ফুরিয়ে আসবার পর মহাভারতে মন দিতে হয়। মাছ, আমিষ ও স্বামীর সাবস্টিটিউট হিসেবে। মহাভারত হচ্ছে বিধবাদের ভিটামিনাইজড মেন্টাল ফুড।

—বিধবাদের ব্যাপার—অথচ যেই জন শোনে হয় পুণ্যবান।

—এখন ভাবছি, মহাভারতে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর একদিকে অষ্টাদশ অক্ষৌহিনী বিধবার সামনে পাঁচ স্বামী নিয়ে দ্রৌপদী কী গর্বে না লজ্জায় সিঁদুর পরতেন। চারদিকে বিধবার সমুদ্রের মধ্যে একা কৃষ্ণার পাঁচদিক সুরক্ষিত সধবার গর্বে গর্বিত ললাটে লাল টকটকে দ্বীপটির নির্জন সৌভাগ্য কত শত বিধবার দীর্ঘশ্বাসের কারণ হ'ত—কে জানে। দ্রৌপদীর সিঁথির সিঁদুরে জোর আছে। পাঁচ স্বামী তার রক্ষা করেছে। সধবা গেছে।

—তাতে পাঁচ স্বামীই কিন্তু বিপত্নীক হয়নি।

রমা হেসে মাথা নামাল। ইচ্ছে হচ্ছিল, একটু কল্যাণের চোখে চোখ রেখে ওর মন্তব্যের তাৎপর্যকে বুঝতে পেরেছে তা জানায়। লোভও হচ্ছিল কল্যাণের উজ্জ্বল স্নিগ্ধ চোখের দৃষ্টি একটু আস্বাদ করে। কিন্তু মাথা নিচু করে—মা সামনে। শুধু ভাববার চেষ্টা করল, এক সঙ্গে এত কথা জীবনে বলেছে কি না। মা ও কল্যাণ দু'জনেই আশ্চর্য হবে। স্বল্পবাক বলে ওর যে খ্যাতি—নিজের হাতে ভেঙে দেবার গ্লানি যে আসছে তা আগাম টের পায়। নিজেকে অন্যমনস্ক করে দেবার জন্যে কল্যাণের স্নিগ্ধ দৃষ্টতে মনকে বেঁধে রাখতে চায়। ইচ্ছে করে, কল্যাণ যেন না ওঠে এখুনি। মা'র অপ্রসন্ন মুখ রমার মনে যে ক্ষোভ ও প্রতিবাদ জাগিয়ে তুলেছিল—এতক্ষন যেন সেই বিদ্রোহকেই রমা প্রকাশ করেও নিঃশেষ করতে পারছিল না। বাবার প্রদর্শনীর কথা শোনামাত্রই মা'র মুখে সেই চিরপরিচিত বিরক্তি ও বিতৃষ্ণা দেখামাত্রই রমার মনে ভয় জাগেনি—মা কী বলতে কী বলবে। যদিও এই ভয়ই বরাবর ছিল। কিন্তু মুহূর্তে যেন রমার চিত্ত বিদ্রোহ করে উঠল। চিরকাল মাকে ভয় করে আসবার বিরুদ্ধে যেন এই বিদ্রোহ। যেন ওর কোন স্বাধীনতা নেই, ওর বয়েস হয়নি—বিদ্যেবুদ্ধি হয়নি—মা'র খুশি আর ইচ্ছেকে তোষামোদ করে নিজেকে বঞ্চিত করতেই জন্মেছে। তাই বিরক্তি দেখামাত্র এক ঝলকের ভয় একটা প্রবল বিদ্রোহের প্রতিক্রিয়ায় ওকে টেনে নিয়ে এল। বাবা, মা, কল্যাণ কাউকে ছেড়ে দিল না। শুধু তাই নয়, একদিকে যেমন বিদ্রোহের জোর ছিল—কিন্তু বিদ্রোহের আবেগ কমে আসতেও নিজেকে থামতে দিল না। মাকে কথা বলতে দিতে ওর ভরসা হল না। তাই নিজেকে আজ কথার স্রোতে ভাসিয়ে দিল। তারপর এতক্ষণ একটানা কথা যে বলতে পারে এই আবিষ্কারের আনন্দও ওর মনকে অভিভূত করল—যদিও জান্‌ল—ওর স্বল্প বাক্যের ইমেজ নষ্ট হল তবু এত কথা বলতে পারে এক সঙ্গে এ যেন ওর চরিত্রের আজ এক নতুন পরিচয় ওকে মুগ্ধ করেছিল। কল্যাণের চোখে-মুখে

সেই স্বীকৃতি ফুটে উঠল। মা'র দিকে তাকাতে সাহস হল না।

রমার বাবার ছবির কথা শুনে মুহূর্তে তেলেবেগুনে জ্বলে উঠলেন রমার মা। ও, এই লোকটি এসেই তাল দিতে শুরু করেছে—প্রদর্শনীর জন্যে পয়সা খরচ হয় এ কথা তিনি কোনদিনও ভোলেননি—বহু দিন ভেবেছেন ঐ পয়সা থাকলেও পরে.....। রমার 'পরও রাগটা গিয়ে পড়ে, কোথায় মা লুচি তরকারি করল উনুনের তাতে পুড়ি—আর লোকটা আসা মাত্র কিনা বাবার গল্প—আর্টিস্ট—আর্টিস্ট মিত্র। অমন ডাগর একটা ভাই মরে গেল—আর তিনি কিনা বাবার জন্যে প্রদর্শনী করবেন। বাবার জন্যে খেজুর, আপেল, মৌসাম্বীতে কুলাল না—এবার খুশি করবার জন্যে এক্সিবিশন। আর লোকটিই বা কেমন—তুই এ সংসারের কিছু জানিস না বুঝিস না—এসেই তাল দিচ্ছিস—একজন আর্টিস্ট নেগলেকটেড হবেন—তোর কী তাতে। এসেই মেয়েটাকে হুজুগে মাতাচ্ছিস—খ্যাপাচ্ছিস। ছাই পাশ এঁকেছে—তার জন্যে ভুগতে হল সারাজীবন—এখন একজিবিশন—মরণকালে বিয়ের পিঁড়ি। সেই এক্সিবিশনের পর থেকে—ভাবলেই গা কাঁটা দেয়—কী দিন শুরু হল—ড্রইং টিচার..... অনাহার ..... দুটো নাবালক বাচ্চা ..... আর কী মেজাজ.....আমাকে অলক্ষ্মী....। রমার মা'র মনে নিজের আত্মহত্যা করবার দৃশ্যটি যেন ফুটে ওঠে—স্বামীর সেই কান্না। একসজিবিশন.... একসজিবিশন.....রাগের মধ্যেই কেমন একটা তন্ময়তা আসে রমার মা'র। ওর বাবার সেই হুহু করে কান্নার দৃশ্য মনকে কেমন ভিজিয়ে দেয়—রাগের কাঠামোটা জোর করে অর্ধচেতন ভাবে ধরে রাখলেও মন কেমন উধাও হয়ে যায়—সেই এক্সিজিবিশনের দিনগুলোতে। সেই বিয়ের প্রথম দিনকার দিনগুলো—আশা, উন্মাদনা, উত্তেজনা আর অফুরন্ত আনন্দ—কোথা থেকে এত আনন্দ আসত কে জানে? সেই পাতলা ছিপছিপে প্রদ্যোত মিত্র—সেই সরল কিশোরী চোখের সামনে যেন নিজের সেই বহুদিনের ভুলে যাওয়া চেহারা আর স্বামীর সেই তাঁর দিকে তন্ময় আত্মহারা হয়ে তাকিয়ে থাকা। চুমোতে চুমোতে অস্থির করে দেওয়া।—তারপর শুরু হল নিজের দেওয়া নাম—ভেনাস, ভেনাসিনি, কমলা, কমলিনী, কমু,—কম কথা বলত বলে ঠাট্টা করে ডাকত মুনি—সেই সব এক্সিবিশনের সময়কার দিনগুলো—কত আশা, যশ, নাম। একটা উজ্জ্বল আবেগে মনটা কেন যেন রমার বাবার জন্যে উতলা হয়ে ওঠে—বিকেলে চা দেবার পর একবারও যাননি—এখন পর্যন্ত। তবু, সেই উতলা মুহূর্তে এখনকার মানুষটির চেয়ে অতীতের মানুষটির কাছে চলে যায়। সেই এক্সিবিশনের সময়কার দিনগুলো। ভেতরে ভেতরে কেমন যেন একটা গোপন টলমলে আশা উঁকি দেয়—আবার কী সেদিন..... ভাবতে ভরসা হয় না বলে তিনি রমার কথা শোনায় মন দেন—বুঝতে পারেন রমা মানুষের মহত্ত্ব বলে কিছু নেই—তাই বলতে চাচ্ছে। নিজের আগের দিনের ভরসাকে আসন না দেবার জন্যে যেন নিজের ইচ্ছের বিরুদ্ধেই বলেন—কারণ কথা বলতে ইচ্ছে হচ্ছিল না। তবু যেন এ কথা শুনে রাগ করা উচিত—রাগ করা কর্তব্য মনে করেই যন্ত্রের মত রাগ করতে চেষ্টা করেন—কৃত্রিম ভাবে মনে মনে বলেন—ওরে মেয়ে, তোদের খেতে দিয়ে নিজে জল খেয়ে কাটিয়েছি কতদিন। তবু নিষ্প্রাণভাবে প্রতিবাদ করেন। প্রতিবাদ করতে গিয়েই অবনকে মনে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে অবনকে মনে পড়ায়—

মন এমন স্মৃতিকে নষ্ট করে দিল—সে জন্যে কেমন ক্ষোভ হল। অবনকে মনে পড়বার সঙ্গে সঙ্গে তিনি বুঝতে পারলেন—অবন মরে যাওয়ায় এদের এক্সিবিশন করবার অধিকার নেই, ওর বাবার নাম যশ তা হবে অবনকে ভুলে যাওয়া ও ওর স্মৃতিকে প্রতারণা করা—আর অবনকে ভুলে কোন আনন্দ তাঁর করতে নেই। এমনকী অবন মরে যাওয়ায় পুরনো স্মৃতি থেকে আনন্দ ও তন্ময় হবার অধিকারও তাঁর নেই। এ কথা মনে পড়ায়, অবনকে ভুলে থাকবার জন্যে আজ কিন্তু মনে অপরাধবোধ, গ্লানি বা লজ্জা এলনা। পুরানো স্মৃতির আমেজ অবনের জন্যে নষ্ট হয়ে গেল বলে অবনের 'পর রাগ করতেও প্রকাশ্যে পারবেন না। তবু, অবনকে মনে পড়ায়, একটা বিরক্তি যেন জোর করে মনে ঢুকে পড়ল। তবু মন যেন সেই স্মৃতির আমেজ ছাড়তে চায় না। অবনকে ভুলতে চায় না কিন্তু সেই পুরানো দিনের হারানো কথার মধ্যে যে এত প্রাণ ছিল মন তা যেন ছাড়তে চায় না। তবু, অবনকে মনে পড়বার জন্যে একটা রাগ ও বিরক্তি মনকে আচ্ছন্ন করতে চাচ্ছিল। রাগ আর বিরক্তি যেন সারাদিনই আছে। মনের স্বাদ যে একটা সজল তৃপ্তি পেয়েছিল—অবনকে মনে পড়ায় তা ছেড়ে দিতে হল বলে তিনি রাগ ও বিরক্তিকে কার 'পর ফেলবেন—কাকে আশ্রয় করবেন ঠিক বুঝে উঠতে পারেন না। হঠাৎ কল্যাণের চাহনির মধ্যে এমন একটা কিছু দেখতে পেলেন—যা তাঁর ভাল লাগল না—মুহূর্তের মধ্যে কল্যাণের 'পর বিরক্তিতে মন ভরে গেল—রাগ ও বিরক্তি আশ্রয় পেল। ওঃ, নিজে বেথা করে এখন মেয়েটাকে নাচাচ্ছে—নাচাবার মতলব ভাঁজছ—তাই এক্সিবিশনের লোভ। তিনি রমার দিকে তাকান—এত কথা রমা বলতে পারে। কই, বাড়িতেও মুখ গোমড়া—আজ হাসিও বের হয়েছে। মুহূর্তে রমার মা'র মনে হয়—ওরা দু'জনেই যেন ওর বাবার দলে—তাকে নিয়েই ভাবছে—তার নাম, খ্যাতি, যশ—এ নিয়েই ওদের আলোচনা। আর তিনি হচ্ছেন লুচি-তরকারির সেবাদাসী। তবু, ভেতরে ভেতরে রমা এই লোকটার 'পর আকৃষ্ট হয়েছে বা হতে পারে ভেবে—কেমন একটা স্বস্তিও পান—তা হলে বাবার 'পর থেকে মনোযোগ এ লোকটির দিকে যায়। আনমনাভাবে এ কথা চিন্তা করে তিনি যেন ছোট একটা নিস্কৃতিও পান। বিয়ে করা বউ আছে—গড়গড় করে হয়ত ইংরেজি বলে, ওকে বিয়ে করবার উপায় নেই অথচ একটু নির্দোষ আকর্ষণ থাকল রমার—অনন্ত বাবার 'পর মনোযোগে কমবে—এ কথা নিজের প্রায় অগোচরে ভেবে মনে যেন একটা সূক্ষ্ম প্রায় অদৃশ্য শান্তি আসে। হঠাৎ দেখে, রমা শ্রীকৃষ্ণের নিন্দে করছে—হ'ল কী মেয়েটার—দুটো পয়সার মুখ দেখে—ওরে তোর পাতে যে এখনও নারান পূজোর সন্দেশ। আজ নারান পূজো গেল—পূর্ণিমা তিনটের সময় আর এরই মধ্যে তুই কৃষ্ণের নিন্দে করছিস, গীতার নিন্দে করছিস সংস্কৃতের মত বাংলা বলে—কৃষ্ণ কী কঠিন বাংলা বোঝে না ভেবেছিস—ইংরেজি জানে না? তবু, ভেতরে ভেতরে মেয়ের সাবলীল বলবার ভঙ্গি, পাণ্ডিত্য ও কল্যাণের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা অর্থাৎ ওর মেয়ে কল্যাণকে—একজন অফিসারকে হারিয়ে দিচ্ছে—এ কথা বোধ করে ভেতরে ভেতরে গর্ববোধ না করেও পারেন না। এমন মেয়েকে যদি বাবা-মাকে দেখাতে পারতাম.... সঙ্গে সঙ্গে অবনকে মনে পড়তেই.....আবার অবনকে মনে পড়বার ভয়ে তাড়াতাড়ি রমার উদ্দেশে

মনে মনে বলে ওরে নেমকহারাম যেই ঠাকুর-দেবতার দয়ায় দুটো পয়সা আনছিস—তার নিন্দে করছিস—বাপের মতোই অকৃতজ্ঞ হয়েছিস—কপালে দুঃখ আছে বাপের মতোই। অবনকে মনে পড়বার ভয়ে, রমার বাবার আবার টান উঠবার সময়কার আতঙ্ককে মনে আঁকড়ে ধরেন। সঙ্গে সঙ্গে ভয়ও হয়, আজ এতক্ষণ টুঁ শব্দটি করেনি—রাত হলেই আবার না জ্বালায়। রমার কৃষ্ণ নিন্দে করবার জন্যে কোন একদিন পাঁচসিকের সিন্নি নারান পুজোর দিন পাসের বাড়িতে পাঠিয়ে দেবেন বলে নারায়নকে অশ্বাস দেন। বগলকাটা ব্লাউজ আর ঠোঁটে লিপস্টিক মাখবার জন্যেই যে রমার ভক্তি শ্রদ্ধা কমে গেছে—নইলে পরীক্ষার সময় বাবা-মা ঠাকুর-দেবতাকে প্রণাম করেই যেত—নারায়নকে তাও জানান। তারপর দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলেন—যেমন বাপ, তেমনি মেয়ে—কাজের বেলা কাজী, কাজ ফুরোলে পাজী।

কল্যাণের মনে হল রমার মা কেমন যেন বিষণ্ণ ও আনমনা হয়ে পড়েছেন। স্বামীর কীর্তি ও যশ আসন্ন—আর তা কল্যাণের জন্যেই সম্ভব হচ্ছে—এ কথা কী বিশ্বাস করতে ভরসা হচ্ছে না? হয়ত অনেকে এমন ভরসা দিয়েছে—দিয়ে কেটে পড়েছে। তাই এ রকম প্রস্তাবকে হয়ত লুচি—তরকারির জন্যে কৃতজ্ঞতা মাত্র মনে করেছেন—তাও মৌখিকই। গুড়, আমি যে আর লুচি—তরকারি খাচ্ছিনে—তা নিয়ে তো পীড়াপীড়ি করছে না—এই ফাঁকে জল খেয়ে চা খেয়ে এই খাবার পর্বের গন্ধমাদন শেষ করা যাক। তবু পীড়াপীড়ি শোনবার জন্যে—ওর দিকে কল্যাণের মনোযোগ দেবার 'পর একটা গভীর প্রত্যাশা কল্যাণের অন্তরে অন্তরে রয়েছে—অসচ্ছন্দ ও আবছাভাবে তা ওর ভেতরে পীড়া দেয়। একটা অবহেলার সূক্ষ্ম অপমান নিজের ভেতরে প্রবেশ করে। ও যে আর খাচ্ছে না—এ রকম অবস্থায় পীড়াপীড়ি না শোনবার মধ্যে যে ঔদাসীন্য ও অবহেলার একটা ক্ষোভ ও বেদনা রয়েছে—অপমানের সঙ্গে মিশে—জীবনে কল্যাণ এই প্রথম তা বোধ করে। সঙ্গে সঙ্গে কেন যেন মনে হয় স্বামীর নাম করে দেবে বলে যদি কেউ ঠকিয়েও থাকে—তবে রমা এতে এত উৎসাহিত আর ওর মা'র এত নিরুৎসাহ হল কেন? রমা ওকে চেনে বলে? মা চেনেন না বলে? হঠাৎ কেমন বিরসভাবে মনে হয়, হয়তো নাম করে দেবে যে বলেছে রমা তারই সঙ্গে ওর মতো ব্যবহার করেছে—তাকেই অন্তরঙ্গ হিসেবে....। সঙ্গে সঙ্গে কল্যাণের অন্তরে ক'টি ছবি ভেসে যায়—দুপুরে রমার গম্ভীর মুখ—ওকে আমন না দেবার চেষ্টা—ডালহৌসি ও এসপ্ল্যানেডে অপমান—এখানে মা'র সামনে লম্বা বক্তৃতা। একটা প্রবল অসাচ্ছন্দেও কল্যাণ প্রায় একই নিঃশ্বাসে ভাবে, অনেক আগে চলে যাওয়া উচিত ছিল—সঙ্গে সঙ্গে ভাবল—অনেকে যদি ঠকিয়েও থাকে—তবে রমাই বা ওকে এত বিশ্বাস করতে গেল কেন? পেসিমিস্ট হয়েও......ও তো মুখের বচন। পরচিত্ত অন্ধকার। হয়ত বিশ্বাস যে করে না তা বুঝতে দিতে চায় না—হয়তো ভাবে, দেখা যাক না কাজ কিছু হয় কি না? হয়তো ওকে বিশ্বাসটিও মৌখিক? শুধু হয়তো পরীক্ষা করে দেখতে চায় ওর ক্ষমতা আর সততা....। রমার যে ওর'পর স্বাভাবিক বিতৃষ্ণা এতকাল ধরে নিজের অগোচরে বোধ করে এসেছে—নিজেকে যে গম্ভীর ভেতরে আটকে রাখবার চেষ্টা দেখেছে—তা কী অনেক অভিজ্ঞতার ফল? রমার দিকে তাকাতে ভরসা হয় না—পাছে ওর দুঃসহ

অনুমানের কোনো সমর্থন পাওয়া যায়। কল্যাণ জলের গ্লাসে চুমুক দিয়ে বেশ ঠক করে গ্লাসটি রাখে—চা টি বেশ সজোরে তুলে নেয়।

রমার মা আতঙ্কিত হয়ে ওঠেন—ও, কী, কিছু খেলে না যে।

এতগুলো লুচি তরকারি নষ্ট হবার ক্ষোভে মুহূর্তে সব কিছু ভুলে যান। বরাবর জানেন বড় লোকের ছেলেরা কোথাও গিয়ে বেশি খায় না—খিদে থাকলেও। এতে ওদের বনেদীয়ানা নষ্ট হয়—হ্যাংলামো প্রকাশ পায়। তাছাড়া বাড়ি গিয়ে ভাত তো খেতে হবে। অথচ সারাদিন খায়নি খায়নি বলে রমা এমন একটা আতঙ্ক ধরিয়ে দিল—একগাদা ময়দা মেখে ফেললেন। এখন এই পাতের জিনিস—অবশ্য ব্রাহ্মণেরই, কে খাবে? এতগুলো পাতের লুচি তরকারি ফেলে দিতে কারো প্রাণে সয়—অথচ কোনো কাজে লাগবে না। রমা তাল দিয়ে এতগুলো লুচি তরকারি করিয়ে নিল। রমার 'পর মনে মনে রাগে শরীর জ্বলে যায়। তবু নিজের অজান্তেই রমার দিকে এমনভাবে তাকান যার অর্থ হল—তুই খেতে বল—তোর কথায় এতগুলো লুচি.....।

রমার মনে তখনও একটা বিক্ষোভ ও বিদ্রোহের আমেজ। আমেজটা যেতে দিতে ইচ্ছে করছে না—অথচ এতক্ষণ কথা বলবার একটা শ্রান্তি ও অবসাদ যেন মনে ঢুকতে চাচ্ছে। কল্যাণের খাওয়া শেষ হতেই ওর মনে হল—মাকে লুচি বানাতে না বলে যদি নিজে গিয়ে মিষ্টি নিয়ে আসতাম—ঐ অত লুচির পাশে একটা সন্দেশ—কেন যে মাকে পাঠাতে পারলাম না। কল্যাণের একটুখানি খাওয়া দেখে রমা মা ও কল্যাণ দু'জনের পরই চটে যায়। লজ্জা ও অপমান এক সঙ্গে বোধ করে সেই সঙ্গে অনুতাপও। মা'র কৃপণতার জন্যে এই লুচি আর ঘন্ট ওকে দিতে হল—দু'টাকার মিষ্টি অনায়াসে নিয়ে আসতে পারত। তা অনেক ডিগনিফাইড হ'ত। কিন্তু অত মিষ্টি আনলে মা চটে যেত—এখন মনে হচ্ছে সেই ভয়েই যায়নি। মা'র ভয়ে যায়নি—এ কথা ভেবে মা'র 'পর মন রাগে ভরে গেল। আবার কল্যাণের অল্প খাওয়াটি এত অশোভন হয়েছে—যা প্রায় অভদ্রতার শামিল। অফিসার, বড়লোকের ছেলে—চপ কাটলেট ছাড়া কিছু মুখে রোচে না। লুচির 'পর অবজ্ঞা যেন ও'দের দরিদ্র অবস্থার 'পর কটাক্ষ। একটা অপমান বোধও করে। আবার সঙ্গে সঙ্গে এও মনে হয়। লোকটা এত চপকাটলেট খাইয়েছে—তার বদলে ওকে দুটো টাকার মিষ্টি এনে দিতে পারলেম না। অনুতাপ প্রায় নিজের 'পর রাগে গিয়ে দাঁড়ায়। মা'র 'পর কল্যাণের আর নিজের 'পর রাগে রমা যেন ভেতরে ভেতরে গুমরাতে থাকে। মনে মনে কল্যাণকে একদিন ভাত খাবার নেমতন্ন করবে বলে যে ঠিক করেছিল—রাগে তা বাতিল করে—হয়তো মা রাজ্যের বাজে তরকারি আর এক টুকরো মাছ দেবে—অপমানের একশেষ হবে। আর কল্যানের 'পরও রাগ হয়—হয়ত রমা নিজে বাজার করে আনলেও, ওদের রান্না পছন্দ হবে না—একটু খেয়ে উঠে যাবে। দরকার নেই—এরপর না হয় দিন কয় রেস্টুরেন্টের বিল আমি জোর করে দিয়ে দেব। মা'র অপ্রসন্ন মুখের দিকে তাকিয়ে যেন আরো জ্বলে যায় : এ সংসারে ওর কোন স্বাধীনতা নেই—স্বাধীনতা ছিল দাদার। দাদার সব অন্যায় আবদার মা সহ্য করেছে—আর বাবা মা'র অন্যায় অত্যাচার রমা চিরকাল সহ্য করে এসেছে, মেনে এসেছে। দেখতে ভালো নয়—শাঁকচুন্নি—তায় মেয়ে। ওর কাজ শুধু রোজগার করা,

দাসত্ব করা—চির অসন্তুষ্ট বাবা মাকে সন্তুষ্ট করবার জন্যে গোলামি করা। ও হচ্ছে রোজগারি বাঁদী। কল্যাণের জন্যে দুটো টাকার মিষ্টি আনলে মা চটে যেতেন। নিজের টাকা খরচ করবার স্বাধীনতা নেই—অন্তত জানিয়ে করবার অধিকার নেই। মা'র মুখে অপ্রসন্নতা, চোখে কল্যাণকে আরো খাবার জন্যে অনুরোধ বুঝতে পেরেও—রমা মা'র দিকে তাকায় না আর। মা'র দৃষ্টিকে প্রত্যাখ্যান করে যেন রমা নিজের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ঘোষণা করতে চায়—স্বাধীনতা ঘোষণা করে।

মা'র ভেতরটা জ্বলতে থাকে—একে তো ময়দা রেশনে কখনও ও দেয়—সেই ময়দাগুলো—এতটা ডালডা। লুচি তো দিয়েছিলেন আটখানা—সারাদিন খাওয়া হয়নি শুনে—নইলে চারখানার বেশি কিছুতেই দিতেন না—মাত্র দু'খানা খেল। মিষ্টিটা অবশ্য খেয়েছে। মনে পড়ল, এরপর রমা আবার মিষ্টি কিনে আনতে বলেছিল—ভাগ্যিস তিনি যাননি—নইলে অতগুলো পয়সাও নষ্ট হ'ত। কিন্তু মিষ্টি কিনে পয়সা বাঁচিয়েছেন—এ কথা চিন্তা করেও সামনের লুচিগুলোর শোক কিছুতেই ভুলতে পারেন না। এ গুলো কিনা ভিখিরিকে ধরে দিতে হবে—ভাবতেই চোখে জল আসে। আর অবনটা একটা লুচি দেখলে..... অবনের কথা এরা কেউ আলোচনা করছে না—এ কথা মনে পড়ল। রমা অমন ভাইটার কথা বেশি করে বললও না—এতে রমার ভাইকে ভুলে যাবার নির্দয়তা ও নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকবার স্বার্থপরতার কথা মনে এলেও—সামনের লুচিগুলোকে ভিখিরিকে দিয়ে দিতে হবে—এ থেকে কিছুতেই মন সরাতে পারলেন না। একটা অপূরণীয় ক্ষতির জ্বালায় তিনি জ্বলতে থাকেন।

রমা ঈর্ষৎ ব্যঙ্গ স্বরে মা-কে জানায়—অফিসারদের ও বড় মানুষদের অপরের বাড়িতে বেশি কিছু খেতে নেই। কেবল রেস্টুরেন্টের বেয়ারা ছাড়া কেউ তাদের খিদে মেটাতে পারে না। লম্বা বিল পেমেন্ট্ করবার সম্ভাবনা না থাকলে তাদের খিদে পায় না।

কল্যাণ এবার রমার মা'র দিকে তাকিয়ে বলে—বেশ ভালো খেলাম—বেশি হয়তো খেলাম না কারণ বেশি আমি খাইনে। তাছাড়া সবটা না খেলে ভালো খাওয়া হল না—এ হচ্ছে এক ধরনের কুসংস্কার। রেস্টুরেন্টে খাই—খেতে বাধ্য হই—তাই বলে রেস্টুরেন্টে ভালো খাই—এ কথা ঠিক নয়।

রমার মা নিষ্প্রাণভাবে বলতে গিয়ে গলা দিয়ে ঝাঁজ বের হয়। রমার উদ্দেশ্যেই বলেন—বাড়ি গিয়ে ভাত খেতে হবে তো। সেখানে বউমা রান্না করে বসে থাকবেন না? সেগুলো নষ্ট হবে না? ওর তো আর দুটো পেট নেই?

তিনি সব প্লেট, কাপ ডিশ জলের গ্লাস কৌশলে একসঙ্গে জড়ো করে বের হয়ে যান। অসন্তুষ্ট ভাবটি খুব অস্পষ্ট থাকে না।

রমা গুম হয়ে যায়। মা'র রাগ রাগ ভাবটি কল্যাণের সামনেই প্রকাশ্য হওয়ায় একদিকে অপমানবোধ করে, নিজের বাড়িতে যে কোন মর্যাদা নেই সেই ভাবটিও ওর সামনেই প্রকাশ পেল দেখে সমস্ত সত্তা যেন বিদ্রোহ করে উঠল—রোজগারি বাঁদী—মা'র রাগ দেখে ওরও রাগ বেড়ে যায়—ওর ধারণা—বাবার ছবির প্রদর্শনীর কথাতেই মা'র এই রাগ। তাছাড়া কল্যাণের সামনেই মা'র রাগ প্রকাশ হয়ে পড়ায়—লজ্জা ও

সংকোচে ছোট হয়ে যায়—নিজের দারিদ্রের সঙ্গে কালচারের দারিদ্রও যেন মিলে মিশে এক হয়ে গেছে—এ কথাও রমার চেতনায় এসে ওকে ক্ষুব্ধ করে। কী ভাবল লোকটা! তাছাড়া বাবার ছবির ব্যাপারে মা একটি কথাও বলেনি—মা'র এই নীরবতা যেন কল্যাণকে অপমান করা আর রমাকে ছোট করা। তাছাড়া কল্যাণের স্ত্রীর উল্লেখের সঙ্গে সঙ্গে ওর এতক্ষণের সমস্ত সুরের রেশ যেন কেটে যায়। মন বিগড়ে যায়—যেন মা'র কথার মধ্যে রয়েছে—তুমি যতই তোয়াজ কর—ঘরে বউ রয়েছে—মন সেখানে। রমার কান দুটো ঝাঁ ঝাঁ করতে থাকে। মা, বাবা, কল্যাণ ও নিজের 'পর—নিজের আজকের ব্যবহারের জন্যে কেমন একটা অফুরন্ত রাগে সব কিছু ধ্বংস করে দিতে ইচ্ছে হয়। কল্যানকে চুমো খেয়েছি—বুকে হাত নিয়েছি—বেশ করেছি—আমার কপালে এর চেয়ে বেশি জুটবে না—সেকেন্ড হ্যান্ড প্রেমিক—মাকে উদ্দেশ করে বলে—তোমরা তো ফার্স্ট হ্যান্ড প্রেমিক—চমৎকার জীবন কাটালে। সঙ্গে সঙ্গে মনে হয়—মা যদি বাবার সঙ্গে পালিয়ে না যেত—তবে বাবার শিল্পী জীবন এ ভাবে নষ্ট হ'ত না—এখন বিরুদ্ধে—বাবার সব সর্বনাশ করে—এখন আমাকে বাবাকে জ্বালাচ্ছে। রমার ইচ্ছে হয়, সব কিছু ছেড়ে দূরে চলে যায়—যেখানে মা, বাবা, কল্যাণ কেউ নেই। সঙ্গে সঙ্গে ভাবল, আজ যদি কিছু মা বলে—ছেড়ে দেব না। কিছু না বলে বলে—এদের যা তা করবার অধিকার দেওয়া হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে একটা ক্ষীণ ধারায় গর্ববোধ করে, কল্যাণের স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও, আমার খুশি মত কল্যাণ বাড়ি যায়—বাড়ি থেকে আসে। হঠাৎ অফিসের সেই স্টেনো মেয়ে দুটোর উদ্দেশে বলে, কই তোমাদের কাছেও তো কল্যাণ ঘেঁসেও না। ইচ্ছে হ'ল—আজ রাত দশটা পর্যন্ত কল্যাণকে বসিয়ে রেখে মা'র 'পর প্রতিশোধ নেয়। মাকে গ্রাহ্য করে না এ কথা জানান দরকার হয়ে পড়েছে। মা চলে যেতেই কল্যাণ রমার মুখের দিকে তাকায়। মুখ থমথমে। কল্যাণের বুঝতে অসুবিধে হয়নি—এত কম খাওয়াতে মা মেয়ে কেউ সন্তুষ্ট হয়নি। স্ত্রীর উল্লেখে লজ্জা পেয়েছে। তবু ওর অদ্ভুত লাগল—এরা খাবার জন্যে পীড়াপীড়ি করল না—অথচ অল্প খাবার জন্যে রাগ করল। নিজের দায়িত্ব পালন করল না অথচ যে দায়িত্ব পালন করল না তার 'পর আমার কাজ অনেকটা নির্ভর করছিল—তা এরা বুঝতে রাজি হয় না। শ্বশুরবাড়িতে কত সাধাসাধি করে। খেতে বলল না অথচ খেল না বলে রাগ করল। কখন যে এদের টেম্পারেচার ওঠে আর কখন রেমিসন হয়—কোন দেবতা বা দেবীই তা বলতে পারে না। এরা দেখছি বড্ড আনপ্রেডিক্টেবল। মা'র এভাবে চলে যাওয়া—রমার থমথমে মুখ—মা'র গলার স্বরে যে ঝাঁঝ ছিল—তাতে কল্যাণের বেশ অপমান বোধ হয়েছিল—কিন্তু কল্যাণ সেই সূক্ষ্ম অপমানকে আমল দিচ্ছিল না। কিন্তু রমার থমথমে মুখকে অগ্রাহ্য করতে পারে না। তবু, সামনে সেই দুর্ধর্ষ লুচি-বেগুনের থালা না থাকবার একটা স্বস্তিও লাভ করছিল। সেই স্বস্তিকে আনন্দে প্রকাশ করবার একটা ইচ্ছাও জাগছিল। আবার রমার মা চলে যাবার ফলে ঘর ফাঁকা হয়ে গেল—একটা সূক্ষ্ম শূন্যতাও বোধ করছিল। আর রমার থমথমে মুখের সামনে একা বসে থাকবার চেয়ে বরং ওর মা আর একটু বসলেই পারতেন। আবার সঙ্গে সঙ্গে ওর মা'র চোখে থেকে ওর দেহ-মনের যে প্রশংসা প্রত্যাশা করছিল—তা না পেয়ে কেমন নিজের

অজান্তেই ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চনার একটা ক্ষোভও প্রকাশ করে। তবু, সব ছাপিয়ে স্ত্রীর উল্লেখ আর রমার থমথমে মুখের মধ্যে কার্যকারণ সম্বন্ধ বের করে ভীত হয়ে ওঠে। কেমন দুর্বল ভাবে কল্যাণ চিন্তা করে, রীনাকে অস্বীকার করতে পারিনে। এতো রমাকে মেনে নিতেই হবে। সম্পূর্ণ অন্যমনস্ক হয়ে একবার নিজের অজান্তেই যেন আবার ভাবে—রীনা কী রমাকে মেনে নেবে? ভাবনাটি আত্মপ্রকাশ করা মাত্র চমকে যেন জেগে ওঠে কল্যাণ। নিজেকে বলে, কেউ কাউকে মানবে না—মানতে পারে না—সমাজ বিরুদ্ধ বলেই নয়—এ প্রকৃতি বিরুদ্ধ। কিন্তু আমি দু'জনকেই মেনে নিয়েছি। তীব্র জ্বালা আর দুঃসহ আকর্ষণে। আমার উপায় নেই। রীনা বা রমা যদি অপর কারো 'পর আকৃষ্ট হয়—আমিই কী তা মানতে পারতাম! ভাবতেই শরীর কেমন করে ওঠে—রীনা অপর লোকের ঠোটে—কিম্বা রমা অপর কারো হাত নিজের বুকে.....। মুহূর্তে সমস্ত কিছু বিরস হয়ে যায় কল্যাণের কাছে। রীনার অবশ্য অতীত জীবন জানি—ও নিষ্পাপ। অবশ্য এ কথা চিন্তার মধ্যে রীনা সম্পর্কে কল্যাণের আশ্বাসের মধ্যে দৃঢ়তা ছিল না। চিন্তা যেন অন্তরের বদ্ধমূল বিশ্বাস থেকে উঠে আসেনি। চিন্তাটি একটা ভাসমান উপরকার মুহূর্ত মাত্র। আসলে রীনাকে নিয়ে কল্যাণের উদ্বেগ নেই, দুশ্চিন্তা নেই। কিন্তু রমা সম্পর্কে ঠিক এতটা নিশ্চিন্ত হতে পারছে না—একটা সংশয়ের জ্বালা যেন অতি সহজে মনে ঢুকে যায়। এ সংশয়ও জ্বালার হাত থেকে অব্যাহতি পাবার জন্যে যেন কল্যাণ অনিচ্ছা সত্ত্বেও রমার দিকে তাকায়। কল্যাণের অলক্ষ্যেই ওর চোখে মিনতি ফুটে ওঠে। রমা যেন ওকে উদ্ধার করে। রমার জীবনে আসবার আগেও রমা ওরই ছিল—রমা যেন এ কথা বিশ্বাস করতে সাহায্য করে ওকে। লুচি না খাবার জন্যে মা'র হাতে অপমান, স্ত্রীর উল্লেখে লজ্জা, নিজের চেহারার সংপ্রশংস দৃষ্টি থেকে বঞ্চিত হবার বেদনা, রমার থমথমে মুখ—সব দুশ্চিন্তাগুলোর মধ্যে তাড়াতাড়ি কল্যাণ এক একবার করে আশ্রয় চাইল—কিন্তু কোন দুঃশ্চিন্তাই ওকে আকৃষ্ট করতে পারল না—কাউকে ফাঁপিয়ে ফুলিয়েও মনে ক্ষোভের সঞ্চার করে তাতে মন স্থির করতে পারল না। কোন দুশ্চিন্তা, ক্ষোভ, ক্রোধ, অপমান, বঞ্চনা ওকে আজ আশ্রয় দিল না। রমার জীবনে কল্যাণই প্রথম পুরুষ—এই সত্য কথাটির জন্যে কল্যাণ লালায়িত হয়ে ওঠে।

কল্যাণ এবার মুখ খুলল—আমার কম-খাওয়া বড্ড অশোভন হয়েছে। এযে এত অশোভন হবে আমি আগে ভাবিনি।

রমা সোজা চোখ তুলে কল্যানের দিকে তাকায়—তুমি লুচি পছন্দ করোনা। যা পেরেছ, খেয়েছ। এতে কে কী মনে করল না করল—তার 'পর তোমার হাত নেই। জানো কল্যাণ, আমরা সব সময় অপরের মন যুগিয়ে চলতে চেয়ে কেবল নিজেকে বঞ্চনাই করেছি। অপরেও সন্তুষ্ট হয়নি—কেবল নিজেরা ঠকেছি। কল্যাণ শব্দটি কল্যাণের মনে শুধু তাপ যে জুড়িয়ে দিল তা নয়—ওর ইচ্ছে হচ্ছিল রমা যেন না থামে। যদিও রমার কথার মধ্যে যে স্নিগ্ধ আশ্বাস রয়েছে—চোখ দুটো যেন তাতে সায় দিচ্ছিল না। তবু, রমার এই শুকনো-কঠিন তীক্ষ্ণতার মধ্যে যেন ওকে চেনা যায়, যেন পরিচিত মনে হয়—আর পরিচয়ের মধ্যে একটা আপন ভাবও আসে।

আবার আস্তে আস্তে যেন কিছুটা তন্ময় হয়ে রমা বলতে থাকে—বেশ কিছু মানুষ

আছে—অপরের মন নিয়ে মাথা ঘামায় না—দুনিয়াটার কাজ তাদের মন জুগিয়ে চলা। অথচ দুনিয়াটি কিন্তু তাদের মন যুগিয়ে চলেও। উৎকট, বেখাপ্পা যাতে না হয়ে ওঠে তাই পৃথিবীর মানুষ এদের তাল দিয়ে চলে—সহ্য করে, মেনে নেয়। উৎকট, দৃশ্যসৃষ্টি করা, বেখাপ্পা হওয়া—এ হচ্ছে যেন এদের হাতের অস্ত্র—এ দিয়ে এরা পৃথিবীকে বশে রাখে। এরা স্নেহকে কর্তব্য মনে করে, কর্তব্য করাকে মনে করে এদের দাসত্ব করা, ভালবাসা এদের কাছে আনুগত্য ছাড়া কিছু নয়—আঘাত দিলে যে কেউ আঘাত পেতে পারে—সেই বেদনাকে এরা বে-আইনি ভাবে। অপরের চোখের জল ফেলে এরা অনুতপ্ত হয় না—জিতে যাবার আনন্দ বোধ করে। ঝগড়ার সময় তুমি যদি নীরব থাকো—তাহলে সে কোনও দিনও নীরব হবে না। তুমি তাকে থামবার জন্যে যদি সরব হও—তখন তার গলা সপ্তমে। আমার কেমন মনে হয়, বিয়ের ভালবাসা—এ গুলো বড্ড কৃত্রিম—তারপর এই কৃত্রিমতাই অভ্যাস হয়ে যায়—অভ্যাসই দ্বিতীয় স্বভাব। আসলে আমি ভালবাসব—এই খিদে কতটা চোখের খিদে—কতটা মনের খিদে—কতটা ভালবাসা প্রথার জন্যে আকাঙ্ক্ষা—কতটা আত্মসম্মানের জন্যে প্রয়োজন—কতটা অন্তরের তাগিদ বলা শক্ত। বিয়ে যেমন প্রথা—আমার সন্দেহ হয়—ভালবাসাও তেমনি একটা প্রথা, ফ্যাশন—হয়তো প্রকৃতির কাছে এর কারিগরি বৃত্তির প্রয়োজন আছে—কিন্তু তা তো ফিজিক্যাল যাকে আমরা ভালবাসি বলি তার সত্যিকারের মূল্য নেই—শুধু স্ট্যাটাস ভ্যালু আছে। বাড়ি, গাড়ী, ফোন, ফ্রিজের মতো—সুন্দরী বা সুন্দর প্রনয়ী আছে। বিয়ে বলো, ভালবাসা বলো—দুটোই হয়তো অন্তরের চেয়ে মর্যাদা বৃদ্ধির জন্যেই প্রয়োজন।

ভালবাসা কৃত্রিম—এ কথা চিন্তা করে কল্যাণ এক ধরনের আনন্দ বোধ করে। তা হলে নিশ্চয়ই রমা এখনও বা এর আগে কাউকে ভালবাসেনি। একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে। সেই স্বস্তি পাবার আনন্দে মনে মনে রমাকে বলে, ভালবাসা যদি নিতান্তই স্ট্যাটাস ভ্যালু হয়—অর্থাৎ মর্যাদা বৃদ্ধির জন্যে হয়ে থাকে—তবে রীনাকে ছেড়ে তোমার কাছে নিত্য ঘুরপাক খাচ্ছি—এতে আমার কী এমন আত্মসম্মান বাড়ছে। রূপে, গুনে, পরিবারের মর্যাদায় রীনার সঙ্গে রমার তুলনাই হয় না। রমার জন্যে রীনাকে অবহেলা করলে সমাজে ওর কী মুখ থাকছে? বরং এই যন্ত্রণার হাত থেকে ওর নিষ্কৃতি নেই—নিস্কৃতি পাবার ইচ্ছার জোরও নেই। আর স্ট্যাটাস ভ্যালুই যদি হয়—অনেক মেয়ে আমার 'পর আকৃষ্ট—এই আকাঙ্ক্ষাই যদি আমার হত—তবে ঢের ঢের সুন্দরী মেয়ে ছিল, আছে এখনও, তোমার অপমান সহ্য করে—নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও—বছরের পর বছর তোমার চারদিকে ঘুরপাক খেতাম না। সঙ্গে সঙ্গে কল্যাণের এও মনে হয়, তোমার যা মেজাজ—যে বেখাপ্পা, কী জান বললে দৃশ্য সৃষ্টি করা অর্থাৎ সিন ক্রিয়েট করা মেজাজ তাতে আমিই তো শুধু মানিয়ে চলছি। তুমি তোমার খুশিমতো চলছ—পান থেকে চুন খসলেই তুমি যা হয়ে দাঁড়াও—তাতে আমারই তো মন জুগিয়ে চলতে হচ্ছে। তুমি একজন রিসেপসনিস্ট—আমি একজন অফিসার। অথচ ব্যাপারটি এমনি দাঁড়াচ্ছে, তুমি হচ্ছ একজন খাম খেয়ালি রিসেপসনিস্ট—আর আমি হচ্ছি তোমার খুশির ক্লাস ফোর স্টাফ—পিওন বা বেয়ারার। তবে, মনে মনে কল্যাণ ভাবে, রমার

মা বা বাবা হয়তো ভয়ংকর রাগী—কাণ্ডজ্ঞানহীন—হয়তো কথায় কথায় ঝগড়া করে লোক জমায়—যা রমার রুচিতে বাঁধে। সেই বেদনার সংবাদই জানাল। শুধু সেই বেদনার কারণ হিসেবে প্রেমকে ধরায় ওর ভুল হল। একই সঙ্গে কল্যাণের মনে হ'ল—ও যেন ভয়ংকর বন্দী—বন্দী এই মেয়েটার কাছে—ওর স্বাধীনতা নেই, নিজের ইচ্ছে নেই, নিজের মনে অভিমান কিছু নেই—রমার 'পর আনুগত্য—ওর দাসত্ব ছাড়া কিছু নয়। রমার 'পর আকর্ষণ ওকে অন্ধ দাসে পরিণত করেছে। একটা প্রবল বন্ধনে যেন কল্যাণের দম বন্ধ হয়ে আসতে চায়—জোর করে এই দম বন্ধ করা চিন্তার হাত থেকে অব্যাহতি পাবার জন্যে ভাবে, আগে আগে কত পুরুষ রমার জীবনে এসে গেছে—রমার কাছে হয়ত কল্যাণ মোটেই প্রথম পুরুষ নয়—উত্তম, পুরুষ হতে পারে। কিন্তু এ চিন্তাতে রমার 'পর মন বিকল হল না। রমা ওর সাতপাকে বাঁধা আপনজন নয়—যেন উনপঞ্চাশ বাঁধনে বাঁধা অত্যাচারী জন। কল্যাণ দুর্বলভাবে চিন্তা করে, ওর মার খাবার আনবার আগের মুহূর্তগুলোই ছিল সুন্দর। কল্যাণ ভাবল যতক্ষণ হাসি থাকে ততক্ষণই প্রেম সুন্দর—যেই মুহূর্তে হাসি চলে যায় তখন প্রেম হচ্ছে লোহার শেকলে বাঁধা দুটি নিরুপায় নরনারী—কোথাও যাবার স্বাধীনতা নেই লোহার শেকল ছেড়বার সাধ্যও নেই। যে মুহুর্তে প্রেমের মাধুর্য চলে যায় তখন প্রেমের সম্পর্ক—লোহার শেকলে বাঁধা কয়েদী ও ওয়ার্ডারের সম্পর্ক। যে বেখাপ্পা, দৃশ্য সৃষ্টি করা, ডমিনেন্ট সে হচ্ছে ওয়ার্ডার—আর যার নিরুপায় বন্ধন অথচ বেখাপ্পা হতে পারে না—দৃশ্য সৃষ্টি করতে চায় না সে হচ্ছে কয়েদী। ওয়ার্ডারেরও মুক্তি নেই—কয়েদীরও নয়। প্রেম তাই আসলে প্রকৃতির দেওয়া লোহার শেকল। একটা মনের সঙ্গে আরেকটা মনের বাঁধবার শেকল। মন বাঁধা পড়লেই দেহ বাধা পড়বে। প্রকৃতিরও উদ্দেশ্য সিদ্ধ। জেল ঘুঘুরা নাকি জেল ছাড়া থাকতে পারে না। বারে বারে কয়েদীরা ফিরে ফিরে জেলে আসে। তাই প্রেমের হাতকড়া যার পড়েছে—প্রেমের ঘানি তাকে সারাজীবন টানতে হবে। উপায় নেই, পথ নেই, মুক্তি নেই। চলে যেতে পারবে না, বাঁধন ছেঁড়বার সাধ্য নেই, বাঁধন সহ্য করা কঠিন—একজন মরে গেলেও—হয় আরেক জন—আরেক বন্ধন—নয়তো স্মৃতির বন্ধন। আমি আর কোনও দিন আসব না—আজ থেকে সব শেষ—এই সব আজগুবি দিবাস্বপ্ন নির্বোধের আত্মপ্রবঞ্চনা মাত্র। হঠাৎ কল্যাণ কেমন অধীর হয়ে ওঠে। ওর ঠোঁট দুটো শুকনো শুকনো লাগে। ইচ্ছে হয়—রমাকে বিবস্ত্র করে একটা তীব্র ঘৃণার দৃষ্টি হেনে চলে যায়। কিন্তু এই উত্তেজনার মধ্যেও রমার বিবস্ত্র রূপ যেন রীনার বিবস্ত্র দেহের সঙ্গে এক হয়ে যায়। তবু, যে ভিন্ন হবে এই লোভ যেন ওর রাগের মধ্যে উঁকি দিতে থাকে। সঙ্গে সঙ্গে নির্মমভাবে কল্যাণ চিন্তা করে, ঘৃণা দূরে থাক—রমার ঐ নগ্নদেহ তখন ওর কাছে স্বর্গীয় মনে হবে। তখন জয়ের আনন্দবোধ করবে। কল্যাণ যেন হতাশ হয়ে চিন্তা করে—এই সত্যিকারের কঠিন বন্ধনকেও আমি বন্ধন হিসেবে নিতে পারিনি—বন্ধনের বিলাসকে, পরাধীনতার বিলাসকে উপভোগ করছি মাত্র। মুক্তির চিন্তা যেন দিবাস্বপ্ন ও আত্মপ্রবঞ্চনা—তেমনি বন্ধনের অধীরতাও একটা উপভোগের—নিজের এক ধরনের সুখকে ধাপ্পা দিয়ে দুঃখ বলে চালানো। দুঃখের বিলাস। মুক্তি ও বঞ্চনা দু'টি আত্মপ্রবঞ্চনা। অপরকে কিছু বলবার জন্যেই সাধারনত

কল্যাণ চিন্তা করে। আজ যেন কল্যাণ নিজের কাছে কিছু বলল। যদিও ভেতরে ভেতরে তাগিদ ছিল এই কথাগুলো প্রকাশ করবার। কিন্তু কেমন ইচ্ছেটা মরা খিদের মতো। আজ যেন নিজের স্বরূপ ওকে চমকে দিল। কিন্তু এই মোহভঙ্গ ও যে বেশিক্ষণ সহ্য করতে পারবেন না তাও জানে। এই উলঙ্গ আত্মসমালোচনাকে বেশিক্ষণ দেখা সম্ভব নয়—তা কল্যাণ বুঝেছিল। শুধু মনে হ'ল, আজকের সন্ধ্যার উপসংহার আরো ভালো হতে পারত। যেখানে অনেক আগে গেলে সব দিক রক্ষা হত—সেখানে বেশিক্ষণ থাকলে সব দিক নষ্ট হয়। তবু, আজ কল্যাণ শেষ পর্যন্ত সব দেখবে। স্বপ্ন দেখতে এসেছিল—স্বপ্ন শুরুও হয়েছিল—কিন্তু এখন জঞ্জাল ক্রমে জড়ো হয়েছে—স্বপ্নভঙ্গের 'পর সকালের জঞ্জাল। মনে এল আরেকটি উপমা—তীব্র গরমে ফ্যানের ঠান্ডা হাওয়ার তলায় কেবল সুন্দর স্বপ্ন এসেছিল—কিন্তু কারেন্ট চলে গেল।

কথা শেষ করেই রমা ভাবছিল হয়ত কল্যাণ ভাবছে কী এমন সুন্দরী তুমি—তোমাকে নিয়ে আমার স্ট্যাটাস বাড়ছে—বরং তোমাকে নিয়ে ঘুড়ে বেড়ালে লোকে আমার রুচিরই নিন্দে করবে। এ কথা কল্যাণ ভাবতে পারে চিন্তা করবার সঙ্গে সঙ্গে রমার মাথা যেন আগুন হয়ে যায়। মনে পড়ে যায়, মা'র গালাগাল, শাঁকচুন্নি, পেত্নী, যতই বগলকাটা ব্লাউজ পরো আর ঠোঁটে রঙ মাখো—শাক দিয়ে মাছ ঢাকা যায় না—যতই পাউডার ঘষো—চুল দিয়ে কাটা কান ঢাকা যায় না। সমস্ত যেন বিষের আগুনে জ্বলে উঠতে দেখে রমা ঠিক ভয় পায় না—এবার উদ্বিগ্নও হয় না, উৎকণ্ঠাও আসে না—নিজের বিষাক্ত রক্ত যেন ছোবল দিয়ে অপরের রক্তে ছড়িয়ে দিতে ইচ্ছে হচ্ছিল। তবু, নিজে যেন জোর করে ভাবল, আমি তো কল্যাণের কাছে যাইনি—কল্যাণ আমার কাছে এসেছে। একদিনও কল্যাণের অনুরোধ ছাড়া ওর সঙ্গে যাইনি—গেলেও ফিরে আসবার জন্যে ছটফট করেছি—কল্যাণের স্ত্রী অপেক্ষা করে আছে—এ কথা বার বার বলে ওকে তাড়িয়ে দেবার চেষ্টা করেছি। হয়ত সত্যিই আমি শাঁকচুন্নি, হয়ত প্রেতিনী, হয়ত যদি কোনদিন কল্যাণের স্ত্রী সব জানে—বলবে, ডাইনীর খপ্পরে পড়েছিল। হয়ত আমি জানিনে—আমি ডাইনীই। নইলে কল্যাণ সব অপমান সহ্য করেও আসে কেন এই প্রেতিনীর কাছে। হঠাৎ নিজের চেহারাকে রমার মনে হয়, ক'দিন কবরে থাকবার পর যেন সেই রুগ্ণ মৃত শরীর কবর থেকে বের হয়ে চলা ফেরা করছে। যে দেখছে যেন ভয়ে সম্মোহিত হচ্ছে। গভীর রাতে যখন ছেলেবেলায় ভয় করত—তখন যেমন জানলার কাছ থেকে চোখ ফেরানো যেত না—অথচ চেয়ে থাকাও ছিল তেমনি কষ্টকর। তেমনি, তেমনি হয়তো ঐ জানলার মতো ওর ক'দিনের কবরে থাকা প্রেতিনীর চেহারা কল্যাণকে সম্মোহিত করেছে। হয়তো কল্যাণ চলে যেতে চায়—পারে না। হয়তো, নিজের অনিচ্ছাসত্ত্বেও ভাবল রমা সুন্দর নিটোল নারীমূর্তি দেখে দেখে কল্যাণের অরুচি এসেছে—তাই স্বাদ বদলের জন্যে রমার তেতো অম্ল রূপের দিকে আকৃষ্ট হয়েছে। সুন্দরে অরুচি এসেছে—নিজে সুন্দর, স্ত্রী সুন্দর, ভাই বোন বাবা-মা, শালা শালী সবাই হয়তো সুন্দর। তাই সুন্দর ওর কাছে এক ঘেয়ে লাগছে—একটু বৈচিত্র দরকার—একটু হাওয়া বদল দরকার—একটু পিকনিক দরকার কুরূপের সঙ্গে। তাই আমি। হঠাৎ যেন নিজের আধভাবা একটা ভাবনা মনে ফুটে ওঠে। মা দাদা সম্পর্কে শোক করতে করতে

বলতেন, আমার এমন সুন্দর ছেলেটা চলে গেল..... তখন ওর মনে হ'ত—হয়তো আমি দাদার বদলে মরে গেলে মা এত শোক পেতেন না—হয়তো, হয়তো মা দাদার বদলে ওরই মৃত্যু হলে ভাল হ'ত—এমনি একটা যেন কিছু ভাবতে চান। এতকাল কথাটা অস্পষ্ট রেখেছে রমা, আজ স্পষ্ট করেই ভাবল, দাদার বদলে রমা বেঁচে যেন দোষী হয়ে রয়েছে মা'র কাছে। আজ কথাটা চিন্তা করবার সঙ্গে সঙ্গে মনে হ'ল—কেউ ওর নেই—দাদার বদলে রমা বেঁচে আছে বলে মা অসন্তুষ্ট। ওকে না দেখলে বাবার হয়তো ওকে মনেও পড়ে না, ছেলেবেলা থেকে আজ পর্যন্ত ওর কেউ অন্তরের বন্ধু নয়, কল্যাণ এসেছে রূপের স্বাদ বদলের জন্যে। ওকে প্রয়োজন আছে অনেকেরই কিন্তু কেউ ওকে আপন ভাবে না, অন্তরের ভাবে না। রমা চিরকাল বাইরের লোক বগলকাটা ব্লাউজ আর ঠোটে লিপস্টিক মেখে সবাইকে অভ্যর্থনা করাই মাইনে করা কাজ—অভ্যর্থনার পরই সবাই যে যার ডিপার্টমেন্টের লোকদের কাছে গিয়ে পৌঁছায়—ওর অন্তরের কেউ আসে না। ওকে কেউ অভ্যর্থনা করে না—কোন অন্তরে ওর স্থান নেই। ট্রাম-বাস-বাড়ি-অফিস—সব জায়গায় ও বাইরের লোক, কোথাও নিজের লোক নয়। কোনদিন কোথাও যায়নি বলে ওর আফসোস—অথচ চিরকাল বাইরের লোকই থেকে গেল। আবার মনে ভেসে উঠল, দাদার বদলে ওর মরণই হয়ত মা'র পছন্দ ছিল—খাইয়ে পরিয়ে শাড়ি-গহনা দিয়ে কোনদিক থেকে যেন মাকে সন্তুষ্ট করতে পারল না। মা হয়তো দাদার বদলে ওকে চায়নি—এ দোষ ক্ষমা করতে পারেনি—যেমন পারেনি বাবার অক্ষমতাকে। রমার চোখে জল ভেসে উঠল। রমা লজ্জা পেল না—হয়তো একটু সহানুভূতির কামনাও ভিতরে ভিতরে থাকতে পারে—কিন্তু সে কামনাকে রমা চিনেও চিনল না। ধীরে-সুস্থে মুখে আঁচল দিয়ে চোখের জল মুছে ফেলল। তারপর ধরা গলায় একটু হেসে কল্যাণকে জিজ্ঞেস করল—অনেকক্ষণ চুপ করে রয়েছ। ভাবছ কিছু? কি? লুচি সবটা খেয়ে নিজের 'পর অত্যাচার করতে পারলে না বলে ক্ষোভ? না, প্রেমের মূল্য দিলেম না বলে ধরা পড়ে যাবার অপ্রস্তুত ভাব? না, সত্যি ভালবাসা আছে—নইলে আমার মতো ডাকিনী যোগিনী নাগিনীর কাছে এমন বাঁধা পড়বে কেন? তুমি এর জবাব জানো কিনা জানিনে—আমি হয়তো জবাব জানি। জান, কোনও জিনিস ভালো করে জানার মতো অভিশাপ আর নেই। অন্তরঙ্গতার চেয়ে অভিশাপ আর কিছুতে নেই। জ্ঞানীরা সবচেয়ে অভিশপ্ত। অনিচ্ছাসত্ত্বেও যে জ্ঞান মানুষের ভেতরে জোর করে ঢোকে—তাই আসল জ্ঞান। জ্ঞানই শক্তি। সেই শক্তি হচ্ছে সমস্ত আশা আকাঙ্ক্ষা ইচ্ছাপূরণকে ভেঙে তচনচ করে যখন অন্তরে প্রবেশ করে নিজের অধিকারে বসে থাকে, সেই জ্ঞানকে কেউ টলাতে পারে না। জ্ঞান স্বভাবত নির্মম, নিষ্ঠুর আর অভিশপ্ত। এই জ্ঞান অর্জন করতে হয় না—দুয়ার ভেঙে ঝড়ের মধ্য দিয়ে অন্তরে আসে। অবাঞ্ছিত, অযাচিত, কী বলব? অনাহূত আত্মজ্ঞানের চেয়ে অভিশাপ আর কিছু নেই। মিথ্যা না থাকলে, দু'দণ্ডের মোহ না থাকলে এ পৃথিবীকে সহ্য করা কী কঠিন তা তোমার মতো ভাগ্যের বরপুত্রেরা বুঝবে না। আজ খুব বকবক করছি না? অনেক লম্বা বক্তৃতা যেন ট্রামে হাওড়া থেকে বালিগঞ্জ টার্মিনাস। যাকগে, একটি কথা বলে রাখি—ডাকিনী, যোগিনী, নাগিনী কি না বলতে পারব না—আমি মায়াবিনী নই—মায়া সৃষ্টির জন্যে

হওয়াকে ওর ভয় করে না—ভেতরে ভেতরে কেমন একটা লোভও আছে। সব কিছু হারিয়ে নিজেকে একলা উপলব্ধি করবার বা এই উপলব্ধিটির 'পর—স্বামী, সন্তান, সংসার যেখানে ঝাপসা—ঝাপসা অথচ তাতে কোনো বেদনা নেই। সকলের সঙ্গে নিজেকে বোধ করবার—এক হবার যে ব্যাকুলতা—কমলা ভেতরে ভেতরে অস্পষ্ট ভাবে জানে—তা অনেকটা জোর করা—নাড়ি ছেঁড়বার বেদনা নয়। ভয় করতে ইচ্ছে করে অথচ ভয় হয় না—ব্যথার চাহিদা আছে অথচ ব্যথা হয়না—ব্যাকুলতা হচ্ছে বলে ভাবতে চায়—কিন্তু ব্যাকুলতা নিতান্তই ফ্যানানো। এই সময়টা কমলা যেন সব পৃথিবী ছেড়ে মহাশূন্যের ভেতর—যেখানে একটি গ্যালাক্সি শেষ হয়ে গেছে অনেক আগে—আরেকটি গ্যালাক্সি অনেক কোটি আলোকবর্ষ দূরের—স্তব্ধ অন্ধকারের মধ্যে আচ্ছন্ন। নিজেকেও যেন অজানা লাগে—এত অপরিচিত জগতে নিজের পুরানো পরিচয় কী মনে থাকে? মনে থাকলেও সেই পরিচয়ের কোন জোর নেই। অনেকক্ষণ নিজের অপরিচয়কে সঙ্গে নিয়ে অপরিচিত জগতে বাস করে আবার কখন পাঁচটার সময় কমলার ঘুম ভাঙে। ও যে অপরিচিত ছিল নিজের কাছে তার কিছু মাত্র মনে থাকে না। জীবনকে হঠাৎ একঘেঁয়ে লাগা থেকে সব পরিচয় হারিয়ে ফেলা পর্যন্ত ঘণ্টাক্ষানেক সময় যেন সেই দুই গ্যালাকিসর ভেতর রেখেই কমলা সাড়ে পাঁচটায় সংসারে প্রবেশ করে। প্রবেশ যে করে তা জানতেও পারেনা—মনেও থাকেনা। শেষ রাতের সেই এক ঘন্টাকে মহাশূন্যের দুই নক্ষত্রপুঞ্জের মাঝেকার কোটি কোটি অন্ধকারের মধ্যে রেখে দিয়ে আসে। সেই অন্ধকারকে দেওয়া উপহারকে দিনের আলোতে একেবারে ভুলে যায়। নক্ষত্রহীন চির অন্ধকারের অমাবস্যার কোনো অজানা আকাশ কখন জানলা দিয়ে এসে ভোর রাতে ওকে স্মৃতি আর কল্পনার আষ্টেপৃষ্টে বন্ধন থেকে মুক্ত অন্ধকারে হালকা হালকা ভয়ে স্বাধীন ও অপরিচয়ের মধ্যে ঘণ্টাখানেক রেখে দিয়ে যায়—আর যাবার সময় নিজের কোনো স্মৃতিও প্রত্যাশা কিছুই রেখে যায় না—সকালে সংসারের আষ্টেপৃষ্টের মধ্যে সহজ ও স্বাভাবিক কমলার সেসব কিছুই মনে থাকেনা। ....আজকাল বেশি রাতে নরেন 'কল'এ যায়না—ভোর রাতে তো নয়ই। চারদিকে নানা গন্ডোগোল। ঘনঘন রাজনৈতিক সংঘর্য, মিছিল, খুন। নানা ডাক্তার ভিজিট কমাবার জন্যে নানা রকম ধমকানো চিঠি পেয়েছে। নরেনও। ইতিমধ্যে দু'জন ডাক্তারকে ডেকে নিয়ে চিকিৎসা করিয়ে শুধু যে ভিজিট দেয়নি—তা নয়—গায়ে গরম জল ঢেলে দিয়েছে। কোনো কোনো ডাক্তার ভিজিট কমিয়ে দিয়েছে। রাতে কেউ-ই বের হয় না—অন্তত খুব জানাশুনা না থাকলে। নরেন ভিজিট কমায়নি—তবে রাতে পারতপক্ষে বের হয় না। তাই শেষ রাতে আর উঠবার দরকার হয় না। কিন্তু ঘুম কারোই হয় না। কমলা উঠে গিয়ে শেষ রাতে নরেনের পাশে শোয়। বোঝে নরেনের ঘুম ভেঙে গেছে—জোর করে ঘুমোবার চেষ্টা করছে। কমলার মনে হয়, নরেন যেন 'কলে' যেতে না পেরে লজ্জা পাচ্ছে। তাই ঘুম না এলেও ঘুমের ভান করে কমলাকে এড়াতে চাচ্ছে। সেই যে একবার ঘুম ঘুম চোখে কমলার দিকে তাকিয়ে আবার চোখ বুজছে—তা আর কিছু নয়—কমলার পায়ের শব্দে, চুড়ির শব্দে আগে থেকে বুঝতে পেরেই—ওর ঘুম ঘুম চাহনির নকল—তারপর নকল ঘুম। কমলা গিয়ে পাশে শুয়ে পড়ে।

......এবার গরমের ছুটিতে কমলা বাচ্চা দুটোকে নিয়ে দাদার কাছে যায়। দাদা সাবজজ হয়েছিলেন—এবার আবার বদলি হয়েছেন। তবে খুব বেশি দূরে নয়। নতুন বাড়িটি মন্দ নয়। এখানেও বৌদি ঠিক জমিয়ে নিয়েছেন—দাদা বই মুখে করে অবসর কাটান। এখানে সেই ঝগড়া—যেই ঝগড়ার কথা গোড়াতে বলা হয়েছে। কমলার আশা ছিল—দাদা বৌদিকে অন্তত কিছু কড়া কথা বলবে। দাদা যে পুরুষমানুষ এ প্রমাণ গতবারের শীতের ছুটিতে পেয়ে এবার অন্তত সেই ভরসায় ঝগড়ায় নেমেছিল। কিন্তু দাদা বুঝেও উদাসীন রইলেন। মা কাঁদলেন। নরেন বারোটার মধ্যে এসে দুটোর ট্রেনে ওদের নিয়ে চলে এল। নরেনকে কিছু খেতে দিল না—বাচ্চাদের খাওয়াল না—নিজে তো খেলই না। নরেন আর বরুণ বর্তমান সরকারের পরমায়ু নিয়ে আলোচনা করল—কবে পর্যন্ত রাষ্ট্রপতির শাসন হবে তার তারিখ নিয়ে আলোচনা করে বিদায় নিল।

এবার নরেন মোটর কিনল। পরোক্ষভাবে বরুণের এক সহকর্মীর মারফত তা জানিয়েও দেওয়া হল। দাদা কোনো চিঠিপত্র দিল না—কমলাও না। পুজোতেও দাদার চিঠিপত্র বা শাড়ি এল না। কমলাও লিখল না। মা'র জন্যে মন হুহু করে। তবু, কমলা দাঁতে দাঁত চেপে স্তব্ধ হয়ে রইল। পুজোর ক'দিন চিঠির জন্যে ব্যাকুল হয়ে থাকল। তারপর, মা'র নামে একটা শাড়ি পার্সেল করল—সঙ্গে কোনো চিঠি দিল না। কিন্তু কমলার নামে কোনো কিছুই এল না। কমলা বার বার বোঝাল—বাপের বাড়ির পর্ব শেষ হ'ল—ভালই হোল—তবু, মা যে ক'দিন—থাকছে....মা তো আসতে রাজি হলেন না। ওরা—ডাক্তাররা কেমন নিজের মধ্যে থাকে জানতে পেরেও যদি দাদা-মা কোনো খবর না নেয়—না নেয় না নিক—আর মরে গেলেও নয়।

.....আজকাল শেষ রাতে কমলার এক অদ্ভুত স্বপ্নের কথা মনে পড়ে। যেই স্বপ্ন বিয়ের পর প্রায়ই দেখত। সেই কলকাতার বাড়িওয়ালার স্কুল ফাইনাল ফেল করা দামড়া ছেলের সঙ্গে ওর বিয়ে হয়ে গেছে—নরেনের সঙ্গে ওর বিয়ে সম্ভব নয়। অদ্ভুত কান্না পেত—স্বপ্নের মধ্যেই। জেগে আশ্বস্ত হত। যতসব.....। ব্রহ্ম আমাকে বেছে নেননি—ছেলেবেলা থেকেই তা আমি জানি—আমি চোজেন রেসের কেউ নই। তবে, মাঝে মধ্যে জগতের ধাপ্পাবাজি আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে যায়। আমি ভুল পথে চলতে চাই, ভুল করতে চাই—কিন্তু মাঝে মধ্যে ভুল করা আর নিজেকে ভোলানো আমার পক্ষে শক্ত হয়ে ওঠে। আমাকে অনিচ্ছুক ব্রহ্মবাদিনীও বলতে পার? যাক, এবার আমি—অনেকক্ষণ হল টার্মিনাসে এসে গেছি—ট্রাম এবার ডিপোতে যাবে—আর বসে থাকা চলবে না।

কল্যাণ এবার জানায়—অর্থাৎ তুমি জ্ঞান বৃক্ষের ফল খেয়েছ। তাই আর ইডেন গার্ডেনে যেতে পারবে না। শ্রীকৃষ্ণের নিন্দে করেও তুমি ব্রহ্মবাদিনী।

—জ্ঞানবৃক্ষের ফল খেয়েই আমি অনিচ্ছা সত্ত্বেও ব্রহ্মবাদিনী। এই বলতে চাই।

—জ্ঞান বৃক্ষের ফল খাবার আগের ক'টা মোমেন্টে তোমাকে দেখবার ইচ্ছে যে ছিল—আছেও। তা না হয় আবার বালিগঞ্জ টার্মিনাস থেকে রিটার্ন জার্নি শুরু করলে—অন্তত জ্ঞানবৃক্ষের ফল খাবার আগের মুহূর্ত গিয়ে না হয় দু'জনে পৌছলাম।

বমার সমস্ত শরীরটা শির শির করে উঠল।

দুর্বলভাবে মাথা নাড়ে। তারপর যেন খুব আস্তে আস্তে গোপনে ক্ষীণ স্বরে বলে—বলতে নেই। কল্যাণ আবার বলে। কিন্তু গলার স্বর যেন কেমন কাঁপা—তোমাকে বড্ড ক্লান্ত দেখাচ্ছে। মুহূর্তে একটা প্রবল কান্না যেন সব ঠেলে বেরিয়ে আসতে চায়। কিন্তু প্রাণপণে রোধ করা সত্ত্বেও—মুখে আঁচল দিয়ে একটু ফুপিয়ে কেঁদে উঠল। ক'মুহূর্তে মাত্র। তারপর থমথমে মুখে কল্যাণের দিকে তাকাল। কী যেন বলতে গেল। কিন্তু তক্ষুনি আবার আচল দিয়ে মুখ চাপা দিল। এবার বেশ কিছুক্ষণ থাকল। আবার সোজা কল্যাণের দিকে তাকাল। তারপর যেন একটা দুর্বল দৃষ্টিতে কল্যাণের দিকে তাকিয়ে এক ঝোঁকে বলে ভেজা গলায়—আমাকে সহানুভূতি দেখাবে না—হয়তো আমার 'পর বড্ড স্ট্রেন পড়ে—আমার 'পর অত্যাচার করা হয়। অনেক অত্যাচার করেছ—আর নয়—প্লিজ, ইট ইস্.....। এবার শেষ করতে না পেরে মাথা নিচু করে থাকে। ইচ্ছে হয়, ছুটে গিয়ে কোথাও কাঁদে.....এবার খুব কান্না আসবে—ঝড়ের মতন—হয়ত কাল বৈশাখীর মতো—রমা ভাষায় এ কথা চিন্তা করল না—নিজের কান্না—আর ঝড় ও কালবৈশাখী চিত্র ভেসে উঠল। হঠাৎ রমা রূদ্ধস্বরে বলে—আসছি। বলে প্রায় ছুটে বাথরুমে চলে যায়। তারপর নিঃশব্দে হু হু করে কাঁদতে গিয়েও শব্দ বের হয়ে যায়। মা শুনতে পাবে—বাথরুম দূরে নয়—তবু, চেষ্টা করেও কান্না একেবারে নীরবে সারতে পারে না।

প্রথমে কল্যাণের মনে হয়, আজ যেন রমা হাতের মুঠোয় এসে গেছে। ওর কথায় অভিমান ভাঙতে পারে, আত্মসমর্পণ করতে পারে, রাগ করতে পারে, ওকে সান্ত্বনা দিতে পারে, হাসাতে পারে, কাঁদাতে পারে—কিন্তু তবু এতে ঠিক জয়ের আনন্দ এবার আসে না। ঠিক কখন যে অভিমান করবে, কোন কথায় সেন্টিমেন্টাল হয়ে উঠবে, কোন সহানুভূতিতে কাঁদতে ছুটবে—রমার মনের এই মেকানিজমটা আয়ত্তে এলেই ভয় হয়—এ কথা চিন্তা করেও কল্যাণ আনন্দ পায় না। রমাকে বহু রঙে, বর্ণে, শব্দে, মেজাজে দেখলেও কেমন যেন অনেক দেখার তৃপ্তি আসে না। আজকের রমার এত ঘন ঘন রূপ-পরিবর্তন কড়া মেজাজী, স্নেহশীলা, আত্মনিবেদিতা, অভিমানী, কূট-তার্কিক, বেশ একটা হতাশায় মাখা মন ওর ভেতরে রমাকে অনেক দেখার বৈচিত্রের আনন্দ আনে না। ঠিক রমা যে কখন কী করবে—আনপ্রেডিকটেবল—এ জন্যেও যে খুব একটা ভয় হয় তাও নয়—এ জন্যে যে আকর্ষণ বেড়েছে তাও নয়। মনে হয়, রমা যেন কেবল ছুয়ে ছুয়ে যাচ্ছে ঠিক ধরা দিয়েও নিজেকে সঁপে দিচ্ছে না। আর সঁপে দিলেও—তা যেন হারিয়ে ফেলছে। সঁপে দেবার কথা ভুলে যাচ্ছে। হঠাৎ কল্যাণের ভাবনায় যেন আসল চিন্তাটি ধরা দেয় বলে ওর মনে হয়। ওকে উপলক্ষ করে রমা যেন আজ নিজের অনুভূতি নিয়ে ব্যস্ত, বিব্রত, আত্মমগ্ন, নিজের বৈচিত্র্যে অস্থির। কল্যাণ শুধু উপলক্ষ। রমা আজ নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত, বিব্রত, মগ্ন। নিজের অনুভূতি ওকে আচ্ছন্ন করে রাখছে। ওর মনের দীঘিতে কল্যাণ যে ঢেউ তুলেছে—রমা সেই ঢেউ নিয়েই কখনও আত্মস্থ, কখনও অস্থির, কখনও আত্মহারা। আর কল্যাণ যেন দীঘির পাড়ে দাঁড়িয়ে অবহেলিত দর্শক। একটা অবহেলার বিশ্বাস যেন কেমন মনটাকে শুকনো করে দেয়। ইচ্ছে হয় বলে তুমি অনুভূতির দীঘিতে নিজেকে নিয়ে

মেতেছ আর খটমটে শুকনো জায়গায় আমি দাঁড়িয়ে রয়েছি—এক ফোঁটা রসও এখানে নেই। তোমার দীঘি থেকে এক মুঠো অনুভূতি আমার দিকে ছিটিয়ে দাও—আমি সরস হই। কথাটি চিন্তা করে কল্যাণ একটু আনন্দ পায়। সঙ্গে সঙ্গে মনে হয়, রমার অনুভূতির এই তীব্রতা—কড়া মেজাজ, মুহূর্তে সঁপে দেওয়া নিজেকে—চোখে আঁচল দিয়ে ছুটে পালানো—সব কিছু মিলিয়ে ওর যেন একটা ঝাঁজ আছে—যা রীনার নেই। রীনা যেন নরম মাটি।

কল্যাণ ঘড়ি দেখে। রীনার কী ফেরার সময় হয়েছে? রীনার জন্যে একটা ব্যথা অনুভব করে। কেমন একটা অনুতাপের মতো। অথচ এখান থেকে উঠে যেতেও ইচ্ছে করে না। যেন রমা অনুমতি না দিলে যেতে পারবে না। আবার মনে হ'ল, রমা যেন ওকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছে—কয়েদী আর ওয়ার্ডার। কিন্তু রমার চোখে আঁচল দিয়ে ছুটে পালালো দেখে—ওর দমবন্ধ করা বন্ধনের চিন্তায় আর অস্থিরতা এল না। মনে হল, ছুটে পালিয়ে যেন রমাও যে বন্দি ও রমাও লোহার শেকলে বাঁধা—এ কথাই যেন বেশি করে প্রমাণ হয়ে গেল। রমা যে পালাতে পারবে না—চোখে আঁচল চাপা দিয়ে ছুটে পালিয়ে রমা সে কথাই প্রমাণ করল। আবার রীনার কথা মনে এল—ওর ট্রামে ওঠবার সময় মুখ কাঁচুমাচু ছলছলে হয়ে যাওয়া চেহারা। দু'জনেই ওর কাছ থেকে চলে গেল—কেবল যে যেতে পারবে না এ কথা জানাতে। একটা গর্ববোধ ও আনন্দ এবার কল্যাণ অনুভব না করে পারে না। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল, মঙ্গলগ্রহের চিত্র—অহরহ দু'টি গ্রহ ক্রমাগত আকর্ষণে অভিমানে কখনও পূর্ণিমা ও অমাবস্যা। এতক্ষণে একটা সূক্ষ্ম আনন্দের ক্ষীণ ধারা অনুভব করে। এই অনুভব যেন অনেকটা ভেতরকার জিনিস। অনেক স্থায়ী। যেন এরপর নির্ভর করে অনায়াসে কিছু কল্পনা করা যেতে পারে—যেখানে নির্বিঘ্নে হাসলে পেছনে পেছনে কান্নার চলে আসবার সম্ভাবনা নেই। অবশ্য যারা প্রাণ খুলে হাসতে ভরসা পায় না—উদারভাবে হাসতে সাহস না পাছে—অতি হাসি অতি কান্নার অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে পড়তে হয় এই ভয়ে কল্যাণ তাদের দলের লোক নয় বলে নিজেকে চিরকাল ভেবে এসেছে ও বলে এসেছে। তবু, গর্ব ও আনন্দের একটা স্থায়ী সূক্ষ্ম ধারা বোধ করে যে স্বস্তি বোধ করল—তা যে টিকবে এতে আশ্বস্ত হবার মধ্যেই যে ঐ প্রবাদের একটা অলক্ষ্য প্রভাব নিজের মধ্যে ছিল তা যেন কেমন করে টের পেল। আজ তো বাড়ি ফিরতে ভয় হচ্ছে না। রীনা কী ভাববে তা নিয়ে দুশ্চিন্তা নেই। কারণ, রীনা বাপের বাড়ি গেছে—বাবা এসে পৌঁছে দেবে। হয়তো কল্যাণের জন্যে অপেক্ষাও করবে। কল্যাণ যদি বলে, তোমার বাবা বসবে জেনেই দেরি করে এলেম—রীনা গম্ভীর হবে। তুমি বাপের বাড়ি—আমি গেলাম একটা সিনেমায়। সিনেমা থেকে একটু দেরি করেই এলেম। না, সাড়ে আটটা এখনও হয়নি? বাবাকে এড়াবার জন্যে দেরী করে এলেম শুনে রীনা মুখ গম্ভীর করবে। কী বলব? তোমাকে চটাবার জন্যেই বললাম? প্রথমটা বিশ্বাস করবে না—পরে করবে। কিন্তু বিশ্বাস যে করবে—অর্থাৎ এই আত্মপ্রতারণাটুকু নিজের কাছে করবে—তা নিজেকে তো বলবেই না—আমাকে বলবে—হ্যাঁ, এ জন্যেই দেরী করে এসেছ—তা আমি বুঝতে পেরেছিলাম—তোমার না বললেও চলত। এবার রীনা প্রতিবাদ আশা করবে। ওর অভিমান ভাঙবার

একটা ডিফেন্স কল্যাণকে দিতে হবে। রমার এই তীব্রতা, এই ঝাঁজ, এই তীক্ষ্নতা সব মিলে এখন যেন রীনাকে কেমন ম্লান মনে হয়। ম্লান মনে হওয়াকে ভালো করে কল্যাণ ভাবল না। শুধু মনটা ফিরে এল রমার কাছে। রমা কী করছে? কাঁদছে? নিজেকে সংযত করছে? নিজের পুরনো চেহারা খুঁজে চলেছে? নিজেকে বার বার হারানোকে কীভাবে বন্ধ করা যায় তা নিয়ে ভাবছে? নিজের হারিয়ে যাওয়া চেহারা কখন ফিরবে—সেই রিটার্ন জার্নির জন্যে অপেক্ষা করে আছে? আজকের আচরণের জন্যে অনুতাপ করছে? বার বার প্রতিজ্ঞা করছে—যাতে এতদিনের মন মুহূর্তের আবেগের ঝড়ে উধাও না হয়ে যায়? কী জানি—কী ভাবছে? হয়তো, ঠিক করেছে আর ভালবাসার কথা নয়—হয়তো বাবার বাইও-ডাটা শুধু বলবে সর্বনাশ, একদিকে ওর ফ্ল্যাটে রীনার বাবা বসে আছে—ওর ঘেরাও ও টেলিফোন আসবার বিষয় উপলক্ষ করে নিজের আত্মচরিতের সবচেয়ে লম্বা বিরক্তিপূর্ণ একঘেয়ে বেশ বড় একটা অধ্যায় বলবার জন্যে—যার মধ্যে সাহেবদের টেস্টিমনিয়ালই তিন চতুর্থাংশ—বাকি এক চতুর্থাংশ সেই সব সাহেবদের কতখানি শিক্ষা ও সম্মান তার একটা বিরাট এনসাইক্লোপিডিয়া। এখন যদি রমাও তাঁর বাবার বাইওডাটা শুরু করে। এ বাবা আবার সামনে আসে না—পেছনে মেয়েকে লেলিয়ে দেয়—এও তো কম ভয়ংকর নয়। এ তো দেখছি, মেয়েদের বাবার জীবনী মেয়েদের প্রণয়ীদের ভালবাসা ছাড়াবার সবচেয়ে বড় ওঝা।

কল্যাণের লুচি খাবার শোকের চেয়েও যে কথা রমার মাকে বেশি আঘাত করেছিল—তা ঠিক তখন তখনই তিনি বুঝতে পারেননি : বড় লোকের ছেলেরা বেশি খায় না। তিনি যেন এ কথা জানেন না। তিনি যে কত বড় ঘরের মেয়ে—কত বড় লোকের মেয়ে—এ কথা তাঁর মনে পড়তেই সমস্ত অন্তর জ্বলে উঠল। কেন রমা কী জানে না, তিনি কত বড় ঘরের মেয়ে—তিনি কী বড় লোকেরা কোথাও গিয়ে কী খায়, না খায়—কতটুকু খায়—সব ভুলে গেছেন? ওরে হাড় হাভাতের ঘরের মেয়ে—তুই কী বুঝবি—জানবি আমার মর্ম—ঐ তোর বাপের কাছে যা গিয়ে জিজ্ঞেস কর। ছেলেটা ভাবল কী? এমন চিরকাল ছিলেম। তোরা ছিলি—জন্মে থেকে আধপেটা খেয়েছিস—দোকানদারের গালাগাল খেয়েছিস—আমি যে ভাবে বড় হয়েছি—অমন তুই, তোর বাপও সাত জন্মেও দেখিসনি। যে ফেলা ছড়ার মধ্য দিয়ে আমি বড় হয়েছি—তোর বাপও হয়নি। খুব বড় গলা করে বলত—ইস্টবেঙ্গলে জমিদারী ছিল—ছিল তো তোর বিষয় বিক্রি করে ঐ ক'টা টাকা পেলি কেনরে? সেগুলো দিলি ঐ ছবির পেছনে! আর্টিস্ট মিত্র! এখন থেকেই বাপের মতো চাল দিতে শুরু করেছিস—আর্টিস্ট মিত্র। একবার ডেকে আনতে পারলিনে কেন—তখন মা'র দোহাই পাড়তে এসেছিলি কেন? বড় লোকের ছেলেরা কোথাও গিয়ে বেশি খায় না। খাবে কেন? তোর, তোর বাবার মতো তো বাড়িতে ভাত জোটে না কিনা—তাই তোর ডালডার লুচি দেখলেই ঝাঁপিয়ে পড়বে। তিনি কল্যাণের পক্ষ নেন। বেশ করেছে খায়নি। একসজিবিশন—একবার এনে বসিয়ে দিলে পারতি—কোরামিন—ক্রিটেগেরাস—হোমিওপ্যাথি—ঐ দুটি লুচি না খেয়েই পালাত। বড় লোকেরা বাড়িতে বেশি খায় না—রেস্টুরেন্টে খায়—তাই তিনি বাড়িতে খাওয়া ছেড়েছেন—অফিসের ক্যান্টিনে খান। বড় লোক হয়েছেন। দুটো পয়সা

আনছিল—এবার ঐ ছবির পেছনেও আবার সব যাবে। এবার গিয়ে রাস্তায় দাঁড়াতে হবে। কাতর ভাবে রমার মা লুচিগুলোর দিকে তাকান—এই, এতগুলো লুচি ধরে ভিখিরীকে দিতে হবে। এত বড় সমস্যায় তিনি বহুকাল পড়েননি। চোখে জল আসে। লুচি তরকারির দিকে তাকাতে পারেন না।

রমা প্রাণমন দিয়ে কামনা করে কান্না যেন শেষ না হয়। যতক্ষণ—আজ রাত থেকে আগামিকাল সকাল সাড়ে নটা পর্য্যন্ত কান্না ঝড়ের বেগে বয়ে যাক। মিনিটে মিনিটে ঝড়ের বেগ বেড়ে চলুক! ও থামবে না—মা—কল্যাণ যার যা খুশি ভাবুক—আজ রমা কাঁদবেই। কান্না চলে যাবে—চলে গেলে ওর ভয় করবে—মা কী ভাববে—কল্যাণ কী ভাবছে—এ নিয়ে কিন্তু ভয়কে আসতে না দেবার ভয়েই হোক—বা যা করেই হোক—রমা যেন জেদ করেই কাঁদবে। জেদ কতক্ষণ থাকবে—তা নিয়ে দু'একবার ভয় ও জেদের সম্পর্কে সংশয় ও অবিশ্বাস যে আসেনি তা নয়—তবু, জেদকে যেন মরণ কামড় দিয়ে রমা ধরে। আজ সব কিছুকে অগ্রাহ্য করে, অস্বীকার করে, বিদ্রোহ করে রমা কাঁদবে-কাঁদছে। এই বেপরোয়া কান্না যেন ওর অন্তরকে কেড়ে নেয়—কল্যাণের মতো—অজগর সাপের মতো সম্মোহিত করে আস্তে আস্তে গ্রাস না করে। নিজের সব ভুলে বেপরোয়া কান্নায় নিজেকে বিকিয়ে দেবার প্রবল ইচ্ছার মধ্যে যেন একটা ছবি ফুটে ওঠে—ঠিক অবনকে যখন শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হল—তখন মা'র কাপড় খুলে গিয়েছিল, ব্লাউজের ঠিক ছিল না—পাগলের মতো মেঝেতে লুটোপুটি খাচ্ছিলেন—। অথচ কত নারী পুরুষ তখনও বাসাতে। কিন্তু কেউ আছে—এ কথা মা'র একদম মনেও হয়নি। নিজেকে ভুলে, সব ভুলে প্রবল কান্নার ঝড়ে ভেসে আর সবাইকে ভিজিয়ে দিয়েছিলেন মা। এই ছবির মধ্যে যেন নিজের কান্নার ইচ্ছার চেহারা দেখতে পায়। কান্নার প্রথম দমকে ওর মনে হয়েছে—কেন আজ কল্যাণ এল—এতকাল পরে—অথচ ও বিয়ে করেছে—ওর স্ত্রী ওর চেয়ে অনেক অনেক সুন্দরী। যে কল্যাণের পাশে রমাকে দেখে—অনেকেই দেখেছে—তাঁদের চোখেও কল্যাণের রুচি সম্পর্কে বিতৃষ্ণা রমা কী লক্ষ্য করেনি—ওকি তাদের ভাষা জানে না—ও যে কল্যাণের পাশে মানায় না—এ কথা কী কম লোকের চোখের মধ্যে দেখেছে। কল্যাণ আসতে পারবে না কোনদিন—এলেও দোজবর প্রেমিক হিসেবে কোনদিন রমা শান্তি পাবে না—আর পাঁচজনেও ওদের বেমানান চেহারা নিয়ে হাসাহাসি করবে। ও প্রেতিনী—কিছুকাল হল কবর থেকে উঠে এসেছে। মা ঠিকই বলে, শাকচুন্নি। এখানে রমা প্রবলভাবে কাঁদল। বেশ কিছুটা শব্দ করেই। হাউহাউ করেই কাঁদতে ইচ্ছে করছিল—কিন্তু নিজের রুচি যেন বাধা দেয়। জোর করে রুচি বাধা ভেঙ্গে দেবার চেষ্টা করল—পারল না। নিজের রেজাল্ট মনোমতো না হবার জন্যে, মা'র অবহেলার জন্যে, চাকরিতে যে উন্নতি বা যে পদে ওর অধিকার ছিল তা না হবার জন্যেও কাদতে ছাঁড়ল না, আজ সমস্ত বেদনার পাওনা কান্না রমা মিটিয়ে দেবে। সমস্ত বকেয়া কান্না আজ শেষ করবে। সমস্ত অতীতের ব্যর্থতাকে আজ কান্নার তর্পণ করে যেন শান্ত করতে চায়। একের পর এক প্রথম কিছুক্ষণ নিজের বেদনা আপনা থেকেই মনে আসতে থাকে—তারপর কান্নাকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্যে নিজের ব্যর্থতা ও অপমানকে মনে করতে থাকে। কান্নাকে বন্ধ

করতে ইচ্ছেও নেই, সাহসও নেই—জেদকে বিদায় দেবার মতো মনের জোরও নেই। কান্নায় ঝাপসা হয়ে যাওয়া, মুছে যাওয়া জগৎকে আজ ও ছেড়ে দিতে পারবে না। ঝড়ের পরের নির্মল হয়ে যাওয়া জগতের পরিষ্কার চেহারাকে ওর ভীষণ ভয়। আজকে কল্যাণ ওকে বসিয়ে রাখবার জন্যে কাঁদল, নিজের মেজাজ দেখাবার সময় কল্যাণের আর্তমুখ মনে করে কাঁদল। এইখানে কল্যাণের আর্তমুখ বেদনাতুর মুখকে অনেকক্ষন ধরে রাখল—যাতে ঐ শানিত ছবিটি ওর অন্তরে আরো অনেকক্ষন কান্না ক্ষরণ করতে পারে, কল্যাণের হাত নিজের বুকে রেখে কুমারী জীবনের অপমান করল ভেবে কাঁদল, বাবার ব্যর্থতার জন্যে, অবনের জন্যে, এমনকি মা'র কোন প্রশংসা না করতে পারার জন্যেও কাঁদল। রমা কান্নার ইন্ধন যুগিয়ে চলতে থাকে—কল্যাণের জন্যে মিষ্টি না আনতে যাবার জন্যে, অযথা সোয়েটার গায়ে দেবার জন্যে, কল্যাণকে দিয়ে পনেরো টাকা খরচ করাবার জন্যে, আজ নিজের অসংযত ব্যবহারের জন্যে যে হ্যাংলামো প্রকাশ পেয়েছে সেই জন্যে। রমা যেন সমস্ত কান্না-পাঠ আজই, এখুনিই শেষ করতে চায়। যেন নিজের ব্যবহারের জন্যে, আজকের আচরণের জন্যে পরে আর কোন অনুশোচনা, আত্মগ্লানি, অনুতাপ-কান্না না করতে হয়—এই রকম একটা বৈষয়িক ইচ্ছাও কান্নার শেষ পর্বে দেখা দেয়। যখন বুঝল, কান্নার বেগ চলে যাচ্ছে, কান্নাকে আর ধরে রাখা যাবে না—এইবার কান্না বিদায় নিচ্ছে—তখন রমা যেন যত দুঃখ বেদনা আছে বা থাকবে—কান্নাকে দিয়ে তার আগাম শোধ করে দিচ্ছে। আর যেন কান্নাকে ডাকতে না হয়—নিজের দুঃখের ভান্ডারকে ডেকে রমা যেন এ কথা বলতে চায়। কান্না চলে যাবার আগে সমস্ত বেদনা বঞ্চনাকে তাদের পাওনা মিটিয়ে দিচ্ছে।

এক সময় কান্না থামে। রমার মনে হয়, মানুষের অত্যাচারে প্রকৃতি এমনি ঝড় হয়ে কাঁদে। প্রকৃতির বুক থেকে অবনকে নিয়ে গেলে প্রকৃতি কালবৈশাখী হয়ে বেপরোয়া ভাবে কাঁদে। কতক্ষণ কাঁদলাম কে জানে। একটু হাসি আসে—হায়রে পাগলামি পাগলামি-টাইম ডিস কনটিনিউয়াস—সময় অবিচ্ছিন্ন—এই সময়কে কে না ভয় করে? কিন্তু কান্নার রেশ্‌কে রমা ছেড়ে দিতে রাজি নয়—যে জেদ এসেছিল তাকেও রমা ছাড়বে না। জেদের মেজাজ ও কান্নার বেপরোয়া ভাবও। শুধু কিছুক্ষণ আগের জেদের রেশ ও বেপরোয়া ভাবের রেশটুকু মাত্র রয়েছে। চোখ মুখ ভাল করে ধুয়ে—যখন নিজের ঘরে এসে কাপড় ছাড়ছিল—তখন ভাবছিল : যা খুশি মা ভাবুক গে—কল্যাণ যদি একা এতক্ষণ বসে থাকা অভদ্রতাই মনে করে তবে তাই করুক। আমি কিছু আর গ্রাহ্য করছিনে। কিন্তু রমা এ কথা ভাববার সময় যে কেবল কিছুক্ষণ আগের জেদের ও বেপরোয়া ভাবের নকল করছিল—তা ভেতরে ভেতরে ঝাপসাভাবে অনুভব করলেও স্বীকার করতে কিছুতেই রাজি নয়। হাত, মুখ ভাল করে ধোবার মধ্যে—নাকে মুখে ভাল করে জলের ঝাপটা দেবার মধ্য আর শাড়ি পাল্টাবার মধ্যে যে মাকে বোঝাবার চেষ্টা ছিল—এতক্ষণ বাথরুমেই ছিল—তাও প্রকাশ্যে—নিজের মনে—স্বীকার করতে রমা রাজি নয়। রমা যেন জপ করতে থাকে—আজকে আর কাউকে গ্রাহ্য নয়—মা, কল্যাণ, নিজের ভাগ্য—কাউকে খাতির করব না। নিজেকে প্রতিষ্ঠা করবার সময় এসেছে। অবশ্য এরই মধ্যে বার কয়েক মনে এসেছিল—কল্যাণ বাবাকে

যশ এনে দেবে। কিন্তু কান্নার সময় এই চিন্তাকে কান্নার পক্ষে বিঘ্নকারী বলে তাড়িয়ে দিয়েছিল। এখন, যখন আবার মনে পড়ল, তখন ও পাশ কাটাল। কারণ তাতে মনে আনন্দ ও উৎসাহ এসে—যে বিষণ্ণ জেদ এসেছে তাকে কাবু করে দিতে পারে। যা হয় হবে, পরে ভাবা যাবে। এখুনি কিছু হচ্ছে না। রমার মা ভাবছিলেন লোকটি ভাল নয়। এসেই তাল দিচ্ছে একিসবিশন। কবে ছবি এঁকেছিল—কবে ঘি খেয়েছিলেম—আঙুল শুঁকে দেখ্। হঠাৎ রমাকে এমন ভাবে দৌড়ে যেতে দেখে তিনি আশ্চর্য হন পেট-টেট খারাপ—হঠাৎ কেমন একটা শব্দ যেন কানে এল বমি করছে নাকি? বুকটা ধড়াস করে ওঠে সারাদিন খায়নি—কতগুলো ডালডার লুচি অবেলায়.....এরই মধ্যে আবার নারায়নের নিন্দে। তিনি তক্ষুনি ঠাকুরকে মনে করিয়ে দেন—পাঁচ সিকের ভোগ মানত করেছেন—সঙ্গে সঙ্গে মনে হয় ভোগে তো অবনের সময়ও কম মানত করেননি। বুকটা টিপ টিপ করতে থাকে। কান খাড়া করে রাখেন। না, বমির শব্দ নয়। তবে কী কাঁদছে—যেন কান্নার মতোই মনে হচ্ছে। ঠিক বুঝতে না পেরে তিনি চঞ্চল হয়ে ওঠেন। বাথরুমের দরজার কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করবেন কী না ঠিক করতে পারছেন না। জিজ্ঞেস না করা পর্যন্ত বিশ্বেস নেই। জোর করে বমি করছে নাকি? সারাদিন না খেয়ে পিত্তি পড়ে অম্বল হয়ে এমন বমি হয়। বমিই হয়তো হবে—নইলে অত ছুটে যাবে কেন? রমার মা'র বুক কাঁপতে থাকে—এমনিতে রমার অসুখ বিসুখ করে না—অবনেরই কী করত? যখন করে তখন আর...। তিনি উঠে দাঁড়ান। উদ্বেগে, দুশ্চিন্তায় বুকটা ধড়াস ধড়াস করতে থাকে। হাত, পা কাঁপতে থাকে। স্বামীর অসুখে তিনি অভ্যস্ত। কিন্তু অবন, রমা-ওরা বিপদ বাধালে আর রক্ষে নেই। তাড়াতাড়ি বাথরুমের কাছে এসেই বুঝতে পারলেন—রমা কাঁদছে। কেবল জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিলেন—কিরে রমা—শরীর....। কিন্তু যেই মুহূর্তে বুঝলেন কাঁদছে, সঙ্গে সঙ্গে এক মুহূর্তে এতক্ষণের উদ্বেগের কথা ভুলে তো গেলেনই বরং একটা ক্ষোভ ও অসন্তোষে আবার রান্না ঘরে এসে বসলেন। রমার পাশে ঐ লোকটির চাহনি ভাল লাগেনি। মুহূর্তে তিনি গুম হয়ে যান। বাবার নাম করে দেবে বলে এসে জাঁকিয়ে বসছে। অতগুলো লুচি নষ্ট করে বড়লোকগিরি দেখানো হচ্ছে। এসেই রমার উচ্ছ্বাস—ও মাকে জোর করে নেওয়ার অর্থও তার ভাল লাগল না। একটু আগে রমা ঐ হারামজাদার 'পর একটু আকৃষ্ট হচ্ছে তা অনুমান করে তিনি অখুশি নন বলেই ভেবেছিলেন। ভেবেছিলেন, বাপের দিক থেকে মনোযোগ অন্যত্র যাবে। কিন্তু এবার হাতে হাতে প্রমাণ পেয়ে তিনি গম্ভীর হয়ে যান। তার মনে হল, রমা মাঝে মধ্যে এক একবার এসে লুচি করা দেখে গেছে তখন তিনি ভেবেছিলেন—অত দামী লোকের সঙ্গে কী আর কথা বলবে—তাই, তাড়াতাড়ি খাইয়ে দাইয়ে বিদায় দিতে চাচ্ছে। দেখতে এসেছে, মা'র কতটা হল। তবু, ঠিক বুঝতে পারেন না। তিনি এসে পৌছতে না পৌছাতেই এমন কী ঘটল যার জন্যে মেয়ের ছুটে কাঁদতে যেতে হবে। একা পেয়ে..... সেই জন্যেই। তিনি উঁকি দিয়ে দেখেন কল্যাণ আছে না গেছে। আছেন। ওরে বদমায়েস আমারটা খাবি—আবার আমার ঘরে আমারই দাড়ি উপড়াবি। নানা আশঙ্কা মনে দেখা দেয়। এত অল্প সময়ে এমন কী হ'ল। হয়তো ঐ বদমায়েসের খারাপ খেয়াল না মেটালে চাকরি থেকে ছাড়িয়ে দেবে—এমন কিছু ইঙ্গি

ত করতে পারে। তাই শুনে হয়তো.....। তাঁর নিজেরও এ কথা চিন্তা করে বুক কাঁপতে থাকে। মনে মনে কাঁপতে কাঁপতে কল্যাণকে বলেন—ওরে উল্লুক—নিজে বেথা করে—এখন একটা মেয়ে দুটো পয়সা এনে বাপ-মাকে খাওয়াচ্ছে—তুই তার সর্বনাশ করতে পেছনে লেগেছিস্। কল্যাণ পক্ষাঘাত হয়ে বিছানায় পড়ে থাকুক—এর জন্যে তিনি ঠাকুরকে মানত করতেন—কিন্তু অপরের অকল্যাণ মানত করলে নিজেরই ঘাড়ে ফিরে আসে এ কথা চিন্তা করে তিনি চুপ করে যান। হঠাৎ বিদ্যুৎ ঝলকের মতো মনে হল—তিনিও তো পালিয়ে এসেছিলেন ওর সঙ্গে। সেদিন বাবা মাও মনে ব্যথা পেয়েছিলেন। দুঃখ পেয়েছিলেন। হয়তো বাবা মা'র অভিশাপ তাই ওকে বিছানায় থাকতে হল। যেই হাত দিয়ে ছবি এঁকেছিলেন—সেই ছবির দাম এক কানা কড়িও হলনা। যেই দু'খানা পা নিয়ে তাকে নিয়ে পালিয়ে ছিল—আজ ঘর থেকে সেই পা নিয়ে বের হতেও পারেন না। এবার রমার মা কেমন ভয় পেয়ে যান। বাবা মা'র অভিশাপ—বড় সাংঘাতিক। স্বামী পঙ্গু হয়েছে—অত বড় ছেলেটা গেছে—এখন যদি রমাও তারই মতো পালিয়ে যায়। অফিসে গিয়ে আর না ফেরে। বাবা মা'র অভিশাপ কী আজও শেষ হবে না। রমা পালিয়ে গেলে কী অভিশাপ শেষ হবে। দু'জনে না খেয়ে মরবেন এ কথা ঠিক মনে হলেও, রমা চলে গেলে যেন জীবনের সকল সম্বলই চলে যাবে এই ব্যাকুলতাই তাকে পেয়ে বসল। সজল মনে রমাকে উদ্দেশ করে নির্জীবভাবে বলেন, তুই তো আমার মতো বোকা-ছোকা নস—লেখাপড়া শিখেছিস—তুই কেন এদের খপ্পরে পড়বি। বলেন কিন্তু ভরসা পান না। অর্থহীন ভাবে জড়িয়ে জড়িয়ে নিজেকে দোষ দেন—ঠিক বয়েসে বে না দিলে ছেলেমেয়ে কী ঠিক থাকে। তিনি যেন কাতর হয়ে শক্তিহীন হয়ে মনে মনে রমাকে বলেন, ওরে আমার বাবা-মা'র আবো ছেলে মেয়ে ছিল—টাকা পয়সা সম্পদ সবই ছিল—তুই ছাড়া তো আমার কেউ নেই। যেন অসহায় ভাবে নিজের বাবা-মাকে বলেন, এখনও, এখনও, তোমাদের অভিশাপ শেষ হ'ল না। এরই মধ্যে কেমন যেন রমার মা'র বিশ্বাস হয়ে গেছে—তাঁর ভাঙা কপালে এ রকম একটা কিছু ঘটবেই। কেমন যেন একটা প্রবল আতঙ্কে মন অবশ হয়ে আসে। নিজের অজান্তেই চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ে—জানতেও পারেন না চোখের জল গাল বেয়ে মাটিতে শাড়িতে ফোঁটা ফোঁটা পড়ছে। কিন্তু এরই মধ্যে বাবা বা মা'র চেহারা কিছুতেই মনে আনতে না পারবার একটা চঞ্চলতা ও নিজের অগোচরে ভেতরে ভেতরে তাগাদা দিতে থাকে। বাবা মা'র বদলে অবনকে নিয়ে যাবার সময়টার কথাই মনে আসে। জোর করে সেই ছবি সরিয়ে বাবার চেহারা ও মা'র চেহারা মনে আনতে চেষ্টা করেন কিন্তু আসে না। নিজের অর্ধ-চেতনায় যেন ভাবেন, বাবা-মা-ছেলে মেয়ে সবাই সবাই চলে গেছে। তিনি আজ একা। আর ঐ রোগা মানুষটা কখন থাকে—কখন যায়—কে জানে? তারপর? আর ভাবতে পারেন না—অথচ মন ভাবতে চায় : চকিতে একটা ছবি—সেই ঐ ঘরে যখন তিনি আত্মহত্যা করতে গিয়েছিলেন—সেই মানুষটার কান্না—নিজের কেমন ঘোর—আচ্ছন্নতা। বাথরুমের দরজা খোলবার শব্দ শুনেই তিনি আবার জেগে ওঠেন। দেখলেন, কাঁদছিলেন। চোখের জল মুছলেন। রমা শোবার ঘরে গেল—শাড়ি পালটিয়ে—ঘরোয়াভাবে যখন আবার

বসবার ঘরে গেল। তখন রমার আটপৌর পোশাক তাকে যেন অনেক আশ্বস্ত করে—ভরসা দেয়। তিনি যেন আবার কিছুটা শক্তি ফিরে পান।

রমা যখন কল্যাণের কাছে এল—একটা পাটভাঙা তাতের শাড়ি পরে—মুখে একটু ভেজলিন, ব্লাউজও পাল্টেছিল—তবে শাড়িটি বেশ ঢেকেঢুকে সাধারন ভাবে পরা বলে ব্লাউজ দেখা যাচ্ছিল না। এবার রমার শীত শীত করছিল—কিন্তু ঐ অলুক্ষনে সোয়েটার আর নয়—একটা শাল অক্ষত ছিল—কিন্তু গরম কিছু পরতে ভয় হচ্ছিল—যদি আবার ঝগড়া বেধে যায়। তাছাড়া, চোখে মুখে ঠান্ডা জল দেবার জন্যে, না ভিজে বাথরুমে এতক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদবার জন্যে, না রাত বেড়ে যাবার ফলে শীত সত্যি পড়বার জন্যে—কেন শীত করছিল—ভেতরকার আবেগ—না বাইরের ঋতুর প্ররোচনা—ঠিক বুঝতে না পেরে রমা সাহস করে শীতের কিছু পরতে পারল না। তাছাড়া আরও একটা উৎকণ্ঠাও ছিল—না জানি কতক্ষণ কেঁদেছে, কতক্ষণ কল্যাণ একা বসে রয়েছে। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখল, দশ-পনেরো মিনিট মাত্র। এবার রমার খেয়াল হ'ল—যতই আত্মভোলা কান্নায় ডুবে থাকুক যেন ভিতরে ভিতরে কল্যাণের একা বসে থাকবার একটা অন্ধ ও অদৃশ্য ইচ্ছা ওকে সব সময় ধাক্কা দিয়েছে। এবার, বেশি সময় হয়নি দেখে, সেই সম্পর্কে সচেতন হল। ঠিক করতে পারল না—কান্নার পক্ষে সময়টা লম্বা হয়েছে, না, কম হয়েছে। যাই হোক, শাড়িকে শালের বদলে ব্যবহার করে বেশ করে নিজেকে জড়িয়ে বসল।

—যেন পুজোয় চলেছ। কল্যাণ কণ্ঠকে ইচ্ছে করে মৃদু ও উদাস করে।

রমা একটু হাসল। কল্যাণের প্রশংসার যেন স্বীকৃতি এই হাসিটি। নিজে সচেতন হবার আগেই এই ক্ষমা ও আনন্দের প্রশ্রয় ও প্রসন্নর হাসিটি স্নিগ্ধ ভাবে আত্মপ্রকাশ করল।

রমার এই পরিচ্ছন্ন ও পরিপাটি ঘরোয়া চেহারা কল্যাণের যে খারাপ লাগছিল তা নয়—কিন্তু কেমন যেন বয়স্ক বয়স্ক মনে হচ্ছে। যেন ওর মা'র মতো রমার এই চেহারায় এক ধরনের বিধবা বিধবা ভাব আছে। যেন অল্প বয়সে বিধবা হযে শোক-তাপ পেয়ে একটু গম্ভীর হয়ে গেছে। যেন ধম্ম কম্ম করে—যেন কোন গুরুদেব আছে—তাঁর কাছে দীক্ষা নিয়েছে। এই চেহারায় সত্যিই একটা পবিত্রতা আছে যা বেশি বয়সে ভালো মানায়। অফিসের পোশাকে যেন ওর বয়েসটা চুরি করিয়ে কমিয়ে দেয়—ঘরের পোশাক ওর বয়েস বাড়িয়ে দেয়। ঠিক রীনার উল্টোটি। রীনার স্কুলে যাবার পোশাকে মাঝে মাঝে গম্ভীর হয়—তখন ওকে মনে হয়, যেন বয়েস হয়েছে কিন্তু সেই তুলনায় চেহারা কচি আছে। কিন্তু ফ্ল্যাটে যখন রঙিন শাড়ি পরে কাজকর্ম করে—তখন বয়সের তুলনায় ওকে খুব অল্প বয়েসী মনে হয়—মনে হয়, কুড়ি পার হবার অনেক আগেই সিঁথিতে সিঁদুর উঠেছে। একদিন রীনাকে সেই কথা কল্যাণ বললও। রীনা জিজ্ঞেস করে প্রসন্ন মুখে—তাহলে কোনো পোশাকেই আমাকে মানায় না বলো? কল্যাণ মাথা নাড়ে—না, কোন পোশাকেই তোমাকে মানায় না। যখন কোন কিছু তোমার দেহে থাকে না—তখনই, একমাত্র তখনই, ঠিক মানায়। রীনা এসে কল্যাণের কান ধরে—ওই চেহারা দেখতে খুব সাধ। কল্যাণ মাথা নেড়ে সায় দেয়। মনে মনে ভাবল রীনাকে বাড়িতে

ঘরোয়া চেহারায় কচি মনে হয়, মনে হয় বালিকা বধূ—আর রমাকে বাড়িতে আটপৌরে শাড়িতে মনে হয়— বাল-বিধবা। তবে সেই বাল্যকাল অনেক আগে কেটে গেছে। স্বামীকে ভালো মনে নেই। এখন যেন যৌবনের মধ্যপ্রান্তে এসে অনেকটা স্থির, গম্ভীর হয়ে গেছে। সঙ্গে সঙ্গে নিজের অনিচ্ছাসত্ত্বেও মনে এল, কোনো প্রণয়ী—কোনো প্রেম-পত্র কী পায়নি—এতটা বয়েসে—এও কী সম্ভব একটা মেয়ের পক্ষে। স্কুল জীবনের শেষ থেকেই তো মেয়েদের ভালবাসার দীক্ষা আরম্ভ হয়ে যায়। প্রথম প্রাইভেট টিউটারের সঙ্গে—তারপর, দাদার বন্ধু, পাড়ার সহৃদয় দাদা, কলেজে সহপাঠী—বা সহপাঠিনীর কোনো দাদার সঙ্গে—এমনি করে ভালবাসতে-বাসতে যখন বাবা পাত্রস্থ করে দেয়—তখন স্বামী এত স্বাভাবিক মনে হয়—ভালবাসা এত জল-ভাত হয়ে যায় স্বামীর প্রনয় আলাপ নির্বিঘ্নে শোনে, নিরুদ্বেগে স্বামীর হাতে ধরা দেয়। স্বামী যখন কাছে টানে—তখন কাছে টানবার এত স্মৃতি এসে জড়ো হয়—স্বামীই ঝাপসা হয়ে যায়। হয় যন্ত্র-চালিতের মতো কাছে আসে—নয়তো আগেকার ব্যবহারের নকল করে নকল করবার ইচ্ছে না থাকা সত্ত্বেও। একদিন রীনাকে এ কথা বলতে—এত খেপে গিয়েছিল—দেখবার মতো। বলেছিল, আমাদের পরিবারের একটা কালচার আছে—ভাল বলো আর মন্দই বলো। আমরা যার-তার সঙ্গে মিশতে ঘৃণা বোধ করি। আমরা জানি, আমাদের যোগ্য খুব কমই আছে। আর বাবা যাকে যোগ্য মনে করেন না—তার সঙ্গে কথা বলতেও আমাদের ইচ্ছে হয় না—রুচি হয় না। কল্যাণ আবার চিন্তার মোড় ফেরাল। রমাকে বলবে, কোনো পোশাকেই তোমাকে ঠিক মানায় না। শুধু যখন পোশাক থাকবে না—। যদি বলে, তা হলে আকৃষ্ট হয়েছিলে কী দেখে? কী বলব? বলব কিছু না দেখে। অন্ধ ভালবাসার জন্যে কিছু কী দেখবার উপায় আছে। যখন ভালবাসবার মেয়েটির কোনো পোশাক থাকে না—তখনই পুরুষের চোখ ফোটে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে কল্যাণের কেমন ভয়ও হয়। এর কোন তীক্ষ্ণ উত্তর না দেয় রমা। ও যেন রীনার মতো মুগ্ধ শ্রোতা নয়—ও যেন কথা বলবার প্রতিদ্বন্দ্বী। সানন্দে নিরাপদে কথা বানানোর যে অভ্যাস কল্যাণের এতদিন ধরে ছিল—সেই কথা বানাবার চর্চায় প্রতি মুহূর্তে একটি বিঘ্নের ভয়, ভুল হবার ভয় আসবার আতংক কল্যাণকে কেমন অস্বাচ্ছন্দ্য এনে দেয়—যে অস্বাচ্ছন্দও রমাকে কাছে পাবার ও অনুভব করবার পথে পদে পদে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে। তবু রমার এখন কার নীরব স্নিগ্ধ হাসি—সহজ আনন্দের হাসি ওকে আবার চাঙ্গা করে তোলে। ওর মনে হয়, সহজে যেন রমা হাসতে ভয় পায়, আরামে হাসতে জানে না। নিজের দিকে না তাকিয়ে আনন্দময়ী হয়ে উঠতে পারে না, যেন নিজের অতীতের সুখ দুঃখের সমস্ত দেনা পাওয়া শেষ করে হাসবার টাইম টেবিল খুঁজবে। যদি হাসি ও আনন্দের কথাও ওঠে—তবু তা যেন অফ পিরিয়ডের জন্যে রাখবে। টিফিনের জন্যে মুলতুবি থাকবে।

কল্যাণের মনে হল আরও যদি চুপ থাকি—এ হয়তো চুপ থাকবার প্রতিযোগিতা শুরু করে দেবে। কথা বললে প্রতিযোগিতা, তাকালে তাকাবার প্রতিদ্বন্দ্বিতা—চুপ থাকলে মৌন হবার ম্যারাথন রেস। এ সব মেয়ে অলিম্পিকে না গিয়ে কেন যে তাঁতের শাড়ি পরে ঘরে আর স্লিভলেস ব্লাউজ পরে অফিসে যায়—বলা শক্ত।

জান রমা, পুজো বা পবিত্র কিছুর 'পর আমার ভয় আছে। পবিত্র হচ্ছে দেবতার জন্যে, মানুষের জন্যে নয়। কেউ পবিত্র হয়ে দেবতার পুজো দিতে যায়—তখন মনে হয়, আমার লোক দেবতা ছিনিয়ে নিল। যখন প্রণাম করে, পুজো করে ফিরে আসে—তখন দেবতার প্রসাদ বলে তাকে মনে হয়—দেবতার উচ্ছিষ্ট মাথা পেতে নিতে কেমন রুচি হয় না। রমা হাসল—তাঁতের শাড়ির বিজ্ঞাপন কিন্তু হয়ে যাচ্ছে। যা গরদের শাড়ির পাওনা—তুমি তাঁতের শাড়িকে সেই মর্যাদা দিচ্ছ।

গরদের শাড়ি পরে যারা পবিত্র হন—তাঁদের পবিত্র হবার বয়েস হয়েছে—তাদের 'পর দেবতার লোভ থাকতে পারে—মানুষের তাতে আক্ষেপ নেই। তাঁতের শাড়ী যদি গরদের প্রক্সি দেয়—তবে নিজের প্রাপ্য না পেলে সিজার আপত্তি করবেই।—সিজার কী চায়?

কল্যাণের মনে হল, রমা যেন অন্যমনস্ক। কল্যাণের কথা যেন ওর মনের বাইরের দরজায় 'নক' করছে—একটা মামুলি উত্তর আসছে—কিন্তু ভেতর থেকে সাগ্রহে কেউ যেন সাড়া দিয়ে দরজা খুলে দেবার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে না। কল্যাণ যেন একটু অবহেলা বোধ করে। ওর কথায় রমার মনে যে আনন্দ ও চাঞ্চল্য দেখা দেবে আশা করেছিল তা না পেয়ে যেন একটু ক্ষুণ্ণ হয়ে যায়। দীর্ঘনিঃশ্বাস চেপে রাখে—রীনা এমন করে ওর কথাকে উদাসীন ভাবে অগ্রাহ্য করতে পারত না। এর চেয়ে কথার প্রতিযোগিতায় টেনসন থাকলেও—জীবন আছে—একটা সূক্ষ্ম উন্মাদনাও আছে। কথার প্রতিযোগিতায় প্রেমের চর্চা বেশি হয়—তবু, এর চেয়ে.....—পোপের জন্যে তাঁতের শাড়ি হলে সিজারের দুঃখ নেই—আর সিজারের জন্যে ঢাকাই মসলিন—যা পরলে পরেছে কিনা বোঝে কার সাধ্য। জ্ঞানবৃক্ষের ফল খাবার পর 'ইভ' ও প্রথমে ঢাকাই মসলিন পরেছিল—অনিচ্ছুক ব্রহ্মবাদিনী যদি তাই পরে -তবে সিজার আশ্বস্ত হয়। মানুষের বিবর্তনের প্রথম স্তরে ঢাকাই মসলিন—শেষ স্তরে—যখন মানুষ দেবতা হতে চাইছে—তখন তাঁতের শাড়ি।

—সিজার যদি খুশি হয়, তবে মসলিনই পরব—কিন্তু কোথায় পাব? কোন এম্পোরিয়ামে?—তুমি তো দর্শন পড়েছ—আমার চেয়ে ভালই জানো। জগৎটা মায়া—জগৎ যেমনকে তেমনই থাকছে—শুধু তোমার মনে জগতকে মায়া মনে হবে। অর্থাৎ মায়াবোধটাই আসল। তুমি কিছু না পরেও যদি মনে কর—ঢাকাই মসলিন পরেছ—তবে শঙ্কর থেকে সিজার সবাই খুশি। বস্ত্রের নির্বানে বুদ্ধও অখুশি হবে না। আর দেশের কল্যাণ তোমার হাতের মুঠোয়।

—কী হচ্ছে তখন থেকে?

একেবারে মনস্তত্ত্বের গোড়ার কথা। সেই পয়লা নম্বরের ইচ্ছেকে কেবল বড় বড় কথার পোশাক পরানো হচ্ছে—উদ্দেশ্য, তোমার পোশাকও লোকে......। দেখ, শুভ রাত্রিতে বর কনে অত পোশাক পরে—কিন্তু শেষ পর্যন্ত....। অথচ ঐ শেষ পর্যন্তটুকুর জন্যে তা শুভ রাত্রি। আসলে পোশাক-পরিচ্ছদ সাজসজ্জার মূল ফিলজফি হচ্ছে এইগুলোর অপ্রয়োজনীয়তা জানানোর জন্যে আবেদন।

রমা কষ্ট করে কল্যাণের কথা শুনছিল। কথাগুলোর ব্যঞ্জনা বুঝতে পারছিল—

ভালও লাগছিল না, খারাপও লাগছিল না। কথাগুলো ওকে আকর্ষণ করছিল না। মনে হচ্ছিল, অযথা—মনে হচ্ছিল, যেন বহুবার মাইকে শুনবার পর ঐ গানটা শুধু যে একঘেয়ে কষ্টকর মনে হয় তাই নয়, গানটি যে পীড়া দেবার প্রতীক হয়ে ওঠে শুধু তাই নয়, যেন গানটাই অ্যালার্জি হয়ে যায়। কল্যাণের এই উদ্যম, এই কথার চমক ওকে কেমন যেন পীড়িত করছিল। যেন এই মুহূর্ত একটু সরস, একটু আপন, একটু পার্সোনাল কী কল্যাণ হতে পারে না? ওর এতক্ষণকার ঝড়বৃষ্টির মতো ভেজা মন যেন সরস হয়ে নরম কিছু চায়। নিজের মনের এতক্ষণকার প্রবল অনুভূতির প্রবলতার ফলে মন যেন কল্যাণের কাছ থেকেও অনুভূতি চায়—একটু সহানুভূতি, একটু নিবিড়তা, একটু একান্ত হয়ে ওঠা। ওর মনের সুরের সঙ্গে কল্যাণের কথার যেন মিল হচ্ছে না। ওর মনে হয়, পুত্রশোকে যে কাতর—তাকে যেন বাজারের চড়াদাম নিয়ে আলোচনা করে অন্যমনস্ক করে দেবার একটু নিষ্ঠুর অথচ ব্যর্থ প্রচেষ্টা। কল্যাণের কথার চুম্বক যেন ওর কাছে ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে। ও যেন মধ্যাকর্ষণে আকৃষ্ট হতে না পারা কোন জীব। পাখি যেমন মাধ্যাকর্ষণে ধরা না দিয়ে ফুরফুর করে হালকাভাবে এড়িয়ে যায়—ও যেন আজ তেমনি কল্যাণের মূল আকর্ষণকে উপেক্ষা করতে পারে না যদিও, তবু, এই মুহূর্তের স্থানীয় আকর্ষণকে অনায়াসে ডানা মেলে নিজের অনিচ্ছা সত্ত্বেও উপেক্ষা করতে বাধ্য হচ্ছে। তা ছাড়া, এই মুহূর্তে এই বিশেষ মুহূর্তের একটা আকর্ষণের চাহিদা ওর ছিল—এই মুহূর্তে যখন কল্যাণের কাছে আকৃষ্ট হয়ে তন্ময় হয়ে মিশে যেতে চেয়েছিল—একাত্ম হতে চেয়েছিল—ওর এই মোহ ও আবেশমাখা মুহূর্তে কল্যাণের বুকে মিশে গিয়ে ওর মাধ্যাকর্ষণে বিলীন হতে চেয়েছিল—তখন, কল্যাণ যেন সময়ের এই স্থানীয় রূপে নিজেকে প্রকাশ করতে পারল না। কল্যাণের এত কাছে এসেও—মাত্র একটা টেবিলের দূরত্বে এসেও—অনেক দূরে রইল। যেন রিসেপশন রুমের সঙ্গে কল্যাণের ডিপার্টমেন্টের। ঠিক এমনি ভাষায় স্পষ্ট করে রমা ভাবল না—তবে উপমার ছবিগুলো ওর মনে একে একে উঁকি দিয়ে যেতে লাগল। কল্যাণ যদি ওর অনুভূতিটি এত কথায় প্রকাশ না করত—অত সাজসজ্জা করে প্রকাশ না করত—তবে তাও হয়তো রমাকে এক রকম অনুভূতি দিয়ে স্পর্শ করতে পারত। কিন্তু এত কসমেটিকস্ দেওয়া ইচ্ছেকে কল্যাণ যে ভাবে প্রকাশ্যে পর করল তাতে কেমন সন্দেহ হয়—কল্যাণ কী নিজের অনুভূতি প্রকাশ করছে—না, এই কথায় রমা কেমন ধরা পড়ে—কেমন রিএ্যাক্ট করে তাই দেখতে চাচ্ছে—রমা দুর্লভ, না, আজকে অত্যন্ত সুলভ হয়ে উঠেছে দেখতে চাচ্ছে। রমা তাড়াতাড়ি চিন্তার গতি পাল্টাতে চায়। আর কিছু ভাবলে, মনের রেশ কেটে যাবে, কল্যাণ দূরে যাবে—এতক্ষণকার ঝড়ের পর নির্মল আকাশে আবার মেঘ জমতে শুরু করবে—যদি সে মেঘ স্থায়ী হয়ে ওঠে আবার—সমস্ত আকাশকে ভারাক্রান্ত করে রেখে দেয়—যদি ঝড় না আসে, যদি বৃষ্টি না হয়—অথচ মেঘে আকাশ অপরিচ্ছন্ন হয়ে থাকে। আজ, অনেক কাল পর মেঘগুলো ওর মন থেকে উড়ে গেছে। কিন্তু আবার স্থায়ী ও পাকাপাকিভাবে মেঘকে আকাশের বাসিন্দা করতে দিতে এখন রমা নারাজ। রমার ইচ্ছে হল নিজেই অন্য প্রসঙ্গ শুরু করে। বাবার এক্সিবিশনের বিষয়? না তা হয় না। ভাববে, আজকের এই মুহূর্তের এমন আবেগমাখা মুহূর্তের সুযোগ নিয়ে বাবার

কাজ বাগিয়ে নিচ্ছে। যাক্। রোববারের কোথাও যাবার কথা—সেই প্রগ্রাম? জিজ্ঞেস করব? ভাববে হয়তো .... হয়তো .... আজকের এই এতক্ষণকার কথার রেশ্ ওকে ভিতরে ভিতরে তাগাদা দিচ্ছে কল্যাণের কাছে একা সারাদিন থাকবার জন্যে। না, নিজেকে সস্তা, সুলভ কর হয়। থাক্। কথা বলতেও ইচ্ছে করছে না—অথচ কল্যাণের ঐ কথাগুলো শোনাও ঠিক নয়—যেন চুপ করে থাকলে সায় দেওয়া হয়, প্রশ্রয় দেওয়া হয়। এদিকে ঠিক কথা বলতেও ভালো লাগছে না। তবু চিরকাল নিজের ভাল লাগা মন্দ লাগাকে অগ্রাহ্য করতে, অস্বীকার করতেই রমা অভ্যস্ত। আজই যেন হঠাৎ নিজের ভালো মন্দ লাগা ওকে কেমন অবশ করে দিয়েছিল। তাই কথা বলতে ইচ্ছে না থাকলেও বলতে হবে। ভেতর থেকে চুপ করে থাকবার ইচ্ছেটা আসন্ন অস্বীকৃতির জন্যে যেন অপেক্ষা করছে। ভাবল বলি, এখন এই সময় কী করো? হয়ত স্ত্রীর সঙ্গে গল্প করে বা মার্কেটিং-এ বেরোয় তা কি বলবে? হয়তো মিথ্যে একটা কিছু বলবে? বলবে, তোমার কথা ভাবি। খামকা মিথ্যে কথা শুনে হয়তো বিশ্বাস করব। এই মুহূর্তে অপ্রিয় সত্য আর প্রিয় মিথ্যে কিছুই ভালো লাগছে না। কিছুই ভালো লাগছে না—কল্যাণের কথাও ভালো লাগছে না—এও তো বলা যাবে না। ক্ষুন্ন হবে। ও ক্ষুন্ন হলে আমারও মন খারাপ হবে। আর মন খারাপ করতেও ইচ্ছে হয় না।

এবার রমা যেন সামনে কেউ নেই এমনি ভাবে একা একা বলল—আজকের বিকেল—সন্ধ্যা—রাত যেন জীবনের সকাল—বিকেল—সন্ধ্যা—রাতকে ছাপিয়ে অনেক উঁচুতে উঠে গেল। সব সময় চোখে পড়বে। কল্যাণ চিন্তা করতে করতে বলল—ঠিক মনুমেন্টের মতো নয়—নিছক বিচ্ছিন্ন স্মৃতিস্তম্ভের মতো নয়—আজকের বিকেল থেকে রাত—তোমার আমার মনের স্থায়ী যোগের সেতু—হাওড়ার ব্রিজ। স্মরণীয় কিন্তু প্রতি মুহূর্তের বন্ধনে প্রয়োজনীয়। জলস্তম্ভের ছবিটি মনে আসছিল—তা যত বিশালই হোক ক্ষণস্থায়ী। কিন্তু আমাদের অতীত আর ভবিষ্যতের সঙ্গে স্থায়ী বন্ধন এই হাওড়ার ব্রিজ।

কল্যাণ বুঝল, ওর এতক্ষণকার ইঙ্গিত নিছক সুন্দর করে বলা রসিকতা ছাড়া কিছু নয়। কিন্তু প্রসঙ্গ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে যেন একটা সূক্ষ্ম অশ্বস্তিকর তাপ ওর চেতনায় উষ্ণ হয়ে দেখা দেয়। ওর রসিকতাকে রমা লঘুভাবে নিয়ে কৃত্রিম রাগ দেখালেই যেন ওকে মূল্য দেওয়া হত। কিন্তু ওর অন্য কথায় পালিয়ে যাবার মধ্যে কল্যাণের যে চেহারা প্রকাশ পাচ্ছে তাতে কল্যাণ যেন একটু অপমান বোধ না করে পারল না। ও যেন প্রসঙ্গ পরিবর্তন বোঝেনি এ কথা বোঝাবার জন্যে রমার কথার সুরে সুর মেলাল। ও যে আজকার কথার মোহে আবিষ্ট নয়—এ কথা জানাবার জন্যে রমার মুড যে ওর মুড এ কথাও বোঝান। সঙ্গে সঙ্গে মনে হল, এবার ওঠা দরকার। কিন্তু তক্ষুনি এও মনে হল, হয়তো রমা মনে করল, প্রসঙ্গ পরিবর্তন করা মাত্র কল্যাণ বিরস হয়ে গেল। এখন যেতে চাচ্ছে। কল্যাণের ইচ্ছে হল, নিজের ঘড়ি দেখে—বা, ঐ অ্যালার্ম ঘড়িটার দিকে তাকায়। সাহস হয় না।

রমা, এখনও কিন্তু আজকের বিকেল সন্ধ্যা রাতের স্টক টেকিং এর সময় আসেনি—সময় যেন না আসে। আত্মসমালোচনা একটা রোগ—নিজেকে সমাজের

মনোমতো গড়ে তোলবার ইচ্ছার ইনফেকশনে এই রোগের জন্ম। রোগটা দামী। নিজের আচরণের অডিটিং বছরে একবার করে করাও বড্ড বৈষয়িক মনের লক্ষ্মণ—এতে নিখুঁত হবার ঝোঁক থাকে। তাতে ভালবাসবার ইচ্ছেটা বড্ড মার খায়। তাছাড়া নিজেকে কেবল অপরের পছন্দ মতো গড়ে তুলতে গেলে হয়তো একদিন প্রশংসনীয় হওয়া যায়—কিন্তু তাতে স্বধর্ম নষ্ট হয়—স্বাদ চলে যায়। আত্মসমালোচনা মানুষকে বর্বরতার হাত থেকে রক্ষা করে বারোয়ারী করে তোলে।

রমা যেন এক দৃষ্টিতে কল্যাণের দিকে তাকিয়ে থাকে। কী যেন বুঝতে চাচ্ছে ওর কথা থেকে। একটু চুপ থেকে কল্যাণ আবার বলে, আত্মসমালোচনা করে নিখুঁত হয়ে মানুষ একদিন মহৎ হয়। এই মহৎ লোকদের দেখবে কী অসন্তোষ। আর সকলে তাদের মতো হয়নি বলে কী আফসোস। আর আফসোসের ভেতরের অর্থ তো বুঝতেই পারছ—অর্থাৎ আমি মহৎ হয়ে ঠকে গেলাম আর সকলে প্রবৃত্তির বশে আরামে চলছে—এই ঈর্ষাই তাদের ক্রোধের কারণ। অথচ আত্মসমালোচনার ফলে এ কথা যে তারা বুঝতে পারেন না—তা নয়—বুঝতে পারেন বলেই নিজের ও অপরের 'পর ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন। আর অপরে তাদের মতো হয়নি—এই ঈর্ষা একদিন আত্মপ্রতারণায় দাঁড়ায়। এই আত্মপ্রতারণা চেতনায় ধরাও পড়ে—কিন্তু নামী লোকের পোষা গুন্ডার মতো গ্রেপ্তার হলেও ছাড়া পেয়ে যায়। আমরা পরের নয়—নিজের মানদণ্ডে চলব। তুমি তোমার—আমি আমার। আর দু'জন যখন একই ভালবাসার প্রসঙ্গে ও প্রাঙ্গণে ধরা পড়েছি—তখন ভালবাসাই হচ্ছে আমাদের ফ্রেম অব রেফারেন্স। ভালবাসাই আমাদের আচরণ কী হবে জানিয়ে দেবে। আমাদের আচরণের সুপ্রিম কোর্ট ভালবাসা। এই হচ্ছে আপেক্ষিক তত্ত্বের কথা।

—শোন, যে জীবনের শুরু থেকে নিজের ও আর সকলের বেদনা বোঝে—মনে রেখ, এই বোঝবার শক্তি আসে বঞ্চনার আর অবহেলার মধ্য থেকে। অবহেলা, অনাদর, বঞ্চনা মনের কল্পনা আর ব্যথা বোঝবার শক্তি বেশ বাড়িয়ে দেয়। তার ফলে, অপরের ব্যথা বোঝবার ফলে, আদর নয় আপনজনের প্রসন্নতা লাভের কাঙালপনায়, প্রশ্রয় নয় একটু স্নিগ্ধ হাসি পাবার জন্যে, নিজেকে জাহির করবার জন্যে নয় নিজে যে আছে এ কথা বোঝবার জন্যে—অপরের মনে একটু ঠাঁই পাবার জন্যে—সে অপরের, হয়তো আপন জনেরও মন জুগিয়ে চলে—অপরের মতো হয়ে একটু প্রশংসা, একটু আত্মবিশ্বাস, একটু স্নেহ চায়। হয়তো তুমি বুঝেছ আমি আমার কথাই বলছি। আমার কথা তো বটেই—তবে অনেকের কথাই। তবু জেনো, এরা যদি মহৎও হয়, পরোপকারীও হয়, আত্মত্যাগও করে—তবু, আপন হয় না—যা হবার জন্যে সারাজীবন ধরে এরা চেষ্টা করে। তাই এদের মন এমন হয়—একটু মনোযোগ পেলে এরা ভাবে অনেক বেশি পেলাম। ছেলেবেলায় পরীক্ষার সময় মা টিফিন দিলে আমি মনে করতাম—আমি টিফিন খাবার যোগ্য নই—যদি পরীক্ষা ভালো না দিই তবে টিফিন খাবার জন্যে আমাকে অনুতাপ করতে হবে। একটু ফর্মাল স্নেহ—এমনকী একটু প্রশংসা পেয়েও এঁরা ভাবে, এত পেলাম—এর যোগ্য আমি নই। আর শেষে একদিন—কারো আপন না হতে পেরে—এরা সকলের পর হয়ে যায়। আপন হওয়াকেই অবিশ্বাস করে। আর সাময়িক

প্রবৃত্তির আত্মপ্রকাশ আর ভালবাসার পার্থক্য নিয়ে এদের মনে দ্বিধা ঘোচে না। অনাদর অবহেলা ক্রিমিন্যাল ও মহৎ দুইয়েরই জন্ম দেয়। যে নিজেকে হত্যা করে সে মহৎ—আর অপরকে খুন করে সেই ক্রিমিন্যাল। আর দু'জনকেই যে খুন করে সে বুদ্ধিমান। যাকগে, তোমার আর আমার ফ্রেম অব রেফারেন্স এক নয়—আমার মনের গড়ন আর তোমার মনের গড়ন এক নয়—আমার আচরণের বিচার—তোমার আচরণের বিচার ভালবাসার মানদণ্ডে হতে পারে না। আমার আচরণের বিচার করবে—আমার মনের গড়ন দিয়ে—তোমার আচরণে তোমার মন। আর ভালবাসা এক্ষেত্রে স্টিমুল্যাস।

—রমা তুমি রীতিমতো সিরিয়াস।

—হবে। তবে আজকের নিজের কথা একটু বেশি বলছি—কথা দিচ্ছি, এর জন্যে অনুতাপ আমার কপালে ঝুলছে—ডিমোক্লিসের তরবারীর মতো। তবু তোমাকেই জীবনে প্রথম বললাম। এমন করে নিজেকে ধরা দেবার খেয়াল চেপেছে। তোমার কাছে নিজেকে কেবল ধরিয়ে দিচ্ছি, ফাঁস করে দিচ্ছি—নিজেকে ধরিয়ে দেবার, ফাঁস করে দেবার, নিজেকে দেউলে করে দেবার, ফতুর করে দেবার নেশা বোধ হয় মদের নেশার মতোই সর্বনেশে। আর নিজেকে এ ভাবে গ্রেপ্তার করে তোমার হাঁতে সপে দেওয়াই হচ্ছে তোমার ভালবাসার স্টিমুল্যাসের রিঅ্যাকশন। তোমাকে শুনতে হ'ল আমার কথা। না শুনিয়ে আমার উপায় ছিল না। শোনবার সময় তোমার মনের অবস্থা কল্পনা করতে সাহস পাচ্ছিনে। তাছাড়া, সিরিয়াস যদি হই—তাই মেনে নাও—যা মনে আসে—আসতে দাও। জোর করে হাল্কা হাসি এনে লাভ নেই, হাসতে যদি নাই পারি—হাসব না। কান্নাই যদি আসে—এসেছেও—লুকিয়ে রাখব না। একদিন—একটা বিকেলে আধখানা সন্ধেয় নিজেকে খরচ করতে দাও। নিজেকে যতটা পারি ব্যয় করে ফেলি। না হয়, অনেক রাতে যদি অডিটিংও হয়, কাঁদব, অনুতাপ করব। কিন্তু এখন তোমার হাতে আমি বন্দী—এ টুকুই আমাকে প্রানভরে অনুভব করতে দাও। কল্যাণ যেন কেমন তন্ময় হয়ে রমার দিকে তাকিয়ে ওর উচ্ছ্বসিত আবেগকে প্রাণভরে অনুভব করে। অস্ফুটভাবে বলে, ক্যাপটিভ লেডী।

রমার আন্তরিক আবেগের কাছে নিজের কথা ও অনুভূতিকে কল্যাণের যেমন জোলো ও তেমনি মামুলি ও পোশাকি লাগে। মনে হয়, ভালবাসাবাসির যে একটা প্রথা আছে, যে কনভেনশন রয়েছে কী রকম নিয়মছাড়া ব্যবহারের মধ্যে—কল্যাণ যেন চোখ বুজে সেই ভালবাসার নিয়ম রক্ষা করছে। ভালবাসা দেওয়া নেওয়ার মধ্যে যেমন ধরনের কথা বলা সাহিত্যে, সিনেমায় আছে—কল্যাণ যেন সেই নিয়ম সূক্ষ্ম ও মার্জিত ভাবে মেনে চলছে। কিন্তু সেই নিয়ম-কনভেনশন রমার মধ্যে নেই তা নয়—কিন্তু রমার খাপছাড়া ব্যবহারের মধ্যে, ওর প্রবল অথচ দৃঢ় আবেগের মধ্যে, ওর আন্তরিক ও জীবনের স্পন্দনে উজ্জ্বল বিশ্লেষনের মধ্যে এমন একটা প্রাণ আছে যা কল্যাণ ঠিক প্রকাশ করতে পারল না। নিজেকে কেমন ম্লান লাগে, কেমন যেন ছোট হয়ে যায়। আবছা আবছা ভাবে কল্যাণ যেন কিছু অন্যমনস্ক হয়ে ভাবে, ভালো করে কথা বলবার চেষ্টায়—আমার ভালোবাসাকে ঠিকমতো প্রকাশ করতে পারলাম না। যা অনুভব করি, আর যা বলি—তা যেন এক হতে পারল না। তাই আমার কথা সুন্দর প্রতিমা—মাত্র—

জীবন্ত সত্য নয়। উপমাটি মনে আসা মাত্র—তা বলবার জন্যে একটা উৎকণ্ঠা বোধ করেই কল্যাণ নিজের পর বিরক্ত হয়। আবার উপমা! যদিও ওর তপ্ত আবেগ, ওর আত্মসমর্পণ সবই কল্যাণকে এক ধরনের তৃপ্তি এনে দেয়। তবু একটু পরাজয়—একটা ছোট হবার দীনতা কোথায় যেন অনুভব করে। মনে হয়, রমার কথাবার্তা আচরণের মধ্যে কোথায় যেন একটা গর্ব রয়েছে, একটা দর্প রয়েছে—যেন একটা অহংকার—শিক্ষাদীক্ষা চিন্তা ভাবনা সব কিছুতে কল্যাণকে হারিয়ে দিয়েও যে শ্রেষ্ঠ এ কথা যেন প্রচ্ছন্নভাবে ওর মধ্য দিয়ে প্রকাশ হয়ে যায়। যেন এত শিক্ষা দীক্ষা সূক্ষ্ম ও পরিচ্ছন্ন চিন্তা ভাবনা সত্ত্বেও ওর ভাগ্য খারাপ। বাড়িতে আদর পায়নি—আর নিজের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করে কল্যাণের ভালবাসায় নিরুপায় হয়ে বন্দী। ক্যাপটিভ লেডী। নিজের অপ্রসন্ন ভাগ্যকে—নিজের ভাগ্যের কার্পণ্যকে যেন কিছুতেই ভুলতে পারে না। নিজের সংসার ওর মনোমতো নয়—কল্যাণকে বাধ্য হয়ে ভালবাসে—বেসে কিন্তু সুখী নয়। একটা অসাচ্ছন্দ্য কল্যাণকে বিরস করে দেয়। ওর হাতে রমা বন্দী—এ কথায় আনন্দ বোধ করতে পারে না। একটা অপমানের জ্বালা ওকে গ্রাস করতে চাইলেও—কল্যাণ মনের বিরসতাকেই ধরে রাখে। অপমানবোধকে ঢুকতে দেয় না। যদিও অভ্যাসমতো বাইরের মুগ্ধভাব বজায় রাখে। যদিও বাইরে যে মুগ্ধভাব প্রকাশ পাচ্ছে—যাতে অন্তরের কোন প্রতিবিম্ব নেই—তাও কল্যাণের খেয়াল ছিল না।

একটু মাথা নামিয়ে নিজের অনুভূতিকে সংযত করে আবার রমা বলল—আজকের আমার ব্যবহারের যে অসংগতি প্রকাশ পাচ্ছে—তা হয়তো নিছক বাইরের ব্যাপার—একসটারনেল। হয়তো ভেতরে ভেতরে একটা সুস্থির নিয়ম রয়েছে—কে জানে। হয়তো ঐ নিয়মটাই যখন প্রকাশ পায়—তখন প্রচলিত ব্যবহারের যে মানদন্ড রয়েছে তার সঙ্গে ঠিক মেলে না। আবার ভেতরেও যে সুস্থির নিয়ম রয়েছে তাও ঠিক জোর করে বলতে পারিনে। তা হয়তো একটা আমার পুওর ডিফেন্স মাত্র। অসংগত আচরণের দুর্বল আত্মরক্ষা। কী বলো? ও, তুমি আবার যখন তখন অডিটিং এর বিপক্ষে। আচ্ছা, তোমার কিছু বলতে হবে না। কী ভাবছ? বাচালতা তোমার একার সম্পত্তি নয়—না, তুমি বাচাল নও—তুমি কথক। স্নানের ফোয়ারা হঠাৎ বিকল হয়ে গেছে—কেবল জল হুহু করে পড়ছে—যদিও অতটা জল স্নানের জন্যে দরকার নেই। তা হোক, আজকের বাচালতায় তোমাকে একদম ভিজিয়ে দিচ্ছি। দেবও। যতক্ষণ ট্যাঙ্কে বা রিজারভারে জল থাকে। একটা বিকেল আধখানা সন্ধের বাচালতা!

ভেতরে ভেতরে আবার রমার কান্না জমতে থাকে। যেন নিজেকে নিঃস্ব করে, রিক্ত করে দেবার কান্না। নিজের দুর্বলতা, অসহায়তা ফাঁস করে দিয়ে অপমান হবার মতো যেন একটা বঞ্চনার ভার। নিজের মর্যাদা ও মূল্যকে পায়ে দলে দেবার একটা আত্মপীড়নের সজল উল্লাস। কেবল মনে হয়, ছেলেবেলায় নিজের খাবার অভিমানে দাদাকে দিয়ে দেবার পরও দাদা তা খেয়ে ফেলবার পর যে বঞ্চনার একটা আকণ্ঠ দুঃখ মনকে কানায় কানায় অশ্রুপূর্ণ করে তুলত—এখন যেন সেই অনুভূতি। হঠাৎ রমার মনে হয়, আজ যেন ও বার বার কাঁদতে চাচ্ছে। কান্নার লোভেই নিজেকে দুঃখ ও বেদনার দিকে অপমান আর অবহেলার দিকে ঠেলে দিচ্ছে। হয়তো নিজের খাপছাড়া

ব্যবহার ওকে এক ধরনের স্বাধীনতার স্বাদ দিয়েছে—ফলে সেই খাপছাড়া অসংগত ব্যবহারও লোভীর মতো ধরে রয়েছে। আর এর পরে মনের মধ্যে যে নিজেকে যে পীড়ন করছে—কান্নাও সেই জন্যে। অসংগত ব্যবহারে লোভ—কান্নায় লোভ—অসংগত ব্যবহারের প্রতিক্রিয়া। কান্নায়—রমা যেন এই দুষ্ট চক্রের মোহকে এড়াতে চাচ্ছে না। একথা চিন্তা করে রমা যেন কান্নার মেজাজকে এড়াতে পারে। নিজের অনিচ্ছা সত্ত্বেও অনেকটা বিরস সুস্থিরতা বোধ করে। কিন্তু এই সুস্থির যেন হতে ইচ্ছে করে না—কারণ সুস্থিরতার মধ্যে যেন কেমন শূন্যতা বোধ করে। যদিও নিজের পুরানো চেহারা ফিরে পাবার একটা ব্যাকুলতা ওর সব সময় গুপ্তচরের মতো মনের পেছনে পেছনে রয়েছে—তবু, তাকে আজ আশ্রয় করতে রমার একান্ত ইচ্ছাও কিছু কম শক্তিমান নয়। রমা আবার সচেতন হয়—অডিটিং করছে ভেবে একটু মনে মনে ফ্যাকাসে হাসি হাসে।

—জানো রমা, এতকাল আমি একা কথা বলেছি—মনে মনে ভেবেছি, আমার মতো কথা বলতে ক'জন পারে? অনেকের ভালো লেগেছে—সবচেয়ে ভালো লেগেছে আমার নিজের। আজ আমার দর্প চূর্ণ হ'ল। দর্পহারী মধুসূদন বোধ হয় এতকাল সিডাকটিভ কিছু খেয়ে নিদ্রা মগ্ন ছিলেন—এবার জেগেছেন। আজ বিকেলে আধখানা সন্ধেয় তাঁর ঘুম ভাঙা টের পেলাম। এতকাল পরে বুঝলাম, বলবার চেয়ে শুনবার আনন্দ কম নয়। নিজের গর্বচূর্ণ হল—দুঃখের খবর বটে। তবে যাকে পেলাম, তাঁর সঙ্গে কথা কয়ে আনন্দ পাব, শুনে খুশি হব। শুধু শ্রোতার মুগ্ধতাই যে একমাত্র পাওনা—এই রূঢ় অস্ত্রোপচারের 'পর আমি সুস্থ হলাম।

—জানো, আমার বাচালতা চিরকাল ঘুমিয়ে ছিল—আজ বিকেল আর আধখানা সন্ধেয় সেই কুম্ভকর্ণের অকাল জাগরণ ঘটেছে—অনিবার্য মরণের নিয়তি ওকে জাগাল। আমিও বোধ হয় একেবারে থেমে যাবার—সব কথা ফুরিয়ে দেবার জন্যেই আজ অনর্গল অসংলগ্ন বাচালতা।

—আমি তোমাকে জাগিয়ে রাখব।

—যখন কেউ আফিম খেয়ে আত্মহত্যা করে। আর তক্ষুনি যদি পাম্প করে আফিম বের করে দেওয়া যায়—তবে রোগীকে অর্থাৎ সেই আফিম খাওয়া আত্মহত্যাকারীকে ঘুমুতে দেওয়া হয় না—জাগিয়ে রাখে। ঘুমুলে আর জাগানো যায় না। যাতে ভালবাসা থেকে ফেরত স্বাভাবিক জীবনে যেতে না পারি—তাই জাগিয়ে রাখবে?

—আমি তোমাকে স্বপ্ন দেখিয়ে জাগিয়ে রাখব।

—যে ঘুম ভালবাসার সিডাকটিভের ফল—সেই ঘুমের ফসল—তোমার স্বপ্ন?

—কে জানে স্বপ্নটাই সত্য, স্বপ্নই আমার একান্ত আপনার। আর বাইরের জগৎ তো পরের জগৎ—তোমার ভাষায় এক্সটার্নাল। একটা স্বপ্ন আমরা দুজনে দেখব। সেই স্বপ্নে ঘুম নেই। সেই একটা স্বপ্নে আমরা জেগে থাকব। যে ভালবাসায় চৈতন্যের মহাজাগরণ—আর বাইরের পৃথিবী—অফিস—বাড়ি—ঘুম—জেগে থাকা সব মায়া—নিছক ব্যবহারিক ঝাপসা জগৎ মাত্র।

নিজের মনে রমার শ্রেষ্ঠত্ব বারবার প্রতিষ্ঠিত হতে যাচ্ছে দেখে কল্যাণ যেন নিজেকে

হেয় করে নিজের 'পর প্রতিশোধ নেয়। জীবনে কোনো দিন এমনভাবে নিজের দীনতা স্বীকার করেনি, পরাজয় মেনে নেয়নি। রমার কাছে নিজেকে ছোট করবার সময় বার বার মনে হচ্ছিল, রমা আজ ভালবাসায় নিজেকে কতভাবে প্রকাশ করতে পারে—কত রঙিন ও আবেশে আচরণ করতে পারে—সেই প্রদর্শনীতেই, হয়তো নিজের অজান্তেই—মগ্ন। তবু এত রকমের নাড়া খাবার ও রমার গর্ব, নিজেকে বড় মনে করবার প্রচ্ছন্ন অহংকার, আর কল্যাণের কথার তক্ষুনি জবাব দিয়ে কল্যাণের কথার অসারতা দেখাবার চেষ্টা—সব মিলে রমাকে বড্ড আত্মকেন্দ্রিক মনে হয়। তবু, এই নারীর কাছে হাজার পাকে বাধা ওর মন। নিজেকে পদদলিত করে যেন নিজের ভালবাসার প্রতিশোধ নেয় কল্যাণ। আর এত সত্ত্বেও রমার 'পর আন্তরিকভাবে বিরক্ত হতে না পেরে, বরং মনে মনে রমার শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে নিজের মোহ লক্ষ্য করে কল্যাণ মরিয়া হয়ে নিজেকে ছোট করে নিজেকে জব্দ করে। এখুনি উঠে যাওয়া উচিত—হয়তো অনেক আগেই উচিত ছিল—তবু যাবার প্রেরণা বোধ না করবার জন্যে নিজের কাঙালপনাকেও যেন বিদ্রূপ করে কল্যাণ। রমার কথা আরো শোনবার ইচ্ছে জাগিয়ে কল্যাণ নিজের উঠে যাবার চিন্তাকেও যেন অপদস্থ করতে চায়। শেষের দিকে আবার সুন্দর কথা বলবার ঝোঁক এসেছে—তবু অভিমান আর নিজেকে অপমানের মার্জিত ক্ষোভের একটা নিরস কণ্ঠ—বিরসভাব গলায় ছিল।

রমার মুখে কেমন একটা উদাসীন আত্মজ্ঞান—মাঝে মাঝে আমরা প্রলাপ বকতে না পারলে অসুস্থ হয়ে পড়ি। হয়তো কিশোর বয়েস থেকে প্রলাপ বকবার আকাঙ্ক্ষায় আমরা আকুল হই। ঠিক বুঝি না, মানুষ যুক্তি বেশি ভালবাসে, না প্রলাপের 'পরই অন্তরের টান। হয়তো সঙ্গতির 'পর আমরা যত মূল্যই দিই—ভেতরে ভেতরে তো আমরা একেবারে অসংলগ্ন। আমার তো মনে হয়, এই বিশ্বজগতে জীব একেবারে অসংগত—অসংলগ্ন—খাপছাড়া, একটা তুচ্ছ বেপরোয়া অপ্রয়োজনীয়।

—আসলে রমা, আমাদের মতো কাজের জগতের লোকগুলো—হাড়ে মাসে বৈষয়িক লোক বলে যখন জগতের, দেহের, মনের স্বরূপ বুঝতে চায়—তখন সব কিছুর মধ্যেই নিয়ম খুঁজে বেড়ায়। কিন্তু একদিন—সত্য প্রকাশ হয়—সেদিন বোঝা যায়, একটু তুচ্ছ পরমাণু পর্যন্ত নিয়মকে লাফ মেরে ডিঙিয়ে যায়। আর দৈত্যাকার পাঁচ-সাত ডাইমেনশনের জগতগুলোর চেহারা দেখে নিয়মগুলো পর্যন্ত ওদের খুশিমতো চলতে থাকে। শুধু চার ডাইমেনশনের মধ্যবিত্ত মানুষগুলোর জন্যে প্রকৃতির যত নিয়মকানুন—যত ট্যাবু। তাই কোনটা প্রলাপ আর কোনটা নিয়ম—তার প্রলাপই এক অঞ্চলের নিয়ম কিনা কে বলবে? আজ দুপুরের নিয়মে বিকেল—আধখানা সন্ধে প্রলাপ—আর বিকেল আর আধখানা সন্ধের প্রলাপের কাছে হয়তো দুপুর তুচ্ছ অনাবশ্যক। হয়তো সকালের কাছে সন্ধে একটা বেপরোয়া অনাবশ্যক।

রমার চোখে মুখে কোনো মুগ্ধতা না দেখতে পেয়ে বরং রমার চোখে মুখে কিছু একটা বলবার বা জবাব দেবার প্রস্তুতি লক্ষ্য করে কল্যাণের বিরস ভাবটি যেন চলে যেতে চেয়েও ফিরে এসে বসল। ভাবল, এবার ওর ওঠা উচিত। অন্যদিন দেরি হয়ে যাচ্ছে বলে বলে ওকে জোর করে রমা বাড়িতে পাঠাত। আজ রমা যাবার কথা মুখেই

আনছে না—হয়তো নিজের বাড়ি বলে সঙ্কোচে বলতে পারছে না। তবুও যেন কল্যাণকে ছাড়বার মেজাজ ওর নেই। ওর কথা, ওর বিদ্যে বুদ্ধি গর্ব, ওর মুগ্ধ করা প্রলাপ বসে বসে শুনতে হবে। কল্যাণের কেমন একটা বদ্ধ বদ্ধ ভাব মনের মধ্যে আসে। কতকাল কে জানে এই মেয়েদের হাতে বন্দী হয়ে থাকতে হবে। সেই নিজেকে আবার মনে হয় কয়েদী—পালাবার উপায় নেই। কাছে থাকলে তবু কম আকর্ষণ বোধ করা যায়। দূরে গেলে টানতে থাকে। কল্যাণের মনে হয়, অনেক আগে উঠে গেলে—আজকের মুহূর্তগুলো সত্যি স্বপ্ন হয়ে থাকত—বেশিক্ষণ থাকবার জন্যে অতিলোভে আত্মহত্যা করে এখন যেন এই খাওয়া আত্মহত্যাকারীর মতোই জোর করে নিজেদের জাগিয়ে রাখতে হচ্ছে। ভালবাসায়ও যতটুকু জাগা দরকার—তার বাইরে জাগলেই অনিদ্রা আসে—তখন স্বপ্ন থাকে না। ঠিক ঠিক জায়গায় শেষ করতে সংযম দরকার। নইলে শেষ পর্যন্ত মাধুর্যটুকু নষ্ট হয়ে সমস্তটাই বিস্বাদ তেতো হয়ে ওঠে। হঠাৎ কল্যাণের মনে চকিতে একটা চিন্তা যেন তাড়াতাড়ি অত্যন্ত অস্পষ্টভাবে কোনো প্রভাব না দেখে চলে গেল : ক্রমাগত রমার সঙ্গ করলে হয়তো ওর বন্ধন থেকে মুক্তি পাব—মোহমুক্তি ঘটবে। কিন্তু ভাবনাটিতে না পেল কোনো সাড়া—না এল কোনো আনন্দ—না পেল কোনো সমর্থন। মুহূর্তের ভাবনা মুহূর্তেই বিলয় হয়ে গেল। শুধু তাই নয়, উঠে গেলে রমা অপমানিত হবে—আজকের দিনে এমন করে উঠে যেতে নেই—এই জন্যেই যে উঠে যাওয়া উচিত এ কথা অন্তর থেকে ভাবছে বলে কল্যাণ মনে করছিল—একটু পরেই, কল্যাণ টের পেল, ঠিক তাও নয়। আজকের এমন দিনকে, এমন রাতকে অপমান না করবার জন্যেই যে উঠে যাচ্ছে না তা নয়। একদিকে আজকে বিরস হয়ে নীরস হয়ে তেতো হয়ে বাড়ি ফিরতে যেমন সাহস নেই, তেমনি ঠিক উঠে যেতেও ভেতরে ভেতরে ইচ্ছে নেই—হয়তো, হয়তো, নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের কোনো স্বাক্ষর না রেখে যেতেও পারবে না। কিংবা ওর মনে হয়, হয়তো নিজের আরো পরাজয়, আরো অমর্যাদা, আরো গ্লানি ও অপমান না পেয়ে—ওর আত্মপীড়ন সম্পূর্ণ না হলে যেন উঠতে পারবে না। যেন দেখতে চায়—কতদূর পর্যন্ত আজ রমা ওকে অপ্রস্তুত ও হেয় করতে পারে। ভালবাসার সবচেয়ে বড় শত্রু একঘেয়েমি। আজ একঘেয়ে হয়ে এখানেই ভালবাসার স্বাস্থ্য নষ্ট করে দেবে। একঘেয়ে ভালবাসাকে রিকেটি এনে দেয়। তাই কিছুকাল পর দাম্পত্য জীবনে ভালবাসা রুগণ্ হয়ে পড়ে। তারপর একজনের মৃত্যু ঘটলে বিচ্ছেদের মধ্যদিয়ে অপরজন প্রথম বহুকাল পরে আরেক জনকে কিছুক্ষণ অনুভব করে। কিছুক্ষণ মানে শ্রাদ্ধের ক'দিন আগে পর্যন্ত মৃত্যুর পর তেরাত্রি। তারপর শোকের নকল শুরু হয়। মৃত্যুর দিনের ব্যবহারকে বার বার অভিনয়। সেদিনের ব্যবহারকে জোর করে অভ্যাস করবার চেষ্টা। তারপর শ্রাদ্ধের কাজ এসে প্রিয়জনকে ভুলবার আত্মগ্লানি থেকে বাঁচিয়ে দেয়। কথাটি মনে হওয়াতে কল্যাণ একটু উদ্দীপ্ত হয়—বিরসভাব সবটা না কাটলেও অনেকটা কাটে। আসলে রমার মধ্যে ওর কথা শোনবার মুগ্ধতা দেখতে না পেয়েও কেবল ওর কথার জবাব দেওয়াতে যে অভিমান কল্যাণ বোধ করছিল তাই যে বিরসভাবকে যেতে দিতে চাচ্ছিল না—কল্যাণ ঠিক তা বুঝতে চাইছিল না।

রমা কিছু বলতে চেয়ে যেন আবার থেমে গেল। কল্যাণ স্বস্তিবোধ করে। রমার কথার সঙ্গে সঙ্গে তক্ষুনি মুখের মতো জবাব দেবার যে টেনশন বোধ করছিল তা চলে যেতে কেমন একটা শূন্যতা বোধও করে।

কল্যাণ আবার বলল—দেখ রমা, নিয়ম একঘেয়ে অনিয়ম নতুন। ভাল লাগা বিরল—একঘেয়েমি অবিরল। আজকের মুহূর্তটির ফ্রেম অব রেফারেন্সে ভাল লাগা, ভালবাসা রয়েছে—অন্য অন্য স্থূল সময়গুলোর ফোর ডাইমেনশনে রয়েছে একঘেয়েমি। অধিকাংশ সময়গুলোর দৈর্ঘে, প্রস্থে, ঘনত্বে, উপরে নীচে সামনে পেছনে আগে পরে কেমন একঘেয়েমি, মনটনি-মনামী নয়।

রমা যেন ঠিক শুনছেনা আর যখন উত্তর দিচ্ছে তখন নিজের উত্তরের দিকেও যেন মন নেই, এমনি অন্যমনস্কভাবে বলল—একঘেয়েমির বিপরীত তো বৈচিত্র্য। বৈচিত্র্যে ভাললাগা ভালবাসা রয়েছে, ঝড়, শোক, খরা, বন্যা, ক্ষুধা, অনাহার, নেমতোন্ন সবই রয়েছে। অবশ্য তুমি বলবে, কোনো ব্যক্তির কাছে কোনোটা ভাল লাগা কোনোটা একঘেয়ে। কান্না হয়তো কারো পক্ষে ক্রনিক—একঘেয়ে—হাসিই বৈচিত্র্য—নভেলটি। হয়তো ভালবাসা কারো পক্ষে মনটনি, বিচ্ছেদই সেখানে ভাল লাগা। কারো পক্ষে একজন মনটনি—অপরজন নভেলটি। সেই একই লোক একজনের কাছে একঘেয়ে—অপরজনের কাছে আকর্ষণীয়। এ সবই খুবই সাধারণ কথা।

মুহূর্তে কল্যাণের মনে হল, রমা কী বলতে চাচ্ছে? রমা কী অন্য কোন লোকের কাছে এক ঘেয়ে—ওর কাছে আকর্ষণীয়? না, রীনার কাছে এক ঘেয়ে, রমার কাছে আকর্ষনীয়? 'বৈচিত্র্য' শব্দটিও কল্যাণকে আঘাত করে। কল্যাণের ভালবাসা কী বৈচিত্র্যের আস্বাদন—নভেলটির। এই চেহারার নভেলটি? রীনা—কল্যাণের ভালবাসা মনটনি—বিচ্ছেদ ও নভেলটি—এই দুটোই কী কল্যাণের মনের চেহারা বলে রমা ভাবছে। ভিতরে ভিতরে কেমন উষ্ণ হয়ে ওঠে। কিন্তু সবচেয়ে ওকে উষ্ণতর করে তোলে রমার শেষের কথাটি 'এ সব খুবই সাধারণ কথা'—অর্থাৎ কল্যাণ আর পাঁচটা লোকের মতো সাধারণ কথা বলে। কল্যাণ বুঝতে পারে রেগেছে। এমন সময় কথা বলতে গেলে কল্যাণের কথা কেমন জড়িয়ে যায়—। এ সম্পর্কে সচেতন বলে চুপ করে রাগকে আত্মস্থ করতে লাগল।

রমা বেশ কিছুক্ষণ ধরেই কল্যাণের বিরসভাব, ম্লান ও কেমন নিভে যাওয়া ভাব লক্ষ্য করছিল। গলার স্বরে প্রাণ নেই। একটা বেদনা ও বিষাদে রমা দীর্ঘ নিঃশ্বাস চেপে রাখে। বুঝতে পারে, কল্যাণের একঘেয়েমি লাগছে। অন্যদিন লক্ষ্য করেছে কী তীব্র আকর্ষণ ওর মধ্যে। অল্প সময়ের বরাদ্দের মধ্যে কল্যাণ কী তীব্র পিপাসার্ত হয়ে উঠত। আজ সময় একটু লম্বা হতেই—দৈর্ঘে, প্রস্তে, ঘনত্বে, উপরে, নীচে সামনে পেছনে আগে পরে সময় একটু হাত পা ছড়িয়ে বসে যাওয়া মাত্রই কল্যাণের আকর্ষণের সমস্ত তীব্রতা চলে গেছে। চলে যাবার জন্যে ব্যস্ত—কিন্তু মুখ ফুটে তা বলতে পারবে না। অন্যদিন যেতে চায়নি—আজ যাবার ইচ্ছে সত্ত্বেও, অন্যদিনের নকল করতে হবে। রমাকে ছেলে ভুলাতে হবে। একটু বেশি সময় থাকলেই কল্যাণের আকর্ষণ কত অল্প সময়ের—বোঝা যায়। কল্যাণকে সারাসময় ধরে রাখবার রূপ মাধুর্য ওর নেই। ওর বাঁধবার কোনো

কিছু নেই। শুধু নিজে বাঁধা পড়ে আছে—নিজের মোহভঙ্গের কোনো পথ নেই। আবার একটা ধিক্কার, নিজেকে পীড়নের ব্যথা ও ভালবাসার 'পর অভিমান ওর মনকে অধিকার করে ফেলে। চোখে জল আসতে চায়, মনে হয়, কল্যাণের ভালবাসার সময় হচ্ছে—বিকেল পাঁচটা থেকে সাড়ে ছ'টা। তার পরেই, এখন পৌনে ন'টা, ওর ভালবাসা জুড়িয়ে ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। শুধু ভদ্রতার খাতিরে যেতে পারছে না। কিন্তু ওকে জোর করে রমা আটকাতে চায় না। কিন্তু আজ ওকে যেতে দিতে ইচ্ছে করে না। ও চলে গেলে একা একা নিজের মুখোমুখী হবার সাহস নেই। নিজের প্রলাপ, বিলাপ, বিকার.....অসম্ভব, অসম্ভব। আজ বোঝাপড়া পারব না। নিজের কাছে আজ দিনটা ভিক্ষে চায়—আজকে আত্মসমালোচনা নয়—আজ নিজের কাছে ছুটি, যদিও ক্লান্ত—তবু নিজের মনকে ভয় করে রমা। নিজের মনকে বিশ্বাস নেই। আর স্বপ্ন নয়, দুঃস্বপ্ন ওৎ পেতে রয়েছে। আজ বাবার একটা ঘুমের ওষুধ খাবে। একটা সোনারিল। বাবার একটাতে কিছু হয় না। ওর হবে। কোনদিন খায়নি। আজ খাবে। কল্যাণ চলে যেতে চেয়েছে ভেবে একটা পরাজয়, একটা অপমান, একটা নিরাশা, হতাশা ও সেই সঙ্গে যেন এতদিনের আশাভঙ্গ—ও অহংকার ভেঙে পড়বার লজ্জা ওর মনকে গ্রাস করে। এমন যে হবে এ কথা এখন ওর মনে হয়, ও আগে থেকে কেমন করে জানত—কিন্তু বিশ্বাস করেনি। কল্যাণের 'পর রাগ হয় না—অভিমান হয়—যদিও অভিমানকেও ওর বিলাসিতা মনে হয়। কল্যাণ ঠিকই এসেছিল—তবু, কল্যাণকে ধরে রাখতে পারল না। এতখানি স্পষ্ট পরাজয় এমন প্রকাশ্যভাবে অনুভব করতে হবে—এ কথা ও যেন অস্পষ্টভাবে এতকাল জেনে এসেছিল—মাঝে শুধু পাঁচটা থেকে সাড়ে ছ'টার পাল্লায় খেয়াল ছিল না—আজ যখন কল্যাণের হাত ওর বুকে—কল্যাণের ঠোঁট ওর ঠোঁট দুটো—সেই দিনই নিজের ক্ষমতা কত দুর্বল—সেই সনাতন কথাই স্থায়ী হ'ল। বিকেল আর আধখানা সন্ধে বড় বেশি সময় যেখানে ভাললাগা একঘেয়েমি হয়ে দাঁড়ায়—অবিরল একঘেয়েমিতে নিজের সৌন্দর্যের অভাব মনকে আবার পুরানো খরাক্লিষ্ট এলাকায় নিয়ে আসে। তিন ঘন্টার বন্যাই ধাপ্পা—খরাই সত্য। শেষে রমা ভাবল, বাবার সোনারিল কী আছে, না, আনতে হবে। তাঁতের শাড়িই কী ওকে ধরিয়ে দিল, চিনিয়ে দিল। আগামীকাল যাব না। সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও মনে হল, এতকাল কল্যাণ ওকে চেয়ে এসেছে—রমা নিজেকে ধরা না দিয়ে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রেখেছিল। আজ ও যখন কল্যাণের কাছে ধরা দিল—তখন কল্যাণ নিজেকে সরিয়ে নিল, দূরে চলে গেল। আজ কল্যাণ নিজের শ্রেষ্ঠত্ব বুঝতে পারল—রমা বুঝতে দিল। সুন্দর না হয়েও রমা নিজের মর্যাদা রক্ষা করে চলে এসেছিল—নিজের কাঙালপনা কোনোদিন স্বীকার করেনি। আজ হেয় হল, ছোট হল—আর কল্যাণ ওর দুর্বলতা জেনে নিয়ে চলে গেল। একদৃষ্টিতে কল্যাণের দিকে তাকায়। শুধু আজ—আর কোনোদিন নয়—শুধু আজ আর একটুকু থাক। নিজের কলঙ্ক রবার দিয়ে মুছে ফেলা যাবে না ঠিকই। তবু, আজকের ব্যবহার, একদিনের ব্যতিক্রম হয়েই থাক। সমস্ত জীবনের বাইরে ক'টি মুহূর্তের কলঙ্ক। ও আর একটু বসুক। তারপর সোনারিল। রমা একবার কল্যাণের এখনকার কথাগুলোর মধ্যে ওর জন্যে ভালবাসা যে রয়েছে তা খুঁজে বেড়াল—কিন্তু কল্যাণের নিভে যাওয়া চেহারা, শুকনো কণ্ঠ, নিরস

মুখ, ম্লান চোখ ওকে কথাগুলোর মধ্যে কোন আশ্রয় দিল না। কেবল মনে হল, সোনারিল খেয়ে আর যদি ঘুম না ভাঙে। আত্মহত্যা করতে পারবে না—চায় না—তবে হঠাৎ মৃত্যু ঘটলে রমা মেনে নেবে। স্ট্রোক, দাদার মতো ম্যানেনজাইটিস!

এবার কল্যাণের খেয়াল হ'ল : দু'জনেই চুপ করে রয়েছে। শুধু তাই নয়, রমার কথার উত্তর ও দেয়নি। ও জানে এতে রমার কাছে হেরে যাওয়া বোঝায় না—রমাকে মূল্য না দেওয়া বোঝায়। অপমান করা হয়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ভয় পেয়ে যায়। উত্তর না পেয়ে রমা যদি সেই উগ্রচণ্ডা হয়ে ওঠে—সেই বিকেল সাড়ে চারটায় কায়েমী হয়ে বসে। সঙ্গে সঙ্গে এও বুঝল, একবার মেজাজ দেখিয়ে রমা কেমন ওকে কাপুরুষ করে তুলেছে। রমার বিদ্যা, বুদ্ধি, শিক্ষা দীক্ষা, মেজাজ—সব যে ওর চেয়ে অনেক অনেক বড়—একথাই শুধু প্রমাণিত হয়েছে তাই নয়—এমনকি কল্যাণও তা মানতে আরম্ভ করেছে। রমাকে ভয় করে এ কথা চিন্তা করে কল্যাণের দেহ যেন আগুন হয়ে ওঠে। এতকাল সকলে ওকে আদর খাতির করে এসেছে—এতেই কল্যাণ অভ্যস্ত—এখন রমার কাছে নিজের এমন অনাদর ও অপমান যেন ওর শরীরে আগুন ধরিয়ে দিচ্ছিল। হঠাৎ কল্যাণের মন হল, এই চুপ করে থাকা—রমার এই চুপ হয়ে যাওয়া—একি কল্যাণকে ভদ্রভাবে তাড়িয়ে দেবার ইঙ্গিত। কল্যাণ যে নিজেও কথা বলছে না—এ কথা ওর খেয়াল হল না।

কল্যাণ জানাল—অনেকক্ষণ আমরা চুপচাপ বসে রয়েছি।

রমা যেন জলভরা স্বরে বলল—ভাল লাগছে। তুমি সামনে রয়েছ—আমি যেন সব সত্তা দিয়ে তা অনুভব করছি।

একটু চুপ থেকে রমা আবার জানায়—দু'জনে চুপ করে থাকবার এমন একটা শান্ত সৌন্দর্য রয়েছে—মনে হয়—চুপ করে থাকলে যেন তোমাকে বেশি—এমন কী তোমার সবটুকু অনুভব করা যায়। যাবেই তো—আজ, আর একটু বস।

রমার ধারণা ভেতরে ভেতরে কল্যাণ চলে যেতে চাচ্ছে। চুপচাপ রয়েছি এই অজুহাতে কল্যাণ চলে যাবার ভূমিকা তৈরি করছে। তবু মুখ ভেঙ্গে কল্যাণকে থাকতে বলে রমা যেন নিজের কাঙালপনা, হ্যাংলামো কতদূর যেতে পারে তা দেখতে চায়। কতদূর নিজের মর্যাদা নষ্ট করে—করতে পারে—তা দেখতে চায়। নিজের ইমেজ নষ্ট করবার, ধ্বংস করবার একটা শান্ত হিংস্রতা ওকে যেন আস্তে আস্তে গ্রাস করতে চায়। ওর ইচ্ছে ছিল আরো বলে, তোমার কথার চেয়েও তুমি সুন্দর আজ এমন সজল মুহূর্তে—এমন কাণ্ডজ্ঞানহীন মুহূর্তে এ কথা বলতে রমার কোন কৃপণতা ছিল না—অনায়াসে ও অকুণ্ঠভাবেই বলতে পারত। কিন্তু ওর কণ্ঠ ওকে বলতে দিল না। গলা আটকে এল। কেঁদে ফেলবে ভয়ে চুপ করে রইল। কাঁদবার ইচ্ছে ছিল। কাঁদতে আজ ভাল লাগছিল। কিন্তু নিজের কাঙালপনা, হ্যাংলামো—নিজের ইমেজ ধ্বংস করবার—নিজের এতদিনকার মর্যাদার চেহারাকে হত্যা করবার নেশা আজ ওকে পেয়ে বসলেও—কাঁদতে যেন ওর সংকোচ হল। কেমন মনে হল, কেঁদে ও সহানুভূতি চায়—এ কথা সত্য—কিন্তু হয়তো কান্না কল্যাণ আর পছন্দ করবে না। শুধু তাই নয়—কল্যাণকে এই মুহূর্তে ছেড়ে দিতে ইচ্ছে করে না—কাঁদতে গেলে যদি কল্যাণ উঠে চলে যায়।

যদি আগামীকাল বলে, তোমাকে না জানিয়েই এলাম—কারণ তোমাকে বড্ড কষ্ট দিচ্ছিলাম। কল্যাণ থাকতে চায় না বুঝেও ওকে যেতে দিতে মন চায় না। তাই কাঁদবার জন্যে ঘর ছেড়ে চলে যেতে সাহস হয় না। আর কল্যাণের সামনে কান্না—যেন সমস্ত রুচি বিদ্রোহ করে—কাঁদলে ওকে বড্ড বিশ্রী লাগে। চোখে আঁচল দিয়েও কাঁদতে সাহস হয় না। পাছে চোখে আঁচল দেবার সঙ্গে সঙ্গে কল্যাণ চলে যাবার জন্যে উঠে দাঁড়ায়। তখন কী করে আটকাবে? কল্যাণকে সোনারিল খাবার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত কেড়ে রাখতে হবে।

মুহূর্তে কল্যাণের মন নরম হয়ে যায়। যেন স্নিগ্ধ হয় ওঠে। মনে হয়, অনেক দুঃখ, বেদনা, অবহেলা আজ যেন কল্যাণের স্পর্শে উদ্বেল হয়ে উঠেছে। যেন মন বেদনা বঞ্চনা অবহেলা অপমান সমুদ্রের মতো বিশাল হয়ে উঠেছিল—হঠাৎ ভালবাসার ঝড়ে তা প্রচণ্ড হয়ে উঠল। যেন অপমান বঞ্চনা ক্ষোভের সঙ্গে সংগ্রাম করে ওর ভালবাসা জায়গা করে নিচ্ছে। অন্তরের এই প্রবল আলোড়ন আজ ওকে কখনো তীক্ষ্ণ তার্কিক, কখনো মধুর, কখনো মেজাজী করে তুলছে। ওকে যেতে দিতে চায় না এ কথা চিন্তা করে কল্যাণ যে শুধু আশ্বাস পেল তাই নয়, একটা মমতা ও আত্মপ্রসাদে মন ভরে উঠল। অফিসে ওকে যত ভাল লাগত—রেস্টুরেন্টে ওর জন্যে আকাঙ্ক্ষা যত তীব্র হয়ে উঠত—আজ, এত শত অভাবনীয় অভিজ্ঞতার পরও, সেই ভাল লাগা, সেই তীব্র আকর্ষণ অনুভব করতে না পাবার যে একটা আশাভঙ্গ কল্যাণের ভেতরে একটু আড়ালে বয়ে যাচ্ছিল—যা কল্যাণ টের পাচ্ছিল—কিন্তু ইচ্ছে করেই চিনতে চাচ্ছিল না। এখন যেন সেই আড়ালে বয়ে যাওয়া আসাভঙ্গকে হাল্কা ভাবে স্বীকার করে নিজেকে জানাল, ও কিছু নয়, তাঁতের শাড়ির জন্যেই ওর পরিচিত চেহারা ঢাকা পড়ে গেছে। তাই অন্যরকম, তাই আশাভঙ্গ।

কল্যাণ জানায়—চুপ করে অন্তরে অন্তরে কথা বলা—আইডিয়াটি চমৎকার। টেলিওপ্যাথিক কমিউনিকেসনস। তুমি হয়তো কথা বলে চলেছ—কিন্তু রেসিপেন্ট হিসেবে আমি একদম বাজে। আমাকে তুমি সবটুকু অনুভব করতে পার—এমন লোভ দেখালে—এরপর কথা বলতে সাহস হয় না। আমি জানি, আমি কথা বলে আমার দিক থেকে আমার কথার দিকে লোকের মন ঘুরিয়ে দিই। এক ধরনের মহৎ আত্মম্ভরী বিনয়। টেলিওপ্যাথিক রেসিপেন্ট বা মিডিয়ম আমি নই। আর বেচারা ইন্দ্রিয়গুলো থাকতে—ওদের বঞ্চিত করে মনে মনে পরস্পরের অনুভব—মহৎ জিনিষ হতে পারে—অতটা মহৎ—বড্ড ডিফিক্যাল্ট।

রমা একদৃষ্টিতে তাকিয়ে বলে, গলার স্বর গাঢ়—তোমার কথার চেয়েও তুমি সুন্দর।

আর একটু থেমে রমা আবার বলে—তোমার সুন্দর কথার চেয়ে তুমি সুন্দরতর।

কল্যাণের সমস্ত শরীর ঝিম ঝিম করে ওঠে। এক মুহূর্তে উঠে গিয়ে রমার ঠোঁটে নিজের ঠোঁট স্পর্শ করে—কপালে ও গ্রীবাতে চুমো খেয়ে আবার এসে নিজের জায়গায় বসল। রমার সমস্ত শরীর কেঁপে উঠল।

দু'জনেই একটু চুপ করে রইল। তারপর কল্যাণ যেন একটু জোর করে বলল—তোমার কমপ্লিমেন্ট উইদড্র কর। এরপর প্রত্যেক মুহূর্তে কথা বলতে আমার সাহস

দরকার হবে। এত সাহস আমার স্টকে নেই—প্লিজ উইদড্র।

রমা মাথা নেড়ে অসম্মতি জানায়।

কল্যাণ বলে—তা হলে কিন্তু আবার।

রমা ভয়ের ভান করে।

কল্যাণ আবার জানায়—কথা না বলাই ভাল জান? আমরা বড্ড ইমপারসনাল হয়ে যাচ্ছিলাম—প্রায় কচকচি শুরু করেছিলেম—বড্ড নৈর্ব্যক্তিক। তুমি সংশোধন করেছ। আমি আমার নীরবতার স্বরূপ শুধু প্রকাশ করলাম।

কল্যাণ আর রমা দু'জনেই নীরবে হাসল। দু'জনেরই হাসি আন্তরিক, স্নিগ্ধ, প্রসন্ন।

রমা বলল—নীরবতার স্বরূপ যদি এই হয়—তবে আমি উথড্র করছি।

এবার কল্যাণ রাজি হয় না—মুখের কথা যখন একবার বের করেছ—ওয়ার্ড অব অনার।

—তুমি চাওনি?

—যাহা চাই তাহা ভুল করে চাই?

—পরের লাইনটা যাহা পাই-

শেষ করবার আগেই তাড়াতাড়ি কল্যাণ যোগ করে—তাহা আরো চাই।

তারপর কল্যাণ বলে—কথা দিচ্ছি নীরব থাকব—কথা বলব না। তবে আমার শর্ত—তোমার ঐ মহৎ তাঁতের শাড়ি, ঐ ইমপারসনাল—নৈর্ব্যক্তিক কথাবার্তা—ঐ টেলিওপ্যাথি—এগুলো বাদ দিতে হবে। তবেই আর্মিস্টিজ, সন্ধি।

তুমি বলে দিও—কোন শাড়ি পরব?

—সেই পরম মৌন মুহূর্তে শাড়ি পরতেই হবে এমন জুলুম আমার নেই।

ভেঙে ভেঙে রমা বলে—দুষ্টু কোথাকার।

চুমো খাবার সঙ্গে সঙ্গে আর কল্যাণের জীবন্ত ও ফুটন্ত মুগ্ধ দৃষ্টি ফিরে আসবার আর কল্যাণকে দুষ্টু বলবার অধিকার বোধ করবার সঙ্গে সঙ্গে রমার মনে একটা ক্ষীণ উজ্জ্বল অনুভূতি দেখা দেয়। সেই ক্ষীণ ধারার স্রোতে রমা গা ভাসিয়ে দেয়। ও আর কিছু ভাবতে চায় না। কোন দুশ্চিন্তা, দুঃস্বপ্ন, পরিণাম—কল্যাণের এখনকার কাজের পেছনে যে কল্যাণের প্রশংসার পাবার আনন্দ রয়েছে—আর চুমো সেই কমপ্লিমেন্টের প্রকাশ—এ কথা সেই ক্ষীণ ধারার স্রোতের মুখে পাথরের নুড়ির মতো পথ সাঁতারের প্রতিবন্ধক হতে চাইলেও রমা তা মানল না—চিন্তা এলেও ভাবল না, বুদ্ধিকে সজাগ রাখতে নয়—বুদ্ধি বিভ্রান্ত হোক, যুক্তি অবশ হোক, চিন্তা এলেমেলো হোক—সেই অনুভূতির ক্ষীণ ধারা খরস্রোতে সব কিছু ভাসিয়ে নিয়ে যাক। যেন সোনারিল না খাওয়া পর্যন্ত এই স্বপ্ন ওর থাকে—ঘুম না আসা পর্যন্ত যেন ওর স্বপ্নের আয়ু থাকে। স্বপ্ন যেন ওকে ঘুম পর্যন্ত এগিয়ে নিয়ে বিদায় নেয়। রমার শরীর ঝিম ঝিম করতে থাকে। এই ঝিম ঝিম করা—এই ভেতরে ভেতরে কাঁপুনি—এই ঠোটে কপালে গ্রীবায় কল্যাণের স্পর্শ রমা চোখ বুজে স্মরণ করে। আচ্ছন্ন হয়ে থাকতে চায়। ইচ্ছে হয়, কল্যাণ আবার উঠে আসুক—ওকে চুমোয় চুমোয় নেশার ঘোর এনে দিক। তারপর নেশার ঘোরে ঘুমিয়ে পড়লে তখন পা টিপে টিপে কল্যাণ চলে যাক। কোথায় যাবে

রমা ভাবতে চায় না—যেন ভাবতে না পারে। ওর ভাববার ক্ষমতা আজ কল্যাণ যেন চুমোতে চুমোতে শুষে নেয়। ও আর ভাবতে পারেনা। ওকে ঘুম পাড়িয়ে যাক। ওর সোনারিল কল্যাণের ঠোঁটে রয়েছে। ওর ভেতর থেকে যেন উঠে আসতে চায় একটা কথা—কল্যাণ, আমরা অতীত আর ভবিষ্যতের জ্বালায় বর্তমানকে চুমো দিতে ভয় পাই। অভিজ্ঞতাটা বড্ড বৈষয়িক—অভিজ্ঞতাটা ইনসমনিয়া—অভিজ্ঞতা আত্মরক্ষা করায় কিন্তু নিজেকে দিতে শেখায় না। অভিজ্ঞতা আত্মরক্ষা করে—আত্মদান করতে পারে না। স্মৃতি অভিশাপ—আশঙ্কা পাপ। ওরা সবাই মিলে এক মুহূর্তের বর্তমানকে এমন ভয় দেখায়—ওরা এত বীভৎস হয়ে ওঠে চারদিক ঘিরে ধরে। একটা চুমোকে পর্যন্ত—একটা নিরীহ স্পর্শকে পর্যন্ত—একটা শিশু-ভাললাগাকেও ওরা এত অবিশ্বাস করতে, সন্দেহ করতে শেখায়। বুড়ো অতীত ও ভবিষ্যতের ভূত একটা মুহূর্তে চারদিকে এমন করে ঘিরে থাকে। কথাগুলো বলতে গিয়ে রমা বলে না। কারণ, কথা গুলো বড্ডইমপারসনাল। তাছাড়া, ভাবতে ভাবতেই রমার উজ্জ্বল ভাললাগা একটা বিদ্রোহের আকার নিচ্ছে—নিজের বিরুদ্ধে একটা তাপ যেন ওর ভেতরে ভাল লাগাকে পরিবর্তন করে দিচ্ছে। নিজের ভেতরে একটা ঝাঁজ লক্ষ্য করেই রমার আগের মুহূর্তের অনুভূতিকে খুঁজতে লাগল। সেই অবশ-আচ্ছন্ন করা সব ভুলে যাওয়া চুমোর মুহূর্ত। ইতিমধ্যেই আগের মুহূর্তটি হারিয়ে এসেছিল—তবু তাকে রমা হারাতে দিতে চায় না। চোখ বুজে যেন কিছু ভাববে না—এক মনে সেই মুহূর্তকে স্মরন করলেই ল' অব অ্যাসোসিয়েশনের ফলে সেই মুহূর্তও আসবে—এরকম একটা আবছা ধারণায় আর ভরসায় রমা আগের মুহূর্ত—সেই চুমোর মুহূর্ত—সেই সজল বিদ্যুৎ—ঠোঁটে, কপালে, ঘাড়ে। তবু অবাধ্য মন থেকে আবার একটা কথা ভেসে ওঠে, ইচ্ছে হয়, কল্যাণকে জানায়—জানো, তোমার আপেক্ষিকতত্ত্ব অনুযায়ী—এই মুহূর্তের বিচার হবে—চুমো দিয়ে—ওয়ান ডাইমেনশনের জগৎ হচ্ছে এই চুমোর জগৎ। বলতে পারা যায় না। একে বললেই কল্যাণ আবার কথা শুরু করবে। ওর বানানো কথায় এমন মুহূর্তটিকে পোশাকী করতে ওর ইচ্ছে নেই—তা ছাড়া, নিজেই চুপ থাকবার অনুশাসন জারী করে এখন যদি নিজেই তা ভাঙে....। তবু, নিজের ভাল লাগাকে রক্ষা করতেই হবে। নিজের হাতে আর নিজেকে একা ছেড়ে দেওয়া যায় না। তা হলে অতীত আর ভবিষ্যৎ অভিশাপ আর আশঙ্কা—পাপ আর ভয় বিশ্বাস ঘাতকতা করে ওর এই মুহূর্তকে কয়েদ করে ফেলবে। তখন জামিন পাওয়া শক্ত।

এবার কল্যাণ বলে—প্রায় দু'মিনিট মৌন থাকলাম—আমার সুন্দর কথা বলবার শোক—প্রস্তাব। আমি মৌন রইলাম—তুমি কিন্তু দিব্যি তাঁতের—শাড়ি পরে রইলে। ব্রিচ অব ট্রাস্ট।

রমা ক্লান্ত হাসি হাসে।

কল্যাণ আবার জানায়—তোমার হাসিটি মানবিক—ভাগ্যিস টেলি প্যাথিক নয়। দেখ রমা, মন শরীরকে ছাড়িয়ে যাবে না—শরীরও মনকে ছেড়ে ছ'ফুট সাত ফুট হয়ে উঠবে না। এই ছাড়াছাড়িটা অস্বাস্থ্যকর। দেহকে ছাড়িয়ে মন যদি নায়ক হয়ে ওঠে—তবে যোগী হতে হয়—সংসার চলে না। আর শরীর যদি মনকে কসরত করে একদম

কাবু করে ফলে তবে লম্পট হতে হয়—সংসার চলে না। দেহ—মনের সহ অবস্থান—শান্তিপূর্ন সহ অবস্থান—এই হচ্ছে গ্রীক ভিউ।

রমা আবার হাসে—যেখানে দুই দেহ—দুই মন—দুইয়ে দুইয়ে.....।

—দুই-ই। তোমার দেহ আর আমার মন—আমার দেহ আর তোমার মন।

একটু চুপ থেকে রমা বলে—তোমার স্পর্শে আমার ঘুম পায়।

—আমার স্বপ্ন যে তোমাকে ছুঁয়ে দেয়।

—আজ তোমাকে যেতে দিতে..... তবু তো যেতে হবেই। তুমি ট্রাম রাস্তায় যাবার আগেই আমি ঘুমের ওষুধ খাব। সোনারিল।

—আজ কে ঘুমুবে? আজ জেগে থাকা আর ঘুমিয়ে যাবার পার্থক্য বোঝবার ক্ষমতা আমার চলে গেছে। আজ আমার একটানা স্বপ্ন। সেই স্বপ্নের মধ্যে কখন জেগে থাকা—কখন ঘুম—কোনো খোঁজ রাখব না। আমি স্বপ্ন লোকের চাবি পেয়ে গেছি। ঘুম আর জেগে থাকা একাকার। স্বপ্নকে নামিয়ে জেগে থাকা আর ঘুমিয়ে থাকা দুই-ইকেই তাড়িয়ে দেব।

—স্বপ্ন তো ভেঙে যায় শেষ পর্যন্ত।

—যারা বোকার মতো—জাগতে চায়।—যেন জগতকে বুঝতে পারাই জীবনের সবচেয়ে বড় কথা—যেন সত্য জ্ঞানই শ্রেষ্ঠ জ্ঞান। একদিন যখন সত্য জ্ঞান হয়—তখন স্বপ্নের জন্যে তাদের কাঙালপনা দেখ একবার। যেদিন বুঝতে পারে, দেহের সঙ্গে আত্মারও সহমরণ—মৃত্যু নিশ্চিহ্ন করে দেয় সব অস্তিত্ব। তখন যদি ভগবান আত্মার অমরত্ব এ সব আত্মপ্রবঞ্চনা থেকে আত্মরক্ষা করতেও পারে—পারবার মতো মনের জোর থাকে—তখন তাদের দেখ—স্বপ্নের জন্যে, মায়ার জন্যে কী লোলুপতা। তখন ঘুমের ওষুধে স্বপ্ন আসে না—অন্তরের আতঙ্ক ঘুমকে দুঃস্বপ্নে পরিনত করে। আজ আমার স্বপ্ন ভাঙবে না—আসলে স্বপ্ন ভাঙে না—স্বপ্ন শেষ হয়।

—ঠিক আছে, স্বপ্ন রাজত্ব করুক জেগে থাকবার সময়—ঘুমের সময়।

—আসলে ঘুম, জেগে থাকা আর স্বপ্ন—এই তিনটেই সত্য। আর স্বপ্নটা বেশি সত্য। স্বপ্ন জেগে থাকাকে সুস্বাদু করে—ঘুমকে মিষ্টি করে।

—স্বপ্নে একঘেয়েমি নেই?

—না, স্বপ্ন অসংলগ্ন, বদ্ধ, বিচিত্র, অসংবদ্ধ। স্বপ্ন আমাদের অন্তরের একান্ত নিজের। নিজের মধ্যে অবশ্য দু'জন থাকে—দুইয়ে দুইয়ে দুই। আবার ইমপরসনাল হচ্ছি। আসলে স্বপ্ন ঘুমের সম্পত্তি—বদ্ধ কুসংস্কার—বহু অভ্যাসের ফলে এ ধারণা জন্মেছে।

এতক্ষণে নিজের প্রতিষ্ঠা হওয়ায়—ওর কথা রমা মন দিয়ে তন্ময় হয়ে শুনছে দেখে তৃপ্তি লাভ করে কল্যাণ যেন পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। এতক্ষনকার কথা বলবার তৃপ্তি—আর রমার মুখে কোনো জবাব দেবার চেষ্টা নেই দেখে বরং একটা প্রচ্ছন্ন মুগ্ধতা লক্ষ্য করে—যদিও মুগ্ধতা ওর চেহারার জন্যে, না কথার জন্যে তা নিয়ে মনে সংশয় থাকলেও—সেই সংশয়কে কল্যাণ মনে জায়গা দিতে রাজি হল না।

ঠিক এমনি সময় রমার চোখ ঘড়ির দিকে পড়তেই—কল্যাণ উঠে দাঁড়াল। ঠিক ন'টা। কল্যাণ বলল—অন্যদিন তোমাকে পাইনি—আজ পেলাম। তাই অন্যদিন তুমি

যাবার তাড়া দিয়েছ—আমি অনিচ্ছাসত্ত্বেও গেছি। আজ তুমি থাকতে বলেছ—আমি থাকতে পারি। কিন্তু ন'টার পর থাকা—তোমার মা-বাবা—তারা ঠিক আমাদের স্বপ্নলোকের ইনকোয়ারি অফিসে এসে খোঁজখবর করবেন—বোধ হয় ঠিক নয়। উঠি। যাচ্ছি। এতদিন তোমাকে চুরি করে নিয়ে গেছি—টেরও পাওনি। আজ ডাকাতি করলাম। আজ নীরবে সারারাত তোমাকে অনুভব করব।

প্রসন্ন মনে রমা বলে—এস।

দু'জনেই দরজার কাছে আসে। দরজার বাইরে দাঁড়ায়। রাস্তায় লোকজন নেই। সামনের লাইট পোস্টের বালব প্রায়ই চুরি যায়। আজও নেই। দরজা ভেজিয়ে দু'জনেই চারদিক তাকায়। রমার চারদিক তাকানো দেখেই কল্যাণ মুহূর্তে ওকে একটা চুমো খায়। দু'জনেই হাত ধরে ঝাঁকুনি দেয়। কল্যাণ রমার হাত ঠোঁটে স্পর্শ করে হেসে রাস্তায় চলতে থাকে। বারবার ফিরে ফিরে তাকায়।

যতদূর দেখা যায় রমা দাঁড়িয়ে রইল। মনে হয়, এই দরজায় ঢোকবার সময় বলেছিল, যে রাতে মোর দুয়ার খানি ভাঙল ঝড়ে.....। রমার মনে হল, কল্যাণ সব সুন্দর—ওর কথা সুন্দর—ও নিজে সুন্দরতর।

রমা যেন স্তব্ধ হয়ে দরজার পাশে দাঁড়িয়ে রইল। কতক্ষণ কে জানে। টাইম ডিসকনটিনিউয়াস!

মফঃসল শহর হলেও মীনাদের ফ্ল্যাটটি সাজানো গোছানো—ঝক ঝকে তক তকে। শহরটিও মোটামুটি পরিচ্ছন্ন।

মীনার থাকবার মধ্যে আছে এক বিধবা শাশুড়ি—এক বিবাহিত ননদ। ননদ মাঝে মধ্যে এসে থেকে যায়। এবার একটা প্রকাশ্য মনকষাকষির মধ্যেই ননদ চোখের জলে বিদায় নিয়েছে। ঠিক করেছে, আর নয়—একটা মাত্র দাদা—তাই ছুটে ছুটে আসি—না, আর আসব না। দাদার কাছে অভিযোগ করেও কিছু হয় না—আর ঠিক সব কথা দাদাকে বলাও যায় না। কী দেমাকী! বাপের বাড়ি বলতে অজ্ঞান। ওর বৌদি যে প্রচ্ছন্নে ওদের পরিবারকে হেয় করে—এ পরিবারের তুলনায় যেন বৌদি মস্ত একটা কিছু—এ ভাবটি ননদের কাছে অসহ্য। তার স্বামীও ডাক্তার—এম.ডি সঙ্গে মস্ত বিলিতি ডিগ্রী—গভর্নমেন্ট হাসপাতালের ডাক্তার—গায়োনোকোলজিস্ট। হাসপাতাল ছাড়াও নার্সিংহোসের সঙ্গে যুক্ত। নিজের বাসাতেও চেম্বার রয়েছে। গাড়ি কেনেনি—নিছক লোকের চোখ টাটাবে বলে। কিন্তু এবার চোখের জলে মীনার ননদ—কমলা—স্বামীকে দিয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়েছে—এক মাসের মধ্যে মোটর কিনতে হবে—ওর বাপের বাড়ির দেমাক ভাঙতে হবে। দাদা কী বলেন? আমার দাদা মুন্সেফ—আজ বাদে কাল যুদ্ধ হবে—ভাবখানা, কী আর এমন কাজ করে—যা মাইনে পায়—লোকের কাছে বলতে লজ্জা করে। আমিও ছেড়ে দিইনি—বলেছি—তোমার দুই দাদাই তো শুনেছি—মাত্র বি.এ.পাশ করেছে—তা তো তুমিও করেছ—আমিও করেছি—আমার দাদা কিন্তু শুধু এম.এ. নয়—ডাবল্যু বি জে. এস—তোমাদের বংশে এখন পর্যন্ত কিন্তু কেউ—

শুনেছি, তোমার দাদা বা সরকারী ক্লার্কশিপ পরীক্ষায় পাশও করতে পারেনি । বৌদি কি বলল জান?—আমার বাবা ও বড়দার কথা ছেড়েই দাও মেজদাও যে টাকা রোজগার করে একসঙ্গে তা চোখেও দেখেছে কিনা সন্দেহ—রীনার বরও সি.এ—কি রকম টাকা আয় করে একবার দেখে এস। কমলা অসহ্য ক্রোধ সংবরণ করে আস্তে আস্তে বলে—তবে রীনা চাকরী করে কেন? আমরা তো জানি, দু'জনের আয়েই সংসার চলে। মীনা বেশ ক্রুদ্ধ কণ্ঠেই জবাব দিল—কল্যাণকে দেখে এস—ওদের সংসার দেখে এস—দেখতে শুনতে রূপে গুণে—তোমাদের পরিবারের কারোরই পাশে দাঁড়াবার যোগ্যতাও নেই। বলেই ঝনাৎ করে চাবি শুদ্ধ আঁচল পিঠের 'পর ফেলে পাশের ঘরে মীনা চলে যায়। কিন্তু পেছনে পেছনে কমলা এসে তীক্ষ্ণ স্বরে জিজ্ঞেস করে—তবে তোমার অমন বাবা দাদা—তারা আমাদের মতো ঘরে তোমাকে দিলেন কেন? তোমার জন্যে যোগ্য পাত্র জোটালেন না কেন? শোন বৌদি, আমি প্রথম থেকেই লক্ষ্য করছি—তুমি যেন লাটসাহেবের মেয়ে—রাজ্যপাল ভবন থেকে নেমে এসেছ—যেন দয়া করে থাকছ—আর কোন দিন তুমি আমার বাপের বাড়ি সম্পর্কে যদি সাবধানে কথা না বল তা হলে আমি তোমাকে ছেড়ে দেব—ভেব না। মীনাও ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে একবার কমলাকে লেহন করে বলল—আমার নিজের বাসাতে কী একটা ঘরে একা থাকবার উপায় নেই। কমলা সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল—কত তুমি একা থাকতে চাও—ও সব তুমি দাদাকে বুঝিও। আচ্ছা আমি যাচ্ছি। কমলা সঙ্গে সঙ্গে দাদার ঘরে এসে ফোনের রিসিভার তুলে এক্সচেঞ্জে একটা নাম্বার বুক করল। সেদিন একটা ছুটির দিন ছিল। দাদা বাসাতে একটা বই পড়ছিলেন। কমলাকে এমন আগুনের মতো ছুটে আসতে দেখে—আর নম্বর বুক করতে দেখে—প্রায় সব কিছুই তিনি আন্দাজ করতে পারলেন। তবু জিজ্ঞেস করলেন না। ঠিক এমন একটা বিস্ফোরণ যে ঘটতে পারে তা নিয়ে চিন্তা অহরহ ছিল। তবু যতক্ষণ ঝগড়াটি অভিযোগ আর অনুযোগে প্রকাশ না পায় ততটুকু মুহূর্তই তাঁর লাভ। যতক্ষণ নিশ্চিন্তে থাকবার অর্থাৎ না জানবার ভান করা যায় ততক্ষণই লাভ। একবার দাদার মুখের দিকে তাকিয়েই কমলা তা বুঝে নিল। অর্থাৎ ঝগড়া-ঝাটির বিচার দাদা করতে চায় না—পারবেও না। বলেও লাভ নেই। যদিও ঠিক করল বিনা ভূমিকায় চলে যাবে—তবু তা যে পারবে না তা ভালো করেই জানত। অমন মিনমিনে বলেই তো দাদার কপালে এমন জুটেছে। চাবুক মেরে এদের শায়েস্তা করতে হয়। দাদার ঘরে এস.ডি.ও এলে তিনি নড়বেন না—জজ্ এলে নড়বেন না—কারণ দেখতে তাঁরা সুন্দর। ভেবেছে আমি বুঝি না। দাদার চোখ নেই—কিন্তু বৌদি কাদের দেখলে খুশি হয়ে ওঠে—মেজাজ খুপ সুরৎ (স্বামীর দেওয়া) থাকে তা কী জানিনে। তুমি কী ধরনের মেয়ে—বুঝতে আমার বাকি নেই। একটু পরেই টেলিফোন বেজে উঠল। লাইন পাওয়া গেল। কমলা জানাল—আমি আজই যাব—নেকস্ট ট্রেনে তোমাকে আসতে হবে—চুলোয় যাক অপারেশন—এখন ন'টা—তুমি বারোটার মধ্যে আসবে—হ্যাঁ খেয়ে এসো—আমি একটা সাতের ট্রেনেই তোমার সঙ্গে যাব। তুমি যদি নাই আস—তবে—আমি—আচ্ছা, বারোটার মধ্যে কিন্তু। রিসিভার নামিয়ে কমলা দাদাকে বলল—দাদা শোনো, বৌদিকে বারণ করে দেবে—যেন আমার বাপের বাড়ির নিন্দে আমার কাছে

না করে আর তোমার নিন্দে ওর বাপের বাড়ি গিয়ে করে—বলে দিয়ো। আমি চলে যাচ্ছি। ভাবছি, মাকেও নিয়ে যাব। বলেই কমলা দাদাকে কোনো জবাব দেবার সুযোগ না দিয়ে সোজা মা'র ঘরে—ভাড়ার ঘরে এসে হাজির। মা সব কথাই শুনছিলেন। কারণ কারো কণ্ঠস্বর মৃদু ছিল না। এসে দেখলেন তিনি কাঁদছেন। মা—কমলা তখন আবেগে কাঁপছে—আমার সঙ্গে চলো। আমার শাশুড়ি নেই—তোমার জামাই তোমাকে মাথায় করে রাখবেন। তোমাকে মা'র মতো দেখে। কমলার এমনিতে রঙ খুব ফর্সা—কিছুটা পাতলা—মোটামোটি সুশ্রী—চোখ দুটো খুবই বড়—আয়ত—বাবা আদর করে ডাকতেন পটলি বলে। মীনার মতো অমন ডাকসাইটে সুন্দরী না হলেও বেশ সুশ্রী—সুন্দরী বলা চলে। আজ যেন সেই ফরসা মুখ আগুনের তাপে লাল টকটকে। মা'র চোখের জল মুহূর্তে যেন কমলাকে স্মরণ করিয়ে দিল—এমনি ছেলের বৌয়ের হাতে নির্যাতন হয়তো মা'র নিত্য পাওনা। মা'র কান্না প্রথমে একটু 'সংক্রমণের মতো কান্নার ঢেউ ওর অন্তরে খেলে গেলেও—রাগের তাপে তা এক পলকে শুকিয়ে গেল। বলল—দাদা একা থাকবে—এই তো দুশ্চিন্তা তোমার। দাদা একাই থাকে। বরং তুমি থাকলে দাদা যে একা তা দাদা বুঝতে পারে না। দাদার বোঝা উচিত। আর নাতি নাতনি—জীবনে অনেক দুঃখ পেয়েছ—এটুকুও সইবে। আর আমারও দুটি রয়েছে। তারাও তোমার পর নয়। তুমি চল। দুদিনেই এরা ভুলে যাবে। আজ তোমাকে যেতেই হবে। তোমাকে এ অবস্থায় ফেলে আমি যেতে পারব না। যেমন তুমি—তেমনি দাদা—এমন মিনমিনে—পড়তো আমার শাশুড়ির পাল্লায়। যে ক বছর বেঁচে ছিল—কাঁটা হয়ে থাকতাম। বৌকে শাসন করতে হয় কী করে—তা তোমরা জান না। আর কোন সংসার হলে বৌকে সোজা বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দিত—আর কোনদিন খোঁজও করত না। একটু থেমে কমলা জানাল—আর আমি আসছিনে। তুমি চল—বল, কী কী নেবে—তোমরা জামাই বারোটার মধ্যে এসে পড়বে—আমি গুছিয়ে নিচ্ছি—তোমারটাও গুছিয়ে দিচ্ছি।

কমলা ও মীনার মধ্যে মন কষাকষির সূচনা আজকের নয়। মাঝে মধ্যেই সীমান্ত-সংঘর্ষ চলছিল। এই কমলাই মীনাকে দেখতে যায় ও পছন্দ করে। মা ও কমলার বর সঙ্গে ছিল। পছন্দ তিন জনেরই হয়েছিল। আর কমলা খুশি ছিল, এমন সুন্দর বৌদি হবে—ঘর আলো করে থাকবে। কমলার মার মীনাকে পছন্দ ছাড়াও মীনাদের ঐশ্বর্য—ফ্রিজ, রেডিওগ্রাম—গাড়ি এসব দেখে আর ছেলেটার কোনোদিন কোনো মুরুব্বি নেই—একটা জাদরেল হিতৈষী হবে এ চিন্তায়ও আকৃষ্ট হয়েছিলেন। কমলার বর অবশ্য রাস্তায় এদের আলোচনায় কোন মন্তব্য করেননি—স্ত্রীর উচ্ছলতা, শাশুড়ির মুগ্ধভাব দেখে তিনি নিজের মন্তব্য প্রায় অস্পষ্ট করে প্রকাশ করলেন। মীনাকে দেখে তিনি অবশ্যই মুগ্ধ হয়েছিলেন। তিনি ডাক্তার। ভদ্রলোকের মাথায় টাক বেশ চকচকে—অল্প বয়সেই চুল উঠে গিয়েছিল। বেশ গোলগাল স্বাস্থ্য—রং কালো ও মাজা। মেয়ে দেখে বাসায় ফিরে তখন আলোচনা চলছিল—মা রান্না ঘরে যেতেই এক ফাঁকে কমলা স্বামীকে জিজ্ঞেস করল—এমন চুপ করে কেন ডাক্তারবাবু? কেমন স্বাস্থ্য দেখলে, তোমার পেসেন্ট হবে না নিশ্চয় জেনো। তারপর ফিস ফিস করে কানে কানে বল্ল—কি আপসোস হচ্ছে? বিয়ের আগে দেখলে এই খেঁদি পেঁচিকে ঘরে তুলতে হত না।

স্ত্রী ভাগ্য ভালো নয়। ভদ্রলোক হাসলেন। তারপর জানালেন—সত্যি, মানুষ চেনবার ক্ষমতা বিধাতা মেয়েদের দেননি। দিলে জনসংখ্যা অনেক কম হত। আমাদের দেশের এত জনসংখ্যার একটা প্রধান কারণ হল—মেয়েরা মানুষ চিনতে পারে না। পরিবারটি কী রকম হামবাড়া লক্ষ্য করেছ? লক্ষ্য করেছ ভদ্রলোক বলতে চাইছিলেন অনেক আই.এ.এস পাত্র ঘুরোঘুরি করছে কিন্তু দাদাকে তিনি পছন্দ করেছেন কারণ সংসার ছোট বলে আর দাদা সোবার বলে। এ কথার পর এখানে সম্বন্ধ করা তোমরা বুঝে দেখো কমলার মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেল।—মাতো—তোমার পছন্দ না হলে এখানে করবেন না। আর মেয়েটি কেমন বল না?—অসাধারণ সুন্দরী। এর বেশি কিছু বলতে পারব না—এটুকু অনুমান করতে পারি—যে রকম অভ্যস্তভাবে এসে বসল—তাতে আরো বহুবার একে দেখে গেছে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে—সে সব জায়গায় হয়নি কেন? কিন্তু কমলার মুগ্ধভাব দেখে তিনি একটুকু হাসলেন মাত্র। তারপর, শাশুড়ি যখন অত্যন্ত প্রসন্নভাবে যেন একটা 'হ্যাঁ' উত্তর প্রত্যাশা করে তাঁর মতামত চাইলেন—তখন তিনি জানালেন, আগে দাদা দেখুন—তারপর আলোচনা হবে। কমলার দাদা বরুন যখন মেয়ে দেখে ফিরল এবং তার চোখেমুখে প্রচ্ছন্ন মুগ্ধভাব আর কমলার বরের ওপর সব সিদ্ধান্ত নেবার দায়িত্ব ছেড়ে দিল—তখন তাঁর বুঝতে অসুবিধে হল না : কী উত্তর তাঁর কাছে চাওয়া হচ্ছে। তিনি মত দিলেন। শুভরাত্রির পর দিন বৌদির সঙ্গে একা বসে বসে যখন হাসি ঠাট্টা করছিলেন, তখন বারবারই কমলা জিজ্ঞেস করছিল—কিগো মিস ইন্ডিয়া—না, না, এখন তো মিসেস—মিসেস ইন্ডিয়া—আমার দাদাকে পছন্দ হল? মীনা যেন কেমন ঠান্ডা হয়ে গেল—কমলা হ্যাঁ উত্তর আশা করেনি, একটু মৃদু লজ্জা, মৃদু হাসি, বা এমনি কিছু প্রত্যাশাই করছিল। আসলে যতক্ষণ দাদার বিয়ে হবে বা হচ্ছিল—কমলা তাই নিয়ে মেতে ছিল। কিন্তু বিয়ে হয়ে যেতেই—বৌ আসবার পর থেকেই কেমন যেন মনে হচ্ছিল -এতদিন দূরে শ্বশুড়বাড়ি থাকলেও—অহরহ ছুটে এসে দাদার সংসার ঠিক করে যেত—ওর যে এতদিন একার অধিকার ছিল—আজ বৌদিকে তা ছেড়ে দিতে হবে। এই একটা সূক্ষ্ম অথচ আমল না পাওয়া—ছেড়ে যাবার অধিকার হারাবার বেদনাকে পাশ কাটাবার জন্যে সকাল থেকে বৌদিকে নিয়ে পড়েছে। হাসি ঠাট্টার সঙ্গে সঙ্গে জানাল—এবার ওর ছুটি—বাপের বাড়ি এসে যেন আদের যত্ন পুরো মাত্রায় পেতে পারে—বাব্বা, এতদিন পর ওর ছুটি জুটল। যাইহোক দাদাকে পছন্দ হল কিনা এই প্রশ্নের উত্তরে মীনার কেমন নিশ্চুপ হয়ে যাওয়া—শীতল হয়ে যাওয়াকে কমলা নিজের জোর করে ধরে রাখা খুশির তোড়ে খুব খেয়াল করল না। প্রথামতো পীড়াপীড়ি করতে লাগল। কিন্তু ভেতরে ভেতরে যেন একটা বেসুরেভাব মীনার মধ্যে ফুটে উঠেছিল—তা যেন স্বীকার করতে চাইল না। যদিও বৌ বরণ থেকেই মীনা আর কমলা পরস্পর 'তুমি' হয়ে গিয়েছিল। আর মীনা যেন এই বাড়ির মধ্যে কমলাকেই পছন্দ করেছিল—এমন একটা ভাবও মীনার মধ্যে ফুটে উঠেছিল। সমবয়সি বলে তো বটেই—স্বামীকে ভালো লাগার কথা বলতে নেই—সেই প্রথার জন্যেই কমলা ভেবেছিল মীনা ওকে পছন্দ করেছে। তাছাড়া একটা মাত্র ননদও তো বটে। যাই হোক, পীড়াপীড়ির মুখে হঠাৎ মীনা বলে বসল : তোমার বরকে যদি তোমার পছন্দ হয়ে

থাকে—আমারও হয়েছে। মুহূর্তে কমলা উত্তর দিতে পারল না—শুধু তাই নয়, যেন এতটুকু হয়ে গেল। তারপর বলল—ওর কথা বাদ দাও—ওতো নিগ্রো—ঘানা থেকে এসেছে—আমি তো বলি, হাইলে সেলাসি ওকে এখানে ফেলে রেখে গেছে। কী আর করব—একা একা থাকবে—বিদেশি লোক—বিয়ে করে ফেললাম। আমার দাদার সঙ্গে কিন্তু—কমলা উঠে গিয়ে বারান্দায় একা কিছুক্ষণ চুপ করে দাড়িয়ে রইল। তারপর চোখের জল মুছে বাড়ির কাজে লেগে গেল। বিয়ের দিনদশেক পরে যখন কমলা ফিরে গেল—তখন রাতে স্বামীর বুকে মুখ রেখে বলল—তুমি ঠিকই বলেছিলে আমরা মেয়েরা মানুষ চিনিনে। বিয়েটা না হলেই হত—মাকাল ফল নয়—বাইরেটা মাকাল—ভেতরটা কী বলব? শুধু অপরিষ্কার নয়—তোমার কোনো ডেটলে বা ভ্যাকুয়াম ক্লিনারে পরিষ্কার হবার নয়। তুমি জোর করলে না কেন? মা তোমার 'পর এত নির্ভর করেন—তুমি যদি বানচাল করে দিতে.....। কী হয়েছে? কমলা সেদিনকার কথা বলল। শেষে বলল—একটা কথা বুঝতে পারলাম না—বৌদি সত্যি সত্যি মনমরা মেয়ে, না, আমাদের সংসার পছন্দ হয়নি বলেই মনমরা। কেমন একটা বিশ্রী রকমের চুপচাপ লক্ষ্য করেছ। শুধু বাপের বাড়ি যাবার সময় একটু যেন খুশি। তাও যে খুব খুশি—চাপা খুশি যা চোখে মুখে ফেটে পড়ে তেমন নয়। কেমন যেন—দূর—একটা বৌদি। ভদ্রলোক অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিলেন—অনেকক্ষণই। বললেন, তোমরা সবাই রাজি, খুশি—যাক, মেজরিটির ভারডিক্ট আমি মেনে নিলেম—এবার তো বুঝলে, মেজরিটির মত কখনও ঠিক হয় না। এ যুগ যে মেজরিটি বা মাইনরিটির যুগ নয়—এক্সপার্টের যুগ—এইটে মানুষ শুধু টেকনিক্যাল ফিল্ড ছাড়া কোথাও স্বীকার করতে চায়নি। আমি অবশ্য একটা কিছু হয়েছে—তোমার মুখ দেখে বুঝেছি—তোমার হৈ হুল্লোড়ও কেমন প্রাণহীন ছিল—তা তোমার বৌদি ছাড়া বোধ হয় সবারই চোখে পড়েছে। তুমি এক কাজ করলে না কেন? জানিয়ে দিলেই পারতে—আমার মতের জন্যে বিয়ে হয়েছে—নইলে অনায়াসে আই.এ.এস পাত্র—সুপুরুষ—কপালে জুটত। তখন আমার 'পর রাগটা কেমন হত—ফাইনাল রাগ—বা হায়ার সেকেন্ডারী—রাগ দেখা যেত। যাক—শুরু হল তা হলে? তা তোমার এত লাগল কেন? তোমার স্বামী যে দেখতে ভালো নয়—এই দুর্বল জায়গায় ঘা খেয়েছে বলে—যাকে ভালবাস তাঁর রূপ নিয়ে গর্ব করতে পারছ না—এই ক্ষোভ জাগিয়ে তুলল বলে—না, নিজের রুচির নিন্দে শুনে ক্ষেপে গিয়েছিলে। কমলা বুকে মুখ রেখে জানাল, আমি তোমাকে ভালবাসি কিনা—তোমার মন তা জানে—তোমার অন্তর্যামী জানে। দুদিন বাপের বাড়ি গিয়ে স্থির হয়ে কখনো থাকতে পারিনি—তোমাকে ভালবাসার শক্তি যদি আমার কম থাকত—তবে আমি অনেক শান্তি পেতাম। তুমি আমাকে অশান্ত করে রাখ। ভালবেসে এটুকু বুঝেছি—এত আকর্ষণ সত্যি সুখের নয়—এতে আনন্দ থাকতে পারে—শান্তি নেই, স্বস্তি নেই—সারাক্ষণ মনটা পড়ে থাকে—যাও—এত করে শুনতে হবে না। ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে কমলার বর—নরেন অন্যমনস্ক হয়ে যায়। কমলাকে তিনি সত্যি ভালবাসেন—আর কমলা যে ওকে তীব্রভাবে ভালবাসে তাও তিনি বুঝতে পারেন। তিনি দেখতে সুন্দর নন—এ কথা তাঁর চেয়ে বেশি কে জানে। মেডিক্যাল কলেজে পড়বার সময় কোনো

মেয়ে ফিরেও তাকায়নি। অথচ তখন এক এক জনের সঙ্গে আলাপ করবার কী উৎকণ্ঠা ছিল—একটু কথা—একটু হাসি—কিন্তু নিজের রূপের অভাব নিয়ে ছিলেন আত্মসচেতন। বিলেতে তিনি অনেক সহজ ছিলেন। অনেকের সঙ্গে যোগাযোগও ঘটেছিল—কিন্তু তা যেন বাইরেকার ব্যাপার। ওখানে অনেকেরই কথা মনে আছে—কেউ মনে দাগ কাটেনি। তাছাড়া পড়াশুনার কাজের চাপে—সোম থেকে শুক্রবার পর্যন্ত তিনি মাথা তুলতে পারতেন না। তাছাড়া মেয়েদের কাছ থেকে অবহেলার ভয় সারাক্ষণ তাকে কেমন সঙ্কুচিত করে রাখত। তিনি লম্বা নন, মাথায় চুল তখনই কমে আসছিল—তাছাড়া কটকটে কালো। কমলাকে তিনি বিয়ে ক'রবার 'পর—কমলার আকর্ষণ, কমলার মুগ্ধতা—তাকে ছেড়ে কমলার এক মুহূর্তও থাকতে না পারা—সিনেমায়, রেষ্টুরেন্টে যাওয়া—উত্তর ভারত ঘোরবার সময় বাইরের লোকের সামনেই তাকে জোর করে শীতের জামা পরান—অনেক সময় যেন পরিবেশ ভুলিয়ে দিত। নরেন লজ্জা পেত। কমলার ভালবাসার মধ্য দিয়েই মেয়েদের সম্পর্কে তাঁর তিক্ততা কমে গিয়েছিল—অনেক সহজ হয়ে এসেছিল মেয়েদের সম্পর্ক। কমলা তাঁকে ছেড়ে থাকতে পারত না। হায়, কমলা কী জানে—বাপের বাড়ি গেলে তাঁর ঘরে থাকা অসহ্য হয়ে যায়—কমলা সমস্ত মনকে আচ্ছন্ন করে রাখে। কিন্তু তিনি কমলাকে তাড়াতাড়ি আসতে বলতেন না। কমলা নিজেই চলে আসত। আজ গাইনোকলজিষ্ট—রোগীদের সঙ্গে সহজ ও সস্নেহ আচরণ করতে পারছেন—তাও কমলার জন্যে। সবাই জানত, নিতান্ত বিলেত ফেরত বলেই কমলার মতো সুন্দরী তাঁর জুটেছে। কিন্তু তিনি তো জানেন, কমলা তাঁর ষ্ট্যাটাসের জন্যে ব্যগ্র নয়—তাকেই চায়। একটু দেরী হলে হবে—তারপর নিজেই খাতির করবে। কমলা সরল, সত্যবাদী, বুদ্ধিমতী। নরেনের এক মামা আছে। ভদ্রলোক কখনো কনট্রাকটারী, কখনো মার্চেন্ট—কখনো মেডিক্যাল রিপ্রেসেনটেটিভ—নানা কাজ—নানা রকম ক্যারিয়ার। কিন্তু মধ্যে মধ্যে দীর্ঘকাল বেকার—সংসার চলে না। কিন্তু তা তিনি গোপন করেন—তখন সংসার চলে না—বাড়িতে হাঁড়ি চড়ে না এমন অবস্থা। হঠাৎ কিছু মাল সস্তা পাওয়া যাচ্ছে বৌমা—হাত একদম খালি—গোটা পঞ্চাশেক টাকা—হবে? অঙ্কটা করে রাখলে.....। কমলা মাথা নেড়ে তক্ষুনি পঞ্চাশ টাকা এনে দেয়। চা জল খাবারও খেতে তর সয়না। তবু, কমলা জোর করে চা জল খাবার খাইয়ে দেন। তিনি যেন নরেন আসবার আগেই যেতে চান। একটা আতঙ্ক নিয়ে চা জলখাবার খেয়ে তাড়াতাড়ি বের হয়ে যান। স্টকটা ক'দিন থাকবে—টাকাটা পেতে একটু দেরী হবে বৌমা—আগে দামটা চড়ুক। তিনি কমলাকে আর্শীবাদ করে চলে যান। রাতে নরেন শুনতে পেল—তাও বড় ছেলে টুনটুনের কাছে—মেজ দাদু এসেছিল। কমলাকে জিজ্ঞেস করেন—মেজ মামা এসেছিল? কমলা শান্তভাবে উত্তর দেয়—হ্যাঁ। দুপুরে বলনি তো?—আমি তো মেজমামা আসবার খবর তোমাকে এখনও বলনি—তুমি টুনটুনের কাছে শুনেছ।—যদি টুনটুন না বলত—তবে জানতে পারতেম না। কমলা তখন ইংরেজিতে জানাল—টুনটুনের সামনে তোমাকে এর উত্তর আমি দেব না। ওরা ঘুমুক—তখন বলব। টুনটুন তক্ষুনি ষ্টেনলেসষ্টিনের গ্লাসটি ছুড়ে ফেলে দিল—দিয়েই তাড়াতাড়ি চিৎকার করে টেক্সট বুক থেকে একটা ইংরেজি কবিতা বলতে লাগল। নরেন

জানাল—তোমার ইংরেজি বলায় কেমন রি-এ্যাকসন লক্ষ্য করছি। কমলা বলে, এক নম্বর হিংসুটে—তোমাকে আমাকে একটু বসতে দেখলেই বা কথা বলতে দেখলেই দুষ্টুমী শুরু করবে।—ও চায় না—ওর দিক থেকে মনোযোগ অন্যদিকে যায়। তোমাকে ওর দখলে রাখতে চায়।—হ্যাঁ, বাবার দখল ছেলে ছেড়ে দেবে কেন। ....রাতে কমলা জানাল, মেজ মামার কথা। নরেন কিছুটা বিরক্তির সঙ্গে বলল—স্টটক বাজে—বেকার। বোধ হয় টাইট অবস্থা—তাই ধাপ্পা দিয়ে। ও টাকা তুমি ফেরত পারে ভেবেছ। এমনিভাবে এরা আমার প্রেষ্টিজ..... তুমি ভবিষ্যতে....। শোন, কমলা শান্তভাবে জানাল, আবার চাইলে আবার পাবেন, এই টাকা রেশন আনবার জন্যে নিয়েছেন। একটা মানুষ কতদূর বিপদে পড়লে ভাগনে বৌ'র কাছে টাকা ধার চাইতে পারে—একবার অনুমান করত। তুমি স্বচ্ছল অবস্থায় বড় হয়েছ—আমি হইনি। দুঃখ কী জিনিস—আমি জানি। তা হলে আমাকে তোমায় ধাপ্পাবাজ বলতে হবে। দাদার টিউশনির টাকায় আমাদের সংসার চলত। বাড়িওয়ালা জানতেন মামারা টাকা পাঠায়। কোনো মামাই কোনো সাহায্য করতেন না। আমি কতবার মামাদের মনি ওর্ডার আসেনি—এ কথা বলে বাড়িওয়ালীর কাছ থেকে মাসের শেষে ধার করে এনেছি—আবার মাস কাবার হলে টাকা শোধ দিয়ে দিয়েছি। টাকা শোধ দিয়েছি ঠিক—কিন্তু তবু তো তা মিথ্যে কথা। আমি কলেজের দু'টো মেয়ের কাছ থেকে মাইনে আনতে ভুলে গেছি—একস্ট্রা কিছু আছে নাকিরে—ওরা বেশ বড়লোক ছিল—ভালবাসত আমাকে—পেয়ে যেতাম। আবার দিয়েও দিতেম। টিউশনি, কোচিং ক্লাস—এ সবের টাকা একসঙ্গে তো পাওয়া যেত না—একদিনে না। সবসময় দাদাকে উদ্বিগ্ন করতে কষ্ট হত। ওদিকে বুঝতেই পারছ—গভর্নমেন্ট কলেজ—ঠিক দিনে মাইনে না দিলে—ফাইন—তাই আমি ম্যানেজ করতাম। দাদা ঠাট্টা করে বলতেন—তুই খুব ওস্তাদ ধারবাজ হয়েছিস—মানুষ অনেক অসুবিধেয়, কষ্টে, দুঃখে, অপমানে ধারবাজ হয়। বলবে আমার মাথা কাটা যেত। কিন্তু এমনভাবে বলতাম—যেন কিছুই না—নিতান্তই মনিওর্ডার আসেনি—নিছক মনের ভুলে মাইনে আনিনি। আমাকে মিথ্যুক, চালিয়াৎ বলবে তুমি চাইবেনা জানি—কিন্তু তোমার কাছে মিথ্যা কোনদিন বলিনি—মিথ্যাকে আমি অপছন্দও করি—কিন্তু ছেলেমেয়ের মুখ চেয়ে যে মিথ্যা কথা বলে—আমি তাকে ক্ষমা করি, অন্যায় মনে করি না—আবার চাইলে বুঝব—মনে মনে কী যন্ত্রণা ও অপমান সহ্য করে এসেছেন—আবার পাবেনও। লোকে বাপের বাড়ি সম্পর্কে অনেক উজ্জ্বল ছবি স্বামীর কাছে দেয়—আমি সত্যকে ভালবাসি—হয়তো তোমাকে সত্যের চেয়েও ভালবাসি—যদি, ভগবান না করুন—প্রয়োজন হয়—তোমার জন্যেও ধার করব। যাক, আমি, দাদা, মা জীবনে কত দুঃখের মধ্য দিয়ে এসেছি—তার জন্যে আমার মনে কোনো ইনফিরিয়রিটি নেই। আমরা তো জিতেছি। একটা জিনিস জেন, যদি আমাকে কেউ ঠকাতে চায়—পারবে না। কিন্তু নিজের ছেলে মেয়েকে খাওয়াবার জন্যে—আর অপমানে তা বলতে না পারার জন্যে মিথ্যে বলে আমাকে ঠকাতে চায়—আমি ঠকবই। কী আমাকে মিথ্যাবাদী মনে হচ্ছে তো? ধার নিয়েছি—শোধ দিয়েছি—শুধু ধার নেবার সময় মিথ্যে বলেছি—নরেন বলে মা'র কাছ থেকে সিগারেট খাবার জন্যে, সিনেমা দেখার জন্যে, বই কেনার নাম করে

বন্ধুদের নিয়ে রেষ্টুরেন্টে বড়লোকগিরি দেখাবার জন্যে—আমার হাত খরচের জন্যে বাবা মা যা দিতেন—তাতে কোনো সন্তানেরই চলে না। তাই আবার বন্ধুদের কাছে ধার করেছি—আবার বড়লোকগিরি দেখাবার জন্যে ধারও দিয়েছি। সব ধার আমার এখনও শোধ হয়নি—সব ধার আমি পাইওনি। এখন ওরা সবাই প্রতিষ্ঠিত। শুধু গ্র্যান্ডে খাওয়ানো ছাড়া অন্যভাবে শোধ দেবার উপায় নেই। আমি বাবার কাছে মিথ্যে বলেছি, মার কাছে বলেছি, বন্ধুবান্ধবদের কাছে। তবে বাবা মা যে এককেবার টের পেতেন না তা নয়—তবে বুঝেও নিরুপায় ছিলেন। আমার মনে হয়, বাবা যতটা বুঝতেন—মা ততটা নয়। বরাবরই—ধর—ক্লাস নাইন থেকেই আমি স্মোক করি—নস্যি নেই—এখন হাত খরচে তা কুলোয় না। আমাদের সমাজ ব্যবস্থা এমন—বাবা মা'র কাছে সত্যি কথা বলবার উপায় নেই। আর যদি সত্যি কথা বল—তবে নেশাটেশা করতে পারবে না। তোমার দাদার মতো ব্রহ্মচারী হতে হয়। ....কমলা অন্যমনস্ক হয়—দাদার কষ্ট তুমি ভাবতে পারবে না। অনার্সে রেজাল্ট ভালো করলেন—একই সঙ্গে এম.এ.ল' আর অবিরাম টিউশনি—রাতে তিন ঘণ্টাও ঘুমোতেন না। এম.এ. পাশ করবার পর বছর দেড়েক একটা প্রাইভেট কলেজে—টিউশনি তখনও চলছে—তখন আমরা নিশ্চিন্ত হলাম—তারপর মুন্সেক। দাদার জীবনটাই কষ্টের। এমন বৌ আমরা জুটিয়ে দিলেম....। ...... তোমার দাদাকে এবার আমি ড্রিঙ্ক করতে—এমন ড্রাই হয়ে থাকেন—যেন সারাজীবনটাই শুক্রবার—যেন সারাজীবনটা রাত শুরু হয়েছে—ভোর ছ'টা পর্যন্ত চলবে। আমার একটা ডিউটি তো আছে—থাক, আর ডিউটি লাগবে না—যা আজকাল শুরু হয়েছে। কমলা বাইরে ড্রিঙ্ক করতে দেয় না। বাড়িতে নিজের হাতে ঢেলে একটা নির্দিষ্ট মাপের বাইরে কিছুতেই দেয়না। আর রোজই বলবে—রোজই চায়—বাঃ এতো বেশ অভ্যাস হয়ে উঠল দেখি। কিন্তু পীড়াপীড়ির জন্যে অপেক্ষা করত—কিন্তু কিছুতেই দিত না। কোট-জামা-সব ফেলে দিত—ওদিকে নরেনের শর্ত ছিল—ড্রিঙ্ক সার্ভ করতে হবে কমপ্লিট আনড্রেসড হয়ে। শর্তমানা হত। তারপর দু'জনেই ছোট্ট পাওয়ারের ব্লু বালব্ জ্বেলে অনেকক্ষণ গল্প করত। তারপর দেখা যেত, নরেন ঘুমিয়ে পড়ছে—তখন শুধু শাড়িটা জড়িয়ে পাশের ঘরে ছেলেমেয়ে দুটোর কাছে এসে ওদের মাথায় অনেকক্ষণ হাত বুলাত—চুমো খেত—তারপর ছেলেমেয়ের মাঝখানে এক সময়ে ঘুমিয়ে পড়ত। কিন্তু ডাক্তারের সংসার। হয়তো গভীর রাতে কলিং বেল বাজত—নরেন ঘুম-চোখে উঠে পড়ত—কলিং বেলের শব্দে কমলাও উঠে যেত। নরেন বের হবার পর অনেকক্ষণ চুপ করে বসে থাকত। খোলা জানলা দিয়ে ঘুমন্ত শহরের দিকে তাকিয়ে থাকত। কতক্ষণে ফিরবে কে জানে? তারপর ঘুমিয়ে পড়ত। শেষ রাতে কখন কলিং বেল বাজত—বামুনদি খুলে দিত—জানতই না। নরেন এসে নীরবে ওর শাড়ি খুলে দিয়ে চলে যেত। ভোরের আলোর সঙ্গে সঙ্গে ঘুম ভাঙতেই শাড়ির দিকে ফিরেই বুঝত—ফিরেছে—ওটা ওর ফেরবার সিম্বল। তাড়াতাড়ি উঠে ব্রেকফাষ্টের জোগাড় করতে হত—যদি ঘুম ভেঙে দেখত শাড়ি ঠিকই আছে তবে কেমন নীরস মনে হত—উঠবার তাগিদ বোধ করত না। এখনও ফেরেনি—কখন ফিরবে কে জানে? কখনো কখনো শেষরাতে যখন কলে বের হয়ে যেত—কমলার ঘুম আসত না। দোতলার জানলার

বাইরে ঘুমন্ত শহরের দিকে তাকিয়ে একমনে কত কী ভাবত উঠে জানলার কাছে অন্ধকারে একটা চেয়ারে বসে নানা ভাবনা, পুরানো কথা ইচ্ছেয় অনিচ্ছেয় ভেবে যেত। গরমকালে ফ্যানের হাওয়া আর শেষ রাতের ঠান্ডা হাওয়ায় কেমন একটু শীতও করত—মশাও কম। শীতকালে একটা শাল জড়িয়ে বসত—কিন্তু এত মশা—রোজ স্প্রে করেও অফুরন্ত মশার ঢেউ কমানো যেত না—তখনকার মতো কমতো। শেষ রাতে যেন মশা আবার দুইগুণ উৎসাহে ওকে ঘিরে ধরত। তবু শাল দিয়ে হাওয়া করত, কখনও বা বিছানায় শুয়ে বাঁ হাতের তেলোয় মাথা রেখে কতকি চিন্তা। ইচ্ছে হত, ওডোমস মেখে বরং বাইরে এসে বসে। কিন্তু মশা তাড়াবার জন্যে মুখে হাতে—এই শেষ রাতে ওগুলো মাখতে একটুও ইচ্ছে হত না। .....এই মফঃস্বল শহর—যদিও নাম করা—ওর বেশী—সারদিনে ফুরসৎ নেই। এরপর কোথায় বদলি হবে কে জানে? দু'দুবার বদলি রদ করেছে—এর পর কী পারবে? সারাজীবন তো রাখবে না? ওদিকে দেশের বাড়িটা পড়ে রয়েছে—পুজোর ক'দিন মাত্র যায়। পৈতৃক বাড়ি—বিয়ের পর কিছুকাল ঐখানেই কমলা থেকেছে। কত বড় বাড়ি। এখন অবশ্য একতলা—আর দোতলার একটা অংশ ভাড়া দিয়ে দিয়েছে। যদিও কমলার ধারণা—বাড়ি আন্দাজে ভাড়া বড় কম পায়—হোক মফঃস্বল শহর—এখানে ভাড়া কেমন? এও তো মফঃস্বল শহরই। দান ধ্যান কর—আপত্তি করছিনে। যে অত বড় বাড়ি নিতে চায়—তাকে অত কম ভাড়া দেবার সাধ কেন? ওরা কলকাতায় একটা ঘরে থাকত—কই, কেউ তো খাতির করেনি। নিজেদের দুঃখ দারিদ্র্যের কথা স্বামীকে অনেক বলেছে—বলে মনে অনুতাপও হয়েছে—ঠিক করলাম কি? মাকে—দাদাকে ছোট করলাম না তো—বড়লোকের মেয়ে নই—এতো ঠিকই—তবু, গায়ে পড়ে অতীতের দুঃখ কষ্ট—নিজেদের অতীতকে ওর কাছে হেয় করা হল না? কমলা আবার এই অনুতাপের কথা স্বামীকে জানিয়েছেও—আমাদের স্ট্রাগলের জীবন তোমার কাছে কিছুই লুকোয়নি—মাঝে মধ্যে মনে হয়—স্বামীকে সব কথা বলবার যে প্র্যাকটিস আমার এতে তুমি কী ভাব কে জানে? ভাবছ কোন হাভাতের ঘরে মেয়ে এলরে বাবা! মাঝে মাঝে ভাবনা হয়—এ ভাবে যে বলি—এতে মা-দাদাকে তোমার কাছে কী ছোট করে দিচ্ছিনে তোমার সাবকনসাস মনে ও কী ......আজকের সভ্যতা তো ষ্ট্যাটাস ভ্যালু দিয়ে বিচার হয় বাড়ি, গাড়ি, ফোন, ফ্রিজ, রেডিওগ্রাম, টেপরেকর্ডার—এই হচ্ছে মানুষের বিচারের মানদণ্ড। বলি, বলে অনুতাপও হয়, আবার জানি না বলেও পারব না। তাই কিছুই লুকোব না—লুকোতে পারিওনা—এটাই ধরে থাকব। যাকগে—তুমি যা খুশি ভাবগে—আমি বলবই। নরেন তখন জানায়—তোমার বাপের বাড়িতেও যা আছে—এখানেও প্রায় তাই আছে—ষ্ট্যাটাস ভ্যালু সমান। তোমার দাদাও সরকারী চাকুরে—আমিও তাই—ক্লাসটু গেজেটেড অফিসার। সামান্য একটু পার্থক্য—আমার একটু প্রাইভেট প্র্যাকটিস এইমাত্র—অন্যগুলোর কথাভাব—তোমার দাদার অবসর—রাতে নিশ্চিন্ত ঘুম। তোমার দাদা দেখতে সুশ্রী—তোমাদের কারো চেহারায় কোন স্ট্রাগলের ছাপ নেই—আর ফ্লাস ব্যাক দিয়ে তোমাকে আমার বুঝতে হবে না। একটা জিনিস মনে রেখ—যারা দেখতে ভাল হয় না—যাদের বাইরেটা মানুষকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দেয়—মানুষকে বোঝবার

ক্ষমতা তাদের অনেক বেশি। তুমি আমাকে যতটা বোঝ—আমি তোমাকে তাঁর চেয়ে ঢের বেশি বুঝি—তোমার বৌদি—আর তোমার মধ্যে যদি আমারে চয়েস করতে হ'ত—তবে আমি তোমাকেই পছন্দ করতাম—কারণ, তোমার মধ্যে ভালবাসবার শক্তি আছে—তুমি নিজেকে দিতে জান—তোমার বৌদি নিতে জানেন—নার্সিসাস্—বাংলায় কী বলে, আত্মপ্রেমিক। কমলা মাথা নেড়ে বলে, কমপ্লিমেন্ট দিলে কী হবে—তা হলেও আর এক পেগও পাবে না।—দিলে ভালো করতে—তবে তোমার বৌদি হলে—আর এই প্রশংশা শুনলে নিশ্চয়ই দিত। আদরে, প্রশ্রয়ে আর প্রশংসায় তোমার বৌদির মন বেড়ে ওঠেনি—শুধু দেহটাই আছে—যেমন শিশুর থাকে—আর শুধু ভাবছেন, তার জন্যেই পৃথিবীটা। শিশুর মতো সরল না—শিশু যেমন স্বার্থপর তেমনি। কমলা স্বামীকে একটু চুমু খায়—ও মাগো কী গন্ধ—একটু সময় বাড়ি থাকব—কাছে থাকবার উপায় নেই। নরেন হাত বাড়ায়। কমলা সিগারেট এগিয়ে দেয়। সিগারেট ধরিয়ে গন্ধটা সুস্থ করে। কমলা আঁচল দিয়ে নিজের ঠোট ও পরে নরেনের ঠোঁট মুছিয়ে দিয়ে বলে—দাদার ঘুমকে তুমি ঈর্ষা করছ—দাদা রাতে ঘুমোয় কিনা কে জানে? আজকাল তো দাদা স্লিপিং ড্রাগ খাচ্ছেন। এবারেই দেখলাম। বলছে, বড্ড একিউট ইনসমনিয়া। অনেক রাত পর্যন্ত জেগে বই পড়ছেন। বৌদি ঘুমিয়ে পড়েন কত আগে। নরেন চিন্তিত স্বরে বলে—হয়তো ঘুম না আসবার জন্যে স্লিপিং ড্রাগ খান না—জেগে থেকে নিজের মুখোমুখী হবার মতো সাহস হারিয়েছেন—এ জন্যেও ঘুমের ওষুধ খেতে পারেন। ..... শেষ রাতে একা বসে কমলার দাদার জন্যে কষ্ট হয়। বৌদি দাদাকে ভালবাসে কিনা তা নিয়ে খুব ভাবনা হয় তা নয়—বৌদি ওর সঙ্গে যে ব্যবহার করে—যেন দেখলে খুশি হয় না—এ কথা দাদার বাসায় পা দেওয়া মাত্র বুঝতে অসুবিধে হয় না। মা-দাদার কাছে যেতে না পারবার জন্যে কষ্ট হয়। মন হুহু করে। মাকে দেখতে ইচ্ছে করে ওকে দেখলে দাদার খুশি খুশি চোখ দুটো মনে আসে। ক'দিন এলে দাদাকে আদর যত্ন করতে ইচ্ছে করে। একা দাদা এসেছেনও। কিন্তু দু'চারটে কথা যা বলেন—তাও বৌদিরই। বৌদিকে সঙ্গে নিয়েও এসেছেন। বৌদির মুখে হাসি দেখলেই যেন দাদা প্রাণ পান। বৌদি কেমন ব্যবহার করবেন এ নিয়ে যেন দাদার দুশ্চিন্তা। বৌদি হাসি খুশি থাকলে দাদা যেন নিশ্চিন্ত হন। দাদার এভাবটা ওকে এত কষ্ট দেয়। দাদার সব মনোযোগ বৌদি নিয়ে নেওয়াতে ওর কষ্ট হয় না—ওর 'পর আর আগের মতো আকর্ষণ নেই—এ কথাও ওর মনে এলেও মনে কোনো ক্ষোভ তুলতে পারেনি। বৌদির 'পর দাদার অনুগত ভাবটা ঠিক ভাবতে না চাইলেও যে শব্দটা ওর মনে আসে তা হচ্ছে স্ত্রৈণ—ভাবতে কষ্ট হয়—না ভেবেও পারে না—এই স্ত্রৈণতা—ঐ বৌদির হাসিতে দাদার ধন্য হয়ে যাওয়া ভাবটা ওকে এত লাগে—দাদার চেহারা ওর কাছে এত খারাপ করে দেয়। আর বৌদির দাদার 'পর—ওর সংসারের 'পর তুচ্ছ তাচ্ছিল্য ভাবটি ওকে এমন ক্ষুব্ধ করে তোলে। আচ্ছা দাদাও কী বৌদির কাছে ওদের আগের জীবনের দারিদ্র্যের কথা—স্ট্রাগলের কথা বলেছে—বুঝে বলতে হবে তো। লোক বুঝে বলবে তো। না, তা নাও হতে পারে—প্রথম থেকেই বৌদির এমন তুচ্ছ তাচ্ছিল্য ভাবছিল—হয়তো ভাবটা শোনবার 'পর আরো জোরদার হয়েছে। এমন বৌকে কিভাবে শাসন করতে হয়—

চিরকালই শান্ত স্বভাবের দাদা—না, এখন বৌদিই দাদাকে শাসন করে চলেছে—দাদার এই স্লেভিস এডমিরেশন ..... ভোরের রাতে মনকে আর ক্ষুব্ধ করে সারাদিনটা নষ্ট করতে ইচ্ছে হয়না। কমলা আবার ঘুমিয়ে পড়বার চেষ্টা করে। একজন রাত জেগে রোগী দেখছে—আর একজন রাত না জাগবার জন্যে ঘুমের ওষুধ খাচ্ছে। একজন ঘুমুতে চায়—আর একজন জেগে থাকতে নাকি ভয়পায়। মা অবশ্য বেশ ভালই ঘুমোয়। ..... শেষ রাতে কখনও কখনও কত ইচ্ছে জাগে....প্রাইভেটে এম.এ পরীক্ষা দিয়ে দিলে হয়.....বসেই তো আছি .....পলিটিক্যাল সায়েন্সে....। তারপর না হয় বি.টিটা পড়ে নেব। ওকে বলেছেও। সঙ্গে সঙ্গে রাজি। সিলেবাসও এনে দিয়েছিল..... দু'চারখানা বই জোগাড় হয়েছিল। মাঝে মধ্যে উল্টে দেখে। ঐ পর্যন্তই। তারপর শেষ রাত না হলে আর এম.এ. দেবার কথাও মনে হয় না। সকালে বাচ্চাদের পড়াশুনা কমলা নিজেই তদারক করে—একগাদা করে স্কুল থেকে টাস্ক দেয়—ওদের ধমকে জোর করে সেগুলো তৈরি করে দেয়—স্কুলতো টাস্ক দিয়েই খালাস—ইংরেজি মিডিয়াম দিয়েছে—দিদিমণিদের ইংরেজি লেখার কী নমুনা! মেয়েটা কনভেন্টে পড়ে—হয়তো কিছু শিখেছে—তাও বাবুগিরি আর ষ্টাইল—ছেলেও ঐ কনভেন্টে—আর মাত্র দু'বছর পড়তে পারবে। এই কনভেন্টেও কটকট করে একটু ইংরেজি বলা ছাড়া আর কিছু শেখায় কিনা সন্দেহ। কতটা ইংরেজি শিখেছে ভগবান জানেন—কিন্তু যা হিন্দি গালাগাল শিখে আসছে—শুনলে শরীর শিউরে উঠবে। আর একটু চোখের আড়ালে গেলেই ঝগড়া করবে.... এখন কেমন নিরীহ হয়ে নিষ্পাপ হয়ে সুন্দর হয়ে ঘুমুচ্ছে। কাছে থাকলে ঐ ঘুমন্ত শিশু শিশু দুটোকেই কমলা চুমো খায়—দেখতে কী অসহায় লাগে। কমলা ওদের মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়—বড় হয়ে কে কী হবে কে জানে? ওর বাবার ইচ্ছে, ছেলে ইঞ্জিনিয়ার—মেয়ে ডাক্তার। মেয়েই বড়। ওর ইচ্ছে, কেউ একজন প্রফেসর হোক। দাদা তখন প্রফেসর ছিল—ওর খুব ভালো লাগত। মা'রও ভালো লাগত। ওর তখন ইচ্ছে হ'ত—স্পেস্যাল অনার্স দিয়ে তারপর এম.এ পাশ করে যদি কলেজে ঢোকা যায়। বি.এ. পাশ করবার পরই তো বিয়ে হয়ে গেল। আসলে সকাল সন্ধ্যা ওদের নিয়েই কাটে। রাতে ওর বাবা আসে। ওতো সকালে ব্রেকফাষ্ট খেয়েই চেম্বারে, চেম্বার থেকে হাসপাতালে—দুপুরে খেয়ে—কোনো কোনোদিন খাবার ফুরসৎ হয়না—ফলে চলে যেতে হয়.....বিকেলে আবার চেম্বার—আবার হাসপাতাল—দশটার আগে তো ফ্রি হয়না। বাচ্চারা স্কুলে চলে গেলে ওর আর কিছু করবার থাকে না। বামুনদি রান্না বান্নায় ওস্তাদ—হরিমোহন বাজার টাজার সব করে। কমলা গল্পের বই একটু পড়ে আর একটু পর পর তদারক করে আসে। গল্পের বই ওর নেশা তা তো আজকের নয়। সেই কলেজ জীবন থেকে স্কুল জীবন থেকে। তখন ছিল বাংলা উপন্যাস—দাদাই ওকে ইংরেজি উপন্যাস ধরাল। স্বাদ পেতে ওর দেরী হয়নি—দাদা ওকে চার্ট করে দিয়েছিল -সেই অনুয়ায়ী বইও এনে দিয়েছিল—বলেছিল—বই পড়ে একটা সামারী করে আনবি তো। সামারি দেখে দাদা কারেক্ট করে দিতেন। তারপর বলতেন, এইবার গল্পটা ইংরেজিতে বল। এইখানেই কমলার দারুন সঙ্কোচ। তারপর দাদা ঠিক করলেন ওর সঙ্গে ইংরেজি ছাড়া কথাই বলবেন না। চিরকাল দাদাকে মান্য করে এসেছেন। আস্তে আস্তে ইংরেজি

বলবার সঙ্কোচ ওর কেটে গেল। কলেজে শেষের দিকে যখন ক্লাসে প্রফেসরদের সঙ্গে ইংরেজিতে সহজ সব কথা বলত—তখন সবাই বলত—তুই ইংরেজিতে অনার্স নিসনি কেনরে। সত্যিই, দাদা প্রথমে অনার্স নিতেই বলেছিল। ওর আত্মবিশ্বাস ছিলনা। দাদাও জোর করেনি। একটু যদি জোর করতেন। কী ভাবে জোর করবেন—। তখন দাদারও সিক্সথ ইয়ার—ওদিকে ল' পড়ছেন—আর অহোরাত্র টিউশনি। তবু, ইংরেজি বইয়ের নেশা, ইংরেজি বলতে শেখা—ওর সব কিছুই দাদার জন্যে। আর আমার ডাক্তার সাহেব তো হয়তো দু'একখানা শরৎচন্দ্রের বই পড়েছেন—স্কুল জীবনে—ব্যস্ খতম। কতদিন শুয়ে শুয়ে ডাক্তারকে গল্প শুনিয়েছেন—অ্যানা করনিনা—ক্রাইম এন্ড পানিসমেন্ট—ব্রাদার কারামিজভ। শুনতে শুনতে ওর ঘুম এসে যেত। ঘুমিয়ে পড়লে কমলা থেমে যেত নিজের মনে বাকীটা চিন্তা করত। অথচ আশ্চর্য, পরেরদিন ডাক্তার বেমালুম ভুলে যেতেন কী গল্প শুনেছিল—আবার বেশ কিছুটা বলবার পর যেন পূর্ব জন্মের স্মৃতির মতো একটু একটু মনে আসত। কমলা গালে টোকা দিয়ে বলত—কি মেমারী তোমার—একটা গল্প মনে রাখতে পার না। আশ্চর্য বেচারী ছোটদের রামায়ণ মহাভারত ছাড়া আর কিছু পড়েওনি। আচ্ছা কৃত্তিবাস কাশীদাস না পড়....রাজশেখর বসুর বাংলা অনুবাদও তো পড়তে পার। ভালো করে রামায়ণ মহাভারতও মনে করতে পারে না। অথচ বাচ্চাদুটো ঠাকুরমার ঝুলি, রামায়ন মহাভারত মুখে মুখে শুনে গোগ্রাসে গিলেছে। ওরা কিন্তু ঘুমিয়ে পড়েনি। মেয়ে বলে—হাউ ফানি, মা, তুমি আজ পজিটিভলি রামায়ণ রিপিট করবে। ছেলে বলে ওঠে—অলরাইট, কিন্তু মা আমার দিকে সাইড করে শোবে। মেয়ে আপত্তি করে—ইমপসবল্—আমি প্রপজাল দিয়েছি—মাই ক্লেইম ফার্স্ট। ছেলে জানায়—বাঃ আমি যে তোমার প্রপজাল এগ্রি করলাম—নো—আমার দিকে। দু'জনের দিকে তাকায়—মেয়ের বয়েস আট ছেলের সাড়ে ছয়। দেখতে দেখতে বড় হয়ে গেল। দাদার ছেলেমেয়েগুলো দু'জনেই বৌদির মতো হয়েছে—সুন্দর হয়েছে—সার্প হয়নি। ওর ছেলেমেয়েরা গিয়ে কী মাতব্বরী করে ওদের 'পর। ভগবানের আশীর্বাদে ওদের রঙও ফর্সাই হয়েছে—তবে ছেলের মুখ বাবার মতোই হবে—ধরন ধারণও। মেয়ের মুখ নাকি মা'র মতো হয়েছে—সবাই তাই বলে। দাদাও সেবার বলেছিল, ওকে দেখে ঠিক তোর কথাই মনে আসে—অবিকল এমনি ছিলি—তবে তুই একটু কম ছটফটে ছিলি—কিছুটা শান্ত ছিলি। মেয়ে সঙ্গে সঙ্গে জানায়—জান মামা, মা কিন্তু একটুও শান্ত নয়—যখন তখন আমাদের স্ল্যাপ করে—কেইন দিয়ে মারবে থ্রেইট করে—রীতিমতো এগ্রেসিভ টাইপ। দাদার পাশে ডাক্তার সাহেবেও ছিলেন। দাদা হা হা করে হেসে ওঠেন। ডাক্তার বলে মীনাবৌদিকে উদ্দেশ্য করে—আমার কাছে কমপ্লেন করে কোনো ফল হয় না—এবার ফাইনাল অথরিটিকে ধরেছে। বৌদি কিন্তু কমলার পক্ষই নেয়—যাই বলুন, এরা এক এক সময় এমন আরম্ভ করে—তখন খুন করতে ইচ্ছে হয়। আমরাও তো মানুষ—রক্ত মাংসের শরীর তো। বাপদের তো আর কিছু পোহাতে হয় না—তাদের কাজ নিয়ে তারা ব্যস্ত। কেন আপনি তো মাষ্টারী করেছেন।—তা করেছি, কিন্তু মাষ্টারী অনেক সহজ—ছেলেমেয়েকে মানুষ করবার চেয়ে। আপনাদের মুনসেফও তো প্রফেসরি করেছেন—কই নিজের ছেলেমেয়েদের শাসন করতে পারেন।

মানে কেউ ওরা? ..... শেষ রাতে কেমন একটা নিঃসঙ্গতা বোধ করে। ভদ্রলোক তো সারাদিন বাসায় নেই—ছেলেমেয়েরা ন'টার আগেই কনভেন্টে। তারপর থেকে একা। এখন যেমন শেষ রাতে একা—এমন শেষ রাত ওর সারাদিন ধরে। বইপড়ে সময় কাটে। দাদা গেলেই নানা বই প্রেজেন্ট করে। তাছাড়া নিজেও বই কিনে ছোট একটা লাইব্রেরীর মতো করে ফেলেছে। দুপুরে অবশ্য অন্যান্য ডাক্তারের স্ত্রীরা আসেন—কেউ কেউ বিকেলেও আসেন। ওর বইপড়া নিয়ে—বই নিয়ে আলোচনা করবার জন্যে পরোক্ষে ওকে নিয়ে হাসি ঠাট্টা করে—নিজেকে একজন বিদুষী বলে চালাবার জন্যে ওযে করুণ চেষ্টা করে চলেছে—ওর এই ভড়ং দেখে যে অনেক ডাক্তার-গিন্নির হাসি পায়—এ কথাও আবার দু'একজন ডাক্তার-গিন্নির মারফৎ ওর কাছে এসে পৌঁচেছে—বুঝলে মিসেস্, তোমার পড়াশুনা—আমরা তো বুঝি—কত বই পড়েছ—পড়তে ভালবাস—তোমার হাজবেন্ড তো এ নিয়ে বেশ প্রাউড—আমরা বলি—তা সারাদিন শাড়ি বাড়ি, ফ্রিজ নিয়ে আলোচনা না করে কেউ যদি পড়াশুনার কথা আলোচনা করতে ভালোবাসে তাকে আমাদের চেয়ে উঁচুতে আসন দিতেই হবে। কমলা জানে, এরাই হয়তো পেছনে গিয়ে ঐ দলে যোগ দেবে—ওর সম্পর্কে বিরূপ আলোচনা পাছে ওর কানে না পৌছায়—তাই হিঁতৈষীর বেশে এসে ওর নিন্দেটুকু জানিয়ে গেল। জানিয়ে গেল, লোক দেখানো এই পড়াশুনার চেয়ে নাকি গাড়ি বাড়ি ফ্রিজ নিয়ে আলোচনা অনেক স্বাভাবিক—তাতে ভড়ং নেই—ভন্ডামি নেই—নিজেকে উঁচু দরের মেয়ে বলে চালাবার কৃত্রিমতা নেই। কমলা ঘরের এক্যুইরামের দিকে একমনে তাকিয়ে ভাবে—ওরা—মাছরা কী ঘুমোয় না। সত্যি, আর পাঁচটা মেয়ের সঙ্গে কমলা ঠিকমতো মিশতে পারেনা। অবশ্য কমলা রিটার্ন ভিজিট দিয়েছে। সমবয়সীরা স্বামীর সঙ্গে পরিচয় করে দেবার সময় যেন কণ্ঠে সরস বিদ্রূপ খেলে যেত—ডাঃ গাংগুলীর মিসেস। সারাদিন বই নিয়ে থাকেন—আমাদের মতো মেয়েলী কথা—আর সিনেমা নয়—ইংরেজি ছাড়া পড়েন না—সত্যজিত রায়ের বই ছাড়া দেখেন না। আমাদের মতো মোটেই নন। কমলা হেসে বললেন—সত্যি দু'একখানা বই পড়ি—সে জন্যে আমাকে দলছাড়া করবার কী ষড়যন্ত্র। ইংরেজি ছাড়া পড়ি না—একেবারে ঠিক নয়—আমার প্রিয় লেখকদের মধ্যে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, সতীনাথ ভাদুড়ী—এদের বই কতবার করে পড়েছি বলবার নয়। আর সত্যজিত রায়ের বই সত্যিই পছন্দ করি—ওর লিরিক্যাল টোন আমাকে খুব স্পর্শ করে। আর অন্য বই দেখিনা ঠিক নয়—একা যেতে ভালো লাগে না। আর আপনাদের তো সময় হয় না। আর বই পড়বার জন্যে আপনাদের মিসেস মহলে আমি অস্পৃশ্য। ওরা দলবেধে অবশ্য যান—আমাকে কেয়ারফুলী এভয়েড করে। কমপ্লিমেন্ট ব্রেক থ্রু করে এলিগেসন বের করা খুব ডিফিকাল্ট হয় না আমার পক্ষে।

ডাঃ মিত্র হেসে জিজ্ঞেস করেন—আপনি কনভেন্টে বা লরেটোতে পড়ছেন নিশ্চয়ই।—মোটেই না, আমি গভর্নমেন্ট স্কুলে—বেথুন স্কুলে আর বেথুন কলেজে পড়েছি। অবশ্য কনভেন্টে আর লরেটোতে পড়লে বিশেষ কিছু শেখা হয় বলে তো আমার মনে হয় না—ওরা ফ্লুয়েন্ট ইংরেজি বলতে পারে, স্মার্ট হয়। এই পর্যন্ত—কিন্তু তা হলে ওদের ইংরেজি খুব রিচও নয়—রুচিও রিফাইনড্ নয়, আর পড়াশুনায় না

হয় ক্রিটিক্যাল—না থাকে ডেপথ। আমাদের সময়, সঙ্গে ওরা তো পড়ত—রেজাল্ট কিন্তু ওদের ভাল হত না—আমাদের প্রফেসরদের মধ্যে লরেটো পড়া প্রায় ছিলেন না বললেই চলে। আমি আমার বাচ্চা দুটোকে দিয়েছি ঠিকই—কারণ এমনি স্কুলে এখন আর পড়াশুনা হয় না। বাচ্চারা যা শিখেছে নিখুঁত ভাবে তা হচ্ছে হিন্দি গালাগালি। ডাঃ মিত্র মাথা নাড়েন—আপনার এসেসমেন্ট কারেক্ট—ফ্লুয়েন্সিতে গ্রামার থাকে এটুকুই—কিন্তু লোকে ভালো ইংরেজি বলছে কিনা সেটাই ডিসাইডিং ফ্যাক্টর। আগাগোড়া বেথুনে পড়েছেন—এটাও খুব খারাপ নয়। যাইহোক, আপনাকে আন ইউজয়াল হবার খেসারত দিতেই হবে। .... পরে অবশ্য মিসেস মিত্র জানিয়েছিল ওর নাকি কমলা সম্পর্কে হাই ওপিনিয়ন। এরপর ওরা দলবেঁধে সিনেমায় নিয়ে যেতে চেয়েছিল। কমলা একটা অভিমানে ফিরিয়ে দিয়েছিল। দলবল নিয়ে ওরা সকালে এসে জানাল—মিসেস গাঙ্গুলী, এবার কিন্তু আমাদের সঙ্গে যেতেই হবে। তুমি আমাদের কর্তাদের কাছে কমপ্লেন করেছ—তোমাকে নাকি আমাদের দল থেকে বাদ দিয়েছি—কি ভয়ংকর মেয়ে বাবা দেখা হতেই কমপ্লেন। আজ কিন্তু যেতেই হবে।—তোমার কর্তাদের রিকমেনডেশনে সিনেমায় যেতে রুচি নেই—তোমরা নিজেরা বললে আমি হিন্দি সিনেমায়ও যেতাম। ওমা, আমরা বলিনি?—তুমি সব সময় হিন্দি বাংলা এমনকি ইংরেজি বইয়ের নিন্দেও কর। তাই তো আমরা ভাবলাম....। চল চল। আজ যেতেই হবে।—এমন করে জোর করে ধরলে আমি নিশ্চয়ই যেতাম—জানতাম, আমার বন্ধু আছে। আমি মুখফুটে বলবার পর সবাই এসেছ? এর পরও কী আমায় যেতে বল? কমলার চোখে জল এসে গিয়েছিল। তাড়াতাড়ি চোখে আঁচল দিয়ে ঘর থেকে চলে গিয়ে পাশের ঘরে একটু দাঁড়িয়ে আবার ফিরে আসে। দু'জন এসে কমলার হাত ধরে। চল ভাই. কেন রাগ করিস—তোর লাগতেই পারে—মানছি। এবার চল। কমলা সেদিন চুপ থেকে আস্তে আস্তে বলে—আমার সেন্টিমেন্টালিটি মাপ কর ভাই—যেদিন বুঝব আমার বন্ধু আছে—সেদিন যাব। ওদের ফিরিয়ে দিয়েছিল। পরে ওদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ সবই হয়েছে—তবে ওরা কোনদিন আর সিনেমায় যেতে বলেনি। কমলাও ভেবেছিল—ওদের সঙ্গে ফর্মাল হব—আর আন্তরিক হব না। তবু ওরা যখন আসত—কমলা খুশি হত—নির্জন নিঃসঙ্গতা থেকে ক'মুহূর্তের জন্যে নিজেকে বাঁচাবার জন্যে ওদের ছাড়তে চাইতো না। কিন্তু ওরা বেশিক্ষণ বসতো না। তখন বসবার জন্যে নিজের পীড়াপীড়িকে হ্যাংলামো মনে হত। নিজেকে খেলো মনে হত—সস্তা মনে হত। আবার প্রতিজ্ঞা করত—ওদের সঙ্গে ফর্মাল ব্যবহার করব—সহজ গম্ভীর ভাবে আচরণ করব। ওরা আমার বাসায় আসায় আমি খুশি হয়েছি—এ ভাবটি না ফুটে হয়তো কৃতার্থ হয়েছি এরকম ভাব ফুটে ওঠে। এ ঠিক নয়। গম্ভীর আর ভদ্র। খুশি আর আন্তরিক নয়। ডাক্তারদের স্ত্রী মহলে কমলা পপুলার নয়—তা ভাল করেই জানে—ওরা নিজেদের ইনফিরিয়রিটি কমলার নিন্দে করে শোধ নেয়—তাও কমলা জানে। কমলা এও শুনেছে—ডাক্তার-গিন্নিরা নাকি বলাবলি করেছে—তাদের বাড়ি এলে কমলা নাকি তাদের স্বামীদের সঙ্গেই বেশি আলাপ করে—বিদ্যা জাহির করতে চায়। কিন্তু এর পেছনে যে একটা অন্য অর্থ আছে—তা কমলার বুঝতে অসুবিধে হয়নি। অর্থাৎ নিজের

স্বামী সুন্দর নয় বলে—তাদের সুন্দর স্বামীদের কাছে কমলা মনোযোগ চায়, জঘন্য। তাই ইদানীং কমলা বলে দিয়েছে নরেনকে সঙ্গে যদি তুমি না যাও যাব—আমি একা কোথাও যাবনা। কিন্তু নরেনের সময় কোথায়? তাই কমলা যাতায়াত প্রায় ছেড়েই দিয়েছে। অপরপক্ষের আসাও কমে গিয়েছে—তবে বন্ধ হয়নি। অবশ্য কমলা নরেনকে জানায়নি, অন্ততঃ অন্যান্য ডাক্তার গিন্নিরা ওর সম্পর্কে কী বলে সব কথা জানায়নি—বিশেষ করে, নরেন দেখতে ভালো নয় বলে ও যে ওদের স্বামীদের কাছে নিজের বিদ্যে জাহির করে বিশিষ্ট হয়ে উঠতে চায়—এ কথা গোপন করেছে। যদিও নরেনকে সব কথা বলবার এই প্রতিশ্রুতি নিজে থেকেই দিয়ে এসেছে—কিছু কিছু মেনে চলেছেও। নিজেকে বুঝিয়েছে, নরেনকে যে ডাক্তারের স্ত্রীরা দেখতে ভালো বলে না—এ কথা জানলে মনে মনে দুঃখ পাবে। এমনকি, কমলা যে বাড়ি টাকা পয়সা দেখেই নরেনকে বিয়ে করতে রাজি হয়েছে—এ সংবাদও যে কমলার কানে পৌঁচেছে—শুনে অপমান বোধ করেছে, চোখের জল মুছেছে। পরে বুঝেছে, এ সব হচ্ছে ওর পসার তাই বেশি এই ঈর্ষা। হিংসুটের দল। তবু এ কথাও নরেনকে জানায়নি। কারণ, এতে—এই বলবার মধ্যে যেন নরেনকে পরোক্ষে জানিয়ে দেওয়া হল—কমলার যোগ্য নরেন নয়—কেবল টাকা দিয়ে কিনে রেখেছে। বলবার মধ্যেও এক ধরনের অহংকার হয়তো আসতে পারে—যেখানে নরেন দুঃখ পেতে পারে—অপমানবোধ করতে পারে। শুধু জানিয়েছে—তোমার ডাক্তারদের গিন্নিরা তো আমাকে বয়কট করছে—কারণ আমি ইংরেজি পড়ি, সত্যজিত রায়ের বই ছাড়া পড়িনা। ওদের মতো ঘর কন্নার কথা বলতে ভালো লাগে না। কে কোন মডেলের ফ্রিজ কিনেছে। কার টেপ রেকর্ডার কতক্ষণ চলে ও একবারও সারাতে হয় না—কে কী ইংরেজিখানা তৈরী করতে পারে—কার স্ত্রী কোন পরপুরুষের দিকে কেমন ভাবে তাকাল। কার স্বামী সপ্তাহে একটা শাড়ি প্রেজেন্ট করে—ওরা নাকি খবর জানে কোন স্বামী সপ্তাহে কলকাতা যায় সেখানে নাকি 'কে' আছে—তাকে একবার না দেখলে ইনসপিরেসন পায় না। নিজেকে এত খাপছাড়া মনে হয়। এ সব আলোচনায় আমি সত্যি কোন ইন্টারেষ্ট পাইনা। ই.এন.টির স্ত্রীর তো আমার 'পর বেজায় রাগ—কারন ই.এন.টির রোগী কম—ইয়ার, নোস, থ্রোটের পেমেন্ট কম হলে আমি কী করতে পারি। তোমার উপকার বেশী। রাগ সেখানে। আমাকে তো রীতিমতো ঈর্ষা। আর সবাই এসে ওয়ার্ডরোব দেখতে—শাড়ির দাম জিজ্ঞেস করবে—গয়না কী গড়ালাম—কার কাছ থেকে রীতিমতো অভদ্রতা মনে, হয়। এত বোরিং এঁরা। আমি রিটার্ন ভিজিট দেওয়া ছেড়ে দিয়েছি—তুমি না গেলে যাব না ঠিক করেছি—তবু, রিটার্ন ভিজিট যে ছেড়ে দিয়েছি—তা যে ওদের বুঝতে অসুবিধে হয়নি—তা জানাতে এসেছে। পায়ে পা দিয়ে ঝগড়া নয়? আমি কিন্তু কেন যাইনি—কোনো কৈফিয়ৎ দেইনি। শুধু হেসে অন্য কথা শুরু করেছি। ওরা ছাড়বার পাত্র নয়—বারে বারে ঐ এক কথা আমাদের দোষ কী—কেন যাইনা—এইতো আমরা ক'জন এদের মধ্যে যদি মুখ দেখাদেখি না থাকে—মফঃস্বলে আমাদের আর কে বন্ধু বল? যত ধানাইপানাই। শীতে একটা ফিষ্ট করলে কেমন হয়। কথা দিয়ে শেষ পর্যন্ত পেছাবে না তো? ওরা ওদের রোগী দেখুক আমরা আমরা। আমি কিন্তু শেষ পর্যন্ত কেন যাইনা তার কোনো কারণও

দিইনি—ফিষ্টে যাবার কথাও দিইনি। ..... শেষরাতে কমলার মনে মাঝে মধ্যে জ্বালাও হয়। সব কথা ওর কাছে বলব। কিন্তু সব কথা যে বলা যায় না। ওর রূপ নিয়ে যে আলোচনা হয়—তা কী ওকে বলা যায়? একে তো বললে মনে আঘাত পাবে। তাছাড়া হয়তো ভাবতে পারে, ও যে দেখতে সুন্দর নয়—এ কথা ওকেই বা জানাচ্ছি কেন? সব কথা বলবার নাম করে—ও যে দেখতে সুন্দর নয়—আমি যে তা সত্ত্বেও ওকে ভালবাসি—এই বাহাদুরি নেবার জন্যে বলছি। হাজার হোক মানুষ তো। আমি যে আর পাঁচজনের চেয়ে অন্য রকম—কুরূপকেও ভালবাসতে পারি—এই উদারতা—এই মহত্ত্ব দেখাবার জন্যে—ওকে এসব বলতে পারি। আসলে আঘাত তো পাবে—আর আমাদেরও ও দেখতে খারাপ এ নিয়ে আমি চিন্তা করে সান্ত্বনা খুজি—এ কথা তো ওর মনে আসতে পারে। কী এসব কথা বলবার। যেখানে বললে আমাকে ভুল বুঝবে নিজে আঘাত পাবে। দু'জনে বেশি কাছে থাকব—এ জন্যেই তো সব কথা বলবার প্রতিশ্রুতি। কিন্তু যে কথার জন্যেই দু'দিকে ছিটকে যাবে—ভুল বুঝবে তা বলবই বা কী জন্যে? আসলে ওর পয়সা বেশি বলেই ওরা ঈর্ষার ছটফট করে—তা কী করে নিন্দে করবে—তাই দেখতে ভালো নয়—এ কথা বলে ঈর্ষার জ্বালা মেটাচ্ছে। বুঝেছে, পড়াশুনায় রুচিতে আমি ওদের দলে নই—তাই আমি টাকা দেখে ওকে বিয়ে করতে রাজি হয়েছি। তবু, এসব কথা ওকে বলা যায় না। এটুকু কমলা বুঝেছে—এ কথা জানালেও কোনো না কোনো ভাবে আঘাত পাবে। ওর চেহারার নিন্দে করলে কমলা আহত হয় না—চুপসে যায় না—নিজের চেহারার জন্যে গর্ব বোধও করে না। শুধু রেগে যায়। লোকটা দেখতে ভালো নয়—এতো জানা কথা। এ নিয়ে যারা আলোচনা করে—তাদের বাইরেটা যাই হোক—ভেতরটা যে অতি জঘন্য—নিচু রুচির লক্ষণ—এদের সঙ্গে মিশতেও ঘেন্না হয়। স্বামী দেখতে খারাপ কী খারাপ নয়—এটা স্ত্রীর বুঝবার ব্যাপার। ওদের তাতে কি? আমার স্বামী রূপবান হলে—দোলার কার্তিক হলে—তোদের কি? ওদের এই অনধিকার চর্চায় ওর পিত্তি জ্বলে যায়। কমলা টাকার জন্যে বিয়ে করেছে—এই গুজবে কমলা নিজের রুচি ও শিক্ষা সম্পর্কে ওদের ধারণায় নিজেকে এত ছোট ও লোভী দেখতে পেয়ে অপমানে অধীর হয়ে ওঠে। এই স্বামীকে পছন্দ করায় ওর রুচির 'পরও যে কটাক্ষ হয় তা মনে করেও কমলা ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে। ওরা হয়তো ভাবে, আমার ভালবাসা লোক দেখানো ওকে ঠকানো, আমার পড়াশুনা হচ্ছে যেহেতু স্বামী দেখতে ভাল না—ভালবাসা যায়না—তাই নিজের হতাশা ঢাকবার একটা লোক দেখানো ছুতো মাত্র। ওরা ভাবে আমি ওর চেয়ে গয়না নাড়াচাড়া করতে বেশি পছন্দ করি—ঘর সংসার সাজাবার দিকে আমার মনোযোগ ওর দিকে মনোযোগের চেয়ে বেশি। যাইহোক—এসব তেতো কথা বলে লাভ নেই—ক্ষতি ছাড়া। ওকে দুঃখ দিয়ে লাভ কি? এ সব অবান্তর কথা বলে আমি যে এ নিয়ে ভাবি—এমন মিথ্যে ধারণা ওর মধ্যে হতে দেব কেন? ওর চেহারা নিয়ে যে এত সোরগোল—এত আলোচনা—এ গুলো নিতান্তই অবান্তর—অনধিকার চর্চা নয়। কেন এসব অবান্তর কথা বলে ওর মনের শান্তি নষ্ট করি। ভাববে, ওরা হয়তো আমার মনকে বিষিয়ে দিচ্ছে, ভাববে ওর চেহারার আলোচনা বিচলিত হয়েছি—কারণ, পুরুষের মন তো, মানুষের মন তো,

ভাববে, আমার ভেতরে দুর্বলতা রয়েছে সুন্দর চেহারার জন্যে তাই আমি ক্ষুব্ধ হই, বিচলিত হই, দুঃক্ষিত হই। এসব বলে অযথা অশান্তি টেনে আনা। নিজের ভালবাসার শক্তি দেখাতে গিয়ে হয়তো ওকে দুঃখ দেওয়া। যাক, এসব। ওদের সঙ্গে তো মিশছিনে। ওদের স্বামীর সঙ্গে কথা বলে ওদের ভালবাসায় বাধা হচ্ছিনে। উঃ কী ভালবাসা—রূপের কী স্থায়ী আকর্ষণ—আমি এক ফোটা কথা বললেই নাকি ভালবাসায় চিড় ধরে। এমন মজবুত মন নিয়ে এরা সংসার করে! ওকে তো আর এসব বলা যায় না—ঠিকও নয়। দুঃখ পাবে, ব্যথা পাবে। চাপা লোক। দুঃখ পেয়েছে বা অপমান বোধ করছে এ কথা বুঝতে দেবে না। হেসে হয়তো উড়িয়ে দেবে। কিন্তু ঠিক মনে গেঁথে থাকবে। ওই কী সব কথা বলতে পারে? আমার তো মনে হয় না। ওর চেহারার জন্যে ওকে নানা অবহেলা নিশ্চয়ই সহ্য করতে হয়েছে। মাঝে মধ্যে বলে বটে, আমার চেহারা নিয়ে আমার মাথা ব্যথা নেই। কারণ, কারো ভালো লাগে—কারো লাগে না। ধর, যে পেসেন্ট দারুন যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে আমার চেহারা দেখবার জন্যে বারবার ফোন করছে—দেখবার জন্যে আকুল হয়ে উঠেছে—আমাকে দেখতে পেয়ে কী তার শান্তি। পেসেন্টরা আমাকে দেখে খুশি হয়—দোকানদাররা আমাকে দেখে খুশি হয়—বাড়িতে তুমি খুশি হও—ছেলেমেয়েরা ছুটে আসে—তোমার মা আমাকে দেখে যে খুশি—তা বলবার অপেক্ষা রাখে না। তোমার দাদা তো আমাকে আসতে দিতেই চান না। তা হলে ঘরে, কর্মস্থলে, শ্বশুর বাড়িতে সবাই আমাকে চায়। আর যারা অলসভাবে জীবনকাটায়—কে কেমন দেখতে তা নিয়ে আর সিনেমা নিয়ে সময় কাটায়—তাদের মতামতের মূল্যই বা কি? কমলা এ সব কথা শুনেও ডাক্তার গিন্নিদের কথা ওকে বলেনি—বলতে পারেনি—ইচ্ছে হয়নি। সত্যি তো এদের মতামতের কী মূল্য। কেন, এদের নিয়ে ভাববে—এদের নিয়ে ভাববার জন্যে নিজেকে ধিক্কার দিয়েছে কমলা। স্বামীর কথায় আশ্বস্ত হয়েছে। বলেছে—মা, আমার চেয়েও তোমাকে দেখলে খুশি হন। আর তুমি তো দাদার ফার্ষ্ট ফ্রেন্ড। ....তবু কমলা জানে, ওর আর সকলকে অগ্রাহ্য করা এও তো নিশ্চয়ই অভিমান আর অবহেলা থেকেই এসেছে। যতই উদাসীনতা দেখাক—ভেতরে ভেতরে কী ব্যথা পায়নি—পেয়েছে নিশ্চয়ই। .....শেষরাতে নানা ভাবে নিজেকে বোঝায় কমলা—সব কথা বলা কী সম্ভব? বিয়ের আগে কলকাতার বাড়িতে যখন বাড়িওয়ালীর কাছে ধার আনতে যেত—ধার কী অমনি পেত? বাড়িওয়ালী ওকে পছন্দ করত ছেলের বৌ করবার ইচ্ছেও কী ছিল না—পরোক্ষে নানা ইঙ্গিত দিয়েছে—কমলা যেন অসম্মত নয়—অথচ মেয়েদের এসব আলোচনায় থাকা উচিত নয়—এমন ভাব কী দেখায়নি। ওর ছেলে দুটোই বখাটে—রকে বসে আড্ডা দিত—কতবারের চেষ্টায় স্কুল ফাইনাল পাশ করেছে কে জানে—শুনেছিল ঐ বুড়ো বয়সে নাকি প্রি ইউনিভার্সিটিতেও ভর্ত্তি হয়েছিল। ড্যাবড্যাব করে চেয়ে থাকত কমলা যখন রাস্তা দিয়ে যেত—তখন পাড়ার ছেলেরা—ঐ হারামজাদা একেবারে থেমে যেত—হতভাগা বোধ হয় বলেছিল, কমলা ওর ভাবী স্ত্রী—তাই মাস্তানের ভাবী স্ত্রী হিসেবে ওকে শিষ দিত না—বা ওর উদ্দেশ্যে কিছু বলতো না। ধার আনবার পেছনে যে একধরনের হীনতা ওকে মেনে নিতে হত—তা কী বুঝত না। তবে ছেলেটিকে একদম আমল দিত না। দু'একবার

গায়ে পড়ে আলাপ করবার চেষ্টা করেছে। কমলা আমল দেয়নি। বা বড়জোর পড়াশুনার কথা শুরু করেছে—কি, কী বই ছেলেটা পড়ে জিজ্ঞেস করেছে—কেন স্কুল ফাইনাল পাশ করতে পারছে না—জিজ্ঞেস করেছে।—আপনি স্কুল ফাইনালটা পাশ করে ফেলুন তো। অথচ ঐ কথার মধ্যে যে একটা প্রচ্ছন্ন ভাবছিল—ছেলেটা স্কুল ফাইনাল পাশ করতে না পারায় কমলা রীতিমতো বিচলিত। ছেলেটা আমতা আমতা করে বলেছিল—এখনও আপনি। এবার পাশ করে ফেলব। সেবার পাশ করেনি—নকল করতে গিয়ে ধরা পড়েছিল। যার সঙ্গে কথা বলতেও ঘেন্না করে—তার সঙ্গে ও কী ভদ্রভাবে আচরণ করতে হয়নি। উপায় কি? যখন দাদা ক্লাশ নাইনে—আমি ফাইভে তখন বাবা মারা গেলেন। বাবা ছিলেন স্কুল মাষ্টার। কি-ই বা সঞ্চয় ছিল। মারাও গেলেন হঠাৎ হার্টফেল করে—স্কুলের ভেতরেই। সেই থেকে দাদা—দাদা স্কুলে ফার্ষ্টবয়। সেই থেকে টিউশনি। বাবাও করতেন। স্কুলের হেডমাষ্টার মশায়ই দাদাকে প্রথমে ক'টা টিউশনি দেন—বাচ্চা ছেলেদের পড়াবার জন্যে। বেশ দু'জন অফিসারের বাড়িতে। মামারা কোনো সাহায্য করেনি। এসে বাবা কিছু সঞ্চয় করেনি—সে জন্যে দোষারোপ—বোনটা জলে পড়ল বলে কুমীর কান্না। তারপর চা-টা খেয়ে সেই যে কেটে পড়ত—ন'মাসে ছ'মাসে পাত্তা পাওয়া যেত না। কমলার চিন্তা আবার মোড় নেয়—ঐ যে বাড়িওয়ালীর কাছ থেকে ধার নিত—সেই ধার আনবার পেছনে ওর ভূমিকাটুকু—তা কী দাদাকেই বলতে পেরেছে—না, মা'কে। ঐ যে সলজ্জ অভিনয়টুকু করত—এখন ভাবতে কেমন বিশ্রী লাগে—তখন কেমন মজাই লাগত। ওর কেমন বিশ্বাস ছিল দাদা ঠিক বড় হবে—ওদের অবস্থা ফিরে যাবে—কমলাও এম.এ.পাশ করে হয়তো স্কুলে ঢুকে যাবে। দাদার মতো প্রফেসার হতে পারলে তো কথাই নেই। অনার্স না থাকলেও এম.এ'তে ভালো ফল করলে প্রাইভেট কলেজেও চান্স পাওয়া যায়—হয়তো প্রফেসারও......কত স্বপ্ন ছিল। ও ভালো করেই জানত—ঐ স্কুল ফাইনালে টুকলি করা দামড়া ওর স্বামী হবে—স্পর্ধা কত। এসব তো আর ওর কাছে বলা যায় না। আর এতদিন না বলে এখন হঠাৎ বলতে আরম্ভ করলে ভাববে—হয়তো এতদিন বলিনি কেন? না, সব কথা বলবার দরকারই বা কি? এগুলো অযথা, অবান্তর—শুধু অশান্তিই ডেকে আনবে। .....শেষ রাতে শেষ রাতের নানা ভাবনা স্মৃতি নিয়ে স্বামীর সঙ্গে যে আলোচনা করে, তখন মনে আসে—রাতে যাবার পর আর কিছুতেই ঘুম আসতে চায় না।—কই, আমি যখন এলেম—তোমার শাড়ি খুলে ফেললাম—তুমি তো দিব্যি ঘুমুচ্ছ। সত্যি কোনো কোনো দিন শেষ দিকে ঘুমিয়ে পড়ে। কোনো কোনো দিন স্বামীর সাড়া পেয়ে ঘুমের ভান করে—শাড়ি যখন খুলে দেয়—তখন ঠিক জানে—একটা আশ্চর্য শিহরণ অনুভব করে—শিহরণটুকুর জন্যে ঘুমের ভান করে থাকে। ইচ্ছে হয়—ঠিক সেই মুহূর্তটুকুতে হেসে ওকে চমকে দেবে। কিন্তু ভাবে—তা হলে হয়তো পরদিন থেকে যেন ও সাবধান হয়ে যাবে—পরীক্ষা করে দেখবে জেগে আছে কিনা। কী দরকার! কী ভাবছিলে—না ঘুমিয়ে? কত কি? ছেলেবেলাকার কথা—তোমার কথা?—আমার কথা?—হ্যাঁ, তোমার কথা? যাকে দেখতে গেলে—সেই নারী দেখতে কেমন? কেমন মনোযোগ দিয়ে দেখছিলে? নরেন হাহা করে হেসে ওঠে।—কি জানতে চাও? দেখতে

কেমন অর্থাৎ মুখশ্রী ও ফিগার কেমন এ দেখতে তো গাইনোকলজিষ্টকে ডাকা হয়না—ওটা ফাও—যে জন্যে ডাকা হয়—সেইটে দেখতে যেয়ে?—ছিঃ ছিঃ। কিন্তু সবদিন তো আর রাতে 'কল' থাকে না। কমলার মন আগে আগে খুব খুশি থাকত—সকালে কিছুক্ষণের জন্যে হলেও বাড়িতে তো ওকে পাওয়া যাচ্ছে—ওর একটা পুরোঘুম হল। কিন্তু আজকাল কমলা পরিষ্কার বুঝতে পেরেছে, রাতে 'কল' না এলে ও যেন কেমন একটু মনমরা হয়ে যায়—সকালে চেম্বারে না বসা পর্যন্ত যেন নিষ্প্রাণ নিষ্প্রাণ মনে হয় ওকে। এমনকি কমলা পর্যন্ত যেন আজকাল ওর 'কল' না এলে—শেষরাতে এমনিতে ঘুম ভেঙে গেলেও—ও ওঠেনি বুঝতে পেরে যখন আবার ঘুমিয়ে পড়বার চেষ্টা করে—বা ঘুমিয়েও পড়ে—তবু, ওর মনমরার ছোঁয়াতে কমলাও কেমন মিইয়ে যায়—যদিও বাইরে বুঝতে দেয়না—বলে, যাক ফ্যামিলি প্ল্যানিং এবার সাকসেসফুল—অন্ততঃ একজন বাচ্চা আজ রাতে হল না—বা হবার সম্ভাবনার কথা জানা গেলনা। তবু, অন্তরে অন্তরে একটা অভ্যাস অসম্পূর্ন থাকবার অস্বস্তি যেন ওকেও পেয়ে বসে। তারপর দিন রাতে বের হয়ে যেতে যেন দু'জনেই স্বস্তি বোধ করে। সেদিন সকালে নরেন—কমলা দু'জনেই বেশ 'মুডে' থাকে। কোনও কোনো রাতে হয়তো দশটা এগারটা থেকেই একটার পর একটা ডাক আসতে থাকে। প্রথম প্রথম ওর চাহিদা দেখে আনন্দ হলেও, শেষ দিকে কমলা বিরক্ত হয়ে উঠত—হয়তো ভোর রাতে একটু অবসর নরেন পেত—এক ঘণ্টা ঘুমিয়ে হয়তো সকালে স্নান সেরে চেম্বারে যাবার জন্যে তৈরি হয়ে পড়ে। কমলা খুঁত খুঁত করে—সারারাত এত খেটেছ—না হয় একটু বেলা করেই চেম্বারে যেতে—শরীরটা দেখতে হবে তো। কমলা টাকাগুলো গুনে লকারে রেখে দেয়। বাচ্চা স্কুলে গেলে—নরেন হাসপাতালে বের হলে পর সপ্তাহে দু'দিন কমলা ব্যাঙ্কে গিয়ে টাকা জমা দিয়ে আসে। ব্যাঙ্কের সবাই ওকে চেনে—জমাও পাস বই পেতে ওর অসুবিধে হয় না। লকারের কথায় ওয়ার্ডরোবের কথা মনে আসে......বিয়ের আগে—কলেজ জীবনে ওর দু'তিনখানার বেশি শাড়িই ছিলনা—মা'র তাঁতের সাদা শাড়ি পরেও গেছে। মেয়েরা আড়চোখে দেখেছে—কমলা ঘেমে উঠেছে—তবু, জেদ করেই পরে গেছে। সেই থেকে রঙচঙে শাড়ি পরবার দিকে একটা সঙ্কোচ ছিল। বিয়ের পরই কত রঙচঙে শাড়ি এল—এখন আর সঙ্কোচ নেই। ম্যাচ করে পরবার স্বাভাবিক নৈপুন্য ওর মধ্যে আসতে দেরিও হয়নি। এখন অনেকক্ষণ ওয়ার্ডরোবের দিকে তন্ময় হয়ে চেয়ে থাকে—কত শাড়ি—কত রঙের। ওর যেন ওকে সাজাবার নেশা কিছুতেই শেষ হয়না। অথচ বাড়ি থেকে কত আর বের হয়। মনে হয়, ওর মা'র কথা। জীবনে না পেয়েছে ভালো একখানা শাড়ি পরতে না পেয়েছে তেমন করে গয়না। কিছু বিক্রী হয়েছে অন্নসংস্থানের জন্যে—দাদার পরীক্ষার জন্যে। আর কিছু ওর বিয়েতে। বিয়েতে অবশ্য এরা কিছুই চায়নি—তবু, দাদা ওকে সাজিয়ে গুছিয়ে বেশ জাঁকজমক করেই বিয়ে দিয়েছে। বিয়ে দিতে দাদা যে বেশ কয়েক হাজার টাকা ধার করেছিল—তা কমলা জানত। সেই ধার শোধ হয়েছে—প্রায় আট হাজার টাকা। দাদা নিজের বিয়েতে কিছু নিতে চায়নি। কিন্তু বিয়েতে যে দাদার ধার ছিল—নরেনকে এমনি আভাস দিয়েছিল কমলা। নরেন বলেছিল—আমি তোমাদের অসুবিধে ঘটুক তা চাইনি। কিন্তু জাঁক-

জমকের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে তোমার দাদা বলেই করেছিলেন। তাঁর আত্মসম্মান রয়েছে—পজিসন রয়েছে—আর আমারও পজিসন রয়েছে। আর নমঃনমঃ করে বিয়ে দিলে তোমারও মনে হত—দাদা আমার বিয়েটা দায় সারা করে দিলেন। যখন তোমার দাদার অবস্থা ভালো হত—তখনই এ কথা তোমারও মনে হতে আরম্ভ হতো। যাক—তোমার দাদা এ টাকা শোধ দিয়ে দেবেন। ও নিয়ে তুমি কিছু ভেব না। মেয়ে পছন্দ হবার পর দেনাপাওনা নিয়ে কথা উঠতেই দাদা জানালেন আমার কিছু নিতে ইচ্ছে নেই। কমলা বুঝেছিল, মা'র কিছু ইচ্ছে আছে। কিন্তু কেউ কিছু বলবার আগেই নরেন জানাল—দাদা, মেয়ে পছন্দ করবার দায়িত্ব আপনার—আর আপনার এ বিষয়ে কোনো কথা নেই। আর মনে রাখবেন—দায়িত্ব আমাকে দিয়েছেন—এ ব্যাপারে আমি যা বলব—তাই কিন্তু আপনাদের মেনে নিতে হবে। আমি কিন্তু বরকর্তা। আমাকে কিন্তু পাওয়ার অব এটর্নি দিয়ে দিয়েছিলেন। সত্যি সত্যি ও কিন্তু পাঁচ হাজার টাকা নগদ—প্রায় পনরোভরী গয়না—ফ্রিজ, সোফাসেট, রেডিওগ্রাম—সবই আদায় করেদিয়েছিল। মীনার বাবা কিন্তু এ কথায় রাজি হয়ে গেলেন। বললেন—এ সব আপনাদের না বললেও চলত—আমি দিতামই। শুধু টাকার অঙ্কটা...। নরেন মাথা চুলকে বল্ল—আসলে আমরা তো ছেলেমানুষ—বুঝতেই পারছেন—একজন বয়স্ক কেউ থাকলে আপনাকে অনেক ভালো বুঝতেন—আমরা ছেলেমানুষ তো—সব সময় ভাবী—বাইরেটা আর ভেতরটা একনয়—কিন্তু কিছু কিছু মানুষের যে দুটোই এক—এ কেবল বাচ্চারা—মেয়েরা—আর অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা বুঝতে পারেন। আরো দু'হাজার—আর বৌভাতের জন্যে দু'হাজার ব্যস্। আরো দু'হাজার যোগ হতে দেখে মীনার বাবার মুখ কালো হয়ে যায়। প্রায় সাতভরীর নেকলেস্ কমলাকে দিয়ে প্রেজেন্ট করিয়েছিল নরেন। কমলা পরে রাতে শুয়ে শুয়ে বলেছিল আমার বিয়ের পণের টাকা শোধ করে দেবার ব্যবস্থা করলে। কমলার দাদা নরেনকে বলেছিল—আমার কিন্তু ভীষণ অস্বস্তি হচ্ছে।—হোক, অস্বস্তি ভোগ করুন।—তুমি তো কিছু চাওনি—আর আমার বেলায়....। নরেন জানিয়েছিল—আমার শ্বশুরবাড়ি—আর আপনার শ্বশুর বাড়ি এক নয়। আপনি যদি কিছু না চাইতেন—আপনার শ্বশুর মশায় মনে করতেন—যেন দয়া করে আপনাকে মেয়ে দিচ্ছেন। ওরা মার্চেন্ট অফিসের মানুষ। টাকা দিয়ে মানুষকে মাপা ওদের মজ্জাগত। তাই আপনার দাম ওদের জানিয়ে দিলেম। আপনাকে বিনে পয়সায় পেলে ওরা আপনার মর্যাদা বুঝত না। .....কমলার বিয়ের ঋণ শোধ হয়ে গিয়েছিল। আর সত্যিসত্যি দাদা পেয়েও ছিল প্রচুর। বৌদির বাবা ফ্রিজ, গডরেজের আলমারি ওয়ার্ডরোব থেকে রেডিওগ্রাম পর্যন্ত দিয়েছিল। কমলা দিয়েছিল নেকলেস আর নরেন প্রেসেন্ট করেছিল একটা টেপরেকর্ডার। আর নিজের বিলেত থেকে আনা মুভিতে ওদের বিয়েটাও ধরে রেখেছিল পরে—ওদের প্রথম বিয়ে বার্ষিকীতে মীনার বাপের বাড়ি লোকদের নেমতোন্ন করে দেখিয়ে বেশ খুশি করে দিয়েছিল। ওর নিজের বিয়ের ফিল্ম ও বিয়ে বার্ষিকীতে প্রজেক্টারে ওরা দেখে। কমলা বরাবরই লক্ষ্য করেছিল, নরেন যেন ফটো তুলতে কেমন কুণ্ঠিত। মুভিতে পারতপক্ষে নিজেকে বাদ দিয়েই চলতে চায়। নিজের বিয়েতে যতটুকু না হলে চলেনা, ততটুকুই। ওর কম্পাউন্ডারই মুভি তোলে—প্রজেক্টার দেখায়।

কমলাকে নরেন বলেছে—ওর আর্টিস্টিক সেন্স চমৎকার। একানকার ডাক্তারদের মধ্যে একমাত্র ওদেরই মুভি আর প্রজেক্টার রয়েছে। ওদের এক বিয়ে বার্ষিকীতে সবাইকে ধরে রাখাও হয়েছে। এও যে সবার গায়ের জ্বালার কারণ—তা বুঝতে কমলার দেরি হয়না। সেদিন নরেন কিছুতেই মুভির সামনে আসতে রাজি হয়নি বারবার কমলার পরিকল্পনায় রাজি হয়নি—কিন্তু সবার সামনে আপত্তি করেনি—মাত্র একটা শটে ওরা দু'জন ছিল। আর অতিথিদের জন্যে তুলেছিল একটা রিল। পরে ওয়াশ হয়ে এলে—সবাইকে আবার ডেকে দেখানো হয়—সেদিন অবশ্য নরেন ছিল না। সবাই খুব আগ্রহ করে দেখেছে—দু'দুবার দেখানো হয়। .....কিছু ভালো রান্না বান্না হলেই ওর দাদার কথা মনে পড়ে....মা'র কথা মনে আসে নিরামিষ কিছু রান্না করলে মনে মনে স্থির করে রাখে—এবার মা এলে মা'কে করে দেব। দাদা রান্নাবান্নার জন্যে কেন মেয়েমানুষ রেখে দিয়েছে—মন্দ করে না তবে একটু নোংরা এই যা। মা'র রান্না মা-ই করে নেয়। বৌদির সোনার অঙ্গ—মোমের শরীর আগুনে গলে যাবে—তাই মা'র রান্না মাকে করে নিতে হয়। দেখে কমলার শরীরে আগুন ধরে যায়। ও নিজেই মা'র রান্না বান্না করে দেয়। অবশ্য যে লোকটিকে রেখেছে—সে নিরামিষও রান্না করবে স্থির ছিল। মা কিন্তু রাজি নয়। বলে, সারাদিন করব কি? বসে থাকলে অঙ্গ লেগে যাবে। কমলা রাগ চেপে বলে, যারা সারাদিন বসে থাকে তাদের তো অঙ্গ লাগতে দেখলাম না। কমলার কথার আওয়াজ পেয়ে বৌদি ঘর থেকে বের হয়ে যায়। মাও চুপ হয়ে যান।—তারা তো বসেই থাকে কেবল, হয়তো সিনেমা হলে তিনঘণ্টা—রিক্সায়, কারো বাড়িতেও তো বসতেই হয়—সেখানেও বসতে হয়—অবশ্য এত বসে থাকতে থাকতে শ্রান্ত হয়ে মাঝে মাঝেই শুয়েও থাকতে হয়। কমলার সব কথাই মীনার কানে যায়। পরে মীনা একসময় জানায়—তোমাদের ওখানে শুনেছি—সারাসময়ের জন্যে তিনটে মানুষ রয়েছে। আমার এখানে কিন্তু একজনই, বাসন মাজা থেকে ঝাল ঝোল অম্বল সবই করে। কমলা জানায়—আমার ওখানে তিন জন বললে ভুল হবে—তিনজন তো আছে—কম্পাউন্ডার দু'জনও কিছু করবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে থাকে। কিন্তু আমি রোজই কিছু না কিছু রান্না করি—হয় মাছ, না হয় মাংস, পুডিং, ষ্টু—একটা না একটা আমি করবই। আর খেতে আমি সবাইকে দি। প্রতিটি রান্নার 'পর আমি নজর রাখি—তদারক করি—সেই সঙ্গে অন্ততঃ দু'দিনে একখানা বই আমি শেষ করবই। আর ছেলেমেয়েদের পড়াশুনা—মাষ্টার রাখিনি—কারণ মাষ্টার কী শেখাতে কী শেখাবে। আমি কিন্তু শুয়ে বসে থাকতে পারিনি। তোমার বাপের বাড়িতেও শুনেছি—মা'ই সব করেন। এবার মীনা জানায়—সারা সময়ের জন্যে একটা লোক আছে—রান্না মা-ই করেন। আমাদের কোনোদিন কিছু করতে দেননি—তাই ছেলেবেলা থেকে অভ্যাস হয়ে গেছে—কিছু না করবার। যেমন তোমার ছেলেবেলা থেকে কিছু করবার অভ্যাস থেকে গেছে।—ছেলেবেলায় মা'ও আমাকে কিছু করতে দেননি—কিন্তু আমি নিজে শিখেছি। অমার শেখবার একটা আগ্রহ ছিল—আজও আছে। শুধু ডিগ্রি চাইনি—লেখাপড়া শিখতে চেয়েছি—শুধু রূপের 'পর ভরসা করে বৌ হতে চাইনি—স্ত্রীর যোগ্যতা বৌয়ের যোগ্যতা অর্জন করতে চেয়েছি—পেরেছিও। নিশ্চিন্তে চুপচাপ হয়ে বসে নিজেকে

অকর্মণ্য করে রাখবার নামই যদি হয় সুখে থাকা—তেমন সুখ বাড়ির পোষা কুকুর বিড়ালের হতে পারে—মানুষের তা নয়। মীনা জবাব দেয়নি। মুখ গম্ভীর করে কিছুক্ষণ বসে তারপর উঠে গেছে। চলে যেতেই মাও মেয়েতে চোখের দৃষ্টি বিনিময় হয়ে গেল। মা কিছু বলে না বৌদিকে। তাই যে ক'টা দিন বাপের বাড়ি থাকা—বৌদিকে অন্তত বুঝিয়ে দেওয়া—একটু শিক্ষা দিয়ে দেওয়া একটা কর্তব্য হিসেবে নেয় কমলা। আর কমলাও নিজে বাজারে যায়—নিজে অনেক কিছু রান্না করে। রান্নার লোকটিও কমলাকে দেখলে খুশি থাকে। দুপুরে বই নিয়ে মা'র পাশে বসে—হয়তো ছেলেমেয়েদের ধমকে অঙ্ক করতে বসায়। ছেলেময়েরা প্রতিবাদ করে—এই হলিডিতে তুমি প্রমিস করেছিলে আমাদের টাস্ক করতে হবে না—এখন আবার.....। তোমাদের বই পড়তে বলেছি—তোমরা পড়তে বসনি—থার্ড এরিথমেটিকস। ....আসলে, শুধু যে বৌদিকে একটু শিক্ষা দেবেই বলে আসে তা নয়—বৌদি ওদের দেখামাত্র যে নিষ্প্রান ও নিস্তেজ ঠান্ডা হাসি হেসে অভ্যর্থনা করে—তাতে দাদাকে মাকে দেখবার আনন্দটাই মাটি হয়ে যায়। সেই থেকে ভিতরে ভিতরে এমন করে মেজাজটা বিগড়ে থাকে। এখানে আসবার পর—নিজের ঘর—স্বামী—সব কিছু দেখবার পর মেজাজ আস্তে আস্তে ঠান্ডা হয়। তখন শেষরাতে বোঝে—কেমন উত্তেজনার মধ্যে বাপের বাড়ির দিনগুলো কেটে গেল। অথচ যাবার আগেই কী কমলা জানত না? ওকে দেখে বৌদির সেই প্রাণ—জ্বালানো ঠান্ডা হাসি? ভাবত, যাব বাপের বাড়ি—বৌদি কী ভাবল না ভাবল বয়ে গেল। তবু বৌদির সেই ঠান্ডা হাসি সহ্যও করতে পারেনা। একবার বলতে ছাড়েওনি। -ওঃ আমাদের গাড়ি যখন এসে দাঁড়ায়—বৌদির হাসি দেখবার মতো—ঠিক যেমন করে হেসে লোকে ভিক্ষুককে বলে—মাপ করো, বাড়িতে অসুখ আছে—ঠিক তেমনটি। মীনা একটু অপ্রস্তুত হয়ে পরে জানায়—কি যেন সেই শ্লোক আছে সেই যাকে পছন্দ করে না—তার সব কিছুই—এমনকি চাল চলনও.....। সঙ্গে সঙ্গে কমলা জানায়,—হ্যাঁ, আর যাকে পছন্দ করে—তার ঠান্ডা হাসিও প্রাণ-জুড়ানো তাই না? বৌদি প্রতিটি কথার জবাব দেবে। একবার কমলা নিজের বাড়ির ফার্নিচার নিয়ে আলোচনা করছিল—হঠাৎ মীনা বলে বসল—এ বাড়িতে তো আমার বাবা যা দিয়েছেন—তা মাইনাস করলে কিছু থাকে না। মা ও কমলা মুহূর্তে দৃষ্টি-বিনিময় করে। কমলা সঙ্গে সঙ্গে জানায়—হ্যাঁ, রাজ্যের বোঝা তোমার বাবা এ সংসারে পাচার করে দিয়েছেন। তোমার বাবার দেওয়া সব কিছু মাইনাস করলে আর কিছু না হোক—এ সংসার অনেক হাল্কা হ'ত—আনন্দ ও শান্তি থাকত। মীনা চুপ করে থাকল এক মিনিট। তারপর উঠে তক্ষুনি নিজের ঘরে চলে গেল। দাদা কোর্টে—ছেলেমেয়েরা স্কুলে। আধ ঘণ্টারও কম সময়ের মধ্যে তৈরি হয়ে বৌদি কাউকে কিছু না বলে বের হয়ে গেল। কমলা ও মা স্তম্ভিত হয়ে গেল। অপমানে কমলা দুপুরে কিছু খেতে পারলনা। মা শুধু বল্ল— দেখিস ছেলের আমার চেহারা। কমলার শুধু মনে হচ্ছিল—এমন বৌকে আর কোনোদিন ঢুকতে না দেওয়া। বিকেলে দাদা এল। বাচ্চারা এসেই জানাল—মা, চলে গেছে কলকাতা—তাই না ঠাকুমা। কমলা আশ্চর্য হয়—তোমরা জানলে কী করে।—বাবা বলল যে। সাধারণত বৌদিই বাচ্চাদের নিয়ে আসে। বোঝা গেল বৌদি দাদাকে জানিয়ে গেছে। দাদা যেন কেমন নিষ্প্রাণ,

নির্জীব। দাদা জানাল—মীনা পোস্টাফিস থেকে ফোন করে আমাকে জানিয়ে গেছে। দাদা আর কিছু জানতে চাইলও না। দাদা কিছু বললও না। অভিমানে কমলা দাদার সঙ্গে একটি কথাও বলল না। মা-ই দাদাকে চা দিল—খাবার দিল। দাদা এসেই অভ্যাসমতো বই নিয়ে বসল। কিন্তু দাদার চেহারার মধ্যেই কেমন একটা ভেঙে পড়া ভাব। যেন একটা প্রচণ্ড অশান্তিতে পড়েছে। কোনোমতে নিজেকে চেপে রেখেছে। কিছুই যেন হয়নি এমনি দুর্বল অভিনয় করে চলেছে। কমলা ভাবল, দাদা যখন জানতে চাইল না—তখন আমিও বলব না। দরকার হয় মা'র কাছ থেকে জেনে নেবে। হয়তো ভাববে—মা মেয়ের পক্ষ নিয়ে বলছে। আর মা-কেই যদি বিশ্বাস না করে—আমার কথা বিশ্বাস করবে কেন? দাদা আবার বিচারক! বৌদির অপমানের চেয়েও দাদার ঔদাসীন্য যেন ওকে আঘাত বেশি করল। মনে হল, আমি এসে দাদার সংসারে অশান্তি আনলাম—দাদা এখন আমাকে আপদ ভাবছে। এবার দাদাকে বাছতে হবে—হয় বৌদিকে—না হয় আমাকে। বৌদি থাকতে আমি আর আসছিনে। রাতে মা'র পীড়াপীড়ি সত্ত্বেও কমলা কিছু খেল না। পরদিন দাদা ছেলেমেয়েকে স্কুলে দিয়ে কোর্টে চলে গেল। দাদা চলে যেতেই কমলা ছেলেমেয়েকে নিয়ে—এই প্রথম একা—চলে গেল। এসে মা-কে একটা চিঠি দিয়েছিল। পরে শুনেছিল—দাদা নাকি শনিবার গিয়ে রোববার বৌদিকে নিয়ে এসেছে। দাদা নিয়মিত পত্র দিয়েছে। পুজোর সময় দাদা যাবার জন্যে নিমন্ত্রণ জানিয়েছে—কমলা যায়নি চিঠির উত্তরও দেয়নি। একেবারে বিজয়াদশমীর প্রণাম জানিয়ে মা-কে চিঠি দিয়েছে। দাদাকেও প্রণাম জানাতে বলেছে আর বাচ্চাদের স্নেহাশীষ। বৌদির নামও কোথাও নেই। কমলা মা-কে পার্সেল করে কাপড় পাঠিয়ে দিয়েছিল। দাদার চিঠিসহ পার্সেল এল পুজোর পরে। তারপর এক্স-মাসের ছুটিতে দাদা-বৌদি বাচ্চারা মা-সব এসে হাজির। দুপুরে খেতে এসে নরেন জানাল—ছুটি বটে আপনাদের আর প্রফেসারদের। আমরা তো ছুটি ভুলেই গেছি। কমলার দাদা জানায়—তোমাদের মধ্যে যার যত ছুটি কম—তাঁর তত অর্থ আর সম্মান। মীনা হেসে বল্ল—ছুটি যার যত বেশি—মাইনে বুঝি তাদের তত কম। কমলার দাদাই জবাব দেয়—যার ছুটি আগাগোড়া আর অর্থও নেই—সে বেকার। কমলা হেসে জবাব দেয়—কিন্তু বৌদি তোমার তো ছুটি সারাসময়—তুমি বেকার ঠিকই—কিন্তু টাকা তোমার আছে—আসছে। বাড়িতে আসবার জন্যে কমলা অবশ্য হাসিমুখেই অভ্যর্থনা করেছিল বৌদিকে। এখানে আসবার পর থেকে কেবল মনে হত—বৌদি আমাদের অপমান করল কিন্তু দাদা আমার 'পর অবিচার করেছে ঠিকই হয়তো আমাকে আপদ মনে করেছে—তবু দাদাকে না বলে চলে আসায়, দাদার চিঠির জবাব না দেওয়ায় ওর মন খুঁত খুঁত করছিল। দাদাদের অপমান করা হচ্ছে ভেবে গোপনে কেঁদেছেও। তবু, দাদার চিঠির উত্তর দেয়নি। দাদাদের—মাকে দেখে ওর মন এক ধরনের মর্যাদা পেয়েছে। দাদা-বৌদি যেন প্রকাশ্যে ওর অভিমানের স্বীকৃতি দিল। ওর 'পর অবিচার হয়েছে একথা মেনে নিল—ওকে খুশি করবার জন্যে বৌদিকে নিয়ে এল। দাদা বৌদি যেন ওর রাগের কাছে হার স্বীকার করে নিল। তবু, দাদার হাব ভাবে, ওর কেমন অস্বস্তি মনে হয়। মনে হয়, ওকে আর বৌদিকে সন্তুষ্ট করতেই যেন দাদা উদ্বিগ্ন। দাদা কেন আগের মতো নির্লিপ্ত হতে পারেনা।

দাদা কোনো পক্ষ নেয় না—ঠিকই, তবু, গৃহযুদ্ধ না লাগাবার জন্যে দাদার চেষ্টার মধ্যে দাদাকে কেমন যেন ভীরু মনে হয়। মনে হয়, বৌদিকে অসন্তুষ্ট করতে ভয় পায়—ওকে ক্ষুণ্ন করতে দুঃখিত হয়। দাদা যেন অশান্তির ভয়ে, সর্বদা অশান্ত, ঝগড়ার ভয়ে উৎকণ্ঠিত, মনকষাকষির ভয়ে উদ্বিগ্ন—কেমন একটা গোপন আতঙ্কের ভাব যেন দাদাকে সর্বদা ঘিরে থাকে। একদিন রাতে নরেনের কাছে কমলা না বলে পারল না—আমরা পাছে ঝগড়া করি—তাই দাদা কেমন ভয়ে ভয়ে থাকে লক্ষ্য করে দেখ। নরেন জবাব দেয়—শুধু তোমার দাদা কেন আমিও, তোমার মাও। তোমার দাদা বাচ্চারা আর তোমার বাচ্চারা তো প্রায়ই ঝগড়াঝাঁটি মারপিট করছে—কখন ওর মা'রাও যে শুরু করে দেবে—সেই আতঙ্ক আমাদেরই বা কম কি? কমলা ম্লান হেসে জবাব দিয়েছিল—অতিথিকে বা বাড়িতে কেউ এলে তাঁদের সঙ্গে কেমন ভদ্র ব্যবহার করতে হয় তা আমি জানি। ভদ্রব্যবহার কাকে বলে বৌদিকে আমি দেখিয়ে দেব। তবে ওরা আসায় আমি খুশি হয়েছি—কৃতার্থ হইনি—সেই সঙ্গে এই ব্যবহারও করব।—সেটা কী রকম ব্যবহার?—এই ধর বাড়ির কাজ, পড়াশুনা, ওদের দেখাশুনা যেমন করছি তেমনি করব—আবার ওদের আদরেরও ত্রুটি করবনা। ফর্মালিটি নয়—আদর আপ্যায়ন, খুশি খুশি কিন্তু কৃতার্থ নই—জন্ম সার্থক হয়ে যায়নি—গায়ে পড়ে বড়লোকি দেখাব না—বৌদি ওয়ার্ডরোব দেখতে না চাইলে—ওয়ার্ডরোবের কথাও তুলব না। যা আছে দেখবে—কিছুই দেখাব না। গায়ে পড়ে কিছু দেখানো—একদিকে যেমন হঠাৎ বড় লোকগিরি দেখান—তেমনি মনের ভিতরকার দারিদ্র্যেরও প্রকাশ-—হ্যাংলামির প্রকাশ। অর্থাৎ আমার কিছু আছে, হয়েছে—আমি এই পার্থক্যবোধ দিয়ে তোমার থেকে ভিন্ন—এই সম্পদই তোমার থেকে আমাকে বড় করেছে—নইলে ভেতরে ভেতরে তুমিও যে গরীব আমিও সেই। বুঝেছ ডাক্তার, আমি ঝগড়াটে নই—অতিথিকে ঝগড়া করে তাড়াব না। তবে রাতে ঐ এক পেগটা ক'দিন বন্ধ করলে হয় না—দাদা অনেক রাত পর্যন্ত জেগে থাকে—বৌদিও দুপুরে ঘুমিয়ে রাতে অনেকক্ষণ ছট্‌ফট্ করে। গন্ধ পেতে পারে। একে তো হিংসায় জ্বলে যাচ্ছে। তার 'পর যদি আবিষ্কার করে তোমার এই গুণ তাহলে মাকে দাদা কথা শোনাতে ছাড়বে না। লক্ষ্মীটি—প্লিজ। নরেন জানায়—ভাবছি, আগামীকাল তোমার দাদাকে ড্রিঙ্কে ডাকব। বৌদিকেও।—আর আমি আনড্রেস হয়ে সার্ভ করব। তোমার মা'র কাছে বসিয়ে রাখবে। আমরা আগামীকাল বসব। আমি বিলেত নরেন হো হো করে হেসে উঠল।—না, আমরা চারজন। বাচ্ছাদের—নিতান্ত বুদ্ধু হলে ভাববে আমি লিক টাচ করিনি।—না, না, প্লিজ। তাছাড়া দাদার সামনে। সে হয় না। সেবার অনেক কষ্টে নরেনকে নিবৃত্ত করেছিল। কিন্তু নরেন কমলার দাদাকে একদিন ডেকে নিল। কমলা পালিয়ে গেল। বৌদিকে পাহারা দেবার জন্যে গিয়ে পাশে বসল। বৌদি একটু মুচকী হাসল। কমলা যেন পরিস্কার দেখতে পেল—বৌদি বুঝতে পেরেছে কেন দাদাকে ডাকা হয়েছে।—হাসছে যে?—তোমার দাদার রিঅ্যাকশন দেখ?—কিসের রিঅ্যাকশন? যে জন্যে তুমি চলে এলে? দেখবে কী রকম গুম হয়ে যায়—আস্তে আস্তে।—দাদা কী ডিঙ্ক করে আজকাল?—পয়সা পাবে কোথায়? তবে পার্টিতে যেতে হয়।—তুমিও তো যাও?—যাই।—কখনোও ড্রিঙ্ক করেছ?—সামান্য—

তবে তোমার দাদার মতো গ্লুমি নই। তুমি করনি? তোমার তো পয়সার অভাব নেই।—না, পয়সার জন্যে নয়—টেষ্টই করিনি। আজ কী খেয়াল হল দাদাকে, টেনে নিল—নইলে ওরই বা ড্রিঙ্ক করবার ফুসরত কোথায়—ন'মাসে ছ'মাসে—এইতো আজকে কত দিন পর। কমলা পরিষ্কার মীনার চোখে মুখে একটা অবিশ্বাসের ভাব দেখতে পেল। কিন্তু মীনার মধ্যে কোন রকম বিকার দেখতে পেলনা। ড্রিঙ্ক করে বলে কিছু মাত্র ক্ষুন্ন নয়—মীনা যেন কমলার স্বামী ড্রিঙ্ক করে বলে মীনা যেন কিছু মাত্র ক্ষুণ্ণ নয়—মীনা যেন কমলার স্বামী ড্রিঙ্ক করে বলে মনে মনে কমলাকে হেয় করছে না মজা দেখছে না বরং কমলার মনে হয়, মীনা যেন ড্রাই ফিল করছে। হঠাৎ কমলা বলল—বৌদি, তুমি ড্রিঙ্ক করবে? এনে দেব? মীনা শুস্কভাবে মাথা নাড়ে।—আমি তো বলেছি, ড্রিঙ্ক আমি করেছি—সামান্যই, তবে এখানে নয়।—কেন আমি কিছু মনে করব বলে? নিজে এনে দেব?—তা দেবে। কিন্তু আমাদের অন্তরঙ্গতা সেভাবে গড়ে ওঠেনি। কমলা এবার যেন একটু তীক্ষ্ণ স্বরেই বলে—যাদের সঙ্গে বসে তুমি ঐ সামান্য ড্রিঙ্কই কর—তারা তো সবাই তোমার অন্তরঙ্গ নয়।—কিন্তু তারা আপনও নয়, স্বজনও নয়।—স্বজন হবার অপরাধে বেশ যাব কিন্তু তোমাকেও খেতে হবে।—কিন্তু আমি যে সামান্যও খাইনি—ছেলের মাথায় হাত দিয়ে বলতে পারি বৌদি।—আমি জানি তুমি খাওনা। তোমাকে এতদিন দেখছি জানিনে। আজকে খাও। কর্ত্তাকে বলো—সব ঠিক করে দেবে।

—কিন্তু খেলে আমি কী করব—কিছুই জানিনে।—কিছুই করবে না। অযথা ভয় পাচ্ছ। লোকে ড্রিঙ্ক করে মাতাল হবার জন্যে নয়—একটু স্টিমুলেন্ট পাবার জন্যে। কমলা যদিও ব্যস্ত ছিল ওর কর্তা যে নিয়মিত ড্রিংক করে না একথা বোঝাবার জন্য মীনার কাছে ধরা পড়ে যাবার লজ্জায়—এমনকি, ও নিজেও যে খায় না—এ কথাও যেন বৌদি বিশ্বাস করছেনা এই অভিমানে, সঙ্কোচে আর বাড়িতে ড্রিঙ্ক করবার অপরাধে ওর কান্না পাচ্ছিল। শুধু সে তাই নয়, ওযে খায় না বৌদির এ আশ্বাস ওর কাছে মিথ্যে আশ্বাস বলে মনে হচ্ছিল, মনে হচ্ছিল, ওকে আজ ড্রিঙ্ক করাবার জন্যে—বৌদির হচ্ছে এই ফাঁদ। কিন্তু কর্ত্তা ড্রিঙ্ক করছে এ কথায়—অপরাধের মতো—ভেতরকার লজ্জার মতো—ওর বৌদি অবিশ্বাস করছে জেনেও—রাগ করতে পারছিল না—রাগ হচ্ছিল না—কেমন কাচুমাচু হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ভেতরে ভেতরে একটা অনুভূতি এতক্ষনে যেন এসব ছাপিয়ে মাথা চাড়া দিয়ে দাঁড়াচ্ছিল। ওর বৌদি পার্টিতে যায়—ড্রিঙ্ক করে—ওর দাদার মতো গ্লুমি হয়না অর্থাৎ ওর চেয়ে অনেক গরীব হলেও বৌদি ওর চেয়ে অনেক আধুনিকা। ওর শাড়ী, গহনা, অনেক থাকতে পারে—কিন্তু কমলা হচ্ছে গেঁয়ো—যতই ইংরেজি বলুক আর পড়ুক। মনে প্রাণে আধুনিক নয়—আধুনিকা নয়। বলতে পারবে না তো, নিজে আনড্রেস হয়ে রোজ নির্দিষ্ট মাপে কর্ত্তাকে নিজে ঢেলে দেয়। তবুও, আজ বৌদির সামনে নিজেকে ওর কেমন গেঁয়ো লাগতে থাকে—যা অসহ্য। ওর মনে হয়—কোন এক সোনার বেনের বাড়িতে গিয়েছিল—কত অলংকার—কত শাড়ী—সেই ছাত্রী জীবনে—পরে বন্ধুরা—ওদের চালচলন—ওদের ঐশ্বর্য—মাথায় জবজবে করে তেল—সেই অলঙ্কারের কুৎসিত জাঁকজমক—কী হাসাহাসিই না করেছিল। আজ নিজেকে তেমনি গেঁয়ো—তেমনি অনাধুনিক মনে হতেই কমলার

যেন দুর্বলতা অনেকটা কেটে যায়। আস্তে আস্তে বলে—দাদার সামনে—দাদাকে চিরকাল....। বলেই থেমে যায়। দাদার সামনে কী করে—এযে ভেতরের—দাদা কী ভাববে। কিন্তু বৌদি যদি দাদার সামনে.....। কমলা ততক্ষনে উঠে দাঁড়ায়। বৌদির হাত ধরে এক রকম জড়িয়ে বৌদিকে নিয়ে আসে। বৌদিও ওর কোমর ধরে এগিয়ে যায়। আজ ওর মনে হল, বৌদি যেন আন্তরিক ভাবে ওকে জড়িয়ে ধরল।

ওরা যেতে যেতে শুনতে পেল নরেন বলছে—কিন্তু প্রতিটি মানুষ বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে ছেলেবেলা বা শিশু বয়েস থেকে বড় হয় না ঠিকই—কিন্তু প্রতিটি কোষ একটা অনিবার্য তাগিদে—ভেতরকার তাগিদে—এক একটা টিস্যুতে গিয়ে বিশেষ বিশেষ কাজে যোগ দেয় একই রকম কোষ—একই ধরনের কাজ করে। ওদের শ্রমবিভাগ ওরা কী ভাবে বেছে নিল? তেমনি প্রতিটি মনও বিশেষ বিশেষ কাজ করবার—কোন নির্দিষ্ট কাজ করবার প্রতিশ্রুতি নিয়ে জন্মায়। এ কথা বলা কী অসঙ্গত আবার এই উপমাটিকে বা ধারনাটিকে যদি প্রসারিত করা যায়—তবে সমগ্র জীবন যা কোষ থেকে মস্তিকে পরিণতি লাভ করেছে—তারও কী কোন উদ্দেশ্য নেই—আমরা কী সকলে সেই উদ্দেশ্যের অন্তর্গত নই?

বরুন মাথা নেড়ে বলল—না, নরেন, বিশ্বকে বুঝতে গেলে বাইওলজি দিয়ে হবে না। ফিজিক্স দরকার। কোষ থেকে মস্তিস্ক—এই যে পরিণতি তুমি দেখালে তা এই বিরাট বিশ্বে যেমন নগণ্য—তেমনি আকস্মিক। তা ছাড়া জিন থেকে, ভাইরাস থেকে, এক কোষী জীব থেকে মানুষ পর্যন্ত ধারাটি যে ভাবে ভাগ করেছ তা যতটা যৌক্তিক ততটা কালানুক্রমিক নয়। মানুষ পৃথিবীতে অনেক অনেক আগে আসতে পারত—আসেনি কেন? ট্রায়াল ও এবার—ভুল আর সংশোধন, চেষ্টা আর ভুল—এই পদ্ধতিতে মানুষ এসেছে। হঠাৎ ম্যামাল অর্ডারের একটা জীব বুদ্ধিবৃত্তি পেয়েছে—এই পর্যন্ত। এই বিরাট বিশ্ব—যা অযুত কোটি আলোক বর্ষ জুড়ে ব্যাপ্ত—সেখানে বস্তুর এমন একটা স্থানীয়—লোকাল পরিণতি খুব গ্রাহ্য করবার বিষয় নয়। লক্ষ লক্ষ গ্যালাক্সির অযথা ছুটে চলা—কোটি কোটি নক্ষত্রের অনর্থক নিরর্থক জ্বলা আর নেভার মধ্যে—নগণ্য নক্ষত্রের পরিবারের তুচ্ছ গ্রহের বস্তুর মধ্যে বুদ্ধিবৃত্তির এক পলকের প্রকাশ—সমগ্র বিশ্বের পরিপ্রেক্ষিতে কিছু মাত্র উল্লেখযোগ্য নয়। এই প্রসারিত বিশ্বের দিকে তাকিয়ে, কোটি কোটি নক্ষত্রের অযথা বাঁচা মরা থেকে তুমি কিছুতেই কোনো উদ্দেশ্য খুঁজে পাবে না। আমরা এতকাল ছিলাম না—মরবার পরেও থাকব না। দুইটি অনন্ত না থাকার মধ্যে এই একফোঁটা থাকা। এই জীবন—উদ্ভিদ আর প্রাণীর জীবন—এই অস্তিত্ব—যেন অনন্ত অনস্তিত্বের একটুকু বিশ্রাম—একটু ইনটারভেল। অনন্ত না থাকা যেন এক ঘেয়েমি কাটাবার জন্যে একটু থাকায় হাফ ছেড়ে বেঁচেছে। এই হচ্ছে সমগ্র গ্যালাক্সি আর একটু গ্রহের এক মিনিটের জীবনের উদ্দেশ্য। এই রকম কাব্য যদি কিছু কর—তবে হয়তো বিশ্বের উদ্দেশ্য কিছু পেতে পার। আর জীবনের বিবর্তনের কথাই যদি বল, মানুষ আরো বিবর্তিত হয়ে অতি মানুষে পরিণত হবে—এটাও মানুষের ইচ্ছাপূরণ ছাড়া আর কিছু নয়। আরো সূক্ষ্মতর বিবর্তন যে মানুষকে অবলম্বন করেই ঘটবে—এইটে মানুষের ভিত্তিহীন অহংকার ছাড়া কিছু নয়। বিবর্তন হয়তো অন্যকোনো জীবকে

অবলম্বন করবে—হয়তো অন্যকোন অর্ডার থেকে, ফাইলাম থেকে বিবর্তনের পরবর্তী স্তর শুরু হবে। পরবর্তী বিবর্তনের পছন্দ মানুষই হবে—আমি তার কোনো সঙ্গত কারণ দেখিনে। আমরা ভুলে যাই আমরা পরিবেশের হাতে বন্দী, কয়েদী। এই পরিবেশ বাইরে, ভেতরে, অন্তরে অন্ধরে। কমলার দাদা চোখ বুজে বলছিলেন। কমলা আর মীনা ঢুকে দাঁড়াতেই নরেন ইঙ্গিতে ওদের বসতে বলল। নরেনকে দেখেই কমলা বুঝেছিল, বেশ ক' পেগ হয়ে গেছে। তবু কমলা নরেনের দিকে তাকিয়ে চোখের ইঙ্গিতে মদের বোতল আর বৌদিকে দেখিয়ে দিল। ওর দেখিয়ে দেওয়া মীনা দেখে ফেলল। সঙ্গে সঙ্গে মীনাও নরেনকে ইঙ্গিতে মদের বোতল আর কমলাকে দেখিয়ে দিল। কমলা কিছুটা অসহায় ভাব ও কিছুটা কৃত্রিম রোষে নরেণের দিকে তাকাল। পরে নিজের বুকে আঙুল ঠেকিয়ে মাদার দিকে তর্জনী দেখাল। নরেন হেসে মানাকে ইঙ্গিতে বসতে বলল। আর কমলাকে বসতে বলে অভয় দিল। দু'টি চেয়ারের শব্দেও বরুণের কথা-স্রোত বন্ধ হল না। যেন একটা ক্ষোভ ওর কথার মধ্য দিয়ে প্রকাশ পাচ্ছিল। জীবনের কোনো উদ্দেশ্য নেই, বিশ্বসৃষ্টি আগাগোড়া কতগুলো বস্তুপুঞ্জের খামখেয়াল যেন ওর এক বেদনাময় আবিষ্কার—দুঃখজনক সিদ্ধান্ত।

নরেন উঠে আরো দুটো বোতল ফ্রিজ থেকে বের করল। একটা ককটেল করে মীনাকে দিল। আর একটা গ্লাসে একটু জিন একটু সোডার সঙ্গে মিশিয়ে কমলার দিকে ঠেলে দিল। কমলা টেবিলের 'পর ঝুঁকে দু'হাত টেবিলের 'পর রেখে যেন জিনকে আঁচল চাপা দিতে চাইল। যথাসম্ভব হাতের আড়ালে গ্লাসকে আড়াল করল। মীনা ফিস ফিস করে জানাল—তোমার দাদা এখন চোখ খুলছেনা। নরেন অনুপান হিসেবে কিছু নোন্‌তা বিস্কুট মীনাদের দিকে এগিয়ে দিল। মীনা যেন একটু চুমুক দিয়ে তারিয়ে তারিয়ে খেতে শুরু করল। মাঝে মধ্যে বিস্কুট মুখে ফেলে দিচ্ছিল। যেন স্বগতোক্তির মতোই—কে নরেনকে—না কমলাকে বলল—ঠিক বুঝা গেল না—এগুলোর দাম অনেক—খাস বিলিতি।

মীনার কণ্ঠস্বরে বরুণ মুহূর্তের জন্যে চোখ খুলল। কিছুক্ষন মীনার দিকে, মীনার গ্লাসের দিকে ঝাপসা ভাবে তাকালো। কমলাকে দেখলো কিনা বোঝা গেলনা। সেই থেকে কমলার বুক এত কাঁপছিল—দাদার বন্ধ চোখ খুলতেই চোখ—কান—মুখ যেন গরম হয়ে উঠল। হাতের গ্লাসটিকে ছুঁড়ে ফেলে দিতে ইচ্ছে করছিল। তাড়াতাড়ি দায়িত্ব শেষ করবার মতো অনেকটা এক চুমুকে খেয়ে মুখ বিকৃত করল। নরেন ইঙ্গিতে আস্তে খেতে বলল। কমলা ভয়ে ভয়ে অপেক্ষা করতে থাকে—এবার ওর না জানি কী হয়। নিজের দেহের ও মনের 'পর সতর্ক দৃষ্টি রাখল। কোনো পরিবর্তন দেখলেই ছুটে পালাবে—তা বৌদি যত গেঁয়োই ভাবুক। বুকের মধ্যে একটু জ্বালা করা ছাড়া আর কিছু লক্ষ্য করতে পারল না।

এবার নরেন জানাল—শুনুন দাদা, আপনি কিন্তু জগতের চিত্র সম্পর্কে জগতের উৎপত্তি, বিকাশ ও বিলয় সম্পর্কে একটা স্থির সিদ্ধান্তে এসে গেছেন। কিন্তু, যদিও আমার পড়াশুনা অতি সামান্যই—কমলা আমাকে বহু বছর কোচ করতে পারে—তবু, আমার ধারণা, বস্তু বা পার্টিক্যাল অর্থাৎ এনার্জি ও মাসের সম্পর্ক—এনার্জি ও মাসের

স্বরূপ সম্পর্কে সঠিক সিদ্ধান্তে আসবার মতো সংবাদ আমাদের হাতে আসেনি। তাই বস্তুর উৎপত্তি, জীবনে উৎপত্তি মনের উৎপত্তি এখনও রহস্যের অন্তরালেই রয়েছে। এগুলো এখনও টেনটেটিভ, হাইপোথিসিসের স্তরে রয়েছে। এ সম্পর্কে চরম সিদ্ধান্ত নেওয়া—আর সিদ্ধান্ত নিয়ে নিজেকে কষ্ট দেওয়া—মনে হয় এমন জায়গায় এগিয়ে যাওয়া যেখানে মাটি খুব মজবুত নয়। শুনেছি, প্রতিটি দার্শনিক এক একটি বিশ্বের চেহারা এঁকে চলেছেন—প্রত্যেকেই অপরকে ধূলিসাৎ করে নিজের মতো প্রতিষ্ঠা করতে চাচ্ছেন। ফলে, এ কথাই স্পষ্ট হচ্ছে—সত্য ওদের কারো পকেটে নেই—তাই এই ক'হাজার বছরের যুদ্ধে সব্বাই নিহত। এই কুরুক্ষেত্রে কুরুপাণ্ডব কেউ-ই জীবিত নয়। কিন্তু আমার কথা হচ্ছে, আমরা বুদ্ধিমান জীব—অর্থাৎ বুদ্ধির মধ্যেই একটা উদ্দেশ্য রয়েছে, তাই প্রতিটি সেল থেকে মানুষের প্রতিটি কাজের মধ্যে এই উদ্দেশ্যের সন্ধান পাই। এমনও তো হতে পারে— প্রাণ বা জীবন বস্তুকে একটা বিশেষ অবস্থায়—যখন বস্তু ব্যবহারের যোগ্য হল—তখন থেকে ব্যবহার শুরু করল—এমনি করে বস্তু জগতে জীবনের অভিযান শুরু হল। হয়তো জীবন এখন পর্যন্ত বস্তুকে পুরোপুরি আয়ত্ত করতে পারেনি। হয়তো জগতে প্রাণের এনার্জি আছে—বস্তুর একটা বিশেষ অবস্থায় প্রাণ তাকে গ্রহণ করতে পারে। আপনার কথা সত্য, বস্তু জগতের মাপ কাঠিতে জীবনের বিচারে জীবন মূল্যহীন—তুচ্ছ হয়ে যায়। কিন্তু প্রাণের মাপ কাঠিতে বস্তু একটা ব্যবহারের যন্ত্র মাত্র। প্রাণ এই যন্ত্রটিকে ব্যবহার করছে। যন্ত্রটির একটা নিজস্ব নিয়ম রয়েছে—বস্তু বিশ্বের নিয়ম অনুযায়ী তা চলে। আবার মনের জগতেরও একটা নিয়ম আছে। বস্তু যখন ব্যবহারের অযোগ্য হয় মন তখন তা ছেড়ে দেয় একেই তো বলি মৃত্যু। হয়তো জগতে দু'রকম এনার্জি রয়েছে—কিংবা বহু রকমের রয়েছে। আমরা আপাতত দু'রকমই দেখতে পাচ্ছি—একটা নেগেটিভ ও পজিটিভ এনার্জি অর্থাৎ ফিজিক্যাল এনার্জি—আরেকটা জীবনের এনার্জি—বা সাইকিক্যাল এনার্জি। হয়তো এই মানসিক শক্তি বস্তুর একটা বিশেষ অবস্থা ঘটলেই নিজেকে প্রকাশ করতে পারে। তবে সবই হয়তো। দাদা, আজকের টেবিলে মেটাফিসিকস একটু বেশি হেভী হচ্ছে না?

মীনা ইঙ্গিতে বরুনকে দেখিয়ে যেন বরুণকে উদ্দেশ্য করেই বলল—আমাদের ওখানকার এস.ডি.ও মিঃ চক্রবর্তী বলেন, আগে নাকি উপন্যাসে মাতাল ও পাগলের মুখে গভীর দার্শনিক তত্ত্বকথা, জীবনের অসারতা সম্পর্কে নানা মন্তব্য দেওয়া লেখক ও সিনেমা পরিচালকদের একটা মুদ্রাদোষ ছিল।

নরেন হেসে জানাল—মাতাল ও পাগল যে সুবিধে ভোগ করে তা তো আর সবাই পেতে পারে না। তাই ওদের সাহায্য লেখকদের পক্ষে খুবই দরকার। নিজের ফিলজফি প্রকাশের জন্যে পাগল ও মাতালের প্রয়োজন। তাতে ভগবানের, সমাজের সমালোচনাও চলে, আবার সমালোচনার জন্যে কোনো শস্তিও পেতে হয় না। বরুন গম্ভীর ভাবে জানাল—পাগল ও মাতাল জীবনকে একটা দৃষ্টিভঙ্গী থেকে দেখে—সেই দৃষ্টিভঙ্গী অন্যান্য পাঁচজনের চেয়ে অন্যরকম। আমরা বিভিন্ন ষ্টিমুলেন্টে বিভিন্নভাবে রি-এ্যাক্ট করি। পাগলামিও এমনি ধরনের একটা প্রতিক্রিয়া—মাতলামিও। জীবনের সত্য একমাত্র গার্হস্থ্য মুহূর্তেই প্রকাশ পাবে—এমন কোনো প্রমান নেই। পাগলামিও এক

ধরনের জীবনযাপন—অন্য কারো সঙ্গে তা মেলে না বলেই তা অপাঙ্‌ক্তেয় এ কথার কোনো যুক্তি নেই। পাগলে পাগলেও যদি অমিল থাকে—তবু কারো বক্তব্যই উড়িয়ে দেওয়া যায় না। জীবনের নানা প্রকাশের মধ্যেই পাগল ও মাতালও এক একটি প্রকাশ—আর সকলের অভিজ্ঞতার সঙ্গে ওদের অমিল বেশি—আমরা সংখ্যাগরিষ্ঠরা তাই বলে ওদের অগ্রাহ্য করতে পারিনে। জীবনের সমগ্র অভিজ্ঞতায় অ-সাধারণ অভিজ্ঞতার মূল্য কম নয়। যখন সমগ্র জীবনের মূল্য নির্ণয় করা হবে—তাতে সাধারণ অসাধারণ সকল রকমের অভিজ্ঞতার সাক্ষ্য নিতে হবে।

—তা হলে দাদা, টেলিপ্যাথি ও ক্লেয়ারভায়ন্স অর্থাৎ প্যারা সাইকোলজির সাক্ষ্যও কিন্তু নিতে হবে। নরেন জানায়।

মীনা জানায়—অসুস্থ মানুষের সাক্ষ্যও নিতে হয়।

নরেন আর একটা কোর্স ইতিমধ্যে সাজিয়ে ফেলেছে।'বরুণ আস্তে আস্তে চুমুক দিচ্ছে, মীনাও। কমলাকে চোখের ইঙ্গিতে দিতে চাইলে কমলা রাজি হল না। কমলা তাড়াতাড়ি গ্লাস শেষ করে দূরে গ্লাস রেখে দিয়ে নিজের মনের গতিবিধির তীক্ষ্ণ নজর রেখেছে। কিন্তু কোনো প্রতিক্রিয়া না করেও ঠিক স্বস্তি পাচ্ছিল না। ভাবছিল, একটু পরেই হয়তো রভ হবে।

কমলা গ্লাসটি আরো দূরে সরিয়ে রাখল। ওর সঙ্গে গ্লাসের যে কোনো সম্পর্ক ছিল এ কথা যেন পুরোপুরি অস্বীকার করতে চাইল। তবু, বারবার মনে পড়তে লাগল, দাদাতো বৌদির কাছে শুনতেই পাবে। দাদার চোখে এমন ভাবে হেয় হবার জন্যে কেমন যেন নিজের 'পর, বৌদির 'পর বিরক্তি বাড়তে লাগল। বৌদি কেমন আরামে আলস্যে চুমুক দিচ্ছে—দেখে গা জ্বলে যায়। বৌদি কী ওর বড়দা, মেজদার সামনে ড্রিঙ্ক করতে পারে? তবে আমাকে নিয়ে এল কেন? হয়তো জিজ্ঞাসা করলে বলবে, আমাদের বাপের বাড়িতে সবাই একসঙ্গে বসে ড্রিঙ্ক করি। তখন? কমলার কেবল মনে হতে থাকে, দাদার চোখে ছোট হয়ে গেল, হেয় হয়ে গেল, যেন ওর পবিত্রতা নষ্ট হয়ে গেল। কমলার মন উষ্ণ হয়ে ওঠে। কেমন যেন তেতে ওঠে। হঠাৎ মনে হয়, এই রাগ আর গ্লানি—এগুলো ঐ ছাইভস্ম গেলবার ফল নয় তো! কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মনে হয়, এই রাগ আর গ্লানি এতো অতি পরিচিত অনুভূতি। ঐ জিন খেয়ে তো কিছু হ'লই না—মাঝ থেকে দাদার কাছে নিজের ইমেজ নষ্ট হল। হয়তো মাও বৌদির কাছ থেকে জানতে পারবে। এ কথা মনে হতেই—ইচ্ছে হ'ল—ছুটে মা'র কাছে যায়। কিন্তু এখন নিশ্চয়ই মুখে গন্ধ—মা টের পাবেন। ইতিমধ্যে নরেন একটা ককটেল করে হঠাৎ কমলার হাতে গুজে দিল। দিয়ে কমলাকে যেন আদেশ করল। শব্দ হবার ভয়ে কমলা দূরে সরিয়ে রাখল না—সঙ্গে সঙ্গে ভাবল, যা হবার হয়েছে—এখন এক পেগ খেলেও যা—পাঁচ খেলেও তাই। কমলা প্রায় সবটা একসঙ্গে খেয়ে ফেলতে গিয়ে বিষম কাশতে লাগল—লজ্জায়, ঘৃণায়, অপমানে গ্লানিতে কমলার মুখ লাল টকটকে হয়ে উঠল। ঠিক সেই সঙ্গে মনে হল—হয়তো ওর বৌদি ভাবছে—আজ যে প্রথম দিন খাচ্ছে—সেই ন্যাকামি বারবার করছে। মনে হতেই বাকি গ্লাসটি শেষ করে। নরেন উঠে ক'টি কাজু বাদামও বিস্কুট কমলার মুখে ফেলে দেয়। শান্ত ভাবে কমলা তা খায়। ভেতরটা যেন জ্বলে পুড়ে যাচ্ছে।

ইতিমধ্যে নরেন চোখের ইঙ্গিতে মীনাকে একটা সিগারেট ধরাতে বলে।

মীনা মাথা নেড়ে জানায়—রুচি নেই—তবে ট্যাবুও নেই। ভালো লাগে না। নরেন উঠে একটা গোল্ড ফ্লেক মীনার হাতে গুজে দেয়—আমার অনারে।

মীনা রাজি হয়ে বলে—বেশ।—বলেই কমলার দিকে ইঙ্গিত করে—এক যাত্রায়—

নরেন জানায়—গোড়া থেকে পৃথক ফল হচ্ছে। প্রথম দিন ওকে আর ট্যাক্স করা নয়। অতটা সইবে না।

নরেন লাইটার ধরিয়ে দেয়। মীনা মৃদু মৃদু টান দেয়। বলে, আপনার টেস্টের প্রশংসা করতে হয়। ভালোই লাগছে কিন্তু। এতটা ভালো লাগবে—ভাবিনি। বরুণ আবার মুখ খোলে—এক, প্যারাসাইকোলজির কথাই যদি ধর, যদি ওদের ফলাফল মেনেও নেওয়া যায়, তবে বলতেই হবে—ফলাফল তোমাদের ফেভারে যাচ্ছে না। কারণ, টেলিপাথি অর্থাৎ ইন্দ্রিয় ছাড়া মনের সঙ্গে যোগাযোগ করে কি পাচ্ছ—ওর মনের অবস্থার কথা জানতে পারছ বা ওর মনের মধ্যে নিজের ইচ্ছা জাগিয়ে তুলছ। ইচ্ছাটি কিন্তু নিতান্তই তোমার অভিজ্ঞতার ফলাফল অর্থাৎ যা তোমার অভিজ্ঞতায় নেই—তাই টেলিপাথিতে পাচ্ছ না। ক্লারাভয়েন্স বা দূরদর্শন, দূরশ্রবণ—কি দেখছ, কি শুনছ? এই জগতেরই কোন কথা বা ছবি। প্রিকগনিসন বা প্রিমনিসন—অর্থাৎ কী ঘটতে যাচ্ছে—কি ঘটবে—এই সম্পর্কে ধারনা—তা তোমার বা তোমাদের বাস্তব জীবনেরই আগাম সংবাদ। অর্থাৎ প্যারাসাইকোলজিও এ জগতের কথাই তোমাকে বলছে—তাঁর বাইরে কিছু বলছে না—তুমি যে এই জগতের সঙ্গে নিষ্ঠুরভাবে বদ্ধ—তার বাইরে যেতে পারছনা—মন ইন্দ্রিয় ছাড়া কাজ করলেও—এই জগতের—বস্তুপুঞ্জের বাইরে এক পাও যেতে পারে না—ভাবতে পারে না—দেখতে পায় না—এখানেই কী প্যারাসাইকোলজি সীমিত নয়? দুই, তোমরা যোগীদের সমাধি—সবিকল্প ও নির্বিকল্প সমাধির কথা বলতে পারতে। বলনি। তাঁরও জবাব দিচ্ছি। মনকে একটা বিন্দুতে এনে—চিন্তাশূন্য করে ফেলা অর্থাৎ নিজেকে সম্পূর্ণ চিন্তাশূন্য করা—করে একটা অচেতন অবস্থায় কাটানো। ঐ অবস্থার কথা কেউ বলতে পারেনা—কারণ তা অন্ধকারময়। তবে ঐ অচেতন অন্ধকারটি নাকি ভালো লাগে—যেমন সুষুপ্তি বা স্বপ্নশূন্য ঘুম আমাদের ভালো লাগে। ঐ অবস্থা যখন শেষ হয়—তখন যে যার আগের আকাঙ্ক্ষার বিষয়কে ঐ অবস্থার ঘাড়ে চাপিয়ে দেয় অর্থাৎ সমাধিতে স্বপ্নহীন ঘুমের আস্বাদন—হয়তো একটু বেশী ডিগ্রির তা পাওয়া যায়। তাও তোমার অভিজ্ঞতার বাইরে নয়। তিন, জগতে প্রাণের এনার্জি রয়েছে—তার নিজস্ব স্বাধীন সত্তার কোনো অভিজ্ঞতা আমাদের নেই। যেই প্রাণ, কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেনের নাইট্রোজেন নিজে বস্তুর সাহায্য না পেলে কিছুই করতে পারেনা—করবার কোনো ক্ষমতা নেই—নিজে যে বস্তুর সাহায্য ছাড়া প্রকাশ পেতে পারে না—বস্তু না গেলে, দেহ না পেলে যে নিরুপায়, অসহায়—সে যে স্বাবলম্বী নয় এ কথাও তো স্বীকার করতেই হবে। তা হলে, যা বস্তুকে অবলম্বন করছে—অথচ নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারেনা—তা কী বস্তুরই সম্পত্তি নয়? এ দিকেই কী পাল্লাটি বেশি ঝুঁকে পড়ছে না? বস্তুর একটা বিশেষ অবস্থায়—বিশেষ সম্মিলনে জীবনের প্রথাটি দেখা দিচ্ছে। এখন ব্যাপার হচ্ছে এই, যে সব বস্তুর মধ্যে এই প্রপার্টি দেখা দিচ্ছে জগতে এই জাতীয়

বস্তুগুলো নিজেদের লাটসাহেব বলে ভাবতে শিখেছে—আর জগতে মানুষ হচ্ছে আপস্টার্ট—হঠাৎ বড়লোক। এই আপস্টার্ট নিজের সম্পর্কে এত উঁচু ধারণা—সে বস্তু জগতের—তার সত্যিকারের আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে—বস্তুর সঙ্গে—সম্পর্ক ছেদ করতে পারলেই বাঁচে। তাই সমস্ত আধ্যাত্মিকতার মধ্যে, মেটাফিজিকাল আইডিয়ালইজমের মধ্যে আমি কিছু বস্তুর হঠাৎ নবাবী লক্ষ্য করি—কেউকেটা হয়ে গেছে এমনভাব। তাই যখন রোগ, ব্যাধি, মৃত্যু আসে—তখন কিন্তু এই সব হঠাৎ বড়লোকগিরির ভিতরকার দারিদ্র্য ধরা পড়ে যায়। ভেতরকার আসল চেহারাও স্পষ্ট হয়। তাই মেটাফিজিক্যাল আইডিয়ালইজমের সবচেয়ে বড় শত্রু মৃত্যু। শ্মশানে, কবরে, গোরস্থানে, হাসপাতালে আর নার্সিংহোমে আধ্যাত্মিক দর্শনের অন্তঃসারশূন্যতা ধরা পড়ে যায়। চার, পাগল ও মাতাল দেহেরই বশ—দেহের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ায় চলে—পরিবেশের দাস—এই কী প্রমাণ করে না। প্রাণের এনার্জি বিষ সহ্য করতে পারেনা, ক্লোরফর্মে নিষ্ক্রিয়, বেশি মদে কার্যকরণ সম্পর্ক এলোমেলো হয়ে যায় আবার পরিবেশ পছন্দ না হলে নিজেকে একটা মনগড়া জগতের মধ্যে রেখে দেয়—বাইরে আনতে—চায়না—এইতো পাগলামির সার কথা। এমনই স্পর্শকাতর, দেহের ভেতরে পর্দানশীন একটা প্রক্রিয়ার জন্যে একটা নিজস্ব জগত দাবি করছ? আরেকটা বিলয়—আরেকটা রিনস। নরেন জানায়—আজকের আপনার বক্তব্য নিশ্চয়ই কোনো দ্রব্যগুণজাত নয়। বরুণ হাসল। আবার হাতও বাড়াল। নরেন আরো কিছুটা ঢেলে দিল। সবটা একসঙ্গে খেয়ে একটু চুপ করে রইল। বল্ল—এমন কী তাও যদি হয়—তবু তা আমার বক্তব্যের পক্ষেই যায়। শুধু ভালগার লজিসিয়ানরা একটা ফ্যালাসি দেখতে পাবে—এইটুকু মাত্র। পাঁচ, তুমি মাস—এনার্জি ইকুইভালেন্স সম্পর্কে বলছিলেনা—সেই কেয়োন্টাম মেকানিক্স ও রিলেটিভিটি... বরুণ এবার চোখ খুলল। চোখ দুটো লাল। যেন কমলাকে চিনতে চেষ্টা করছিল। তারপর মীনার দিকে। একটু চুপ থেকে মীনার সিগারেটের শেষ অংশটুকু দেখছিল। তারপর যেন সিগারেটের কথা মনে পড়ল। একটা সিগারেট ধরাল। চোখ বুজে একমনে টানতে লাগল। তারপর আবার মুখ খুলল,—পাঁচ, ম্যাস এনার্জির সম্পর্ক—সেই কনজেকচার—সেই কোয়ান্টাম মেকানিক্স ও রিলেটিভিটি থেকে যতটুকু স্প্রিচুয়াল রোমান্স করা যায়—কিছু আপস্টাটি বস্তুর অহংকারের যদি কোনো মূলধন পাওয়া যায়—তাই না? সবচেয়ে আগে দরকার অভিজ্ঞতা কথাটি ঠিকমতো ব্যাখ্যা করে নেওয়া....। বরুন একটু চুপ থেকে জানায়—তোমার ষ্টক খুব ভাল।

— আপনাদের অনারে আজকে জোগাড় করেছি।

— ভালো কার লাগছে —দেহের — না মনের? দেহ ভোগ করছে — দেহের ভোগের সচেতনতাকে মন বলতে চাচ্ছি? এ কথাটি মনে রেখে এবার অভিজ্ঞতা কথাটির.....। দেহ, প্রাণ, মন—এই ভাবাগুলোই যত ভুল চিন্তার কারন। না, আজকের ড্রিঙ্ক—সত্যি, এমন ডিলিসাস্—মাত্রা বোধ হয় একটু — তা হোক, রোজ তো এমন জোটে না। পাঁচ, কোয়ান্টাম—মেকা.....হ্যাঁ, বলছিলাম, ভাবার ভুল—সৃষ্টি, উৎপত্তি, দেহ, প্রাণ, মন — এই ভাষাগুলোর যথার্থ অর্থ কি? বরুণ যেন এবার চুপ করে যায়। কেমন যেন ঝিমিয়ে পড়ে।

মীনা যেন খুব আলগোছে নরেনকে বলে—আপনি নিজে কিন্তু খুব বেশি নেননি। আমাদের কী হয় দেখবার শখ? তবু এই শখকেও প্রশংসা করতে হয়—যেমন কষ্টলি—তেমনি অতগুলো ভ্যারাইটির সামনে—এত প্রাচুর্যের সামনে নিজেকে সামলানো—অন্তত পরিমিত করা—আই অ্যাডমায়ার—এতটা ঠান্ডায় এমন জমেছে—একটু লাইট টক—আমার এমন হাল্কা লাগছে—মনে হয় উড়ে চলে যাব। তোমার পাঁচের কী হল? ঐ আপদ কখন শেষ হবে? না, আরো পয়েন্ট আছে। আচ্ছা ডক্টর, আপনারা ফ্যামিলি প্ল্যানিং করেন—তাতে বৈধ সংখ্যা তিন। আলোচনা বা তর্কের সময় এমনি পয়েন্টের সংখ্যা বেধে দেওয়া যায় না। কী একটা বই সেদিন ওর হাতে দেখলাম—ওয়ান টু থ্রি ইনফিনিটি—এমন চমৎকার আয়োজন—অথচ থিয়োরীর কচকচিতে—ডক্টর একা উড়ে যাওয়া যায় না?—আমেরিকায় শুনেছি মেয়েরা একা একা ছোট্ট নিজের প্লেনে ওর্য়াল্ড ট্যুর করে—সত্যি? ফ্যাক্ট? না, আমার শুতেও ইচ্ছে করছে। নরেন এবার নিজে অনেকটা আস্তে আস্তে খেতে শুরু করল। তারপর হঠাৎ মীনা দিকে আরেকটা সিগারেট এগিয়ে দিল—ধরিয়েও দিল। মীনা উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে—ওঃ এমনি একটা কিছু যেন চাইছিলাম। আপনাকে এত থ্যাঙ্কস দিতে ইচ্ছে করছে। আপনি পজিটিভলি থট রিড জানেন—জানেন, যখন স্কুলে কাজ করতাম তখন অ্যাসিষ্টাট হেডমিসট্রেস হাত দেখে বলেছিলেন—হাত দেখতে জানতেন, বলেছিলেন, তোমার ম্যারেড লাইফ সুখের হবে না। কিন্তু ডক্টর, লাইফ বলতে শুধু কী ম্যারেড লাইফই বোঝায়? জীবন বলতে কী সংসার? ফ্রাঙ্কলি বলুনতো—আমরা সমাজে বাস করি—না, পরিবারে বাস করি? সমাজের আর লোকগুলো কী অস্পৃশ্য? সমাজকি আমাদের স্বার্থসিদ্ধির জায়গা? এবার বরুণ আবার নড়েচড়ে বসে তারপর বলে—পাঁচ—কোয়ান্টাম..... মীনা বলে, তোমার পাঁচ নম্বর পয়েন্ট অনেক আগে শেষ হয়ে গেছে। বরুণ যেন অনেকক্ষণ মীনার দিকে তাকাল—একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল।

—শেষ হয়ে গেছে। গুড্। কিন্তু আমার মনে হচ্ছিল যেন ..... কিন্তু উপসংহার তো বাকি রয়েছে।

—তোমার উপসংহারে আমাদের আগ্রহ নেই। এতক্ষণ শুধু তুমি কথা বলে বলে পরিবেশটা নষ্ট করেছ—এবার থাম। আমাদের একটু বলতে দাও।

—কী বলবে?

—যা মনে আসে—তাই বলব।

—এটাই সাইকোএনালিসিসের প্রসেস। তাহলে নরেন, অ্যাম আই ক্লিয়ার।

—ইউ আর, স্যার।

—মীনা সত্যি সুন্দরী—হয়তো লক্ষেও একটা পাওয়া যায় কিনা জানিনে—আমি অবশ্য লক্ষ লক্ষ মেয়ে দেখিনি—তবে আজ পর্যন্ত ওর মতো দেখতে কাউকে আমার চোখে পড়েনি। কিন্তু একটা আপস্টার্ট ফ্যামিলির সন্তান হবার জন্যে।

—আমার বাপের বাড়ির ফ্যামিলিকে আপর্ষ্টাট বলবার কোনো অধিকার তোমার নেই? তুমি আপর্ষ্টাট নও?

শান্তস্বরে বরুণ বলে—না, আমি আপষ্টার্ট নই।

—এতক্ষণ থিয়োরীর কচকচি করলেন —এবার আমার বাপের বাড়ির শ্রাদ্ধ করতে বসলেন। নরেন আরেকটা ককটেল করে সবাইকে দিল। মীনা সাগ্রহে খেল। বরুণ মৃদু মৃদু চুমুক দিতে দিতে বলল—নরেন, তুমি একটা চমৎকার খেলা খেলছ। তবে একটু নিষ্ঠুর খেলা। আমি কিন্তু তোমার আত্মীয়—বন্ধু। আমাকে তুমি চেন—আর জানবার কী দরকার? মীনাকেও জান—আমিও জানি তোমার চেয়ে অনেক বেশি। আর লজ্জায় ফেলনা। প্লীজ।

মীনা একটু উষ্ণ হয়ে বলল—এর পেছনে তুমি কী মটিভ দেখতে পাচ্ছ? জানেন, সব কিছুর ভেতরে একটা মটিভ বের করবেই—এমন নেচার। আমাকে জান—বেশ জান—বয়ে গেল আমার। তোমাকেও আমি জানি—তা নিয়ে মাথা ঘামাইনে। সব সময় ক্রুড করা হ্যাবিট।

একটু চুপ থেকে বরুণ বলে—ভালবাসলে লোক কয়েদী হয়ে যায়। যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর। তুমি ভালবাসলেই তোমার স্বাধীনতা গেল। ভালবাসা আর স্বাধীনতা এই দুটো সম্পূর্ণ বিপরীত—একটি আরেকটির শত্রু।

কমলা তীক্ষ্ণ মনোযোগ নিয়ে দাদার কথা শুনছিল। যেন দাদার কথা ওকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। এমন মনোযোগ ওর জীবনে এসেছিল কিনা সন্দেহ। যেন দাদার কথার মধ্যে ডুবেছিল। নিজের গ্লানি ভুলে গেল, ভুলে গেল ড্রিঙ্ক টেবিলে বসে রয়েছে। দাদার প্রতিটি অক্ষর যেন ওর অন্তরে দাগকেটে বসে গেল। আস্তে আস্তে কমলা টের পেল, কেমন যেন মাথাটা ঝিম ঝিম করছে। সব অশান্তি সব কিছু অস্থিরতা—সব কিছুই যেন কেমন দূর হয়ে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে দাদা যেন অনেক দূর থেকে কথা বলছে। বৌদির কণ্ঠস্বরও যেন অনেক দূরের—নরেনও যেন বহুদূরে গ্লাসে কী সব ঢালঢালি করছে। বৌদিও দাদা কথা কাটাকাটি করছে। কিন্তু ওর কথা বলতে ইচ্ছে করছে না। দাদার পক্ষে নিয়ে কিছু বলা যে ওর দরকার—তা বোধ করলেও—এই ঝিমঝিম করা—বহুদূরে চলে যাবার অবস্থা যেন ওর নষ্ট না হয়—এই বোধটি ভেতরে ভেতরে ওর একটা আবরণের মতো তৈরি করল।

বউদি উড়ে যেতে চাচ্ছিল। যাক উড়ে। গেলে আপদ যায়। কিন্তু বৌদি দাদার কথাকাটিতে মনে হয় বৌদি উড়ে যাবে না। বোধ হয় থেকেই গেল। বৌদি যাবে না বুঝতে পেরে ওর ইচ্ছে হচ্ছিল একটু কাঁদে। কিন্তু ঝিম ঝিম করা—বহুদূর থেকে দেখবার একটা নিরাসক্ত আনন্দ ওকে কাঁদতেও দিল—দাদার পক্ষ হয়ে বলতেও দিল না। এমন ঝিম ঝিম করা—বহুদূরে চলে যাবার অবস্থা যেন ওর নষ্ট না হয়—এই বোধটি ভেতরে ভেতরে ওর একটা আবরণের মতো তৈরি করল।

মীনা বলতে থাকে—এদিকে বাসায়তো বই মুখে করে বসে থাকেন। আমি কখনও বিরক্ত করিনা।

—করো না, কারণ আমার 'পর তোমার কোনো আগ্রহ নেই।

—দেখছেন কেমন পায়ে পা দিয়ে ঝগড়া করছে। ওকে নিয়ে পার্টিগুলোতে যেতে এত লজ্জা করে কী বলব। এমনিতে তো মুখে কথা নেই। কিন্তু যেই ঐ লাল জল

পেটে পড়ল—অমনি শুরু হল থিয়োরীর কচকচি। ও বোঝে না—ওর কথায় কারো ইন্টারেষ্ট নেই। জীবনের বাপ—ঠাকুর্দা কে—তার চৌদ্দ পুরুষের ইতিহাস বলে নিজের বিদ্যে জাহির করা। প্রফেসরি করা হচ্ছে। জীবনের বংশ পরিচয় নিয়ে আমার এতটুকুও কৌতূহল নেই।

—জীবনের বংশ পরিচয় নিয়ে তোমার কৌতূহল নেই—এ কথাটি চক্রবর্তীর কাছ থেকে তুমি গোগ্রাসে গিলেছ। কথাটি তোমার মনের কথা বটে—দরিদ্র মানসিকতার লক্ষ্মণ তো বটেই—তবে ভাষাটি চক্রবর্তীর।

—হ্যাঁ, চক্রবর্তীর 'পর তোমার রাগ আমার বুঝতে বাকি নেই। আর তোমার মনের মতো কথা বলতে না পারলে—তোমার মত বিদ্যে জাহির করবার ইচ্ছে না থাকলেই মনের দিক থেকে সবাই দেউলে—তোমার এত অহংকার কিসে? এস.ডি.ও—ডি.এম—এদের চেয়ে তুমি অনেক কোয়ালিফাইড ভাবলেও—লোকে ভাবে—কলেজে মাষ্টারী করলেই ঠিক হত—দু'এক পেগেই ভেতরের মাষ্টারটি বেরিয়ে আসে। দেখুন, কেমন সুন্দর মেজাজটা এসেছিল—কিভাবে নষ্ট করে দিল। এর হাতে পড়ে, জানেন জামাইবাবু, আমার জীবনটা নষ্ট হয়ে গেছে। বিয়ের আগে নষ্ট করেছেন মা—এক কনজারভেটিভ ফ্যামিলির মেয়ে—বাবা প্রগ্রেসিভ—বিয়ের 'পর এক কনজারভেটিভ হাসবেন্ড। আমার দুঃখ আপনি কল্পনা করতে পারবেন না জামাইবাবু। একটা কমপ্লিট ট্রাজিডি। কী জীবন আমি যাপন করি—হরিবল! চক্রবর্তী! চক্রবর্তীর মতো ভাইটালিটি তোমার আছে—তুমি কিসে চক্রবর্তীর চেয়ে সুপিরিয়র? চক্রবর্তী জীবনকে এনজয় করতে জানে—কাজ জানে—আর তুমি জান কতগুলো অবসকিয়র থিয়োরী—ব্রুডিং—আর সবাইকে ঈর্ষা করতে। এই হচ্ছে তোমার স্বভাব। চক্রবর্তীর কথা বলেছি বেশ করেছি—তোমার মতো বক্তৃতা দেয়না—কিন্তু কথা বলতে জানে—গুড টকার। আজকে মেজাজ দেখানো হচ্ছে—জান, কারো মেজাজ আমি সহ্য করিনা।

বরুণ চোখ বুজে যেন ধ্যানস্থ হয়েছিল। হঠাৎ নরেনের দিকে তাকিয়ে বল্ল—আমি জানি, আমার পাঁচ নম্বর পয়েন্ট শেষ হয়নি। কিন্তু শেষ করতে পারছিলাম না। মাত্রটা একটু.......যাক, সিন ক্রিয়েট করতে আমার ঘৃণা হয়। দাও, আর একটু। নরেন আবার সবাইকে বিতরণ করে আস্তে আস্তে বরুণকে বলল—জানেন কমলা নিজে খায়না—আর আমাকে কখনও এক পেগের বেশি খেতে দেয়না। আজ আপনাদের নিয়ে বসে একটু প্রাণভরে খাব—কমলা কিছু বলতে পারবেনা—এইটেই ছিল আমার মটিভ। আর কিছু নয়। তারপর মীনার কানে কানে শোনবার মতো করে বল্ল—কিভাবে ঐ এক পেগ সার্ভ করে—কমলার কাছে শুনে নিন্। কমলা যেন বহুদূরে একা বসে রয়েছে। হঠাৎ যেন ওর মনে হ'ল—নরেন কিভাবে ওকে পেগ সার্ভ করে তা বলতে নরেন নির্দেশ দিচ্ছে। স্বামীর 'পর কর্তব্য পালনের জন্যে মীনার দিকে তাকাল। মীনার উষ্ণভাব তখনো কাটেনি—তবু, আবার কিছুটা অন্তরস্থ করে কমলার দিকে তাকাল। কমলা বাধ্য মেয়ের মতো মীনাকে নিরাসক্তভাবে জানাল—আনড্রেস হয়ে।

মীনা জানাল—এ সব রোমান্টিসিজিম ওর মধ্যে নেই। আপনারা সত্যিই সুখী।

আমাদের জীবন নরক। হেল্।

—কমলা আমার বোন—ও আদর্শ বোন—আদর্শ স্ত্রী। আমার বোন হলেও—ওর তেজ আমার মধ্যে নেই। আমি ষ্ট্রাগেল করতে পারি—সাফার করতে পারি, করিও, পুরুষের যে তেজ থাকা দরকার—তা আমার নেই—আর তা ঠিক অসভ্যের গোয়ারতুমি নয়। কিছুটা নিজেকে প্রতিষ্ঠা করা—এসারটিভনেস—আমার চরিত্রে নেই। থাকা উচিত ছিল। কিন্তু স্বভাবে গড়ে ওঠেনি—কী করব। প্রতিবাদ করা তো নিজেকে প্রতিষ্ঠা করা নয়। তাও বড় করিনা। চিরকাল অপরের অধিকারকে মর্যাদা দিয়েছি—আজও দি। হয়তো সব সময় সব মানুষের পক্ষে এ দৃষ্টিভঙ্গী তো ঠিক নয়। অপরকে অধিকার দিলে—অনেক সময়ই সে তোমার অধিকার নষ্ট করতে চায়। তখন ভদ্রতার খাতিরে, রুচির ও শিক্ষার খাতিরে তুমি যদি সিন ক্রিয়েট করতে না চাও—তখন নিজের অধিকার হারাবে। যাই হোক, আমি থামছি। তোমাদের মেজাজ নষ্ট করবার জন্যে, তোমাদের যদি ভুল বুঝে থাকি সে জন্যে আমি এপলজি চাচ্ছি। সিগারেট প্লীজ! হ্যাঁ আমি কনজারভেটিভ হয়তো হয়েছি—কারণ, ভালবাসা মানুষকে—অতিরিক্ত ভালবাসা মানুষকে রক্ষণশীল করে দেয়। কী করব—রক্ষণশীল হওয়া উচিত নয় জানি। এতখানি ভালবাসা—তাও হয়তো উচিত নয়। কী করব স্বভাব যে ভাবে গড়ে ওঠে! তাকে কখনোই মীনা বলতে পারবে না—ওর 'পর কোনো জোর, জুলুম, জেদ, বা ওর ইচ্ছের বিরুদ্ধে ওকে কিছু করতে নিষেধ করছি। করবও না। যাক, অনেক হয়েছে। আমি থামলাম।

মীনা জানাল—থামবার তো লক্ষণ দেখছিনে।

বরুণ একবার মীনার দিকে তাকিয়ে চোখ বুজে আস্তে আস্তে গ্লাসে চুমুক দিতে লাগল।

এবার কমলা কিছুটা খেয়ে টেবিলের 'পর মাথা রেখে যেন ঘুমিয়ে পড়ল। চারদিকে সবই ঘটছে—আবছা আবছা সব কানেও আসছে কিন্তু কেমন আচ্ছন্নের মতো—মাথাটা এত ভার—আর কিছু ভালো করে মনে করতে পারছিল না।

.....পরদিন সকালে উঠতে বেলা হয়ে গেল। মা'র মুখ ভার ছিল না—কেমন যেন একটু মন মরা, একটু বিষণ্ণ বিষণ্ণ। দাদা, বৌদিও দেরি করে উঠল। বাচ্চারা উঠে হৈ চৈ শুরু করেছিল সকাল থেকেই। কখনো রেকর্ড প্লেয়ার বাজাচ্ছিল—কখনও টেপ রেকর্ডার। নরেন বের হয়ে গিয়েছিল শেষরাতেই। তখনও ফেরেনি। দাদা উঠে চা-টা খেয়ে বই নিয়ে বসেছিল। বৌদি উঠেই স্নান করতে গিয়েছিল এক কাপ চা খেয়ে। বাচ্চাদের মধ্যেই কমলার মা বসেছিলেন। বাচ্চাদের প্রাণপ্রাচুর্য ও উচ্ছলতাকে মা যেন বিষণ্ণ হয়ে, নীরব হয়ে লক্ষ্য করছেন—কিন্তু আস্বাদন বা উপভোগ করতে পারছেন না। অথচ তিনি জানেন 'ঠাকুমা' ওদের প্রিয়—'দিদিমাকে' পেয়ে ওরা খুশিতে টগবগ। কমলা যেন ওর মা'কে মুখই দেখাতে পারছিল না—শুধু তা নয়, কাছে থেকে সহজ হ'তে রীতিমতো কষ্ট হচ্ছিল তো বটেই—সঙ্গে সঙ্গে কেবল মনে হচ্ছিল, ও যেন মা'র দল থেকে বৌদির দলে চলে গিয়ে মার মনে ব্যথা দিয়েছে—যেন মা'কে একঘরে

করে দিয়েছে। মা হয়তো ভাবছেন, এতদিনে ছেলে বৌয়ের দলে যোগ দিল—এবার মেয়েও তাকে ছেড়ে ভেতরে ভেতরে ঐ দলেই যোগ দিল। মা'র জন্যে একটা তীব্র যন্ত্রণায় ওর মন ছটফট করতে থাকে—কিসে মা'কে প্রসন্ন করা যায়—কিছুতেই তা স্থির করতে পারছিল না। বৌদির সঙ্গ যতদূর পারল এড়িয়ে চলল। সারা সকাল মনে হতে থাকল, মাও ওকে শেষপর্যন্ত বৌদিদের মতো করে ভাবতে শুরু করে কষ্ট পাচ্ছে। ভাবছে, মেয়ে বৌ'র মতো মদ খায়। মা'র কাছে নিজেকে এত ছোট লাগছিল—ও কী করে বোঝাবে—গতকালই ওর প্রথম দিন—আর জীবনেও স্পর্শ করবে না। মনে হ'তে থাকে, যে মা সারা জীবন কষ্ট পেয়ে এলেন—পবিত্র বৈধব্য জীবন যাপন করলেন—ও যেন গতকাল মদ খেয়ে নিজের পবিত্রতা নষ্ট করে মা'র কষ্টের জীবনের অংশীদার হবার অধিকার নষ্ট করেছে। যা এতদিন ছিল—গতকাল বিকেল পর্যন্ত। তাছাড়াও, দাদার সামনেও যেতে পারছিল না—দাদা কী ভাবল? দাদা বৌদির সামনেই যেন ওর এতকালের শুদ্ধ ও পবিত্র চেহারা নষ্ট হ'ল। যে আদর্শ বোন ও আদর্শ স্ত্রী বলে ওর দাদা ওকে মনে মনে ভেবে এসেছিল—গতকাল সবাই মিলে তা যেন নষ্ট করে দিল। দাদার কাছে গেলে হয়তো দাদাও লজ্জা পাবে। যেন গতকালের দাদা বৌদির ঝগড়ার সাক্ষ্য হয়ে দাদার কাছে যাওয়াও ওর পক্ষে কঠিন হয়ে উঠল। আর সকাল থেকে যে বৌদির সঙ্গ এড়াতে ব্যস্ত—সেই বৌদি যেন ওর 'পর অনেকটা সস্নেহ হয়ে উঠেছে—বৌদি যেন এতকাল পর ওর সঙ্গে অন্তরঙ্গ হয়ে উঠেছে—এমনি একটা গায়ে পড়া মাখামাখি করবার জন্যে বৌদির একটা চেষ্টা ও লক্ষ্য করে অস্থির হয়ে উঠছিল। বৌদি ঐ তথাকথিত অন্তরঙ্গতার মধ্য দিয়ে যেন বৌদি কমলাদের বোঝাতে চায়—এতকাল তো সবাই আমাকে দোষী বলে ভেবে এসেছে—এবার দেখ, তোমার দাদা কেমন চিজ। দাদা বৌদির মধ্যে মিল নেই—দাদাকে যতটা স্ত্রৈণ ভেবেছিল দাদা তা নয়—অন্যদিন হলে কমলা এতে সুখীই হ'ত। ওরা মীনা সম্পর্কে যা বলে এসেছে—দাদা যে তা জানে—বোঝে—ভোগে এতে কমলার আশ্বস্ত হবারই কথা। দাদা সব সময় চুপ থাকলেও—ভেতরে ভেতরে যে বৌদিরই দলে—এ ব্যথা কমলার বহুকালের। কিন্তু গতকাল দেখা গেল দাদা বৌদি সম্পর্কে মোটামোটি ঠিকই ধারণা করেছে। তবু কমলা এ'তে না হতে পারল আশ্বস্ত, না হতে পারল ভেতরে ভেতরে খুশি। শুধু কী তাই, বৌদির সঙ্গে এক টেবিলে বসে মদ খাওয়ায় যেন বৌদির সঙ্গে ঝগড়া করবার, বৌদিকে শাসন করবার জোরও ওর চলে গেছে। যেন বৌদির হাতে ওর দুর্বলতা ধরা পড়ে গেছে। যেন আগের মতো তেজ দেখাবার অধিকার গতকাল ওর নষ্ট হয়ে গেছে। তাই কমলা না পারছিল মা'র কাছে যেতে, দাদাকে মুখ দেখাতেও ঠিক তেমনি লজ্জা হচ্ছিল, অথচ বৌদির সঙ্গে অন্তরঙ্গ ব্যবহার করা অসম্ভব হচ্ছিল, তবু বৌদিকে অগ্রাহ্য করাও সম্ভব হচ্ছিলনা। ও জানে, মা-দাদা সবাই ওকে শান্তভাবে গ্রহণ করবে—যেন কিছু হয়নি এমন ভাব দেখাবে—তবু, ভেতরে ভেতরে.....। কিন্তু এখনকার বাধা—আজকের বাধা তাও বড় কম নয়। নিজেকে ওর এত একলা লাগছিল—আর মানুষটাও সেই যে শেষ রাতে বের হয়েছে—এখন পর্যন্ত পাত্তা নেই। একটা তীব্র যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে রান্না ঘরে গিয়ে প্রচুর রান্না বান্নার জোগাড় করল। কিন্তু সব ছাপিয়ে মা'র প্রসন্নতার জন্যে

একটা ক্ষিদে ওকে ব্যাকুল করে তুলল। একবার মনে হ'ল—ঐ মানুষটা কী আমাকে রক্ষা করতে পারত না..... একবার মনে হয়, না হয় গেঁয়ো ভূতই বৌদি ভাবত, কী হ'ত তাতে—মদ খাবার চেয়ে তা অনেক ভালো ছিল—না হয়, আধুনিক মনে করত না—আধুনিকতা কী মদ খাওয়ায়—না, নতুন চিন্তা ধারায়। রান্না ঘরে কমলা নিজের সঙ্গে—মনে মনে বৌদির সঙ্গে তর্ক করল। তাছাড়াও আরো একটা জিনিসের মীমাংসা না করে মা'র কাছে যেতে পারছিল না। কিভাবে টেবিল থেকে বিছানায় এসেছে—তা না জানা পর্যন্ত কিছুতেই স্বস্তি পাচ্ছিল না। নরেনের বিছানায় শুয়েছিল এ কথা ঠিক—কাপড় চোপড়ও ঠিক ছিল—তবু, অজ্ঞান অচৈতন্য অবস্থায়....।

নরেন আজ একটু বেলা করে ফিরল। কমলা জানে, ওকে দেখতে না পেয়ে মনে মনে নিশ্চয়ই খোঁজাখুঁজি করছে। তবু, কাছে যেতে পারল না। তারপর নরেন ডেকে পাঠাল। কমলা গেল না। একটু পরে নরেন নিজেই এসে হাজির। রান্নাঘরের বাইরে ডাইনিং রুমে ঠিক সেই সময় কমলাও বের হয়ে এসেছিল। ইচ্ছে ছিল, রান্নাঘরেই ঢুকে যায়—কিন্তু বাবুকে দেখেই মা ওভাবে পালিয়ে এলে ওরা কী ভাববে—তাই চুপ করে দাঁড়াল। নরেন জিজ্ঞেস করল—কী হয়েছে? কমলা কোনো জবাব দিলনা। আবার ঐ প্রশ্ন—এবারেও জবাব নেই। তারপর নরেন এসে কমলাকে ধরতেই কমলা মুখে আঁচল দিয়ে হুহু করে কেঁদে উঠল। নরেন যখন আশ্বস্ত হ'ল—বৌদির সঙ্গে কোনো ঝগড়াঝাটি নয়, নিতান্তই গতকালের টেবিলের ব্যাপার—তখন নরেন জানাল—ওদের কাছে মুখ দেখতে পারছো না বলে—আমার কাছে মুখে আঁচল চাপা দিয়ে আমার কাছেও মুখ দেখাতে রাজি হচ্ছ না কেন—আমি তো ওদের দলে নই। নরেনকে হাসতে দেখে কমলা বুকে কিছুটা বল পেল। নরেন জানাল, তোমার মা'র কাছে যাও—বল গিয়ে আজ দুপুরে তাকে নিয়ে কল্যাণেশ্বরী দেখে আসবে। দাদাকে তোমার নতুন বইগুলো দেখাও—বৌদরি সঙ্গে স্বাভাবিক ব্যবহার কর। শেষ পর্যন্ত কমলা তাই করল, মা'র কাছে গিয়ে কল্যাণেশ্বরী যাবার প্রস্তাব করল। মা রাজি হ'ল—তবে গিয়ে যখন পূজো দিতে হবে—তখন উপোষ থেকেই দিতে হবে—তাই আগামীকাল সকালে গেলেই.....। কমলা রাজি হল। ঠিক হ'ল আগামীকালই যাবে—সকালে। বৌদিও যাবে। বাচ্চাকাচ্চারা তো নিশ্চয়ই। এদিকে দাদার কাছে যাবার আগেই দাদা কমলাকে ডেকে বল্ল—কম্‌লি, ভালো চুরুট খাওয়াতে পারিস্। কমলা খুশি। একে দাদা স্বাভাবিক সহজ হয়ে ওকে নিল—শুধু তাই নয়—যে দাদা কোনো দিন কিছু খেতে চায়নি—আজ চুরুট চাইল—তক্ষুনি লোক পাঠিয়ে পনেরো মিনিটের মধ্যে এক বাক্স চুরুট এনে দিল। দাদা কল্যাণেশ্বরী যেতে চাইল না। না, রে, ঐ ধর্মকর্ম আমার সহ্য হয় না। দাদা কমলার নতুন বইগুলো দেখল, জানাল, প্রায় সব বই-ই ওর পড়া। তা ছাড়া গল্প-উপন্যাস ওর যেন আর ভালো লাগে না। কমলা জিজ্ঞেস করে, আচ্ছা দাদা, আজকের উপন্যাসের নায়করা জগতকে এত অপরিচিত, অবাঞ্ছিত ভাবে কেন—ওরা জীবনের কোনো মূল্য খুজে পায় না কেন—যেন ওরা বাইরের লোক—ওদের আপন বলে কেউ নেই, ভালবাসার কোনো অর্থ নেই—কোনো কিছুতেই যেন ওদের আকর্ষণ নেই—জীবন যেন ওদের কাছে সত্য নয়। বাস্তব নয়—যেন একটা অর্থহীন ঘোরের মধ্যে জীবন কাটাচ্ছে।

নিজেকে ভুলে থাকাই—ওদের গল্পের মূল বিষয়। দাদা জানাল, ঠিকই বলছিস্, মানুষের জ্ঞান মানুষকে এক ভয়ংকর জায়গায় পৌঁছে দিয়েছে—মানুষের জ্ঞান মানুষকে আশ্রয়হীন—বাস্তুহারা করে দিয়েছে। সততা নিয়ে নিজের অন্তরের দিকে তাকিয়েও মানুষ আত্কে উঠছে। পুরানো রূপকথার আশ্রয় চলে গেছে—আজকের সাবালক মানুষের কাছে জগত যেমন অর্থহীন—নিজের অন্তরের অবলম্বন—সেখানেও নিজের অস্তিত্বের কোনো প্রয়োজন যে খুঁজে পায় না। যতক্ষণ অজ্ঞান—ততক্ষণই আরাম—যখনই জ্ঞান—তখনই যন্ত্রণা। সেই যন্ত্রণার হাত থেকে বাঁচবার জন্যেই এসেছে একরকমের আত্মরক্ষার দৃষ্টিভঙ্গী—যাকে বলে ডিফেন্স মেকানিজেম—এই ডিফেন্স মেকানিজমই হল একটা অবাস্তবতা বোধ, জীবনকে কোনো রকমভাবে অনুভূতির মধ্যে জড়িয়ে না ফেলা—একটা নিরাসক্তি জ্ঞান বিজ্ঞানের 'পর অনাকর্ষণ। আসলে যে মৃত্যু ভয় থেকে চিন্তার জন্ম সেই চিন্তাই শেষ পর্যন্ত সান্ত্বনাহীন মৃত্যুর কাছেই আবার মানুষকে পৌঁছে দিয়েছে। তাই মানুষ আজ চিন্তাকে ঘৃণা করতে শুরু করেছে, বার বার বলছে—চিন্তা জীবনকে অস্বীকার করে। আসলে ব্যাপারটি জানিস্। মৃত্যু ভয়ও একটা চিন্তা—জীবনের ধারনাও একটা চিন্তা—আর চিন্তা সম্পর্কে ধারনাও আরেকটি চিন্তা ছাড়া কিছু নয়। কোনো চিন্তা আরাম দেয়—কিন্তু চিন্তা যতই সমৃদ্ধ ও সতর্ক হয়—ততই আরাম চলে যেতে থাকে। তাই ভয় থেকে যে চিন্তার জন্ম—ভয়েই সে চিন্তার অনিবার্য পরিনতি—যদি চিন্তার সততা থাকে। যে ভাবনা যত আরাম দেয়, আশ্বাস দেয়—তা জীবন থেকে ততদূরে। ওরা জীবনের মুখোমুখী হয়েছে—তাই ওদের শান্তি নেই, আনন্দ নেই, জীবন ওদের কাছে মূল্যহীন। কারণ ছোটবেলায় রূপকথার আশ্রয়ের জন্যে ওরা যে ভেতরে ভেতরে আসক্ত—তাই জীবনকে ওদের এত 'হোরার' বলে মনে হয়। তবু দেখ, কেউই বেশিক্ষণ জীবনের মুখোমুখী—সত্যের মুখোমুখী দাঁড়াতে পারে না—তাই নিজেকে ভুলাবার জন্যে কেউ সমাজের পরিবর্তনে ব্যস্ত, কেউ ইন্দ্রিয় বিকাশে হাল্কাভাবে নিজে ভুলে থাকতে চায়, কেউ বা নিজের একটা মনগড়া জগত সৃষ্টি করে সেখানে সময় কাটিয়ে দেয়—এই এদের যারা নিজের মনগড়া জগতে সময় কাটায় তাদেরই বলে পাগল বা ইনসেন। আর যারা কোনদিনও জীবনের মুখোমুখি দাঁড়ায়নি—বা দাঁড়াবার মতো যোগ্যতা অর্জন করেনি—তারাই কিন্তু জীবনে সবচেয়ে বেশি সফল ব্যক্তি—নামে, ধামে, ঐশ্বর্যে—অর্থাৎ যাকে বলবি 'ওয়েল এডজ্যাষ্টড পিপল'। অজ্ঞান মানুষই জীবনকে সবচেয়ে বেশি মানিয়ে নেয়। অজ্ঞ মানুষই বাঁচবার পক্ষে সবচেয়ে যোগ্য ব্যক্তি। অন্ধ গাড়ি চাপা কম পড়ে।

বৌদির সঙ্গে দেখা হতেই বৌদি জানাল—কী চুরুট এল বুঝি? আমি ঐ গন্ধ একদম সহ্য করতে পারিনে। চুরুট, পাইপ এগুলো হল পুরানো আভিজাত্যের নমুনা—আজকের দিনের ফ্যাসান নয়—বাতিল বনেদির নকল শুরু করেছেন তোমার দাদা। কমলা সংক্ষিপ্ত অথচ সহজ মন্তব্য করে—দাদার চেহারায় চুরুট মানায়—চার্চিলের চুরুট কী এট্লির মুখে মানাত। সুন্দর এক আভিজাত্য আরেক। দাদার চেহারায় চলনে আভিজাত্য রয়েছে—চুরুট তা আরো ভালো খোলে। বৌদি একটু অবজ্ঞার হাসি হাসে। কমলা তা হজম করে। ভেতরে ভেতরে রাগে। শুধু বলে—চুরুট, পাইপ হচ্ছে ম্যানলি।

সিগারেটকে আমার এফিমিনেট এফিমিনেট লাগে। কথা বলতে বলতে দু'জনেই দাদার কাছে এসে হাজির হতেই মীনা কৃত্রিম অনুনয়ের ভঙ্গিতে বলে—মাইরি, চুরুট আর সিগারেটের পার্থক্য নিয়ে তোমার দাদাকে কিছু বলো না। তা হলে এক, দুই তিন করে চুরুটের সমর্থনে ক'ঘণ্টা থিয়োরীর কচকচি চলবে ঠিক নেই। আজ যে পাঁচ নম্বর পয়েন্টে থামবে—এ কথা মনেও করো না। চকিতে কমলাও মীনার চোখাচোখি হ'ল। কমলা বৌদিকে দাদার ঘরের কাছে রেখে জানায়—আমি থিয়োরীর আলোচনা পছন্দই করি—এতক্ষণ তাই করছিলেম। মীনা হেসে বলে—ও ঘর থেকে তাই শুনছিলেম—ভয়ে আসিনি। তারপর গলা নামিয়ে বলে—তোমার দাদা করছিলেন চুরুট পাবার আনন্দে—তুমি শুনছিলে আর বলছিলে, দাদা সহজ ও স্বাভাবিক ভাবে তোমাকে নিয়েছেন বলে। আমার তো মুখ কাটা—ঠোঁট কাটা। কিছু মনে করো না। তোমার লজ্জা পাবার কিছু ছিল না। অযথা কষ্ঠ পাচ্ছিলে। কমলা স্বীকার করে—তা পাচ্ছিলাম—এখনও যে নেই তা নয়। মীনা বলে—ওটা কুসংস্কার। কমলা ঠাণ্ডা হয়ে জানায়—হবে। অনেক কাজ চলি। ভেতরে ভেতরে কমলার একই সঙ্গে ভরসা ও রাগ। মীনার কথায় বুঝতে পারে—ভেতরে কষ্টটার তেমন কিছু কারণ ছিল না। বৌদি সোজাসুজি প্রসঙ্গ তোলায় অন্তরের ভাব আরো একটু হাল্কা হ'ল। কিন্তু কমলা থিয়োরী আলোচনা করছিল—থিয়োরী পছন্দ করে বলে নয় পড়াশোনার 'পর আকর্ষণ আছে বলে নয়—দাদার কাছে সহজ হতে পারার আনন্দে। বৌদির এই ইঙ্গিতের মধ্যে অপমান বোধ করে একটু রাগই হয়। মনে মনে জানায়—তোমার তো মাতাল হওয়া ছাড়া আর সব কিছুই কুসংস্কার। থিয়োরীর আলোচনা শুনতে পার না—তা আমি কুসংস্কার বলব না—তা তোমার অযোগ্যতা তোমার মন সূক্ষ্মতর আনন্দ পায়নি—তার আস্বাদন তোমার ধারণার বাইরে। খোঁচা মেরে কথা বলবার বুদ্ধিই আছে—সূক্ষ্মশিল্প, দর্শন, বিজ্ঞান বোঝবার শক্তি তোমার নেই। অযোগ্যতার বাহাদুরী। ভেতরে ভেতরে ওর আরও রাগ হয়—এই সব মূর্খ মানুষগুলোর জ্ঞান বিজ্ঞানের 'পর আকর্ষণ নেই তা নয়—এরা এ আলোচনাগুলোকে শ্রদ্ধা করতেও জানে না। দাদা ঠিকই বলেছে—এরাই মদের পার্টিতে যোগ্য লোক—অজ্ঞ ব্যক্তিই যোগ্য ব্যক্তি—অন্তত ঐ সব পার্টিগুলোতে। বৌদির 'পর রাগ করতে পেরে নিজের ভেতরে জোর পায়। এতক্ষণে যেন নিজের মনের অনেকটা ফিরে পায়। রাগ আত্মগ্লানিকে অনেকটা পিছু হটিয়ে দেয়। রাগ করতে পেরে নিজেকে স্বাভাবিক স্বাভাবিক লাগে। রাগকে ধরে রাখতে চায়।

দুপুরে নরেন যখন একা একা বিশ্রাম করছিল—তখন কমলা এসে বসল। মা একটু শুয়েছেন—দাদা বৌদিও। বাচ্চারা অবশ্য হুলুস্থূল করে বেড়াচ্ছিল—তবু, এরা ছিল একতলায়। কমলা আস্তে আস্তে বল্ল—দেখ, আমি গেঁয়ো, আধুনিকা নই—এ শুধু এখানকার অনেকের ধারণা নয়, বৌদিরও। আমার মনে হয়, কথাটির মধ্যে কিছু সত্য নিশ্চয়ই আছে। গতকাল তোমরা যখন এখানে বসে ড্রিঙ্ক করছিলে—তখন বৌদিকে গার্ড দেবার জন্যেই যেতেই দেখলাম—বৌদি আন্দাজ করে নিয়েছে। আমার এভাবে পালিয়ে আসবার জন্যে বৌদির ব্যবহারে এমন একটা ভাব ফুটে উঠল—যেন আমি গেঁয়োভূত—সেকেলে। অথচ কালকের ঐ দুর্বলতাটুকু যদি সহ্য করতে পারতাম—

না হয় গেঁয়োই—গ্রাম্যই, নরেন জানায়—যদি মদ খেলেই আধুনিক হওয়া যায়—তবে সব রিক্সাওয়ালা, ড্রাইভার—মজুর—শ্রমিক সবচেয়ে আধুনিক।

—ইস্ কথাটি যদি আগে বলতে—গতকাল বিকেলের আগে।

—তুমি কী ভাবছ, বৌদি তোমাকে গেঁয়ো বলেছেন—তুমি গেঁয়ো বলে। মোটেই তা নয়। বৌদি ঠিকই বুঝতে পেরেছিলেন—আমরা ড্রিঙ্কে বসেছি। আসবার জন্যে ছটফট করছিলেন। কারণ, সিংহী রক্তের স্বাদ অনেক আগেই পেয়েছে—এবার রক্তের গন্ধ পেয়ে চুপ করে বসে থাকা কঠিন হচ্ছিল। তাই গেঁয়ো, আধুনিকা নও—এসব বলেছে যাতে তুমি চটে ওকে নিয়ে ড্রিঙ্ক টেবিলে যাও। বৌদিই তোমাকে নিয়ে এসেছে—তুমি নিয়ে যাওনি। তোমাকে যে করে হোক বৌদি নিয়ে আসতই। এ আমি জানতাম। তাই জোগাড় আমি অনেক করেছিলেম। তারপর বল, কেমন লাগল কালকে?

—আরেকজন তো উড়ে যেতে চাচ্ছিল—ভাবলাম, তোমাকে শুদ্ধু নিয়ে না যায়।

—তোমার কী হচ্ছিল তাই বল না? আরেকজনেরটা তো আমি জানি।

—দাঁড়াও না, যে ভাবে সিংহীর রক্তের স্বাদ মেটাচ্ছিলে—আমি ভাবলাম, তোমারও পাখা গজাবে। তোমার সিংহীর কথা শুনে আমার তো পাতালে যেতে ইচ্ছে করছিল।

—'সিংহী' বিশ্লেষণটা যেন তোমার পছন্দ হয়নি—ও'তে যেন কম্প্লিমেন্টের গন্ধ পাচ্ছ? তা হলে কালকের অগ্নিপরীক্ষায় তোমার পাতালে যাবার ইচ্ছে হচ্ছিল।

—মোটেই না। মাথাটা ঝিম ঝিম করছিল—কেমন সব দূরের। ঝিমঝিম ঘুম ঘুম—না বাবা, আর জন্মে ও নয়।

—তোমার বৌদি কিন্তু প্রত্যাশায় থাকবেন।

—ওর মুখ আমি কারবলিক এসিড দিয়ে পুড়িয়ে দেব। দাদার সঙ্গে আজকের দিনের উপন্যাস নিয়ে আলোচনা করছিলাম—বলছে, গতকালের ব্যাপারে আমি আড়ষ্ট হয়েছি—দাদা সহজভাবে নিয়েছে—সেই আনন্দে নাকি দাদার বক্তৃতা শুনছি। ঠিক আছে দাঁড়াও দেব একদিন বলে, মদ খেলেই যদি আধুনিকা হয় আর স্মোকেই যদি এত আনন্দ—তবে মেথরানী, মেছোনী এরাই সমাজের আদর্শ—আমাদের আদর্শ হওয়া উচিত। ওরা তো চিরকালের আধুনিকা। আঃ কথাটি যদি একদিন আগেও বলতে।

—তাহলে তোমার দাদা বৌদির সম্পর্কটা যা আন্দাজ করছিলেম—তার প্রমাণ পেতাম না।

—দাদা কিন্তু বুঝতে পেরে গেছেন তোমার চালাকি। সত্যি, ওরা পার্টিগুলোতে যে কী করে।

—কিছুই করে না। তোমার বৌদি মনোমতো চক্রবর্তীদের সঙ্গে গল্প করে—তোমার দাদা ব্রুড করে—ওদের ঘৃণা করে—হয়তো তর্ক জুড়ে দেয়। কালকে অন্তত এটুকু বুঝতে পারলাম, তোমার দাদা অন্ধ নয়—তবে গাড়ি চাপা পড়বেন না এমন বলা যায় না। নরেনের বেশি বিশ্রামের সময় ছিল না। বের হয়ে যেতেই কমলা মা'র কাছে গিয়ে বসল। একটু পরেই কমলার মা বৌর নিন্দে শুরু করতেই কমলা একই সঙ্গে আরাম ও অনুশোচনা বোধ করছিল। মা আবার স্বাভাবিক ভাবে ওকে বিশ্বাস করছেন—আরাম

এ জন্যে। আর এই বৌদির সঙ্গেই গতকাল অত খাতির করবার জন্যে অনুশোচনা। মা বলছিলেন, কিছুকাল আগে বৌদির বাবা মা এসেছিলেন—বৌদির মা লোক ভালো। বাবা এক নম্বরের পাজি। বৌ'র মতো খোঁচা মেরে ছাড়া কথা বলে না। বরুণকে যেন মানুষের মধ্যেই গ্রাহ্য করে না। শুনতে শুনতে কমলা রীতিমতো গরম হয়ে উঠছিল। ঠিক এমনি সময় খবর এল—নরেনের মেজ মামার মেজ ছেলে এসেছে। শুনেই কমলার বুক কেঁপে উঠল। সর্বনাশ, ছেলেটা একটা রাজনীতির দলের পান্ডা—পার্টি নিষিদ্ধ—ওর নামে ওয়ারেন্ট—ওতো দু'চক্ষে দেখতে পারেনা। বাড়ি নেই সংবাদ পেয়েই ঢুকেছে। কমলা তাড়াতাড়ি ব্যস্ত ভাবে নীচে চলে যায়। ছেলেটা জামা কাপড় ময়লা থাকে—একমুখ দাড়ি গোঁফ—বৌদি দেখলে প্রেষ্টিজ থাকবেনা।

—এই যে বৌদি, মাছ, মাংস, ভেজিটেবিল চেহারাখানা বেশ খুলেছে। মাংস অবশ্য আমরাও খাই—তবে ইঁদুরের মাংস—ইঁদুর পুড়িয়ে।

—হঠাৎ তুমি?

—বেশ করেছ—সোজাসুজি কারণ জিজ্ঞেস করেছ। আমারও ভূমিকা করবার সময় নেই। ক্ষিদে অবশ্য পেয়েছ কিন্তু খাবার সময় নেই। কিছু টাকা দিতে হবে—এই হাজার খানেক।

—এক হাজার!

—খুবই কম চাইলাম—আরো চাইতে আসব। আমরা রি-থিংকিং শুরু করেছি—তোমাদের সম্পর্কেও ভাবছি। তোমরাও আস্তে আস্তে ইন্ডাষ্ট্রিয়ালিষ্ট হয়ে উঠছ। একদিনের জায়গায় পাঁচদিন একই পেসেন্টকে দেখছ, নার্সিংহোম, পলিক্লিনিক, প্রাইভেট প্র্যাকটিস—কী দারুন ভাবে মানুষের রোগের সুযোগ নিয়ে শোষণ করে যাচ্ছ। টাকাটা নিয়ে এস—কিছু অস্ত্র কিনতে হবে। আর টাকা যদি না দাও—নরেনদাকে কিন্তু বাঁচাতে পারব না। আমি নিজে মারব কিনা বলতে পারিনে—দরকার হলে..... দেরি করো না। সময় বড় অল্প।

—এক হাজার টাকা আমি কোথায় পাব।

—কোথায় পাবে—টাকাটা কোথায় রেখেছ তা আমি আন্দাজ করলেও করতে পারি। কারণ সব কালো টাকা তোমরা ব্যাংকে রাখ না।

—কিছুদিন আগে বিজনেসের জন্যে তোমার বাবা....

—কিছু টাকা ধার নিয়ে গেছেন—ওটা রেশন আনবার জন্যে হয়তো নিয়েছেন। কারণ বাবার ধারণা—বাবা সংসার চালাতে পারে না—কারণ বাবার অযোগ্যতা—বাবা জানে না! একটা অকর্মণ্য সমাজ, শোষিত সমাজ তাকে বাঁচতে দিচ্ছে না। যাকগে বাবার খবর থাক্—বাড়ির কোনো খবর আমি রাখিনে। চাইওনে।

—টাকা না দিলে তোমার দাদাকে তুমি মারবে?

—শুধু দাদাকে কেন—তুমিই বা বাদ যাবে কেন—তোমার ছেলেমেয়েরা হয়তো সকলের আগেই যেতে পারে। নরেনদা কী অস্ত্রোপচারের সময় নিজের আত্মীয়দের খাতির করেন। এই হচ্ছে সমাজের ঠিক অস্ত্রোপচারের সময় তাতে ঐ জঙ্গলের মধ্যে কার সঙ্গে কার কী আত্মীয়তা এই ক্ষয়িষ্ণু সমাজ ঠিক করে দিয়েছে—তা নিয়ে কে

মাথা ঘামায়। চারদিকে বিপ্লবের আবহাওয়া বইছে—এই ইতিহাসের নির্দেশ মেনে নেওয়া ছাড়া আমাদের অন্য পথ নেই। আর যারা বিধান সভা আর পার্লামেন্টে গিয়ে গরম গরম বক্তৃতা দিয়ে সরকারের লাথি গুঁতো খাচ্ছে—বিধান সভায় ক্ষমতা পেয়েও বুঝছে না, একটা মিউনিসিপ্যালটির চেয়ারম্যানের এর চেয়ে বেশি ক্ষমতা থাকে। এরা করবে বিপ্লব!

—মাষ্টার, প্রফেসর, ডাক্তার কনষ্টেবলকে খুন করবার নামই হচ্ছে তবে বিপ্লব।

—না। মাষ্টার, প্রফেসর এরা একটা শোষণ ব্যবস্থা বাঁচিয়ে রাখবার জন্যে যুক্তি যোগাচ্ছে—এদের ওকালতি চিরতরে বন্ধ করে দিতে হবে—তাতে যদি ক'জন খতম হয়—আপদ যায়। ডাক্তাররা নূতন ধরনের শোষক—এদেরও নির্বিচারে শোষণ চলতে দেওয়া যেতে পারে না। আর কনষ্টেবল—পুলিশ এরা এই শোষণ ব্যবস্থার রক্ষক—এদের সরিয়ে দেওয়া দরকার বইকি? তবে একটা কথা জেনে রাখ, পুলিশ, কনষ্টেবল খুন হয়েছে তার অনেকগুলোই আমরা করিনি। আমাদের ঘাড়ে দুর্নাম চাপিয়ে দেবার জন্যে এটা অন্যের কীর্তি। কারণ পুলিশ একদিন আমাদের দলে চলে আসবে এ আমরা জানি। আমরা পাল্টা সরকার তৈরি করছি। নিজেদের সৈন্যবল, অস্ত্রবল না থাকলে আজকের দিনে বিপ্লব হয় না—পুলিশের হৃদয় পরিবর্তন কবে হবে তার জন্যে আমরা পত্রিকা দেখব না। আমাদের শক্তি আছে তা প্রমাণ করছি—একদিন এদের আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য করব। যাও, টাকা নিয়ে এস। আমার সময় নেই।

—বিপ্লব ফুরিয়ে যাচ্ছে।

—যাও।

—তুমি কী আমাকে ধমকাচ্ছ।

—আমার সময় কম। ধমকাচ্ছি, কী ভয় দেখাচ্ছি, কী আতংক সৃষ্টি করছি—এ সমস্ত বুর্জোয়া চিন্তাজীবীদের চুলচেরা বিচারে আমার রুচি নেই।

—তুমি আত্মীয় বলে আমাদের ব্ল্যাকমেলিং করবে। শহরে আর কোনো ডাক্তার নেই, তাদের প্রাইভেট প্র্যাকটিস, পলিক্লিনিক, প্রাইভেট চেম্বার নেই?

—তাদের জন্যে চিন্তার ভার করবার অন্য লোক আছে। কে বলেছে, তুমি আমার আত্মীয়। টাকা আনতে বলেছি, নিয়ে এস। কথা বাড়িও না। যাও।

একটা ক্ষোভ, ভয়, দুশ্চিন্তা আতঙ্ক কমলার বুকে আলোড়ন তোলে। এই ছেলেটির হায়ারসেকেন্ডারী, বি.এ. পরীক্ষার ফিস দিয়েছে। কতদিন না খেয়ে এসেছে—অথচ কত যত্ন করে ওকে খাইয়েছে—হাত খরচের পয়সা দিয়েছে, বই-কেনার টাকা দিয়েছে। নরেন ওদের একদম দেখতে পরেনা। তবু লুকিয়ে লুকিয়ে কত যত্ন করেছে। সেই মুখ-চাপা লাজুক ছেলে আজ ওকে ভয় দেখাচ্ছে, ধমকাচ্ছে, জোর করে টাকা আদায় করে নিতে এসেছে। কী রূঢ় ব্যবহার—কি হৃদয়হীন কথাবার্তা। এক হাজার টাকা ওকে দিতে হবে। কমলার কান্না পেতে থাকে।

ধরা গলায় বলে—একহাজার টাকা না পেলে তোমার দাদাকে, আমাকে, আমার ছেলেমেয়ে খুন করবে।

—টাকাটা বড্ড কম চেয়ে ফেলেছি দেখছি। পার, বেশি দিও। আর খুনের কথা

যদি বল, চাকর বাকরও বাদ যেতে না পারে।

এবার ছেলেটি কোমর থেকে রিভলবার বের করে টেবিলের 'পর রেখে জানায়—আর এক মিনিট নয়, যাও।

—তোমার দাদা আসুন, তাঁর কাছ থেকে নিও।

কমলা কথাগুলো জড়িয়ে জড়িয়ে বলল। নিজের কানেই কথাগুলো স্পষ্ট হল না। ভেতরটা শুধু নয়, যেন হাত পা'ও অবশ হয়ে যায়। মনে হয় উঠে দাঁড়াতে পারবে না। মনে হতে থাকে, এই ছেলেটি ওর মেজশ্বশুরের ছেলে নয় —এ এক অপরিচিত লোক—ডাকাত। শুধু মুখ চেনা আছে এই পর্যন্ত।

তবু কাঁপা কাঁপা গলায় বলে, রিভলবার দেখিয়ে ভয় দেখাচ্ছ?

—দরকার হলে দাদার কাছ থেকেও নেব। আপত্তি করলে কুকুরের মতো গুলি করে মারব। হ্যাঁ ভয় না দেখালে টাকা দেবে না। তবে ভয় শুধু এই মুহূর্তের জন্যে—বেশি দেরি করলে এই বস্তুটি ধৈর্য রাখতে পারবে না। তুমি টাকা আনতে যাবে কিনা—এক মিনিট মাত্র সময় তোমাকে দিলেম। আমি ক্ষুধার্ত—গত দু'দিন খাইনি—এক কাপ চা চাইতে পারতেম। কিন্তু ডাক্তারের বাড়ি—তুমি হয়তো কোনো বিষটিষ মিশিয়ে দিতে পার—কোনো অ্যাসিড ট্যাসিড—ভরসা নেই। এক মিনিট পার হয়ে গেছে।

—তুমি আমাদের খুন করতে পার—আমরা বিষ মেশাব তোমার মতো এমন অমানুষ আমরা নই। আর দাদা হচ্ছে কুকুর। নিজে তুমি কি, বন্য শুয়োর। কমলা উঠে দাঁড়াতেই বল্ল—শোন, তোমার স্বামীকে বা পুলিশ ষ্টেশনে ফোন করবার চেষ্টা করতে পার—তাই আমি তোমার সঙ্গে যাব। অন্তত টাকাটা কোথায় রাখ দেখেও আসি।

—উপরে আমার দাদা বৌদি এসেছেন—তোমার মতো একটা ভিক্ষুককে সেখানে আমি যেতে দিতে পারিনে। প্ল্যাটফর্মের ভিক্ষুককে আমি দোতালায় উঠতে দিতে পারিনে।

—প্ল্যাটফর্মের ভিক্ষুক! আমরা যদি বিপ্লব সম্ভব করতে না পারি—তবে এই নিম্ন মধ্যবিত্তদের সকলকে ঐ প্ল্যাটফর্মে ভিক্ষুকই হতে হবে। ফোন তো দাদার ঘরে থাকে—আমি শুধু ফোনের সামনে দাঁড়াব—পরিচয় দেবার দরকার নেই।

কমলা পিছনে না তাকিয়ে চলে যেতে থাকল। ছেলেটিও পেছনে পেছনে এল। গত দু'দিনের টাকা দোতালার ড্রেসিং টেবিলেই ছিল। কমলা ড্রয়ার টেনে একশো টাকা আর দশ টাকার নোট মিলে ওকে এক হাজার টাকা দিল। যদিও এর আগেই কোমরে রিভলবার লুকিয়ে রেখেছিল। ছেলেটি তাড়াতাড়ি নোটগুলো নিয়ে পকেটে রাখল।

—গুনলাম না। কারণ তোমাকে বিশ্বাস করি বলে নয়। কম দেবার সাহস তোমার হবে না। চলি।

কমলা অবশের মতো সেখানেই বসে পড়ে। একটা অবসাদে যেন ভেঙে পড়ে। আর যেন উত্তেজনা সহ্য করতে পারছিল না। লোকটা রাত জেগে, সারাদিন পরিশ্রম করে গত ক'দিন যা উপার্জন করেছিল—তার থেকে এক হাজার টাকা! আতঙ্কের অবসাদ আর ক্ষতির ক্ষোভে যেন আর চিন্তা করবার ক্ষমতাও হারিয়ে ফেলেছিল। চুপচাপ নরেনের বিছানায় শুয়ে পড়ে।

অনেকক্ষণ কমলা কাঁদল। কাঁদতে কাঁদতেই নানা চিন্তা ওর মনে আসতে থাকে। হয়তো নরেন এভাবে ওকে শুয়ে থাকতে দেকলে প্রথমে ভাববে, কালকের ঐ জিনিশ গেলবার জন্যে এখনও ওর ন্যাকামি চলছে, হয়তো, ভাববেও, কমলা যে কত ভালো মেয়ে তাই নানা ভাবে বোঝাচ্ছে। ঢুকেই বিরক্ত হবে—তারপর সব শুনলে..... টাকা না দিয়ে কী উপায় ছিল—যদি গুলি চালাত ..... আবার আসবে বলেছে....এমনি করেই কী ওদের নিঃশেষ করে দেবে—তারপর যেদিন দিতে পারবে না সেদিন মরতে হবে? হাজার টাকার ক্ষতির বেদনায় ও যেন ওদের সকলের মৃত্যু চিহ্ন দেখতে পায়। ওকে যদি চেম্বারে যাবার পথে মারে, ওরা স্কুলের থেকে ফেরবার পথে যদি ওদের.....ব্যাঙ্কে যাবার পথে যদি ওকেই....। কমলার যেন ক্ষতির শেষ দেখতে পাচ্ছিল। ক্ষতির শেষ মৃত্যু। কোনো ভাবেই যেন মৃত্যুর হাতকে একটুও অদৃশ্য করে দিতে পাচ্ছিল না। নরেনের আজকের প্রতিক্রিয়া নিয়ে ওর দুশ্চিন্তা তো ছিলই.....কেন দিল.....দেখতে গুলি চালায় কিনা....টেরও পাবেনা—কখনও তো শুনেও দেখে না কত টাকা আছে, পরে যদি জানতেও পারে—তখন না হয় অন্য কিছু বলে .....একখানা গয়না করেছে জানিয়ে দিলেই হয়.....কিন্তু ওর কাছে কিছু লুকোবে এই শর্ত ভাঙা হয়—তাছাড়াও এত বড় বিপদের কথা লুকানো.....আসলে আজকের এই ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতার কথা আর একটা অনুভূতির আশ্রয় ওর একান্ত প্রয়োজন। এই অভিজ্ঞতার কথা গোপন করতে মন চাইছেনা—এত বড় সংবাদ—এত উত্তেজনার খোরাক গোপন করা ওর পক্ষে সম্ভব নয়। ভেতরে ভেতরে নরেনের কাছে একটা আশ্রয় ও সান্তনার জন্যে ওর মন লালায়িত হয়ে উঠল। তবু, হাজার টাকা দেবার জন্যে নিজের অপরাধকে ভুলতে পারছিল না। না দিয়ে উপায় ছিল না—অত ঝুঁকি কী নেওয়া যায়।

কিছুক্ষণ কমলাকে দেখতে না পেয়ে ওর মা আস্তে আস্তে কমলার ঘরে এল। এসেই কমলাকে কাঁদতে দেখে অবাক হয়ে গেল।

মাকে ঢুকতে দেখে কমলা উঠে বসে। আঁচলে চোখের জল মোছে। মা কেমন যেন কাঁচুমাচু হয়ে যায়। মুহূর্তে কমলার মনে হয়, মা হয়তো ভাবছেন, নরেনের সঙ্গে কিছু হয়েছে।

মা'র চোখে বিব্রত ও কাঁচুমাচু ভাব দেখে মাকে বসিয়ে কমলা সবটা বলল।

—বলিস্ কি? এক হাজার টাকা? তুই আমাকে ডাকলিনে কেন? বুদ্ধি করে যদি বলতিস্—মা'র কাছে ড্রয়ারের চাবি—আমি না হয় দাঁড়াতাম—দেখতাম কেমন গুলি ছোঁড়ে।

—ওরা সব পারে—যে নিজের দাদাকে মারতে চায়—যে দাদা, বৌদি এত করেছে—তাদেরই....। কমলা আবার কেঁদে ফেলে। মা তাড়াতাড়ি বের হয়ে যান।

একটু পরেই দাদা ও বৌদি আসে।

—হ্যারে কমলা, হাজার টাকা—তুই আমাকে ডাক্‌লিনে কেন? কেমন গুলি চালায় দেখতাম। নিশ্চয়ই এবস্‌কন্ডার—নরেন ক'লে? এখন হাসপাতালে বা চেম্বারে পাওয়া যাবে না। আমি না হয় এস.ডি. পিও কে ফোন করছি—যেন ট্রেনে—বা বাসগুলো ছাড়বার আগেই ওদের লোক গিয়ে পৌছয়—আধঘণ্টা হয়ে গেছে—বোকা মেয়ে......

আগে বলতে হয়.....সোজা কথা এক হাজার টাকা—এত টাকা বাড়ি রাখিস কেন? আমি ফোন করছি?

—না দাদা ফোন কর না? ওরা সব পারে—এর পর হয়তো রাস্তায় বের হ'লে —

—কিছুই পারেনা। যারা ক'টা রিভলবার নিয়ে একটা মেকানাইজড আর্মির সঙ্গে ফাইটে নামে—তারা বিপ্লবীর কেরিকেচার ছাড়া কিছু নয়।

—ওর কাছে না জিজ্ঞাসা করে—ওর ভাই—যদি পুলিশে দিতে না চায়?

—না চাওয়া ভুল হবে। ও যদি তোদের খাতির না করে—তবে ও'কে। না না ভুল হবে। বৌদি বলে—আমাদের বাড়িতে কেন—ব্যাঙ্কেও হাজার টাকা আছে কিনা সন্দেহ।—না, দাদা, ওকে জিজ্ঞেস না করে ফোন করো না।

—শোন, অবুঝ হস নে। ও যদি রিভলবার দেখিয়ে টাকা নিতে পারে—তোর ওকে খাতির করবার কী দরকার। এখনও সময় যায়নি—হয়তো স্টেসনে যদি পুলিস যায়—বাস টার্মিনাসে গিয়ে যদি পড়ে—আমার তো মনে হচ্ছে, ওরা এখনই যাবে না—ওরা জানে পুলিশে খবর দিবি—পুলিশ এখুনি স্টেসনে বা টার্মিনাসে থাকবে। আমার নিজের মনে হয়—আজ ওরা এখান থেকে যাবে না। নিশ্চয়ই এখানে ওদের কোনো গোপন আস্তানা আছে।

—ওরা হয়তো ভাবছে, আমাদের অনেক ব্ল্যাক মানি আছে তাই পুলিশে খবর দেব না। খবর দিলে পর যদি ওকে রাস্তায় গুলি করে, বাচ্চারা স্কুলে যাবার সময় যদি প্রতিশোধ নেয়—আমি যখন ব্যাঙ্কে যাব—তখন? মা বললেন—ইস্ হাজার টাকা।

ইতিমধ্যে বাচ্চারা কিছু একটা হয়েছে বুঝতে পেরে দৌড়ে এসে হাজির হয়। কমলার ছেলে বারবার জিজ্ঞেস করে—কত বড় রিভলবার—আমাকে ডাকলে না কেন—আমার এয়ার গান দিয়ে.....

কমলার মেয়ে ধম্‌কে ওঠে—এক ফোটা গায়ে জোর নেই—এয়ার গান।

—সবটা বল্ দেখি।

কমলা সবিস্তারে বলতে থাকে সঙ্গে সঙ্গে ভাবনাও চলে। সকলকে দেখে ওর মনে ভরসা জাগে! ক্ষতিও মৃত্যুর যে বীভৎসতা এতক্ষণ ওর মনকে অবশ করে রেখেছিল—এবার যেন তা অনেকটা ঝাপসা ও ফিকে হয়ে ওকে কিছুটা আশ্বাস দেয়। শুধু তাই নয়, রিভলবার দেখে এতটা বিকল হওয়া ওর উচিত হয়নি—এতে আবার অপরাধ বোধও মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে চায়। আবার এক কথায় হাজার টাকা বের করে দেবার গর্বও বোধ করতে থাকে বৌদির সামনে ও বৌদির মন্তব্যে। কিন্তু এই সমাবেশে—দাদা বৌদি মা ছেলেময়েদের মধ্যে বসে ওর কেবল মনে হতে থাকে, এসব ওদের বলে খারাপ করলাম না তো। হয়তো ভাবতে পারে, হাজার টাকা গিয়েছে যাক্। কিন্তু দাদা বৌদি মা'র সামনে ওর মা'র বাড়ির মাথা নীচু করে দিলেম। নরেনের পিতৃকুল মাতৃকূলের সম্পর্কে এদের একটা খারাপ ধারণা করে দেবার জন্যে যদি ক্ষুণ্ণ হয়। একে তো বারবার বলে, মেজমামা তোমাদের কাছে দিন দিন আমার প্রেস্টিজ নষ্ট করে দিচ্ছে। এবার সব জানাজানি হয়ে গেল। হয়তো ক্ষুণ্ণ হবে, বিরক্ত হবে, মনে মনে রাগও করতে

পারে। সব মিলে ওর মনে একই সঙ্গে আশ্বাস, অপরাধবোধ কিছুটা গর্ব ও ভয় ওকে মন্থন করতে থাকে।

বলা শেষ হয়ে যেতে মা বললেন—তুই হাজার টাকা দিয়েছিস কিনা আমার সন্দেহ হচ্ছে—অনেক বেশি হবে। ও তোর পাশে দাঁড়িয়ে শুনেছে—ক'খানা একশ টাকা দিয়েছিস—ঠিক আছে—হাজার দু'তিন গেছে কিনা আগে গুনে দেখ—যা।

বৌদি জানায়—আমি হলে হাজার টাকা দিয়ে বলতাম—দু'হাজার গেছে। এক হাজার নিজের জন্যে রাখতাম।

কমলা ম্লান হাসি হেসে বলে—টাকা আমার কাছেই থাকে—যখন ইচ্ছে নিতে পারি—ও টেরও পাবে না। নিলে জিজ্ঞেসও করবে না। নিজের টাকা কেউ চুরি করে নাকি? এই হাজার টাকা ওকে না বললেও টেরও পাবে না। বরুণ অনেকক্ষণ একদৃষ্টিতে মীনার দিকে তাকিয়ে থাকে। তারপর বলে—মা মিথ্যে বলেননি—তুই গুনে দেখ।

মা আবার বলেন—ও কী একা এসেছিল নাকি? বাইরে নিশ্চয়ই আরো অনেকে রিভলবার, বোমা নিয়ে ছিল।

রাধুনি এতক্ষণ দাঁড়িয়েছিল। ও-ই দরজা খুলে দিয়েছিল। ওর এবার মনে হতে থাকে—বাইরে কেউ থাকলেও থাকতে পারে। ওর মনে হয়, এবার যেন মনে হতে থাকে কেউ যেন ছিল। এ কথা বলতেই মা বলেন—দ্যাখ্, শোন্, দল বেধে এসেছিল।

কিন্তু বরুণের কথা কেউ কানে তোলে না। আস্তে আস্তে ঠিক হয়, দলবেধে এসে ক'হাজার টাকা নিয়ে গেছে। রিভলবার কমলার বুকের 'পর তুলে ওকে পেছনের দিকে ফিরে না তাকাতে বলে দোতালায় নিয়ে যায়—কয়েক হাজার টাকা নিয়ে সব পালায়।

বরুণ বলে—ঠিক আছে, তুই যখন বলছিস্, তখন ফোন করছিনে। নরেন আসুক।

বার বার তাগাদায় কমলা উঠে টাকা গুনতে যাবে এমন সময় নরেন এসে হাজির হয়। সবাইকে এক সঙ্গে দেখে বেশ অবাক হয়ে যায়।

সবাই একসঙ্গে বলতে চায়। 'হাজার টাকা' 'ক-হাজার টাকা' 'রিভলবার', 'দলবেঁধে' 'বোমা-পিস্তল' 'এয়ারগান' অনেক কষ্টে সবাইকে থামিয়ে বরুণ সংক্ষেপে নরেনকে বলল। বরুনের বলা শেষ হওয়া মাত্র—আবার সবাই চেঁচাতে থাকে। 'দলবেঁধে' 'বোমা-পিস্তল' এসব না বলবার জন্যে ক্ষুণ্ণ হলেও জামাইয়ের সামনে তাঁর স্বাভাবিক নম্রতা ও মর্যাদা বজায় রেখে মা নিজের বক্তব্য বলেন। নরেন শুনে আগুন হয়ে যায়। সোজাসোজি কমলাকে জানায়—রিভলবার বের করল? এত সাহস! একটু চুপ থেকে বলে—হাজার টাকার জন্যে ভাবছিনে—আমার স্ত্রীকে, আমারই বাড়িতে রিভলবার দেখাবে? আজই দুপুরে আমি এস.ডি.পিও'এর স্ত্রীকে দেখতে গিয়েছিলেম—সেখানে শুনলাম, মেজমামাকে ঐ ছোঁড়াটার জন্যে বার বার ডেকে আনা হচ্ছে। মেজ মামা আবার আমার রেফারেন্স দিয়েছে। এমনি করে আমার সম্মান নষ্ট করতে এদের একটুকুও বাঁধে না। আমি অবশ্য জানিয়েছি, ঐ ছোড়াটার সঙ্গে মেজমামার কোন সম্পর্ক নেই। আর আমার সম্পর্কেও না। জানেন দাদা, আমার বড় মামা ইউনিভার্সিটি প্রফেসর, বড় ছেলে কলেজের লেকচারার, মেয়েটি বেথুনে পড়ে অনার্স নিয়ে, সেজমামা কমার্সিয়াল ফার্মের অফিসার—তাঁর একটি ছেলে এনজিনিয়ারিং পড়ছে শিবপুরে,

অপরটি ডাক্তারী নীলরতনে। এই মেজমামাই কিছু করতে পারেনি—বিজনেস করে বড়লোক হবার জন্যে শেষ পর্যন্ত নিজের সর্বনাশ করে ছেড়েছেন। মিথ্যে ছাড়া সত্য ভুলেও বলেননা। তাঁর ছেলে এ রকম হবে—এ আর বেশি কি? বড় ছেলেটি মাস্তান—চুরি-ছিন্তাই করে বোধ হয়। এই মেজ ছেলেটি—ওর নাম দ্বিজু—ভাবছিলাম—কিছু হবে। এখন দেখুন—

—তা হলে এস.ডি.পিও'কে বলা বোধ হয় ঠিক হবে না। আজই যখন কথা হয়েছে—আজই যদি বল, মনে করবে, তুমি যে ওদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে চাওনা—তারই প্রমাণ হিসেবে এই গল্প বানিয়েছ।

—দেখি কী করি।

—আমি অবশ্য ফোন করতে চেয়েছিলেম—এস.ডি.পিওকে।

—করলে ভালো হত—ঐ খানেই ছিলেম—ব্যাপারটি হয়তো এখানকার মতো বানানো বলে ভুল নাও করতে পারত। যাক্ দেখি কী করতে পারি।

কমলা এবার মুখ খোলে—বলেছে, আবার আসবে। তোমাকে, আমাকে, ছেলে মেয়েদের কুকুরের মতো গুলি করে মারবে—টাকা না দিলে।

—কে কাকে মারে দেখা যাবে।

—তোমার রিভলবার নেই?

—না, বাবার দু'টো ডবল ব্যারেন গান ছিল—আমি কিছুকাল আগে ঐ সব হাঙ্গামার ভয়ে জমা দিয়ে দিয়েছি। কারণ বাড়িতে অস্ত্র রাখা টাকা রাখার চেয়েও ঐ অস্ত্রের জন্যেই হয়তো বারবার আসত।—ঐ কী নাম যেন—বিজু, হ্যাঁ, ওকি জানে একথা। আর না জানলেও, ডবল ব্যারেল ভাঁজ করে নিয়ে যাওয়া—এই দিনের বেলা—এবস্‌কন্ডারদের পক্ষে কঠিত হত। —ওরা জানে, আমি জমা দিয়েছি।

কমলা মনে মনে অনেকটা স্বস্তি পেল। টাকার জন্যে নরেন বিগ্‌ড়ে যায়নি—এ কথা বুঝতে পেরে একদিকে যেমন কিছুটা সাহসও বুকে এল। এতক্ষণ পর্যন্ত ড্রয়ারের কাছেও যেতে ভরসা হচ্ছিলনা—পাছে দেখে ভয়ে ভুল করে বেশি টাকা দিয়ে দিয়েছে। এখন যেন ড্রয়ারের কাছে যাবার সাহস ফিরে পেল। যদিও নরেন এসে পড়বার জন্যে আর টাকা গুনতে চায়নি। যদিও কমলা জানে—সেজ মামার দু'টি ছেলেও জাহান্নামে গেছে—একথা নরেনের মুখেই শুনেছে। মেডিকেল কলেজে যেটা পড়ে—সেটা নাকি মেডিকেল কলেজে ক্লাস না করে সারাসময় ধরে পোষ্টার লেখে। আর শিবপুরে যে পড়ে—নকল করবার পক্ষে লড়তে গিয়ে পুলিশের কাছে কিছুকাল আগে হাত ভেঙেছে। মেজ মামা দুঃখ করছিলেন ছেলেদের এই পরিণতির জন্যে। ওর মামা বাড়ি সম্পর্কে দাদাবৌদি মা একটা ভুল ধারণা না করে—দ্বিজু বা দ্বিজুর বাবা মা-ই যে ওর মামা বাড়ি সম্পর্কে শেষ কথা নয়—নরেনের আক্ষেপের মধ্যে এই সুর বুঝতে অসুবিধে হয় না। টাকা নেবার চেয়েও যেন দ্বিজুদের অধঃপতন নরেনকে অনেকটা আহত করেছে—নরেনের গোড়ার দিকের রাগ যেন শেষের দিকে ওর সম্মান নষ্ট করে দেবার বেদনায় শেষ হতে চলল। তবু, কমলা এর রাগের 'পরই যেন বেশী ভরসা করল—নির্ভর করল। নির্ভরতা ওর একান্ত দরকার। তাই নরেনের মামা বাড়ির প্রেষ্টিজ নষ্ট

হবার বেদনা ও তা শুধু মাত্র দ্বিজুদের মধ্যে রেখে দেওয়া—অন্য মামাদের তা থেকে বাদ দেবার পেছনেকার মনোভাব কমলার বুঝতে অসুবিধে না হলেও—ভাসা ভাসা ভাবে তা ভাবল—সেই ভাবনা যেন এই মুহূর্তে সকলের হট্টগোলের মধ্যে কমলার মধ্যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করলনা। কমলা অনেকটা ভরসা পেল—এবার উঠতে গিয়ে টের পেল—শুধু ড্রয়ারের কাছে যেতেই ওর ভয় করছিল না—যেন একতলায় যাবার সাহসও ছিলনা। সংসারের সকলের অপমৃত্যুর ভয় যেন ওর খাটের চারদিকে ওকে ঘিরে ধরেছিল—সকলের হৈ হট্টগোলের মধ্যে, সবাই চারদিকে ওকে ঘিরে থাকবার জন্যে আর নরেনের ভয় না পেয়ে বরং রাগ হবার জন্যে—সেই ভয়ংকর মৃত্যু ভয় এখন অনেক হাল্‌কা—অনেক পাত্‌লা। বরুণ জানায়—এসব চরমপন্থী ছেলেরা আসলে কিছু আত্মবিশ্বাসহীন এডভ্যানচারিষ্ট। এরা ব্যক্তিগতভবে অত্যন্ত উচ্চাশা নিয়ে বড় হয়েছে—নিজের সম্পর্কে বাবা-মা আত্মীয় স্বজনের কাছে কেবল প্রশংসা শুনে শুনে বড় হয়েছে—অথচ কলেজে ঢুকবার 'পর ভেতরে ভেতরে বুঝতে পেরেছে—প্রশংসা অনুযায়ী পরীক্ষার রেজাল্ট হবে না—তখন—এই সব লাই পাওয়া ছেলেরা উৎকট কিছু করে নিজেদের ভীতু মনের ক্ষতিপূরণ করছে চরমপন্থা অবলম্বন করে। বাবা-মা'র ছেলের ক্ষমতা'য় অসীম বিশ্বাস —এই সব ছেলেদের একদিকে যেমন নিজের ক্ষমতা'য় অসীম বিশ্বাস—এই সব ছেলেদের একদিকে যেমন নিজের ক্ষমতাকে সাবালক হতে দেয়নি—তেমনি অতিরিক্ত বাবা-মা কেন্দ্রিক করে ফেলেছে—ফলে বাবা-মা-আত্মীয় বন্ধু সকলের কাছে নিজের ইমেজ রাখবার জন্যে—উৎকট কিছু করে দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। যেন সকলেই বলতে পারে, পড়লে এই ছেলে ব্রিলিয়ান্ট হত—কিন্তু এই পথে গিয়ে নিজের ক্যারিয়ার নষ্ট করল। এই কথাটি আদায় করবার প্রেরণা এদের মনের ভেতরকার কথা। ছোট ছেলেরা যেমন দুষ্টুমি করে বাবা মা'র দৃষ্টি আকর্ষণ করে —এরা চরমপন্থী হয়ে তেমনি সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার চেষ্টায় রয়েছে। একই ব্যাপার। এরা ভেতরে ভেতরে জানে—অথচ নিজেদের কাছে তা স্বীকার করা এদের পক্ষে সম্ভব নয়—এরা পড়াশুনা করেও ব্রিলিয়ান্ট হত না।

মা বললেন—যা একবার গুনে দেখ্—কত টাকা দিয়েছিস্।

কমলা সংকুচিত হয়—যেন হাজার টাকা দিয়েছি বললে কেউ সন্তুষ্ট হবেনা। সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত দু'তিন হাজার গেছে। এখন সেই ধারণাকে ক্ষুণ্ণ হতে দিতে কমলার রীতিমতো কষ্ট হচ্ছে।

কমলা নরেনের দিকে তাকিয়ে বলে—একশ টাকার তিনখানা নোট ছিলনা? নরেন একটু চিন্তা করে বলে—হ্যাঁ, তিনখানাই। ঐ গেলে দশ বিশ টাকা বেশি গেছে। থাক্ গুনে আর কী হবে?

কমলা স্বস্তি পায়। গুনে যদি দেখে ঠিকই দিয়েছে—তবে এরা কেউ সন্তুষ্ট হবে না। যদি দেখে বেশি দিয়েছে, তবে আপশোষ হয়তো আরো বাড়বে। ওর নিজের ও ধারণা ছিল হয়তো দশ বিশ টাকাই বেশি গেছে যদি একশ টাকার নোট তিনখানার বেশি না থেকে থাকে। কিন্তু স্বস্তির সঙ্গে সঙ্গে একটা সূঁচ ফোটাবার বেদনাও অনুভব করে। ও কেন গুনতে বারণ করল—এই বারণ করবার মধ্যে যেন একটা বিরক্তি। এই বিরক্তি

কিসের জন্যে? কার 'পর? নরেনের রাগে কমলা রীতিমতো ভরসায় ছিল, দ্বিজুদের জন্যে ক্ষোভে কমলা একটু শংকিত হলেও তা গ্রাহ্য করেনি—কিন্তু বিরক্তিতে একটা অভিমান যেন ভেতর থেকে ঠেলে বের হতে চাচ্ছে। কেন যেন মনে হয়, রাগ হয়েছিল স্ত্রীকে রিভলবার দেখিয়ে অপমান করবার জন্যে, ক্ষোভ হয়েছিল মামা বাড়ির সম্মান নষ্ট হবার জন্যে—বিরক্তি কিসের জন্যে? হাজার টাকা যাবার জন্যে—যদি হাজার টাকাই গেল—না গুনতে বলবার মধ্য দিয়ে কী হাজার টাকা যাবার ক্ষোভ? না, এ সকলের সূত্রে কমলা —কমলাকে টাকা গুনতে না দিয়ে ওর 'পর বিরক্তি প্রকাশ পাচ্ছে। এতক্ষণ সকলের সান্ত্বনা আর আশ্বাসে কমলা যে প্রশ্রয় পেয়েছিল —স্বামীর কাছেও যেন ভিতরে ভিতরে সেই প্রশ্রয়ই চাচ্ছিল! হঠাৎ ওর বিরক্তিতে সেই প্রশ্রয় না থাকবার জন্যে—একদিকে যেমন অভিমান—আরেক দিকে বিরক্তি প্রকাশ করে কমলা যেন স্বামী স্নেহশূন্যা তাই প্রমাণ করে দিল। যা সকলের ধারণার বাইরে। আর সকলের সামনে কমলা উঠে দাঁড়িয়েছিল। এবার খাটে বসে পড়ল। বালিশে হেলান দিয়ে নিজেকে সামলাতে চেষ্টা করল। কিন্তু নিজের চেহারায় একটা ক্লান্তি ফুটে উঠল—কমলা যেন ক্লান্ত হয়ে একবার দাদার মুখের দিকে, একবার নরেনের দিকে তাকাল। কমলা বুঝতে পারছিল, এই ক্লান্তি স্বামীর কাছে প্রশ্রয়ের জন্যে হীন আবেদন—তবু, তা না করেও পারলনা। দাদা বললেন—কম্‌লির স্নায়ুর 'পর আজ বড্ড অত্যাচার হয়েছে—তুই শুয়ে থাক।

নরেন জানাল—তা তো গেছেই। আজ রাতে ওকে একটু ক্যামপোজ দেব—এখন একটা ওষুধ দিচ্ছি।

সঙ্গে সঙ্গে কমলা উচ্ছ্বসিত হয়ে বালিশে মুখ গুঁজে কেঁদে ফেল্ল। এতক্ষণ উত্তেজনায় টগবগ করছিল। কমলাকে কাঁদতে দেখে ওরা কাঁচুমাচু হয়ে গেল। কমলার ছেলেমেয়েরা মা'কে বোধ হয় এই প্রথম কাঁদতে দেখল। এমন কড়া-মাও যে কাঁদতে পারে দেখে ওদের চোখ ছলছল করে এলেও, ভেতরে ভেতরে কেমন আশ্বস্তও হ'ল—যত কড়া মনে হ'ত—তা হলে ততটা নয়—এমন একটা ঝাপসা ধারণা ওদের ভরসাই জোগাল।

মীনা মৃদু স্বরে নরেনকে জানাল—কান্নাটা আপনার জন্যে।

বরুন কথাটা শুনে ফেলল। সঙ্গে সঙ্গে জানাল—হতেও পারে, না হতেও পারে। জটিল অনুভতির ফলও হতে পারে। চট করে একটা সিদ্ধান্তে চলে আসা দুর্বল বুদ্ধির লক্ষণ।

মীনা হতাশ হয়ে নরেনকে জানায়—উঃ এর থিয়োরীর কচ্‌কচি। আচ্ছা জামাইবাবু, প্রতিমুহূর্তে থিয়োরীর কচ্‌কচি সমাজবিরোধী কার্যকলাপের ভেতরে পড়ে কিনা—এন্টি সোস্যাল এ্যাকটিভিটি?

নরেন হেসে জানায়—মানুষ যে জ্ঞান বৃক্ষের ফল খেয়েছে।

মীনা মাথা নাড়ে—আমি অন্তত খাইনি।

বরুণ নিস্পৃহ হয়ে উত্তর দেয়—পশুরাও খায়নি।

মীনা নরেনকে বলে—শুনলেন?

নরেন বলে—না, শুনিনি।

মীনা হেসে ফেল্ল—এ আমার নিত্য পাওনা।

মা বলতে থাকে— বুকের 'পর রিভলবার—অজ্ঞান হয়নি এতেই আশ্চর্য। কাঁদিসনে। আমি এসে দেখি মেয়ে আমার চুপচাপ কাঁদছে—কাঁদিসনে—কাঁদতে নেই—সোজা ধকল। নিজের হাতে ডাকাতের সামনে টাকা দেওয়া—বাইরে বোমা পিস্তল নিয়ে— একটা কিছু যে হয়ে যায়নি ভগবানের অসীম কৃপা। উঃ কেঁদে কেঁদে যে বালিস ভাসিয়ে দিলি—শরীর খারাপ করবে—এই কমলা, আর না। এবার মাও নিজের চোখ মুছলেন।

নরেন আস্তে আস্তে বলে—এই ছেলেটিকে কমলা কত খাইয়েছে—সব ক'টা পরীক্ষার ফিস্ দিয়েছে। কতদিন কত যত্ন করেছে। পরিণাম হচ্ছে এই।

কমলার কান্নায় অনেক স্বস্তি। স্বামীকে পরিচিত চেহারায় ফিরে পাবার আশ্বাস, বরুণের স্নেহ অনুভব করবার আনন্দ, মা'র আদর, সকলের সহানুভূতি ও মনোযোগ আকর্ষণ করবার শক্তি অনুভব করবার পুলক—নিজের 'পর এতখানি ধকল যাবার জন্যে নিজের 'পর ভালবাসা বোধ করবার খুশি আর নিজের সংযত হয়ে না চলবার উল্লাস ও নিজের খুশিমতো কান্নার অধিকার পাবার প্রশ্রয়। তবু, একথাও মনে হচ্ছিল, দাদাই ওর 'পর —ওর স্নায়ুর 'পর যে এতখানি ধকল গেছে তা বুঝতে পেরেছে, দাদাই যেন নরেনকে তা স্মরণ করে দিয়েছে—নরেন যেন মামা বাড়ির সম্মান যাবার ক্ষোভে কমলাকে ভুলেছিল—দাদাই নরেনকে ওর কাছে ফিরিয়ে দিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে এ চিন্তাও কমলার চেতনায় এসেছে—নরেন সবার সামনে কর্তব্য করবার জন্যে—স্বামীর কর্তব্য দেখাবার জন্যেই কী ওষুধের প্রস্তাব দিয়েছে—কিন্তু কান্নার মধ্যে এতগুলো আনন্দের সঙ্গে এই বিশ্রী সন্দেহটাকে মিশিয়ে আনন্দকে কমলা বিষাক্ত করতে দিল না—কান্নার আনন্দময় উত্তেজনায় চিন্তাটিকে দূরে ফেলে দিল। কান্নাকে ধরে রাখল তবু নরেনকে যেন আরো খানিকটা ওর সম্পর্কে দুর্বল করে দেবার জন্যে, নরেনকে বুঝিয়ে দেওয়া বিপদের গুরুত্ব কতখানি ছিল, ওর 'পর দিয়ে কী ভীষণ ঝড় গেছে—হাজার টাকা দেওয়াতে ওর কতখানি লেগেছে। নরেনকে সম্পূর্ণ জয় করবার জন্যে সহজে কান্নাকে থামতে দিতে কমলা রাজি নয়। শুধু তাই নয়, সকাল থেকে মা'র আদর ও মা'র কাছে মুখ দেখাতে না পাবার যে বেদনা ছিল—যদিও তা ম্লান ও ফিকে হয়ে গিয়েছিল— আর পরবর্তী ঘটনার তীব্রতায় তা প্রায় ভুলে এসেছিল—এই কান্নার মধ্য দিয়ে—মা'র কাছে স্নেহ ফিরে পাবার আনন্দেও কমলা কান্না থামাতে রাজি ছিলনা। মা'র আদরের মধ্যে আবার মা'র কাছে আসতে পারার আনন্দ তিল তিল করে অনুভবকে কমলা সহসা যেতে দিতে চায় না। তবু কান্নার মধ্যেই নরেনের সস্নেহ কণ্ঠস্বর শুনবার জন্যে কান খাড়া করে রাখে—শুধু বৌদির কাছে ওর স্বামীর ভালবাসা কেমন বা হাজার টাকার জন্যে ওর স্বামী কিছুমাত্র পরোয়া করে না এ কথা প্রমাণ করা ছাড়াও—ওর নিজের জন্যেও প্রয়োজন ছিল—ছিল স্বামীর কাছ থেকে পূর্ণ আশ্রয় ও প্রশ্রয় পাবার ইচ্ছে— আগের মতো নরেনের 'পর নির্ভর করবার ব্যাকুলতা। কিন্তু নরেনের কণ্ঠস্বরে ঠিক সুরটি না পাবার জন্যে কান্নাকে থামতে দিতে পারেনা। শেষের দিকে দু'দু'বার মনে হল—নরেনের যেটুকু স্নেহ প্রকাশ পাচ্ছে—তা যেন ওর হয়ে সকলের সুপারিশের ফল। যদিও এই চিন্তাটি খুব আশ্রয় দিতে চাইল না—তবু ঠিক কান্নার গোড়ার দিকে যত

জোরে এই চিন্তাটিকে আমল দিচ্ছিল না—তত জোর আর শেষের দিকে ছিল না। দ্বিজুকে খাইয়ে, ফিস্ দিয়েছে—নরেনের এ সান্ত্বনাও যেন প্রানহীন মামুলি মনে হল। নরেনের জন্যে আর কত অপেক্ষা করবে? এদিকে কান্নায় ওর ক্লান্তি এসে গেল—নরেনের সস্নেহ প্রশ্রয়ের পাত্তা নেই? কতক্ষণ আর কাঁদবে? কমলার এবার রাগ ও অভিমান হতে থাকে। রাগের মধ্যে যেন শক্তি খুঁজে পায়। ঠিক আছে, আমি মরলে, ছেলেমেয়েরা গেলে তবে বুঝত। কমলা ঠিক করে নরেনের কাছে গম্ভীর ও নিষ্প্রাণ হবে। আবার সঙ্গে সঙ্গে একথাও না ভেবে পারল না—মা'র সামনে দাদার সামনে নরেন কেমন করেই বা স্নেহ প্রকাশ করবে—সান্ত্বনা দেবে। অন্য কোনোভাবে—যাতে অন্তত কমলা বুঝতে পারে—ওর কান্না সার্থক হয়েছে। যে কান্না স্বস্তি দিয়ে শুরু, আনন্দ ও উল্লাস নিয়ে যে কান্নার সূচনা—সমাপ্তি ঘটল কিছুটা অস্বস্তি, ক্রোধ আর ক্ষোভের মধ্যে। কমলা যখন উঠে বসল—চোখ মুছল, তখন ওর মনে একটি অনুভূতি কান্নাটিও লোকসান গেল—আজকের হাজার টাকার মতোই লোকসান। নরেনের দিকে তাকাল না। কিন্তু অন্য কারো দিকে তাকাবার সাহসও হল না—ইচ্ছে ছিল, সবার দিকে তাকাবে কেবল নরেনের দিকে নয়—ও'কে অবহেলা করবে। কিন্তু সাহস হল না। মনে হ'ল—এত কেঁদেও স্বামীর মন না পাবার লজ্জায় ওদের দিকে তাকাতে পারবে না। নরেনকে জয় করতে না পারার গ্লানি ও পরাজয় হয়তো ওদের চোখে মুখেও দেখতে পাবে—এই ভয়ে তাকাল না। আসলে নরেনকে বাদ দিয়ে সকলের দিকে তাকাবে এই সংকল্প রাখতে পারল না—কারণ নরেনকে ক্ষুব্ধ করতে ওর সাহস হলনা। উঠে বাথরুমে গিয়ে চোখ মুখ ধুয়ে ওয়ার্ডরোব খুলে শাড়ি পাল্টে সোজা রান্না ঘরে গিয়ে বিকেলের চা জলখাবার তৈরি করতে শুরু করল বামুনদিকে নিয়ে।

বামুনদি খুঁত খুঁত করছিলেন—তুমি মা না হয় একটু শুয়ে......এতবড় ধকল......পাঁজি হারামজাদা....মামীকে খুন করতে চায়.......ভূভারতে শুনেছে কেউ.....লেখাপড়া শিখেছেনা হাতি। একটু পরেই মা এসে হাজির—তুই সর দিকিন........আমি করে দিচ্ছি.......এই শরীরে......কিছু ওষুধ খা। এবার মা গলা খাটো করে চোখের ইঙ্গিতে মীনাকে উদ্দেশ্য করে বল্ল—ওদিকে তো দু'জনে এক চোট হয়ে গেল। হাজার টাকা গেছে—মজা দেখছে খুব......তোর বাপের বাড়িতে মাথা খুঁড়লেও হাজার টাকা বের হবে না। এবার যখন এসেছিল.......টিকিট কাটবার আগে কতবার টাকা গুনল ওর বাবাটা.....প্রত্যেক রিক্সাওয়ালার সঙ্গে দর কষাকষির কী ধুম। মিষ্টি নিয়ে এসেছে কলকাতা থেকে গুনে গুনে।

কমলা যখন শাড়ি পাল্টাতে যাচ্ছিল—বাথরুমে শাড়ি পাল্টাচ্ছিল তখন দেখল বাথরুমে মদের একটা গ্লাস ভাঙা। এই গ্লাসটি গত দু'দিন ধরেই ছিল। প্রথমেই মনে হ'ল—জমদারটি লোকজন দেখে ফাঁকি দিতে শুরু করছে—দাঁড়িয়ে না থেকে কাজ করালে এরা ফাঁকি দেবেই। আগামীকাল জমাদারকে কিঞ্চিৎ দিতে হবে। এবার মুখে চোখে জল দিতে দিতে ভাবল—এরপর রাতে যখন এক পেগের বেশি চাইবে—তখন কমলা নিস্পৃহ হয়ে যত চায় তত দেবে। তোমার জিনিস তুমি খাবে আমি না করবার কে? ও যে নরেনের সম্পর্কে আর আগ্রহী নয়—এ কথা বুঝিয়ে দেবে। নরেনকে যত খুশি পেগ দিয়ে ও যে আর আগের মতো নেই এ কথা বুঝিয়ে দেবে। নিজের অভিমান

প্রকাশ করবার একটা রাস্তা পেয়ে কমলা একটু আশ্বস্ত হয়।

যখন বাথরুম থেকে ফিরে রান্না ঘরের দিকে যাচ্ছিল তখন মীনা কমলাকে দেখিয়ে বলল—ও'কে কিছু একটা ষ্টিমুলেন্ট দিন। এখুনি চাঙ্গা হয়ে যাবে। কমলা দেখল ঘরে দাদা নেই। অনিচ্ছাসত্ত্বেও নরেনের দিকে চোখ পড়ল। দেখল, মীনার কথায় নরেন একটু হাসল। কমলার মনে হল—হাসিটি যেন প্রস্তাবের জন্যে নয়—মীনার হাসিতে কৃতার্থ হবার হাসি। ওর সমস্ত অন্তরটা জ্বলে উঠল। নরেনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হবার মীনার একটা চেষ্টা যেন মুহূর্তে ওর চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠল—নরেনের হাসিতে যেন মীনাকে আপ্যায়নের চেষ্টা। ওর এতক্ষনের কান্নায় যা হল না—মীনার এক পলক হাল্কা হাসিতে নরেনের তা হ'ল। ওর মনে হল—কান্নাটি শুধু লোকসান নয়—নরেন যেন ওর কান্নাকে স্বীকার না করে ওকে অপমান করছে। এবার রাগে ওর শরীর জ্বলতে থাকে। বামুনদি'র সান্ত্বনার কোন উত্তর দেয় না—মা'র কথা শুধু চুপ করে শুনে যায়। ....এই হচ্ছে পুরুষজাত। দাদারই দোষ হল কেবল। তবু দাদা মুখের 'পর বৌদিকে পশু বলতে ছেড়ে দেয়নি......চক্রবর্তীদের দোষ......তুমি কৃতার্থ হওনা? সাধু পুরুষ সব। মা'র কথার একটা জবাব দেওয়া দরকার। সায় দিয়ে কিছু বলা প্রয়োজন। কিন্তু বলতে ইচ্ছে করছিল না। রাগে শরীর যেন কাঁপছে।.....তবু, দাদা যতটা বুঝেছে, মা যতটা বুঝেছে—তুমি? মনে মনে কমলা নরেনকে জিজ্ঞেস করে। ......অথচ তুমি নাকি আমাকে বেশি বোঝ। হাজার টাকা.....মামা বাড়ির সম্মান! কমলা ঠিক করে, ওর দু'একখানা গয়না বিক্রি করে ঐ হাজার টাকা ব্যাঙ্কে জমা দিয়ে দেবে। পরে বলে দেবে—তোমার টাকা লোকসান যায়নি। তবে মামা বাড়ির সম্মান—তারাই যদি নষ্ট করে, আমি নিরুপায়। আমি মেজমামাকে ডেকে ধারও দিইনি—দ্বিজুকেও বাড়ি থেকে ডেকে এনে খেতে দিইনি—পরীক্ষার ফিস্‌ও গায়ে পড়ে দিই নি। গরীব আত্মীয়কে সাহায্য দেওয়া উচিত জেনেই দিয়েছি। ভিক্ষুককেও ফেরাই না। তাদের সম্মান তারা না রাখলে আমি কী করব। হ্যাঁ গয়না বিক্রি করে—আর আমার বিয়ের মায়ের দেওয়া গয়নাই.....। সঙ্গে সঙ্গে কমলা স্থির করতে থাকে, এবার পলিটিক্যাল সায়েন্সে এম.এ. দিয়ে নেবে—যদি সম্ভব হয়.......একটা মাষ্টারী নিজের টাকা থাকা প্রয়োজন—নিজের একটা আয়......এতক্ষণ ধরে কাঁদলাম......তিনি এখন বৌদির হাসিতে কৃতার্থ হচ্ছেন, ধন্য হচ্ছেন....... পুরুষজাত......আমার এতক্ষণ কান্নার চেয়ে বৌদির একফোঁটা হাসির দাম দেখছি অনেক.......। সঙ্গে সঙ্গে ভেতরে ভেতরে নিজের এই ভাবনাগুলো নরেনের বুকের কাছে শুয়ে শুয়ে স্বীকার করছে—কারণ কিছুই ওর কাছে লুকোবে না—এমন একটা ইচ্ছা ও চিত্র—ওর মনে ভেসে গেলেও কমলা তা স্বীকার করল না। চিত্রটিকে সজোরে তাড়িয়ে দিল। ওর কান্নার দাম নেই, বৌদির একনয়া পয়সা হাসির দাম হাজার টাকার চেয়েও বেশি। কমলা ভেতরে ভেতরে এত উত্তেজিত হয়.....জিভ শুকিয়ে আসে......মা কী বলছে না বলছে মন দিতে পারে না। ....বাপের বাড়ি নেই......বৌদি এসে তা ভেঙে দিয়েছে......এখন ওর সংসারও ভাঙতে চাচ্ছে এমন বদ্‌......জেনেশুনেও—কমলা অস্থির হয়ে ভাবে—কোন মুখে এমন হাসিতে ধন্য হয়.......এমন ফ্লার্ট গার্লের হাসি......আপনার জন্যেই কান্না.......আমি ন্যাকামি করে কাঁদছিলাম। তবু, এ কথা

শোনবার পরও ওকি না এমন ব্যবহার.....। নিজেকে কমলার ভারী শুকনো শুকনো লাগে। মা আর বামুনদির দিকে মনোযোগ যেন অত্যাচারের মতো। ওর একবার মনে হয়, দ্বিজুর ব্যাপারটি না বললেই হত....আবার মনে হয়.....বেশ করেছি......মানুষের পরীক্ষা তো এমনি ঘটনায় ধরা পড়ে যায়। অনিচ্ছা সত্ত্বেও না ভেবে পারে না—ঐ এক টুকরো হাসিতে ধন্য হয়ে হঠাৎ যেন নরেনের চরিত্র ফাঁস হয়ে গেছে। ভাবনাটি ওকে হাজার কাঁটার মতো সব জায়গায় বিঁধতে থাকে।

ঠিক এমনি সময় নরেন এসে বাইরে দাঁড়ায়। হাতে একটা ওষুধের মাঝারি গ্লাস। নরেনকে দেখে মা ও বামুনদি থেমে যায়। না দেখার ভান করেও কমলা পরিত্রাণ পেল না। মা বলল—জামাই ডাকছেন। কমলা উঠে বাইরে ডাইনিং স্পেসে এসে শুষ্ক মুখে জিজ্ঞেস করে—কি?

নরেন একটু চুপ থেকে বলে—খেয়ে ফেল।

ওষুধটা হাতে নিয়েই কমলা দেখল ব্রান্ডির পরিচিত গন্ধ। সঙ্গে সঙ্গে গ্লাসটি নিয়ে নর্দমায় ফেলে দিয়ে আবার রান্না ঘরে দিকে যখন যাচ্ছিল—তখন নরেন জিজ্ঞেস করল—কি হ'ল?

—তুমি আর কোনোদিন এসব আমাকে দেবেনা—তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি। যত পার নিজে খাও—ঐ মাতাল বৌদিকে খাওয়াও।

কমলা ঘরে চলে আসে। নরেনও চলে যায় আস্তে আস্তে।

......শীতের শেষ রাতে কমলার মনে হয়, যেন এসব কতকালের কথা। অথচ একবছর হতে চলল। মাত্র। এমনি এক্স-মাসের ছুটিতেই দাদা-বৌদি-মা-বাচ্চারা এসেছিল। অথচ মনে হয় কতদিন, কতকাল। সেবার গ্লাসের ব্রান্ডি নর্দমায় ঢেলে ফেলবার 'পর সেই যে নরেন অদৃশ্য হল—পাত্তা পাওয়াই কঠিন। শেষ রাত থেকে সকাল-সকাল মানে আটটা-আটটা থেকে চেম্বারে, হাসপাতালে, হাসপাতালে নাকি ক'টা জরুরী কেস এসেছে—বিকেলে চেম্বার থেকে-আবার হাসপাতালে—অর্থাৎ নরেনের দেখাই নেই। কমলা মানেটা বুঝল—ও যে বৌদির 'পর আকৃষ্ট নয়—একথা বোঝাবার জন্যে বাড়িতে আসা বন্ধ করে দিল। কমলার রাগ কমে এসেছিল—মনে হতে থাকল, ওরই জন্যে বাড়ি আসা বন্ধ করে দিচ্ছে। বরাবর টাকা এনে নরেন কমলার হাতে দেয়—এবার ড্রয়ারে রেখে দিল। কমলাকে ডাকলও না। রাতেও বারোটার আগে ফেরে না। কমলা সবটা মিটমাট করবার জন্যে ব্যাকুল হয়ে ওঠে। তারপর একদিন রাত বারোটার 'পর নরেন ফিরতেই কমলা এসে হাজির হয় তখন ছোট পাওয়ারের একটা লাইট জ্বেলে নরেন খেয়ে দেয়ে চুপচাপ শুয়ে ছিল। এক'দিন কমলা ওর কাছে আসেওনি। এবার এসে চুপ করে পাশে শুয়ে পড়ে। নরেন একটু কাছে টেনে নিতেই বুকে মাথা রেখে হুহু করে কেঁদে ওঠে।.....মা'র আর কল্যাণেশ্বরী যাওয়া হয়নি। রাস্তায় যদি দ্বিজুর দল বোমা পিস্তল নিয়ে হানা দেয়। নরেন গাড়ি ঠিক করেছিল, বরুণ অভয় দিয়েছিল—কিন্তু মা কিছুতেই রাজি হননি। কমলা মুখে রাজি হলেও—নরেনের কাছে নিজের রাগ দেখাবার জন্যেই—ভেতরে ভেতরে একান্ত ইচ্ছে ছিল মা যেন রাজি না হন। ওদের যেন যাওয়া না হয়। তাছাড়া যে জন্যে কল্যাণেশ্বরী যাবার দরকার—সেদিনের সেই

টেবিলের ব্যাপার মা যদি কিছু মনে করে থাকেন—তবে তার প্রসন্নতার জন্যেই কল্যাণেশ্বরী যাবার প্রস্তাব। দ্বিজুর ঘটনায় সেই সব যখন মুছে গেল—তখন কমলার আর আগ্রহ ছিল না। তবু মাকে বার বার বল্ল—ইস্ তোমাকে একটু নিয়ে যাব ভাবলাম! মা জানাল—সে হবে খন। আমি দশ টাকার মিষ্টি মানত করে গেলাম—তোদের কল্যাণের জন্যে—আগামীবার এসে দেব। একটু থেমে বলেন—দেখ, তীর্থ করবার কপাল চাই! আমার কপালে কী আর তীর্থ আছে! কপাল—এমন কপাল নিয়ে জন্মেছি। বুঝলি কপালই সব—নইলে বাড়িতে এত লোক—এমন কপাল নিয়ে জন্মেছি। বুঝলি কপালই সব—নইলে বাড়িতে এত লোক—আর সেই বাড়িতে ডাকাতের হাতে তুই একা। ....আমার মন্দ কপাল মন্দ কপালের টানেই ছোঁড়ারা এসেছিল—কই, এতদিন তো আসেনি। কল্যাণেশ্বরীকে উদ্দেশ্য করে তিনি বলেন—মা, এবার দেখা দেবেন না আমাকে তাই ছোঁড়ারা এল। তোরও এতক্ষতি হ'ল। আমি যেখানে যাই—সেখানেই লোকসান। লোকসানের কপাল নিয়ে জন্মেছি।.....দাদা, মা, বৌদি আর বাচ্চারা চলে যাবার সময় কমলা নিয়ম-মাফিক কেঁদেছিল। ওরা চলে যাবার 'পর বাসাটা বড্ড খালি খালি মনে হচ্ছিল ঠিকই, এত লোকজন—দ্বিজুদের ভয় থেকে বাঁচবার জন্যে এত লোকজনও একটা ভরসা—তবু, কেমন যেন নিষ্কৃতি পেয়েছিল—তা অবশ্য বৌদি চলে যাবার জন্যে নয়। নরেনকে যে সন্দেহ করেছিল—তা কোনোদিনও লজ্জায় মুখ ফুটে বলতে পারবেনা। সে জন্যে নয়। ওরা চলে গেলে বাসাটা যেন নিজের মতো করে অনুভব করা যায়। সেই রাতে এক পেগ সার্ভ করা—সেই আনড্রেস হয়ে ওর পাশে শুয়ে গল্প করা—তারপর ছেলেদের মাঝে এসে শুয়ে ওদের চুমো খাওয়া আদর করা... .সেই শেষ রাতে ওর কাপড় খুলে দেওয়াকে জানতে না দেওয়া—আর শেষ রাতে ঘুম ভেঙে নানা স্মৃতি, কল্পনা ও পরিকল্পনা—এগুলোর পিপাসায় ভেতরে ভেতরে কমলা যে পিপাসিত হয়ে উঠেছিল—ঠিক সচেতনভাবে তা ভাবতে না চাইলেও—দু'একবার না ভেবে পারল কই? ওরা চলে গেলে কমলা যেন নিজের সংসারকে আবার ফিরে পেল—নিজেকে, স্বামীকে, বাচ্চাগুলোকে। কমলা আবার পরিচিত সংসার পেয়ে খুশি হয়ে উঠল। খুশি হয়ে ঘরদোর গোছাতে লাগল। অবশ্য এরই মধ্যে কমলা ড্রয়ার খুলে টাকাগুনে দেখেছিল—এত যে কল ছিল—কত টাকা পেয়েছে। এমন কিছু নয়। কমলা বুঝল, নরেন মীনাকে এড়াতে পারে তা কমলাকে বোঝাবার জন্যে, কোনো দৃশ্য পাছে কমলা সৃষ্টি করে বসে সেই ভয়ে আর কিছুটা হয়তো অভিমানেও এই ক'দিন বাইরে বাইরে। ওর মনে হল, সেই সঙ্গে ওর সঙ্গে কমলার সম্পর্ক যে গভীর দাদা-মা-বৌদির সেই ধারণা পাছে তাতে কোনো চিড় খায়—এই ভয়ও ছিল। মনে মনে ভাবল, ভালই করেছে। এনা করলে—মাথার ঠিক ছিল না—কি করতে কী করতাম। হাজার হোক, পুরুষ মানুষ অনেক বুদ্ধি ধরে। নরেন সারা সময় বাইরে বাইরে—এতে কমলার মর্যাদাও বেড়েছে—কত দেখুক। ......বৌদি শুধু বলছিল—জামাইবাবু তো সারাদিন দেখছি সময়ই পান না—হারামজাদা, এখন জামাইবাবুর মদের বোতল দেখেছে, টাকা দেখেছে—তাই জামাইবাবুর সময় ওর চাই। জামাইবাবু গলে গেলে কমলার 'পর প্রতিশোধও নিতে পারে—কত মতলব ওর মাথায় তার কী কিছু ঠিক আছে। বদমায়েস

মেয়ে ছেলে! স্বামীর সংসার ভেঙেছে—এখন এসেছে ননদের সংসার ভাঙতে। কম শয়তান! আর এ বাড়িতে ঢুকতে দিচ্ছিনে। দাদা ঠিক বুঝেছে—কেমন স্ত্রী রত্ন পেয়েছেন। দেয়ও যখন তখন আচ্ছা করে। সকলের সামনেই। তা তিনিও ছেড়ে দেন না—কারো কাছে মাথা হেট করবেন না। অসভ্য, জানোয়ার। খোঁচা মেরে কথা বলা ছাড়া কথাই বলতে জানে না। যৌবন যাক—তখন বুঝবে! .....একদিন অবশ্য শুয়ে শুয়ে নরেন বলেছিল, আমার 'পর তোমার বিশ্বাস যত মজবুত ভেবেছিলেম—দেখলাম, ভিত্তি অত শক্ত নয়। আমি অবিশ্বাসী হতে পারি—এমন আত্মবিশ্বাসই আমার নেই। কমলা কিছু না বলে নরেনের কান মলে দিল। ওর যা বলবার ছিল—তা কী করে বলে? সেই কান্নার সময় কিছু আদর—একটু প্রশ্রয় আশ্রয়—বৌদির হাসিতে ঠিক সেই মুহূর্তে মুগ্ধভাবে সায়—হয়তো সায় নয়—হাসির উত্তরে মামুলি হাসিও হতে পারে—কিন্তু কমলার কী তখন মাথার ঠিক ছিল? একটু চুপ করে কমলা খুব মৃদুস্বরে জানায়—দাদা বলেন, ভালবাসা—খুব বেশি ভালবাসা মানুষকে রক্ষণশীল করে তোলে। আমরা ভাই-বোন দু'জনেই বড্ড বেশি ভালবাসতে পারি। দাদা ঠকেছেন—আমি ঠকিনি। সে সময় আমার অবস্থা...। কমলা চুপ করে অন্যমনস্ক হয়ে যায়। একটু পরে নরেন আবার বলে—অবশ্য ভালবাসা আর বিশ্বাস একসঙ্গে সবসময় ঘর করে না। তোমার দাদা তো বৌদিকে ভালবাসেন—কিন্তু বৌদিকে বিশ্বাস করেন কি? বোনেরও সেই রোগের ছোঁয়াচ সেই সময় লেগেছিল হয়তো? এবার কমলা ঝাঁজের সঙ্গে জবাব দেয়—কিন্তু বৌদি যদি ভালবাসতেন দাদাকে—তবে নিশ্চয়ই দাদা বিশ্বাস করতেন। যেখানে একজন ভালবাসে—আরেকজন বাসেনা—যেখানেই অবিশ্বাস—সেখানেই ঘর ভাঙার প্রশ্ন। দু'তরফের ভালবাসা থাকলে—বিশ্বাস আসবেই। তা দাদার বোনকি তোমাকে বিশ্বাস করে না? সেই একদিনের মাথা ঠিক নেই যখন তখনকার এক মুহূর্ত দিয়ে তুমি আমার এতকালের সব কিছু বিচার করবে? সেই এক মুহূর্তের রাগই আমার স্বভাবের সব—আর এতদিনকার সব কিছু মিথ্যে, নকল। তুমি তো ডাক্তার—রোগীর বিকার যখন হয়—তখন এই বিকারই কী মানুষটার স্বাস্থ্যের আসল বলে মেনে নেবে? মানুষের স্বাস্থ্যটা স্বাভাবিক—রোগটা স্বাভাবিক নয়—শুধু রোগী ঘেটে ঘেটে এই কাণ্ডজ্ঞানটুকু হারিয়েছে। এবার নরেন কমলার কান মলে দিলে কমলা দু'হাতে নরেনের দু'কান মলে দিল। নরেন জানাল—তোমার কথাগুলো পয়েন্ট দিয়ে বলোনা? —এক, দুই, তিন......চার এমনি করে। কমলা সঙ্গে সঙ্গে জানায়—তারপর একসময় তুমি জানাবে—তোমার পাঁচ নম্বরের আপদ অনেক আগে শেষ হয়েছে....উঃ সেদিন আকাশে উড়ে যাবার কী শখ! নিশ্চয়ই লুকিয়ে লুকিয়ে স্মোক করে—কেমন অনায়াসে টান দিল। ওর মুখাগ্নি যে কবে হবে? —স্বাস্থ্য খুব ভালো; শীগগীর মুখাগ্নি করে দাদার বিয়ে দেবে—এ আসাও করো না। —তাহলে ঝগড়াঝাটি করেই চিরকাল কাটাবে? —দেখ, চিরকাল অনেকটা সময়—আগে থেকে কিছু বলা কঠিন। সমস্ত ভবিষ্যৎ তো এখন জন্মগ্রহণ করেনি। যে জন্মায়নি—তার চেহারা নিয়ে আলোচনা শুধু নিজের ইচ্ছে জানানো ছাড়া আর কিছু নয়। কমলা ভাবতে ভাবতে বলে—প্রতি মুহূর্তেই তো ভবিষ্যৎ জন্মাচ্ছে। নরেন মৃদুস্বরে বলে—তবু, জন্মে জন্মেও ভবিষ্যৎ কখনো শেষ হয়ে যায় না। বর্তমান কোনো দিনও

ভবিষ্যৎকে ফুরিয়ে ফেলতে পারবে না। কমলা একটু হেসে বলে—ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তোমার এই ধারণার পেছনে কোনো ইচ্ছাপূরণের কল্পনা নেই? যে মরে যায়—তার কাছে কী ভবিষ্যৎ শেষ হয়ে যাচ্ছেনা—ফুরিয়ে যাচ্ছেনা? নরেন জবাব দেয়—মৃত্যুর পরে হয়তো সে অন্ধ, পরমাণুতে যাচ্ছে—সেই অণুপরমাণুর ভবিষ্যৎ নেই এমন বলাও যায় না—নয়তো আত্মা হয়ে সূক্ষ্মদেহ নিয়ে ছেলেমেয়েদের শ্রাদ্ধে অত খরচ করছে বলে ছটফট করছে—কি বেশি খরচ করছে না বলে দুঃখ করছে—নয়তো শেষ বিচারের জন্যে অপেক্ষা করছে—সেখানেও ভবিষ্যৎ। আসলে মৃত্যুর ব্যাপারটি জীবনের বাইরের ব্যাপার—তা আমরা জানিনে—জানা হয়তো সম্ভবও নয়। কিছু প্রশ্ন আছে—যার কোনো অর্থ কোনো দিন হয় না—মৃত্যুর প্রশ্ন সেই প্রশ্ন। অর্থাৎ মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে মৃত লোকটি জীবনের আয়ত্তের বাইরে জ্ঞানের বাইরে আত্মা হচ্ছে, কী নিশ্চিহ্ন হচ্ছে চিরকালের মতো এ কেবল ঐ ইচ্ছাপূরণের অনুমান। —তবে যে সেদিন তুমি বলছিলে এই বস্তু জগতের বাইরে আরেকটা মনোজগত আছে যা বস্তুকে ব্যবহার করে জীবন হয়ে প্রকাশ পায়—ঠিক এমনি কিছু বলছিলে না? —নরেন খুশি হয়ে কমলাকে চুমো খেয়ে বলে—চমৎকার মেমারী তো তোমার—হ্যাঁ, এই রকমই কিছু বলছিলাম। এ সবই অনুমান—আর তথ্য বা ফ্যাক্টকে ঠিক ভিত্তি করেও এ অনুমান নয়—এগুলো হচ্ছে উপমার সাহায্যে কিছু চিন্তা করা। আসলে তোমার দাদাকে তর্কে নামানোই উদ্দেশ্য ছিল। দাদা চিন্তা ভালবাসেন—বৌদি দুচোক্ষে দেখতে পারেন না—এ তো অনেকদিনই জানতাম। তাই একটা পরীক্ষা। —দাদা কিন্তু ধরে ফেলেছিলেন। —বুদ্ধিমান লোক, না ধরবার কী আছে? তবে আমার উদ্দেশ্য তো সার্থক। —আচ্ছা, এই যে কথায় কথায় ইচ্ছাপূরণের গায়ে সব দোষ দিচ্ছ—এইটিও কী ইচ্ছাপূরণ নয়? কোনো সিদ্ধান্তে না আসবার চেষ্টা—এই ইচ্ছাপূরণটি সেখানে নেই? দাদা বলছিলেন, দার্শনিকরা সমস্যাকে যেমন ভালবাসে—সমাধানকে তেমনি ভয় পায়। ওদের বিশ্বাস, সমাধান মাত্রই মিথ্যে হতে বাধ্য। এই বদ্ধমূল কুসংস্কারই এত দর্শনকে জন্ম দিয়ে যাচ্ছে। কিছুতে বিশ্বাস করা গোঁড়ামি—সন্দেহ করাই বুদ্ধির আসল কাজ—এই সন্দেহ করার বাতিকে দার্শনিকরা ভুগছেন। এ হচ্ছে দাদার বিশ্বাস—তুমি কী বল? নরেন বলে, তোমার ইচ্ছেপূরণের থিয়োরী দিয়ে বিচার করলে সহজেই এর উত্তর পাওয়া যায়। বিশ্বাস করা ইচ্ছাপূরণ, অবিশ্বাসকে বিশ্বাস করা ইচ্ছাপূরণ—আবার দার্শনিকদের অবিশ্বাস তাও ইচ্ছাপূরণ হয়তো জীবনের অনিশ্চয়তা থেকে এসেছে। মনে হয়, কোনো কিছুর ভেতরে—কোনো থিয়োরীর আলোচনায় যুক্তিকে যুক্তি দিয়ে আলোচনাই ঠিক—থিয়োরীর মালিকের মনকে বিশ্লেষণ ঠিক নয়। তবে হয়তো, যে ভাষার জগতে, চিন্তার জগতে বা যুক্তির জগতে আমরা সবসময় বাস করি—সেখানে যুক্তি ছাড়া পথ নেই, আবার সেই যুক্তি দিয়ে সত্যে পৌঁছানো হয়তো সম্ভব নয়। যে অর্থের জগতে আমাদের বাস—যে তাৎপর্যের জগত আমরা গড়ে তুলেছি—সেখানে এক একটি যুক্তির বংশ জন্মাচ্ছে—আরেকটি যুক্তির বংশ তাদের নির্বংশ করতে চাচ্ছে। যুক্তিরও জন্ম মৃত্যু আছে। যুক্তি মরণশীল। যুক্তিই এক মাত্র অস্ত্র—কিন্তু এমন অস্ত্র নয় যা দিয়ে যুদ্ধ জয় করা যায় না। তাই বিভিন্ন যুক্তির বংশধরেরা ঝগড়া করে চলেছে। কেউ কেউ নির্বংশ হয়েছে,

হচ্ছে বা হবে। কোনো যুক্তির শিশুমৃত্যু, কোন যুক্তি মধ্যায়ু, কোনোটি বা দীর্ঘায়ু। তবে মানুষের জ্ঞান বিজ্ঞান যত বাড়ছে—যুক্তির শিশুমৃত্যুর হার তত বাড়ছে। তবে মজা হচ্ছে, কাণ্ডজ্ঞান বেশি যাদের—যুক্তির অজন্মায় ভোগে বেশি—কিন্তু রোগে ভুগেও এরা অসুস্থ হয়না। যুক্তির জন্মহার জ্ঞানী মানুষের মধ্যে বেশি—কাণ্ডজ্ঞানশূন্যতার এনিমিয়া তাদের ক্রনিক। এই তো প্রচলিত বিশ্বাস—কি বল? ....শেষ রাতে কমলার এক এক সময় জীবন বড্ড একঘেয়ে লাগে। সকাল থেকে অনেক রাত পর্যন্ত সময়টা এত ব্যস্ততার মধ্যে, উত্তেজনার মধ্যে কাটে—তখন ক্লান্তির কথা—এক ঘেঁয়ের কথা মনে আসে না। ছেলেদের পড়া তৈরি করে দেওয়া, ওর খাবার তদারকি, একটু বই পড়া, ওর জন্যে বার বার ঘড়ি দেখা—কখন আসবে—বিকেলে বাচ্চারা এলে আবার ব্যস্ততা, হৈ চৈ, চড় চাপড়, খাওয়ানো তো মহা ঝামেলা—ছেলেটা এক একটা গ্রাস মুখে নিয়ে আধ ঘণ্টা বসে থাকবে—এত জেদী ওরা দু'জনেই—আর মারপিট তো লেগেই আছে—আটটার পর ঢুলতে শুরু করবে—তারপর রাত দশটায় বা এগারটায় ওকে ক'পেগ সার্ভ করে নিজের বিছানায় আসা। তারপর এক ঘুমে রাত প্রায় চারটা—সব পৃথিবী তখন ঘুমে। সেই সময় ঘুমন্ত পৃথিবীর মধ্যে জেগে কচিৎ কখনও ওর যেন মনে হয় জীবন বড্ড একঘেয়ে—যন্ত্র। রাত চারটা থেকে পাঁচটা পর্যন্ত ঘুমের এই বিরামটুকুর মধ্যে জীবনের অর্থহীনতা তখন কেমন যেন স্পষ্ট হয়। কখনও কখনও এই সময়টা ওর জীবন থেকে যেন ছিঁড়ে বের হয়ে যায়। কেমন যেন সব সুদূর মনে হয় রাত এগারটার আগের পৃথিবীকে—যে পৃথিবী আবার সকাল ছ'টা থেকে একেবারে আপন হয়ে ওকে মিলিয়ে দেবে। তখন কেমন নরেনকে সুদূর—অপরিচিত লাগে—ছেলেমেয়েদের উপলব্ধি করতে পারে না—দাদা-বৌদি আর মা যেন অনেকদিন আগের দেখা সিনেমার মত—মনে আছে—কিন্তু তখনকার অনুভূতিগুলোর সঙ্গে মেশানো নয়—দূরের নিস্পৃহ, উদাসীন স্মৃতি। কমলা ছেলেমেয়েদের উপলব্ধি করবার জন্যে চুমো খায়—কিন্তু এ যেন পরের ঠোঁটে পরের গালের স্পর্শের মত—এ যেন স্পঞ্জকে স্পর্শ করবার মতো। এত বিচ্ছিন্ন, এত দূরের মনে হয় নিজেকে—এত একলা লাগে। অথচ এই একলা হওয়াকে ওর ভয় করে না—ভেতরে ভেতরে কেমন একটা লোভও আছে। সব কিছু হারিয়ে নিজেকে একলা উপলব্ধি করবার বা এই উপলব্ধিটির 'পর—স্বামী, সন্তান, সংসার যেখানে ঝাপসা—ঝাপসা অথচ তাতে কোনো বেদনা নেই। সকলের সঙ্গে নিজেকে বোধ করবার—এক হবার যে ব্যাকুলতা—কমলা ভেতরে ভেতরে অস্পষ্ট ভাবে জানে—তা অনেকটা জোর করা—নাড়ি ছেঁড়বার বেদনা নয়। ভয় করতে ইচ্ছে করে অথচ ভয় হয় না—ব্যথার চাহিদা আছে অথচ ব্যথা হয়না—ব্যাকুলতা হচ্ছে বলে ভাবতে চায়—কিন্তু ব্যাকুলতা নিতান্তই ফ্যানানো। এই সময়টা কমলা যেন সব পৃথিবী ছেড়ে মহাশূন্যের ভেতর—যেখানে একটি গ্যালাক্সি শেষ হয়ে গেছে অনেক আগে—আরেকটি গ্যালাক্সি কোটি আলোকবর্ষ দূরের—স্তব্ধ অন্ধকারের মধ্যে আচ্ছন্ন। নিজেকেও যেন অজানা লাগে—এত অপরিচিত জগতে নিজের পুরানো পরিচয় কী মনে থাকে? মনে থাকলেও সেই পরিচয়ের কোন জোর নেই। অনেক্ষণ নিজের অপরিচয়কে সঙ্গে নিয়ে অপরিচিত জগতে বাস করে আবার কখন পাঁচটার

সময় কমলার ঘুম ভাঙে। ও যে অপরিচিত ছিল নিজের কাছে তার কিছু মাত্র মনে থাকে না। জীবনকে হঠাৎ একঘেঁয়ে লাগা থেকে সব পরিচয় হারিয়ে ফেলা পর্যন্ত ঘন্টাখাণেক সময় যেন সেই দুই গ্যালাক্সির ভেতর রেখেই কমলা সাড়ে পাঁচটায় সংসারে প্রবেশ করে। প্রবেশ যে করে তা জানতেও পারেনা—মনে থাকেনা। শেষ রাতের সেই এক ঘন্টাকে মহাশূন্যের দুই নক্ষত্রপুঞ্জের মাঝেকার কোটি কোটি অন্ধকারের মধ্যে রেখে দিয়ে আসে। সেই অন্ধকারেকে দেওয়া উপহারকে দিনের আলোতে একেবারে ভুলে যায়। নক্ষত্রহীন চির অন্ধকারের অমাবস্যার কোনো অজানা আকাশ কখন জানলা দিয়ে এসে ভোর রাতে ওকে স্মৃতি আর কল্পনার আষ্টেপৃষ্টে বন্ধন থেকে মুক্ত অন্ধকারে হালকা হালকা ভয়ে স্বাধীন ও অপরিচয়ের মধ্যে ঘন্টাখানেক রেখে দিয়ে যায়—আর যাবার সময় নিজের কোনো স্মৃতিও প্রত্যাশা কিছুই রেখে যায় না—সকালে সংসারের আষ্টেপৃষ্টের মধ্যে সহজ ও স্বাভাবিক কমলার সেসব কিছুই মনে থাকেনা।.......আজকাল বেশি রাতে নরেন 'কল'এ যায়না—ভোর রাতে তো নয়ই। চারদিকে নানা গন্ডোগোল। ঘনঘন রাজনৈতিক সংঘর্ষ, মিছিল, খুন। নানা ডাক্তার ভিজিট কমাবার জন্যে নানা রকম ধমকানো চিঠি পেয়েছে। নরেনও। ইতিমধ্যে দু'জন ডাক্তারকে ডেকে নিয়ে চিকিৎসা করিয়ে শুধু যে ভিজিট দেয়নি—তা নয়—গায়ে গরম জল ঢেলে দিয়েছে। কোনো কোনো ডাক্তার ভিজিট কমিয়ে দিয়েছে। রাতে কেউ-ই বের হয় না—অন্তত খুব জানাশুনা না থাকলে। নরেন ভিজিট কমায়নি—তবে রাতে পারতপক্ষে বের হয় না। তাই শেষ রাতে আর উঠবার দরকার হয় না। কিন্তু ঘুম কারোই হয় না। কমলা উঠে গিয়ে শেষ রাতে নরেনের পাশে শোয়। বোঝে নরেনের ঘুম ভেঙে গেছে—জোর করে ঘুমোবার চেষ্টা করছে। কমলার মনে হয়, নরেন যেন 'কলে' যেতে না পেরে লজ্জা পাচ্ছে। তাই ঘুম না এলেও ঘুমের ভান করে কমলাকে এড়াতে চাচ্ছে। সেই যে একবার ঘুম ঘুম চোখে কমলার দিকে তাকিয়ে আবার চোখ বুজছে—তা আর কিছু নয়—কমলার পায়ের শব্দে, চুড়ির শব্দে আগে থেকে বুঝতে পেরেই—ওর ঘুম ঘুম চাহনির নকল—তারপর নকল ঘুম। কমলা গিয়ে পাশে শুয়ে পড়ে।

.....এবার গরমের ছুটিতে কমলা বাচ্চা দুটোকে নিয়ে দাদার কাছে যায়। দাদা সাবজজ হয়েছিলেন—এবার আবার বদলি হয়েছেন। তবে খুব বেশি দূরে নয়। নতুন বাড়িটি মন্দ নয়। এখানেও বৌদি ঠিক জমিয়ে নিয়েছেন—দাদা বই মুখে করে অবসর কাটান। এখানে সেই ঝগড়া—যেই ঝগড়ার কথা গোড়াতে বলা হয়েছে। কমলার আশা ছিল—দাদা বৌদিকে অন্তত কিছু কড়া কথা বলবে। দাদা যে পুরুষমানুষ এ প্রমাণ গতবারের শীতের ছুটিতে পেয়ে এবার অন্তত সেই ভরসায় ঝগড়ায় নেমেছিল। কিন্তু দাদা বুঝেও উদাসীন রইলেন। মা কাঁদলেন। নরেন বারোটার মধ্যে এসে দুটোর ট্রেনে ওদের নিয়ে চলে এল। নরেনকে কিছু খেতে দিল না—বাচ্চাদের খাওয়াল না—নিজে তো খেলই না। নরেন আর বরুণ বর্তমান সরকারের পরমায়ু নিয়ে আলোচনা করল—কবে পর্যন্ত রাষ্ট্রপতির শাসন হবে তার তারিখ নিয়ে আলোচনা করে বিদায় নিল।

এবার নরেন মোটর কিনল। পরোক্ষভাবে বরুণের এক সহকর্মীর মারফত তা জানিয়েও দেওয়া হল। দাদা কোনো চিঠিপত্র দিল না—কমলাও না। পুজোতেও দাদার

চিঠিপত্র বা শাড়ি এল না। কমলাও লিখল না। মা'র জন্যে মন হুহু করে। তবু, কমলা দাঁতে দাঁত চেপে স্তব্ধ হয়ে রইল। পুজোর ক'দিন চিঠির জন্যে ব্যাকুল হয়ে থাকল। তারপর, মা'র নামে একটা শাড়ি পার্সেল করল—সঙ্গে কোনো চিঠি দিল না। কিন্তু কমলার নামে কোনো কিছুই এল না। কমলা বার বার বোঝাল—বাপের বাড়ির পর্ব শেষ হ'ল—ভালই হোল—তবু, মা যে ক'দিন—থাকছে...মা তো আসতে রাজি হলেন না। ওরা—ডাক্তাররা কেমন নিজের মধ্যে থাকে জানতে পেরেও যদি দাদা-মা কোনো খবর না নেয়—না নেয় না নিক—আর মরে গেলেও নয়।

....আজকাল শেষ রাতে কমলার এক অদ্ভুত স্বপ্নের কথা মনে পড়ে। যেই স্বপ্ন বিয়ের পর প্রায়ই দেখত। সেই কলকাতার বাড়িওয়ালার স্কুল ফাইনাল ফেল করা দামড়া ছেলের সঙ্গে ওর বিয়ে হয়ে গেছে—নরেনের সঙ্গে ওর বিয়ে সম্ভব নয়। অদ্ভুত কান্না পেত—স্বপ্নের মধ্যেই। জেগে আশ্বস্ত হত। যতসব.....

আজকাল প্রায়ই কমলা একটা স্বপ্ন দেখে। যেন নরেনের সঙ্গে ওর বিয়ে হয়নি। কা'র সঙ্গে হয়েছে কিছুতেই মনে করতে পারছেনা। নরেন পর পুরুষ—ওর কাছে যাওয়া ঠিক নয়। হঠাৎ যেন দ্বিজু রিভলবার নিয়ে ওদের সর্বস্ব কেড়ে নিতে এসেছে—যেন বাচ্ছাদের মেরে ফেলবে। কিন্তু দ্বিজুর চেহারা সেই স্কুল-ফাইনাল ফেল করা কলকাতার বাড়িওয়ালার দামড়া ছেলেটির মত। কী ভীষন রাগ ওর! কমলা ভয়ে দিশেহারা। কোথায় যাবে—নরেনের কাছে যাওয়া যায়না—পরপুরুষ। চিৎকার করতে গিয়ে গলা দিয়ে স্বর বের হয়না। পা অবশ। তবু দৌড়ে বাচ্চাদের কাছে ছুটে এল। কোথায় ওরা? বাচ্চাদের খুঁজে পেল না। হঠাৎ বৌদিকে মনে পড়ল—কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মনে হল—বৌদি তো আকাশে হাল্কা হয়ে উড়ে গেছে। বৌদিকে পাওয়া যাবেনা। হঠাৎ দাদাকে মনে পড়ল। ওর সবচেয়ে পৃথিবীতে আপন দাদা—দাদার মত কেউ নয়। দাদার জন্যে ব্যাকুল হয়ে চারদিক খুঁজে বেড়াতে লাগল। কোথাও দাদা নেই। প্রাণপনে দাদাকে খুঁজতে শুরু করল—কোথায় দাদা? দাদা নেই। দাদার জন্যে কান্নায় যেন বুক ভেঙে যেতে লাগল। দাদা নেই—এ যেন সহ্য করা যায় না। প্রাণপনে দাদাকে ডাকতে গিয়ে নিজের গোঙানিতে ঘুম ভেঙে গেল। বুক তখনও কাঁপছে। কমলা উঠে বাচ্চাদের চুমো খেয়ে নরেনের পাশে শুয়ে পড়ে। শুয়ে নরেনকে জড়িয়ে ধরে। নরেন নকল ঘুম ঘুম চোখে কমলাকে শুতে দেখে। নকল ঘুমের আড়ষ্টতায় ওকে আরো কাছে টেনে নেয়। কমলা নরেনের বুকে মুখ রেখে জেগে থাকতে চায়—ঘুমুতে ভয় পায়। আশ্চর্য হয়ে ভাবে—কই মাকে তো মনে পড়ল না?

দ্বিজুর রিভলবার দেখিয়ে টাকা নেবার দিনই সন্ধ্যায় নরেন এস.ডি.পি.ও'এর সঙ্গে দেখা করে সব কিছু বলল। নিজের অন্যান্য মামাদের সঙ্গে এই মামা ও ছেলেদের পার্থক্য যে অনেক—তা জানাতেও ভুলল না। যে ভাগ্নে ডাক্তারি পড়ে-সেই হতভাগাও যে পোষ্টার লিখে—দলের ব্যানারে কারুকার্য করে এনাটমি ও ফিজিওলজির কোর্স শেষ করছে—প্রফেসরদের ভয় দেখিয়ে প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষায় সসম্মানে পাশ করে যাচ্ছে—দল বেঁধে এদেরই তো ক'দিন পরে হাসপাতালে চাকরি হয়ে যাবে—এদের পাশ করানো মানে লোক মারবার লাইসেন্স দেওয়া ছাড়া আর কি? এখন বলুন মিঃ

মিত্র—কি করব? এই দ্বিজুর ব্যাপারে? আমি চাই—ওর শাস্তি হোক।

এস.ডি.পি.ও জানালেন—একটু দেরি হয়ে গেল। তা মিসেস গাঙ্গুলীকে দিয়ে কি একটা ষ্টেটমেন্ট করানো যায় না?

—বললাম তো। আপনাকে বলব—তাতেই ভয়। যদি পুলিশে সংবাদ দিলে আরো প্রতিশোধ নেয়—যদি রাস্তায় যাবার সময়—কি আমার এ্যাবসেন্সে আবার বাড়িতে...এত ভয় পেয়েছে....মোটেই সুস্থ নয়—এ অবস্থায়.....ডাক্তার হিসেবে আমি ওকে এই মুহূর্তে এ ব্যাপারে....

—ঠিক আছে। আমি যা বলছি—তাই করুন—কেস তৈরি করতে হবে তো—একটা ডায়েরী করতে হবে। অল রাইট।

নরেন কথামত ষ্টেটমেন্ট তৈরি করল। সঙ্গে সঙ্গে এস.ডি.পি.ও চারদিকে ফোন করে স্টেশনে—বাস টার্মিনাসে— বিভিন্ন বাসরুট যেখানে যেখানে গেছে—সেই সব জায়গায় সংবাদ পাঠাবার ব্যবস্থা করল।

দ্বিজুর ঘটনায় নরেন প্রথমটা জ্বলে উঠেছিল—তা ওর স্পর্ধায়। ওকে অগ্রাহ্য করবার দুঃসাহসে। কিন্তু বিরক্ত হয়েছিল কমলার 'পর। টাকা যাবার জন্যে নয়—দ্বিজু কমলার 'পর এত জুলুম করবার সাহস কোথা থেকে পেল—এ চিন্তায় নরেন রীতিমত নীরস হয়ে পড়েছিল। কমলা দিনের পর দিন এই ছেলেটাকে প্রশ্রয় দিয়েছে—আমন দিয়েছে—অনেক আড্ডা দিয়েছে। আজ কাঁদতে বসেছে! এ কান্না কি দ্বিজু অপমান করেছে বলে—ওর প্রভাব অস্বীকার করেছে সেই জন্যে—না টাকা যাবার জন্যে—সত্যি কি ভয় পেয়েছে? নরেন বরাবরই লক্ষ্য করেছে—কমলা ওর ভাগনেদের সঙ্গে বড্ড বেশি মাখামাখি করে। কমলার চেয়ে বয়সে অল্প ছোট তরুণ যুবকদের সঙ্গে কমলা অনায়াসে মিশে যায়। এরা অবশ্য সবাই নরেনের আত্মীয়। কই ভাগনী বা মামী, মামীদের সঙ্গে তো কমলা এত বেশি মেশে না। কমলার ব্যক্তিত্ব মাসী, মামী, বা অন্যান্য ডাক্তারদের স্ত্রীর কাছে প্রকাশ পায়—সেই গাম্ভীর্য বা ব্যক্তিত্ব এই সব নয়াযৌবনের ভাগনের কাছে কোথায় যায়। ওরা এলে কমলা যেন ওদের আদর যত্ন গল্পে বিভোর হয়ে যায়? তখন অবশ্য রুটিন মাফিক নরেনের সেবাযত্ন যা করবার সবই করে—কিন্তু তা নিষ্প্রাণ, তা যন্ত্রের মত। আবার ওরা চলে গেলেই কমলা আবার আগের চেহারায় ফিরে আসে। নরেনের জন্যে উৎকণ্ঠিত, ব্যস্ত, ব্যগ্র। ওদের জন্যে অপেক্ষা নেই, প্রতীক্ষা নেই, ওরা চলে গেলে কমলা ওদের ভুলে যায়। ওরা কাছে এলে কমলা রীতিমত খুশি—এই খুশির চেহারাটি নরেন কোনোদিনও পায়নি। এ নিয়ে বলতে নরেনের রুচিতে বাধে—শিক্ষায় আটকায়। নরেন এত বোকা নয় যে ভাববে, ছোট ভাই নেই—তাই ওদের 'পর ওর এত আগ্রহ—নিজে গরিব ছিল বলে গরিবদের জন্যে এত দরদ—অন্যান্য মামার ছেলেরা তো গরিব নয়। ও জানে, অল্প বয়সি তরুণদের 'পর কমলার একটা ক্ষিদে আছে—ও হয়তো তা জানে—আবার নাও জানতে পারে। ওরা এলে এই ক্ষিদে জেগে ওঠে—ওরা না এলে তা চাপা পড়ে যায়। তাই ওরা কাছে এলে এত বিভোর—চলে গেলে ভুলে যায়। আর নরেনও আস্তে আস্তে ভুলে আসে।

কমলার 'পর ভালবাসা ও কৃতজ্ঞতার তীব্রতা নরেন ভুলতে পারে না—যদিও

বাইরের প্রকাশে ওর চিরকালের কুণ্ঠা। কমলার ভালবাসাও বুঝতে কখনও ভুল করেনি। কিন্তু এই ভালবাসা—এই আকর্ষণ—এই ঘরের শান্তি—কমলার গভীর অনুরাগ, প্রবল উৎকণ্ঠা—এ নিয়ে ওর মনে কোনো দ্বিধা নেই। কিন্তু কোনো অন্ধমোহও ওর নেই, অবুঝ হতে মন চাইলেও নরেন অবুঝ হতে পারে না, অতিরিক্ত প্রত্যাশার ইচ্ছে থাকলেও আশাভঙ্গ ওকে গ্রাস করতে পারে না। ও জানে, কমলার বৌদি যখন ওকে বলেছিল, তোমার স্বামীকে যদি তোমার পছন্দ হয়ে থাকে—তবে আমারও হয়েছে—এ কথায় কমলা কেন চোখের জল ফেলেছিল। নরেনের রূপ নিয়ে গর্ব করতে পারে না—এই ব্যথায়। ও জানে, নরেনের চেহারায় পাছে কটাক্ষ হয়—এই ভয়ে কমলা সহকর্মীদের স্ত্রীদের সঙ্গে মিশতে চায় না। আরো স্পষ্ট করেই নরেন ভেবেছে, ওর রুচির নিন্দে শুনতে যেতে ও রাজি নয়। ওকে নিয়ে যে কমলার কুণ্ঠা আছে—বা থাকা অসম্ভব নয়—সেই ভয়ে কমলা ওদের সঙ্গে মেশে না। ডাক্তারদের স্ত্রীরা ওকে অনুকম্পার চোখে দেখবে—এ ওর অসহ্য। শুধু তাই নয়, ডাক্তারদের স্ত্রীর মহলে ওর যে শিক্ষার গর্ব—তা কি ওর রুচি অনেক বড়—স্বামীকে দিয়ে—স্বামীর রূপ দিয়ে তা বিচার করা চলে না—এ কথাই কি প্রমাণ করতে চায় না? ওর শিক্ষা রুচির অহংকার কি স্বামীর রূপকে—শ্রীহীন চেহারাকে আড়াল দেওয়া নয়? ও যে রূপের ভেতরে মানুষকে চিনতে পারে—ভালবাসতে পারে—নিছক টাকা দেখে বিয়ে করেনি—তাই কি প্রমাণ করতে চায় না? কমলা যে নরেনকে জোর করে ডাক্তারদের কাছে নিয়ে যেতে চায়—এক সঙ্গে যেতে চায়—তা কি ওর ভালবাসা ওদের কাছে প্রমাণ দিতে নয়? আর ডাক্তারদের সঙ্গে আলাপ? সেখানেও কি শিক্ষায় দীক্ষায় তাদের স্ত্রীদের চেয়েও বড়—এ কথা বলবার ব্যগ্রতা কেন? এখানকার অধিকাংশ ডাক্তারও তাদের স্ত্রীরা সুশ্রী, সুন্দরী। কমলা যে বেশি স্ত্রী মহলে মেশে না তা কি ওরা সুন্দরী বলে নয়? তাছাড়া, ডাক্তারদের কাছে নিজের স্বাতন্ত্র্য প্রকাশের ব্যগ্রতা—তাও এক ধরনের শ্রদ্ধার মধ্য দিয়ে তাদের আকর্ষণের চেষ্টা নয়? কমলা হয়তো জানে না—সুশ্রী চেহারার ডাক্তাররা ওকে আকর্ষণ করে—অথচ সেই আকর্ষণের জবাব না পেয়েই কি কমলা ঐ ডাক্তারদের সম্বন্ধে এত নীরব? রূপের ক্ষিদে—সুশ্রী চেহারার আকর্ষণ এ থেকে কি কমলা নিজেকে রক্ষা করতে পারে? কেউ-কি পারে? নরেন তা বোঝে—কষ্ট পায়—মেনে নেয়। তবে এমন কষ্ট—নিজের চেহারার শ্রী'র অভাব—সেই অভাবের যন্ত্রণা এতো পেয়েই এসেছে। তাই খারাপ লাগলেও মেনে নেয়। খারাপ যে লাগছে—তা বুঝতে দেয় না—মেনে নিয়েছে—কষ্ট করেই মেনে নিয়েছে তাও জানতে দেয় না।

তবু রূপের ক্ষিদে নিয়ে নরেনকে যে কমলা কত ভালবাসে—তা কি অস্বীকার করা যায়? নরেন তা করে না। কমলাই মেয়েদের কাছে সহজ হতে শিখিয়েছে, মেয়েদের 'পর স্নেহশীল হতে কমলার দানই সবচেয়ে বেশি, কমলার জন্যেই মেয়েদের কাছে স্বাভাবিক সহজ ও প্রসন্ন। নইলে ওর সাধ্য ছিল না নিজের জাল ছিঁড়ে বের হয়। মেয়েদের অন্তরে যাবার—বুঝবার পথ কমলার জন্যে সম্ভব হয়েছে। স্বাভাবিক ও সহজ হয়ে কত যন্ত্রনার—গ্লানির—বেদনার হাত থেকে বেঁচেছে—কমলা তা কোনোদিনও

জানবে না। নরেনও তা ভুলে যায়—কিন্তু, যখন ছেলে ছোকরাদের 'পর—সেই ভাগনে জাতীয় অল্প বয়সিদের 'পর ওর আকর্ষণ দেখে নীরবে ক্ষুব্ধ হয়—সেই ক্ষুব্ধ ও পুরানো গ্লানির বয়স যখন কমে আসতে থাকে—তখন ওর চরিত্রে কমলার দানের কথা ভেবে নিজের মনকে সহজ ও স্বাভাবিক করতে চায়। ওরা চলে গেলে—কিছু সময় লাগে নরেনের মনকে গোছাতে, কিন্তু কমলার মনোযোগ ও আকর্ষণ আবার যখন ওর 'পর বর্ষণ শুরু করে—প্রথমটা তা নিষ্প্রাণ ও যন্ত্রের মত গ্রহণ করলেও শেষের দিকে নরেন স্বাভাবিক হতে শুরু করে। তখন কমলার প্রভাব মনে পড়ে। কমলা আবার ফিরে এলেও তখনি ওকে মনে মনে স্বীকার করে না—স্বীকার যে করে না তা কমলাকে বুঝতেও দেয় না—পরে, আস্তে আস্তে বিয়ের পর অর্জন করা স্বাভাবিকত্ব ফিরে পাবার জন্যে কমলার ভালবাসার তীব্রতার স্মৃতিতে নিজেকে সরস করতে চায়। এ কথাও নরেন না ভেবে পারেনি—কমলাকে যে ও ক্ষমা করে—যে অন্যায় কমলা হয়তো অজানায় করে—হয়ত অজানাতেই ক্ষমা প্রার্থী—নিজের অগোচরে পাপ মানুষ কিছু কম করে না—সেই কমলাকে ওযে ক্ষমা করে—তা কি বিয়ের পরে অর্জিত স্বাভাবিক চেহারা ফিরে পাবার ব্যাকুলতায়? সহজ হতে পাবার সুখ থেকে বঞ্চিত হবার ভয়ে? পুরানো হীনতাবোধের ক্রনিক আত্মগ্লানিতে আত্মসমর্পণ না করবার জন্যে? না, কমলার মুখ থেকে যদি নিজের চেহারার নিন্দে হঠাৎ ক্রোধের মাথায় প্রকাশ হয়ে পড়ে কমলা যদি হঠাৎ সরল হবার সুযোগ নিয়ে বলে—ওদের সুশ্রী চেহারা ওকে আকর্ষণই করে—তাই মিশি, মিশতে ভাল লাগে—এর কদর্থ কর কেন? তখন হয়তো কমলার চরিত্র ব্যাখ্যা করা অসম্ভব নয়—কমলা অবশ্যই মানবে না, কিন্তু নিজের রূপ নেই—এ কথা তো আর কিছুতেই উড়িয়ে দেয়া যায় না। গোপনে ইঙ্গিতে কি বলা যায় না? ঘুরিয়ে, অপরের নাম দিয়ে? যেমন, একটি বিবাহিত মেয়ে—কাল্পনিক নাম, ধাম দিয়ে ওর চেয়ে অল্প বয়সি ছেলেদের—বিশেষ করে আত্মীয় ছেলেদের সঙ্গে মিশতে ভারী শখ ছিল—ওর যৌন ইচ্ছের এ এক বিকৃতি—বিকার। তারপর স্বামীর কাছে ধরা পড়ে—ডিভোর্স। একই সঙ্গে কমলা চরিত্রও পরিনামের ধমকানি—দুই দেওয়া হয়। ওদিকে বাপের বাড়ির অবস্থা এমন নয় যে থাকতে পারে না—কিন্তু ঐ বৌদির লাথি গুঁতো খেয়ে ওর মত জেদি, অহংকারী মেয়ে পারবে না। কিন্তু নরেন এসব কিছুই বলতে পারেনি। কেমন ভয় ভয় করেছে—কমলা ওদের সঙ্গে কেন মেশে তা হয়তো জানেও না—সোজা বলে দিলে হয়তো সচেতন হবে—সতর্কও হবে। এর পরে হয়তো মেশবার পুরো সুযোগ নেবে—অত্যন্ত সাবধান হয়ে। রোগীর ষ্টিচ্ করতে করতে কল্পনায় যেন হঠাৎ দেখতে পায়, সেই আনড্রেস হয়ে কমলা অল্প বয়সী ভাগনের সামনে......। যতসব। মন দিয়ে ষ্টীচ্ শেষ করে। গুম হয়ে চেম্বারে চলে যায়। রোগীর ভিড় দেখে একটু একটু ভালো বোধ করে। চেম্বার থেকে যখন ক্লান্ত হয়ে বাসায় ফেরে তখন সব আত্মগ্লানি ঝাপসা—কমলার 'পর সন্দেহ আলগা। যখন ব্যগ্র, ব্যস্ত, খুশি খুশি চোখ নিয়ে কমলা ওর সার্ট খুলতে শুরু করে—ক্লান্ত নরেন ভাবে, প্রেমে পারফেকসন খোঁজা পুরানো কুসংস্কার। অনেক সময় ভেবেছে—যখন মন শান্ত হয়ে আসে তখন ওর কি পুরানো আশাভঙ্গ ও অপমানের 'পর লোভ রয়েছে, লালসা? এতকাল যে অপমান ও অবহেলা

পেয়ে এসেছে—যে যন্ত্রণা ও আত্মগ্লানিতে মন আকৃষ্ট হয়ে থাকত—এখন মাঝে মধ্যে সেই অপমান ও যন্ত্রণার একটা ঢেউয়ে স্নান করবার জন্যে কি ওর মনে তৃষ্ণা উঁকি দেয়? কমলার একটা সামান্য বিকারকে ধরে পুরানো যন্ত্রণায় মন স্নান করবার একটু তৃপ্তি চায়? মনকে এতকাল যে বন্দি করে রেখেছিল—মন সেই বন্ধনকে ফিরে পেতে ভেতরে ভেতরে একটু ক্ষিদে বোধ করে? কিছুই আশ্চর্য নয়। নিজের চেহারা নিয়ে যে লাঞ্ছনা ও অপমান বার বার এসেছে—মন সেই কষ্টে এত অভ্যস্ত ছিল—এখন মাঝে মধ্যে কি সেই যন্ত্রণার অভাব—সেই গ্লানির ক্ষিদে বোধ করে? এতকালের অভ্যাস তো? হতে পারে। তাই না কল্পনায় মাঝে মধ্যে সেই যন্ত্রনার অভাব—সেই গ্লানিকে ক্ষিদে বোধ করে? এতকালের অভ্যাস তো? হতে পারে। তাই না কল্পনায় মাঝে মধ্যে কমলা অপরের 'পর আকৃষ্ট হচ্ছে ডাঃ ঘোষের 'পর বা ডাঃ ব্যানার্জীর 'পর—এই চিত্র কল্পনা করে কেন কমলার বস্ত্রহীন চেহারার দিকে তাকিয়ে এক পেগ হুইস্কি খেতে খেতে কেমন অযথা গুম হতে চায়? কমলা বিশ্বাসঘাতকতা করছে—এ কথা ভেবে কষ্টের বিলাস করে? অথচ কমলা তখন ওর কাছে নীরবে গভীরে দেহ লগ্ন—আদরে, চুমোয় আচ্ছন্ন। সেই আদর অপরের 'পর কমলা বর্ষণ করছে—এই ভিত্তিহীন কল্পনা বিলাসে কেন একটা গুম হয়ে যাবার দিকে ওর মুহূর্তের ঝোঁক? তাদের চোখে কমলাকে দেখে নিজের যৌন বোধ জাগানো—একটা লোভনীয় অথচ কষ্টকর বিলাস যদি শুধুমাত্র হ'ত তবে যৌন বোধ তখন কমে যেত না। তা নয় পুরানো আঘাত পাবার পিপাসা যে ওর নিজের ভাগ্যের 'পর প্রচ্ছন্ন অবিশ্বাস থেকে এসেছে তাও নয়। তাহলে মনকে তা নানা সময়েই অধিকার করে থাকত। কমলার 'পর অবিশ্বাস নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় কম ঠিকই—তবু, অবসর মুহূর্তগুলোতে কমলাকে দেখবার, পাবার মধ্যে—ওর মধ্যে মিশে যাবার আনন্দে কই কোনো সন্দেহ তো নেই? কাজের মধ্যে কমলাকে ভুলে যায়—মনে পড়লে ভালো লাগে—বাড়ি গিয়ে ও'কে দেখে ঘরের সুখ অনুভব করে। নিজের শিক্ষাও বিদ্যার আভিজাত্য ডাক্তারদের আকর্ষণ করবার চেষ্টা কমলার রয়েছে—এ চিন্তায় মনে কোনো আলোড়ন আনে না। শুধু ঐ ছোটভাই জাতীয়.....। কিছুদিন পরে তাও তো ভুলে যায়। শহরে ডাক্তার হিসেবে নরেনের প্রসার সবচেয়ে বেশি ওর মত ডিগ্রী এম. ডি. ডি. জি. ও আর কারোর নেই সার্জেন হিসেবে ওর নিখুঁত হাত শহরে স্বীকৃত।—কিন্তু মানুষ হিসেবে খ্যাতি তেমন সুবিধের নয়। ওর চেম্বারে আগে না দেখালে হাসপাতালে সিট পাওয়া শক্ত আর যারা ওর নার্সিহোমে যায়—যতটা যত্ন পায়, মনোযোগ পায়—হাসপাতালে গেলে ততটা নয়। সিজারিয়ান করবার দিকে ওর প্রবল ঝোঁক—অনেকের চোখেই পড়েছে। একই রোগীকে বেশ কিছুদিন হাতে রাখা—দু'দিনের ওষুধ দিয়ে আবার আসতে বলা—এ সব তো আছেই। কিন্তু এগুলো অধিকাংশ ডাক্তারই করে থাকেন—ওর বিরুদ্ধে অভিযোগ ঠিক এ নিয়ে নয়। ওর ফিস বেড়েই চলেছে—বাড়িতে গেলে—রাতে বিশেষ করে চার্জ সকলের চেয়ে বেশি। ওর রোগী নার্সিহোমে গেলে বেশি চার্জ দিতে হয়। টাকা সম্পর্কে ওর সুনাম নেই। তবু, অস্ত্রোপচারে ওর দক্ষতা, সুনাম, ওর রোগী কদাচিৎই বিপন্ন হয়। কঠিন ও জটিল কেসগুলো যেভাবে ভালো করেছে—গর্ভে প্রায় মৃত ছেলেকে যে ভাবে বাঁচিয়ে

দিয়েছে—তাতে শহরে নিজেকে প্রায় অবিচ্ছেদ্য ও অনিবার্য করে তুলেছে। ওর সম্পর্কে রটনা: ডাঃ গাঙ্গুলীর চিকিৎসায় ভালো হবে ঠিকই তবে শেষ পর্যন্ত বাড়ি ফিরে না খেয়ে মরতে হবে। গরিব বলে বুঝতে পারলেও নরেন খাতির করেনা। অবস্থাপন্ন হ'লে চার্জ বাড়িয়ে দিতে কুণ্ঠিত হয় না। টাকা পয়সার ব্যাপারে কাউকে খাতির নেই। কমলা একদিন রাগের মাথায় জানায়—তুমি লোককে শুষে টাকা নাও—ডাক্তাররা এ কথা রটিয়ে বেড়াচ্ছে। নিজেরা রোগী পায় না—এখন হিংসেয় জ্বলছে। নরেন হাসে—হ্যাঁ, আমার চার্জ বেশি। দুর্লভ জিনিসের দাম একটু বেশিই হয়। আমার আত্মবিশ্বাস আছে—তাই ফিস বাড়াচ্ছি। রোগীদের তো বাড়ি থেকে ডেকে আনচিনে। তারাই তো এত 'কল বুক' করে রাখে—সামলাতে হিমসিম খেতে হয়। তবু, আমার সময় জ্ঞান রাতে বিরাতে নিজের দিকে তাকাবার অবকাশ পাই কই? নিজের দিকে তাকাবার মত চেহারা আমার নয়—তবু, মজা লাগে—আমাকে একটু দেখবার জন্যে লোকে ব্যাকুল হয়ে অপেক্ষা করে। এই চেহারাকেও দামি করে রেখেছি—সোজা কথা! কমলার তখনও রাগ ছাড়েনি—হিংসে, হিংসে। নিজেরা হা পিত্যিস করে বসে থাকেন—মেয়েদের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকেন—কবে ওদের পেটে সন্তান এলে তখন মেডিকেল চেক-আপ করবে—সিজারিয়ান করবে—সিজারিয়ান করবে? দেখো, ওদের বসে থাকতেই হবে—একদিন ঠিক বলে দেব—তোমাদের স্বামীদের হাতে যারা সিজারিয়ান করবে—এখন তারা কিন্ডার গার্ডেনে। একটু অপেক্ষা কর। শয়তানের দল—কুৎসা রটানো ছাড়া আর কিছু জানে না। অথচ এই টাকা পয়সা সম্পর্কে নরেনের একটুও মোহ নেই। সব এনে কমলাকে দিয়ে দেয়। খাবার দিকে, পোষাকের দিকে, নেশার দিকে কোনো আকর্ষণ নেই। হাজার টাকা যাওয়াতে ওর কিছু বিশেষ লাগেনি। কমলার 'পর ক্ষুব্ধ হয়েছিল—সন্দেহ হয়েছিল দ্বিজু হাতছাড়া হবার জন্যেই হয়তো কান্না-বলা যায়না? তাই দ্বিজুকে শাস্তি দিতে চায় যেন কমলার এই বিকারকে শাসন করবার জন্যে। দ্বিজুর শাস্তির ভেতর দিয়ে যেন কমলাকে বোঝানো—এদের সঙ্গে মেশবার পরিণামে—এদের কি অবস্থা তুমি করলে—বোঝ? আজ দ্বিজু শাস্তি পাচ্ছে—কারণ-তুমিই প্রশ্রয় দিয়ে ওকে শাস্তির মুখে ঠেলে দিয়েছ বলেই। দ্বিজুর পরিণামের জন্যে তুমি দায়ী। নরেন জানায়—যত ফিসই বাড়াই, রোগী আসবেই—সকলেই কিছু কিছু রোগী পাবে—আজকাল পাবলিক খুব মেডিক্যাল—মাইন্ডেড-হসপিটাল মাইন্ডেড। পাঁচ হাত ঘুরে যে রোগী আসে—সে আর কখনও অন্য ডাক্তারদের কাছে যাবে না। যাদের টাকা আছে—সোজা আমার কাছেই আসবে। যদি বেশি টাকা বুঝে আবার ফিরে অন্যের কাছও যায়—ঠিক আবার চলে আসবে। ওদের আসতেই হবে। এই চেহারার আকর্ষণ থেকে মুক্তি পাওযা কঠিন। এবার কমলা হেসে বলে—আমি বিনি পয়সায়ই সেটা জানি। দু'হাত কমলার কাঁধে রেখে বলে—তোমার মত ফিস কেউ দেয়নি—দিতেও পারবেনা। কমলা জানায়—ফিস ফিস করে বল, পাশের ঘরে তোমার ছেলে—দেখলেই এক্ষুনি কিছু একটা ছুতো করে আমাকে ডেকে নেবে—নয়তো কিছু ভেঙে আমাদের দু'জনকেই ওখানে নিয়ে যাবে। দেখ, তুমি ছেলে মেয়েকে একদম শাসন কর না? আমি চড়চাপড় মারি-চড়চাপড় যে খাচ্ছেই- কিন্তু আমাকে মানে না। তুমি একটু যদি শাসন কর। নরেন হেসে বলে—

আমি তো শোষণ করি—এই বদনাম—তার 'পর আবার শাসন! এবার হাত কাঁধ থেকে নামিয়ে বলে- আমি কাউকেই শাসন করি না—পারি না। যাকগে, রোগী আসবেই—সাধারণ লোকের হাতে টাকা এসেছে- আগে সাধারণ লোকের হাতে এত টাকা ছিল না। খরচ করতে পারত না। আর ডাক্তার—হাসপাতাল—ইনজেকশন-এগুলোর 'পর ভয়ও ছিল। এখন ভক্তি বিশ্বাস। ভয় থেকেই তো ভক্তি। তোমার দাদা থাকলে কথাটা এপ্রিসিয়েট করতেন।

নরেন বাবা মা'র একমাত্র সন্তান। কিন্তু নরেনের জন্মের পাঁচ বছর আগে ওর বাবা মা'র একটি ছেলে হয়। ছেলেটি সুশ্রী ছিল। তা ছিল। নরেন ফটো দেখেছে। ওর বাবা মা'র মতই সুশ্রী। ছ'বছর বয়সে জলে ডুবে মারা যায়। কি ক'রে একা পুকুরে গিয়েছিল কেউ জানে না। খোঁজ যখন পড়ল—তখন সব শেষ। নরেনের তখন মাত্র এক বছর বয়েস। মা শোক সামলাতে শেষ দিন পর্যন্ত পারেনি। বাবা শুধু চুপ হয়ে যেতেন। বড় ছেলের কথা উঠলেই মা'র চোখে জল ভেসে উঠত—বাবা চুপ। তবু, বড় ছেলের চেহারার খ্যাতি মা চিরকাল করতেন। কমলার কাছেও করেছেন। নরেন দেখতে কারো মত হয়নি। রঙ কালো—চোখ ছোট—ঠোঁট বেজায় পুরু-খুব একটা লম্বাও নয়। তবে বেঁটেও নয়—মাঝারি। মাথায় চুল অল্পই বরাবর। মুখটা গোল। গাল দুটোও ফুলো তাই চোখ দুটো আরো বেশি ছোট লাগে। তবে চোখ খুব চকচকে—দাঁতও। নাক কিছুটা বোঁচা। কপাল খুব চওড়া। ছেলেবেলা থেকে দাদার রূপের খ্যাতি শুনেই বড় হয়েছে। ওর মনে হ'ত—মা যেন বোঝাতে চাইতেন—এই ছেলেকে দেখে আমার বড় ছেলের চেহারা অনুমানও করতে পারবে না—কি চেহারা ছিল—সোনার কার্তিক সেই ছেলে জলে ভেসে গেল। ওর অনেক সময় মনে হত, সেই সময় মা ওকে নিয়ে ব্যস্ত না থাকলে হয়ত ওর দাদা মরতেন না। ওর দিকে নজর দিয়ে বড় ছেলেকে হারিয়েছেন—এমন একটা অপরাধবোধ যেন মা'র মধ্যে ছিল। নরেন ভাবতে শুরু করেছিল-ও জন্মেছিল বলেই দাদা মরল। একটু বেশি বয়সে—আট নয় বছরে নরেন যেন উপলব্ধি করত—ওর জন্মানো ঠিক হয়নি। দাদাকে খাবার জন্যেই ওর জন্ম। কেন যেন নিজেকে অপরাধী মনে হত। ও যে দাদার স্থান পূরণ করতে পারবেনা—আর না পেরেও দিব্যি বেঁচে থাকবে এ যেন ঠিক হচ্ছে না। কত সময় দীঘির ধরে চুপ করে বসত-মনে হত—ঐ দীঘির জলে কি ওর কবর রচনা হতে পারেনা। পারা সম্ভবও ছিলনা। বাবা অতি অল্প বয়সে ওকে সাঁতার শিখিয়ে দিয়েছিলেন। আট নয় বছরে সাঁতার কাটতে কাটতে কত সময় নরেন আত্মহত্যার মহড়া দিত—হাত পা ছেড়ে দিয়ে চুপ করে ডুবে যাবার চেষ্টা। কিন্তু একটু দমবন্ধ হতেই সাঁতার কাটতে শুরু করে ভাবত দাদা কি কষ্টই না পেয়েছিল—তখন যেন দাদার 'পর সহানুভূতি বোধ করত। ক্ষোভও তীব্রতা হারিয়ে ফেলত কিছুক্ষণের জন্যে। দাদা যে ঘাটে ডুবেছে—সমস্ত জায়গাটা সাঁতার কেটে আবার ঘাটে উঠে কেমন একটা জয়ের আনন্দে শরীর হাল্কা ও স্নিগ্ধ হয়ে যেত। ও মনে না করে পারত না বাবা মা ওর চেহারা নিয়ে লজ্জিত ও বিব্রত। ওর এমন চেহারা না হলেই যেন বাবা মা খুশি হতেন। ওর পড়াশুনা নিয়ে বাবা-মার গর্ব ছিল—সেই সন্তানের

গর্বে গর্বিত হবার সময় নরেন যেন সেখানে না থাকলেই ভালো। ছেলেবেলায় একটা কথা বারবারই ঝাপসা ঝাপসা হয়ে চেতনায় ঘুর ঘুর করত—বাবা মা ওর জন্যে যত বেশি উদবিগ্ন, দুশ্চিন্তিত—তত আদর ও প্রশ্রয় ছিল না। চোখের আড়াল হলে মা ব্যস্ত হয়ে পড়তেন—কাছে এলে বকাঝকা। মা'কে চিন্তায় রাখাই যে ওর একমাত্র কাজ—এই তিরস্কার শুনতে শুনতে কান ঝালাপালা। নরেনও যে দাদার মতই একদিন মাকে শাস্তি দেবে—এই ভয়ে যেন তিনি ব্যাকুল হয়ে থাকতেন। কাছে দেখে আশ্বস্ত হয়ে এতক্ষণ দুশ্চিন্তা ভোগের কষ্ট বকাঝকার মধ্যে দিয়ে প্রকাশ করেন। সমস্ত ছেলেবেলাটাই যেন মা'র উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা আর দুশ্চিন্তার লোহার শিকলে নরেন বাধা ছিল। না ছিল কোন স্বাধীনতা—না ছিল একমাত্র ছেলে হবার আদর, প্রশ্রয়। বাবা রাশভারী লোক। যমের মত ভয় ছিল বাবাকে। বারবার ঘুরে যেতেন নরেনের পড়ার ঘরের পাশ দিয়ে ঠিক মত পড়াশুনা হচ্ছে কিনা। বাবাও ডাক্তার ছিলেন—জায়গা জমিও কম নয়। পুরানো পৈতৃক বাড়ি সংস্কার করে তিনি বাড়িখানাকে আধুনিক করে তুলেছিলেন অনেকটা। নিজের দেশেই চিকিৎসা করতেন। ডাক্তার হিসেবে নামও মন্দ ছিল না। সব দিক মিলে আয়ও প্রচুর। বাবার কাছে কিছু চাইতে নরেনের সাহস কখনও হয়নি—হাত খরচ মা-ই দিতেন। কিন্তু টাকা কড়ি সব বাবার কাছে। তবু নরেনের ছেলেবেলায় মা-ই যখন যা চাইত দিয়ে দিতেন—অক্লেশে। বাবার নির্দেশ অনুযায়ী খাওয়া দাওয়া হ'ত—অস্বাস্থ্যকর কোনো ভাজা ইত্যাদি নরেনের খাদ্য তালিকা থেকে বাদ। বাবার সামনে দাঁড়িয়ে দুধ খেতে হত। দুধ দু'চোক্ষে দেখতে পারত না—তাই পড়ার ঘরে ক'বার দুধ ফেলে দেবার পর—বা চাকরদের দিয়ে দেবার পর—যখন বাবার কানে কথাটা উঠল—তখন থেকে তিনি ছেলেকে খাঁটি গরুর দুধ নিজে দাঁড়িয়ে থেকে খাওয়াবার দায়িত্ব নিলেন। চুপচাপ দুধ খেয়ে আবার পড়ার টেবিলে। মাষ্টার প্রথম দিকে একজন—শেষ দিকে দু'জন। ছেলেকে মানুষ করবার দিকে বাবার যত নজর ছিল, ভাবনা ছিল নরেনের সে সময় মনে হত—অত হয়তো ভালবাসা ছিল না। যত দায় ছিল, দায়িত্ব ছিল—তত যেন সদয় ছিলেন না। শাসন ছিল—স্নেহ কই? নরেন টাকাকড়ির দিকে ঐ বয়সে যত স্বচ্ছল ছিল—স্বাধীনতা ছিল না একেবারেই। একেবারে রুটিন বাঁধা জীবন দাদার অপমৃত্যুর স্মৃতি-আর নরেনের ক্ষেত্রে তা যেন না ঘটে সেই দুর্ভাবনায় মা এত ব্যাকুল থাকতেন, তাতে নরেনের মা'র কাছ ছাড়া হবার সাহস ছিল না। নরেন ঘরে থাকলে—চোখে চোখে থাকে—মা নিশ্চিন্ত। উৎকণ্ঠায় যেন মা'র স্নেহ, প্রশ্রয় সব কিছু ঢাকা পড়ে গিয়েছিল। বাবা-মা'র সঙ্গে পুরী, ওয়ালটেয়ার, কাশী, মথুরা বৃন্দাবন কত জায়গায় ঘুরেছে—কিন্তু বাবার ভয়ে কাঁচুমাচু হয়ে থেকেছে। যাবার আনন্দ হ'ত ঠিকই কিন্তু প্রথমবার যাবার পর মনে হত বাবা-মা ওকে যদি না নিয়ে রেখে যায় তবে বেশ স্বাধীন হতে পারে। ক'দিন স্বাধীনভাবে কোথাও একটু ছটফট করবার উপায় নেই। কিছু কিনতে ইচ্ছে হলেও বলতে সাহস হত না। বাবা মা কখনই জিজ্ঞেস করতেন না—হ্যাঁরে এটা নিবি। তাদের যা পছন্দ তাই কিনে দিতেন। তা যে খারাপ ছিল তা নয়—তবু, বাবা-মা'র দেওয়া বলে সানন্দে নিতে পারত না। কোনো মমতা বোধ করত না। । ক্লাস নাইনে হঠাৎ নরেন গায়ত্রী জপ করা ছেড়ে দিল। .....একজন

মাষ্টার মশায় ওকে বোঝালেন, ধর্ম শিক্ষা, সংস্কৃতি এগুলো সব নির্ভর করে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার 'পর, ভোগ্যপন্য বণ্টন ব্যবস্থার 'পর। নরেন কি বুঝল আজ নরেনের তা মনে নেই। পাঠ্যপুস্তকের বাইরে অন্য কোনো বইয়ের দিকে অত নজরও ছিল না—ইচ্ছেও ছিল না। রেজাল্ট ভালো করা ওর ধ্যানজ্ঞান।.....বাবার কানে কথাটা যেতেই তিনি ডেকে পাঠালেন—আগামীকাল থেকে সকালে গায়েত্রীমন্ত্র পাঠ করে পড়াশুনা শুরু করবে। নরেন মাথা নেড়ে জানাল—পারবনা। তিনি একদৃষ্টিতে ছেলের দিকে তাকিয়ে রইলেন। নরেনও মাথা নিচু করে। একটু পরে— কেন? —আমি না বুঝে মুখস্থ করি না। ধর্মও না বুঝে করতে পারব না। —গায়েত্রীর অর্থ যদি তোমাকে বুঝিয়ে দেওয়া হয়.....। —আমার আগামী বছর স্কুলফাইনাল, এখন অন্য দিকে মন দিতে পারব না। .....মা বিস্তর বকাঝকা করে নরেনের এই ব্যবহারের জন্যে শান্তি স্বস্ত্যয়নের বিরাট আয়োজন করলেন। আরেকবার, তখন কলেজে পড়ে, বাবা ডেকে বললেন—তোমার মা ও আমি দীক্ষা নিচ্ছি, তুমি ইচ্ছে করলে আমাদের সঙ্গে.....। নরেন রাজি হয়নি। এরকম তাত্ত্বিক বিদ্রোহ ছাড়া আর কিছু করতে সাহস হয়নি। প্রতিবাদ ঐ পর্যন্তই।

স্কুলের ছেলেরা ওকে ডাকত 'মোটা' বলে। কেউ কেউ 'গদাই'। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ঐ মোটা নামটাই চালু হয়ে গেল। অপরের সঙ্গে ভাব করতে ওর কি দারুণ ইচ্ছে হ'ত—কেউ একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু। কিন্তু যাকে চিনে বাদাম খাইয়ে—তেলেভাজা—মিষ্টি খাইয়ে আপন করতে চেয়েছে—মনের কথা বলেছে—সে অনায়াসে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। হয়তো কোনো মাষ্টারমশায়ের ব্যবহার সম্পর্কে, কি নিজের পরাধীনতা সম্পর্কে....পরে শুনতে পেয়েছে—কথাটা মাষ্টারমশায়ের কানে উঠেছে। নিজের নিঃসঙ্গতার অর্থ হয়েছে—ওকে বাড়িতে খুব ঠেঙায়। তাছাড়া, অব্রাহ্মণ ছেলে ওর ক্লাসে ছিল বেশি ওকে ক্ষেপাত 'মোটা বাম্‌না' বলে। ব্রাহ্মণদের 'পর তীব্র বিদ্বেষ যেন প্রতিপদে নরেন অনুভব করত। অথচ ওযে নিজেও জাতিভেদ মানে না—এ জেনেও ওকে ওরা দলে নেবে না। তাছাড়া অর্থবান ঘরের ছেলে বলেও কেউ ওকে আপন করেনি। অথচ ওর পয়সায় খেতে সবাই ব্যগ্র। ও অক্লেশে সবাইকে খাওয়াতো—সবাই আগ্রহে খেত। কিন্তু খাবার 'পরই ওর 'পর আকর্ষণ উড়ে যেত। ও বুঝত, ওর খাতির পয়সার জন্যে—ও কারো আপন নয়। সুন্দর ছেলেদের সঙ্গে কত ভাব করতে চেয়েছে—কেউ ওর দিকে তাকায়নি, তাকায়নি মানে বন্ধু হয়নি—শুধু ওরটা খেয়েছে। ক্লাসে সেরা হলেও মাষ্টারমশায়েরা সুন্দর ছেলেদের অনেক বেশি পছন্দ করতেন। বড়লোক বলে যেন মাষ্টারমশায়েরাও ওকে সুচক্ষে দেখতেন না। ও যে ক্লাসে ফার্ষ্ট সেকেন্ড হয়—তা নিতান্ত খাটুনির জোরে, পরিশ্রমে—মাথায় তেমন কিছু নেই—কিন্তু অমুক ছেলেটা যদি একটু খাটত—মাথা ছিল। তা ছাড়া বাবা স্কুলের সেক্রেটারী—তাও ওর ফার্ষ্ট সেকেন্ড হবার পেছনে কাজ করছে—এমন কথা কৌশলে মাষ্টারমশায়রাও ছড়িয়েছেন। তারা রাজনীতি করতেন। কেন 'মোটাকে' আনতে পারেননি- সেই রাগ বরাবর। ক্লাস নাইন থেকে টেনে উঠবার সময় যখন ফার্ষ্ট হল—তখন হঠাৎ কি করে রটে গেল—যে দু'জন মাষ্টার মশায় ওকে পড়ান—তারা নাকি প্রশ্ন বলে দিয়েছেন। তার ফলেই.....। ঘরে লুকিয়ে লুকিয়ে নরেন সেদিন কান্নায় ভেঙে পড়েছিল। কেউ

ওর বন্ধু নেই—কিন্তু শত্রু অনেক, অযথা। ও ব্রাহ্মণ - ও কি করবে- ও তো গায়ত্রী ছেড়ে দিয়েছে। ওর বাবার টাকা আছে—তাতে ওর 'পর রাগ কেন? ও দেখতে ভালো নয়—এ'তে ওর হাত কোথায়? অথচ ওর পয়সায় খেতে সবার আগ্রহ—ভাবখানা, বোকা পেয়ে লুঠেপুঠে নিচ্ছি, মাষ্টাররা বাবার কাছে অহরহ আসতেন, নরেনের প্রশংসা করে বিনি পয়সায় চিকিৎসা করাতেন গোষ্ঠীশুদ্ধ সবার, আর নরেনকে অবহেলা করতেন সবার সামনে। শুনতে শুনতে কান ঝালাপালা, বাবার জন্যেই নরেনের রেজাল্ট এত ভালো—মাষ্টাররা সুবিধে পাবার জন্যে ওকে বেশি নম্বর দিত। স্কুলের সেক্রেটারীর ছেলে বলেই নরেন এ রকম পরীক্ষার ফল করতে পারছে। যে বাবা, যে বংশ, পরিবারের জন্যে নরেনের এত লাঞ্ছনা—সেই বাবা একটুও প্রশ্রয় দেননা, তাঁর শাসনের ভয়ে 'টুঁ' শব্দটি করা যায় না—একদিন ডেকে একটু কাছেও নেননি। বাবার সামনে চুপ করে বসে থাকা এক শাস্তি। ক্ষোভ, বেদনা, নিজের চেহারার জন্যে গ্লানি আর কেবল একলা থেকে থেকে স্কুল ফাইনাল পর্যন্ত নরেনের কেটেছে। স্কুল ফাইনালের রেজাল্ট নরেনেরই সেরা হ'ল। তিনটে লেটার নিয় ডিষ্ট্রিক্ট স্কলারশিপ পেল। রেজাল্ট বের হবার পর বাবা ডেকে বললেন—যাও, মাষ্টার মশাইয়দের প্রণাম করে এস। নরেন বল্ল—মাষ্টার মশায়রা খুশি হবেন না। তবু নরেন গেল—বাবাকে অগ্রাহ্য হয়তো আজ করতে পারত—কিন্তু ওর ঐ 'মোটা'ই স্কুলের নাম রেখেছে। হেড মাষ্টারমশায় জিজ্ঞেস করলেন—কোথায় পড়বে—কলকাতায়? দেখি বাবা কি করেন। ওকে স্কুলে ঢুকতে' মাষ্টারমশায়রা আগেই দেখেছিলেন—ও যখন এসে প্রণাম শুরু করল তখন একজন বোঝাচ্ছিল—যা শিক্ষা ব্যবস্থা, এতে ভালো ছেলেরা—পড়ুয়া ছেলেরা—কখনও ষ্ট্যান্ড করতে পারে না। প্রশ্ন কমন পড়ল তো কেল্লা ফতে, নইলে.....। আর একজন নরেনকে জানাল-বিরাট একটা ভোজ হবে তো—আমাদের নেমতন্ন কবে? অর্থাৎ এমন রেজাল্ট করায় ওর চৌদ্দ পুরুষ কৃতার্থ হয়ে জয়ঢাক পিটোবে- এই এর ব্যঞ্জনা। কিছু না বলে নরেন বিদায় নিল। মোটা—মোটা—আজও স্বপ্নে যেন নিজের সেই ছেলেবেলাকার চেহারা দেখে। কেউ পছন্দ করেনি—এমন একটি দেহ ওর আপন ছিল—ওরই কি ভালো লাগত? নিজেকে?

মামা মাসী ছিল অগুনতি। মা'র ভাই-বোন অনেক। দেখতে সবাই সুশ্রী। কিন্তু ও বুঝতে পেরেছিল—একমাত্র ছেলে বলে সবাই ওকে হিংসে করতো। মা ছিলেন ভাইবোনদের মধ্যে বড়। মামারা এসে বার বার মা'কে বলতো—দেখ, একমাত্র ছেলে, বিগড়ে না যায়। ওর পড়াশুনার মন—ওর পরীক্ষার ফল যখন মা গর্ব করে বলতেন, তখন মামারা জানাতেন, এখন ছেলেমানুষ—বড় হোক—এখন নীচু ক্লাসে ভালো রেজাল্ট কিছু নয়। বড় হলে- টাকাপয়সা নাড়াচাড়া করলে-তখন যদি মাথা ঠিক থাকে- বুদ্ধিশুদ্ধি যদি ঠিক থাকে। বড় মামা বলতেন, তেরো থেকে ষোলো-ছেলেদের একটা বড় পরিবর্তন হয়—হয় বকে যায়, নয়তো ব্রিলিয়ান্ট হয়। খুব কেয়ারফুল এই বয়সটাতে। গায়ত্রী ছেড়েছে—লক্ষণ ভালো নয়। ওযে দেখতে ভালো নয়—এ'তে যেন মামা মামীর পঙ্গপাল খুশিই ছিল। নিজেদের ছেলেদের রূপ গুণের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। এক এক সময় মাও যেন মামা মামীদের 'পর বিরক্ত হয়ে উঠতেন। ঝিদের সঙ্গে—

বামুনদিদের সঙ্গে আলাপ আলোচনায় মন্তব্য করতেন—নরেনকে কেউ সুচক্ষে দেখে না। ওকে ডেকে কেউ একটু আদর করে না। কেউ কিছু ওর হাতে দেয় না। .....নরেন নিজের ঘরে থাকত—মামাদের দলবল এলে দেখা করতেও যেত না। ডাকলে গিয়ে প্রণাম সেরে আসত। ভালো রেজাল্ট হয়েছে। বেশ, বেশ। ভাল রেজাল্ট যদি চালিয়ে যেতে পার—তবেই বুঝব কিছু একটা করলে। কোনো কোনো মামা আরো উচ্চস্তরে যেতেন—দেখ, ভালো রেজাল্ট বড় কথা নয়। জীবনে কিছু কর। তোমার এত সুবিধে। আমরা তো সুযোগ সুবিধে পেলাম না। তোমাদের এত সুযোগ। একমাত্র ছেলে আদরে আবদারে বড্ড নাই—পাওয়া হয়ে যায়—প্যামপার্ড ছেলে হয়। বড় কিছু কর। মা জানাতেন, কখনও কিছু চায় না। জোর করে না খাওয়ালে খেতেও চায় না। দুধ খাওয়ানো তো ওকে বাবা একটা কাজ। আদর আবদার আর করল কই? যেতে যেতে নরেন শুনতে পায়, মামার মন্তব্য—ছেলের সামনে ছেলের প্রশংসা করনা—ওতে প্রতিযোগিতার ইচ্ছে চলে যায়। উন্নতির আকাঙ্ক্ষা কমে আসে। অহংকার বাড়ে। এমনিতেই একটু অহংকারী কিন্তু হয়ে উঠেছে। ঘরে এসে নরেনের চোখে জল আসে, অহংকারী। অবহেলায় অবহেলায় শাসনে শাসনে ও আজ একঘরে, চাপা স্বভাবের—ওকে মুখ খুলতে না দিয়ে বোবা করে রেখে সবাই বলছে, চাপা স্বভাব। আর চাপা স্বভাব কিনা অহংকার। কেন মামা মাসীদের এত রাগ? মা'র মনোযোগ কেড়ে নিচ্ছে বলে মামাদের মামীদের এত ক্ষোভ? তাদের ছেলেমেয়েদের তুলনায় এই হাবাগোবা ছেলেটাকে পেয়ে মা যে ধন্য হয়ে গেছে—ওদের রূপবান ছেলেদের দিকে তাকাচ্ছে না—হিংসে সেই জন্যে? মামারা অনেক টাকা পয়সা মা'র কাছ থেকে নিতেন। বাবা সব জানতেনওনা। কিন্তু কিছু কি জানতেন না। হয়তো সবই জানতেন। তাই উইলে সব বিষয় সম্পত্তি নরেনকেই দিয়ে দিয়েছিলেন। পাছে মামাদের পাল্লায় পড়ে মা সম্পত্তির কিছু নষ্ট করেন। মামীর মেয়েরা বড়। প্রায় ওর কাছাকাছি বয়েস। ওদের সঙ্গে মিশবার একটা প্রবল আগ্রহ ছিল। ওদের তরফে আগ্রহের অভাব বুঝতে পারবার সঙ্গে সঙ্গে নরেন মেলামেশার আশা ছেড়ে দিল। নরেনও অবহেলা শুরু করল। ওরা এসেই ওদের মফঃস্বল শহরকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করত—গ্রামের স্কুলের ফার্স্টবয় তো ওদের কলকাতার স্কুলের থার্ড ডিভিসনেও যেতে পারে না। নরেন গুম হয়ে উঠত। এখানকার হলে মানুষ আবার সিনেমা দেখে—কি বই হচ্ছেরে এখানে? নরেন জানায়—বাবার নিষেধ সিনেমা দেখা। ষোলো বছর না হলে সিনেমা দেখতে দেবে না। তুই একটাও দেখিস নে? তোকে তো শহরে গেলে উজবুক বলবে। নরেন নিজের ঘরে চলে আসে। ওদের চোখে ভাইর স্নেহ-আপনজনের মমতা কিছু নেই। একজন বোন—ওর চেয়ে বছর তিনেকের ছোট—বলে—নরেনদা লাসখানা যা করেছে। সবাই হেসে ওঠে। এই—এভাবে বলতে নেই। একজন হাসতে হাসতে নিষেধ করে। একজন মন্তব্য করে—ওরে নিগ্রো, যাবি সিনেমায়। মেসোকে বলে রাজি করাব। নরেন রাজি হয় না। যদিও ইচ্ছে ছিল—ওদের সঙ্গে বসে। একটু স্পর্শ পায়। ছেলেরাও দেখুক, ওর সঙ্গে সুন্দরী মেয়েরা সিনেমায় যায়। কিন্তু তারপর? ওর চরিত্র নিয়ে ছেলেরা ক্ষেপাতে শুরু করবে। আরেক কাণ্ড হবে। নরেনের বাবার নিষেধ ছিল সিনেমা দেখতে পারবে না ষোলো বছরের আগে।

কিন্তু নরেন স্কুল পালিয়ে কিছু সিনেমা দেখেছে। সঙ্গে কাউকে বিশ্বাস করে নেয়নি। থার্ড ক্লাসে ভিড়ের মধ্যে বসে দেখেছে। বুক ঢিপ ঢিপ করতে করতে বাসায় এসেছে। মা'কে জানিয়ে গেছে-একটা ছেলের বাড়িতে ওকে কিছু অঙ্ক শেখাতে যাবে—সন্ধ্যার সময় ফিরবে? মা গনগন করতেন—নিজে দিগ্‌গজ হয়েছে। মাষ্টারী করতে যাবেন। কিন্তু মনে হ'ল মা খুশি হয়েছেন। —বিকেলে কি ওখানে পোলাও মাংস খেতে দেবে?—তা কি করে দেবে? টাকার অভাবে মাষ্টার রাখতে পারেনা—খেতে দেবে হয়তো রুটি আর গুড়? আমি তাই খাব—নইলে ভাববে গরীব বলে ঘেন্না করছি। মা যেন সন্তুষ্ট হন। তবু চিন্তিত হয়ে বলেন—তোর থেকে শিখে যদি তোর চেয়ে এগিয়ে যায়? মাথা খারাপ—এমনি অঙ্কই পারেনা—পাশ করতে পারবে কিনা সন্দেহ। আটঘাট বেধেই যেতে হ'ত—শহরে ওকে—ওর বাবাকে এত চেনে। তবু, বাড়ি ফেরবার সময় এত ভয় করতো। মাকে ঠকিয়েছে ভেবে ভারী আনন্দ হত। আর ছেলের দয়াধম্ম নিয়ে বাবার কাছেও গর্ব করতেন। যেদিন রেজাল্ট বের হল—তখনও ষোল বছর হ'তে ক'দিন বাকী। বাবা ডেকে বল্লেন—আজ সিনেমায় যাও—ফার্স্ট ক্লাসে যেও। থার্ড ক্লাসে গেলে লোকে তোমাকে আমাকে দু'জনকেই নিন্দে করবে। এতদিন পালিয়ে পালিয়ে থার্ড ক্লাসে গেছ—এবার যখন ইচ্ছে যেও—ফার্স্ট ক্লাসেই যাবে। বুঝতে পেরেছিল—হয়তো সিনেমার মালিক না হয় আর কেউ বলে দিয়েছে বাবাকে। তবে বাবা শাসন করেনি কেন? এত মোটা চেহারা নিয়ে লুকিয়ে কিছু করা সত্যিই অসম্ভব। নিজের চেহারাই ওকে বার বার ধরিয়ে দেবে।

খেলাধুলাও ওর কপালে ছিল না। গোড়ার দিকে বেশ ভালো খেলোয়াড় ছিল। কিন্তু বাবা আপত্তি করেননি—কিন্তু মতও যেন ছিল না। একটা ম্যাচে খেলে ওর বেশ নাম হয়। কিন্তু আরেকটি ম্যাচে গোল দেবার সময় হঠাৎ একজন বিশ্রীভাবে ওকে ফাউল করে। সঙ্গে সঙ্গে নরেন একটা ঘুঁষিতে ওর নাক ভেঙে দেয়। তখন দলের আর সবাই একসঙ্গে নরেনকে আক্রমণ চালায়। ক'জন নরেনের হাতে বেশ ঘায়েল হয়—নরেনও বেশ মার খায়। শেষ পর্যন্ত ওর দলের বন্ধুরা এসে থামিয়ে দেয়। বাবা সেদিন থেকে খেলা বন্ধ করে দেন। বলেন—লেখাপড়া আর খেলা এক সঙ্গে চলতে পারেনা। নরেন গুম হয়ে ভাবত—সেদিন যদি ওর দলের লেকেরাও ওদের পাল্টা আক্রমণ করত—কিন্তু আর কাউকে করলে হয় সবাই এগিয়ে....ওর জন্যে কে আসবে? অন্যপাড়ার এক ওভারসিয়ারের মেয়েকে মা'র ভারী পছন্দ। বছর দুই ছোট হবে নরেনের চেয়ে। দু'জনের মা ঠিক করেছিলেন—ওদের বিয়ে দেবেন। নরেন দূর থেকে মেয়েটিকে দেখেছে। ভারী ছটফটে সুন্দরী। কতকি কল্পনা করত জ্যামিতির একস্ট্রা করতে করতে। কিন্তু মেয়েটি ওদের বাড়িতে ও'কে দেখে যে কী পরিমাণ আশাভঙ্গ হয়েছিল—ওর চোখমুখ দেখে নরেনের মা'রও তা বুঝতে বাকি ছিলনা। তিনি অবশ্য খুব একটা গ্রাহ্য করেননি। বলেছেন—ছেলেদের আবার রূপ। সোনার আংটি বাঁকা হয় না। তবুও আশাভঙ্গ দেখে নরেন দমে গেলেও, চুপসে গেলেও, আশা ছাড়েনি। পরে জানতে পারল—আর একটি কলেজের ছেলের সঙ্গে ওর পত্রচর্চা চলছে।

খেলা, সিনেমা, ছেলেদের বন্ধুত্ব, নারীর সঙ্গ সব কিছু থেকে বঞ্চিত হয়ে নরেন

শুধু পাঠ্য বইয়ের উত্তর কত ভালো করে লেখা যায়—সেই পাঠ্য বইয়ের জন্যে যা যা বই পড়া দরকার—তা মুখস্থ করছে। মনে মনে ঠিক করেছে—এর প্রতিশোধ নেবে। এই অবহেলার শোধ নেবে। আজ নরেন বোঝে এ সব থেকে বঞ্চিত হয়ে যেটা সব চেয়ে বেশি ক্ষতি হয়েছে—তা সূক্ষ্মতর বোধশক্তির উন্মেষ না হওয়া। আজ খেলাধুলায় ওর আকর্ষণ নেই, গল্প-উপন্যাস পড়ে না—পড়লেও আনন্দ পায় না—গান একটুখানি শুনেই অন্যমনস্ক হয়—সিনেমার আবেদনও নেই—ছবি বা চিত্রশিল্প তো দূরের কথা। কোনো সূক্ষ্মবোধ—শিল্প চেতনা ওর মধ্যে নেই। জন্মায়নি। অথচ একজন সংস্কৃতিবান মানুষ হিসেবে সবই ওর ঘরে আছে—কিন্তু ওর তাতে আনন্দ নেই। আর আনন্দ যে পায় না তা নিয়ে মাথাব্যথাও নেই। .....একটু নির্জলা একাদশীর মধ্যে ওর স্কুলজীবন কেটেছে। এই বয়সে ছেলেদের যে সব যৌন অভ্যাস দেখা যায়—ও তার কিছুই জানত না। অথচ অটুট স্বাস্থ্য। এক এক সময় যন্ত্রণায় এপাশ ওপাশ করেছে। কবে শহর ছাড়বে—কবে কলেজে—বিয়ে....সম্ভব?

স্কুল ফাইনাল পরীক্ষার পর মফঃস্বল কলেজ? না, কলকাতার কলেজ? মা কাছছাড়া করতে চান না। কিন্তু এবার নরেন যেন জোর পেয়েছে। জানাল, কলকাতা। বাবা রাজি হলেন। ডাক্তারী পড়বে, তা তো আগে থেকেই স্থির করা। তবে ইন্টার মিডিয়েট ও কলকাতাতেই। কোথায় থাকব—মামা বাড়ি? ওদের অবস্থা ভালো নয়—খাবার দাবার স্ট্যান্ডার্ড উঁচু নয়—ওর শরীর খারাপ হ'তে পারে। মামীদের অবস্থা খারাপ নয়। কিন্তু স্ত্রীর সম্পর্কীয় কারো গৃহে বাবা ঠিক রাজি নন। নরেন জানাল, কলেজ হোস্টেলে থাকবে। বাবা মা তাই মেনে নিলেন। বাবা এসে প্রেসিডেন্সিতে ভর্তি করে হোস্টেলে বন্দোবস্ত করে বিদায় নিলেন। মামা মামীদের কাছে সপ্তাহে হাজিরা দিতে বললেন। আর মামাদের ও মেশোমশায়কে খবরদারি করবার জন্যে ঠিক করে গেলেন। কিন্তু মামারা এলে নরেন কিছু বিশেষ কথাবার্তা বলতো না। মেশোমশায় মানুষটি খারাপ ছিলেন না। বরং একটু স্নেহপ্রবণ। তিনি কমার্সিয়াল ফার্মের কেরানি—পারচেজ ডিপার্টমেন্টে—বেশ রোজগার। তিনি মাঝে মধ্যে খোঁজ খবর করতেন। রাজনীতি নিয়ে আলোচনাও করতেন ওর সঙ্গেও যে খুব উন্নতি করবে—এ কথা বলে বিদায় নিতেন। মামাদের বাড়িতে ও তো যেতই না। নেমতন্ন করলেও না। মেসোর বাড়িতে দু'একবার গেছে। তবে মামী—বা বোনদের ধারে কাছেও না। যতক্ষণ থাকত মেশোর সঙ্গেই বসে বসে গল্প করত মানে মেশোর কথা শুনতো। তিনি কলকাতার চেয়ে মফঃস্বল যে অনেক ভালো, পড়াশুনাও দু'চারটে কলেজ—স্কুল ছাড়া কলকাতাতে কিছুই হয় না এ কথা বারবার জানাতেন। তবে এও বলতেন, তুমি যদি কলকাতার সেরা স্কুলে পড়তে—আমার বিশ্বাস-প্রথম দশ জনের মধ্যেই থাকতে। যদিও নরেন প্রথম পঁচিশ জনের মধ্যেই ছিল। নরেনেরও তাই বিশ্বাস হয়েছিল। কলেজে ঢুকেই প্রথম যা ওর চোখে পড়ল তা হচ্ছে ছেলেমেয়েদের পোষাক, গাড়ী, স্বাধীনতা ও স্বাচ্ছন্দ্য। শহরে অবস্থাপন্নদের মধ্যেও নরেনই ছিল সেরা ঘরের ছেলে। টাকা পয়সায় ওর মত স্বচ্ছল বিশেষ কেউ ছিলনা। এখানে হরদম ছেলেমেয়েরা নিজেদের মোটরে কলেজে আসছে—আবার ছুটির পর হাসিতে খুশিতে ক্লান্তিতে বাবা বা মা'র সঙ্গে—কখনও বা ড্রাইভারের

সঙ্গে মোটরে বাড়ি ফিরে যাচ্ছে। ওর ভেতরে অর্থের অহংকার একটা ধাক্কা খেল। শুধু তাই নয়, পড়াশুনার গর্বেও আঘাত—লেটার পাওয়া, ষ্ট্যান্ড করা ছেলেও কম নয়। আর তাদের বাইরের জ্ঞান কত! কত বই পড়েছে—সে সব নামধামও নরেন জন্মে শোনেনি। তবে আশ্বাসের কথা এই, ওর মত মোটা মোটা ছেলে মেয়ে আরো আছে। এখানে কেউ কাউকে গ্রাহ্য করে না—খেয়াল করে না। সবার সঙ্গে পরিচয়ও হয় না। নরেনের স্বাস্থ্য দেখে অনেকেই তাকাল—ঐ পর্যন্ত। তা নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না। এতে মোটামুটি ভাবে নরেন স্বস্তিবোধ করলেও—ওর স্বাস্থ্যকে কেন্দ্র করে যে হাসি ঠাট্টার মধ্য দিয়ে একধরনের মনোযোগ আকর্ষণ করতো—ভেতরে ভেতরে সেই মনোযোগ ও আকর্ষণ হারিয়ে কেমন যেন একটু ক্ষুণ্ণও হ'ল। এখানে কোনো বিদ্রুপের লক্ষ্যও নয়, ব্রাহ্মন বলে বিদ্বেষের পাত্র নয়, ভালো ছেলে বলে হিংসের পাত্রও নয়। এমন বিত্ত বা পোষাক নেই যা সকলের চোখে পড়ে। নরেন আর দশজনের মধ্যে মিশে গেল। কিন্তু কেমন যেন একটা গৌণ হবার নগণ্য হবার—আমল না পাবার বেদনাও রইল। নরেন ঠিক করল, পোষাক উৎকট রকমের কিছু করবে না—ভালো কিন্তু রুচি থাকবে। দু'চার জনের পোষাক দেখল, তারপর একটা ভালো দোকানে গিয়ে পোষাক দেখল—সেই দোকানদারই ওকে দেখে পছন্দ করে ক'প্রস্থ প্যান্ট সার্ট অনেকক্ষণ বসিয়ে রেখে ফিট করে পরিয়ে আয়নায় ওকে দেখিয়ে দিল। ওর নিজেরও ভালো লাগল। ওর ভুঁড়ি যেন অনেক কম, পাজামা, ময়লা পাঞ্জাবী, কাঁধে ঝোলা, চুলে তেল না অত মোটাও লাগছে না। কলেজে আরেকদল ছেলে ছিল—যারা খোঁচা খোঁচা দাড়ি দেওয়া। এরা রাজনীতি করত—পোষ্টার লেখা, মিছিলে যাবার জন্যে ছেলে জোগাড় করা, পার্টির জন্যে চাঁদা আদায়—এমনি সব কাজে ব্যস্ত। এদের মধ্যেও দলাদলি ছিল। নরেন এদিকে বড় মিশল না। চাঁদা চাইলে দিত— কিছু বোঝাতে এলে চুপ করে শুনত। তারপর যখন ষ্টাডি ক্লাসে যেতে বলতো—যেত না।

মেসে চলত একপক্ষে দিনরাত রাজনীতি—ওরা অনেক সময় কলেজেও যেত না —সব সময় মেসে থাকতও না। ওদের দলের লোক এসে রাতও কাটিয়ে যেত। দিন রাত পোষ্টার লেখা, কোনো ঘটনার পেছনে কি আর্থিক মতলব, আমেরিকা, ভিয়েতনাম, প্রতিক্রিয়াশীল—প্রগতিশীল—অনন্ত আলোচ্য, জল্পনা কল্পনা, তর্ক, বিতর্ক, প্যামপ্লেট লেখা, পুস্তিকা বিক্রি। এবার ময়দানে জনসমাবেশে হয়েছিল, হয় দলে যোগ দাও—নয়তো তুমি নিরপেক্ষ থেকে প্রতিক্রিয়াশীলদের সাহায্য করছ। নরেন চুপচাপই থাকল। আরেক দলে চলেছে মেয়েদের আলোচনা—মেয়েরা কেমন ছেলে পছন্দ করে, কত রোল কোন রোলের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকে, সেই যে সবুজ শাড়ি—রোল ফর্টি ফাইভ—যে একটা এ্যামবেসাডারে আসে—ওকে নাকি গতকাল একটা লোকের সঙ্গে মোটরে রেড রোডে বেড়াতে দেখা গেছে—চাহনি দেখেই বোঝা গেছে—দাদা—কাকার জেনারেশন নয়। রোল সিক্সিটি ফাইভ নাকি এনগেজড্। আবার মেয়েদের সঙ্গে প্রফেসরদের জড়িয়েও আলোচনা চলে। ভিন্ন ভাবে প্রফেসরদের চরিত্রও সমালোচনা থেকে বাদ যায় না। কোন প্রফেসার বিয়ে করেননি—যাকে নাকি বিয়ে করতে চেয়েছিলেন—একজন আই.এ.এস্‌কে বিয়ে করে কেটে পড়েছে—তাই? আবার কোন

প্রফেসর নাকি স্ত্রী থাকতেও......। কোন মেয়ে কেমন সাজে—কোন মেয়ে কোন ছেলের সঙ্গে কি একটা কথা বলেছিল, সুতরাং ছেলেটিকে খাওয়াতে হবে। ওরে, একটা কথা বলাতে এত কৃতার্থ হয়েছিস, তাই খেতে চাচ্ছি। কেউ কেউ জানায়, সে দারুণ প্রেমিক-পাঁচটা মেয়ে প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে—সে কেবল খেলিয়ে বেড়াচ্ছে। কেউ কেউ আবার প্রেমপত্র দেখায়ও—আবার অন্যে বলে, ওগুলো অন্য ছেলেকে দিয়ে লিখিয়েছে—ভাষা পজিটিভলি মেয়েদের নয়। মেয়েরাই ইনিয়ে বিনিয়ে......। এ নিয়ে প্রায় মারপিঠ হবার যোগাড়। বিকেল হলেই এরা সবাই চা, জল খাবার খেয়ে সন্ধ্যায় মেয়ে দেখতে রাস্তায় বের হয়ে পড়ে। সন্ধ্যা পর্যন্ত। আর সেই সঙ্গে সিনেমার আলোচনা-উত্তম-সুচিত্রা-বিকাশ-বসন্ত। দুপুরে অনেকেই তিনটার শোতে এসে জানাবে—উঃ সুচিত্রার লভ সিনগুলো.......সত্যি। কেউ জানায়—ওটা দেখতেই ভালো—অভিনয় করে সাবিত্রী—একটা ট্যালেন্ট। মেয়ে ও সিনেমা এ পক্ষের চা আর সিগারেটের আড্ডাকে মশগুল করে রাখে। কেউ কেউ সত্যজিৎ রায়, মৃণাল সেনের নামও করে কিন্তু সকলেই সায় দেয়। ওখানেই মিটে যায়। অপরপক্ষে রাজনীতি করা ছেলেদের থিয়েটারের আলোচনায় বেশি মিনার্ভা। কল্লোল-ফেরারি ফৌজ, অঙ্গার—উঃ যাই বলিস্, অঙ্গারের লাষ্টসিন—ক্যাপিটলিষ্ট সোসাইটির দম বন্ধ করা—সাফোকেটিং এনভিরনমেন্ট-সিমপ্লি ওন্ডারফুল। কেউ কেউ জানায়—জানিস্ উৎপল দত্তের টেকনিকের দিকে ঝোকটা যেন বেশি। সবাই থামিয়ে দেয়। —মঞ্চের দুদিক ভেঙে দিল—আস্ত একটা মেলা—পাঁপড় ভাজছে—তিতাস একটি নদীর নাম যা দেখে আয় গিয়ে। এখানে নিয়মিত পড়া তৈরির তাগিদ নেই। কলেজে পড়া ধরা হয় না। মেসে কোনো কোনো ছেলে দিন রাত নানা বই পড়ছে—সংখ্যা অবশ্য খুব কম। অধিকাংশ সন্ধ্যের পর-এর ঘরে, ওর ঘরে আড্ডায়। সন্ধ্যের পর বই নিয়ে রোজকার পড়া তৈরির এতদিনকার অভ্যাস নরেন চট করে ছাড়তে পারল না। কিন্তু নিয়মিত পড়া তৈরি এখানকার ফ্যাশন নয়—অচিরেই তা বুঝে গেল। কিন্তু আড্ডাও দিতে পারে না। তাও এক সমস্যা।

একদিন একটি ছেলে জানাল—আপনার এত ফ্যাট শরীরে—আপনি রেগুলার ব্যায়াম করুন না—স্লিম হবেন। এই ছেলেটির সঙ্গে একদিন একটা বিখ্যাত আখড়ায় গিয়ে হাজির হ'ল। নিয়মিত ব্যায়াম শুরু করল। ছেলেটি যায় শরীর মজবুত করতে—নরেন যায় স্লিম হতে। নির্দেশ মত খাওয়াও কমাতে হ'ল। এতদিনে হঠাৎ যেন স্বাভাবিক হবার একটা পথ দেখতে পেয়ে নরেন ভেতরে ভেতরে একটা উল্লাস বোধ করল যা ছিল ওর স্বপ্নেরও বাইরে—আজ যেন তাই সত্য হতে চলল। ছেলেটিও প্রেমের নানা তত্ত্ব আলোচনা করত। মেয়েরা স্লিম ছেলে চায়—অর্থ দেখেই বিয়ে করে। সুন্দরী নারীরা নাকি নিজেরা সুন্দর বলে ফরসা রঙ খুব পছন্দ করে না। প্রেমের ব্যাপারে রূপ বড় নয়। নরেন শোনে। কিন্তু নিজের এতদিনের অভিজ্ঞতার সঙ্গে মেলাতে পারে না। বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয়—কিন্তু পরদিনই যখন দেখে কোন মেয়েই ওর দিকে তাকায় না—কেউ আলাপ করে না—তখন ভাবে, কি হবে ফিজিক্যাল এডুকেশন বুরোতে গিয়ে। তবু যায়। তবু ভালবাসার তত্ত্ব শোনে। বিকেলে মেয়ে দেখতে রাস্তায় বের হয়। এমন নিশ্চিন্তে নির্ভয়ে মেয়ে দেখা ওর একটা নেশার মত লাগে। যদিও প্রথম দিকে ঠিক

ভালো করে তাকাত পারত না। একটু দেখেই চোখ নামিয়ে নেয়। তবু শেষপর্যন্ত অনেকক্ষণ ধরে দেখবার শক্তিতে অভ্যস্ত হয়। ক্লাসেও মেয়েদের দিকে সঙ্কোচে তাকাতে পারত না। কিন্তু কখন নিজেকে ভুলে তাকিয়ে থাকত টেরও পেত না। ক্লাসের নোট নিতে গিয়ে— নেবার ফাঁকে ফাঁকে চোখ পড়তই। রাস্তায় বা ক্লাসে দেখা দু'চারটে মুখকে ধ্যান করতে করতে রাতে ঘুমিয়ে পড়ত। এমনি করেই ফার্স্ট ইয়ার কেটে গেল। সেকেন্ড ইয়ারে উঠবার সময় নরেন থার্ড হ'ল। ভুঁড়ি অনেক কমে গেছে। মা'র ধারণা শুকিয়ে যাচ্ছে ছেলে—খাস দাস না—খালি পড়াশুনা করে একি হাল হয়েছে তোর। কিন্তু হাজার অনুরোধ সত্ত্বেও নরেন নির্দিষ্ট খাওয়া ও ব্যায়াম চালিয়ে গেল।

ক্লাসেরই একটি মেয়েকে ওর দারুণ ভালো লাগতে শুরু করল সেকেন্ড ইয়ার থেকে। বড় ঘরেরই মেয়ে। ছটফট করতে করতে মোটর থেকে নামে। মনোযোগ দিয়ে ক্লাসে নোট নেয়। থার্ড হবার পর অনেকেরই চোখ পড়েছে নরেনের 'পর। কিন্তু কেউ বিশেষ আলাপ করেনি। নরেন পড়াশুনায় ভালো—এটুকু ছেলেমেয়েরা জেনেছে। কিন্তু আর কেউ কোনো আগ্রহ দেখায়নি। ইচ্ছে, মেয়েটির সঙ্গে একটু আলাপ করে। ইতিমধ্যে জানতে পারল, ওর ক্লাসের আরো তিনটে ছেলে ওর 'পর আকৃষ্ট। একজন গিয়ে আলাপ করল। মেয়েটি বিশেষ আমল দিল না। প্রফেসররা রসিকতা করলে মেয়েটির মুখ হাসিতে লাল হয়ে উঠত। সেই গায়ে পড়া প্রেমিকটি মন্তব্য করে— মুখে প্রথম সূর্যের আলো। বাকি দু'জনও আলাপ করবার চেষ্টা করল। কিন্তু মেয়েটি বিশেষ গ্রাহ্য করে না। জিজ্ঞেস করলে সংক্ষিপ্ত উত্তর দেয়। নরেনের একান্ত ইচ্ছে সত্ত্বেও আলাপ করতে পারল না। একদিন দেখল নিউমার্কেটে কি কিনছে। নরেন পাশ দিয়ে চলে গেল। মেয়েটি একবার দেখল। তারপর আবার জিনিস পছন্দ করতে লাগল। বুঝল, ওর সঙ্গে আলাপে মেয়েটি রাজি নয়। একটু পরিচিতের মত তাকাতেও তো পারত? গ্রাহ্যই করল না। অথচ নরেন কত স্লিম হয়েছে আগের চেয়ে। ভুঁড়ি নেই। আয়নায় কতবার নিজেকে দেখে। কি হ'ত একটু আলাপ করলে? ওর বাবার মোটর থাকতে পারে—নরেন কি গরিব নাকি? নরেন আলাপের চেষ্টা করল না—ভুলতে পারাও দুঃসাধ্য হল। টেস্ট এগিয়ে আসছে—নরেনের অবাধ্য মন বইয়ে খাতায় কিছুতেই থাকতে রাজি নয়। কত কল্পনা ওর সঙ্গে আলাপ হয়েছে—ওদের বাড়িতে নিয়ে গেছে, সবাইকে মেয়েটি গর্ব করে বলছে—আমাদের একজন সেরা ছেলে। তারপর পাশাপাশি বসে—মোটরে। নরেন উঠে পাশের ঘরে যায়। তিনটি আর্টসের ছেলে পড়ে—ডিগ্রি ক্লাসে—সেখানে আলোচনা চলছে—ওঃ রবীন্দ্রনাথ—রূপ কথা লিখেছেন—এখন রবীন্দ্রনাথ পড়া-হোরিবল-বার্নাডশ-ফুল অব ষ্টান্টস্ কেবল চমকানো কথার ফুলঝুরি। আলডুস হাক্সলি বোগাস ব্যাকডেটেড, জাঁ পল সার্ত্রে টলারেবল, ইদানীং রিঅ্যাকশনরি, হেমিংওয়ে ওল্ড ম্যান এ্যান্ড দ্য সি? নোবেল কমিটি এখন সেরা সেরা নিকৃষ্ট বই খুঁজে বেড়াচ্ছে। হেমিংওয়ে আবার নভেলিষ্ট-ও তো ন্যারেটার-ফক্‌নার-অ্যাবনরমাল ষ্টোরিটেলার—পড়তে হয় তো....। নরেন আরেক ঘরে যায়। সেখানেও একটি ডিগ্রি ক্লাসের ছেলে—কি ফোড়ে আঁতেলেকচুয়ালরা কি করছে? নামকরা লেখকদের ধূলিসাৎ তো? একটা দুটো সমালোচনা পড়ে-হয়তো কারো লেখবার সঙ্গেই পরিচয়

নেই। সেদিন আমি রবীন্দ্রসংগীতের কথা তুলতেই ভাগ্‌নার শুরু হ'ল। কাকে বলে? পরীক্ষায় দেখো এদের রেজাল্ট। এরা হচ্ছেন সব কাম্যুর আউট সাইডার। এরা সমাজের সঙ্গে মিশতে পারছে না। প্রেম, শোক এ সব হচ্ছে সুপার ফুলাস—ওদের নাকি টাচ্‌ করে না। ওদিকে বালিশের তলায় দেখবে যৌন পত্রিকা-সত্যজিৎ মৃণাল সেনের প্রশংসা করবে—দেখাব সুচিত্রা উত্তমের—আর জেমসবণ্ডের সেক্স আর ভাইয়োলেন্সের ছবি। আউট সাইডার? ফক্কড় আর কাকে বলে? কফি হাউসে কফি আর পাকৌড়া থেকে সেরিব্রাস এদের সুপারম্যানে পৌঁছে গেছে। ফাজিলের দল সব। আউট সাইডার? রেজাল্টের পাতায় তাই হবেন। আউট সাইডার? কিছুই ওদের টার করে না? সেদিন কুঁচোটা হাত থেকে পড়ে ভেঙে গেল বলে আধ ঘণ্টা ধরে ঘ্যানর ঘ্যানর? টাব করে না? মাছের সাইজ মনোমত হচ্ছে না দেখে সুপারিন্টেন্ডেন্টের বিরুদ্ধে ঘোঁট পাকানো তো বেশ দানা বেঁধে উঠেছে? আউটসাইডার। নরেন চুপচাপ শোনে। সব কথা কান দিয়ে যায় না। মোট কথা এটুকু বুঝেছে, যত সব বিখ্যাত লেখক-নামকরা লেখক—ভেতরে তাঁদের কিছু নেই। সব অন্তঃসার শূন্য। নরেন একই সঙ্গে বিখ্যাত লেখকদের নাম প্রথম শোনে—সেই সঙ্গে এও শোনে, ওরা কিছু নয়। গল্প—উপন্যাস নরেন বড় পড়ে না। মনও বসে না। বিশ্বাসও করে না। উপন্যাস খুললেই দেখে নায়করা যখন তখন ভালবাসছে—মেয়েরা হুমড়ি খেয়ে তাদের 'পর আকৃষ্ট হচ্ছে। নরেন আর পড়তে পারে না। মেয়েরা প্রেমে ব্যর্থ হয়ে অনুশোচনা করছে—ছটফট করছে, চোখের জল আর দীর্ঘ নিঃশ্বাসে বইয়ের পাতা ভিজিয়ে দিচ্ছে—এ কথা নরেনের বিশ্বাস করা শক্ত। যত সব বানানো গল্প। ফিরে এসে আবার বই নিয়ে বসে—ঠিক মত তৈরি হচ্ছে না—একদিকে যেমন উৎকণ্ঠা অন্যদিকে অবাধ্য মন মেয়েটার চিন্তার আশে পাশে থেকে যেতে নারাজ। হঠাৎ দরজায় ঠক্‌ ঠক্‌ শব্দ। খুলে দেখে, প্রদ্যোত। ছেলেটি মাঝে মধ্যে ওর কাছ থেকে টাকা ধার নেয়। আবার দিয়েও দেয়। কালো লম্বা—বেশ মজবুত স্বাস্থ্য। ট্যারা চোখ নিয়ে চুপচাপ নরেনের খাটে বসে। ছেলেটি'কে নরেন পছন্দ করে। একদিন জিজ্ঞেস করেছিল-কি হবে টাকা নিয়ে? জবাব পায়—ভাই খুলেই বলি, আমি ওদের কাছে যাই—যারা টাকার বিনিময়ে দেহ দেয়। ও না হলে আমার চলে না। কেন অপমানিত হবার জন্যে মেয়েদের পেছনে পেছনে ছুটব? মন না হলেও আমার চলবে। ভালবাসাটাসা ওসব ভাই কাব্যের ব্যাপার। ও'দের চেয়েও সুন্দরী মেয়ে আমার জোটে। ক'টা টাকা হলেই হয়। প্রদ্যোতের কাছেই নরেন নিজে নিজে যৌন তৃপ্তির কথা প্রথম শোনে। এ্যাঃ তুমি এসব কিছু জান না? কি করে বেঁচে আছ? ওর কাছেই নরেন প্রথম উলঙ্গ নারীর ছবি দেখে। জীবনে প্রথম। ছেলেটি ওকে নিয়েও যেতে চেয়েছিল। চল আমার সঙ্গে। ভালো দেখে জুটিয়ে দেব। এমন কিছু খরচ নয়। ইচ্ছে থাকলেও সাহসে কুলায় না। ও'কে জিজ্ঞেস করে নানা খবর জানে। নরেন ভাবে, গেলেও হয়। অন্তত অন্য একটা চিন্তা যদি মনকে নতুন করে ধরে—তবে হয়তো ঐ মেয়েটিকে নিয়ে অসহ্য চিন্তার হাত থেকে বাঁচে। কিন্তু সাহস হয় না। কল্পনা শক্তিও নরেনের ছিল না। তাই দিবাস্বপ্নে যে তা পূরণ করে নেবে তাও হয় না। একটা প্রবল গ্লানি, দুশ্চিন্তা নিয়ে নরেন টেষ্ট দেয়। টেষ্টে নরেন প্রথম দশজনের মধ্যে কোনো স্থান পেল না। টেষ্টের পর দ্বিগুণ

জোরে ও অজস্র কষ্টের মধ্যে নিজের অবাধ্য মনকে নিয়ে বই, নোট ঘাটতে লাগল। ইন্টার মিডিয়েট পরীক্ষায় নরেন বাইওলজিতে লেটার নিয়ে সাধারণ ভাবে প্রথম বিভাগে পাশ করল। প্রথম দশজনের মধ্যে কেন-প্রথম তিরিশজনের মধ্যেও স্থান হ'ল না। মোটামুটি নরেন এ রকম পরীক্ষার ফলের জন্যে তৈরি ছিল। ও জানত, ওর আঘাত দরকার। আঘাত এলও। বাবা-মা'র মুখে নিরাশার ছাপ। বন্ধুবান্ধবদের চোখে ছোট হয়ে গেল। সবাই জানত, এবার নরেন ষ্টান্ড করবে। আঘাত নরেনকে অনেকটা স্বাভাবিক করে তুলল। মেয়েটিও ওর মনে ফিকে হয়ে গেল।

বাবা কিছু বলেননি। কিন্তু হতাশ হয়েছেন। হতাশার কারণও নরেন অনুমান করতে পারে। কলকাতায় সেরা কলেজে নরেন ষ্ট্যান্ড করবে ইন্টার মিডিয়েটে-এমন একটা আভাষ অনেককেই বাবা দিয়েছিলেন। বাবার মুখ ছোট হয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও, বাবার কিছু না বলবার পেছনে যে মনোভাবটি রয়েছে তা হচ্ছে, এর চেয়ে বেশি ভালো করা নরেনের পক্ষে সম্ভব নয়। নরেন যথেষ্ট খাটলেও, এর চেয়ে বেশি সাধ্য নরেনের নয়। মা'র মুখ দেখে মনে হচ্ছিল, নরেন যেন ফেল করেছে। নিঃশব্দে নরেন অপমান সহ্য করেছে। চারদিকে সহানুভূতির ছলে যে খোঁচা ও অপমান—পাড়াপড়শি থেকে স্কুল মাষ্টার পর্যন্ত—ওর 'পর বর্শার ক্ষতের মত বার বার খুচিয়ে গেছে—এবার নরেন তাতে ভেঙ্গে পড়েনি—অপমান অবশ্যই বোধ করেছে—লেগেছে। কিন্তু ও জানে এ অপমান—এ আঘাত ওর দরকার ছিল। অবশ্য দরকারের কথা ভাবলেই কি অপমান কমে যায়! তবু, নরেন এই রেজাল্টের জবাব দেবে।

নম্বর যা ছিল তাতে অবশ্য ডাক্তারি অনায়াসে পড়তে পারত। বাবার ইচ্ছে তাই ছিল। কিন্তু নরেন ঐ কলেজেই ফিজিওলজি অনার্স নিয়ে বি.এস.সি পড়া শুরু করল। বাবা আপত্তি করলেও নরেনের দৃঢ়তা দেখে বাধা দিলেন না।

এ দু'বছরের ইতিহাস খুবই সংক্ষিপ্ত। আড্ডা দেওয়া নরেন ছেড়ে দিল। বিকেলে মেয়ে দেখাও বন্ধ করল। সপ্তাহে একদিন সিনেমায় যেত। কলেজের সময়টুকু বাদ দিয়ে ব্রিটিশ কাউন্সিল, ন্যাশানাল লাইব্রেরীতে বই আনতে বা পড়তেই সময় কেটে যেত। পড়াশুনায় আবার মন ফিরে পেল। তবু, মাঝে মধ্যে মেয়েটিকে স্বপ্নে দেখত, মোটর থেকে নামছে। বা ওকে ডাকছে কথা বলবার জন্যে। সকালে মন একটু উন্মনা হ'ত না তা নয়—তবু, এবার নরেন যোগীর মত কঠিন সাধনা শুধু করল। মেয়েটিও বাইওকেমিষ্ট্রি অনার্স নিয়ে কিছুকাল পরে হঠাৎ আসা বন্ধ করে দিল। শুনল, বিয়ে হয়ে গেছে। নরেন যেন আরো জোর পেল। সবটুকু আশা চলে যাবার দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে সেই নিরাশার শ্মশানে নরেন বই নোট নিয়ে তপস্যা শুরু করল। কিছুকাল পর সেই মেয়েটি সিঁথিতে সিঁদুর দিয়ে সোনা গয়নায় ঝলমল করতে করতে আবার কলেজে এল। নরেন এই অস্ত্রোপচারে আরো শূন্যতা বোধ করল। এবার যেন নিজের দেহ সৎকারের 'পর নিরুপায় বিদেহী যেমন বাধ্য হয়ে মোহমুক্ত হয়—নরেনও যেন শূন্য শ্মশান থেকে বই খাতা নোটে মন দিল। আশা ভরসা যে এখনও ছিল—সব আশা চলে যাবার পর তা টের পেল। এবার মন শূন্য—কিন্তু শান্তও। নরেন আস্তে আস্তে নিজের শ্মশানের 'পর নতুন করে কীর্তিস্তম্ভ রচনার কাজে হাত দিল অনার্সে নরেন

ফার্স্টক্লাস সেকেন্ড হ'ল। আবার দেশের বাড়িতে ওর সম্মান ও আদর ফিরে এল। আর এই বিজয়ের আনন্দ নরেনকে নতুন করে আত্মবিশ্বাস এনে দিল।

পরের ছ'বছর সময় ওর ইন্টার মিডিয়েটের দু'বছরের চেয়ে ও সংক্ষিপ্ত। প্রথম থেকেই প্রফেসরদের নজরে পড়েছিল। ডাক্তারি শাস্ত্রে ওর নিষ্ঠায়, পরিশ্রমে ওর বুদ্ধি দিন দিন ধারালো হয়ে উঠছিল। আর অস্ত্রোপচারেও হাত খুব সতর্ক। প্রফেসরদের প্রশংসায় এবার সকলের নজর ওর দিকে। এই প্রশংসা ওকে এমন একটা আত্মবিশ্বাসের আনন্দ এনে দিল—এই প্রশংসার ধারাকে বজায় রাখবার জন্যে পরিশ্রমকে একবিন্দু বিশ্রাম দেয়নি। সহপাঠি ও পাঠিনীদের সঙ্গে সহজ ভাবে মিশেছে, রেষ্টুরেন্টে খাইয়েছে কিন্তু অন্তরঙ্গ হয়নি। কেমন করে বুঝেছিল, মেয়েরা রূপ ও টাকা ছাড়া কিছু বোঝে না। প্রেম-টেম সিনেমার উপন্যাসের ব্যাপার। বুদ্ধুরা এগুলো বিশ্বাস করে। মেয়েরা কিছু নয়—মেয়েদের 'পর দুর্বলতা পুরুষের নিজের ব্যাপার। পুরুষ নিজের দোষে ভোগে।

তবু মেয়েদের সঙ্গ একটু সান্নিধ্য—ভেতরের এই লোভকে ওর যত ভয়ই থাকবে যেদিন দিন রাত পরিশ্রমে কেটেছে—শোবার সময় কাউকে নিয়ে একটু চিন্তা-জানে তা মিথ্যে-তবু প্রশ্রয়ের সঙ্গে ভেবেছে।

কারো সঙ্গে গায়ে পড়ে মেশেনি। কথা বললে ভেতরে ভেতরে পুলকিত হলেও-ছোট্ট জবাব দিয়ে যেন সেই ইন্টার মিডিয়েট ক্লাসের মেয়েটির 'পর শোধ নিতে চেয়েছে। তবু, যে মেয়েটি কথা বলেছে—কথা বলবার পুলক অনেকক্ষণ ধরে রেশ জাগিয়ে রেখেছে। আবার কবে বলবে, সেই আশায় থেকেছে। হয়তো আর বলেনি। তখন আশাভঙ্গ হলেও, অন্তরে অন্তরে জোর পেয়েছে। পড়াশুনায় মন দিতে পেরেছে। ওর ইচ্ছে, সবাই ওকে দাম্ভিক বলুক। ভালো ছেলে—সবাইকে হেয় করে। কিন্তু অহংকার করবার মত মনের জোর নেই। ভাবে, আলাপ না করলো তো বয়ে গেল। হতাশ হয়ে ভেবেছে, অহংকারী হতে গেলেও সুপুরষ হ'তে হয়।

একদিন নরেন ডাক্তার হয়ে মেডিক্যাল কলেজ থেকে বের হল। গোল্ড মেডেল ও পেল। বাড়িতে এসে জানাল লন্ডন যাবে আরো স্পেশ্যালিষ্টের বিদেশী ডিগ্রি জোগাড় করতে। লন্ডন মানে সমুদ্রযাত্রা। এক ছেলে জলে ডুবে মরেছে—আরেক ছেলে গেছে সমুদ্রে পাড়ি দিতে। মা ভয়ে বিবর্ণ। বাবা যেন জানতেন নরেনের এই উদ্দেশ্যের কথা। এক কথায় রাজি। বাবার এই কুসংস্কার ছিল না তা নয়। কিন্তু তিনি আমল দিলেন না। আবার বাড়িতে জ্যোতিষ ও পুরুত-শান্তি স্বস্ত্যয়নের ধূম পড়ে গেল। দুপুরে মা একটা পৈতে হাতে করে এলেন-কোনো প্রতিবাদ না করে নরেন পৈতে পরে নিল। এবার বাবা মা যেন নরেনকে অনেক ভরসা পায়। নানা পরামর্শ করে। কিন্তু বাবার স্বাস্থ্য দিন দিন খারাপ হচ্ছিল। নরেন এবার এসে বাবাকে কলকাতা নিয়ে এল-সব পরীক্ষা করল। বড় বড় বিশেষজ্ঞদের দেখাল। ডাক্তারা জানালেন -রোগ বিশেষ কিছু নেই। আসলে ভেতরে ভেতরে ক্ষয় হয়ে যাচ্ছেন। একটা ডিপ্রেসন কাজ করছে কোথাও। বাবা হেসে বললেন- আরে আমিও তো ডাক্তার—ওরা কি কিছু বলতে পারল। সময় এলে দেহ নোটিশ দেবেই। নরেন ভাবল, আমি যোগ্য হয়ে উঠতেই কি বাবা নিজেকে অবাঞ্ছিত ভাবছেন। নিজেকে অপ্রয়োজনীয় ভাববার জন্যে ডিপ্রেসন।

হয়তো তোর সঙ্গে আর দেখা হবে না। এ কথা বলেই বাবা যেমন নীরব থাকেন—তেমনি নীরব হয়ে গেলেন। নরেন বল্ল—ক'বছরই বা। আপনার বয়েস কিছু হয়নি। মনে মনে চিন্তা করে—ভেতরে ভেতরে বাবার ভাঙন কিসের। বাবা যদিও আগের চেয়ে অনেক সহজ, অন্তরঙ্গ—তবু, বাবার আগের চেহারা, গাম্ভীর্য, শাসনেই যেন বাবাকে চিনতে পারা যায়। বাবার এই সামান্য বদল নরেনের ভালো লাগে না। বাবা যদি এত সহজ, স্বাভাবিক তবে ওর ছেলেবেলাকার শাসনের ইতিহাসটা মিছে। বাবা যেন সহজ সরল হয়ে ওর ছেলেবেলাকার সকল কষ্টকে বিনা খরচে বাতিল করে দিতে চান। কিন্তু নরেন বাবাকে আগেও যেমন ভয়, শ্রদ্ধা ও সমীহ করে দূরে দূরে থাকত—আজ বাবা নরেনের সঙ্গ চাইলেও—নরেন সেই আড়ালের বাইরে আসতে পারল না—চাইলও না। কথাবার্তা বললেও দূরে দূরে থাকত। জাহাজে যেতে যেতে বহুবার নরেনের মনে হয়েছিল—বাবা, হয়তো জীবনের উদ্দেশ্য হারিয়ে ফেলেছেন কিংবা হঠাৎ জীবন উদ্দেশ্যহীন মনে হচ্ছে কিংবা হয়তো বাবার মনের কোনো হতাশা ছিল-আজ শক্তি কমবার সঙ্গে সঙ্গে সেই গা ঢাকা দেওয়া হতাশা ডিপ্রেসনে রূপান্তরিত। এ কথাও নরেন না ভেবে পারল না। ছেলের যোগ্যতার পাশে নিজের স্বল্প যোগ্যতার বেদনায় বাবা ক্ষয়ে যাচ্ছেন? বাবা হয়তো চিরকাল উৎকণ্ঠাকে দমন করেছেন-সেই দমন করবার শক্তিই আজ নষ্ট হবার ফলে উৎকণ্ঠা জীবন বিতৃষ্ণায় প্রকাশ পেয়ে শোধ নিচ্ছে। কি জানি। সমস্ত রাস্তা বাবার রুগ্ন মুখ ওকে উৎফুল্ল হতে দেয়নি। বার বার মনে হয়েছে, কলকাতার বিশেষজ্ঞদের হারিয়ে-তাদের দৌড় দেখে কি বাবা খুশি। বাবা কি নিজের অজ্ঞাত রোগের জন্যে গর্বিত? সেই সঙ্গে একটা গৌরব ও গ্লানি নরেনের ছিল। বাবা-মা'র পরিবর্তিত আচরণ অর্থাৎ ছেলেকে বন্ধুর মত দেখা, বল—ভরসা পাওয়া—এ সবকে নরেন মেনে নেয়নি। ছোট থাকতে চায় বলে নয়—নিজের বাল্য জীবনের ইতিহাসকে, বঞ্চনাকে, বেদনা ও ক্ষোভকে ওর অপমান করতে ইচ্ছে হয়নি। অস্বীকার করে নতুন জীবন ওর কাম্য নয়। বাবা-মা'র এই বদল ওর ভালোও লাগেনি। ভয় মেশানো সম্ভ্রমের ভেতর দিয়ে বাবা-মাকে এতদিন দেখে এসেছে—আজ তা ত্যাগ করা সুবিধাবাদী লোকের পক্ষে সম্ভব হলেও ওর পক্ষে সম্ভব ছিল না।

লন্ডনে প্রতিষ্ঠা পেতে অসুবিধে হয়নি। ওর পরিশ্রম করবার শক্তি অস্ত্রোপচারে হাতের নৈপুন্য খুব সহজেই স্বীকৃতি পেয়েছিল। এখানে প্রফেসররা অনেক সহজ প্রায় বন্ধুর মত। মহিলাদের মধ্যেও এমন সহজ স্বাভাবিকতা ছিল নরেন স্বভাবজাত হীনতাবোধ থেকে নিজের অজান্তেই বের হয়ে এসেছিল। একটা জিনিষ ওর লাভ হয় : অন্তরঙ্গ না হয়েও সহজ স্বাভাবিক আচরণ করা। তাছাড়া লন্ডনের দ্রষ্টব্য বিষয়গুলো সম্পর্কে ওর কোনো আকর্ষণ ছিল না। সবাই দেখে-দেখতে হয়-তাই দেখেছে। দেখেই ভুলে গেছে। দেখেছে কিনা জিজ্ঞেস করলে হঠাৎ মনে পড়তে চাইত না। প্রথম উত্তরটা হত না। একটু পরে সব মনে পড়ত। কোথাও ভুল ভেঙে দিয়েছে-কোথাও দেয়নি। কেমন একটা একনিষ্ঠ তন্ময়তা ওর আয়ত্তে এসে গিয়েছিল। তবে তা বর্মের মত ওকে রক্ষা করেছে বিদেশিনীদের কাজ থেকে তাও নয়। নরেন অন্তরঙ্গতা চায়নি-পায়নি। ওদের সহজ স্বাভাবিক আচরণ যে নিতান্তই ফর্ম্যাল-এ কথা বুঝতে ওর অসুবিধে হয়নি। নিজেও ফর্মাল হতে দেরি করেনি। এভাবে প্রবাসের দিন ওর কেটেছে।

এর মধ্যেই একদিন এক ঘটনা ঘটল। বাস্ এর জন্যে ষ্ট্যান্ডে অপেক্ষা করছিল। হঠাৎ ওর মধ্যে একটা অদ্ভুত অনুভূতি ওকে আচ্ছন্ন করে ফেলল। জগতে অনেকগুলো স্তর রয়েছে। স্তরগুলো অনেকটা পরস্পরের 'পর নির্ভরশীল। বস্তু জগত আকার নিতে আরম্ভ করতেই জীবন সেই বস্তুজগতের উপদানকে অবলম্বন করে জীবজগতের স্তর সৃষ্টি করল। আবার জীবজগতের নানা প্রকাশের মধ্য দিয়ে মনোজগতের স্তর আত্মপ্রকাশ করল আবার মনাক অবলম্বন করে নীতিবোধের স্তর, সৌন্দর্যবোধের স্তর সৃষ্টি হল। আরও হয়তো স্তর আছে—যা এখনও আত্মপ্রকাশ করেনি। চিন্তাটি এমন জোরে ও খাপছাড়াভাবে ওর মধ্যে জেগে উঠল যেন নরেন আবার নরেনের মধ্যে রইল না। যন্ত্রের মত বাস্ এ উঠে ঠিক সময়ে নেমেও গেল। কিন্তু বাস্-এ ওঠা নামা যেন ওর স্মৃতির মধ্যে রইল না। ও যেন বাস্ স্ট্যান্ডে হারিয়ে গেল। অনুভূতিদত্ত এই চিন্তাটি বেশ কিছুক্ষণ ওকে অবশ করে রেখেছিল। তারপর সয়ে গেল। তাপও চলে গেল। একদিন তা স্মৃতি হয়ে গেল। কিন্তু ধারণাটি ওর কেমন মনে বসে গেল। এর কিছুদিন পরেই বাবার মৃত্যু সংবাদ। বাবা কোন স্তরে!

বছর চারেক পরে বিদেশী ডিগ্রি নিয়ে দেশে ফিরে এল। সরকারী হেলথ্ সার্ভিসে যোগ দিল। নিজের মফঃস্বল শহরে ডাক্তারী করবার কোনো ইচ্ছেই ওর ছিল না। যদিও উইলে বাবা বিষয়সম্পত্তি যাবতীয় ওকেই দিয়ে গিয়েছিলেন। তাতে নিজের ঘরে বসে যা আয় হত—তাই যথেষ্ট হত। কিন্তু নিজের মফঃস্বল শহরের 'পর ওর কেমন বিতৃষ্ণাই ছিল। তাই পশ্চিমবঙ্গের একটি বড় শহরে প্রথম পোষ্টিং পেয়ে অচিরেই নরেনের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল। সরকারী হাসপাতাল ছাড়াও নিজের ডিসপেনসরী, প্রাইভেট চেম্বার, নার্সিংহোস সব মিলে দৈনিক আয় হত মাস—মাইনের বহুগুণ। এখানেও সেই পরিশ্রম, নিষ্ঠা, সেই একাগ্রতা—অস্ত্রোপচারে ওর সাফল্য সমস্ত জেলায় ছড়িয়ে পড়ল, রোগ নির্ণয়ে ওর নিপুণ সতর্কতা ও দ্রুত চিন্তা করবার ক্ষমতা, রোগীর পরীক্ষায় ওর দক্ষতা। তবে রোগীকে যে বেশি হাতে রাখে এ সর্বাংশে সত্য নয়। তবে রোগী সম্পূর্ণ নিরাময় না হওয়া পর্যন্ত নিজের দায়িত্বে রাখে। যেহেতু স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ—সে জন্যেও বটে আর মিশুকে বা আড্ডাবাজ নয় বলেও পেশাদারী মনোভাব নিয়ে—ও অত্যন্ত ফর্মাল বলে ওর রোগীরা ও তাদের আত্মীয়স্বজন ওর প্রশংসায় পঞ্চমুখ। কিন্তু কিছুটা নীরস বলে একটা সূক্ষ্ম বিতৃষ্ণা ও সমীহ এর সঙ্গে মিশে থাকত। একটা বিষয় কিন্তু শহরে এমন কি জেলার সর্বত্র রটে গিয়েছিল—অর্থাৎ নারী সম্পর্কে ডাক্তার সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য।

বিলেত থেকে আসবার পর মা বিয়ের আয়োজন করতে লাগলেন। এদিকে জেলা শহরে সরকারী ডাক্তারী হিসেবে ওর দ্রুত প্রতিষ্ঠা হতে সময় লাগল না। পৈতৃক সম্পত্তি থেকে নগদ টাকার কিছুটা নিয়ে একটা ডিসপেনসরী খুলল। পৈতৃক সম্পত্তির নগদ টাকায় দু'জন বন্ধু মিলে একটা আধুনিক নার্সিংহোম খুলল। যা বহু জেলাতেও পাওয়া ভার। শহরের আরো ক'জন ডাক্তারকেও নিয়োগ করল। হাসপাতাল, চেম্বার, নার্সিংহোম ও প্রাইভেট প্র্যাকটিসে অল্পকালের মধ্যে শহরের ব্যস্ততম ডাক্তার হয়ে উঠল। দেশ থেকে নিয়ে আসা একটি ব্রাহ্মণকে নিয়ে একটা ছোট একতলায় তখন থাকত। এমনি

ব্যস্ততম একদিনে একটা অস্ত্রোপচার থেকে রিকসায় বাড়ি ফেরবার সময় হঠাৎ একটা অনুভূতি ওকে আচ্ছন্ন করে ফেলল, যেমন করেছিল লন্ডনের রাস্তায়, ওর মনে এক আশ্চর্য অনুভূতি হল : এই যে আমি বেঁচে আছি—এটা এক আশ্চর্য ব্যাপার। আপন অস্তিত্বের বিস্ময় ওকে অভিভূত ও অবশ করে দিল। নিজের রিকসা—তাই কখন বাড়ি পৌঁছাল—স্নান করল, খেল—একটা ঘোরের মধ্যে। ও যে নরেন—এর মধ্যে কি এক আশ্চর্য অনুভূতি লুকিয়ে আছে—ও যে ওই—নিজে যে নিজে—এই বিস্ময় একটা তন্ময়তার মধ্যে ওকে রেখে দিল। বেঁচে থাকার মধ্যে—নিজস্ব চেতনার মধ্যে—নিজস্ব চেতনার পরিচয়ের মধ্যে একটা অপার রহস্যময় অনুভূতি লুকিয়ে আছে—এই অবশ করা বিস্ময় বেশ কিছুক্ষণ ধরে চলত। এক সময় স্বাভাবিক হয়ে যেত—কখন স্বাভাবিক হত টেরও পেত না। হঠাৎ হঠাৎ অবশ করা এই অনুভূতির বিনা নোটিশে চেতনাকে লুঠ করে নেওয়া, দখল করে নেয়া নিয়ে কিন্তু ওর দুর্ভাবনা ছিল না। হয়তো অস্ত্রোপচারের সময়, রোগী দেখার সময়, ব্যস্ত মুহূর্তে যদি এমনি হানাদার অনুভূতি ওর চেতনাকে দখল করে নেয়-তখন কি হবে তা নিয়ে নরেনের দুশ্চিন্তা ছিল না। কারণ ওর অস্পষ্ট চেতনায় একটা বিশ্বাস ছিল—এ রকম অনুভূতি কাজের মুহূর্তে আসবে না। আবার এ রকম অনুভূতি জন্য ওর লোভও ছিল না। বিরাগও ছিল না, ভয়ও ছিল না, আকাঙ্ক্ষাও ছিল না। অনুভূতির ঘোর কেটে গেলে নরেন তা ভুলে যেত। অনুভূতি আরেকবার না এলে অনুভূতির কথা মনেই পড়ত না। অবসর সময়ে কখনো মনে পড়ত না। অবসর যা পেত—বিদেশের মেডিক্যাল জার্নাল পড়ত। অন্য কোনো ব্যাপারে কিছুমাত্র আগ্রহ বোধ করত না।

মা চিঠি দিতেন—যাবার তাগাদা দিতেন। কিন্তু ব্যস্ত ডাক্তারের রোববার নেই। ডিসপেনসরী একদিন বন্ধ থাকত। কিন্তু নার্সিংহোম বন্ধ থাকত না। নরেন পরে ডিসপেনসরী সারারাত খোলা রাখবার ব্যবস্তা করে। তবু, দু'মাসে তিন মাসে একবার একদিনের জন্যে যেতেই হত। তাও বাড়িতে ফুরসত ফেলবার সময় মিলত না। সেখানেও রোগী। এমনি একবার শনিবারের সন্ধ্যায় বাড়ি পৌঁছালে মা বললেন—ভারী সুশ্রী একটি মেয়ে দেখেছি, দাদা মুন্সেফ। মেয়েটি বিয়ে পাশ। মেয়েটির মধ্যে বেশ একটা নম্রতা ও চাপা তেজ আছে। চাপা—তেজী মেয়ে আমাদের দরকার। এতবড় একটা সংসার চালাতে হবে তো। খুব ভালো ইংরেজী জানে। তেজী মানে কিন্তু ঝগড়াটে নয়। তোর পেছনে একটা শক্ত তেজী মেয়ে দরকার। তাছাড়া পরিবারটি বেশ সরল দেখলাম। অল্প বয়সে বাবা মারা যান। দাদা এম.এ পাশ করে প্রফেসরী করত—পরে মুন্সেফ হয়। আগামীকাল গোটা দশেকের সময় আসবে। আলাপ করিস। মেয়েটি কী খুব সুন্দরী?—ডানা কাটা পরী নয়। ফরসা রঙ, ভালো গঠন—সুন্দর মুখশ্রী। —আমাকে পছন্দ তো করবে না—পছন্দ হবে আমাদের বাড়ি, আমার রোজগার। আমাকে দেখে বিয়ে দিতে চাইলে মেয়ে কখনোই রাজি হবে না। —পুরুষমানুষের আবার রূপ কি? বেশ তো, তুই যদি দেখিস মেয়েটির মুখে হতাশার ছাপ—করিস না বিয়ে। ওদের আমি তোর চেহারার কথা বলেছি। ওরা তা গ্রাহ্যই করেনি। মেয়েটির

সামনেই তো বলেছি। কই, মুখের তো কোনো বদল দেখিনি। এক আলমারী ইংরেজী বই। মেয়েটির নাকি দারুন বই—এর নেশা। রান্নাবান্না সব জানে। খুটিয়ে জিজ্ঞেস করেছি। ঠিক ঠিক উত্তর দিয়েছে। তোদের ছকেও মিলেছে ভাল। মুন্সেফ ছেলেটিকেও ভাল লাগল। তোদেরই বয়েসী—দু'এক বছরের বড় হলেও হতে পারে। -ঠিক আছে। সকালে রোগী দেখবার হাত থেকে বাঁচা যাবে-এটুকুই লাভ। .....পরদিন সকালে প্রায় ন'টার ট্রেনে বরুণবাবু এসে হাজির হলেন। লম্বা, ফর্সা, চোখে মুখে বুদ্ধির ছাপ। এসে নরেনের সঙ্গে হ্যান্ডসেক করল—নরেনের মাকে প্রণাম করল। তারপর নরেনের সঙ্গে জমিয়ে আড্ডা দিল। ইংরেজি সাহিত্যের লোক। দর্শনের প্রতি দারুণ ঝোঁক। বলল, ইচ্ছে ছিল, দর্শনেও এম.এ. দেব। হয়ে উঠল না। এত টিউশনি করতে হত। ভাই বোন দু'জনেই পড়াতাম। কলেজে এত কম মাইনে—নইলে এই জজিয়তি করতাম না। সপ্তাহে ক'টা রায় লিখতে হলে ভেতরে আর কিছু পদার্থ থাকে না। ভদ্রলোক খুব পপুলার সায়েন্স পড়তে ভালবাসেন। নরেন জানাল, জীবনে বোধ করি ইংরেজি বা বাংলা একখানাও উপন্যাস পড়েছি কিনা সন্দেহ। নিজের স্পেশালিজেসনের জায়গা ছাড়া বাদ বাকি জায়গায় আমাকে আপনি অশিক্ষিতই বলতে পারেন। স্কুল-ফাইনাল বা ইন্টার মিডিয়েড পড়বার সময় গল্প কবিতা প্রবন্ধ যা পড়েছি—এই-ই আমার বাইরের পড়া। রেজাল্ট ভালো করবার জন্যে পড়েছি—পড়বার পর ভুলে গেছি। আমার ভুলে যাবার শক্তি একটু আনইউজাল। বরুণ হো হো করে হেসে উঠল। তারপর বরুণ বলল—নিজের স্পেস্যালিজেসনের। এরিয়ার প্রতি তুমি পতিব্রতা-সতী, সাবিত্রীর মত একনিষ্ঠ। দু'জনে বেশ জমে উঠল। বিলেতের হেলথ সার্ভিস ফ্রি সম্পর্কে বরুন জানতে চাইল। ইংরেজের ভদ্রতাবোধ নিয়ে বলতে গিয়ে নরেন বলল—ওরা অভদ্র হওয়াকে অসভ্যতা মনে করে। ওরা পেশাদার—কিন্তু আন্তরিক। কিন্তু শিক্ষার ব্যাপারটায় ওরা যেমন সিরিয়াস, আন্তরিক, উদ্ভাবনী। ছাত্রদের সাহায্যের ব্যাপারে ওদের কোনো ক্লান্তি নেই, বিশ্রাম নেই। ছাত্রের অসুবিধে ও কোথায় কোথায় কি প্রয়োজন—তা ওরা জেনে নেবেই। একটা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে ওরা শিক্ষা ব্যবস্থাকে চালনা করে। বিলেতে গিয়ে এই-টুকু লাভ হয়েছে—একটা সভ্য দেশ দেখে এলাম। এদেশেই ইংরেজদের সম্পর্কে যা ছোটবেলা থেকে শুনেছি—তার কোনো সমর্থন ওখানে পেলাম না। বরুণ এবার সরাসরি বলল, আমার বোনকে দেখবে—যদি তোমার পছন্দ হয়। নরেন হেসে বলল—আপনার মা আপনার ফটো নিয়ে গিয়েছিলেন। প্রাইমারী সিলেকসন তো দুপক্ষেই হয়ে গেছে—এবার ভাই। দু'জনেই হাসল। বরুণ আলাপ করে খুব খুশি। বরুণকেও নরেনের ভালো লাগল। মানুষ বুঝবার যে ক্ষমতা নরেনের মধ্যে রয়েছে তা থেকে বুঝতে পারল—মানুষটি সূক্ষ্মচিন্তা করতে ভালবাসে। আসলে স্কলার। কিন্তু মনটি সরল। নরেনের মা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বাড়ি ঘরদোর সব দেখাল। বরুণ বলল—বিশ্বরহস্য আর প্রাণ রহস্যের মত আমার আর একটি রহস্যও আছে। আমি ভেবে পাই না। মানুষ কি করে টাকা করে। অর্থ-উপার্জন রহস্যও আমার বোধগম্য নয়। আসলে মাষ্টারের বংশতো। নরেন হাসল। মা বললেন, ওর মেয়ে পছন্দ হলে—অন্য কিছুতে

আটকাবে না। নরেন সঙ্গে সঙ্গে বলল, পছন্দটা উভয় তরফের হওয়া দরকার। বরুণ হেসে নরেনের কাঁধে হাত রেখে বলল—বিলেতে কি তুমি ফেমিনিষ্ট মুভমেন্টে ছিলে নাকি? দু'জনেই হাসল। বরুণ মাকে জানাল, পছন্দ হলে—ঠিক আছে নরেন বাবুর টার্ম মত পছন্দ হলে—আপনাদের যোগ্য করেই আমার বোনকে আপনাদের ঘরে পাঠাব। আপনাদের অমর্যাদা হতে দেব না। নরেন এবার বলল, আপনার তিন নম্বর রহস্য কিন্তু সমাধান হয়নি বলে আপনি জানিয়েছেন। বরুণ আবার হাসল। শেষ পর্যন্ত ঠিক হল, আগামী রোববার দশটার সময় নরেন, মা ও বাবার ডিসপেনসরির কমাপাউন্ডার সঙ্গে যাবে—আর ইতিমধ্যে ওর মেজো মামা বা অন্যকোনো মামা যদি আসতে পারে—তবে সেও যাবে। ওরা ন'টার ট্রেনে রওনা হবে। লোকাল ট্রেনে আধ ঘণ্টা লাগে। বরুণ চলে যেতেই নরেন বলল—কোনো মামা যাবে না। হরিকাকাও নয়। সে তো তোমাকে নিয়ে গেছেই। শুধু তুমি আর আমি। ছেলে আর মা। তাই ঠিক হল। .....পরের রোববার ট্রেনে যেতে যেতে মা বললেন, আরও চারটে মেয়ে দেখেছি—পছন্দ হয়নি। একজন তো প্রচুর দেবে থোবে বলেছে। আমার টাকার কী করবার। এই টাকাই কে খায়? যাক ভালোই হল—তোর সঙ্গে বের হলাম। কোথাও তো তোর সঙ্গে যাওয়া হয় না। মেয়েটির নামটিও ভাল—কমলা। তোদের মতে সেকেলে নাম। নরেন জানায় আমার নামটিই বা কি আধুনিক? এ সব তো তোর বাবার কাজ। কেন যে এত তাড়াতাড়ি চলে গেলেন। আমার একার ঘাড়ে চাপিয়ে.....। আজ বোধ হয় বিরাট সমাবেশ আছে। ষ্টেসনে ষ্টেসনে দলে দলে লাল ঝান্ডা নিয়ে হুড়মুড় করে ট্রেনে উঠে পড়ছে। গলায় অনেকের বড় বড় লাল রুমাল বাধা। ভাগ্যিস ওদের বিপরীত দিকে ট্রেনে এই দলগুলো উঠছিল। নরেন বিড় বিড় করে বলল—ফেরবার সময় ট্রেনে ওঠা সম্ভব হবে না। মা তন্ময় হয়ে জানলার দিকে তাকিয়ে বলতে থাকেন—শেষের দুটো বছর কেমন যেন হয়ে গেলেন। খেতে পারতেন না। ঘুম হত না। কোন কিছুতে আগ্রহ ছিল না। জমি, জমা, খাজনাপত্তর আদায়, ডিসপেনসরির হিসেব নিকেশ কিছুই দেখতেন না। সব একা আমাকে দেখতে হয়। শেষ দিকে পত্রিকাও পড়তেন না। রোগী দেখতেন না। কেবল তোর এম.ডি হবার খবর যেদিন পেলেন—সেদিন দেখলাম খুশি খুশি। বারবার বলতেন, যেন এখানে প্র্যাকটিস না করে। কলকাতায় গিয়ে যেন প্র্যাকটিস করে। তারপর যখনই তোর আরো ডিগ্রির খবর পেয়েছেন—সেদিন একটু যেন ভালো থাকতেন। কি যে রোগ। শুকিয়ে যাচ্ছিলেন, জ্বর জ্বারী ব্যথা বেদনা কিছু নেই। ইজিচেয়ারে চুপচাপ বসে থাকতেন ঘন্টার পর ঘন্টা। তোর খবর এলে—তোর চিঠি এলে বলতেন, ওর সঙ্গে বোধ হয় আর দেখা হবে না। তারপর হঠাৎ ষ্ট্রোক হল—তিন দিনের দিন—জ্ঞান আর ফিরল না। মা কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। সেই থেকে একা। তুই এসেও বাইরেই প্র্যাকটিস করছিস। আমি সেই একাই থেকে গেলাম। এত বিষয় আশায়—কী যে হবে। একা একা আমিও হাঁফিয়ে উঠেছি। ....ষ্টেসন এসে গেল। ওরা নেমে একটা রিকসা করে রওনা হল। রাস্তায় দলে দলে লাল ঝান্ডার মিছিল চলছে ষ্টেসনের দিকে। রিকসা, বাস দাঁড়িয়ে আছে তো দাঁড়িয়েই আছে। শেষ পর্যন্ত

বরুণের বাড়ি এসে পৌঁছাল।

বরুণ এসে ওদের অভ্যর্থনা করে বসবার ঘরে নিয়ে এল। বরুণ বলল- আপনাদের সংখ্যাটি মনে হয় কমে গেছে। নরেন বলল-সংখ্যা দেখতে দেখতে এলাম। বাইরে বের হলেই সংখ্যার দুঃখ কমে যাবে। সংসার তো মা'র-আর আমার জন্যই মার এই উদ্যোগ। আর কেউ অতিরিক্ত। মা বসে রুমাল দিয়ে হাত মুখ মুছে বলল—এই-ই প্রথম ওকে মেয়ে দেখাচ্ছি। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে মেয়েকে নিয়ে মা ঢুকল। এত তাড়াতাড়ি আসামাত্র— নরেন আশাই করেনি। মেয়েটি এসে নরেনের মাকে, নিজের মা ও দাদাকে প্রণাম করে- নরেনকে একটা ছোট নমস্কার করল হাত তুলে। নরেন ভাবছিল, ওকেও না প্রণাম করে। প্রতি নমস্কার করে নরেন ঠিক হয়ে বসল। বরুণ পরিচয় করে দিল—আমার মা। আর আমার বোন—কমলা। আর এই ভদ্রলোক নরেনবাবু। তাহলে নরেন বাবু, আজ আপনি জীবনে প্রথম মেয়ে দেখতে বের হয়েছেন। নরেন হেসে জানাল, মেয়ে দেখার অসুবিধে হচ্ছে নিজেকেও দেখা দিতে হয়। সেটা সব সময় নিরাপদ নয়। শুধু মেয়ে অন্ধ হলে অসুবিধে থাকে না। মেয়েটির মুখে একটা হাসির রেখা ফুটে উঠেই মিলিয়ে গেল। নরেন দেখল, মেয়েটি সদ্য স্নান করে এসেছে। মুখে কোনো প্রসাধন নেই। ফর্সা, চোখ বড় বড়, নাকও তীক্ষ্ণ। পাতলা ঠোঁট—মুখের গড়ন ও দেহের গড়ন সুন্দর। মেয়েটি সপ্রতিভ। মেয়েটির মা বলল—লেখা পড়া ভালবাসলেও রান্না সবই শিখিয়েছি। বরুন বলল—রান্না সব মেয়েই পারে তা বড় নয়—তবে ওর পড়ায় অত্যন্ত ঝোঁক। কন্টিনেন্টাল উপন্যাস ওর খুব প্রিয়। নরেন বলল—আমি গল্প—উপন্যাস কিছু পড়িনি—স্কুল জীবনে এমনকি ইন্টারমিডিয়েটে কিকি গল্প কবিতা পড়েছিলাম—তাও মনে নেই। আমাকে কিন্তু কন্টিনেন্টাল উপন্যাস থেকে কিছু জিজ্ঞাসা করবেন না। — আর কথা দিচ্ছি, কেটে গেলে কতটুকু ডেটল আর তুলো দিতে হয়-তাও আমি জিজ্ঞেস করব না। মেয়েটি হেসে উঠল। নরেন তাকাল—একটা স্নেহসিক্ত কৌতুক ওর চোখে। বরুণও হেসে উঠেছিল। নরেন জিজ্ঞেস করল—সিনেমা দেখেন? মেয়েটি বলল-কম, খুবই কম। আপনি দেখেন না। নরেন বলল—স্কুল জীবনে পালিয়ে সর্বসমেত তিনটা। কলকাতায় পড়বার সময় সব মিলে প্রথম দু'বছরে চারটে। সুচিত্রা আর উত্তমের প্রত্যেক বইতেই ঘুরে ফিরে ওরা বিয়ে করছে। এখনও শুনেছি, ওরা বিয়ে করে চলেছে। মেয়েটি হেসে উঠল। এবার বলল—পথের পাঁচালী দেখেননি।—না, শুনেছি খুব উঁচু আর্টের বই করেন তিনি। আমার ক্লাসের একটি ছেলে বলেছিল—হাই আর্টের ফ্লিম খুব আনইন্টারেস্টিং। বিদেশে অপেরা দেখেছি—দেখতে খারাপ লাগছিল না। তবে গান বাজনা নাচের মাথামুন্ডু কিছু বুঝিনি—চেষ্টাও করিনি। আর সিনেমা—অপেরা যাই দেখি—ভুলে যেতে সময় লাগে না। সবাই চুপ করল। এবার বরুণ বলল—পথের পাঁচালী দেখলে ভুলতে পারতেন না। এবার নরেনের মাও বরুণের মা উঠে দাঁড়িয়ে— তোমরা কথা বল—বলে বেরিয়ে গেল। বরুণ নরেনের দিকে তাকিয়ে বলল—আমার কি করা উচিত ডক্টর।—আপনি আমাকে এই বিদুষীর হাত থেকে রক্ষা করবার জন্য থাকুন। এবার আমার লোকবল কমে গেল। বরুণ কমলার দিকে তাকিয়ে বলল—

কমলা চুপ করে থাকিস না—সেই অপুর সংসারে মেয়েদের দৃশ্যের মত। মেয়েটি আবার হাসল। —আপনি কি সিনেমা দেখা পছন্দ করেন না?—নিজে দেখিনা—তা বলে আর কেউ দেখলে আমি কিছু মনে করি না। আমার ইচ্ছা, রুচি এগুলো পড়াশুনার চাপে গড়ে ওঠেনি। আর এখন সময়ও পাইনা। এবার কমলা বলল—যতটুকু অবসর পান কি করেন। —অবসরের একটা অংশে ঘুমুই—সেটা দ্বিতীয় অংশ—বাকিটা সময় হাতে থাকলে একটু মেডিক্যাল জার্নাল পড়ি। ব্যস্। —পাসকোর্সের গ্র্যাজুয়েট—বিদুষী টিদুষী নই। তবে আমার অবসর তো অনেক। বই পড়তে ভালবাসি। ভাল সিনেমা—যেমন সত্যজিৎ রায়, মৃনাল সেন, তপন সিনহা—এদের বই হলে দাদার সঙ্গে দেখতে চাই। আর নামকরা ইংরাজি বইও দেখি। এবার বরুন বলল—আমার একটা ব্যাপার আছে- যে বইটা পড়া—তা সিনেমা হলে দেখতে যাই—কিন্তু বই পড়ে যে আনন্দ পাই—সিনেমায় তা পাইনা। —আমার অবশ্য এ সমস্যা নেই, বইও পড়িনা—সিনেমাও দেখিনা। কমলার দিকে তাকিয়ে বলল—একটু আগে অবসরের কথা হচ্ছিল না? বলেছিলাম, ঘুম। তাও সর্বাংশে ঠিক নয়। রাতে রোগীর জন্য বরাদ্দ ঘুম থেকে অনেকটাই চলে যায়।

আবার কিছুক্ষণ চুপচাপ। নরেন বরুনের দিকে তাকিয়ে বলল—যদি অভয় দেন—তবে আপনার বোনকে একটা প্রশ্ন করতে পারি। —আরে, নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই।

কমলা বলল—কঠিন প্রশ্ন নয়তো?

নরেন সোজাসুজি কমলার দিকে তাকিয়ে বলল—কঠিন নয় তবে কমন প্রশ্নও নয়। আসলে প্রশ্নই নয়। একটা অনুরোধ। কমলা একটু অবাক হয়ে নরেনের দিকে তাকায়। নরেন চুপ থাকে একটু। তারপরে বলে, দেখুন, দাদা বা মা'র অনুরোধে বিয়ের মত ব্যাপারে আত্মত্যাগ করবেন না। আমি আত্মত্যাগকে ঘৃণা করি। আমি মেয়েদের স্বাধীনতায় বিশ্বাস করি। আপনার স্বাধীন মত যদি আমার কাছে অপ্রিয় হয়—জানবেন, তাতে আমি আপনাকে শ্রদ্ধাই করব। মেয়েটি এবার স্পষ্টভাবে নরেনের দিকে তাকাল। সেই দৃষ্টির মধ্যে একটা সহানুভূতি ও স্নেহের বেদনা ছিল। কমলা বলল-মা, দাদা মত চাপিয়ে দেন না। আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে-না-কখনোই করেন না।

—তাহলে ডক্টর, তুমি নারী পুরুষের সমান অধিকারে বিশ্বাস কর।

—করি। তবে সংসারে আসল তো মেয়েরাই—পুরুষরা গৌণ। পুরুষের বুকের ওপর। নিয়ে মেয়েরা দাঁড়িয়ে। এই তো আমার অভিজ্ঞতা। সব সংসারে মেয়েরাই ডমিনেট করে। আমি চাই, ইকোয়েল পার্টনার।

—ডক্টর, ইউ আর রাইট। কেন মেয়েরা ডমিনেট করে?

—পুরুষ দুর্বল বলে।

কমলার চোখে একই সঙ্গে আপত্তি ও কৌতুক খেলা করে যায়।

বরুন মৃদু মৃদু হাসতে থাকে। নরেন বলে, আপনি কি কিছু জিজ্ঞেস করবেন?

কমলা মাথা নেড়ে নিষেধ করে।

—তাহলে, এবার আপনার ছুটি।

বরুণ বলল—কমলি, তুই একটু গার্ডদে বাইরে থেকে আমরা স্মোক করব। দু'জনেই স্মোক করে। একটু পরে, খাবার নিয়ে কমলা আসে। চা-ও পরিবেশন করে। তারপর বেরিয়ে যায়। নরেন অল্প কিছু খায়। চা পেয়ে যেন খুব খুশি। তারপর আবার স্মোক করবার আগেই কমলা বাইরে থেকে দাদাকে ডাকে—দাদা, শুনে যাও তো। বরুণ বেড়িয়ে যেতেই নরেনের মা ঢোকে। মা ঢুকে একেবারে কাছে এসে জিজ্ঞেস করে—পছন্দ তো? মেয়েটির খুব পছন্দ হয়েছে। আমি জানি হবে। প্রমাণ পাবি এখনই। এইবার সকলে প্রবেশ করল। কমলা। নরেনের মা বললেন আজকের দিন ভালো। আমি কমলাকে আশীর্বাদ করে যাব। তিনি দুটো বালা বের করে কমলার হাতে পরিয়ে দিতেই কমলা নরেন বাদে সবাইকে প্রণাম করল। নরেন এবার কমলাকে বলল—স্বাধীন ইচ্ছায় তো? কমলা হেসে চুপ করে রইল।

কমলার মা বললেন, তা হলে আজকে না খেয়ে যেতে পারবেন না।

নরেনের মা বলল-যথেষ্ট খেয়েছি।

নরেন এবার বরুনকে বলল-এখান থেকে ট্যাক্সি বা মোটর ভাড়া পাওয়া যায় না। ট্রেনে যাওয়া সম্ভব নয়।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমার চাপরাসিকে দিয়ে আনিয়ে নিচ্ছি। এবার কমলার মা ও দূর্বা এনে নরেনের মা'র হাতে দিয়ে নিজেই শাঁখ বাজাল। নরেনের মা উলুধ্বনি দিল। কমলা আরেক প্রস্থ প্রণাম করল।

মোটরভাড়া করে ফেরবার পথে নরেন জিজ্ঞেস করল—আচ্ছা মা, তুমি যে বলো নিয়ে তৈরি হয়ে গিয়েছিলে—আমার পছন্দ হবে কি করে জানলে?—তুই তো তোকে পছন্দ হবে কিনা তাই শুধু ভাবছিলি—তোর পছন্দ হবে কিনা তা নিয়ে ভাবিসনি কেন?—কারণ, মা, দেখতে ভালো নয়, ব্যবহারে ভালো নয় এমন মেয়ে তুমি পছন্দ করতে পার না। তোমার পছন্দ হলে আমার তা হবেই। আমার পছন্দের জন্য চিন্তিত ছিলাম না। পহেলে তো দর্শনধারী......। ক'দিন পর এমনি এক রোববারে বরুণ মাকে নিয়ে এসে আশীর্বাদ করে গেল। বাড়ি ঘর দেখে বরুণের মা মুগ্ধ। তার মুগ্ধতায় নরেনের মা খুসি।

নরেনকে বরুণ জিজ্ঞেস করল—আপনাদের ডিসপেনসারি কেমন চলে। নরেন জানাল—খুবই লস এ রান করছে। বাবা অর্ধেক রোগীকে বিনা পয়সায় চিকিৎসা করতেন—বাকি অর্ধেককে নিজে পয়সা দিয়ে চিকিৎসা করাতেন। তাছাড়া ধারে ওষুধ নিয়ে ফেরত দেবার অভ্যাস এ শহরের লোকদের মধ্যে বিশেষ নেই। আমি তুলে দিতে চেয়েছি। বাবার স্মৃতি বলে মা রাজি নন। একজন এম.বি.বি.এস রোজ বসে। হরিকাকা কম্পাউন্ডার—যতক্ষন ডিসপেনসরিতে থাকে তার চেয়ে আমাদের বাড়িতেই বেশি থাকে। আসলে ওর ভরসায় তো মাকে রেখে যাওয়া। আর বিনয়দা আমাদের গোমস্তা—জমি-জমা আদায়পত্তর সব ওর কাজ।

—শুনলাম, তুমি নাকি একটা ডিসপেনসরি দিয়েছ তোমার শহরে।

—তাহলে আপনাকে খুলেই বলি। একটা আধুনিক ডিসপেনসারি দিয়েছি বাবার

নামে। ওটাই আমার চেম্বার। পাশেই একটা বাড়িতে একটা আধুনিকতম নার্সিংহোম করেছি এক পার্টনারের সাহায্যে। বেশ কিছু ডাক্তারও নিয়োগ করেছি। শুধু এ জেলা নয়, পাশের যে কোনো জেলাতেও এ রকম নাসিংহোম নেই। নার্সিংহোমের নাম 'কিওর'।

—কিন্তু তুমি যখন বদলি হবে।

—রদ করবার একটা চেষ্টা করব। সহকর্মীরা রাইটার্সে যান যতটা নিজেদের বদলি রদ করতে তার চেয়ে আমার বদলি হবার জন্যে তাগাদা দিতে। শেষ পর্যন্ত যদি রদ না করতে পারি—তবে চাকরি ছেড়ে দেব। কি আর লোকসান হবে?

—এগুলোর জন্যে তোমার ফিনান্স তো করতে হয়েছে।

—বাবা যে নগদ টাকা রেখে গিয়েছিলেন—তারই অধিকাংশ ইনভেষ্ট করেছি। নার্সিংহোমের প্রেসকৃপসন আমার ডিসপেনসরিতেই নিতে হবে। সারারাত খোলা থাকে। অত আধুনিক ওষুধ অন্য কোথাও রাখা হয় না আর নার্সিংহোমের প্রেসকৃপসন তো বিনা পয়সায় দেয়া হয়না। তবে ডিসপেনসরিতে ধার রাখতেই হবে। একটি বি.এস.সি পাশ ছেলে পেয়েছি। ওই ডিসপেনসরির চার্জে রয়েছে। আরো দু'জন সহকারী আছে। দু'টোই খুব ভালো চলছে। আর আমার পেসেন্ট তো রয়েছেই। বিশেষ করে। মাড়োয়ারী বিসনেস-ম্যানরা বাড়িতেই ডাকবে—নার্সিংহোমে মেয়েদের পাঠাবে না। নিজেরা যাবে। তাছাড়া দূর দূর শহর থেকেও গাড়ি পাঠিয়ে নিয়ে যায় রাত বিরেতে। হাসপাতালের সুপারিনটেনডেন্ট বলেন, আপনি বদলি হলে হাসপাতাল কানা হবে। একমাত্র আপনিই নিজের কোটার সিটের জন্য দালাল রাখেন না—সংবাদ পেয়েছি। আর চাকরি ছেড়ে দিলে আপনার লাভ—আমাদের ক্ষতি।

বরুণ বলল—অর্থ উপার্জন রহস্য কিন্তু রহস্যই রয়ে গেল। তোমার বাবার টাকা আর তোমার ক্ষমতা—এগুলোর উৎস সন্ধানে দেখা যাবে—কেউ একজন লাঠির জোরের সঙ্গে বুদ্ধির জোরে বিষয় করেছে। তাতেও সমস্যাকে পিছনের দিকে ঠেলে দেয়া হল—তা বই যুগপৎ লাঠি ও বুদ্ধি কোথা থেকে এল? আর তখনই বা সেই সমাজ ব্যবস্থা ছিল কেন যার সুযোগ সে নিতে পেরেছে আর অধিকাংশই পারেনি। মৌলিক সমস্যার যখন সমাধানের পথ পাওয়া যায় না, তখন বলি রহস্যময়। নরেন বলল—এ শহরের জন্য বাবা অনেক কিছু করেছেন। স্কুলের সেক্রেটারী কলেজের সেক্রেটারী, মিউনিসিপ্যালটির চেয়ারম্যানগিরি, বিনা পয়সায় চিকিৎসা, বাবার চেষ্টায় হেলথসেন্টার হয়েছে, রাস্তা, জল, বাস সার্ভিসের রুট করে দেয়া, এমনকি দুর্ভিক্ষের সময় বাড়িতে লঙ্গরখানা পর্যন্ত খুলেছিলেন। কিন্তু শহরে বাবার নামে একটা রাস্তা ছাড়া আর কিছু নেই। বাবাই প্রথম শহরে কয়েকটা পার্ক তৈরি করেন। ছেলেমেয়েদের খেলার জায়গা করে দেন। রাস্তা, ঘাট, পার্ক যা করেছিলেন এখন তা মেরামত করা হয় না। এখন কাউন্সিলর ক্যান্ডিডেট ছাড়া কেউ হতে পারে না। আর শহরের উন্নতি তো সমাজে বিপ্লব এলে তারপর হবে। সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হলে কমরেড মেথররা রাস্তায় ঝাড়ু দেবে। অবশ্য এদের বিশ্বাস—ঐ মেথররা তখন রিক্রুট হবে বুর্জোয়া বা পাতি

বুর্জোয়াদের শ্রেণি থেকে।

বরুণ বলল—বিপ্লব কোথাও হয়নি—এখানেও হবে না। এখানের বিপ্লবী দলের একমাত্র কাজ হচ্ছে কিছু পাইয়ে দেয়া, মাইনে বাড়ানো, বোনাস দেয়া, ফাঁকিবাজ দেশের লোকদের নিয়ে মাঝে মধ্যে সভা সমাবেশ করা, আড্ডাবাজ লোকদের নিয়ে টিফিনে শ্লোগান দেয়া, কাজের সময় বিপ্লবের তত্ত্ব আলোচনা করে কাজ না করা। রাশিয়ায়, চীনে একটি পার্টির ডিক্টেটর সর্বেসর্বা। সাধারণ মানুষ সকল অধিকার বর্জিত। পার্টির উপর তলার সেমি নেতা ও সামরিক বাহিনীর উপরতলার কর্মচারীরা ভালো খেতে পরতে পায়। বাকিরা কিভাবে জীবনযাপন করে তা বাইরের পৃথিবীর লোককে জানতে দেয়া হয় না। আমাদের দেশের বিপ্লবীরা ইউনিয়নের মাধ্যমে লোককে মুখে বিপ্লবের বুলি শিখিয়েছে—আসলে টাকার লোভ, সম্পত্তির লোভ, অর্থাৎ ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিরুদ্ধে বলতে গিয়ে ব্যক্তিগত সম্পত্তি বাড়াবার আকাঙ্ক্ষাই জাগিয়ে তুলেছে। যেমন চিন্তাশৃঙ্খলা নিয়ে চিন্তা করতে কোনোদিন শেখেনি—সে যখন একটা সামান্য চিন্তা শৃঙ্খলার কথা শোনে—তখন তার চিন্তা দরিদ্র মন, তাকেই চূড়ান্ত ভাবে। এরাই ফ্যানাটিক। আর্থিক দারিদ্রও চিন্তার দরিদ্র এইতো আমাদের দেশের সাধারণ মানসিকতা। বিপ্লবের রোমান্স, চিন্তার দারিদ্র্য, আর্থিক স্বচ্ছলতাকে কতদূর বাড়ানো যায় বিনা দক্ষতায় তার চেষ্টা, সম্পদের প্রতি লোভ আর সম্পদশালীর প্রতি ঈর্ষা, আর মিছিলে, সভা ও সমাবেশে যোগ দিয়ে ব্যক্তিমন থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে আদিম মনের স্বাদ পেয়ে অভদ্রতার নামে এরা ভদ্রবেশী বর্বর হবার পথে অগ্রসর হচ্ছে। এরা বিপ্লবী নয়—এরা বিনা পরিশ্রমে টাকা করতে চায়। নিজের অর্থ করতে চায়—সমাজ-পরিবর্তনের জন্যে নিজেকে পরিবর্তন করতে চায় না। এই শতাব্দীর যারা বিপ্লবী বলে পরিচিত এরা প্রত্যেকেই দুর্লভ ক্রিমিন্যাল। মানুষকে অমানুষ করাই এদের কাজ। এরা মানুষকে যুক্তি ছাড়া, চিন্তা ছাড়া, শিক্ষা ছাড়া অন্নবস্ত্র ছাড়া—সব কিছু হরণ করা—সর্বহারা করাই এদের কাজ। উঃ লম্বা বক্তৃতা দিয়ে ফেললাম।

—আমার ভালই লাগছিল। এবার থেকে কিন্তু 'তুমি' বলতে হবে।

—তাই বলব। তোমার উদ্যম, অধ্যবসায়, দক্ষতা আছে—তোমার উন্নতি আটকায় কে?

—একটা কথা, খুব সঙ্কোচের সঙ্গে বলছি, আমাকে ঘড়ি দেবার প্রয়োজন নেই। খুব বিলিতি দামী ঘড়ি আমার দু'দুটো আছে। না দিলেই খুশি হব।

—মা কি রাজি হবেন। একে তো তোমরা কিছুই নিচ্ছ না।

—দেখুন গান বাড়িতে কেউ শোনে না—বিলেত থেকে রেডিওগ্রাম, রেকর্ড বিটোফেন, মৎসর্ট, রবীন্দ্রসংগীত সব আছে। দামি ক্যামেরা আছে—আমার ফটো তোলার সময় নেই। বাড়িতে ফ্রিজ আছে—কদাচই ব্যবহার হয়। কিছু ঠান্ডা করবার জন্য হয়তো একটু ব্যবহার হয়। বাসী খাবার নিষেধ। টেপরেকর্ডার পড়ে আছে। মা'র গলার গান ও স্তোত্র পাঠ নিয়ে বোধ হয় একটু চালান হয়েছিল। প্রজেক্টার আছে—ওটা বোধ হয় বিয়ের সময় ব্যবহার করা হবে। আপনার বোন এলে যদি এগুলোর

সদগতি হয়। অত্যন্ত কড়া শাসন আর রেজাল্ট ভালো করবার তাগিদে আমার রুচিগুলো মরে গেছে। অথচ দেখুন, বাড়িতে গ্রামোফোন. ছিল, রেডিও ছিল। কিন্তু আমার ছ'বছরের দাদা জলে ডুবে মারা যাবার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের পরিবার থেকে আনন্দ, গান সব বিদায় নিয়েছে। কঠোর শাসন আর নিরানন্দ পরিবেশে আমি বড় হয়েছি। আপনি আর আপনার বোন কত সহজে হেসে ওঠেন—আমার এত ভালো লাগে। আমি কিন্তু পারি না। অথচ মা কিন্তু আপনার বোনের সহজ, সরল, হাসি খুসি, তেজ, গাম্ভীর্য সবই পছন্দ করেছেন। আজ মা'রও বদল ঘটেছে। বিলেতে এক বাড়িতে কিছুকাল গেষ্ট ছিলাম—বয়স্ক মহিলা একা থাকতেন, বলতেন—জান, গানের মত বন্ধু নেই। যে বাড়িতে গান বাজে—সেখানে দুঃখ, রোগ, শোক দরজার বাইরে দাড়িয়ে থাকে—গান থামলে কলিং বেলে হাত দেবে। এমনকি দুঃখের সময় যদি সাহস করে গান বাজাও তবে দুঃখ দরজা দিকে একটু একটু করে পা বাড়াবে। ভদ্রমহিলা ডিভোর্সী ছিলেন। ছেলে মেয়েরা আলাদা থাকত। তিনি থাকতেন গান নিয়ে।

—দেখ, তোমাকে বলি, তোমার ফ্রাঙ্কনেস ও পারসনালিটি কমলার খুব ভালো লেগেছে। আমাকে বলেছে মানুষটি খাঁটি। আমার মনে হয়, তোমরা খুশি হবে—আনন্দ তোমাদের ভেতরেই থাকবে। আর দুঃখ কষ্ট বৈঠকখানাতেও জায়গা পাবে না।

বরুণ মাকে নিয়ে বিদায় নিল।

শুভরাত্রির দিন যথাসময়ে নরেন ফুলশয্যার ঘরে এল তখন রাত এগারটা। নরেন দেখল একা একা বসে কমলা ঘরটিকে ভালো করে দেখছিল। নরেন ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে পাশে এসে কমলার হাত নিজের হাতে নিয়ে বলল—এখন থেকে তুমি করে কিন্তু। তোমাকে একটা নাম দেব—আজ সারাদিন ভেবেছি। কমলা চোখ তুলে জিজ্ঞাসা করল—কি নাম ঠিক হল?—কিছুই ঠিক হল না। ক'টা নাম আর আমি জানি। যা জানি তার মধ্যে তোমাকে মাত্র একটা নামেই মানায়। কমলা কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞেস করল—শুনি। আমার পছন্দের স্বাধীনতা আছে তো? —তোমার অপছন্দ হলে বল? সারাদিন সব কাজের মধ্যে মনে মনে নাম বাছাই করে দেখলাম, তোমাকে 'কমলা' নামেই সবচেয়ে মানায়। এই নামটিই পছন্দ হল। —কমলা হেসে উঠল, বলল—ডক্টর খুব চতুর। —চতুরদের কৌশল আর উদ্ভাবনী শক্তি থাকে—আমার কোনোটাই নেই। তাছাড়া কমলালেবু ফলের মধ্যে আমার একমাত্র প্রিয়। মিষ্টি কমলা লেবু। এবার জুটল মিষ্টি কমলা। —এখনও তো সংসার করনি—মিষ্টি কিনা জানবে কি করে? বলেই যেন লজ্জায় মাথানত করল। তা জানবার অধিকার তুমি দেবে। মিষ্টি কিনা স্বাদ না পেলে বুঝব কি করে। কমলা মাথা নিচু করে রইল। নরেন চুপ করে রইল। একটু সময় চুপচাপ কেটে গেল। কমলা আড়চোখে নরেনকে চুপ করে থাকতে দেখল। কিছু বলতে পারল না। তারপর নরেন অনেকটা স্বগতোক্তি করে বলল—স্কুল জীবনে আর আত্মীয় মহলে আমার আসল নামটাই সকলে ভুলে যেত। 'মোটা' 'গদাই' 'কেলো', মাষ্টারমশায় স্নেহের ভান করে বলতেন 'হোঁদলকুতকুত'। ঐ নামে একটা বইও ছিল। তুমি ও আমার নাম করণ করতে পার—যা সবাই ডাকত—তার মধ্য থেকেও। আর

ফলের মধ্য থেকে যদি পছন্দ কর—তবে কালোজাম। —তোমার বান্ধবীরা কি নামে ডাকত? .....এই প্রথম কমলা 'তুমি'. বলল। নরেনের শরীরে শিহরণ হল। —স্কুল, কলেজ, মেডিক্যাল কলেজ—দেশে বা বিদেশে আমার কোনো বান্ধবী ছিল না। আর কৃপা ভিক্ষার জন্যে কোন বন্ধবীর খোঁজ ও করিনি। ভালো ছেলে বলে চিনত সবাই। কিন্তু কোনো মেয়ে এমন চেহারার সঙ্গে যেচে আলাপ করবে—যেখানে নিজের মাসতুত মামাতুত বোনেরা আমাকে সঙ্গে নিয়ে সিনেমায় পর্যন্ত যেতে চাইত না আমার পয়সায়। —কই আজতো তোমার প্রশংসায় পঞ্চমুখ! নরেন অগ্রাহ্য করে বলল—তুমি যখন আমার ভার নিচ্ছ। তখন স্ত্রীর সঙ্গে কি রকম ব্যবহার করতে হয়—আমাকে শিখিয়ে দিও। গলাটা নরেনের কেঁপে গেল কমলা এবার কাছে ঘেঁষে বলে—তোমাকে সেদিন যখন দেখলাম—তখন তোমার মধ্যে—তোমার চাহনির :মধ্যে একটা যন্ত্রণা দেখতে পেলাম। তুমি কি কোথাও আঘাত পেয়েছ—তুমি বিনা দ্বিধায় বলতে পার। —তোমাকে আগেই বললাম, কারো কাছ থেকে কোনো আঘাত আমি বিশেষভাবে পাইনি। চেহারা খারাপ হলে পুরুষ নারী যাই হোক—তবে কষ্ট আসে সবার কাছ থেকে। একটা উদাহরণ দি—আমার মাসতুত মামাতুত দিদিরা, বোনেরা সিনেমায় খাবার প্রসঙ্গে বলতেন—এই কেলেটার পাশে কে বসবে। সকলে শিউরে উঠবার ভান করে। হয়তো ঠাট্টাই। পরে ওরা কলকাতা থাকবার সময় অনুযোগ দিত—কেন সম্পর্ক রাখি না। আর একটা তখন ফিজিওলজিতে অনার্স নিয়ে পড়ছি—ফোরথ্ ইয়ার। অনার্সে আমরাই ক'টি ছেলে মেয়ে। থার্ড ইয়ারের বার্ষিক পরীক্ষায় ফার্ষ্ট ক্লাস ফার্ষ্ট আমিই ছিলাম। গোটা চার পাঁচ মেয়ে ছিল। একদিন নিউ মার্কেটে জামার কাপড় কিনতে গেছি—দেখি আমাদের অনার্সের একটি মেয়ে—তখন জানতাম, এখন ভুলে গেছি—বাবার সঙ্গে একটা দোকানে দাঁড়িয়ে কি যেন কেনাকাটা করছে। আমাকে দেখল এবং চিনতে চাইল না। আমিও ওকে চিনলাম না। কি হত, একটু পরিচিতের হাসি হাসলে—আমাকে জিজ্ঞাসা না করলে আমি কোনো মেয়ের সঙ্গে যেচে আলাপ করিনি। আর জিজ্ঞাসা করলে যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত উত্তর দিতাম। লন্ডনে কিন্তু দেখলাম, মেয়েরা ফর্মাল কিন্তু ভদ্র। ঠাট্টা রসিকতাও করে—কিন্তু অভদ্র না হলে অন্তরঙ্গ না হবার আর্ট ওরা জানে। নারীর চেয়ে পুরুষ আলাদা কিন্তু তা ওরা মনে করে না। নেবে তো ভার—আন্তরিক ভাবে?—কি করে নেব—তুমি তো আমি মিষ্টি, না টক কমলা তাই জান না? —তাহলে অধিকার দিচ্ছ? —আচ্ছা পাগল তো? এবার নরেন নিবিড়ভাবে চুমু খেল। তারপর কমলা বলল তুমি পুরুষ—মেয়েদের সম্পর্কে এত অভিযোগ কেন? যারা তোমার নিন্দে করছে—তাদের মতামতের মূল্য কি? কেউ কারও চেহারার জন্যে দায়ী নন। তাছাড়া যারা দেখতে জানে—তারা জানে তুমি পুরুষ—ম্যানলি। এবার নরেন কমলাকে জড়িয়ে ধরে।

এই কমলাই আস্তে আস্তে মা'র কাজ বুঝে নিতে থাকে। ডিসপেনসরি, জমি, জমা, আদায় পত্তর—রান্নাবান্নার তদারকী। কমলার মধ্যে একটা সহজ কর্ত্রীত্ববোধ আছে—তা নরেনের মা গোড়া থেকেই বুঝতে পেরেছিলেন। আর কর্ত্রীত্বের স্বাদ পেয়ে কমলাও

পরিশ্রম করতে দ্বিধা করেনি। মা বৌ পেয়ে খুশি। আসলে একা একা থাকতে তিনিও হাফিয়ে উঠেছিলেন। বৌ সঙ্গী পেয়ে সুখী। দেখলেন, বৌয়ের কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারত পড়া, বাল্মীকির রামায়ণ বাংলায় পড়া। রাতে অনেক গল্প শোনাতেন। মা'র অনুমতি নিয়ে রেডিওগ্রাম বাজাত—কত দেশী, বিদেশীগান, কত রবীন্দ্র সংগীত—কোনদিন দুপুরে—কোনোদিন রাত করে। রেডিও তে সংবাদ, গান এমনকি নাটকের নেশা পর্যন্ত মাকে ধরিয়েছিল। অধিকার বোধ পুত্রবধূ কেড়ে নেয় বলে যে ধারণা আছে—এখানে নরেনের মা'র মেয়ের একটি আকাঙ্ক্ষা ছিল —তা পূরণ হল বলে সেই শাশুড়ীর ঈর্ষা নরেনের মার মনে পথ করে নিতে পারল না। আর নরেনও আসে মাসে বড় জোর একদিন। শনিবার এসে সোমবার সকালে যায়।

নরেন সারাদিনই ব্যস্ত বাড়িতে এসে হয়তো ছোট্ট চিঠি পেল—আমার কালোজাম, তোমার স্বাদ কতদিন পাইনি বলতো? মাসে একদিন—এত কৃপণ বরাদ্দ কেন? শিগগির স্বাদ দাও—নাও। ইতি তোমার লেবু।'

নরেন লিখল মিষ্টি লেবু, তোমার কত কোয়া—সংসারে এক একটি করে সবাইকে তা বিলাচ্ছ। আমার জন্য এক কোয়া রেখ। মুখ সরস করবার জন্য আমি ব্যগ্র। কিন্তু আমার কবে যে কমলালেবুর সীজন হবে—কে জানে? লজ্জায় হয়তো বা রাগেও তোমার মুখ আপেলের মত হয়ে ওঠে। তুমি আমার আপেল আর লেবু—দুটোর স্বাদ একসঙ্গে পেতে—শিগগিরই মানে দশদিন পর যাচ্ছি। তোমার কালোজাম। কমলা লিখল—আমার এপেলো, আমার খোসা ছাড়িয়ে তুমি দৌড় দিয়েছ—কোয়া কাকে দেব? সংসার তো খোসাটা পেয়েই খুশি—কোয়াগুলো নিজের স্বাদ বুঝবার জন্যে তোমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। সত্যি, মাসে দু'বার কি আসা যায় না। দু'জন নারী—একজন লেবু ও আপেলের মিকশ্চার — আর একজন পুত্রলোলুপ মা—কি খুশি হয় বলতো? দুদিন এলে কেউ তোমাকে স্ত্রৈন বলবে না। সত্যি ঘরের পিছুটান কি নেই? মাত্র দু'আড়াই ঘন্টার তো রাস্তা। তুমি কাজের মধ্যে সব ভুলে থাক-তোমার ভুলবার শক্তি আনইউজাল—আমি প্রতিটি কাজে তোমাকে মনে করি—আমার আগ্রহ কি মাধ্যাকর্ষণের চেয়ে কম। এপেল পড়ে যাওয়াতেই তো মাধ্যাকর্ষণ আবিষ্কার হল। আমার মধ্যাকর্ষণে অ্যাপেল আসবে না? ইতি তোমার বিগত লেবু, ও বর্তমান আপেল।

এমনি চিঠিপত্র চলত। যতক্ষণ থাকত মা, কমলা ও নরেন একসঙ্গে অনেক গল্প করত। সারারাত ওদের কথা শেষ হত না। নরেন অনেক স্বাভাবিক হল। একটা মানবতার স্পর্শ যেন আজকাল নরেনের ব্যবহারে পাওয়া যায়। আগে ছিল পেশাদারী — এখন যেন কিছুটা মানবিক।

প্রথম সন্তানের সময় মা-ই জোর করে রেখেছিলেন। কমলার বড্ড ভয় ভয় করছিল। কিন্তু কোনো হাঙ্গামা হল না। মেয়ে হল। বংশে মেয়ে এল। মাও খুশি। পরের বার দু বছরের মাথায় ছেলে। মা বিরাট করে অন্নপ্রাশন করলেন। কমলা দুই সন্তান নিয়ে ব্যস্ত। বিয়ের চার বছরের মাথায় মা হঠাৎ বিনা ভূমিকায় মারা গেলেন। রান্নার লোককে কি নির্দেশ দিতে গিয়ে বুকে হাত দিয়ে বসেছিলেন—শুয়ে পড়লেন।

শ্রাদ্ধশান্তির পর কমলাকে কিছুদিনের জন্য বাপের বাড়ি পাঠিয়ে নরেন একটি সুন্দর দোতালা বাড়ি করল। তারপর—কেবলমাত্র বাড়িখানা রেখে জমিজমা সব বেঁচে দিল—ডিসপেনসেরিও। আর কমপাউন্ডারকে টাকা ও জমি দিয়ে—বাড়ির ভার এদের হাতে তুলে দিয়ে কমলাকে কর্মস্থলে নিয়ে এল। ইতিমধ্যে নরেন পুরো নার্সিংহোমটা কিনে নল—কমলার নামে। আরো দু'খানা বাড়ি কিনল—তাও কমলার নামে।

ইতিমধ্যে কমলার দাদার সঙ্গেও মীনার বিয়ে হয়ে গেল। নিজের নামে দু'টো মোটা টাকার ইনসুরেন্স আছে—ন মিনি কমলা। ছেলে ও মেয়ের এডুকেশনের জন্য ব্যাঙ্কে ফিক্সড ডিপোজিট করে রেখেছে বেশ বড় অঙ্কের টাকা। ওদের বিলেত পাঠিয়ে একজনকে ডাক্তার—আরেকজনকে প্রফেসর করবার ইচ্ছে। তবে কোনো জোর নেই—বাবার কাছে ওদের সব আবদার। না চাইতেই এত খেলনা এনে দেয়—এত কিছু দেয়—এরা কিছুক্ষণ বাবাকে না দেখতে পেলে হাঁফিয়ে ওঠে। নরেন বাবা-মা'র শাসন পেয়েছে—তাদের অন্তরের স্নেহ ছিল কর্তব্য পালনের মধ্য দিয়ে। বাড়ি এলে ছেলে মেয়ে দু'হাত ধরে ঝুলতে থাকত। এটা ওটা আবদার লেগেই আছে। নরেনের স্নেহ-ক্ষুধা যেন এতকাল পর তৃপ্তি লাভ করত। বাড়ি ফেরবার সময় কমলাকে দেখবার আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে বাচ্চা দুটোও ওকে কেবলই টানতে থাকত। কমলা কড়া শাসনে ছেলে মেয়েদের পড়াশুনা, ব্যবহার, গল্প ও শুনাত। এই গল্প বলবার মধ্য দিয়েই ওরা যেন ওদের মা'র একটা স্নেহময় রূপ দেখত। কিন্তু নরেনকে দেখলে ওরা যেখানেই থাক ছুটে আসত, চঞ্চল হয়ে উঠত। কেউ পিঠে চড়ত—কেউ কোল দখল করে থাকত। কে কোন হাত নেবে—সকলেই ডান হাত চায়— দু'জনেই ডান হাত ধরে টানাটানি। এমনি সময় যদি কমলা এসে হাজির হত—সব মাটি। কমলাকে দেখলেই ওরা থেমে যেত। কমলা বলত—কি হুটোপুটি শুরু হয়েছে—তুমি একটু শাসন করতে পার না? একটা ধমক? নরেন ছেলেমেয়ে দুটোকে দু'হাতে জড়িয়ে যেন কমলার হাত থেকে ওদের রক্ষা করবার আশ্বাস দিচ্ছে। —নিজে বাচ্চা বয়সে, ছেলেবেলায়, কিশোর বয়সে শুধু শাসন পেয়েছি। স্নেহ, আদর, আবদার কিছুই জোটেনি ঐ অত বড় বাড়ির একমাত্র ছেলের। আমার ব্যক্তিত্বই গড়ে ওঠেনি। নিতান্তই বাধো বাধো ঠেকেছে-নইলে আমারও হুটোপুটি করতে ইচ্ছে করছে। শাসনটা তুমি করছ—তাতেই হবে। আমায় স্নেহ করতে দাও, পেতে দাও, আমি ওদের বন্ধু-বাবা। —তুমি এত খেলনা কিনে দাও কেন? কেনা মাত্র নিয়ে মেতে থাকে—তারপর ফিরেও তাকায় না। আমি বাড়ি থাকলে—ওদের আমার কাছে আসতে বাধা দিওনা। ওদের মধ্য দিয়ে—ওদের সঙ্গে খেলে—আমার না পাওয়া ছেলেবেলাটা ফেরত পেতে বাধা দিও না। তখনকার মত কমলা চলে যেতেই ছেলে মেয়ে দু'জনে বাবাকে চুমো খেয়ে বলল—বাবা আজ যা সেফ করলে—মা একদম ডিফিটেড। তোমার বাবা কি তোমাকে খুব মারত? ভেরী ক্রুয়েল পার্সন ছিলেন। যখন তখন তোমাকে স্ন্যাপ—মা'র মত। —আরে না, না, বাবা এত গম্ভীর ছিলেন কথা বলতে ভয় পেতাম। বাবার রুটিন করে দিতেন-তার বাইরে যাবার উপায় ছিল না।

—কি কি পানিসমেন্ট দিত তোমাকে?—আমি সব মেনে চলতাম তাই পানিসমেন্ট পাইনি।

—দেখ বাবা, তুমি আমাদের খেলনা দাও বলে মা কমপ্লেন করল—কিন্তু মাকে যে তুমি এত শাড়ি— কত কি দাও—কই আমরা তো কমপ্লেন করছি না। বলল মেয়েটি।

ছেলে বলল— তুমি আবার সব আমাদের নতুন খেলনা, জামা কাপড় সব দেবে তো? মার কথা শুনবে না তো? মা তো তোমাকে পানিশ করতে পারবে না। তোমার গায়ে এত জোর।

—তোদেরও দেব—তোদের মাকেও দেব।

ছেলেমেয়েরা নরেনকে ঘিরে নাচতে থাকে।

তারপর মেয়েটি বলে, তবে বাবা, মা'র জন্যই আমরা স্ট্যান্ড করতে পারছি—পানিস করে বটে—রাতে শোবার সময় গল্পও করে। ইন্টারেস্টিং।

ছেলেমেয়েরা চলে গেলে কমলা বলে—তুমি কি বলতো? নিজের ছেলে মেয়ের সামনেই নিজের ছেলেবেলার কথা বলছ। ছেলেমেয়ের আদর পেলে তোমার সন্ট কমে যায়।

—তুমি এক কাজ কর, ছেলেমেয়েদের সঙ্গে কথা বলবার আগে আমাকে এক চামচ সন্ট খাইয়ে দিও।

কমলা ছটফট করে। এ ভাবে মাথায় তুললে ছেলেমেয়ে মানুষ করা যায়। নিজে ছেলেবেলায় একটা মোমের পুতুলও পেয়েছে কিনা সন্দেহ। দাদা মাঝে মধ্যে দু'একটা খেলনা দিত। তা যদি কোন কারণে ভেঙে যেত—কী কান্না কমলার। মা খেলনা দেবার পক্ষপাতী ছিলেন না। তার চেয়ে একটা ফ্রক দিলে মা খুশি হতেন। বাবাকে ঝাপসা ঝাপসা মনে পড়ে। পাড়ার মেয়েদের সঙ্গে লুকোচুরি, দ্বাড়িবান্দা, গোল্লাছুট—রাস্তার মধ্যে—পার্কে দোলনায় চড়া, স্লিপে চড়া ছেলেবেলা ওর মত অভিমানে বই নিয়ে বসে থাকতে হয়নি। বড্ড স্নেহকাতর। একঘর খেলনা—তাও দিচ্ছে। আর আমাকে যে কী দেবে—ভেবে পায়না—কখনো প্যারিস থেকে এসেন্স আনছে—ক'টা কত রকমের কাশ্মীরী শাল—কত পোষাক—দুটো আলমারী বোঝাই হয়ে গেছে। শেষবারে বৌদি দেখে তো মুখ চুন। নিজের ছেলেবেলা আর ছেলেমেয়েদের ছেলেবেলা দেখে ওর ঈর্ষা একটা ছোট বঞ্চনার বেদনায় মনে প্রকাশ পেত। তবু, নরেনের সঙ্গে তুলনায়—যে কখনও খেলাধুলা করতে পারেনি—অনেক স্বাভাবিক। তখন কিন্তু বঞ্চনার বেদনা কিছু ছিল না। সন্ধ্যা হলেও খেলা শেষ না হলে বাড়ি গিয়ে মা'র সামনে পড়তে হবে—এই ভয় ষোল আনা ছিল। ছেলেবেলায় পড়ার ছেলেমেয়েদের সঙ্গে খেলেছে, স্কুলে ও টিফিনে খেলেছে—কত বন্ধু ছিল। কলেজেও খুব পপুলার ছিল—কত মেয়ে বন্ধু। মা'র বয়সি মেয়েদের সঙ্গে ওর বেশ বনে যায়। কিন্তু সমবয়সি সহকর্মীদের স্ত্রীদের সঙ্গে বনিবনা হয়না। মেলামেশা আছে—হৃদ্যতা নেই। আসলে দাদা যখন ওকেই ইংরেজি বাংলা, সংস্কৃত বিশেষ করে ইংরেজি আর বাংলার উপন্যাসের জগতে নিয়ে এল—ভাই-বোন মিলে এক একটা বই পড়ে—দাদাকে ইংরেজিতে গল্পটা বলবার পর

দাদা ইংরেজিতেই সমালোচনা করতেন। এমনি করে পপুলার সায়েন্স, গ্রিক, রোমান হিষ্ট্রি, ফ্রেঞ্চ রিভলিওসনের দাঁতোকে দাদা পছন্দ করতেন—দাদার পছন্দই ওর পছন্দ—দাদার মতই ওর মত। রাশিয়ার বিপ্লব—দাদা ট্রটস্কিকে পছন্দ করতেন—কমলাও তাই। সেই দাদা আজ দু'বছর হল—একখানা চিঠিও লেখে না। মনটা দাদার জন্যে উদাস হয়ে যায়। মা'র জন্যে চোখে জল আসে। বাপের বাড়ি আর নেই। .....কমলার বুঝতে অসুবিধে হলনা—নরেনের অর্থ উপার্জনের প্রবল আকাঙ্ক্ষা—কিন্তু অর্থের ওপর ওর কোনো মোহ নেই। নিজের বাড়িতেই নরেন কমলার জন্যে একটা অফিস খুলে দিয়েছিল। সেখানে ডিসপেনসরির ছেলেটা এসে কমলার কাছে সপ্তাহের কেনা বেচার হিসাব দেখিয়ে নিত। দু'এক মাস অন্তর কমলা স্টক টেকিংও করত। বাড়ি ভাড়া আদায় করে দিত ডিসপেনসরির ছেলেটাই। কমলারই বয়সী যেমন স্মার্ট—তেমনি তীক্ষ্ণ বুদ্ধি। আস্তে আস্তে নার্সিং হোমেও যেতে আরম্ভ করল। পরিচালনা বুঝে নিতে লাগল। শেষ পর্যন্ত ছেলেমেয়েদের স্কুলে পাঠিয়ে নার্সিংহোম যেত—অনেকক্ষণ থাকত। একটায় ফিরত। সবাই জানত, স্ত্রীর নামে করলেও আসল কর্ত্তা ডাক্তার গাঙ্গুলীই। কিন্তু অচিরেই বুঝে গেল—মালিকান শক্ত মেয়ে মানুষ। হিসেব বোঝে। আদেশ দিতে পারে। আদেশ পালন হল কিনা তা পরীক্ষা করে দেখে। ডাক্তার থেকে নার্স সবাই কমলাকে ভয় পেত।

দ্বিজুর ঘটনার পর কিছুদিন রাতে বের হতে না পেরে নরেন ছটফট করতে লাগল। নরেনের একটা গুণ—যেটা ওর মেডিক্যাল কলেজের মাষ্টারমশায়রা জানতেন—বিলেতেও মাষ্টারমশায়রা জানতেন—ওর ঝুঁকি নেবার দুর্জয় সাহস। যে রোগীকে অপারেশন করলে মৃত্যুর চান্স আশি—ও তাকে বাঁচিয়ে তুলেছে। ওর মেডিকেল-সেন্স তীক্ষ্ণ শুধু নয়—অসাধারণ আন্দাজ শক্তি আছে—যাকে হয়ত ইনটিউশন অনেকে বলে। ও 'ইনটিউশন' এর দাবি করে না—কিন্তু রোগ নির্ণয়ে সঠিক আন্দাজ করবার শক্তি, ঝুঁকি নেবার সাহস, একটা দুর্জয় সাহস ওর মধ্যে আছে। মাপা কথা, প্রায় নিস্তেজ ব্যবহার, পরিমিত আচরণ, অমিশুক স্বভাব, নিরীহ চালচলনের অন্তরালে একটি সদাসতর্ক তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও সাহস আছে যা বাইরের লোক বুঝতেও পারেনা। প্রয়োজনে তীক্ষ্ণ যুক্তি—তথ্যভিত্তিক যুক্তিতে কেউ ওর সামনে দাঁড়াতে পারে না। কিন্তু এ স্বভাব এত চাপা—এমনকি কমলাও সঠিক অনুমান করতে পারেনি।

দ্বিজুর টাকা নেবার পর যেটা ওর সবচেয়ে লেগেছে—তা হল ওর বাড়িতে নিজের স্ত্রীর অপমান। উড়ো ফোনে হুমকি, উড়ো চিঠিতে প্রাণনাশের হুমকি, পুলিশও রাতে বের হতে নিষেধ করল—তখন কিছুদিন রাতে ও বের হয়নি। কিন্তু রাতে নার্সিংহোমে রোগী ভর্ত্তি বন্ধ করা, রাতের 'কল' ফিরিয়ে দেওয়া যেন ওর সাহসকে চ্যালেঞ্জ করল। ক'দিন পরই নরেন নার্সিংহোমে ভর্ত্তি শুরু করে দিল। কমলার জন্য একটা আমর্ড গার্ড—একজন প্রাক্তন সৈনিক নিযুক্ত করে দিল। শহরে রাতে একমাত্র নরেনই বের হত। নিজে গার্ড নিত না। রাতে সে বাড়িতে পাহারা দিত। শুধু প্রাক্তন সৈনিকটি—বয়স পঞ্চাশ—কঠিন স্বাস্থ্য—বল্ল—তোমার অস্ত্র যেন বেহাত না হয়। সে

জানাল—জান থাকতে নয়—আবার চাকুরি পেয়ে সে খুব খুশি। কমলা মোটরে ছেলেমেয়েদের দিয়ে নিয়ে আসত—সঙ্গে থাকত গার্ড। নার্সিংহোমেও সে চেয়ারের পেছনে দাঁড়িয়ে থাকত। নিজে একটা মোটর সাইকেল কিনে নিল। স্বাভাবিক স্পর্ধা। দেখ, তোমাদের কত অগ্রাহ্য করি। রাতে অবশ্য মোটরেই বের হত। এ ভাবে একমাস চলে গেল। তখন দু'একজন করে ডাক্তার বের হতে আরম্ভ করল।

ইতিমধ্যে নরেন একদিন মোটর সাইকেলেই হঠাৎ সেই অনুভূতি হল এবার অনুভূতি হল—ও যেন কোথাও নেই—সমস্ত চেতনা যেন কোথায় চলে গেছে—স্পষ্ট দেখতে পেল—ওর শরীর নেই, মন নেই, ও কোথাও নেই—দেখতে পেল—সব ঘরে কমলা ছুটে ছুটে চিৎকার করে ওকে খুঁজে বেড়াচ্ছে—দেখতে কমলা ব্যাকুল কান্নায় ওকে খুঁজে বেড়াচ্ছে—ও বলতে পারছে না যে আমি কোথাও নেই—আমি নেই। হঠাৎ ঘোর ভাঙতেই দেখল নিজের অজান্তেই নিজের বাড়ির দরজায় এসে দাড়িয়েছে—কীভাবে এল—সেই চৌধুরীবাজার পর্যন্ত মনে আছে—তারপর তিনমাইল পথ। সমস্ত শরীর ঘেমে গেছে। মোটর সাইকেল বন্ধ করে তাড়াতাড়ি দোতালায় এসে ফ্যান চালিয়ে শুয়ে পড়ল। কী হয় এগুলো আমার। সম নাম তো এরকম নয়। কমলা তখনও নার্সিংহোম থেকে ফিরে আসেনি। আমি একটা নেই-এর স্বপ্নরাজ্যে ছিলাম—কে চালিয়ে নিয়ে এল। এত মোড়, বাকে কি করে ঘোরালাম। কী অদ্ভুত অভিজ্ঞতা।

শুয়ে শুয়ে মনে পড়ল সেই একটা স্বপ্নের কথা। আগে খুব দেখত। মাঝে বহুকাল দেখেনি। কিন্তু পরশু রাতেই দেখেছে। নরেন জলে ডুবে যাচ্ছে—সেই পুকুরে—যেখানে ওর দাদা ডুবে মরেছিল। নরেন সাঁতার জানে—অথচ হাত পা অবশ। ও জলে ডুবে যেতে যেতে দেখল, সেই প্রেসিডেন্সির ইন্টারমিডিয়েটের মেয়েটি বিয়ের পর মোটর থেকে নেমে ছলছল করে চলে যাচ্ছে। নরেনের কষ্ট হচ্ছে—মেয়েটি সিঁথিতে সিঁদুর—ডুবে যাচ্ছে নরেন—শ্বাস নিতে পারছেনা। ঘুম ভেঙে গেল। দেখল সত্যি গভীরভাবে শ্বাস নিচ্ছে—কমলা ছেলেদের নিয়ে পাশের ঘরে। উঠে ফ্যানটা বাড়িয়ে দিল। চুপ করে শুয়ে থাকল। ইচ্ছে হল—কমলাকে একটু স্পর্শ করি—একটু দেখি। কিন্তু আর ঘুমুতে সাহস হল না। ভাবল একটা 'কল' এলে বেঁচে যাই। একটু পরেই 'কল' এল—বেড়িয়ে পড়ল। কমলা এল একটার পর। দুটো কেস এসেছে তোমার জন্য। কখন ফিরলে একি ঘামে জামা কাপড় সব ভিজে। এত ঘামলে কি করে। কমলা উদ্বিগ্ন হয়ে বলল। নরেন মিছে কথা বলল—যেখানে গেছিলাম—ওদের কারেন্ট চলে গেছে—অনেকক্ষণ থাকতে হল। তাই ঘেমে উঠেছিলাম। কমলা বলল—ও। দেখো, আজ আবার উড়ো ফোন—সেই থ্রেট। নরেন একটু ভ্রূ কুচকাল। তারপর কমলা বলল—অনেক ডাক্তারই চেপে গেছেন-ওরা অনেকের কাছ থেকেই টাকা নিয়েছে। নরেন বলল 'জানি'—এস.ডি.পিও আমাকে বলেছে। আমিই একমাত্র লোক যে ডাইরী করেছি। যত সব ভীরুর দল। —তোমাকে এস.ডি.পিও খুব পছন্দ করেন—যে করে ওর স্ত্রীকে বাচ্চাকে বাচিয়েছ—সবাই বলেছিল—বাচ্চা মরে গেছে—তুমিই একমাত্র 'না' বলে সিজারিয়ান করে জীবন্ত বাচ্চা বের করলে।' নরেন ভাবতে ভাবতে বলল—

ওরও বদলি হবার সময় হয়ে এল। নরেন খেয়েই বেরিয়ে পড়ল। হাসপাতালে ডাক্তারদের একটা মিটিং রয়েছে। ডি.এম. এসে প্রিসাইড করবে।

রাত তিনটা। হঠাৎ টেলিফোন বেজে উঠল। নরেন ফোন ধরে শুনল—তাড়াতাড়ি আসতে হবে স্যার—এমারজেন্সি কেস। —আসছি। নরেনের মনে হল—এখন তো সুব্রতর ডিউটি। কিন্তু গলাটা ওর কাঁপছিল। একটু চুপ থেকে এমারজেন্সিতে নরেন আবার ফোন করল—হ্যালো কে, ও সুব্রত, কি কেস—ও গাইনিক। ঠিক আছে। তোমার গলা কাঁপছে কেন? —কই না তো।—আচ্ছা আসছি। টেলিফোন রেখে দিয়ে এস.ডি.পিও কে ফোন করল—এই মাত্র নার্সিং হোম থেকে বাড়িতে ফোন পেলাম। যে ফোন করছে আমারই লোক—ওর গলাটা কাঁপছে। আজও সকালে টেলিফোনে আমার স্ত্রীকে থ্রেট করেছে। আমার মনে হচ্ছে কিছু একটা গন্ডোগোল হয়েছে। ব্যাপারটা আপনাকে জানিয়ে যাচ্ছি। —আমি থানার দারোগাকে এক্ষুনি আপনার নার্সিংহোমে যেতে বলছি। আপনার না যেতে পারলে ভালো হয়। —তা তো উপায় নেই—সত্যি যদি কোন এমারজেন্সি কেস হয়ে থাকে—তবে আমি না যেয়ে পারি না। যাই হোক জানালাম। নরেনের ভেতরটা বলছে, যেয়োনা—যেয়োনা—বিপদ। ভয়ংকর বিপদ। কমলা জেগে গেল। যাবার জন্য তৈরি হয়ে কমলাকে চুমু খেয়ে ঘুমন্ত মেয়ে ও ছেলেকে চুমো খেয়ে রওনা হল। কমলা উঠে পড়ল। —রাতে যাচ্ছ—গিয়ে একটা ফোন কর। আমি জেগেই থাকব। আজই ফোনে থ্রেটটা এল। এত ভয় হয়। —কমলা, ভয় পেয়ে বিপদকে এড়ানো যায়না। জীবনে কোনো দিন ভয় পাইনি—আজও না। চলি। কমলা আবার বলল—গিয়ে ফোন কর। আর্মড গার্ডকে বলল—আজ দরজা বন্ধ করে জেগে থাকবে। —জো হুজুর। সন্দেহ হলে গুলি চালাতে দ্বিধা করবে না। —জী।

মোটর বের করে নির্দ্ধিধায় নরেন নার্সিংহোমের দিকে রওনা হল। গভীর রাত। রাস্তায় কেউ নেই।

রমা একদৃষ্টিতে কল্যাণের যাবার পথের দিকে তন্ময় হয়ে তাকিয়ে থাকে। মনে হয়, আজ রমার তৃষ্ণা নিয়ে ওর স্ত্রীকে গ্রহণ করবে। ভাবতে যেমন বিশ্রী লাগে, তেমনি একটা প্রতিহিংসার আনন্দও বোধ করে। কিন্তু ভাবনাগুলো আপনা আপনি মনে আসে। কিন্তু কল্যাণের মুগ্ধ আবেশ, ওর চোখে চোখ রাখবার প্রতিযোগিতার ভয়, ওর চুমো, ঠোট রুমাল দিয়ে মুছে দেবার সময় সেই আবেশ ঘন দৃষ্টি। রমা ঠিক করেছিল। এগুলো আজ শোবার সময় ভাববে। কিন্তু কল্যাণকে বিদায় দিয়ে সেইখানেই তন্ময় হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। রমার দেহ—ঠোঁট, বুক স্পর্শের অতৃপ্ত অধীরতায় যেন ব্যাকুল হয়ে উঠতে চায়। আবার আগামীকাল—তবে বাড়িতে নিশ্চয় নয়—কোনো রেষ্টুরেন্টে। সেই সঙ্গে অনুতাপ নিজের কুমারী জীবনের এই আধাআধি শেষ—তাও একজন বিবাহিত পুরুষের স্পর্শ। আজ ওর মধ্যে একি পাগলামী দেখা দিল। আসলে সংযম ওকে শুকনো করেছে, বঞ্চিত করেছে, ঠুনকো আত্মবিশ্বাস দিয়েছে। এতদিন এতকাল কেউ তো ওর জীবনে আসেনি। সকলের মনোমত হতে গিয়ে আর আত্মসম্মান রাখতে গিয়ে একটা নীরস

গোমড়ামুখী হওয়াকেই গাম্ভীর্য বলে ধরে নিয়েছে। জীবনে আনন্দ নেই বলেই নিরস, মেলামেশা করবার সুযোগের অভাবই ওকে স্বতন্ত্র করে তুলেছে, আলাপ করবার কেউ নেই বলেই গম্ভীর। স্কুল জীবনে, কলেজ জীবনে বেছে বেছে দেখতে খারাপ মেয়েদের সঙ্গেই মিশত। কাউকে বাড়ি আসতে বলতে সাহস পেত না। অথচ কত জনের বাড়ি গেছে—কত আনন্দের সংসার। বাবা-মা ছেলে মেয়ে হাসি ঠাট্টা করছে যা ওর কাছে অকল্পনীয়। অথচ চাকুরি করতে এসে দেখল—পুরুষরা কত ভদ্র, বরং মেয়েরা সেই তুলনায় অনেক ছোট মনের। ওদের চাহনি, চোখে চোখে ইঙ্গিত—তুচ্ছ কথাবার্তা। অথচ পুরুষরা রিসেপসনরুমে বসলে ইউনিয়ন, পলিটিক্স, ডিরেক্টার। বড় জোর সেকসন ইনচার্জকে নিয়ে আলোচনা করবে। পুরুষরা রিসেপসনে বসবার আগে ওর অনুমতি নিয়ে নেয়। মেয়েরা তা করে না। অথচ ওর যোগ্যতা ওদের কারো চেয়ে কম নয়। রমা ঠিক করেছে —এবার অফিসার্স গ্রেডে রিক্রুটের খবর পেলে কমপিট করবে। এখানে এভাবে পড়ে থাকবে না। আবার কল্যাণের মুখ মনে পড়ে—ওর কম খাবার কথা মনে পড়ে। আসলে বড়লোকের ছেলে—নিজের ইচ্ছের বিরুদ্ধে খেতে পারেনা। ওর মতো তো নয়। কিছু জুটবে কিনা—এই আতংকেই তো ছোটবেলায় ছিল। অবন হৈচৈ করত। দাদাকে বোঝাবার ভার ওর ওপর।

—দিদি, অফিস থেকে কখন ফিরলেন। ট্রাম, বাস তো বন্ধ হয়ে গেছে।

পাড়ার ক্লাবের এই ছেলেটির নাম বিকাশ। কোনো একটি পার্টির হোলটাইমের ওয়ার্কার। কোথায় কখন থাকে কিচ্ছু ঠিক নেই। ওদের অবস্থা তো পাড়ার সবাই জানে। বিকাশ মাঝে মধ্যে ওদের লিটারেচার, প্যামপ্লেট পুস্তিকা ওকে দেয়। কখনও কোলোনটার জন্য দাম নেয়। ওকে পার্টির সিমপ্যাথাইজার ভাবে। আর রমাও জানে, অর্থ না হলে বেঁচেই থাকা যায় না—প্রেম ব্যর্থ হয়—অর্থই সর্বশক্তিমান ঈশ্বর।

—কিছু হয়েছে নাকি?

—গভর্নমেন্ট পড়ে গেছে। বামপন্থীরা সবাই মিলে আটচল্লিশ ঘণ্টার হরতাল ডেকেছে।

—তাই নাকি। দু'দিন ধরে হরতাল।

মনটা বিকল হয়ে যায়। দু'দিন ধরে কল্যাণকে দেখতে পাবে না। দু'দিন—যেখানে দু ঘণ্টা অসহ্য।

—হরতালের দুদিন বাড়ি থেকে বের হবেন না। বাজার করতে হলে এক্ষুনি যান—দোকান পত্তর এখনও খোলা আছে।

—আচ্ছা দেখি যদি কিছু আনতে হয়। বলে রমা বাড়ির ভিতর ঢুকতেই মার সঙ্গে দেখা।

—বিকাশ কি বলছিলরে?

—গভর্নমেন্ট পড়ে গেছে। আগামীকাল থেকে দু'দিন হরতাল। বাজার কিছু করতে হবে? এখনও দোকান খোলা আছে।

—ও নিয়ে তুই ভাবিস না। আজই বাজার করেছি। তবে নিরামিশ খেতে হবে

দুদিন—এই যা। আগামীকাল যে যেতে পারবিনা—তোর মনিব কিছু বলবে না।

—মনিবও আসতে পারবে না। মোটর নিয়ে রাস্তায় বের হলে হাওয়া বের করে দেবে। এখানে এত সহজে চাকরি যায়না। এখানে চাকরি পাওয়া কঠিন—চাকুরি যাওয়াও কঠিন। চুরি না করলে আমাদের চাকরি যায় না। তাছাড়া টাকা পয়সা লেনদেনের দপ্তর তো আমার নয়। চাকরি যাবার প্রশ্নই নেই।

রমা একটা উত্তেজনা বোধ করে। তাড়াতাড়ি বাবার ঘরে ঢোকে। দেখে বাবার চোখে মুখে আতংক।

—কে এসেছিলরে? মুখে চোখের ভয় গলায়ও সংক্রামিত হয়।

—আমাদের অফিসের এক অফিসার। ট্রাম, বাস বন্ধ। ভদ্রলোক মোটর ভাড়া করে আমাকে পৌছে দিয়ে গেলেন।

—ও। বাবার আতংক অনেক কমে।

—শোন বাবা, যিনি এসেছিলেন—কল্যাণ চ্যাটার্জী। উনি তোমার ছবির প্রদর্শনী করবেন। ভদ্রলোকের খুব ভালো কানেকসন আছে। রিসোর্সফুল। পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেয়া হবে। যাতে ভালো রিভিউ হয়—তারও বন্দোবস্ত হবে।

প্রদ্যোৎবাবু মাথা নাড়তে থাকেন—না-না-না-না।

—কেন?

না-না-না। কেবল মাথা নাড়েন। গভীর একটা আত্ম-অবিশ্বাস ভয়ের আকারে মনে প্রবেশ করে। হয়ত তিনি পুরান হয়ে গেছেন। হয়ত ছবিগুলো ভাল হয়নি—হয়তো তিনি অযথা নিজেকে আর্টিষ্ট ভাবতেন। আজ প্রদর্শনী হলে তার ফাঁকি ধরা পড়ে যাবে। তিনি যে চিত্রশিল্পী নন—এ কথা সবাই জেনে যাবে। তিনি আর অপমান হতে চান না।

শুধু বলেন—না-না।

রমা বলল—আচ্ছা পরে তোমার সঙ্গে কথা বলব। প্রদ্যোতবাবু মাথা নাড়তে থাকেন অবুঝ বালকের মত।

—ঠিক বলেছে, ঐ একিসজিবিসন বড় অপয়া। সেই থেকেই তো সর্বনাশ শুরু হয়েছে। পয়সা খরচ করে ছবির জন্য......।

রমা মা'র দিকে তাকিয়ে বলল—এ জন্য আমার কোনো পযসা খরচ হবেনা। সংসারে কোনো অভাব আর হবে না। যতদিন আমি বেঁচে আছি—তোমাদের কোনোদিন অন্নচিন্তা করতে হবেনা। মা এবার কিছুটা নিশ্চিন্ত হন। কিন্তু তার আপত্তি শুধু অর্থ ব্যয়ে নয়। হঠাৎ যদি নাম হয়ে যায়। স্বামী যদি তার চেয়েও বড় হয়ে যান—এই ঈর্ষাও তিনি তখন থেকে অনুভব করছিলেন। সেই সঙ্গে মেয়ের বাবার ওপর এতটান—এও তার অসহ্য লাগছিল।

—খেতে দিস—কত আর শোনাবি।

মা'র এই কণ্ঠস্বর রমা চেনে। আসন্ন ঝগড়া—বিলাপ ও পার্কে বেঞ্চে যাবার ইঙ্গিত।

—মা, সারাদিন কিছুই প্রায় খাইনি। গা'টা কেমন গুলোচ্ছে। ভাত কি খাব?

মা সঙ্গে সঙ্গে আতংকিত হয়ে ওঠেন—ভাতই খা দুটো। গরম ভাত করেছি। আয় বোস্।

মা'র রাগ পড়ে যায়। মেয়ের জন্য চিন্তা করতে গিয়ে ভাবেন কতদিন তিনি শুধু জল খেয়ে কাটিয়েছেন—তার হিসেব ঈশ্বর জানেন। একদিনে রমা এত কাতর। তবু মা'র মনে কল্যাণ নিয়ে কটূক্তি করবার ইচ্ছে ছিল—রমার রকম সকমও ভালো ঠেকছে না। এ নিয়ে একটা ঝগড়া করবার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু রমার শরীর খারাপ শুনে সব ভুলে গেলেন।

খেতে দিতে দিতে কল্যাণের ভুক্তাবশেষ দেখে অপচয়ের জন্য শোক উথলে ওঠে। কিন্তু মেয়ের খাওয়া পাছে বন্ধ হয়—তাই তিনি চুপ করে থাকেন। কিন্তু চুপ করে থাকাও তার পক্ষে কষ্টকর।

—দ্যাখ, আমরা ছেলেবেলায় ফেলাছড়ার মধ্য দিয়ে বড় হয়েছি—মা রোজ দুধ খাওয়াতেন বড় কাঁসার এক গেলাস। দুধ খেতে চাইতাম না—রোজ খেতে হত। সকালে দুধের সঙ্গে চিড়ে ভাজা তো থাকতই। দুপুরে দু'রকমের মাছ। বিকেলে আমের দিনে আম-কাঁঠাল। ক্ষীর থাকলে মুড়ি দিয়ে। রাতে আবার মাছ-ভাত তো থাকতই। দুধ খেতে চাইতাম না বলে পায়েস থাকত। খেয়েছিলেম বলে শরীরের ভেতরকার গঠন শক্ত ছিল। তোর বাবার সংসারে কতদিন শুধু জল খেয়ে কাটিয়েছি। শরীর তেমন ভাঙেনি—মাথাটা ঝিম ঝিম করত। আর তোরা কি খেয়ে বড় হয়েছিস। না পড়েছে ফেঁটে এক ফোটা দুধ, চিঁড়ে মুড়ি দূরে থাক— ভাতই জোটেনি সকল দিন। তাই একদিন না খেলে তোর শরীর গুলোতে আরম্ভ করে। করবেই তো। উঠতি বয়সে খেলিটা কি? শরীরের ভিতই তোদের দুর্বল। অবনটা দেখিসনি—দুদিনের জ্বরেই কেমন এলিয়ে পড়ত।

—তোমার আর বাবার জন্য হরলিকস এনে দেব। দু'বেলা দু'জনে খাবে।

—তোর বাবার জন্য আনিস—নিত্য রোগী। তুই খাস। আমার দু'বেলা দু'মুঠো হলেই চলে যাবে।

রমা একবার মা'র দিকে তাকিয়ে খাবার শেষ করে উঠে যায়। তারপর বিছানায় গিয়ে শোয়। মা'র আসতে অনেক দেরী। খাবেন—বাসন মাজা, রান্নাঘর পরিষ্কার করা। বাবার খাওয়া আগেই হয়ে গেছে। রমা বিছানায় শুয়ে এবার বোধ করল কতখানি ক্লান্ত। কল্যাণের সুন্দর মুখ চোখর সামনে ভাসতে ভাসতে মনের সকল দিকে ছড়িয়ে পড়ে। একটা প্রবল তৃপ্তি যেন ওকে গ্রাস করে। কখন গভীর ঘুমে ঢুকে পড়ে—টেরও পায় না।

ভোর ভোর প্রদ্যোতবাবু জেগে বা স্বপ্নে তা বলা যাবে না—দৃশ্য দেখছেন। সেই বিক্রমপুর—পুব বাংলার একটি গ্রাম—ধুধু মাঠ বহুদূর পর্যন্ত প্রসারিত—সবুজ ধানের গভীর সবুজ মাঠের পর মাঠকে সবুজ স্নিগ্ধ করে তুলেছে। তারপর দিগন্ত প্রসারিত পদ্মা নদী—ওপার ভালো করে দেখা যায় না। গভীর নীল আকাশ নেমে এসেছে পদ্মার ওপারে। এমন গভীর নীল আর গভীর সবুজ তাকে ছেলেবেলায় ছবি আঁকবার প্রেরণা

দিয়েছিল। কিন্তু সেই গভীর নীল আকাশের দিকে তাকিয়ে তিনি স্তব্ধ হয়ে গেলেন। আকাশের গায়ে তাঁর আঁকা এক একটা ছবি ঝুলে পড়েছে। তাঁর আকা সব ভালো ভালো ছবিগুলো জ্বল জ্বল করছে। তাঁর প্রাণের স্পর্শে আকাশে —সমস্ত আকাশ জুড়ে—তার ছবিগুলোর প্রতিটি রেখার টান পর্যন্ত বোঝা যাচ্ছে। তাঁর আনন্দ হল— এবার জগত তাঁর ছবি দেখবে। কিন্তু অতবড় মাঠে একটাও লোক নেই যে ছবি দেখবে—এত বড় নদীতে একটাও নৌকা নেই—যার যাত্রীরা এই ছবিগুলো দেখবে। হঠাৎ দেখলেন ছবিগুলো পদ্মার জলে একে একে খসে পড়ে যাচ্ছে। তার নিদারুণ কষ্ট হচ্ছে। যেই জায়গার ছবিগুলো খসে যাচ্ছে নীল আকাশটার সেই জায়গাটা কালো হয়ে যাচ্ছে দেখতে দেখতে নীল আকাশটা মেঘহীন কালো আকাশ হয়ে যাচ্ছে।— হঠাৎ এক কোনায় দেখলেন ছায়ার ছবি গুলো রয়ে গেছে—অসাধারণ লাবন্যময় ছবিগুলো—বিয়ের আগে অল্প—বিয়ের পরই বেশি। কিন্তু ছবিগুলো টলছে—পড়ল বলে। মেঘহীন কালো আকাশ যেন ছবিগুলোকে জলে ফেলে দিতে চাচ্ছে। তিনি দৌড়ে ছায়াদের সেই বালিগঞ্জের বাড়ির রাস্তায়—সেই ছায়ার বাপের বাড়ির পায়চারী করা রাস্তায়—এসে চিৎকার করে—প্রাণপণে চিৎকার করে ডাকতে লাগলেন—জানেন এভাবে চিৎকার করে ছায়াকে ডাকলে ওর বাড়ির লোকেরা আপত্তি করবে। তবু আজ আর সময় নেই। ছায়া ছায়া এসে দেখে যাও। ছায়া কোথায় তুমি? ঐ তো দক্ষিণের জানলা—ঐ তো চিলে কোঠার জানলা কোথায় তুমি?

এদিকে রমার মা হঠাৎ প্রদ্যোৎ বাবুর পরিষ্কার 'ছায়া' ডাক শুনে একই সঙ্গে অবাক ও বিরক্ত হলেন। ছায়া বলে ডাকেন না বহুকাল। এখন ডাকলে—শুনছ। ব্যস্। ভাবলেন—এই সাত সকালেই আবার টান উঠল—কতক্ষণ চলবে কে জানে? তিনি পাশে এসে দেখেন একি মুখের চেহারা! কেমন একটা জেদি, অহংকারী—সেই আগের চেহারা। তিনি স্তব্ধ হয়ে শোনেন। প্রলাপ বকছে। বার কয়েক বললেন—এই তো আমি—কি হয়েছে—ডাকছ কেন? কিন্তু প্রদ্যোৎবাবু কিছুই শুনতে পেলেন না।

এবার প্রদ্যোৎবাবু দেখলেন—ছায়া কোথাও নেই। দিনের আকাশে সূর্য নেই—রাত নেই। সমস্ত আকাশ কালো—পদ্মার জল কালো—মাঠের ধান কালো। অথচ সূর্য না থাকা সত্ত্বেও দিন।

এবার প্রদ্যোৎবাবু বলতে থাকেন—ছায়া, তুমি মরে গেছ—যখন তোমার ছবিগুলো এঁকেছিলাম—তখন তুমি আমি দু'জনেই বেঁচেছিলাম। বড় মিষ্টি, বড় আদুরে, চোখ তুলে লজ্জায় তাকাতে পারত না। যখন তুমি অবাক হতে—অবাক হবার এমন সৌন্দর্য আর আমি দেখিনি। বড় কোমল—এত অল্পে আঘাত পেতে—তোমার আধো আধো কথা—সেই ভালবাসার সব ছবি তো আমি এঁকেছি। কী ভালবাসতাম আমরা দু'জন দু'জনকে। প্রথমে ভগবান আমাকে খুন করলেন—তারপর আমার হাত দিয়ে তোমাকে মারলেন। ছায়া আমি তোমাকে খুন করেছি—আমার জন্যই তুমি আত্মহত্যা করেছ। আজ এই কালো আকাশের কোথায় তুমি জানিনে। সবই পদ্মায় ডুবে গেল। আমার অমন ছেলেটা ভগবান নিয়ে নিল। অবনকে ছিনিয়ে নিল। আর আর আমার একটা

মেয়ে আছে......কি যেন নাম ওর......ভগবান তোমাকে বিশ্বাস করে আমি ঠকে গেছি। মরতে আমাকে হবেই একদিন.....সেদিন তোমাকে ভগবান আমি ছেড়ে দেব না—তোমার সঙ্গে অনেক বোঝাপড়া বাকি—হোক একবার আমার মৃত্যু—তোমায় দেখে নেব। ......আমার একটা কাজ বাকি—আমার খুন হওয়া আমার ছবিটা আমার আঁকা হয়নি। এই আমার শেষ ছবি। আমি আঁকব—আমাকে এঁকে যেতে হবে। আমি আবার আঁকব। ছায়া, বড় আদরের ছবি—তোমাকে ছেড়ে কতকাল আছি—বড় মিষ্টি, বড় কোমল, কি সুন্দর চাহনি.....আমার ছায়া....আমার আমার একটা মেয়ে কি যেন নাম......মেয়েটা.....ছায়া....মেয়েটা.....। বুকে এক ঘড় ঘড় শব্দ হতেই প্রদ্যোৎবাবু বড় বড় চোখ করে সমস্ত ঘরে কাকে যেন খুজলেন। স্ত্রীকে চিনতে পারলেন না। আবার চোখ বুজলেন। মেয়ের নাম মনে করবার চেষ্টা করতে করতে ভগবানের সঙ্গে বোঝাপড়া করবার জন্য মৃত্যুর পথ দিয়ে জীবন থেকে বেরিয়ে গেলেন।

রমার মা স্তব্ধ হয়ে শুনছিলেন। এ কণ্ঠস্বর বহুদিনের পুরানো। তিনি রমাকে ডাকতে ভুলে গেলেন। প্রতিটি কথা মনে দাগ কেটে বসে গেল। বুকে ঘড় ঘড় ও জিহ্বা একটু উল্টে ঠিক হয়ে যেতেই তিনি চিৎকার করে ডাকলেন—রমা—রমা—শীগগীর আয়—তোর বাবা কেমন করছে। রমা শুধু শায়া আর ব্লাউজ পরে ছুটে এল। ঘুমের ঘোর তখনও যায়নি। বাবার নাড়ি পরীক্ষা করল। কান পেতে বুকে হৃদস্পন্দন শোনবার চেষ্টা করল। কান্না-চাপা কণ্ঠে ডাকল—বাবা, বাবা। মা কিছু বলতে গিয়ে পারলেন না। রমা একটা শাড়ি জড়িয়ে ডাক্তার ডাকতে ছুটল। জুতো পরতেও ভুলে গেল। রমা বেরিয়ে যেতেই ওর মা গঙ্গা জল মুখে দিলেন। গঙ্গা জল ঠোঁটের দুই কোষ বেয়ে পড়ে গেল।

রমা ছুটতে ছুটতে যেতে লাগল। —রমাকে এভাবে যেতে দেখে রাস্তায় ক'টি ছেলে থমকে দাঁড়াল—যারা প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়ে ছিল—তারাও থমকে দাঁড়াল। ডাক্তারবাবু গায়ে একটা জামা দিয়ে ব্যাগ দিয়ে রওনা হলেন তক্ষুনি। ছেলেরা বা প্রাতঃভ্রমণকারীরা রমাদের দরজার কাছে এসে দাঁড়াল। সকলেই পরিচিত। ডাক্তার পরীক্ষা করে বললেন—স্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে। ছায়া ও রমা চিৎকার করে কেঁদে উঠল। ছায়া ডাক্তার ঢুকতেই বলছিল—একা একা ডেথ সার্টিফিকেট লিখতে লিখতে ডাক্তার জিজ্ঞেস করলেন বয়েস যেন কত?

ছায়া কাঁদতে কাঁদতেই বলল—পঞ্চাশ।

কান্না শুনেই বাইরের ছেলে ও বুড়োরা একসঙ্গে ঢুকে পড়ল।

ডাক্তারবাবু বললেন—একজন শক্তিমান চিত্রশিল্পী অথচ জীবনে প্রতিষ্ঠা পেল না—শুধু দুঃখই পেল—ছবিগুলো দেখবেন—কী অসাধারণ। ফিস না নিয়েই তিনি বের হয়ে যাবার সময় বললেন—বড় কষ্ট পাচ্ছিলেন—ভগবান ডেকে নিলেন—মানুষ তো নিতে পারেনি। আজ সব যন্ত্রণার শেষ।

পরিচিত পাড়া—এখানেই প্রথম বিয়ে করে এসেছিলেন—এতকাল এ পাড়াতেই সব বাড়িওয়ালা ও পুরানো ভাড়াটে সবাই এদের দুঃখ, কষ্ট, ঝগড়াঝাটি সবই জানতেন। নারী পুরুষে বাড়ি ভরে গেল। তাছাড়া এমনিতে হরতাল। কারো অফিস নেই।

অধিকাংশই এসে পড়ল। ছায়া প্রদ্যোৎবাবুর হাতে মুখ লুকিয়ে কাঁদছিলেন। ছেলেবেলার একটা গান যেন তাকে চাবুক মারছিল—জীবনে যারে তুমি দাওনি মালা—মরণে কেন তারে দিতে এলে ফুল। রমার শুধু চোখ ভাসছিল—গতকাল রাতের বাবার সেই না, না, বলে অবুঝ বালকের মত মাথা নাড়া। মনে পড়ছিল, অবনের মৃত্যুর সময় সেই স্তব্ধ—বিফল দৃষ্টি—আর একটি কথা, ছেলে মরে যাবে—বাবা বেঁচে থাকবে—কী বিচার। থেকে থেকে সেই কথা বলছিলেন। আজ রমার মনে হয় সেই অবনের মৃত্যুর পর বাবা বিছানা নিলেন আর ভালো হলেন না। এতদিন ধরে তিনি মৃত্যুর দরজা খুঁজে চলেছেন—আজ সকালে সেই দরজা তিনি খুঁজে পেয়েছেন। আবার রমার মনে হয়, বাবাকে ভালো কোনো বড় ডাক্তার বা বিশেষজ্ঞ দেখান হয়নি। এক ডাক্তারের কথার ওপর নির্ভর করে চলেছে। সে বলেছে, এর কোনো চিকিৎসা হয় না। সে কথাই বেদ বাক্য বলে ধরে নিয়েছে। পাড়ার বৌ শাশুড়ি, মা, মেয়ে সবাই এসে জড়ো হয়েছেন। অনেকেই চোখের জল ফেলছেন।

সামনের বসবার ঘরে বৃদ্ধরা ও বয়স্করা বসেছেন—অনেকে মেজেতে—অনেকে দাড়িয়ে।

এমন সময় নাতির হাত ধরে পঁচাত্তর বছরের বৃদ্ধ তবে এখনও চলা ফেরায় সক্ষম। বাড়িওয়ালা আস্তে আস্তে এসে ঢুকলেন। বাড়িওয়ালার সত্তর বছরের স্ত্রী আগেই এসেছিলেন। বাড়িওয়ালা এসে বললেন—প্রদ্যোৎ চলে গেল। মনে হয় সেদিনের কথা। একটা তরতাজা বুড়ি একুশ বছরের ছেলে সঙ্গে একটা ফুটফুটে বৌ—এসে বলল, আমি আর্টিষ্ট প্রদ্যোৎ মিত্র। ব্রাহ্মণের মেয়ে বিয়ে করেছি। আপনার বাড়ি ভাড়া চাই। আমরা মাত্র দু'জন। বললাম, মিত্তির—আরে আমিও মিত্তির। ব্রাহ্মণের মেয়ে বিয়ে করেছ—ব্রেভো। আর্টিষ্ট মানুষ—পছন্দ আছে। নিয়ে নাও বাড়ি। বলল—পূর্ববঙ্গের এক জমিদারের ছেলে—মাসোহারা পায়। মনে হয় সেদিনের কথা। আমার বাড়িতে ওর চারখানা ওয়েলপেইন্টিং আছে—ওকে দিয়ে করিয়ে নিয়েছি। কম কষ্ট করেছে জীবনে। বোধ করি পঞ্চাশও হয়নি—এই কি যাবার সময়। ছেলেটাও অকালে—ভগবানের কী লীলা জানি না। ভদ্রলোক এসে বৈঠকখানায় বসলেন। একজন চেয়ার ছেড়ে দিল। সকলেই টাঙানো ছবিগুলো দেখতে লাগল। এই পাড়ার প্রায় সকলের কাছেই প্রদ্যোতবাবু টাকা ধার করেছেন—পরিবর্তে তারা প্রদ্যোৎবাবুকে দিয়ে দু'তিনখানা করে পর্ট্রেইট আঁকিয়ে নিয়েছেন—ছবি আঁকিয়ে নিয়েছেন—শুধু তেল রঙের পয়সাটা দিতে হয়েছে। এসব দেখে এদের মধ্যে যদি কোনো পরিচিত আর্টিষ্ট এ ছবি দেখে উচ্চ প্রশংসা করেছে—কত লেগেছে জিজ্ঞাসা পর্যন্ত করেছে। আজ এখানে সমবেত পাড়ার বয়স্ক লোকদের মনে হয়েছে, প্রদ্যোৎবাবুর জন্য তারা কিছু করেননি—তার প্রতিষ্ঠার জন্য তাদের কিছু করা উচিত ছিল। প্রদ্যোৎবাবুকে তাদের কখনও মনে পড়েনি—আজ মৃত্যু সংবাদে জানলেন তিনি এতকাল পাড়াতেই বেঁচে ছিলেন। তিনি অসুস্থ ছিলেন জানতেন। তবু, কেউ কোনোদিন খোঁজ নেননি। একটা অনুতাপ সকলের মনেই পীড়ন করতে শুরু করছিল।

—শিল্পীদের বেঁচে থাকতে কেউ বোঝে না।

—এমনি অনাহারে অর্ধাহারে—কি কষ্টটা করেছেন প্রদ্যোৎবাবু। স্কুলের ড্রইং টিচার—পাবে একজন আর্টিষ্ট। তারপর কোথায় না কোথায় চাকরি। মেয়েটা যে কী করে এত পড়াশুনা করল।

—আরে পূর্ববঙ্গের জমিদারের ছেলে। কী বাবু ছিলেন প্রদ্যোৎবাবু।

—দেশ ভাগ হয়ে আমাদের সব গেছে।

বাড়িওয়ালা বললেন—ওরা তো দু'টি মেয়ে মানুষ—আমাদেরই সব করতে হবে।

সকলেই কিছু করে আত্মগ্লানি থেকে বাঁচতে চায়।

ক্লাবের একটি ছেলে বলল—আমাদের ক্লাবের দুর্গামূর্তির ছবিটা এঁকে দিয়েছিলেন। আমাদের পাড়ার আর্টিষ্ট —হোক হরতাল। কেওড়াতলা তো বন্ধ থাকবে না।

বিকাশ বলল—রমাদি, ফুল ও কাঠের টাকা দিয়ে দিয়েছেন। গড়িয়াহাটের ফুলের দোকানে পেছন দিয়ে গিয়ে নিয়ে আসতে লোক পাঠিয়েছি। আর বসন্তকে খাট আনবার, বাঁশ আনবার আর যাযা লাগবে তা আনবার জন্যে পাঠিয়ে দিয়েছি।

এ পাড়ায় বসন্ত হচ্ছে মড়া পোড়াবার এক্সপার্ট। ওকে কিছু বলতে হয় না।

—ফটো তো এখানে তোলা যাবে না।

—কেওড়া তলাতেই তুলতে হবে। রমাদি একশ টাকা দিয়েছেন।

—যথেষ্ট।

বাড়িওয়ালা আবার বললেন—একটা মেয়ে সংসারটা টেনে তুলল।

বিকাশ বলল—রমাদির সঙ্গে বিমলাদি ও সুমিতাদি যাবে। আর আমরা বারো চৌদ্দ জন তো যাচ্ছি। হরতালের দিন।

—হরতাল হয়ে ভালোই হয়েছে—আমরা সবাই আসতে পারলাম—তোমরাও দল বেধে যেতে পারছ।

সন্ধ্যায় রমা শ্মশান থেকে ফিরে এসে দেখল—মা শান্তভাবে শাঁখা ভেঙে কপালে সিঁদুর মুছে একখানা সাদা তবে থান নয়—কাপড় পরে এসে রমার পাশে বসল। বিকাশ আজ এখানেই থাকবে। বিকাশ এক বাড়ি থেকে এক কাপ চা জোর করে রমাকে খাওয়াল। চা সত্যি দরকার ছিল। রমার মা কিছু খেলেন না। কেউ তাকে কিছু খেতেও বলল না। নিয়ম নেই। রমা বলল—মা, আজ বাবার মুখ দেখেছ। এমন ব্যক্তিত্ব, আত্মবিশ্বাসী, জেদী—জীবনে কোনো দিন দেখেনি। আজ বারবার মনে হচ্ছিল—এত আমার রোজকার বাবা নয়। ফটো তুলে রেখেছি। কী সাহস মুখে—কী তেজ। মা বলল—পরে বলব। কথা আছে তোর সঙ্গে। রাতে শুয়ে মা সব কথা বললেন। রমা অবাক হয়ে গেল। তারপর, তক্ষুনি, ডাইরী খুলে সব কথা লিখে নিল। যদিও জানে মা'র মেমরী খুব ভালো। পরেও কথাগুলো মা'র কাছে বহুবার শুনেছে। পরদিনও হরতাল। অনেকেই খোঁজখবর করে গেল। সন্ধ্যায় পাড়ার ক্লাবে প্রদ্যোৎবাবুর উদ্দেশ্যে একটি শোক সভা হল। রমা এক ধারে বসে বার বার চোখের জল ফেলছিল। শোক প্রস্তাব পাশ হল—অনেক বক্তাই এই মৃত্যুকে একজন শিল্পীর অকাল মৃত্যু বলে বর্ণনা

করলেন।

রমার কাছে সব শুনে মা বললেন—হারামজাদার দল—পাঁচ টাকা ধার দিয়ে পঁচিশ পঞ্চাশ টাকার ছবি করিয়ে নিয়েছে—এতকাল লোকটার কেউ খোঁজও করেনি। দু'চারটি লোক এসে যদি একটু গল্পগাছা করত—তবুও একটা মানুষের মুখ দেখত—কাজকর্মের কথা শুনে হয়তো উৎসাহও পেত। মৃত্যুর দিন সবাই এসেছে—দুঃখের দিনে কেউ আসে না। পঞ্চাশ বছরও পুরোপুরী হয়নি—বিয়ের সময় কুড়ি ছাড়িয়েছে কিনা সন্দেহ—বড় জোর একুশ। বছর চারেকের বড় ছিল আমার চেয়ে। আজ যে মুখ দেখলি—এইটিই ওর আসল চেহারা। আমি প্রথম ওর এই চেহারাই দেখেছি। প্রথম যেদিন আমাদের বাড়ি এল—ফুলবাবু হয়ে—ঠিক এমনি মুখের ভাব—আজ যাবার দিন আবার সেই চেহারায় দেখলাম। আমরা দু'জনেই ঘরে গিয়েছিলাম—ও শেষ মরবার ঠিক আগের মুহূর্তে বেঁচে উঠেছিল—আমি মরেই রইলাম।

সেদিন বাড়ি পৌছে যখন শুনল : দুদিন হরতাল। মাথায় বজ্রাঘাত। এদিকে শ্বশুর তখনও বসে আছে। বলল—জানতাম, এ সরকার টিঁকবে না। টানা দু'দিন হরতাল। তোমরা চল। একসঙ্গে এ দু'দিন কাটান যাবে। স্বদেশী আমলে ছাব্বিশে জানুয়ারী হরতাল হত একদিন করে। ওকে তখন বলা হত, স্বাধীনতা দিবস। রাস্তায় বিকেলে স্বদেশী গান করতে করতে প্রসেসন বের হত। এ জাত চিরকালের হুজুকে। তারপর তোমার ঘেরাও.....। দু'দিন হরতাল তদুপরি শ্বশুর বাড়ি যাবার প্রস্তাব—ওর চিত্ত জ্বলে উঠল। এখন রীনাই অসহ্য—তার ওপর ওর বাবা। বলল—আমি ট্যাক্সিতে আসতে আসতে ভাবছিলাম, কোথাও বোমাবাজি হচ্ছে এদলের সঙ্গে ওদলের। ড্রাইভার আসতে চাচ্ছিল না। বলল—বহুত হাঙ্গামা বাবুসাব। আপনার আর দেরি করা উচিত নয়। আমি আসতে আসতে ভাবছিলাম, ফোন এসে যাচ্ছে—তাছাড়া মোটর কেনবার জন্য আমাদের লোন দেয়—এবার লোন নিয়ে একটা মোটর কিনে নেব। আপনি গাড়িটা চয়েস করে দেবেন—ভেতর দেখে দেবেন। রীনা বলল—আর গ্যারেজ আমাদের পাড়ায় দু' দুটো খালি পড়ে আছে।

শ্বশুর মশায় দারুন খুসি। জামাইয়ের এমবিসন আছে। বড় জামাইয়ের মত বই মুখে করে পড়ে থাকে না। আর লম্বা চওড়া জ্ঞানের কথা। লোকের কাছে বলতে পারবেন গাড়িওয়ালা দ্বিতীয় জামাই।

—ফ্রিজ তো এ মাসেই কিনছি।

এবার শ্বশুর উচ্ছ্বাস চাপতে পারলেন না—গুড় গুড়। তুমি অল্পবয়সে বাড়িও করতে পারবে। তোমার এমবিসনই বড় কথা। ধর আমার কথা, জেনকিনস সাহেব যখন ডিরেক্টার— ম্যানেজিং ডিরেক্টার তখনও হননি কল্যাণ বাধা দিয়ে বলল—চলুন আমি আপনাকে পৌছে দিয়ে আসি। এতরাতে একা আপনাকে পাঠান ঠিক নয়। আপনার গাড়ি থামিয়ে নামিয়ে দিয়ে—যদি গাড়ি নিয়ে ডাকাতি করতে যায়। একে তো আপনার গাড়ি গেল—সেকেন্ড, গাড়ির নাম্বারের জন্য পুলিশ আপনাকে হয়রানি করবে। থার্ড, গাড়ি যাবার সঙ্গে সঙ্গে আপনার ডাইরী করতে হবে। এই রকম যুগ আরম্ভ হয়ে গেছে।

আজই শুনলাম। রীনা থাক—ওকে নিয়ে এত রাতে বের হওয়া ঠিক নয়। চলুন। আর রাত করা ঠিক নয়।

শ্বশুর ভয়ে বিবর্ণ হয়ে গেল। আবার তুমি একা ফিরবে। রীনার বাপের বাড়ি যাবার একটুও ইচ্ছা ছিল না। কল্যাণকে সহ্য করা আজ ওর পক্ষে সম্ভব নয়। দু'দিন টানা হরতাল শুনে ওরও মন বিগড়ে গেল। মোটর ও ফ্রিজ শুনে একটু উৎফুল্ল হল। বিমলেন্দু শুনলে কি বলবে? ঈর্ষায় সহকর্মিনীদের মুখখানা কি হবে। দিদি ঈর্ষার জ্বালায় ছটফট করবে। মা খুব খুশি হবেন। ফোন, গাড়ি, ফ্রিজ। তবু, বিমলেন্দুকে নিয়ে স্বপ্নবিভোর হয়ে থাকবার জন্য মন ব্যাকুল হয়ে ওঠে। রীনার মনে একবারও প্রশ্ন জাগে না—এত রাত পর্যন্ত কল্যাণ কোথায় ছিল। এখন রান্না করতে মন চায় না। যা হোক কিছু করতে তো হবেই।

শ্বশুড় মশায় বললেন, অফিসগুলোতে কাজের এটমসফিয়ার উঠে যাচ্ছে।

—চলুন। আর হরতালের দুদিন একদম গাড়ি বের করবেন না। কাউকে বের হতে দেবেন না। রীনা দশটার নিউজটা শোন। চলুন।

এক রকম জোর করে শ্বশুরকে নিয়ে বের হয়ে গেল। মোটরে উঠতে উঠতে বলল—যা দিনকাল পড়ছে, এরপর নাইট শো'তে ভদ্রপরিবার আর যেতে পারবেনা।

বলকি? আমরা তো চিরকাল নাইট শোতেই গেছি।

কল্যাণ তা জানে। এই নাইট সিনেমায় যাবার আগে ভদ্রলোক পাক্কা দু'ঘন্টা আগে কল্যাণের বাড়ি এসে আড্ডা দেবেন। খুবই আতংকিত হয়ে ভদ্রলোক গাড়িতে ষ্টার্ট দেন। কল্যাণকে জিজ্ঞেস করেন—গাড়ি কি স্পিডে চালাব?

কল্যাণ বলল—নর্মাল স্পিডই দিন।

ভদ্রলোক ও রীনা দু'জনেই উৎকণ্ঠিত হয়ে ওঠে। বাবাকে একা পাঠাতে মন চায় না। আবার ও এতটা পথ একা আসবে—যদি ট্যাক্সি না পায়।

ভদ্রলোককে দরজায় নামিয়ে দিয়ে কল্যাণ হাঁটা দেয়। কে ট্যাক্সি করে। আজ পথটা একা হাটব। মনের সঙ্গীর অন্তর স্পর্শ করেছি। যতটা রীনার থেকে দূরে থাকা যায়। দেরি দেখে রীনা উৎকণ্ঠিত হবে—মনে এ চিন্তা এলেও কল্যাণ ভাবল, ভাবুক না কিছুক্ষণ। ওর এখন রান্নাবান্না। তাছাড়া গাড়ি আর ফ্রিজের স্বপ্ন ওকে দিয়ে এসেছি—স্বামীর কথা ভাববার সময় কই? আর যে নারী ওর চলে আসবার পথের দিকে তাকিয়ে তন্ময় হয়ে গিয়েছিল—তাকে আজ রাত ও পাক্কা দু'দিন একা থাকতে হবে। কেবলই ওর কান্না পাচ্ছিল। ও তো কাঁদতে ভালবাসে না। একটা বিরাট দুঃখ ওর অন্তরে আছে। মাও বেশ দেখতে। কিন্তু দৃষ্টি তীক্ষ্ণ। লুচি না খাওয়াতে মা খুন্ন হয়েছে। হোক। মেয়ে জানে। পাশ দিয়ে একটা খালি ট্যাক্সি হর্ন বাজিয়ে ওর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাচ্ছিল। দেখেও দেখল না। নিওন লাইট, লোকজন কম। রাতে কলকাতায় হাঁটতে এত ভালো লাগে—বিশেষ করে যেদিন কুমার মন প্রথম অন্তরকে জ্যোৎস্নায় ভরিয়ে দেয়। আজ কল্যাণ দুয়ারখানি ঝড়ের রাতে ভেঙে দিয়েছে। এমন দুয়ার ভাঙার রাতে হাজার মাইলও পথ হাটা যায়—যদি কেউ জিজ্ঞেস করে—দু'দিন হরতালে কেমন ছিলে? কল্যাণ

ক্লান্তির কথা ভুলে গেল, ক্ষিদের কথা ভুলে গেল, রীনাকে চেতনায় ঢুকতে দিল না। শুধু হাটবে—একা। কদিন অন্তরে সঙ্গী বের হয়ে নারী মূর্তি ধরে—সেদিন শ্বশুর স্ত্রী সব এহবাহ্য। কল্যাণ তন্ময় হয়ে হাটতে থাকে।

আজ দুপুরে যখন হঠাৎ বিমলেন্দু রীনাকে কোনো ভূমিকা না করে চার নম্বর বাসএ উঠে পড়ল—তখন একটা তীব্র বেদনা—যাকে একই সঙ্গে অবহেলা, নিজের আকর্ষণ প্রায় প্রকাশ্য অপমান করবার অর্ধসচেতন যন্ত্রণা, আবার বিমলেন্দুর মুখে একটা আত্মনিবেদনের কাতরতা, গলার স্বরে উদগত অনুভূতিকে চাপা দেবার প্রয়াস—হঠাৎ চলে যাবার মধ্যে অবহেলা বোধ, নিজের ভালবাসার প্রায় প্রকাশ্য করে তুলবার সময়ে ওর হঠাৎ চলে যাবার মধ্যে একটা বঞ্চনা মিশ্রিত অপমান,' বিমলেন্দুর মধ্যে আবেগও আত্মনিবেদনের কাতরতার ব্যথা চোখে মুখে, নিজেকে সংযত করবার একটি অস্থির চেষ্টার জন্যে রীনার সহানুভূতি—অর্থাৎ অবহেলার অপ্রস্তুতভাব, ভালবাসার প্রতি অপমানের, বিমলেন্দুর প্রতি স্নেহ ও সহানুভূতি এই সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে এমন একটা যন্ত্রণা অনুভূতিটির নামকরণ হয়নি—রীনা অনুভবকে বিশ্লেষণ করতে জানে না—একটা বেদনা যার ভাষা না বুঝে কেমন অস্থিরতা বোধ করে বাড়ি ফিরতে মন চায় না—একটা আশ্রয় খোঁজে। কল্যাণের কাছে আশ্রয়ের জন্যে আসে। কল্যাণ যখন ওকে একরকম জোর করে ট্রামে তুলে দিয়ে বাপের বাড়ি যেতে বলল—তখন আবার ধর্মতলার অনুভূতিটি ওর মধ্যে দেখা দিল। তবে একটু ভিন্ন রকমের। কল্যাণ ওর বিপদের গুরুত্ব না বোঝার অভিমান, ওকে কথা দিয়ে ওর সঙ্গে না যাবার জন্য একটা বিশ্বাসঘাতকতার বঞ্চনা বোধ, সেই সঙ্গে বিমলেন্দুর প্রতি সেই নামকরণহীন জটিল অনুভূতি নিয়ে আরো জটিলতর হয়ে ওর চিত্তকে গ্রাস করে ফেলল। জটিল অনুভূতি নিয়ে মেয়েরা বড় মাথা ঘামায় না—সেই জটিলকে তরল করে অশ্রুজলে বের করে দিতে পারলেই মেয়েরা বাঁচে। অবশ্য মেয়েদের ক্ষেত্রে দোষ দিয়ে লাভ নেই—নিজের উপলব্ধি সম্পর্কে আত্মসচেতন বিশ্লেষণ ক'জন পুরুষের মধ্যেই বা দেখা দেয়। অনুভবের জটিলতার একটা সস্তা চলতি নাম দিয়ে আত্মবঞ্চনা করে পুরুষ আত্মরক্ষা করে। অথবা জটিল অনুভূতির মধ্য থেকে একটি উপাদানকে বেছে নিয়ে ফেনিয়ে ফাপিয়ে তা নিয়ে মন খারাপ করে—গোপনে কাঁদে—বা ঝগড়া করে। অন্তর তাতে সায় না দিলেও অন্তরকে অগ্রাহ্য করে। রীনা ট্রামের মধ্যে কাঁদতে পারল না, অনুভূতি বিশ্লেষণ করবার শক্তি নেই, ইচ্ছে নেই। মিশ্রিত অনুভূতিকে মন থেকে তাড়াতেও ইচ্ছে করে না—কেবল একটা অনুভূতিকে ডেকে এনে অনুভব করতে চাইল—রীনা পরিত্যক্ত। এই বিলাসী অনুভূতিটি একটু বিলাসী চোখের জলের দাবি রাখে। ট্রামে তা সম্ভব নয়। বাড়ি ফিরে একা একা কাঁদবে? বাড়ি যেতে ইচ্ছে করে না। মনে করবার চেষ্টা করল, বিমলেন্দুও ওকে পরিত্যাগ করল, স্বামীও ওকে পরিত্যাগ করল। আসলে জটিল অনুভূতিটি সহ্য হচ্ছিল না বলে তা ইতিমধ্যেই চেতনার নেপথ্যে যেতে আরম্ভ করল। বিমলেন্দুকে পাইপ লাইটার দেবার সময় ওর উদ্ভাসিত মুখ, বিমলেন্দুর অশ্রুরুদ্ধ

কণ্ঠস্বর, নিজের অবেগকে সামলাতে না পেরে চলে যাওয়া—ওর মনে আবার শিহরণ জাগতে শুরু করে। আগমীকাল দেখা হবার পুলক ওর মনে বার বার দেখা দিতে শুরু করে। আরেকদিন গিয়ে ওর ছোট ভাইকে দেখে আসত—কিন্তু না বাবা যা বোমা পড়ে ঐ রাস্তায়। একদিন দুপুরে বিমলেন্দুকে ফ্লাটে নিয়ে এসে খাওয়াবে। দু'জনে নির্জনে বসে একপাতে খাবে। আগে একটা চুমো—রীনার হঠাৎ মনে পড়ে ও বিবাহিত, মনে পড়ে, বিমলেন্দু দেখতে খারাপ—মাথায় টাক আছে—বয়েস নিজেই বলেছে আটত্রিশ—খুব স্ট্রাগল করেছে। সামান্য একটা স্কুলটিচার—তাও পার্মানেন্ট নয়—কেবল টিউশনি করে—ওর কাছে পঞ্চাশ টাকা ধার নিয়েছে। বাবা শুনলে নিজের মেয়ের রুচি সম্পর্কে কী ভাববে। একটু বিরাট শোভাযাত্রাকে পথ দেবার জন্যে ট্রাম দাঁড়িয়ে পড়ল। মিছিল যাচ্ছে তো যাচ্ছেই। পুরুষ-বাচ্চা কোলে ঝি ক্লাসের মেয়েরা—আবার স্কুল কলেজের ছেলে মেয়েরাও আছে। নিজেও কলেজও বিশ্ববিদ্যালয় পড়বার সময় এমনি কত মিছিলে গেছে। কত বুলি মুখস্ত করেছে—একটা কথা সার বলে সবাই মেনেছে—সবই চলছে আর্থিক অবস্থার ওপর—অর্থাৎ টাকাই সর্বশক্তিমান। রীনার কাছে এ আর নতুন কথা কি? অত ফিলজফি করে বলবার কি আছে? কিন্তু লোকের টাকা আছে—একদলের একদম নেই। যাদের আছে—তাদের একদিন তা থাকবে না—যাদের নেই তখন তা তাদের হবে। সকলেরই কিছু কিছু হবে। তার জন্যে সমাজে পরিবর্তন আনতে হবে—এমনি কি কেউ দেয়—ছিনিয়ে নিতে হবে। এই ছিনিয়ে নেবার নামই হল বিপ্লব। এসবের বৈজ্ঞানিক নিয়ম আছে—কখন সময় হবে, কখন কমরেডরা প্রস্তুত হবে শাসন ক্ষমতা দখল করবে—তা সব ঠিক করা আছে—সেই মুহূর্তে পৌছবার চেষ্টা করতে হবে। ঠিকমত সময় পৌছতে না পারলে বিপ্লব হয় না—বিপ্লবের সময় বয়ে যায়। বাড়িতে বাবার কাছে বলে রীনা জ্ঞানের বাহাদুরী নিতে চায়। তিনি মাথা নাড়েন—যাদের আছে—তারা কি অমনি অমনি আছে—সবাই সমান—আরে জেকিন্স সাহেব আর তার চাপরাশি বিদ্যাবুদ্ধি এক হল। জেকিন্স সাহেব তখনও ম্যানেজিং ডিরেক্টার হয়নি—একদিন তখনও আমি সেকসন অফিসার হইনি—হব হব করছি—বলল, তোমরা নাটিভরা স্বাধীনতা চাও—দেশ শাসন করতে চাও—একটা সেকসন তোমাদের হাতে দিয়ে নিশ্চিন্ত হবার উপায় নেই। তারপরের বারই আমি সেকসন অফিসার হলাম। সবার যোগ্যতা কী একরকম। কত বি.এ. এম.এ তো দেখলাম। জেকিন্স সাহেব ক'টা হয়। বললেই হল—সব সমান—সবাই সমান সুযোগ সুবিধা পাবে। এই যে কংগ্রেস লিডারদের দেখছিস—এরা কী রকম ইংরেজি বলে দেখেছিস—জেকিংস সাহেবের চেয়ে কম নয়। তবে ঐ ইনটোনেশন পাবে কোথায়? এখানে রীনার একটা অপ্রীতিকর দৃশ্যের কথা মনে পড়ে। বড় জামাইবাবু আর তার বিলেত ফেরত ভগ্নিপতি দিদিকে দেখতে এসেছে—ভগ্নিপতিকে দেখেই তো বাবা বিরক্ত হয়ে উঠেছেন—বড় জামাইবাবু তো সুন্দরই। ইংরেজির এম.এ বড় জামাইবাবু তারপর ল'পাস—কমপিটিটিভ পরীক্ষা দিয়ে এখন মুন্সেফ—বিচারক-জাজ। বাবা ওদের সঙ্গে ইংরেজিতে কথা বলতে আরম্ভ করলেন। ওরা দু'জনে এমন ফ্লুয়েন্ট বলতে আরম্ভ করল—রীনারা অস্বস্তিবোধ করতে

লাগল। এদিকে ঐ নিগ্রোমার্কা জামাইবাবুটা বলল—আশা করি, মেয়েও ইংরেজিতেই কথা বলবে। বিশেষ করে মুন্সেফ সাহেব ইংরেজি সাহিত্য শুধু নয়, পাশ্চাত্য দর্শন, সমাজতত্ব, এমনকি বিজ্ঞান নিয়ে পড়ে থাকেন। এমনি ইংরেজি জানা পরিবারের মেয়ে মুন্সেফ সাহেবের যোগ্য হবে। দিদি গ্র্যাজুয়েট বটে। বাংলা বাক্যে দু'চারটে ইংরেজি বলতে পারে এ পর্যন্ত। কিন্তু বাবা বললেন—নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই—আমার ছেলেমেয়েদের সব কিছু অসাধারণ—সে ভাবেই তৈরি করেছি। বাবাকে ডেকে মা বললেন—কেন তুমি ইংরেজিতে বলতে গেলে—এখন মীনা কি ইংরেজি বলতে পারবে। বাবা বললেন—আরে জিজ্ঞেস করলে—ইয়েস নো বলে দিবি। মীনা বলল—আমি যাব না। কিন্তু দিদি যেতেই ওরা সব কিছুই বাংলাতেই বলল। বড় জামাইবাবুকে মা'র খুব পছন্দ হল। যেমন গম্ভীর, শান্ত, বিদ্বান—তারপর জজ। বাবা নিমরাজি হলেন। পণের জন্য কোথাও দিদির বিয়ে হচ্ছিল না। এ মন্দের ভাল। ছোট সংসার। দিদি শুধু বলেছিল, হলেই হল একটা। কিন্তু রীনা জানে, দিদির পছন্দ হয়নি। কিন্তু বিয়ের জন্য কত আর অপেক্ষা করা যায়। রীনা জানে দিদি পার্টিতে গিয়ে মদ খায়—ক্লাবে গিয়ে মদ খায় আড্ডা দেয়। দিদি সম্পর্কে নানা দুর্নাম। দিদি জামাইবাবুর বনিবনা নেই। ......কখন শেষ হবেরে মিছিল। ......ওকে আর বিমলেন্দুকে নিয়েও কি এমনি কথা উঠেছে—দুর্নাম রটবে। দিদির কথা শুনে বাবা বলেছিলেন—আমার মেয়ের রূপে গুনে আর পাঁচটা লোক আকৃষ্ট হবেই—বৌ সামলান স্বামীর কাজ। ঐ বরুণটার না আছে ব্যক্তিত্ব। না কোনো পার্সোননাল চার্ম। তা আমার মেয়ে যদি কারো পার্সোনাল চার্ম পছন্দ করে—তবে বরুণের অপত্তি করা উচিত হয়। নিজের কোয়ালিটি নেই, অপরের কোয়ালিটিকে চিনতে শেখ। জেনকিন্স সাহেব তখনও ম্যানেজিং ডিরেক্টর হননি আমার কোয়ালিটি চিনেছিলেন। এবার মা বললেন—আমাকে তো তুমি কোথাও নিয়ে যাওনি—চাইলেও আমি যেতাম না। তুমি পার্টিতে গেছ—আমি তো জানি, তুমি ডিংক করবে না তোমার পেটের জন্য। আর পয়সা খরচ করে তুমি ড্রিংক করবে না—এও জানতাম। একেবারে করিনি তা নয়—জেনকিন্স সাহেবের ম্যানেজিং ডিরেক্টার হবার উপলক্ষে এক পেগ খেতেই হয়েছিল—আর তার ফেয়ার ওয়েলে আরেক পেগ। তবে পয়সা যাদের আছে তারা ড্রিংক করবেই—তুমি আটকাবে কি.করে। আমার মেয়েকে ক্লাবে নিয়ে যাবে—আর গিয়ে সে একাদশীর বিধবার মত বসে থাকবে তা হয় না। পার্টিতে, ক্লাবে গেলে তার নিয়ম মানতে হবেই। আমার বড় মেয়ের মত সুন্দরীর ওপর লোকে আকৃষ্ট হবেই—তা তুমি ঠেকাবে কি করে। এবার মা কড়া ভাবে বললেন—তুমি এসব কথা বললে ছেলেমেয়েরা উচ্ছৃঙ্খল হবার প্রশ্রয় পায়। তোমার এটুকু কাণ্ডজ্ঞানও তুমি মাঝে মধ্যে হারিয়ে ফেল। আর এই বয়সে মানুষের রূপ নিয়ে এত চর্চা করবে না—এতে লোকে তোমাকে যা তা ভাববে। বাবা চোখ উল্টে বললেন—কে কি বলল—বয়ে গেল আমার। .....যাক্ মিছিল শেষ হল। এবার আবার ট্রাম চলতে শুরু করল। রীনাকে যখন কল্যাণ দেখতে এল—ওর মামার সঙ্গে। মামা জানাল—ফাইনাল ওর পছন্দেরই ওপর নির্ভর করছে। এবার বাবা কল্যাণের সুন্দর বুদ্ধিদীপ্ত কথা শুনে আগেই মুগ্ধ

হয়েছিলেন। তারপর মার্চেন্ট ফার্মের অফিসার। এম.কম. এ ফার্স্ট ক্লাস—সি.এ। বাবা জানালেন—মেয়ে বাংলার এম.এ সুধীন দত্তের কবিতা পড়ে—মাইকেল মধুসূদন দত্তের .কবিতা পড়ে। ইংরাজি ও ফাইন জানে। রীনাকে দেখে কল্যাণ বলল—সুধীন দত্তের কবিতা বা মাইকেলের কবিতা নয়—রবীন্দ্রনাথের কবিতাতেই আপনাকে মানায়। রীনা খুসির লজ্জায় চুপ করে রইল। বাবা বললেন—ও ট্যাগোর—ও তাও পড়েছে নিশ্চয়ই—কি রে ট্যাগোর পড়িস নি। কল্যাণ একটু অবাক হয়ে ওর বাবার দিকে তাকাতেই ওর বাবা বললেন—আমাদের পারচেজের বড় বাবু কথায় কথায় রবীন্দ্রনাথের ছড়া কাটতেন।—কল্যাণ বলল—আমার একজন প্রিয় কবি আছেন। এবার রীনা বলল—নিশ্চয়ই জীবনানন্দ।—ঠিক ধরেছেন। যাক আজ আমার হাজার বছর পথ হাটা শেষ হল। রীনা লজ্জিত ও খুশি হল। এবার রীনার বাবার দিকে তাকিয়ে কল্যাণ বলল—মামা বলেছেন, আমি ফাইনাল। কিন্তু ফাইনাল তো দুটো টিমের মধ্যে হয়। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—একাকী গায়কের নহে—গাইতে হবে দু'জনা। রীনাদেবীরও পছন্দ আছে—সেই সাহসের পরীক্ষা আজ হবে। যদিও পাত্রের নিজ মুখে পছন্দ হয়েছি বলা নাকি নিয়ম নয়—তা আমি বলছিনা—আমি বলছি, আমি মুগ্ধ হয়েছি—আর, আপনার যদি পছন্দ হয়ে থাকে—আসুন সাহস করে—বাবার দিকে না তাকিয়ে আমরা পরস্পর হ্যান্ডসেক করি। কল্যাণ হাত বাড়িয়ে দিল—রীনা মন্ত্র মুগ্ধের মত সেই হাতে হাত রাখল। বাবা বলে উঠলেন—ফাইন ফাইন। ওরে তোরা উলুদে, শাখ বাজা। বাড়ির ভাই বোনরা ছুটে এল। কল্যাণ রীনাকে ফিস ফিস করে—ইউ আর ফাইনাল। বাংলার নারীর মুখ আমি তোমার মধ্যে দেখলাম। দেনা পাওনা নেই। বাবা খুব খুশি। ওরা চলে যেতেই রীনাকে জিজ্ঞেস করলেন—জীবানন্দ না কি বলল রে? আনন্দমঠ সিনেমায়—আনন্দমঠের কেউ নাকি? —না, একজন আধুনিক কবি। —খুব কঠিন নাকি? হ্যাঁ শক্ত তো বটেই। বাবা খুশি হন। যাক, বাংলায় বেশ শক্ত শক্ত কবি আছে—আর বলে কি না বাংলা সোজা। জেংকিন্স সাহেব পর্যন্ত ট্যাগোরের নাম জানতেন। কি আনন্দ যেন বলল। লর্ড জীবানন্দ—আরে অফিসের রিক্রিয়েশনে দেনাপাওনা হয়েছিল—তাতে অন্তত পাঁচবার দেনাপাওনা হয়েছিল। দেনা পাওনার জীবানন্দ। অফিস রিক্রিয়েশন মদ-জীবানন্দ—এবার মনে থাকবে। শক্ত কবি। রীনা মনে মনে হাসে—বাবার ছেলেমানুষী আর গেল না। বলল—জীবানন্দ নয় বাবা জীবনানন্দ। —ঐ হল। এরা শক্ত কবি যতই হোক—ভেতো বাঙালির নামতো। মনে রাখাই কঠিন। হ্যাঁ। মাইকেল টাইফেল না হলে কি কবির নাম মানায়। সেদিন রীনা কল্যাণের হাত ধরে যে শিহরণ বোধ করেছিল—তা আজও মনে আছে। বাবার চিৎকারে সবাই এলে কল্যাণ মাকে প্রণাম করে। সবার হাত ধরে ঝাকানি দিয়ে বল—এসেছিলাম স্ত্রী জোগাড় করতে—স্ত্রীর সঙ্গে বাবা-মা-ভাই-বোন সব পেলাম। যেন সব পেয়েছির দেশে এলেম—এলেম নতুন দেশে। সেই কল্যাণ বাবাকে এখন দেখলে পালাতে চায়—শ্বশুর বাড়ি যাবার নাম শুনলে গায়ে জ্বর আসে। ট্রাম চলছে। রীনার মন খচখচ করে। এতক্ষণ কল্যাণের কথা বলে যেন বিমলেন্দুর ওপর অবিচার করছে। রীনা যেন আজ জলের

মত বুঝতে পারে। প্রেম কল্যাণের কাছে একটা আর্ট, একটা রুচি—একটা সূক্ষ্ম ভাবে নিজেকে জাহির করার ঝোঁক ওর মধ্যে। কিন্তু বিমলেন্দু—শুধু তাকিয়ে থাকে ওর দিকে। এ কঠিন আকর্ষণ—মনের গভীর পর্যন্ত সে চাহনি গিয়ে পৌছায়। বিমলেন্দু দেখতে ভালো নয়। তাতে কি হয়েছে। বাবার ওটা একটা বাতিক। বিশ্ববিদ্যালয়ে তো ছেলেদের সঙ্গে পড়েছে। যারা দেখতে ভালো নয়—তাকায় নি পর্যন্ত। ইউনিয়ন করেছে—যারা দেখতে ভালো—তাদের সম্পর্কে খোঁজ নিয়েছে বাড়ির অবস্থা কেমন। তাছাড়া, কেউ চা খাওয়ালে সন্দেহ করেছে—কিছু মতলব আছে। কোনো মতলব ছিল না। বহু ছেলেকে অযথা অবজ্ঞা করেছে। ক্লাসের অন্য মেয়েরা কেমন সহজে মিশেছে। রীনা অন্য ক'টি মেয়ে নিয়ে ছেলেদের সঙ্গে কথা বলত। একা বললেও তা এত সংক্ষিপ্ত হত—অভদ্র পর্যায় পড়ত। কোন ছেলে বা মেয়ে ধারও চায়নি—কেউ অভদ্রতাও করেনি। বিমলেন্দুর হোক বয়েস আটত্রিশ। এতকাল এই অল্প আয়ে এত বড় সংসার চালাচ্ছে। কী ভীষণ দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম করে চলেছে। স্কুলেও পার্মানেন্ট নয়। কবে চাকরি চলে যায়। লেকচারারের জন্য দরখাস্ত করে চলেছে। এখন বলছে, কলকাতার বাইরে পেলেও চলে যাব। যতই টিউশন করুক—তাতে তো গোটা সংসার চলে না। বাবা নিজে তো চাকরির জন্য হন্যে হয়ে ঘুরেছে—থার্ড ডিভিসনে পাশ করে কোথাও কিছু করতে পারেনি—তখন ছিল লীগ আমল। হিন্দুদের চাকরি পাওয়া কঠিন। সেই সময় নিজের মামা এই অফিসে পঁয়ত্রিশ টাকা মাইনের এই কেরানিগিরিতে ঢুকিয়ে দেয়। সেই থেকে বাবা চার হাজার টাকায় রিটায়ার করেছে। এই গল্প বাবা কতবার শুনিয়েছে তার শেষ নেই—নিজের ক্যালিবার বোঝানোর জন্যে। ....আজ প্রথম প্রেমের স্পর্শে—স্নেহের স্পর্শে—ও আর কথা বলতে পারছিল না। আবেগ আর অশ্রু চাপবার জন্যে ছুটে পালিয়ে গেল। রীনা মনকে কিছু ভাবতে না দিয়ে বিমলেন্দুর মুখখানা ধ্যান করে। আজ রীনা ভাবে, বিমলেন্দু সুন্দর কিনা এ প্রশ্ন অবান্তর। বিমলেন্দু ওর মধ্যে একটা ক্ষুধা জাগিয়েছে—যা কল্যাণ পারেনি। বিয়ের পর দু'জনেব মধ্যে একটা আকর্ষণ খুব তীব্র হয়ে কিছুকাল ছিল। এখনও আছে। কল্যাণকে ছাড়া রীনা সংসার ভাবতে পারে না। বড্ড রিফাইন—অনেক সময়—যেন কৃত্রিম মনে হয়—উন্নত রুচি ও সৌন্দর্যের ব্যবহার—তাই যেন কল্যান চায়। বিমলেন্দু কিছু চায় না—কি সাধারণ পোষাক—দুঃখ করে বলেছিল—অঙ্কে এম.এ তে যদি আরেকটু খাটতে পারতাম—তো ফার্স্টক্লাস পেতাম। সেকেন্ড ক্লাস থার্ড হলেও—অঙ্কে সেকেন্ড ক্লাস লাষ্ট হবার মতই। এত টিউশনি করে কি হয়। রীনা বাংলায় ফিফটি পারসেন্ট পেয়েছিল। বংশের প্রথম এম.এ.। কত সম্মান—উপহার। বাবার কী গর্ব। একবার রীনা বলেছিল, আপনার ছেলেবেলায় কী এমবিশন ছিল—কি হবেন। ঈষৎ ব্যঙ্গ করে। উচ্চাশা—ছেলেবেলায়—রাত্রি দুপুরে, মনে নাহি পড়ে, কি ছিলাম আমি ভোরে। রীনা হেসে বল্ল—ও লোহারও তাহলে ব্যথা আছে। বিমলেন্দু উদাস ভাবে রীনার দিকে তাকাল। রীনা তাড়াতাড়ি বলল—আমরা কর্মকাররা তা বুঝতে পারি না—তাই না? কেবল চেয়ে থেকেই যেন বিমলেন্দু ওকে জয় করে নিয়েছে। কেমন একটা অতৃপ্ত অনুভূতি। এমন গভীর ক্ষিদে—সর্বশরীরে

কোনোদিন রীনা বোধ করেনি। আজ কল্যাণের দিকে ও মন দিতে পারল না। পারল না বলে নিজেকে তিরস্কার করবার ক্ষমতাও যেন হারিয়ে ফেলল। তিরস্কার করবার কথা মনেও এল না। বরং কল্যাণের কথা ভাবতে সাহস হল না—পাছে কল্যাণের কথা চিন্তা করলে কল্যাণ সম্পর্কে একটু বিতৃষ্ণা মনে আসে। বিতৃষ্ণার ভয়ে কল্যাণকে মনে ঢুকতে দিল না। এই একা ট্রামে—ডালহৌসী থেকে বালিগঞ্জ—বিমলেন্দুর জন্যে এমন আস্বাদ, এমন তীব্র পিপাসা—এমন আকণ্ঠ ক্ষিদে—এরা আজ যেন রীনাকে আচ্ছন্ন করে ফেলল।

বাপের বাড়িতে বাবাকে ফোন আসবার সংবাদ বলল। রোগী দেখতে যাবার কথা বলে নিজের নির্বুদ্ধিতা আর বলতে চাইল না। বলল, ফার্স্ট প্রিয়েডে ছুটি হল—ভাবলাম ওর অফিসে যাই। বোনরা-ভাইরা নানা কথা-সিনেমার গল্প-কিন্তু রীনা আজ নিজেকে ভুলতে পারল না। কল্যাণের জন্যে অপেক্ষা করে বাবা যখন ওকে পৌঁছে দিল—তখনও দেখল কল্যাণ আসেনি। হাফ ছেড়ে বাঁচল। বাবার উৎকণ্ঠা ওকে স্পর্শও করল না। মা ওকে খাইয়ে সঙ্গে টিফিন ক্যারিয়ারে কল্যাণের খাবারটা দিয়ে দিয়েছিলেন—বলেছিলেন, এখন গিয়ে আর রাধতে হবে না—রাত অনেক হল।

কল্যাণ এসে বাবাকে এক রকম জোর করে তুলে নিয়ে পালাল—তাতে স্বস্তিই পেল রীনা। একদিনে নিজের পরিবর্তন দেখে ওর নিজের কোনো অবাকও লাগল না। নিজের ভেতরে এত তৃষ্ণা, এত ক্ষিদে, এত আকর্ষণ ছিল—তা আবিষ্কার হতে দেখে কোন অবাক বা চাঞ্চল্য বোধ করল না। শুধু তৃষ্ণা, আকণ্ঠ তৃষ্ণা, পিপাসার অমৃত স্বাদ অনুভব করতে লাগল।

হাত পা ধুয়ে গা মুছে, শাড়ি পাল্টে সোফার ওপর বসে কল্যাণের জন্য অপেক্ষা করতে লাগল। জানে কল্যাণ এখনই এসে পড়বে। কিন্তু অবুঝ মন ভাবতে লাগল—যত দেরি হয় ততই ভাল। কল্যাণের কাছে লজ্জা নয়, অপরাধ নয়। নিজের আজ একা থাকবার পিপাসার মাঝে আর কাউকেও চাচ্ছিল না। আজ কল্যাণ ঠিক অসহ্য নয়—ওর আজ একা-একা-শুধু বিমলেন্দুর ধ্যান-সেই ছুটে বাস্ এ বসে কান্নার হাত থেকে নিজেকে বাঁচানো। আজ কল্যাণ পাশে থাকলে পর মনে হবে ওকে—মন কল্যাণকে পর ভাবতে চায়না—তাতে কষ্ট। আজ কল্যাণ যেন ট্যাক্সি না পায়। যেন ওদের বাড়িতে থেকে যায়। তা তো যাবে না—আসবেই আর ট্যাক্সিও পাবে। বাড়ি, গাড়ির কথায় ওর ক্ষনিকের জন্য একটা আনন্দ হয়েছিল—এখন সে সব ভুলে গেছে। রীনা তন্ময় হয়ে লোহার ব্যথা অনুভব করতে লাগল।

কল্যাণ যখন কলিংবেল বাজাল। তখন অনেক রাত। রীনা জেগেই ছিল।

—ট্যাক্সি পেলাম না।

—তাই মনে হয়েছিল।

—একটু বিশ্রাম করে-খেয়ে নেব! তারপর একদম ঘুম।

—মা খাবার পাঠিয়ে দিয়েছেন।

কল্যাণ মাথা নেড়ে সম্মতি জানায়। দু'জন দু'জনকে এড়াতে চায়। রীনা বসে থাকে।

কথা বলতে ইচ্ছে করে না। এত দেরী দেখে কল্যাণ হয়তো ভাবছে রাগ করে বা উৎকণ্ঠিত হয়ে অভিমান করে বসে আছে—রীনা আজ তাও ভাবল না।

তারপর দু'জন পাশাপাশি বসে থাকে। দু'জন দু'জনের দিকে তাকিয়ে হাসে। কিন্তু কেউ কথা বলতে পারে না। কথা বলবার এমন অক্ষমতা জীবনে ওরা বোধ করেনি। দু'জনের মনের ভাব আজ এক। দু'জনই প্রতিমুহূর্তে দু'জনকে ভুলে যাচ্ছিল। তারপর নীরবে কল্যাণ উঠে জামাকাপড় ছেড়ে হাত মুখ ধুয়ে খেয়ে নিল।

দু'জনের এমন নীরবতা কেউ লক্ষ্য করল না। লক্ষ্য যে করল না তাও খেয়াল ছিল না। দু'জনেই মৌন আত্মহারা। দু'জনেই পাশাপাশি শুয়ে পড়ল। রাতের শেষ চুমো খেল না। তাও কারো মনে নেই। দু'জনে দুদিকে ঘুমিয়ে পড়ল কখন কেউ জানে না—জানতে চায়ও না। দু'জনের আজকের ব্যবহার যে এত অস্বাভাবিক—তা ভাবতেও ওদের মন চাইল না। দু'জনেই নিজেদের ভুলে গেছে। দু'জনেই স্বপ্নময়। তবে আলাদা আলাদা স্বপ্ন। একদিন দু'জনে মিলে একটা স্বপ্ন দেখত। আজ কেউ কারো স্বপ্নের হদিশও জানে না। আজ ওরা আলাদা জগতের লোক। দুইটি আলাদা স্বপ্ন ওদের চোখ দুটোকে পর করে দিয়েছে।

সকালে প্রথমে কল্যাণ উঠে মর্নিং কিস দিয়ে রীনাকে জাগায়। রীনা ঘুম আগে ভাঙলেও মর্নিং কিসের অপেক্ষা করে। প্রভাতী চুম্বন দিয়ে ওর দিন। আজও সকালে অভ্যাসমত রীনাকে মর্নিং কিস করতে গিয়েই দেখল, এতো রমার ঠোঁটের সেই স্বাদ। একই সঙ্গে একটা বিস্বাদ ও আনন্দ মিশ্রিত ভাবে ওর চেতনায় দেখা দেয়। ওর ভয় হয়, রীনার স্বাদ রমাকে ম্লান করে দেবে—আর রমার স্বাদ রীনাকে মনে করিয়ে দেবে—তাহলে চুমোর বৈচিত্র্যই চলে যাবে। রমাকে মনে হবে রীনা—রীনাকে রমা। আলাদা বৈশিষ্ট্য যদি না থাকত—একী অভিশাপ। তবে একটা আনন্দের ক্ষীন ধারাও আছে। আজ দু'দিন গৃহবন্দী—সুতরাং রমার স্বাদ পেতে অসুবিধে হবে না। আসলে, শুধু চুমোকে বিচ্ছিন্ন করে ভাববার জন্যই এই সমস্যা। চুমোর সময় ব্যক্তিত্বটি না ভুললে হল। তাও কি সম্ভব। দেহের অন্যান্য অংশ অবশ্যই আলাদা হবে—আর সেখানে রমার চেয়ে রীনার শ্রেষ্ঠত্ব মনে আসবেই। কিন্তু শ্রেষ্ঠত্ব অভ্যাসের ফলে ম্লান হয়ে যায়—উত্তেজনা জোর করে ধরে রাখতে হয়। আর যা অভিনব—নতুন, তার আবেদন......কল্যাণ নগ্ন রমার ছবি সেই সাতসকালে মুখ না ধুয়ে ব্রেক ফার্স্ট না করে সিগারেটের ধোঁয়োয় আঁকতে বসে।

রীনা উঠে চা নিয়ে এসে বলল—গতকাল বাজার করার কথা ছিল।

—কাল যা ধকল গেছে।

—পাউরুটি টোস্ট করে দিচ্ছি। আজ তো ঝি আসবে বলে মনে হচ্ছে না। খিচুড়ি করি। আগামীকাল ধোঁকা করব। চাল-ডাল তো আছে।

—তাহলে আর ভাবনা কি? আমি চা খেয়ে কিংশুকদার বাড়ি ঘুরে আসি। অনেককাল দেখা হয় না।

—বেশ তো।

রীনার সঙ্গে বেশি কথা বলতে ওর ইচ্ছা হচ্ছিল না। কেমন একটা অজানা ভয়—রীনার সামনে যদি রমার ছবি মনে আনতে পদে পদে বাধা পায়।

বেশ কিছুক্ষন কল্যাণ বাড়ি থাকবে না শুনে রীনা যে কী আশ্বস্ত হল বলা যায় না। ওরও ভয়, বিমলেন্দু এই ফাঁকে ওর চেতনায় খালি বাড়ি পেয়ে ঢুকে পড়ুক। পাছে কল্যাণ থাকলে বিমলের একটানা ধ্যানে বাধা পায়। খুশি হয়ে ভাবল—রান্না পরে বসাবে। এখন চা করে দি। তবু মর্নিং কিস্‌ দিয়ে কল্যাণের মনে একটু অস্বস্তি জাগে। রমার ওপর অবিচার করলাম না তো। নিজেকে বুঝায়, অবিচার কোথায়। রীনার ঠোঁটেই করলাম না তো। নিজেকে বুঝায়, অবিচার কোথায়। রীনার ঠোটেই তো রমাকে পেলাম—রমার স্বাদ পেলাম।

প্রভাতী চুম্বন বা রীনার ভাষায় জাগরনী চুমো, পেয়ে প্রথমেই রীনার মনে হয়, বিমলেন্দু যদি আজ ওর চুমোয় আমার স্বপ্ন ভাঙ্গাতে। ওর চুমোতেই ওর স্বপ্ন ভাঙবে না—স্বপ্ন আরও গভীর হবে।

চা খেয়ে পাজামা পাঞ্জাবী পরে স্যান্ডেল পায় দিয়ে কল্যাণ সিগারেটের প্যাকেট ও লাইটার নিয়ে হাটতে হাটতে ভাবে—হঠাৎ গিয়ে যদি রমার বাড়ি হাজির হই—এই ভবানীপুরের কোনা থেকে প্যাম এভিনিও কি খুব বেশি দূর—কিন্তু গিয়ে আবার চলে আসতে হবে। গতকাল রাতের হাঁটাটা কম হয়নি। একটা হাল্কা বুক কাটা সোয়েটার অবশ্য পরেছিল— বেলা বাড়লে ছেড়ে ফেললেই হবে। কিংশুকদার বাড়িও কাছে নয়—সেই আশুতোষ কলেজের কাছে। শুধু রীনার ভয় অবশ্যই আছে—বারবার রীনা আসবে—হয়তো গান ধরবে—পাশে বসে ছুটির দিনে ফোন গাড়ীর স্বপ্নে ওকে অংশ নিতে বলবে। আজ ওর রীনার সঙ্গে একা থাকতে ভয়। স্বপ্নের বিঘ্নকারী বলে নয়—নিজের ব্যবহারগুলোর নকল করা আজ ওর পক্ষে সম্ভব নয়। আবার কিংশুকদার কাছে যাচ্ছে রমার স্বপ্নকে কিছুটা বিশ্রাম দিতে চায়। রমার স্বপ্ন সবটা দেখে শেষ করে ফেলতে চায় না। যদিও ভালবাসার স্বপ্ন কখনই শেষ হয় না—যেমন দিবা স্বপ্ন শেষ হয়না। সবটা ভাবতে নেই। কিন্তু এই একলা সকালে রীনার সঙ্গ কাম্য নয়—আর রমার স্বপ্ন যদি শেষ হয়ে যায়—শেষ হবার পর তাকে বাস্তব করবার একটা অধীরতায় কষ্ট পাবে—আর কষ্ট সহ্য করতে না পেরে রীনাকে রমার অভিমানে টেনে আনতে চায়। তাই রমার স্বপ্নকে বিশ্রাম দেবার জন্যই কিংশুকদার বাড়ি। মনে পড়ল, দুপুর বিকেল—আগামীকাল—এত বড় অবসর—কল্যাণ নিজেকে বোঝাল, আগাম একঘেয়েমির দুশ্চিন্তায় এখনকার বৈচিত্রকে নষ্ট করতে নেই। তখনকারটা তখন ভাবা যাবে। কিংশুকদার জীবন বলবার মত। তিনবোন, মা, বাবা ও কিংশুক ছ'জনের সংসার। খুব ছেলেবেলা থেকেই বইয়ের পোকা। প্রচুর পড়াশুনা করত। কিন্তু ষ্ট্যান্ড করতে পারত না। কখনোই সব প্রশ্নের উত্তর করতে পারত না—চারখানা ভালো ভাবে শেষ করে পাঁচখানা লেখার একটু পরেই ঘন্টা পড়ে যেত। ফলে ম্যাট্রিক, আইতে ফার্স্ট ডিভিসন হলেও—বি.এ ইতিহাস অনার্স নিয়ে সেকেন্ড ক্লাস পেল—তারপর এম.এও সেকেন্ড

ক্লাস। একটা স্কুল মাষ্টারী নিল হাওড়ায়। পরের বছর আবার ইংরেজি দিয়ে সেই সেকেন্ড ক্লাস। তারপরের বছর অঙ্ক—সেকেন্ড ক্লাস। কিন্তু মাত্র সাড়ে চারখানা লিখেও কিন্তু ফিফটি পারসেন্ট নম্বর সবসময় পেয়ে এসেছে। ট্রিপল এম.এ। ও যে বার প্রথম এম.এ দিল—সেবারই বাবা মারা গেলেন। বাবা বিভিন্ন জায়গায় সাপ্লাইয়ের কাজ করতেন। সংসার স্বচ্ছল ছিল না। কিংশুকদা, নাশ্যানাল লাইব্রেরী, বৃটিশ কাউন্সিল, ইউ.এস, আই এস—ইউনাইটেড স্টেটস ইনফরমেশন সার্ভিসের লাইব্রেরী, কলেজ লাইব্রেরী, ইউনিভার্সিটি লাইব্রেরীর—নিত্য পাঠক ছিলেন। ম্যাটিকুলেশনে একমাত্র অঙ্কেই লেটার পেয়েছিলেন। অষ্টআশি পর্যন্ত করতে পেরেছিলেন। বলতেন, তিনঘন্টায় ছ'টা প্রশ্ন লেখা যায়—তাতে আবার ব্যাখ্যা থাকে। যারা সিলেবাস তৈরি করে, যারা প্রশ্ন করে আর খাতা দেখে—তাদের বিষয়বস্তুর ধারনাই নেই। একটা প্রবলেম কে যে কত দিক থেকে দেখা যায়—আক্রমণ করা যায়—তবু নিঃশেষ করা যায় না—এই ধারণাই এদের নেই। স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে কী পড়াবার শ্রী। আর্ধেক তো বইটা রিডিং পড়েই মাস মাইনে পান। আর যারা পড়ান—তারা কতগুলো সমালোচনার বইয়ের সামারী ক্লাসে আলোচনা করেন। কেউ যদি বা একটু স্কুলের সমালোচনা করেন—অন্যগুলো খণ্ডন এমন দুর্বল। আমার সঙ্গে তর্ক বেধে যেত—আমি চিহ্নিত হতাম। এম.এ. ইংরেজি দেবার সময় পেপারে আমার লেগেছিল—তিনঘন্টা—পঞ্চাশে চল্লিশ পেয়েছিলাম। প্রাইভেটে না দিলে 'রেজিনা' জুটত। যাকগে আমার টিউশনি কে আটকায়।

এই কিংশুকদার বয়েস পঞ্চাশ। এক সময় কল্যাণদের এম.এ পড়বার সময়ে একটা আড্ডা ছিল। কলেজে। বিশ্ববিদ্যালয়ে তখন আধুনিক হবার দুর্বলতায় সকলেই বামপন্থী বুদ্ধিজীবী। প্রগতিশীল। ডায়ালেকটিক্যাল মেটিরিয়ালইসম্, ইকনমিক ডিটারমিনইজম, কডওয়েল ইত্যাদি খুব পপুলার। অধিকাংশ ছেলেমেয়েই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী—তা গরিব বা বড়লোক সকলেই বামপন্থী। ছাত্র জীবনের শেষ হবার পর যখন সাংস্কৃতিক মন চর্চার অভাবে অনাহারে মৃত—তখনও বামপন্থার প্রেত এদের ঘাড়ে। সব কিছুর ভেতরে ব্যাখ্যা করবার সময় অর্থনৈতিক কারণ খোঁজে। কিংশুকদা এদের বলতেন 'ভালগার মার্কিষ্ট' ব্যবহারিক ও ব্যক্তিগত জীবনে আর পাঁচটা সাধারন লোকের মতই কোন কিছুর মধ্যে ব্যক্তিগত মতলব খোঁজে।

এই কিংশুকদা যখন এম.এ দেবে—তখন একটি মেয়ের সঙ্গে ভালবাসা হয়—মেয়েটি অনার্স নিয়ে বেথুনে পড়ছিল। বয়েস উনিশ। মেয়েটির বাবা-মা কিংশুকদাকে পছন্দ করেনি—অবস্থা ভাল নয়। নিজেদের বাড়ি ঘর নেই। বাপ সামান্য সাপ্লাইয়ের কাজ করে। যদিও মেয়েটির বাপ রাইটার্সে কেরানি। ছেলে দুটি মেয়ে তিনটি। এইটি বড়। দু'জনে মিলে পরামর্শ ঠিক হয়। তার পর একদিন বেথুন কলেজের সামনে ট্যাক্সিতে মেয়েকে তুলে সোজা ওয়েলিংটনে রেজিষ্ট্রি অফিসে। সেখানে রেজিষ্ট্রি হয়। তারপর মেয়েটিকে নিয়ে কিংশুকদা নিজেদের বাড়িতে নিয়ে আসে। মা-বাবা জানতেন। তারা বধূ বরণ করে নিলেন। তারপর মেয়েটি পড়া ছেড়ে দেয়। সংসারে আয় বাড়ল

না—লোক বাড়ল। বিয়ের এক বছর পরে বাবা মারা গেলেন। কিছু রেখে যাননি। এম.এ সদ্য দিয়ে ভালো করে সমাজ-দর্শন পড়বেন ঠিক করছেন—সেই সময় পিতৃবিয়োগ। অগত্যা হাওড়ার একটি স্কুলে মাষ্টারী শুরু করেন। টিউশনি সে অনুযায়ী বেশি হয় না। সংসারে অভাব। স্ত্রীর মুখভার। এক বছরের মধ্যে স্বামীর মৃত্যুর জন্য মাও মেয়েরা কিংশুকদার স্ত্রীকে অপয়া বলে চিহ্নিত করলেন। তবু কিংশুকদাই সংসারের ভরসা। তিনটে এম.এ হবার পর টিউশনি জুটতে লাগল। নিজে কোচিং খুললেন—প্রচুর প্রাইভেট টিউশন—সপ্তাহে দুদিন করে। এবার তিনি একে একে তিন বোনকে বিয়ে দিলেন—প্রচুর ধার করে—এমনকি কল্যাণের কাছে ধার করেও। বিয়ে দেবার সময় বোনদের বলে দিয়েছিলেন—দ্যাখ, পুজোর শাড়ি ধুতি দেব। তোদের ছেলেমেয়ে হলে ফ্রকও দেব। কিন্তু তত্ত্ব টত্ত্ব দিতে পারব না। এ জন্যে যদি কথা শুনতে হয়—শুনবি। আর যদি বনিবনা করতে না পারিস—বাপের বাড়ির দরজা বন্ধ। বোনেরা দেখতে ভাল—তবু পণ দিতে হয়েছিল। এ মেয়েগুলোকে পড়িয়ে কোনো লাভ হল না—একটাও লাভ ম্যারেজ করে একটু সংসারের সাশ্রয় করবে—সব ডিপেনডেন্ট চাইল্ড। মা মারা গেছেন। উত্তর কলকাতা থেকে বাসা তুলে দিয়ে এখন তিনি দক্ষিণ কলকাতায়। হাওড়ায় দুটো টিউটোরিয়াল চালান। এখন হেডমাষ্টার। এক সঙ্গে তিনটি সাবজেক্ট একা পড়ান—ছাত্ররাও ভাল রেজাল্ট করে। অতি কাঁচা ছেলেকেও অঙ্কে তিনি পাশ করিয়ে দেন। তাঁকে ঘিরে একটা মিথ তৈরী হয়েছে। একটি ছেলে—যাদবপুরে ইনজিনিয়ারিং পড়ে।

কল্যাণে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময়ে কিংশুকদার আড্ডায় ঢোকে—সেখানে পপুলার সায়েন্স, ফ্রয়েড, এ্যাডলার, স্বপ্নতত্ত্ব, য়ুং, অস্তিত্ববাদ থেকে প্যারাসাইকোলজি ফ্রেঞ্চ রিভলিওসন থেকে রাশিয়ার বলশেভিক রিভলিওসন—স্পেনস্যার-টয়েনবি—সরকিন—অরবিন্দ—নাম করা উপন্যাস—সত্যজিৎ-মৃণাল সেন—ঋত্বিক ঘটক কিছুই বাদ যেত না। গোড়াতে রোজ বিকেলে—ঘন্টা দু'তিন কিংশুকদা স্কুল থেকে ফিরে—টিউশনি যাবার মুখে—এই আড্ডা তার মনন জীবনের পক্ষে দরকার—তিনি আসতেন। আরো অনেকে। তারপর রোববার সকালে একটা নির্দিষ্ট চায়ের দোকানে তিনচার ঘন্টা। কল্যান সেখানে রোববার রোববার যেত। ইদানীং বেশ কিছুকাল যায় না।

—কিংশুকদা। ডাক দিয়ে কল্যাণ খোলা ঘরে ঢোকে।

ক্ষমতা আছে—স্বামীকে ঘরে বেঁধে রাখতে পারেন।

কিংশুকদা বললেন—স্ত্রীদের কাজ স্বামীকে ঘর ছাড়া করা—বাজার, চাকরি, টিউশনি—সকাল সাতটা থেকে রাত দশটা পর্যন্ত স্বামীকে না দেখা এদের এমন অভ্যাস হয়েছে—বিধবা হবার প্র্যাকটিস বিনা চেষ্টাতেই করে রাখছে।

—সকলেই বিধবা মরে না।

—আরে কল্যাণ এস এস। অনেকদিন পর। রোববারের আড্ডায়ও আজকাল দেখিনা? আর কতদিন অদৃশ্য মানুষ হয়ে থাকবে?

কিংশুকদার স্ত্রী এসে বললেন—ও বাব্বা, কল্যাণবাবু? আপনার স্ত্রীর স্বামীর এসব

কথা বার্তায় অভ্যস্ত।—নারীবাদীরা অচিরেই বলতে শুরু করবে—বৈধব্য নারীর জন্মগত অধিকার। যাকগে, কল্যাণ এখনও প্রেমের নেশাকে ধরে রাখছে। আরে, ওকে কনসেসন দিতেই হবে—আমরা বিয়ের কত আগে থেকে ভালবাসা আরম্ভ করেছি—আর ও বিয়ের পর—হয়তো বেশ কিছুপর—সুতরাং প্রেমের সমাধি তীরে পৌছতে ওর দেরী হবে।

কিংশুকদার স্ত্রী ভেতরে চলে গেলেন।

—কিংশুকদা, প্রেমের পরিণতি কি সমাধি?

—আরে, না, না, সমাধি তো ধ্যানের শেষ অবস্থা—সবিকল্প ও নির্বিকল্প। প্রেম একরকম ধ্যানই—পেটে সন্তান—তুমি তখন গৌণ। ছেলে হবার পর তুমি গৌণ স্বামী থেকে গৌণস্বামী কাম ছেলের চাকর। তারপর ছেলে বড় হলে বিয়ে করলে স্ত্রীর কাছে তুমি একজন রোজগেরে পরিচিত লোক মাত্র। পুরুষ একা হয় অনেক দিন আগে—তবে সেটা বুঝবার ক্ষমতা পুরুষের অনেক পরে হয়—যখন সে পঞ্চাশোর্ধ। তারপর প্রৌঢ় বা বার্ধক্যে স্ত্রী সাহচর্য যখন মানুষ চায়—কেন চায়, জানি না—তখন স্ত্রী পুত্র বধূ নাতি-নাতনী-পুত্র-এদের নিয়ে ঘোর মগ্ন। স্বামীকে না দেখলে তার স্বামীকে মনেই পড়ে না। স্বামীর প্রসঙ্গ উঠলে বিরক্ত বোধ করে। স্বামীর প্রসঙ্গ উঠলে শুধু স্বামীর ত্রুটিগুলোই মনে আসে। স্বামী হিসেবে পুত্র যে কতভালো তার স্বামীর চেয়ে এ কথা ভেবে ঈর্ষা বোধ করে—বলে, নিজে ক্রুদ্ধ হয়। স্বামীর সঙ্গে যতটুকু সংলাপ হয়—তার সার কথা, তাকে বিয়ে করে তার জীবন বৃথা গেছে—তার মত দুঃখী কেউ নেই। এই ভূ ভারতে খুজলে পাওয়া যাবে না।—বাইদিবাই, কিংশুকদা, মেয়েরা বেশি কাঁদে কেন? সামাজিক ট্যাবু মেয়েদের কান্নায় নেই বলে?

—মেয়েদের চরিত্রে গভীরতা কম। দুঃখকে তক্ষুনি চোখের চলে তরল করে ঝেড়ে ফেলে দেয়। দুঃখ সহ্য করবার শক্তি কম বলে। আর সংসারে দুঃখের তো কিছু কমতি নেই—মেয়েদের কান্নাও কিছু কম নয়। দুঃখ পুরুষকে জয় করতে পারে—মেয়েরা দুঃখকে পরাজিত করে।

—আমার মনে হয়েছে, একটা বয়সের পর মেয়েরা কাঁদতে ভালবাসে।

—একটা বয়সের পর মেয়েরা স্বামী ছাড়া সব কিছুই ভালবাসে।

—তাহলে স্বামীর মৃত্যুতে তো মেয়েদের কাঁদবার কথা নয়।

—কাঁদবে না কেন—এমন কান্নার সুযোগ মেয়েরা ছাড়ে। স্বামীকে অবলম্বন করে কত ভুলে যাওয়া দুঃখ মনে পড়ে—সেগুলোকে তরল অশ্রুতে বের করে দিতে হবে না? তবে যাদের সে রকম কান্না পায় না—তারা আছাড় টাছাড় খেয়ে বুকে ঘুঁসি মেরে নিজেকে মার দিয়ে কান্না বের করে। ওটা খুব কষ্টকর চিত্র।

কল্যাণ হেসে ফেলল। ইতিমধ্যে বৌদি এক কাপ চা নিয়ে এসে বলল—আড্ডা শুরু করুন আপাততঃ এই দিয়ে—এক্ষুনি যাবেন না। —তোমাকে থাকতে বলছে কেন বলো তো? আমাকে এক রোববার ছাড়া সহ্য করবার অভ্যাস নেই তো। তুমি থাকলে স্বামীকে ব্যস্ত রেখে একটু সইয়ে নেয়া।

—আপনাদের সোপেনহাওয়ার তাহলে শুরু করে দিয়েছেন।

—আমার সঙ্গে সেই জার্মান ভাগ্যপতির তুলনা করছ কেন? সারা জীবন বাবার ব্যবসার সুদের টাকায় জীবন কাটালেন। নিজের খুশিমত জীবন কাটালেন। বিয়ে করেননি—নিজের স্বাধীনতা রক্ষা করবার জন্য। এত পড়াশুনা করলেন। ওর জীবনকে আমি ঈর্ষা করি। সারা জীবন যদি পড়াশুনা করতে পারতাম—লিখতে পারতাম—তাহলে আর কিছু আমার দরকারও ছিল না।

—বেথুন কলেজের বাসের জন্য ঘন্টার পর ঘন্টা একজনকে দেখবার জন্য দাঁড়িয়ে থাকত কে?

—অমন দুর্বলতা সোপেনহাওয়ারেরও ছিল। তবে দরকারে এক মহিলার ঠ্যাং ভেঙ্গে দিয়েছিলেন। জার্মান মহিলা—দুমনি লাস। আমার বাবা প্রচুর ঋণ, পাঁচ ছয় জনের সংসার আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে পরলোকে গেলেন। তবু তার মৃত্যুতে আমি কেঁদেছিলাম—সবাই কেঁদেছিল।

স্কুলে পড়ান, কোচিনে পড়ান, টিউটোরিয়ালে পড়ান—সেই মান্দাতার আমলের সিলেবাস—এক ঘন্টায় ইংরেজি তো পরের ঘন্টায় অঙ্ক, ইতিহাস তো আছে। নিজে পড়ি কখন?

স্ত্রীর মুখে একটা বেদনার ছাপ—এখন তো আর অত অভাব নেই? কমিয়ে দাওনা।

—এমনিতেই কমে যাবে।

স্ত্রী বলল—কল্যাণবাবু, এখন যাবেন না।

—কমে যাবে কেন?

—ছেলেরা নকল করতে আরম্ভ করেছে। আর মাষ্টারের প্রয়োজন নেই। বামপন্থী শিক্ষক—যারা টিউশনি পান না—তাদের বক্তব্য এই নকল প্রমাণ করে দিল—আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাটা কত ভঙ্গুর—খেলো। যাদের টিউশনি করে খেতে হয়—তাদের হঠাৎ নীতিবোধ জেগে উঠেছে—পলিটিক্যাল পার্টি এদের ব্যাক করে দেশের সর্বনাশ করছে। আমার স্কুলে এখনও আমি নকল হতে দেইনি। ওদিকে কিছু নৈর্ব্যক্তিক পোষ্টার পড়েছে। শিক্ষক, পুলিশ, এরা প্রতিক্রিয়াশীল সমাজকে রক্ষা করে চলেছে। শিক্ষক প্রতিক্রিয়াশীল জ্ঞানের ধারক ও বাহক—এদের খতম করতে হবে।

—এ রকম পোষ্টার আমিও দেখেছি।

—জ্ঞান প্রতিক্রিয়াশীল হয় কি করে? পুরানো জ্ঞান—নতুন জ্ঞান হতে পারে। অল্প তথ্যের উপর ভিত্তি করে জ্ঞান—পর্যাপ্ত তথ্যের উপর ভিত্তি করে জ্ঞান। তথ্য ভিত্তিক জ্ঞান—তা সত্যকে উদঘাটিত করে। মিথ্যা জ্ঞান—বা সত্যের মত দেখতে জ্ঞান, আসলে যা হচ্ছে ফলস ইনফরমেশন—যা প্রিন্ট মিডিয়া, মিডিয়া পরিবেশন করে মূলত মানুষকে চাঞ্চল্যকর কিছু সংবাদ দিয়ে উত্তেজিত করতে অথবা বিভ্রান্ত করতে। এরা তথ্য সংবাদ ও জ্ঞানের পার্থক্য বোঝে না। যেমন রাশিয়ায় যার সঙ্গেই রাষ্ট্র নায়কের বনিবনা হচ্ছে না—অমনি যে প্রতিক্রিয়াশীল—সঙ্গে সঙ্গে তার অতীতের ঘটনাবলী বিকৃত হচ্ছে—অস্বীকৃত হচ্ছে তার অতীত পাল্টে যাচ্ছে। আমি অঙ্ক করাই—সেই একই অঙ্ক, রাশিয়া,

বৃটেন সর্বত্রই রয়েছে। প্রতিক্রিয়াশীল অঙ্কটা কি? যেখানে একের সঙ্গে এক যোগ কি দাড়ায়? আসলে সর্বগ্রাসী রাষ্ট্র যন্ত্রে একের সঙ্গে কিছু যোগ করা যাবে না—ওরা বিয়োগতন্ত্রের উপাসক। সাহিত্য সমালোচনার ধারার একটি অংশে আমি প্রবেশ করছি—হয়ত এগিয়ে যাচ্ছি—নতুন ব্যাখ্যা করছি—নতুবা ঐ ধারাকে বহন করছি। নতুন নতুন তথ্যে ইতিহাস আরো বিশ্বাসযোগ্য ক্রমেই তা থেকে মিথ বা কল্পনা বিদায় নিচ্ছে। এখন পর্যন্ত আবিষ্কৃত তথ্যের ওপরই আমাকে দাঁড়াতে হবে। চরম সত্যকে অন্বেষণে যুক্তি বিভিন্ন মতবাদ সৃষ্টি করে চলেছে। সঠিক ভাবে প্রশ্ন করা হচ্ছে, ভাষাকে কল্পনা ও ইচ্ছাপূরণের হাত থেকে পরিস্কার করে—তার উত্তর খোঁজা হচ্ছে। চিন্তাগত পরিচ্ছন্নতা, বাস্তবের সঙ্গে মিলিয়ে যাথার্থ্যতা নির্ণয়, মানসিক শক্তির সীমা নির্ণয়—এ সবই দর্শনের এখনকার ইতিহাস। এর মধ্যে মানুষকে বিভ্রান্ত করবার পথটা কোথায়? সত্য প্রতিক্রিয়াশীল হয় কি করে? সত্য মানুষের শত্রু যারা বলে তারাই মুক্ত বুদ্ধির শত্রু, যুক্তির শত্রু। এই প্রসঙ্গে আরেকটা পোষ্টারের কথাও বলে রাখি—দেখেছ বহুবার 'যে যত বই পড়ে, সে তত মূর্খ হয়।'

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, মফঃস্বলের সহকর্মীরা বলে এই পোষ্টারে নাকি বহু টাউন ছেয়ে গেছে।

—মানুষের মূর্খ হবার জন্য কোন চেষ্টা করতে হয় না। আপনা থেকে মূর্খত্বে মানুষ সিদ্ধলাভ করতে পারে। অর্থাৎ এরা জ্ঞানকে ভয় পায়, বইকে নির্বাসিত করতে চায়। অর্থটা হচ্ছে, তুমি একটা দর্শনের বই পড়ছ—একটা চিন্তাপ্রণালী অনুসরণ করছ বেশ ক'দিন ধরে—নানা প্রশ্ন তোমার মধ্যে উঠছে—যুক্তিগুলো সম্পর্কে মন সতর্ক হয়ে উঠছে। তোমার মনে চিন্তা প্রণালীর একটা ডিসিপ্লিন তৈরি হচ্ছে। ইনটেলেকচুয়াল ডিসিপ্লিনে তুমি অভ্যস্ত হচ্ছ—এমনি বিভিন্ন দর্শনে তোমার মন বহুক্ষণ যুক্তিশীলভাবে চিন্তা করতে অভ্যস্ত হচ্ছে—তীক্ষ্ণ সমালোচনার অধিকারী হচ্ছ—না বাজিয়ে—না যাচাই করে তুমি কিছু গ্রহণ করছ না। তোমার কাছে ঠুনকো গোঁড়ামি গ্রাহ্য হবে না। সুতরাং এ রকম যুক্তিপূর্ণ চিন্তাশীল মানুষ যে সমাজের পক্ষে ক্ষতিকর—সেই সমাজ মুক্ত বুদ্ধির মানুষের পক্ষে কত ভয়ংকর তা বুঝতেই পারছ। যারা বইকে ভয় পায়, যুক্তিকে ভয় পায়, চিন্তাশীলতা আপদ মনে করে—তারা অন্ধকার যুগের মানুষ—বিশেষ একটা তত্ত্বের ছদ্মবেশে আবির্ভূত হচ্ছে। কোনো সভ্য জগতে এমন পোষ্টার পড়তে পারে—ভাবতে পারে কেউ। ইতিহাসের কাছে একটা শিক্ষার জিনিস আছে—যারা নিজেদের চূড়ান্ত জ্ঞানী ও অভ্রান্ত মনে করে—যুগে যুগে সভ্যতাকে এরাই পেছিয়ে নিয়ে গেছে। মাকর্স বলেছেন, ইতিহাস চলছে উৎপাদন ব্যবস্থাকে ভিত্তি করে, যেখানে শোষক ও শোষিত এমন একটা ধারার মধ্যে নিক্ষিপ্ত যা থেকে কারো বের হবার উপায় নেই। তা হলে নৈতিকতা বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে গেল কি করে। যা বৈজ্ঞানিক সত্য—তার নৈতিকতা বিচার হতে পারে না। বার্ট্রান্ড র‍্যাসেল বলছেন, ক্ষমতা হচ্ছে ইতিহাস ব্যাখ্যার চাবিকাঠি—ক্ষমতার বিভিন্ন মৌলিক রূপ আছে। স্পেঙলার বলেছেন, সভ্যতার জন্ম, শৈশব, যৌবন, জরা ও মৃত্যু আছে। ইতিহাস ধারাবাহিক নয়—তা কতগুলো মরণশীল সভ্যতার সমষ্টি। টয়েনবি জানাচ্ছেন, প্রতিটি সভ্যতার সামনে কতগুলো চ্যালেঞ্জ

আছে—তাকে সমাধান করে এগিয়ে যেতে হয়। যখন চ্যালেঞ্জ আর সমাধান করতে পারেনা তখন থেকে সভ্যতার প্রাণশক্তি চলে যেতে আরম্ভ করে। এমনি করে বহু সভ্যতা সংখ্যায় খুব যে বেশী তা নয়—সবমিলে কুড়ি-একুশটা হবে-তার মধ্যে অধিকাংশই নির্বংশ হয়েছে—যাদের বংশ আছে—তারাও মরণশীল। টয়েনবি সাহেব পরোক্ষে বলতে চান যুগে যুগে সভ্য মানুষ বর্বরদের কাছে হেরেছে। আধুনিক যুগেও বর্বরদের ছদ্মবেশ চিনতে আমাদের অসুবিধে হয় না—যখন এসব পোষ্টার দেখি। প্রিটিমিন সরকিন বলছেন, আমরা কি ভাবে জানি—এই জানার প্রকৃতির ওপর নির্ভর করে সভ্যতার বিবর্তন ঘটে। যখন ধর্ম বা আদর্শবাদ সর্বেসর্বা—অর্থাৎ যখন জ্ঞানকে আমরা সহজাত বলি—তখনকার যুগে যে সভ্যতা গড়ে ওঠে তাকে তিনি বলেছেন ইডিয়েসনাল, যখন সহজাত জ্ঞান ও ইন্দ্রিয়বোধ যুক্তি নিয়ে সভ্যতা গড়ে তুলি তাকে বলেছেন আইডিয়ালিষ্টিক আর যখন শুধুমাত্র—চেতনা সর্বস্ব হয়ে সভ্যতা গড়ে তুলি- -তখনকার সভ্যতাকে বলছেন সেনসেট সভ্যতা। ভাবময় সভ্যতা, ভাব ও ইন্দ্রিয় সমন্বয়ে সভ্যতা ও ইন্দ্রিয় জ্ঞান নির্ভর সভ্যতা। আমাদের বর্তমান সভ্যতা হচ্ছে ইন্দ্রিয় জ্ঞান নির্ভর। ইন্দ্রিয় নির্ভর যুক্তি, যাচাই, উদ্দেশ্যহীন উচ্চাকাঙ্ক্ষা, বৈষয়িকতার প্রতি তীব্র লালসা, আত্মবিশ্বাসহীনতা ইত্যাদি। কার্লপপার মশায় বলছেন, ইতিহাস তত্ত্বের কোনো বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই। কিন্তু আমরা যখন ইতিহাস আলোচনা করব তখন সবগুলোই তত্ত্বই আলোচনা করব। তখন বুঝব, জ্ঞান হাতের মোয়া নয়। বহু মতবাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ থাকলে মন স্বভাবতঃই সতর্ক হয়ে পড়ে—অবিশ্বাসী হয়ে পড়ে—তখন তার কাছে চট করে কোন মতবাদ বিক্রী করা সহজ নয়। মানুষ ইচ্ছাপূরণের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেতে সত্য চাইবেই—মানুষ জ্ঞানী হবার উপাদান নিয়ে জন্মেছে। আর তার জন্য বই অন্যতম প্রধান। বইয়ের বিরুদ্ধে যারা বলে—মানুষের মানুষ হওয়াকেই তারা অস্বীকার করতে চায়। ঠিক এই সময় বৌদি প্লেটে করে চার পিস ফ্রেঞ্চ টোষ্ট, মিষ্টি এনে দিল। বলল—তোমার দাদার এবার চা দরকার। কিংশুকদা বললেন—তুমি অভাবটা বোঝ বলেই তো তোমাকে কিডন্যাপ করেছিলাম।

কল্যাণ মনোযোগ দিয়ে শুনছিল—চা টারই প্রয়োজন ছিল—আজ হরতালের দিনে মিষ্টি পেলেন কোথায়? ডিম পাউরুটি না হয় ধরলাম, গতরাতে কিনেছেন। মিষ্টি?

—মিষ্টি বাড়িতে আমি রাখি—তোমার দাদা পছন্দ করেন।

—আপনি থাকতে আবার মিষ্টি কেন?

—ও বাব্বা, এ যে তরতাজা রোমান্টিক। এখন ভাই, আমাকে আর মিষ্টি লাগে না—তাই সঙ্গে মিষ্টি রাখতে হয়। মিষ্টির সঙ্গে দেখতে দেখতে যদি আমাকে মিষ্টি লাগে। ল'অফ এসোসিয়েসনের দৌলতে বেঁচে থাকা। তারপর কল্যাণবাবু, এমন সুন্দর হরতালের সকালে আঁচল ধরে পাশে বসে না থেকে দাদার কচকচি শুনতে এলেন যে বড়।

—ও, তাও তুমি বুঝলে না, কল্যাণ বিরহ চায়—স্ত্রীকে নতুন ভাবে পাবার জন্যে। হাঁটা পথে তোমার বাড়ি থেকে মাইল খানেক হবে না? এই এক মাইল বিরহ এখন

কল্যাণ বোধ করতে চায়। এক রাস্তা—টানা রাস্তাই তো—হরিশ মুখার্জী থেকে—এক রাস্তা বিরহ।

—কিন্তু এখনও বাচ্চাকাচ্চা নেই কেন? বাচ্চা না হলে সংসারে পূর্ণতা আসে না। শুধু স্বামী-স্ত্রী হলে সংসার হয় না। স্বামী-স্ত্রী-বাচ্চা তবেই সংসার। রীনাকে নিয়ে এলেন না কেন? সারা দুপুর এক সঙ্গে খাওয়া দাওয়া আড্ডা চলত।

—স্ত্রীকে ব্যস্ত রাখতে প্রত্যেক স্বামীই চায় স্বামী উদ্ব্যস্ত হোক। তবে কত্রীর ইচ্ছার কর্ম। চাইলেই আমি সাহায্যের জন্য রেডি।

—স্বামী স্ত্রীকে ব্যস্ত রাখতে চায় আর স্ত্রী চায়। তবে কর্ত্রীর ইচ্ছায় কর্ম। চাইলেই আমি সাহায্যের জন্য রেডি।

—তাছাড়া, বৌদি—জনসংখ্যা আমাদের দেশের এক নম্বর চ্যালেঞ্জ। রাষ্ট্র সেই সমস্যাকে সমাধান করতে তেমন উদ্যোগী নয়। তারপর যদি আমি আবার একটা সংখ্যা যোগ করি।

—এক বা দুইয়ে আমরা থেমে যাব। কিন্তু আমাদের পিতা মাতাদের কথা ভাবত। বাবার রোজগার অল্প—তাও অনিয়মিত। তার চারটি সন্তান। তবু নাকি ঠাকুমা গনগন করতেন—সাত বা নয়—এর আগে থামা উচিত নয়।

—আচ্ছা, কিংশুকদা আমাদের দেশের মানসিকতার মধ্যে প্রধান অভাব কি? যুক্তিহীনতা?

—না। আমরা ইচ্ছাপূরণের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। আমরা বৈষয়িক — কিন্তু বাস্তববোধ আমাদের নেই, আমরা বুদ্ধির বাহাদুরী দেখাবার জন্য তর্ক করতে পারি—কিন্তু যুক্তিশীল আমরা নেই। আধুনিক পুরানো যাই হোক, আমরা বড্ড কুসংস্কারকে ভালবাসি। আর কুসংস্কারটি থাকে ইচ্ছেপূরণের ক্ষমতাকে ভিত্তি করে। আমরা দর্শন পড়ি চরিত্রে তার প্রভাব নেই। যুক্তিশীল চিন্তা প্রণালী আমাদের মধ্যে গড়ে ওঠে না। বিজ্ঞান পড়ি—কিন্তু বৈজ্ঞানিক মনন আমাদের মধ্যে নেই। এখানে একুশ বছর বয়েস হলেই ভোটার হওয়া যায়। ভোটার হবার জন্য কোনো মানসিক যোগ্যতা দরকার নেই। কোনো পরীক্ষা দরকার নেই। অর্থাৎ যৌন ক্ষমতা হলেই ভোটার হওয়া যায়। আমাদের দেশের প্রথম দরকার কি জান? মানসিক চিকিৎসক। শুধু মার্কসিট দেখে নয়—মানসিকভাবে কে শিক্ষক হবার যোগ্য তা ঠিক করা। সব পেশায় এমন মানসিক পরীক্ষার দরকার। ভোটার হবার যোগ্যতাও এমনিভাবে ঠিক করা দরকার। তুমি বলতে পার, মানসিক চিকিৎসকের যোগ্যতা কিভাবে স্থির হবে? আপাতত এখানে না পাওয়া গেলে বিদেশ থেকে আনতে হবে। তবে এখানেও আছে। আসলে রাজনীতির কাজ হচ্ছে উত্তেজনার মদে মানুষকে মাতাল করে রাখা। আর ইচ্ছাপূরনের কল্পনাকে ব্যবহার করেই উত্তেজনা আসে। এতকালের পরাধীনতায় আমরা নেতা নির্ভর—দাদা নির্ভর হয়ে গেছি। আমরা নেতা চাই—পরাধীনতা চাই—নিজেকে স্বাধীন করতে ভয় পাই। ইচ্ছাপূরন ও কুসংস্কারের জন্য স্বাধীনতাকে এত ভয় পাই আমরা। এরিক ফর্মও এ জাতীয় কথা—একটু অন্য ভাবে বলেছেন। স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা কম বলেই—আমাদের দেশের নেতারা এত

ক্ষমতাপ্রিয়। যুক্তিশীল মানুষ ক্ষমতা চায় না—সে জ্ঞানের জন্য ব্যগ্র। আর অযৌক্তিক ক্ষমতাপ্রিয় লোক আধিপত্য চায়। তার আবেদন কুসংস্কারের কাছে লোভের কাছে আর ভয়ের কাছে আর কুসংস্কার-লোভ-ভয় যে বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করেছে—তার কাছে। রাজনীতি জাতির শত্রু—পার্টি যেখানে মানুষকে ক্রীতদাস করে রাখতে চায়—লোভ, বিদ্বেষ আর উত্তেজনায় বুদ্ধিকে চিরকালের জন্য বামন করে রাখে—সেখানে উদ্ধারের সহজ পথ নেই। 'বিপ্লব' আমাদের এত ভালো লেগেছে কেন জান? আমরা অলৌকিতায় বিশ্বাসী বলে। বিপ্লবের মধ্যে আমরা অলৌকিকতার রোমান্স অনুভব করি।

—কিংশুকদা, আপনার সহকর্মীদের সঙ্গে সম্পর্ক কি রকম।

—এখন দেখ, আমি ট্রিপল এম.এ.। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় কোনো বিষয়েই আমার দক্ষতা নেই। যারা আমার চেয়ে কম নম্বর পেয়ে বি.এ. বা এম.এ. একটা বিষয়ে এ হচ্ছে তাদের রটনা। উদ্দেশ্য আমার টিউশনির বাজার নষ্ট করে লাভবান হওয়া। ছাত্রদের আমি ইউনিয়ন গড়তে দিইনি—পার্টিগুলো আমার বিরুদ্ধে। নকল করতে দিচ্ছি না। ছাত্র ও অভিভাবক আমার বিরুদ্ধে। ম্যানেজিং কমিটি আমার তর্কের জবাব দিতে পারেনা—আমার বিরুদ্ধে। টিচার কাউন্সিল তো মনে করে তারা শ্রমিক পক্ষ আর আমি মালিক পক্ষ। তারা শোষিত ছাত্র শিক্ষকের প্রতিনিধি—আমি স্বয়ং শোষক শ্রেণির প্রতিনিধি। তবে যারা আমার কাছে পড়ে—সেই সব ক্লাসের ছেলেরা আমাকে ভালবাসে। আমি মরব তবু সাবমিট করব না—বলে দিয়েছি। দেখ কল্যান, শিক্ষকরা যদি ছাত্রদের ভয় করে, ছাত্রদের পেশিকে ভয় করে—তবে কোনো শিক্ষা ব্যবস্থাই চলতে পারে না। একটা দিন অনিবার্য ভাবেই আসবে—আর তা যৌক্তিক পরিনতি ছাত্রদের কাছে শিক্ষকদের পরাধীনতা।

—তবু কিন্তু সাবধান কিংশুকদা—কাণ্ডজ্ঞানহীন উন্মাদ ক্যাডারের কিন্তু সংখ্যা কম নেই। এতদূর থেকে যাতায়াত করেন। আর যা স্পষ্ট বক্তা। আচ্ছা এসব করছে কারা?

—দেখ মজার ব্যাপার, কৃষকদের ন্যূন্যতম মজুরী জমির মালিক দেখ না—তাই সরকারী আইন অনুযায়ী মজুরী আদায়ের জন্য একটি আন্দোলন হয়। আর তাতে মার্কিস্ট পার্টির কিছু দলছুট নেতাও ও কলকাতার কিছু নামী কলেজের ছাত্র একে সর্বাত্মক গেরিলা যুদ্ধের চেহারা দিতে চাচ্ছে—আসলে কিছু গুপ্ত হত্যাই এদের বিপ্লবের সার কথা। সবচেয়ে ক্ষতি হল শিক্ষা ব্যবস্থায় নকলের ব্যাপারে সব দল একসঙ্গে সহযোগিতা করছে।

মাঝে বৌদি চলে গিয়েছিলেন। আবার এলেন।

—চলি কিংশুকদা। কতকাল যে আড্ডা দিই না। আজ আমরা উপার্জনের জগতের কয়েদি। স্বাধীনতার স্বাদ আর আমাদের উদ্বেল করে না।

—আসলে, কল্যাণ জান, আমরা ষ্টান্ডার্ড অব লিভিং এমন বাড়িয়ে ফেলেছি—চাহিদা আমাদের এত বেড়ে গেছে—আমরা অন্তরকে উপবাসী রেখে একটা মৃত অন্তর নিয়ে বেঁচে আছি। অন্তর মরে গেছে—জানিও না। আবার অনেকের অন্তর জন্মাবার

আগেই মরে যায়। সে জানলও না—আমার অন্তরের প্রয়োজন ছিল। যাক, আর দশটা বছর পার করতে পারলে বাকী সময়টা ইচ্ছে মত পড়াশুনা করব। কতকাল যে পেটভরে পড়াশুনা করি না। এমন রেশনমাপা পড়াশুনায় দিন চলে না।

—বৌদি, চলি। এখন হরতাল যদি ঘন ঘন হয় তবে আসব।

—হবে হে—হবে। ফাঁকিবাজদের রাজত্বে বাস করছ। কত ছুটি পাবে। এস আবার।

—এবার সুসংবাদ নিয়ে আসবেন।

—বলব রীনাকে আপনার দাবীর কথা। চলি।

মনটাকে অনেক সুস্থ মনে হচ্ছে। অনেক স্বাভাবিক মনে হচ্ছে কল্যাণের। একটা অনুভূতির মধ্য থেকে বেরিয়ে একটা চিন্তার স্রোতে নিজেকে ভুলে থাকায় কল্যাণ সুস্থ বোধ করে। সত্যি নিজেকে ভুলে থাকার মত শান্তি আর নেই। চিরকাল কিংশুকদা একটা চিন্তা শৃঙ্খলার মধ্যে বাস করেন। কিংশুকদার কাছে এলে চিন্তা-স্নাত হওয়া যায়। নিজের জটিল মনের বাইরে এসে একটা উদার চিন্তা-জগতের স্পর্শ পেয়ে কল্যান যেন অনেকটা কিছুক্ষনের জন্য ফিরে পায়।

কল্যাণ অফিসে ঢোকবার মুখে রমাকে দেখতে না পেয়ে একটু আশ্চর্য। রমার আসবার পথে ট্রাম বাস্ এর কোনো হাঙ্গামা হয়নি তো। কল্যাণ আর তিন সহকর্মীর সঙ্গে একটা শেয়ার ট্যাক্সীতে আসে। মাস কাবারে ওকে টাকা দিতে হয়। ফেরবার পথে আজকাল শেয়ার ট্যাক্সিতে আর যায় না। তবে যাবার টাকাটা দিয়ে দেয়।

গন্ডোগোল নিয়ে কেরানিকূল নানা আলোচনা করছে। কল্যাণ ফাইলের মধ্যে ডুবে রয়েছে। একবার সংবাদ নিল—রমা আজ আসেনি। কি হল। ভেবে রাখল, ছুটির পর যাবে। টিফিনের একটু আগে একটা অর্ডার পেয়ে কল্যাণ খুব অবাক ও খুশি হল। ওকে পারচেজ সেকসনের চার্জে দেওয়া হল। আগামী মাসে জয়েন করতে হবে। তক্ষুনি মোটর কেনার জন্য লোনের দরখাস্ত করে দিল। পারচেজ সেকসনে যাবার পর মোটর কিনলে কথা উঠতে পারে—তাই লোনটা ওর জরুরি দরকার বলে জানাল। টেলিফোনে ওটা ফিনান্স ডিপার্টমেন্টকে জানাল। ফিনান্সের অফিসার বলল—দু'তিনদিনের মধ্যেই স্যাংসন হয়ে যাবে। কল্যাণের মামার মোটর ছিল—কল্যাণ ভালই গাড়ি চালাতে জানে। একটা মোটর লাইসেন্স পেতে ওর কোনো অসুবিধেই হবে না। ভিহিকল ডিপার্টমেন্টের চার্জে এখন যে রয়েছে—একসঙ্গে চার বছর কলেজে পড়েছে—পরে ডাবলু-বি-সি-এস হয়—মাঝে মধ্যে টেলিফোনে কথা হয়। ফিনান্সের থেকে আশ্বস্থ হয়ে এবার মোটর ভিহিক্যাল অফিসে বন্ধুকে ফোন করল। খুব ব্যস্ত ছিল—তবু খুশি হয়ে জানাল—কোনো অসুবিধে নেই—তোমার নামে হবে—তুমি নিজে গাড়ি চালাতে জান—নিজেই তো ড্রাইভ করবে। একটা ফোন করে চলে এস। এবার বকেয়া কাজগুলো মিটিয়ে ফেলতে হবে। অনেক দিন এ ডিপার্টমেন্টে ছিল। বেশ কিছুকাজ এ ক'দিনের মধ্যে শেষ করতে হবে। ইতিমধ্যে ম্যানেজিং ডিরেক্টার ডেকে পাঠালেন—পারচেজে তোমাকে দিচ্ছি—ডিপার্টমেন্টটা থেকে অনেক রিপোর্ট আসছে—তুমি ঐ গুরুত্বপূর্ণ

ডিপার্টমেন্ট-এ একটা অর্ডার আর সিস্টেম নিয়ে আসবে—এজন্যই তোমাকে দিলাম। সবাই জানে, পারচেজ ডিপার্টমেন্ট হচ্ছে সবচেয়ে লাভের জায়গা-কিন্তু কল্যাণ কোনো দিন তার উদ্যোগ করেনি। অনেক দেরিতে পেল। বেলা তিনটার সময় পারচেজের সোমেন ভট্টাচার্য দেখা করতে এল। এসেই বলল—খবর শুনেছেন—রিসপেসনিষ্ট মিস মিত্রের বাবা মারা গেছেন—পরশু সকালে। কল্যাণ চমকে উঠল। ভট্টাচার্য বলল—একটা চিঠি পাঠিয়ে দিয়েছে। হরতালের দিনে কি করে কি করল। বাবা-ই একমাত্র পুরুষ। যাই বলুন মিঃ চাটার্জী, মিস মিত্রের ওপর কিনতু অবিচার করছে কোম্পানি। ইংরেজিতে অনার্স গ্রাইজুয়েট—অথচ রিসেপসনে পড়ে আছে। ওর অন্তত অফিসার্স গ্রেডে যাওয়া উচিত। শুনে সবাই দুঃখ করছিল—সবাই যাবে দেখা করতে। আজকে তো বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টের মেয়েরা বোধ হয় যাচ্ছে। আমরাও যাব—দু'চারজন করে—যা দিন কাল—আমি তো উত্তরপাড়া থেকে আসি—ভাবছি, কাল ছুটির আগে বেরিয়ে দেখা করে আসব। ভদ্রলোকের একটি মাত্র সন্তান—যদি কোনো সাহায্য করতে পারি। অফিস থেকে কনডোলেন্স পাঠিয়ে দিচ্ছে।

কল্যাণ ভাবল, মিস মিত্রের সঙ্গে ওর মেলামেশা নিয়ে অনেক কানাঘুষা আছে। ভটচাজদা কি ফেবারে আসবার জন্য রমার সংবাদ দিল। এখন থেকেই লাইন করে রাখল। কিন্তু কল্যাণের কথা বলতে ইচ্ছে হচ্ছিল না। এখন গাদা গাদায় সহকর্মীর দল রমার বাসায় ঢু মারবে সমবেদনা জানাতে। রমা ওকে একটা ফোন করল না? ওরই তো আগে জানা উচিত ছিল। একটা অভিমান ওর অন্তরে জেগে উঠল। কল্যাণ বুঝল, ভটচার্যদা, ওর প্রতিক্রিয়া তীক্ষ্ণভাবে লক্ষ্য করছে। —চলি, আপনার হাতে অনেক কাজ—অনেক ফাইল ক্লিয়ার করতে হবে। সত্যি, মিস মিত্রের জন্য দুঃখ হয়। আগে ফিরিঙ্গ মেয়েগুলো একটু ইংরেজি বলতে পারলেই রিসেপসনিষ্ট হত—এখন মিস মিত্রের মত এডুকেটেড মেয়েকে—অমন রেজাল্ট এক একটি সেকসনে ক'জনার আছে। যে ক'জন মহিলা আছেন—তার মধ্যে স্কুল ফাইনাল তো তিন জন—আর বাকি যে কজন আছেন—পাসকোর্সের গ্রাইজুয়েট। নীরব থেকে ভটচার্যদাকে কল্যাণ বুঝিয়ে দিল—মিস মিত্র সম্পর্কে কোনো প্রতিক্রিয়া আদায় করতে পারবে না। লোভনীয় বদলি, মোটর কেনার নিশ্চয়তার আনন্দ, রমার সঙ্গে সন্ধ্যা কাটাবার আনন্দ—সব ম্লান হয়ে গেল। গত দু'দিন ওর রমা-তন্ময়াতার একটানা যন্ত্রণা সহ্য করে এসেছে। আজ সন্ধ্যাটার জন্য কী ব্যাকুল প্রতীক্ষা, কত স্বপ্ন, কল্পনা, সব থেকে আজ বঞ্চিত। রমা অফিসে আসবে না কতদিন। ওর রোজ যাওয়া কি উচিত হবে? রমাকে নিয়ে মোটরে—কত কি মধুর মুহূর্ত সৃষ্টি করবার ইচ্ছে—আর এখন রমা শোকগ্রস্ত। অফিসের লোকের সামনে রমার কাছে যেতে চায় না। অথচ আজ না গেলে রমা কি ভাববে। ওকি মনে মনে ওর প্রত্যাশা করছে না? একটা বঞ্চনার বেদনা ওর সমস্ত আনন্দকে ম্লান করে দেয়। ওর ধারনা হল—ওর বদলির জন্যে অভিনন্দন জানাতে আসবে অনেকে শুধু এই দেখবার জন্য—ক'দিন রমা না আসবার প্রতিক্রিয়া ওর মধ্যে কি হয়। দু'দিন পরে আজ অফিস খুলেছে—আজ ওর পক্ষে সকাল সকাল যাওয়া সম্ভব নয়। একটু রাত হলেই যাবে—

যারা দেখা করতে যাবে—তারা সাতটার মধ্যে যাবে—সাড়ে সাতটায় কল্যাণ যাবে। তার আগে মা ও মেয়ের জন্যে কিছু ফল নিউমার্কেট থেকে কিনে নিয়ে যেতে হবে। আজ কল্যাণ ছ'টা পর্যন্ত অফিসের ফাইল ক্লিয়ার করবে। আবার ফিনান্স ডিপার্টমেন্টে ফোন করল—আমি পারচেজ জয়েন করবার আগেই যেন লোনটা পাই। কল্যানকে জানাল—দুদিনের মধ্যেই পাবে—তুমি মডেল পছন্দ কর।

প্রায় সাড়ে সাতটার সময় কল্যাণ এসে রমার বাসায় পৌছল। রমা ওকে নিয়ে সোফায় বসে নিজে মাটিতে বসল। শুকনো মুখ, শুকনো বেণী—যেন তপস্যারত কোনো আশ্রম কন্যা। মনে মনে উপমাটি ভাবলেও, বুঝল, এখুনি তা বলবার সময় নয়। —আমি জানতাম কল্যাণ তুমি এখন আসবে। তোমাকে ভীষণ ভাবে চাইছিলাম। রমা কেঁদে ফেলল। কাঁদলে রমা মুখে আঁচল ঢাকা দেয়। কল্যাণের ইচ্ছে মাটিতে বসে। কিন্তু এই প্যান্টে মাটিতে বসা যায় না। কি বলবে?

কিন্তু রমা সামান্য একটু কাঁদল। আজ দু'দিন কথা বলতে গেলেই একটা অল্পায়ু হাল্কা কান্না ওর মধ্যে দেখা দেয়।

রমা চোখের জল মুছে তাকাল। কি স্পষ্ট ব্যথাতুর চাহনী। কল্যাণের বুক টনটন করে উঠল।

—কি হয়েছিল।

—নর্মাল ডেথ—ডাক্তার তো তাই বললেন। একেবারে ভোরে। মৃত্যুর সময় আমার মেয়েটা—আমার মেয়েটা করতে করতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। মা সামনে ছিলেন। আমার নামটা মনে করতে পারেননি।

—অসুখটা কি ছিল।

—কার্ডিয়াক এজমা—গাউট। বয়েস হয়েছিল বড় জোর পঞ্চাশ।

—কিচ্ছু বয়েস হয়নি।

—কল্যাণ তোমাকে একটা কাজ করে দিতে হবে। বাবার একটা ছোট অবিচুয়ারী ষ্টেটসম্যান ও অমৃত বাজার পত্রিকায় দিতে হবে স্পেস ভাড়া করে। আমি গতকাল দুপুরে লিখে রেখেছি। দেখতো কেমন হয়েছে— হেডিং দিয়েছি—ডেথ অফ এ নেগলেগটেড আর্টিষ্ট। কল্যাণ সবটা পড়ল—চমৎকার—টাচিং। আচ্ছা কবে বের করতে হবে।

—বাবার শ্রাদ্ধের দিন।

—কত খরচ পড়বে জানি না—তবু তোমাকে—

—একদম ও কথা বলবে না। দাও, আমি টাইপ করে পিওন দিয়ে পাঠিয়ে দেব। কোনো ফটো দেবে?

—ভাবছিলাম—দিলে যৌবনের ফটো দেয়াই ভাল। বাবার যৌবনের একটা ফটো ছিল মা'র সঙ্গে অবনের অন্নপ্রাশনের। ওখান থেকে বাবারটা আলাদা করে।

—ঠিক আছে, আমি ফটো করিয়ে ওবিচুয়ারীর সঙ্গে ছেপে দেব। তোমার বাবার আঁকা কয়েকটা ছবির নাম বল। আর প্রদর্শনীটা কোনখানে হয়েছিল বল তো?

রমা সাল তারিখ স্থান সব বলল। বহুবার শোনা।

—কেন বলতো?

—আমি রয়টারকে দেব। তোমারটাও থাক।

চুপ করে রইল দু'জনেই।

—এসব ফল কেন এনেছ। দু'দিন হরতাল ছিল। আজ পাড়া থেকে অনেক কিছু দিয়ে গেছে—কে খাবে? সেদিন মৃত্যুর সংবাদ পেয়ে পাড়া ভেঙে পড়েছিল। ওদের হঠাৎ মনে হয়েছে—একজন শিল্পীর জন্য ওরা কিছু করেনি। সেই হরতালের মধ্যে বহুলোক শ্মশানে গিয়েছিল—গতকাল বিকেলে বাবার জন্য ক্লাবে শোক সভা হল—আমি গিয়েছিলাম। এখানে বহু বাড়িতেই বাবার ছবি আছে। আমি জানতাম না।

কাজটা মিটুক। তোমাকে আমি একটা ট্রাজিক জীবনের কাহিনী শোনাব। বো'র যদি হও—তবু শুনো। তা হলে হয়তো আমাকে —আমার আচরণকে বুঝতে পারবে। কারণ তুমি আমাকে বুঝতে চাও। তুমি আমার জীবনের প্রথম বন্ধু—একমাত্র বন্ধু। আজ অফিস থেকে অনেকেই এসেছিলেন। আমি জানতাম, ওরা চলে গেলে তুমি আসবে। আমি ঘড়ির সঙ্গে কথা বলছিলাম—বন্ধু কখন আসবে? ঘড়ি যেন ইঙ্গিতে বলল—সময় এসে গেছে। তারপর তুমি এলে। তুমি সেদিন ঝড়ের রাতেই এসেছিলে। আমার অন্তরের দরজা ভেঙে। দ্বিতীয় ঝড় এ পরদিন ভোরে—একজন ঝড়ের মধ্যে চলে গেল। মনে হয়, বাবার মৃত্যু বাবার পক্ষে প্রয়োজন ছিল—আমাদের পক্ষে নয়। শেষ মুহূর্তে বাবার একটা পরিবর্তন এসেছিল—তিনি যেন শেষ মুহূর্তে নিজেকে খুঁজে পেয়েছিলেন। সেই চেহারা মুখে ছিল। সে আমার রোজকার পরিচিত বাবা নয়। আমি তাকে দেখিনি—মা দেখে চিনেছেন।

কাগজটা পকেটে রেখে কল্যাণ বলল—তুমি আমাকে তোমার একমাত্র আপনজন যখন ভাব—তখন সেই জোরে বলছি—যা এখন এই কাজের জন্য দরকার—আমার কাছে নিতে কিচ্ছু সঙ্কোচ করবে না।

—দরকার বিশেষ কিছু নেই। পাড়ার পুরুত আছে—তার সঙ্গে কনট্রাক্ট হয়েছে—সেই সব কিছু জোগাড় করবে—আমি শুধু টাকা দেব। পাড়ার ছেলেরাই দাঁড়িয়ে থেকে সব করবে। আমার যা আছে—তাতেই হবে। বিশেষ কিছু করব না। তা হলে অবহেলিত শিল্পীর অনাহারক্লিষ্ট জীবনের ওপর অবিচার হবে।

—আমার কোনো সাহায্যই নেবে না।

—তোমাকে না হলে আমি বাঁচব কি করে। তিনদিন শুধু নয়—বহুদিনই তুমি না জেনেও আমার সত্তার সঙ্গে মিশে গেছ। অশৌচের সময় এসব কথা বোধহয় বারন।

—তোমার মা'র সঙ্গে দেখা করা উচিত।

—যাবার সময় কর। দু'দিন কি ভাবে কাটালে?

—তোমার স্বপ্নের মধ্যে।

—আর আমি দুঃস্বপ্নের মধ্যে।

—মা, কেমন আছেন?

—একদম চুপ হয়ে গেছেন। বলছেন, একটা পুরুষ মানুষ যত রোগীই হোক—তবু ভরসা। পাড়া থেকে অনেকেই আসছেন—বিশেষ করে মা'র বয়সি যারা। সতেরো বছরে সদ্য বিয়ে করে এ বাড়িতে এসেছেন। সবাই চেনে—তবে বাবার মৃত্যুতে আমাদের মনে পড়ল। সব বলব তোমাকে।

—শোকে কি বলতে হয় জানিনে। তবে অন্তরের বহু বেদনাকে বাইরে আনা যায় না। আনতে গেলে ওদের রূপ বদলে যায়। নীরব হয়ে যে চলে যায়—তার জন্যে নীরব সহানুভূতিই সবচেয়ে পবিত্র। তোমাকে দেখে বুঝতে পারলাম—শোকে পবিত্র—শোকে তোমার মধ্যে তপস্যার রূপ। তুমি অশৌচ নয়—দুঃখের দাহে তুমি পবিত্র—তোমার পাশে নিজেকেই অশৌচ মনে হচ্ছে।

—রমা আজ কল্যাণের সব কথা বিশ্বাস করল।

কল্যাণ ফিরতে ফিরতে ভাবল, মেয়েদের বাবা মেয়েদের একটা অবসেসন। এখন রমার বাবা নেপথ্যে ছিলেন, কারো সঙ্গে দেখা করেন না—এ দিক দিয়ে তাকে প্রশংসা করতে হয়। কিন্তু মেয়ে তার লম্বা জীবনী একদিন বলবে—একদিনে হবে কি ক্ষেপে ক্ষেপে হবে—এক ঘেয়ে লাগলেও শুনতে হবে—মুখে সহানুভূতি ও বেদনার রেডিমেড আবির্ভাব দরকার। ভদ্রলোক আরও কিছুদিন বাঁচলে পারতেন—তা হলে হয়তো বাইওগ্রাফিটা এক্ষুনি শুনতে হত না। যাক, শুনব। ওদিকে রীনার বাবা—সেও রীনার সাইলেন্ট অবসেসন—তার যদি মৃত্যু হয়—তা হলে সকলে মিলে তার কথা বলবে—এতদিন তিনি একা নিজের কথা বলতেন—বোর সকলে মিলে। মৃত্যুর শোকের জন্য রীনার বাবার কথা একমনে—ভান করে হলেও—শুনতে হবে। শালীরা বলবে, শালারা বলবে। সর্বনাশ। তবে রীনার বাবার মৃত্যুর একটা প্লাস পয়েন্ট আছে। ক'দিন আর বলবে? ক'দিন আর জেনকিন্স সাহেব এদের মুখেমুখে ফিরবে? তারপর সম্পত্তি নিয়ে যখন ঝগড়া শুরু হবে। ঐ রীনার বাবা—উঃ কী হরিবল। যাওয়া মাত্র তিনি আগলে থাকবেন—চলবে তার সেই এক কথা—কতবার বলা—তার খেয়াল নেই। শালীদের সঙ্গে আড্ডা, রসিকতা কিছু তিনি করতে দেন না—যদি ভেতরে যাই মা'কে প্রণাম করবার জন্যে তখন তিনি সঙ্গে সঙ্গে আসবেন। ওদিকে রীনা বোনদের ঘিরে গল্প করছে—ভাইরাও শুনছে। এরাও কেমন যেন—কেউ উদ্ধার করতে আসে না। রীনার বাবা কিন্তু বড্ড খারাপ ব্যবহার করেন বরুণদার সঙ্গে। পাশাপাশি বসে থাকলেও—তিনি বরুণদার সঙ্গে কথা প্রায় বলেনই না—এদিক থেকে বরুণদা বেঁচে গিয়েছেন—এত তুচ্ছতাচ্ছিল্য করেন—যেন বরুণদা বড় জামাই নন—একটা রাস্তার লোক। আর বরুণদা আসেন না। মীনাদিকে প্রথম দেখার কথা আজও মনে আছে। এমন রূপ কল্যাণ দেখেছে বলে মনে পড়ে না। এমন সৌন্দর্যের সঙ্গে একটা বুদ্ধির কাঠিন্য যেন মহিলাকে একটা ব্যক্তিত্ব এনে দিয়েছে। পরিচয় হতেই —বাসরে—কল্যাণ বলল—আপনাকে আমি আগেও অনেকবার দেখেছি। —একটু ভ্রু কুঁচকে বলল—কোথায় বলত—? —স্বয়ং বর সভায় মালা হাতে বর খুঁজে বেড়াচ্ছেন। অনেকদিন আগের কথা। আপনার মনে নাও থাকতে পারে।—তুমিও ক্যান্ডিডেট ছিলে নাকি? —না, আমি দারোয়ান,

দৌবারিক অর্থাৎ চতুর্থশ্রেণীর কর্মচারী ছিলাম। তবে মনে আছে।

—রীনা, তোর কপাল ভাল, রোমান্টিক স্বামী পেয়েছিস। অনেক বানানো মিষ্টি মিথ্যা কথা শুনতে পাবি। তোর সাহিত্য পড়া কাজে লাগল। তা ভাই কথক ঠাকুর—সে সভায় আমি কাকে মালা দিয়েছিলাম মনে আছে তো? —আপনাকেই মনে আছে—আর সব ভুলে গেছি। —আমার নামটা মনে আছে? —তা আছে—ইন্দুমতি। —কেন দ্রৌপদীর স্বয়ংবর সভায় তুমি ছিলে না? —না, আপনিও ছিলেন না। দ্রৌপদী কৃষ্ণা—আপনি কখনও তা নন। তা ছাড়া ভীম যেখানে থাকে—আমি সে সভায় ভয়ে থাকি না। —কেন আমার তো ভীমকে বেশ লাগে—বর হয় তো এই সা। আদিম, বর্বর, সরল, প্রবল, তীব্র—যে হিড়িম্বাকে তুষ্ট করতে পারে। ভীম তো আদর্শ পুরুষ—অথচ স্ত্রৈণ নয়—মেয়েদের পেছনে ছোটে না। এখনও বাইরের পোষাক, সফিস্টিকে-শনের অন্তরালে—অন্তরে অন্তরে যে ভীম—আমি তাকেই পুরুষ বলে মনে করি। বাবার যত মেয়েলি সৌন্দর্য খোঁজে পুরুষের মধ্যে। রীনার জন্যে একটা রোমান্টিক কথক জোগাড় করেছে। এ যুগেও ভীম আছে—তাদের খুঁজে বের করতে হয়—আদিম অন্তরকে জাগিয়ে তুলতে হয়—তার জন্যে চোখ চাই। পুরুষ হবার জন্যে তার ভেতরের শক্তিকে জাগানো চাই। —তা হলে বরুণদার সঙ্গে ভয়ে ভয়ে কথা বলতে হবে। —ও, তোমার বরুণ দা—হোপলেস। ও, জন্মজন্মান্তর ধরে পাঠশালার পণ্ডিত। কোর্টে হিয়ারিং শোনে, রায় লেখে—সময় পেলে বই পড়ে—রাত জেগেও বই পড়ে। আগে আগে বলত—বউ আর বই আমার নেশা। একটা পুরোন নেশা আরেকটা নতুন। ভীমের আর্য-অনার্য দুটো রেসের নারীই তার আয়ত্তে ছিল—কিন্তু বৌ তার নেশা ছিল না। আর বই—অপরের চিন্তায়, কল্পনায় কী যে আনন্দ আমি বুঝিনে। রীনা বলল—দিদি, তুমি কিন্তু ঠিক কাজ করছ—মঙ্গলকাব্যের পতিনিন্দা বাসরে করতে হয়—তুমি ঠিক সেই রীতি মানছ। অবশ্য তোমার নিন্দাটা প্রশংসার ছদ্মবেশ বেশ বুঝতে পারছি। —ছদ্মবেশটেশ বুঝি না। নারী পুরুষের সম্পর্কের মধ্যে কোনো বেশভূষা পোষাক আসাব থাকে না। —শুনেছি বরুণ বিচারক হলেও, স্কলার। আমি স্কলারদের ভালবাসি। —তবে তুমি আমার দলে নয়—রীনার দলের জন্যে এসেছ—রীনার দলেই যাও। ভাবতে ভাবতে কল্যাণ ভাবে, মীনাদি অসুখী কেন? কেন ওদের বনিবনা হয় না। বরুণদার সঙ্গে আলাপের সময় কল্যাণ বলেছিল—আমার মুখ খুলতে ভয় হয়—আমি যে সুপারফুলাস তা ধরা পড়ে যাবে। বরুণদা বলেছিল—যে সুপারফুলাস—সে কিন্তু তা জানে না। পল্লবগ্রাহীরা আত্মসচেতন নয়। নিজেকে বিদ্রূপ করা অনেক বড় মাপের মনের পরিচয়। —শুনলাম বই আপনার নেশা।—ওটা ভারসাম্য রক্ষা করবার একটা চেষ্টা। সমাজের অসৎ ব্যক্তিদের নিয়ে সারাদিন কাটে—তাদের সম্পর্কে চিন্তা করে মত দিতে হয়—মন বড্ড নেমে যায়। তখন বইয়ের মধ্যে মহৎ মনের সন্ধান করে একটু হাঁফ ছেড়ে বাচি। একটু সুস্থ হই—একটু স্বাভাবিক। সেদিন বরুণদাকে ঐ পরিবারের মধ্যে সবথেকে আলাদা—একটা বিচ্ছিন্ন মানুষ মনে হয়েছিল। পরেও অনেকবার মনে হয়েছিল—বরুণদা, কেন শ্বশুড়বাড়ি আসেন—কেন এত অপমান সহ্য করেন। কেন এক কোণে

বই নিয়ে বসে থাকেন একা একা। বরুণদার ওপর এই ঈর্ষা কেন? মেয়ের ওপর অপরের অধিকারের জন্যে ঈর্ষা। যে ঈর্ষা সাধারণত মা'র বৌয়ের ওপর থাকে। এখানে তা উল্টো—তবে ব্যাপারটি তাই। .....না, রীনার বাবার যা স্বাস্থ্য—আর শরীর সম্পর্কে এত সচেতন। ওর কিছু হবার নয়। রিটায়ারের পর হয়েছে কল্যাণের আরেক ঝামেলা। রোজ রোববারের সকালে গাড়ি করে হাজির হন। উঠতে চান না। রীনাকে বসিয়ে ভিতরে গিয়ে স্মোক করে আসে। রীনা বুঝতে পেরে বিব্রত ও অপ্রস্তুত হয়। কিন্তু তিনি জানেন, জামাই স্মোক করে। মাঝে মধ্যে ইনটারভেল হবেই। প্রায় একটায় মেয়ের তাড়া খেয়ে বাড়ি যান। কবে যে চোখে ছানি পড়বে—গাড়ি চালাতে পারবে না। এতক্ষণ রমার কথা না ভেবে যেন একটু আরাম বোধ করল। রমার কথা মনে হতেই—ওকে যে এতক্ষন ভুলতে পেরেছিল—তার জন্যে ওর আনন্দ হল। রমাকে একটু ভুলতে পারবার মধ্যে যেন একটু আত্মবিশ্বাস ফিরে পায়। রমাও ওর নেশা —এখন প্রায় অবসেসনে দাঁড়িয়েছে। রমার মধ্যে আজ একটা আশ্রম কন্যার রূপ। রমার আজ আত্মসমর্পন—একি বাবার অভাবে দিশেহারা মনের একটা আশ্রয় পাবার ইচ্ছে না, না, একী ভাবছি আমি। আগের দিন ওর আত্মসমর্পণ—আজ শোকেও তারই স্বীকৃতি। সেদিন ছিল প্রেমের প্রকাশ—আজ প্রেমের নির্ভরতা। একটা ভরসার তৃপ্তিতে কল্যাণ রমাকে পরিপূর্ণভাবে আপন ভাবে। ও'কে খুশি করতে সব কিছু করতে হবে। আমার রমা। কল্যাণ যখন বাড়ি পৌছাল—তখন ভুলে গেল ওর পারচেজে বদলি হবার সুখবর। মোটর কেনবার আয়োজন সম্পূর্ণ। শনিবারের মধ্যেই ফোন দিয়ে যাবে।

হরতালের পরদিন রীনা যখন স্কুলে পৌছাল—তখন ওর মুখ শুকনো, তীক্ষ্ণ—চোখ দুটো কেমন জ্বলজ্বল করছে। বিমলেন্দুর পাশে বসে জিজ্ঞেস করল—ভাই কেমন আছে? —জ্বরটা কমে এসেছে—তবে রেমিসন হয়নি। —আজ একটা স্পষ্ট চাহনি বিমলেন্দুর দিকে। বিমলেন্দু বুঝল, রীনার অন্তরে আগুন জ্বলছে। চুপ করে রইল। সবাই সরকার পড়ে যাওয়া, হরতাল নিয়ে আলোচনা চলছে। এরই মধ্যে রীনা খুব আস্তে প্রায় ফিসফিস করে বলল—কথা আছে। কখন বলব তার ব্যবস্থা করবে। —আপনার....? রীনা প্রায় ধমকে বলল—আপনি নয়, তুমি। বিমলেন্দু উজ্জ্বল মুখে ঘাড় নেড়ে সায় দিল। তারপর ক্লাসে যেতে যেতে বিমলেন্দু বলল—ছুটির পর সিগারেটের দোকানের সামনে দাঁড়াব। সেইখানে? —তুমি বলতে কি কষ্ট হচ্ছে—বয়েস তো হয়েছে আটত্রিশ। বিমলেন্দু বলল—না, ঐখানে তোমার সঙ্গে কথা হবে। যেতে যেতে।

আজ বিমলেন্দুর তাকান দেখে—আজ ভ্রূক্ষেপহীন রীনার চাহনি দেখে শিক্ষিকাদের কারো বুঝতেই অসুবিধে হল না—ওদের সম্পর্ক আজ কোথায় দাঁড়িয়েছে। রীনা কারো কথায় প্রায় যোগ দিল না। কিছুমাত্র মনোযোগ কোনোদিকে দিল না। লেজার পরিয়েডে একটা ক্লাস পড়ল—নিতে অস্বীকার করল। আজ পারব না। বিমলেন্দুর অফ ছিল—বিমলেন্দু যেতে চাইলে—না, তুমি যাবে না। তোমার জন্যই তো যাচ্ছি না। আচ্ছা, আমিই যাচ্ছি। ব্যাপারটা এত দৃষ্টিকটু হল—সবাই অবাক হয়ে গেল। বিমলেন্দু লজ্জায়

পড়ে গেল। একজন শিক্ষিকা জিজ্ঞেস করল—কি হয়েছে রীনার? একটা কিছু হয়েছে মনে হচ্ছে? বিমলেন্দু বলল—আমি কি করে বলব? তবে মনে হয় ঐ চিঠিটা পেয়েছে। ঐ থ্রেট লেটার। স্বামী-স্ত্রী দু'জনের চাকরি করা চলবে না। একজনকে ছেড়ে দিতে হবে—নইলে যে বেশি মাইনে পায় তাকেই গণ আদালত শাস্তি দেবে।

—ও মা, তাই নাকি? কই আমরা তো পাইনি।

—অনেকেই পেয়েছে। অবশ্য সত্য নাও হতে পারে—আমার অনুমান।

কিছুক্ষন পরে ক্লাস ছেড়ে দিয়ে রীনা এসে বসল।

বিমলেন্দু বলল—ঐ চিঠিটা বোধ হয় গেছে, না, যেখানে স্বামী—স্ত্রী দু'জনের চাকুরি নিয়ে থ্রেট....। রীনা ইঙ্গিতটা গ্রহণ করল। কিন্তু কিছুমাত্র গুরুত্ব না দিয়ে বলল—পেয়েছি।

বিমলেন্দু বিপন্নবোধ করল। রীনা কারো সঙ্গে কথা না বলে এক কোণের একটা চেয়ারে গিয়ে একা বসে থাকল। সবাই মুখ চাওয়াচাই করতে লাগল।

ছুটির পর সবাইকে যে রীনা এড়াতে চাচ্ছে তা বুঝতে পেরে কেউ ওকে ডেকে নিল না। রীনা ঘন্টা পড়বার পর একা একা বের হল। ক্লাস আগেই বিমলেন্দুর শেষ হয়ে গিয়েছিল—শেষ পিরিয়ডে বিমলেন্দুর প্রায়ই ক্লাস থাকে না—ঘন্টা পড়বার কিছু আগে বিমলেন্দু বের হয়ে গেল।

বিমলেন্দুর কাছে রীনা আসতেই বিমলেন্দু চলতে আরম্ভ করল। রীনা বলল—এই দুদিন আমি তোমাকে ছাড়া কিছুই ভাবতে পারিনি—আমার যে কী কষ্ট —কেন তুমি আমার এ দশা করলে। আমি যে তোমাকে ছাড়া বাঁচব না। রীনা প্রকাশ্য রাস্তায় কেঁদে ফেলল। ভাগ্যে লোকজন কম—পরিচিত কেউ নেই।

বিমলেন্দু বলল—আমারও কিছু কম কষ্ট নয়। হরতালের মধ্যেও হেটে যাওয়া যায়—এমন জায়গায় তো আমার অধিকাংশ টিউশনি। প্রতি মুহূর্তে তোমাকে ঠেলে সরিয়ে আমাকে পড়াতে হয়েছে। তোমাকে মন থেকে ঠেলে ফেলে দেবার শক্তি আমার নেই। জীবনে এমন দুর্লভ আমার ভাগ্যে ঘটবে—কল্পনাও করিনি। তোমার ভালবাসা পাবার যোগ্যতা আমার কি আছে? —ভালবাসা তো তুমি পেয়েছ—আমার দেহের প্রতি রক্তকণা তোমায় ভালবাসে—চায়। যোগ্যতা না থাকলে আমি ভালবাসতাম কি করে। তুমি এমন করে আমার মধ্যে এমন পিপাসা জাগিয়েছ—এটাই তোমার যোগ্যতা। কবে আমার বাড়ি আসবে? দু'জনে ছুটি নেব।

—দু'দিন হরতাল গেল—এখন দু'জনে একসঙ্গে ছুটি নিলে খারাপ দেখাবে।

—দেখাক। কেউ তো আমার মত কষ্ট পাচ্ছে না তোমার জন্য। শুক্রবার আসবে—দুপুরে খাবে।

—মানে আগামীকাল।

—হ্যাঁ। সাড়ে দশটায় ব্যাংকের সামনে দাঁড়াবে। আমি এসে নিয়ে যাব।

—কোথায় যাব আমরা।

—আমার বাড়িতে।

—কর্তা থাকবেন না?

—না। কর্তা কথাটা বলো না—শুনতে খারাপ লাগে। আচ্ছা চলি।

শুক্রবার দুপুরে রীনার সঙ্গে বিমলেন্দু মিলন শেষ পর্যন্ত দৈহিক মিলনে শেষ হল। বিমলেন্দু সিগারেট খাচ্ছিল ঘন ঘন।

বিমলেন্দু চারটের সময় চলে গেল। টিউশনি আছে। চলে যেতেই সিগারেটের টুকরো গুলো ফেলে দিয়ে, ঘরে রুম ফ্রেসনার দিয়ে হাওয়া পরিষ্কার করে। ওর থালাবাটি নিজে মেজে বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ল। প্রায় ন'টায় কল্যাণ এল। জানাল—আগামীকাল থাকতে হবে। টেলিফোন লাইন দিয়ে যাবে।

—আমি থাকব খন।

—ঘুমিয়ে পড়েছিলে? খুব ক্লান্ত। আর ভীড় ঠেলে যেতে হবে না। মোটর ক'দিনের মধ্যে আসবে। আমি পৌঁছে দেব। নিয়েও আসব। প্রয়োজন হলে ড্রাইভার রাখব।

—না, আমি মোটরে স্কুলে যাব না। স্কুল মাষ্টারনীর মোটর শোভা পায় না। আজ হঠাৎ ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। আমি ভীড় ঠেলেই যাব। না পারি, ছেড়ে দেব। মোটরে নয়।

কল্যাণ রমার চিন্তা করা সত্ত্বেও—অন্যমনস্ক থাকা সত্ত্বেও—রীনার মধ্যে পরিচিত রীনাকে না দেখে একটু অবাক হল। কিন্তু অবাক হবার কারণ খুঁজল না। মনে মনে স্বস্তি লাভ করল। রমা যদি রাজি থাকে—ওকে তুলে নিয়ে যাব—তারপর ছুটি হলে সন্ধ্যার পর কোনো একসময় পৌঁছে দেব। রাজি হবে কিনা সেই চিন্তায় রীনার কথা কল্যাণ ভুলে গেল।

পরদিন রীনার ভয়ংকর আতংকে শরীর হিম হয়ে গেল। ওর সেফ পিরিয়ড তো দুদিন হল শেষ হয়ে গেছে। গতকালই যদি গর্ভ হয়ে যায়। সমস্তদিন আতঙ্কে কেটে যায়। ফোন দিয়ে গেল। বিকেলে বাবাকে ফোন করে ও কল্যাণকে ফোন করে নম্বর জানিয়ে দিল।

কল্যাণ রাতে এলে পর কুণ্ঠিত রীনা বলল—ফোন হল, গাড়ি হচ্ছে আর কিছুর বোধ হয় বাকি থাকল না।

—কিংশুকদার স্ত্রী বলছিলেন—একটা বাচ্চা না হলে সংসার পূর্ণ হয় না।

—তুমি কি বললে?

—বললাম, রীনাকে আপনার কথা জানাব।

—কই, জানাওনি তো?

—চাও?

কল্যাণের একান্ত ইচ্ছে রীনাকে ব্যস্ত রাখা। নিজের গর্ভ নিয়ে, সন্তান নিয়ে রীনা ব্যস্ত থাক। সন্তান হবার আনন্দ—উৎকণ্ঠায় ও সন্তানের জননী হবার আনন্দে রীনার মনোযোগ নিঃশেষিত হোক। রীনার কাছে কল্যাণ গৌণ হয়ে থাকতে চায়।

—তোমার ইচ্ছে।

—আজ ফোন এল। দিনটা শনিবার হলেও শুভদিন। মাথা নিচু করে রীনা হাসল।

পরের মাসিক রীনার আর হল না।

রমার ভেতরের এক পরিবর্তন ওকে কেমন অস্থির করে তুলল। বাবার মৃত্যু, শ্মশান, বাবার দেহ নিঃশেষ হবার মধ্যে কোনো শ্মশান বৈরাগ্য নয়—একটি আধঘোমটা দেয়া জীবন পিপাসা যেন ওর মধ্যে জেগে উঠতে চাইল। এইতো ক'টা দিনের জীবন। হয়তো অনশনের চাপে, শোকের নীরব চাপের মধ্যে—হয়তো প্রতিক্রিয়ায় ওর মধ্যে একটা তীব্র দেহ-পিপাসা জেগে উঠল। প্রথমটা সচেতন ছিল। নিজের দেহ যেন কল্যাণকে অবলম্বন করে তীব্র কামনা ওর অন্তরে কেমন একটা অস্থিরতা ও চঞ্চলতা এনে দিল। কল্যাণ ওকে বিয়ে করবে কিনা এ ভাবনায় জোর পেল না—এ নিয়ে ভাবতে চাইল না। তাছাড়া প্রেম-বিয়ের যে পরিণাম বাবা-মা'র মধ্যে দেখেছে—তাতে শুধু প্রেমকে অবলম্বন করে বিয়ে করতে এতে ওর বরাবরই বিতৃষ্ণা ছিল। কতদিন কল্যাণের মোহ থাকবে—এ নিয়ে ওর সন্দেহ কম ছিল না। কিন্তু আজ যেন পরিণামের কথা চিন্তা করতে মন চাইল না। একটা অবুঝ কাণ্ডজ্ঞানহীন ভবিষ্যৎহীন দেহের পিপাসা ওকে আচ্ছন্ন করতে চাচ্ছে। শ্মশান থেকে ফেরবার পরদিন থেকেই নিজের ভেতরে এই আ'কাঙ্ক্ষার উঁকি ঝুকি দেখে যেমন বিব্রত, লজ্জিত ও কুণ্ঠিত হচ্ছিল, বাবার শোকের সময়—অশৌচের সময় এমন ভাবনা যে একটা অপরাধ এই বোধও সক্রিয় ছিল। তাই কল্যাণ এলে ওমন আত্মনিবেদনের সুরে কথা বলল। কল্যাণ যখন ওকে পবিত্র—তপস্যারতা ইত্যাদি বলে গেল—তখন কথাগুলো সূচের মত ওকে বিঁধতে থাকল। আত্মগ্লানি ও দেহের এই হঠাৎ জেগে ওঠা পিপাসাকে এড়াবার জন্যে শ্রাদ্ধের কাজের জন্য উঠে পড়ে লাগল। বিকাশ নিজেই সব ভার নিয়েছে। কত জনকে বলবে—দ্বাদশ ব্রাহ্মণ কে কে—কি কি আইটেম হবে—যারা শ্মশানে গিয়েছিল—তাদের তো বলতেই হবে। ওদিকে অফিস থেকে কাকে কাকে বলবে। ক্ষেপে ক্ষেপে অনেকেই দেখা করে গেছে—এখনও আসছে। বিকাশকে নিয়ে নেমন্তন্ন করতে বের হবে। চিঠি ছাপাতে দিয়ে দিয়েছে। ওদিকে রয়টারের প্রদ্যোত মিত্রের মৃত্যুর কাহিনী প্রায় ইংরাজি বাংলা সব পত্রিকায় বের হয়েছে। কল্যাণের কীর্তি। ওর লেখাটা শ্রাদ্ধের দিন প্রকাশিত হবে। কল্যাণকে বলে গেছে—ক'টা করে পত্রিকা জোগাড় করে রাখতে। এদিকে একটু অবকাশ পেলেই এক দেহ-কামনা একটা ইন্দ্রিয় পিপাসা কেমন ব্যাকুল হয়ে উঠতে চায়। বাবার মৃত্যু ও শ্মশান ওকে একি পরিবর্তন করে দিল। জীবন শেষ হয়ে যাচ্ছে—বেলা গড়িয়ে গেল—রমা জীবনের স্বাদ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। এই পিপাসার মধ্যে যখনই নিজের সংসারের অশান্তি, নিরানন্দ ঝগড়া, তুই-তোকারি মনে হয়—তাতে কষ্ট পায়, ভয় পায়, কিন্তু যুক্তিহীন, অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিতে অক্ষম, একটি পিপাসা ওকে কাতর করে তোলে। শ্রাদ্ধের পর অফিসে যোগ দিয়ে বিকেলে রমা কল্যাণকে নিয়ে কী করবে ভেবে একই সঙ্গে শঙ্কা ও আনন্দ বোধ করে। নিজের ওপর বিশ্বাস চলে যাচ্ছে—অথচ কল্যাণকে অধিকার করবার, পূর্ণ আয়ত্তে আনবার একটা ক্ষমতা বোধ করে গোপন আনন্দ বোধ করছে। নিজের ওপর অধিকার চলে যাচ্ছে দেখে ভয় ও

আনন্দ দুইকে পাশ কাটাতে চেয়েও পারছে না। তবু নিজের কাছে নিজেকে আড়াল করতে চাচ্ছে। কাজের মধ্যে মনোযোগ দিয়ে যতটা পারা যায় নিজেকে এড়িয়ে চলবার চেষ্টা করছে।

· পাড়া থেকে ফল, আতপ চাল, ঘি অনেকে দিয়ে গেছে। কারণ সবাই জানে, ওদের কেউ নেই। অফিস থেকেও অনেকে ফল দিয়ে গেছে।

রয়টারের দেয়া ছবি ও সংবাদ পড়ে পাড়ার লোকের খুব গর্ব হয়েছে। অনেকেই দেখা করে গেছে। অনেকেই সাহায্য করতে চেয়েছে।

যেদিন শনিবার, একাদশী বা মঙ্গলবার থাকে সেদিন খাওয়া থাকে না। মুস্কিল হচ্ছে মা ফল ছুঁয়েও দেখে না। শুধু একটু সরবতও খেতে চায় না—সাবুতো দূরে থাক। জল খেয়ে থাকে। সেদিন শনিবার ছিল—জোর করে প্লেটে ক'টা ফল কেটে মাকে খেতে ডাকল। মা এসে বললেন—ও ফল আমি ছুঁতে পারব না।—ঠিক আছে পাড়ার লোকের ফল নাই খেলে—আমি অফিস থেকে যে ফল দিয়েছে—তাই কেটে তোমাকে দিয়েছি। কাজ সামনে—তোমাকে তো ঠিক থাকতে হবে—আগে অনেক উপোষ করেছ—তখন বয়েস অল্প ছিল—কিন্তু এখন তো আর আগের মত শরীর নেই। না খেলে শরীর খারাপ হবে—আর আমিই বা খাই কি করে? —দ্যাখ, তোর বাবাকে তুই ফল এনে দিয়েছিস—তোর বাবা খুশি হয়ে খেয়েছে। আমি কখনও খেয়েছি? ফল আমি খেতে পারব না। অবন একটা ফলও খেতে পায়নি। আমের সময় একটা আম ওকে দিতে পারিনি। সারা জীবনে অবন চারটেও আম খেতে পায়নি। ওর অসুখের সময় একটু ফলের রসও ওর মুখে দিতে পারিনি। কতদিন পেয়ারা খেতে চেয়েছে, আঙুর কেমন খেতে, খেজুর কিনতে পয়সা চেয়েছে—কেমন খেতে জিজ্ঞেস করত বার বার। কাঁঠাল কখনও জীবনে খেল না। যাই খেতে চেয়েছে—কেবল ধমক দিয়েছি—তুই বড়—সংসারের অভাব বুঝিসনা। তোর ছোট বোনটা যা বোঝে—তুই বুঝিসনা—জোর নেই শরীরে—ভাত জোটে না—কাঁঠাল, কেবল চাই, চাই। আজ সবার দরদ উথলে উঠেছে—কেউ কখনও ওকে ডেকে কিছু খাওয়ায় নি। আম, জাম-কাঁঠাল সব থেকে বঞ্চিত হয়েছে। শুধু খেয়েছে পেটভরে ধমক, আর তোর বাবার মার—এক বছর বয়েস থেকে। ছেলের মুখে একটা ফল তুলে দিতে পারিনি—আর ফল খাব আমি?

মা আজ ছেলের অভাব সবচেয়ে বেশি অনুভব করছেন। বাবার শোকের মধ্য দিয়ে অবনের জন্যে কেঁদে চলেছেন। বাবার শোকের আড়ালে অবনকে দেখতে পাচ্ছেন। সেদিন বলেছিলেন—ভাগ্য বটে, ছেলের হাতের আগুনও পেল না। বাবার জন্যে অবন গৌণ হয়ে গেল—এ মা সহ্য করতে পারছেন না। বাবাই বড় হল—আর ঐ তাজা ছেলেটা আজ কেউ না। বোন পর্যন্ত ফল খেতে পারে—বাবা খেতে পারে। এই মানুষের ধম্ম। রমার মনে হয়েছে, মা অতীতের বাধনে আষ্টেপিষ্টে বাধা। বর্তমানকে তার আর প্রয়োজন নেই—জীবন আগেই শেষ হয়েছে—এখন রাধুনি বা ঝি'র কাজ করে দু'মুঠো খাওয়া। এই হচ্ছে মা'র জীবনের ওপর অভিমান।

রয়টারের সংবাদ দেখে ও পড়ে মা অনেকক্ষন চুপ করে রইলেন। শেষে বললেন—

দ্যাখ রমা, আমি যদি একটু সংযমী হতাম—একটু ভয় ডর থাকত—আমি যদি তোর বাবার সঙ্গে পালিয়ে না যেতাম—তবে তোর বাবা আর্ট স্কুলের পড়াও শেষ করতে পারত। নামও করতে পারত। বাড়ি থেকে টাকা আসাও বন্ধ হত না। সতেরো বছর বয়েস—বাড়ির বাইরের জগত কি জানি। মানুষের অভাব অভিযোগ হয়—তাই জানতাম না। কিছুই জানতাম না। এত আদরের ছিলাম। টাকা যে এত বড় জিনিস—কোনো ধারণাই ছিল না। আমারও দোষ আছে। এখানে যেমন নরকে বাস করলাম—মরলেও নরকেই যেতে হবে। তখন অবন আমাকে জিজ্ঞেস করবে—খেতে দিতে পার না—জন্ম দিয়েছ কেন। বলব, তুই বুকে আয়—যত খুশি আমাকে লাথি গুঁতো দে—ও গুলো আমার পাওনা আছে। তবু তুই বুকে আয়.....। মা একটু থেমে চোখের জল মুছে বললেন—অবন নরকে যাবে কেন? ও নিষ্পাপ। আমি একাই নরকে থাকব। ঐ মানুষটাও কম শাস্তি পায়নি। বড়লোকেরই তো ছেলে ছিল। নাম যশ কিছু পেল না। চাকরি করল অপমানের মধ্যে—অবনের মৃত্যুর সময় বার বার বলছিল—আমি বেঁচে রইলাম—ছেলে চলে গেল—একী অবিচার। অবনকে পুড়িয়ে এসে বারবার বলছিল, ছেলে বাপের মুখাগ্নি করে—আর আমি, ভগবান তোমার কি অপার করুণা আমার ওপর—আমি করলাম মুখাগ্নি ছেলের, ছেলের শ্রাদ্ধ আমাকে করতে হবে। উঃ দয়াময় ভগাবানের কী দয়া। সেই যে শয্যা নিলেন—আর দাঁড়াতে পারলেন না। অবন নিজে মরে আমাদের মেরে রেখে গেছে। মরবার সময়ও অবনের নাম করে বললেন—ও কে আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিচ্ছে—তোর নামটা মনে করতে পারল না। বাইরে বলত না—কিন্তু অবনের জন্যে ওর প্রাণটা যে কী কাঁদত—আমি মাঝে মধ্যে বুঝতাম। অবন চলে গেল—আর নিয়ে গেল ওর সব শক্তি, ক্ষমতা। আর আমার সব শান্তি। আবার চোখের জল মুছে, মা বললেন কিছুক্ষণ চুপ থেকে—দ্যাখ, গান ভালবাসতাম—গানের গলাও ছিল—বাড়িতে গ্রামোফোন ছিল—রেডিও ছিল—কটা লোকের বাড়ি তখন রেডিও ছিল—কল্পতরুর আসর শুনতাম। আমি যত অলক্ষুনে গান করতাম। মা ধমক দিতেন। হেসে উড়িয়ে দিতাম। একটা গান করতাম শূন্য এ বুকে পাখি মোর আয়—উড়ে আয়। সেই বুক আমার শূন্য হল। যারা এমন অলক্ষুনে গান লেখে—মুখে আগুন—যারা গায়—তাদের মুখে আগুন। এসব গাইতাম—ভগবান তখনই বুঝিয়ে দিয়েছিলেন এ সব তোমার জীবনে ঘটবে। দুঃখে তোমার জীবন গড়া—তোমার বুক শূন্য হবে। তুমি নিজের ভবিষ্যৎ গাইছো। আমারও দোষ আছেরে রমা—আমি দোষী। যদি একটু কঠিন হতাম—একটু সংযমী হতাম। ব্রাহ্মণের মেয়ে হয়ে তেরো দিনের শ্রাদ্ধ!

ফল প্লেটে শুকিয়ে যায়। রমার চোখ দিয়ে নীরবে জল পড়তে থাকে। অনেকক্ষণ পর মা উঠে যাবার সময় বললেন—তোরও অদৃষ্ট। রমা ভাবে, ওর বাবার জন্যে দাদাকে ভুলে না যাবার আকুতি, ঈর্ষা ও নিবেদন রয়েছে মা'র কথার মধ্যে। অবনের শোক যে তার একার—এও তিনি ফল না খেয়ে বুঝিয়ে দিয়েছেন। ওর বাবার ব্যর্থতার তুলনায় অবনের স্বাদ আহ্লাদহীন অসমাপ্ত জীবন যে কম দুঃখের নয়—তাও আজ মা'র মনে

পড়ছে। বাবার মৃত্যুর পর লোকজন ফল মিষ্টি সব মিলে যে আড়ম্বর সব দেখতে পাচ্ছেন তার জন্য মা'র হয়তো ঈর্ষা হলেও হতে পারে—আসলে এই শোকের প্রচার ও শ্রাদ্ধের আড়ম্ভরের মধ্যে অবন যে হারিয়ে যেতে বসেছে—কেউ একবার অবনের নামও করে না—অবনকে ভুলে যাবার একটা তিরস্কার যেন রমা অনুভব করে। আবার রাত করে রোজ রোজ কল্যাণ আসে—এও মা সুচক্ষে দেখছেন না। সেই জন্যই কি নিজের অসংযম ও শক্ত হতে না পারার মধ্যে যে তাদের ব্যর্থ জীবন লুকিয়ে ছিল—মা তাও জানিয়ে গেল। রমা কেমন অসন্তুষ্ট বোধ করে। দাদার জন্য ওরও কম কষ্ট হয় না। দাদা চলে যাবার পর ওর শূন্যতার কেউ অংশীদার হয়নি। সবাই বাবা-মাকে সান্ত্বনা দিয়েছে। ওর ব্যথা ও শূন্যতাকে কেউ কোনোদিন বোঝেনি। ওর অশ্রুজলের মূল্য ওর সংসার কোনোদিন দেয়নি। ওর কত সময় মার চোখের চাহনি দেখে মনে হয়েছে, ওর বদলে অবন যদি বেঁচে থাকত—তবে মা'র এত কষ্ট হত না। রাগ করে রমা অনেক সময় ভেবেছে—অমন সোনার ছেলের বদলে অমন শাকচুন্নি বেঁচে রইল। মা'র এই সংযমী ও শক্ত হবার ইঙ্গিত কেন? এতকাল তো নিজেকে উপবাসী রেখেছে। কি পেয়েছে তাতে? চিরকালই কি মা'র ভয়ে নিজেকে—নিজের অন্তরকে শুকিয়ে রাখতে হবে। মা-ই বলুক—ঝগড়া ও করবে না—তা বলে নিজের অনুভূতিকে মা'র মুখের দিকে তাকিয়ে অনশনে রাখবে না। ব্যর্থ দাম্পত্য জীবনের অভিজ্ঞতার কাছে নিজের ভবিষ্যৎ বন্ধক দেবে না। ঘর হয়তো বাঁধতে পারবে না। কিন্তু ঘর না বাঁধলেও ভালবাসার অমৃত থেকে নিজেকে কেন বঞ্চিত করবে।

সাতদিনের দিন বেলা তিনটের সময় ভটচাজদা এলেন। এই ভটচাজদার বয়েস—মা'র বয়সী হবে। ওকে রমা বলেই ডাকে। 'তুমি' করে বলে। ভদ্রলোক পারচেজে আছেন। সাধারণ ম্যাট্রিক পাশ—এখন সেকসন অফিসার। ঢুকেছিলেন কেরানি হয়ে। অনেক সময় দরখাস্ত, ড্রাফট, রিপ্রেসেনটেসন এসব রমাকে দিয়ে লিখিয়ে নিত। আসলে ওর এক বোনের শ্বশুর বাড়ি এই পাড়ায়। তাদের কাছে এদের কথা অনেক শুনেছে। বোনের কাছে শুনেছে। বোনকে পরিচয় দিতে নিষেধ করেছে। বলেছে, বুঝলি না, জানা থাকলেই নানা সুবিধা আদায় করতে চাইবে। বোন উচ্যবাচ্য করেনি। তাছাড়া বোনও এই শিক্ষিত মেয়েটিকে শ্রদ্ধা ও ঈর্ষা করত। ওদের পরিবারের ঝগড়ার কথা এ পাড়ায় সুবিদিত। কিন্তু ভটচাজদার রমার ওপর সহানুভূতি ছিল। এতটা শিক্ষিত মেয়ে একটা রিসেপসনে থাকবে। তাছাড়া তিনি কল্যাণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার কথাও জানতেন। ভাবলেন কল্যাণ মেয়েটিকে খেলাচ্ছে। কল্যাণের হাত থেকে মেয়েটিকে বাঁচান দরকার। বিষয়টা ভেবেও রেখেছেন। মৃত্যু সংবাদ অফিসে আসবার পরদিনই তিনি একবার দেখা করে গেছেন। আজ আবার এলেন।

—কইরে রমা। হ্যাঁ এইখানেই বসি। ধুতি জামাপরা যেখানে খুশি বসতে পারি। রমা এসে পাশে বসল।

—সব জোগাড়যন্ত্র হয়ে গেছে তো—না হলে বল, কি সাহায্য করতে পারি।

—আপনাদের কৃপায় সবই ঠিক হয়ে গেছে—নেমতন্নও প্রায় সেরে এনেছি—

আপনাকে ফোনে নেমতন্ন করেছি বলে কিচ্ছু মনে করতে পারবেন না।

—তুই একা। ফোনে না করলেও আজও যদি মুখে বলে দিতিস—তাও আসতাম। আমি তো আবার দ্বাদশ ব্রাহ্মণের একজন। সেদিন বলেছিলাম, আবার আসব।

একথা সে কথার পর ভটচাজদা বললেন—আজ একটু অবসর আছে তো? তা হলে একটা কথা তোকে বলব বলেই এসেছি। তুমি ইংরেজিতে অনার্স। অফিসার গ্রেডে তোর চাকরি হওয়া উচিত। আমি ইউনিয়নে এ নিয়ে হৈ চৈ করতে পারতাম—কিন্তু তাতে তোর ক্ষতি হত। শোন, যে কোম্পানির কথা বলছি—তা একটা তেলের কোম্পানি, আমেরিকান—ওদের হেড অফিসে অফিসার রিক্রুট হবে—একটা রিটন—আর একটা ভাইবা। ওরা মেয়ে ছেলেই পছন্দ করেছে এই পোষ্টগুলোর জন্যে। ওদের ধারণা ভারতীয় পুরুষদের চেয়ে কাজের ব্যাপারে মেয়েরা বেশি সিনসিয়ার। তুই রিটিনে বস্। দরখাস্ত একটা করতে হবে—দুটো টেষ্টিমনিয়েল—সব আমি জোগাড় করে ফরোয়ার্ড করে পাঠিয়ে দেব। তারপর ভাইবাতে তুই বলবি—একমাসের মধ্যে জয়েন করতে পারব। বোম্বেতে হয়তো থাকতে পারবি না—কাছাকাছি শহরগুলিতে কোয়ার্টার্স পাবি। আধঘন্টার পথও নয়। এখানকার চেয়ে কম সময় লাগবে পৌঁছতে। প্রচুর মাইনে।

—আগে তো রিটিন টেষ্টে কোয়লিফাই করি।

—তোর বাইরে যেতে আপত্তি নেই তো?

—কিছু না। মনের মত চাকরি পেলে আফ্রিকাতেও যেতে রাজি। মা ছাড়া আমার কে আছে কলকাতায়। আর মা তো আমার সঙ্গেই যাবে। তবে কতদিনে পার্মানেন্ট হব!

—শোন—একবার ঢুকলে কারো কখনও চাকরি যায় না। কাজ দেখাতে পারলে ওরা ভাল ইনক্রিমেন্ট দেয়। বৃটিশ কোম্পানির চাইতে অনেক লিবারল।

—যেতে আমারও আপত্তি নেই।

—দরখাস্ত, টেস্টিমনিয়াল থেকে ফরোয়ার্ড পর্যন্ত আমার দায়িত্ব। তুই শুধু পরীক্ষা দিবি। ব্যস, আর ভাইবাতে তোকে কে আটকায়। আমাদের ডিবেরক্টার পর্যন্ত তোর ইংরেজি ও ব্যক্তিত্বের প্রশংসা করে। ওরা ফরোয়ার্ড করে দেবে।

—আপনি আমার জন্যে এত ভেবেছেন।

—শোন, তুই যোগ্যতার মূল্য পাবিনে—তাই বসে আমাকে দেখতে হবে। এটা যদি না হয়—আমি জানি নিশ্চিত হবে—আরও কোম্পানি আছে, ফার্ম আছে।

—আপনি একা এ কথা বুঝেছেন। বিদ্যাবুদ্ধি শিকেয় তুলে হাসি বেচে খাওয়া, টেলিফোন তোলা আর রাখা—আর মেসেজ রিসিভ করা—তা নোট করা। এত খারাপ লাগে।

—জানি বোন, জানি। তবে একটা কথা আমাকে দিতে হবে। এই যে দরখাস্ত করছিস—তা কেউ টের পাবে না। শুধু ফরোয়াডিং অথরিটি জানবে—যারা দু'জন সার্টিফিকেট দেবে—তারাও জানবে না কোথাও। শুধু আমি আর ডিরেক্টার। সে

দেখবেও না কোথায় দরখাস্ত করছিস—তুই ভাল জায়গায় কাজ পেলে তিনি আপত্তি করবেন না। আমি নিজে গিয়ে ফরোয়ার্ড করিয়ে আনব। আগামীকাল আমি বিকেলে দরখাস্ত, টেস্টিমনিয়েল সব নিয়ে আসব—তুই সই করে দিবি। বলব, এখন অশৌচের জন্য অফিসে আসতে পারবে না।

—কে, কে প্রশংসাপত্র দেবে।

—একজন বাইরের কলকাতার হাইকোর্টের জজ। আরেকজন আমাদের একজন ডিরেক্টার। ম্যানেজিং ডিরেক্টার ফরোয়ার্ড করবে। আমি নিজে যাব।

—আচ্ছা। এখন আমার ভাগ্য। আপনার চেষ্টা সফল হোক বা না হোক—আমার জন্যে এত ভাবনা কেউ ভাবেনি। এত বড় হয়েছি।

—ও, কিছু নয়। কিন্তু কেউ যেন না জানে। বড্ড কমপিটিসন। তাছাড়া ঈর্ষা বলেও একটা জিনিস আছে। কেউ হয়তো চাইবে তুই এখান থেকে ভালো জায়গায় না যাস। এখানেই পড়ে থাক। কার কি ইচ্ছে বলব কি করে। টপ সিক্রেট। চাকরি পেয়ে তবে বলবি। তার আগে তুই মুখ খুলবি না। কথা দে।

—দিলাম।

—বসুন।

একটা প্লেটে ফল কেটে মিষ্টি নিয়ে এল।

রমা বলল—আমার মাথার ওপর কেউ নেই—ভেবেছিলাম, কিন্তু দেখলাম, ভগবান ভটচার্যদাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন। ভটচাজদা ফল খেতে খেতে বললেন—তোকে আমি ভালো জায়গায় ভালো পোষ্টে বসাবই।

—কতবার ভেবেছি, ইংরেজিতে এম এটা দিয়ে দি। হয়ে ওঠে না।

—আরে ইংরেজি অনার্স আর এম.এ আমাদের কোম্পানীগুলোতে কোনো ফারাক নেই।

ফল মিষ্টি খেয়ে হৃষ্ট মনে বিদায় নিলেন।

পরদিন ঘরদোর পরিষ্কার করতে করতে রমা মাকে জিজ্ঞেস করল—মা, বাবা এতবড় আর্টিষ্ট ছিলেন—বাড়িতে একখানাও বাবার কোনো বই নেই কেন—ফাইনাল ইয়ার পর্যন্ত তো। আর্টস্কুলে পড়েছিলেন?

—দু'বাক্স বই ছিল। অভাবের দিনে একে একে সব বই কলেজষ্ট্রীটে গিয়ে বিক্রি করে দিয়েছে—কত আর্টের মাসিক পত্রিকা বা ঐ রকম ম্যাগাজিনের মত ছিল—সেরদরে ওগুলো বিক্রি হয়েছে। তা দিয়ে চাল ডাল কেনা হয়েছে। আমি তো বাবার বাড়ি থেকে কিছু নিয়ে বের হইনি। বারাণসীতে বাঙালি টোলায় ওর এক আত্মীয়ের বাড়িতে বিয়ে হল। ওখানে বেশ ক'ঘর বাঙালি এসেছিল বিয়েতে—তারাও শাড়ি দিয়েছিল। বিয়ের বেনারসীও ওই কিনে দিয়েছিল। তারপর ওর বাবা-মা যাবার পর সম্পত্তি বিক্রি করে যা পেয়েছিল—তা থেকে আমাকে ক'গাছা চুরি ও হার দিয়েছিল—সে সবও গেছে। শেষ পর্যন্ত শুধু লোহা আর শাখা ছিল। হাতের আংটিও গেল। বের হবার মত কাপড় ছিল না। পাড়া থেকে শাড়ি ধার করে এনেছি—সন্ধ্যার পর বেরিয়ে।

ওর ছেঁড়া পাঞ্জাবী, ছেঁড়া ধুতি, ছেঁড়া চটি। দুর্গাপূজার অষ্টমীর দিন এখানে অনেক বাঙাল বাড়িতে সধবা বরণ হত—আমাকে তিন চার বাড়ি থেকে বরণ করত। জানত, ব্রাহ্মণের মেয়ে। তবে ওরা কায়স্থই ছিল। একটা থালায় নাড়ু মোয়া মিষ্টি ফল সাজিয়ে দিয়ে যেত। চারখানা শাড়ি পেতাম। তা থেকে পাড় কেটে তোর বাবাকে একখানা ধুতি করে দিতাম।

—আমার সে কথা মনে আছে।

—কয়লা ভাঙতে কি ভয় হত— যদি শাঁখা ভেঙে যায়। সধবার শাখা ভাঙা আমাদের দেশে তো ভাল দেখে না। অবনটা একটা সার্ট-প্যান্টের জন্য কি কান্নাকাটি করত। এখন তুই কত শাড়ি দিয়েছিস—চুড়ি করে দিয়েছিস। তোর বাবার তো কত ধুতি নূতনই পড়ে আছে। বের হত না। পরবার দরকারও হত না। ঐ তুই টিউশনি ধরলি—প্রথম পরীক্ষা থেকে। সেই যে সংসারের হাল ধরলি। আজ তুই মেয়ে হয়ে বাপের শ্রাদ্ধ করছিস এত বড় করে—অবনেরই তো করার কথা। ছেলে হয়ে কিছু পায়ওনি—ছেলের কাজ করবার আগেই তো চলে গেল। আজ বেঁচে থাকলে......ওরই তো সব করার কথা।

—আচ্ছা মা, তোমার আত্মীয়স্বজনের কথা তুমি বল—বাবার মুখে কখনও আত্মীয় স্বজনের কথা শুনিনি—কাউকে দেখিনি—কেউ একটা খোঁজও করেনি।

—আসলে সম্পত্তি নিয়ে ওরা তোর বাবাকে ঠকিয়ে ছিল। তোর বাবা কড়া কড়া চিঠি লিখে সম্পর্ক নষ্ট করেছে। দাদাবা ভাইরা প্রথম প্রথম এসেছে। এলেই তোর বাবা ঝগড়া শুরু করে দিত। আমাকে তো গ্রাহ্যও করত না। তারপর আর কেউ আসেনি। বড্ড রাগ ছিল শরীরে—সেই চেহারা তো দেখিসনি।

—বিকেলে ভটচাজদা এসে বললেন—সই কর। আর সব করে দিয়েছি। —একি- এযে স্কুল ফাইনাল থেকে বি.এ পর্যন্ত সব মার্কসিট এটেষ্ট করে এনেছেন।— এপয়েন্টমেন্ট সেকসন থেকে তোর মার্কসিটগুলো নিয়ে টাইপ করিয়ে, রাইটার্সে গিয়ে একজন এসিসটেন্ট সেক্রেটারীকে গিয়ে বললাম—ওরিজিনাল দেখাতে পারব না— এইগুলো এটেষ্ট করে দিন। হাইকোর্টের জজ শোনা মাত্র লিখে দিলেন—আর ডিরেক্টার তো তোকে চেনেই। আমি আগামীকাল ফার্ষ্ট আওয়ারে ফরোয়ার্ড করিয়ে নিজে গিয়ে ওদের অফিসে গিয়ে জমা দিয়ে রসিদ নিয়ে আসব। কেবল ভাইবার সময় ওরিজিনালগুলো নিয়ে যাবি। ওরা এসব নিয়ে মাথা ঘামায় না। ওরা তোর রিটিন পরীক্ষার ফল দেখবে—আর ইন্টারভিউ দেখবে।

—ইস, আপনি এত করছেন।

—কী করছি—আমি কত অফিসে ইউনিওন খুলেছি—কোন অফিসটায় আমার চেনা জানা নেই। কে আমার কথা ফেলবে। এ্যাসিসটেন্ট সেক্রেটারির সঙ্গে কথা বললাম—আগে ক্লার্কে, তখন থেকে পরিচয়—তারপর হল হেডক্লার্ক, বয়স ছিল, তাই হতে পারল এ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারী। ওদে জন্যে কম লড়েছি।

রমা সই করে দিল।

যাবার সময় বলল—কাকে পক্ষীতে যেন টের না পায়।

—নিশ্চিন্তে থাকুন। অফিসে আপনি ছাড়া আর কেউ জানবে না। আমি বলব না।

—ডিরেক্টারও বলবে না। ম্যানেজিং ডিরেক্টার তো সই করেই ভুলে যাবে। অফিসের কেউ জানবে না।

—আজ এপয়েন্টমেন্ট সেকসনের কেউ জিজ্ঞেস করেননি—কেন আমার মার্কসিট চাচ্ছেন।

—ওরা জানে, এসব করি আমি প্রমোশনের জন্যে। এমন কত দরখাস্ত, মার্ক আমি প্রায়ই চাই। কেউ কিছু জিজ্ঞেসা করেনি।

—এই অফিসে প্রমোশন হত না, না?

—নারে। এই অফিসে তোকে বড়জোর কেরানি করত। কিন্তু শীগগীরই ছাঁটাই হবে—আর হবে কেরানিদের থেকে— ভলানটারী রিটায়ারমেন্ট স্কিম চালু হবে—ভেতর থেকে খবর পাচ্ছি। অফিসারদের কিছু হবে না। তুই রিসেপসনিষ্ট যতদিন থাকবি—নিরাপদ—সেফ জোনে আছিস। আচ্ছা, শ্রাদ্ধের দিন আসব। তুই একা কি করে যে সামলাচ্ছিস। তোর রয়টারের সংবাদটা খুব চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছে। আর আমি ওটা সবাইকে দেখিয়েছি। আমাদের হাইকোর্টের বিচারপতি বললেন—নামটা শোনা শোনা। যাক্ চলি। আসব—দুপুরেই। তোরা তো দ্বাদশ ব্রাহ্মণের জন্যে দুপুরে—আর সবাই রাতে এই বন্দোবস্ত করছিস—কী দিয়ে যে কী করছিস—তুই-ই জানিস্। একা সত্যিই ভাবনা হয়। চলি—।

ভটচাজদা চলে গেলেন।

রমা পরিষ্কার বুঝতে পেরেছে। যেন কল্যাণকে না জানাই। কল্যাণকে এমনিতেও জানাত না। ওকি যেতে দেবে নাকি। আগে হোক—তখন বলা যাবে। রমার মন ব্যগ্র হয়ে থাকে—কখন সাড়ে সাতটা বাজবে। অন্তরের মধ্য থেকে বের হয়ে ট্যাক্সি থেকে নামবে। এমন দৃষ্টি—পিপাসা, এমন স্পর্শ পিপাসা—এমন পিপাসাকে বোধ করবার উদগ্র বাসনা—এমন তো এতদিন ছিল না—এমন ছিল না। অশৌচের মধ্যে রমার তপস্যারত চেহারার মধ্যে এমন দেহ-পিপাসা কোথায় লুকিয়ে ছিল। শ্মশানের আগুন ওর মধ্যে এমন করে জীবনের পিপাসা জাগিয়ে দিল কেন?

বিকেলে একা বসেছিল। মা মুখের দিকে তাকিয়ে বলল—তোর মুখটা বড় লাল হয়েছে রমা।

২

সে দিন রমার বাবার শ্রাদ্ধ। কল্যাণ অফিসে যায়নি। ওকে রমা দ্বাদশ ব্রাহ্মণের মধ্যে ধরেছে। চাটুজ্যে বামন তুমি—যত স্যুট কোট বুট পর।

রীনা স্কুলে চলে গেছে। কল্যাণ ধুতি পাঞ্জাবী পরে, সোনার বোতাম লাগিয়ে — যেমন করে জামাইষষ্ঠীর দিন—শ্বশুর বাড়ি যায়—আজ সেই পোষাকে রওনা হল—তখন এগারটা বেজে গেছে। যদুবাবুর বাজার থেকে ফুল কিনে—রমা লেখা অবিচুয়ারী যা ষ্টেটসমান ও অমৃতবাজারে বের হয়েছে—তা কয়েকটা কিনে —পূর্ণ হলের পাশে

মিষ্টির দোকানে ভাল মিষ্টি পাওয়া যায় বলে—দত্তবাবুর বাজার থেকে হেটে মিষ্টির দোকান থেকে মিষ্টি নিয়ে টাকা খুচরা ফেরত দেবার জন্যে হাত বাড়িয়েছে—অমনি হঠাৎ একটা আওয়াজ। চারদিকে লোক ছুটছে। গাড়ি বাস দাঁড়িয়ে গেছে। কল্যাণ দেখল, ট্রাফিক পুলিশটা পড়ে আছে—আর গলগল করে বুক দিয়ে রক্ত পড়ছে। সাদা ইউনিফর্মের একদিকটা রক্তে ভিজে যাচ্ছে। কেউ এগিয়ে দেখছে না। যে যে দিকে পারে পালাচ্ছে। পয়সা ব্যাগে পুরে কল্যাণ এগিয়ে এল—সঙ্গে বয়স্ক ক'জনও এগিয়ে এল—ক'টা দোকান থেকেও লোক বের হযে এল। পুলিশটির বয়েস ত্রিশ পয়ত্রিশ হবে। সোজা উপর থেকে পড়েছে বলে কপালটা কেটে গেছে। কান্নায় কল্যাণের কণ্ঠস্বর বন্ধ হয়ে আসতে চায়—এ একটা নিরস্ত্র পুলিশকে মেরে কার কি লাভ হল—জানি না। কোন বিপ্লব হল জানি না।

—ঠিক বলেছেন মশায়।

—আপনি বোধ হয় প্রফেসর? ওরা তো শিক্ষকদের খুন করবে শাসাচ্ছে।

—নিরস্ত্র ট্রাফিক পুলিশ, নিরীহ ক্ষীণজীবী শিক্ষক এরা হঠাৎ সমাজের শত্রু হয়ে উঠল।

—উন্মাদ। দেশে যে কী হচ্ছে।

ইতিমধ্যে পুলিশের গাড়ি এল। একজন সাবইনেসপেক্টার ও পুলিশ নেমে পড়তেই ভীড় ওদের পথ করে দিল।

কল্যাণের অভিজাত চেহারা ও নির্ভীক মুখ দাবোগা প্রথমেই বলল—কিছু দেখেছেন নাকি? কেউ কিছু দেখেছেন?

কল্যাণ বলল—ঐ দোকানে মিষ্টি কিনছিলাম, হঠাৎ গুলির আওয়াজ পেয়ে দেখলাম লোক দৌড়াচ্ছে।

এবার একজন এগিয়ে এল—আমি এক ছোকরাকে প্রাণপণে ঐ রাস্তা দিয়ে দৌড়াতে দেখেছি। ঐ ছোঁড়াই হবে। আপনারা চেজ করুন।

—আপনি আমাদের মিস ডাইরেক্ট করছেন না তো।

—অযথা সময় নষ্ট করছেন—ঐ আমার দোকান। আমি দশপুরুষ ভবানীপুরের বাসিন্দা—এ অঞ্চলে আমাকে চেনে না—মনে হচ্ছে আপনারা ক্রিমিন্যালকে ধরতে ইন্টারেষ্টট নন।

দারোগা দু'জন পুলিশকে পাঠিয়ে দিল।

কল্যাণ বলল—আমি যা বললাম—তা যদি কোনো কাজে লাগে—তবে আমার কার্ড দিচ্ছি—যোগাযোগ করতে পারেন।

দারোগা কার্ড নিয়ে পড়ে সম্ভ্রমভাবে বলল—আচ্ছা।

কল্যাণ আবার বলল—এবার নিরস্ত্র পুলিশদের রক্ষার ব্যবস্থা নিশ্চয়ই হবে।

দারোগা বিষণ্ণভাবে বলল—উপবের ব্যাপার। থানার এত কাছে। নিরস্ত্র সসস্ত্র কেউ তো আর সব সময় সতর্ক থাকতে পারে না। সঙ্গে সঙ্গে শেষ হয়ে গেছে। তিনি জোরে বাঁশি বাজালেন। দেহটা আস্তে আস্তে নীল হয়ে আসতে লাগল। ভীড় জমে গেল।

ট্রাফিক বন্ধ হয়ে গেল। সারি সারি ট্রাম দাঁড়িয়ে পড়ল। রক্তাক্ত বুক, কপালে ক্ষত আর নীল হয়ে যাওয়া মুখটা কল্যাণের বুকে ছাপ মেরে বসে গেল। মৃত্যুর এমন বিভৎস আকস্মিকতা ওর মনকে স্তব্ধ করে দিল। রমার বাড়িতে যাবার সব ইচ্ছে ওর চলে গেল। তবু আস্তে আস্তে হাজরার দিকে এগিয়ে যেতে থাকে—তারপর একটা ট্যাক্সি পেয়ে উঠে বসে। কেবল মনে হতে থাকে—এরা তো আমাদেরই নিম্ন মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে—পড়াশুনা বেশি করতে পারেনি—হয়তো বিয়ে করেছে, স্ত্রী সন্তান আছে, কার কি লাভ হবে, এ মৃত্যুতেই পুলিশ কি নিঃশেষ হবে? এমন খুচরো মৃত্যু? এতে কি পুলিশে যেতে লোকে ভয় পাবে? কী এমন আতংক হবে একটা পুলিশের মৃত্যুতে। কল্যাণের মনে হল—ওর বুকটা ভার হয়েছে। আগামীকাল পত্রিকায় পড়লে এ নিয়ে চিন্তাও করত না। নিজের চোখে দেখার মূল্য অনেক।

রীনা আর বিমলেন্দুর সম্পর্ক স্কুলে আর গোপন নেই। একটা মুখরোচক কুৎসা শিক্ষিকা মহল থেকে ছাত্রীদের মহলেও ছড়িয়ে পড়েছে। প্রধান শিক্ষিকা জানতেন—কিন্তু না জানার ভান করতেন। তার রাগ রীনার ওপর—তুই একটা ভাল ঘরের মেয়ে, একটা অফিসারের বৌ—তুই একটা অভাবী শিক্ষকের সর্বনাশ করছিস। কিছু করবার উপায় নেই। রীনা পার্মানেন্ট স্টাফ। নৈতিক কারণে কিছু করা সম্ভব নয়—প্রমান কই? দু'জন একসঙ্গে কথা বলছে—এ সাক্ষ্যের ওপর তো নির্ভর করে কিছু করা যায় না। তাছাড়া বিমলেন্দু ভাল টিচার—এম.এতে ভাল রেজাল্ট করেছে। ছাত্ররা অনেকেই ওর কাছে প্রাইভেটে পড়ে। রীনা ভাল পড়ায়। দেখতে সুন্দরী গান জানে। এম.এ: তে ফিফটি পার্সেন্টি নম্বর রয়েছে। ভাল বক্তৃতা দিতে পারে—গুছিয়ে কথা বলতে জানে। বড়লোকের মেয়ে—বড় লোকের বৌ। ওর সোর্স অনেক। স্কুল মেয়েদের দিয়ে নাটক করাল। বর্ষ বরণ, নবীন বরণ সব ফাঙসনগুলো ওই করায়—আর কল্পনা শক্তিও আছে। তোর কেমন এমন মতিচ্ছন্ন হল—বিমলেন্দুর কী কম বয়েস হল। তুই ওর মাথা খাচ্ছিস। সেদিন সেক্রেটারী এসেছিলেন, বললেন, শুনেছি। তবে বিমলেন্দু পার্মানেন্ট নয়। ওর জায়গায় লোক খুজছি—তবে এবার আর ছেলে নয়—মেয়েই নেব। আমার এক বন্ধুর মেয়ে অঙ্কে অনার্স নিয়ে এবার পরীক্ষা দিয়েছে। ফল বের হলেই ওকে নিয়ে নেব। বিমলেন্দু কিন্তু স্কুলের রেজাল্টটা ভালো করে দিয়েছে—আগে অঙ্কেই সবচেয়ে বেশি ফেল করত। কিন্তু সেই জায়গায় এখন ফেল তো খুব কম হয়—অনেকে ডিষ্টিংসন পাচ্ছে। আর বিমলেন্দু যেমন কড়া, তেমনি পপুলার। ছেলেমেয়েদের জন্য খাটে খুব। টিচার দু'জনেই ভাল। এ জন্যেই বলে, ঘৃত আর কুম্ভ এক জায়গায় রাখতে নেই। প্রাচীন প্রবাদ বহু জেনারেসনের অভিজ্ঞতার ফল। বিমলেন্দু সংসারের চাপে অভাব অনটনে বিয়ে করতে পারেননি—ওর অবস্থা আমি জানি—ওরা তো রিফিউজি ছিল। কিন্তু মিসেস চাটার্জী ওকে প্রশ্রয় দেন কেন—বুঝিনা। হেড মিস্ট্রেস বললেন—ওদের বিরুদ্ধে মূল অভিযোগ দু'জন পাশাপাশি বসে কথা বলে, তাকানোর ভঙ্গী দেখে আমাদের একসপার্ট শিক্ষিকাদের বুঝতে কিছু অসুবিধে হয় না। তা ছাড়া ছুটির পর ওরা এক

সঙ্গে টার্মিনাস পর্যন্ত যায়—এই তিনটে মূল অভিযোগ। আর চতুর্থ অভিযোগ—ওরা নাকি চারদিন একসঙ্গে ক্যাজুয়েল লিভ নিয়েছে। দু'জনেই কোনো বছরই একদম ছুটি নেয় না। আর দু'জনে তো এক কাগজে সই করে ছুটি নিচ্ছে না। সেদিন অন্য শিক্ষিকারাও কেউ কেউ আসেননি। তবে তার নাম, বিমলেন্দুবাবুর সঙ্গে যোগ করা হচ্ছে না কেন? আসলে, বলতে আমার লজ্জা করে। মেয়েদের স্কুলে পুরুষ টিচারকে সবাই ইনফ্লুয়েন্স করতে চায়। যারা পড়ে—তাদেরই ক্ষোভ—স্কুলের নৈতিক আবহাওয়া দূষিত হচ্ছে। সেক্রেটারী বললেন—আর নৈতিক আবহাওয়া। কিছু আগে কলেজের পরীক্ষার প্রশ্ন মনের মতো হয়নি বলে পরীক্ষা ভণ্ডুল হচ্ছিল। সিলেবাসের বাইরে প্রশ্ন হয়নি—প্রশ্ন কঠিনও হয়নি—এখন আমাদের জামানা এসে গেছে—নকল করে পাস করব। সর্বত্র নকল আরম্ভ হয়ে গেছে। আপনি কতদিন পারবেন জানি না—গতবার ছাত্রীদের দাদারা স্কুলে হাঙ্গামা করতে এসেছিল—এই বিমলেন্দু আর রীনা চ্যাটার্জী কিন্তু রুখে দাঁড়িয়েছিল। বিমলেন্দু ঘাড় ধরে ছেলেদের গেটের বাইরে নিয়ে যায়—রীনা ছাত্রীদের ধমক দিয়ে বক্তৃতা দিয়ে হল-এ ঢোকায়। বিমলেন্দু সেদিন দারুণ সার্ভিস দিয়েছিল—পরে পরীক্ষার হলে চার জনকে এক্সপেল করে। রীনা করে দুটো এক্সপেল। আর কেউ করেছে? আমি জানি না, নকল মহামারী থেকে আপনি স্কুল রক্ষা করতে পারবেন কিনা। হেডমিস্ট্রেস বলল—তাছাড়া ধরুন ওদের সাবধান করে দেবার কথাও বলা যায় না।

—আরে না না। প্রমাণশুদ্ধ লিখিত অভিযোগ না পেলে আমরা কিছুই করতে পারি না। যদি বলে সহকর্মীর সঙ্গে হৃদ্যতা হবে—এতে দোষ দেখাই দোষী মনের লক্ষণ। কারো বয়েস কম নয়। যদি বলে আমরা ঝগড়া করব—এই কি আপনারা চান। যাক্, রেজাল্ট বের হলেই নতুন মেয়েটাকে ঢুকিয়ে দেব। কিন্তু বিমলেন্দুর এত ভাল রেজাল্ট, প্রায় ফার্স্ট ক্লাসের কাছাকাছি, বোঝায় ভাল।—স্কুলের রেজাল্ট পাল্টে দিল—বড় খারাপ লাগছে। ওর জন্যে কষ্ট হচ্ছে। অভাবের সংসার—সকাল থেকে রাত দশটা এগারটা পর্যন্ত খাটে—সে যদি বাস্ টার্মিনাসে একজন সহকর্মীর সঙ্গে যায়—আর ছুটি নিয়ে দুটো সিনেমা দেখে বা রেস্টুরেন্টে খায়—তা এমন কি দোষের। মানুষের তো একটা রিক্রিয়েশনেরও দরকার। ঠিক আছে—বিমলেন্দুই যাবে। তবে আপনি প্রমান সহ অভিযোগ চাইবেন।

এদিকে ছাত্রীমহলে বিশেষত উপরের ক্লাসে কানাঘুষা অঙ্কের স্যারের সঙ্গে বাংলার দিদিমণির ইয়ে হয়েছে। দু'জনে কি আলাপ করেরে—রীনাদি কবিতা বলে। স্যার জিওমেট্রির এক্সট্রা জিজ্ঞেস করেন। আর দু'জনে মিলে একসঙ্গে কোরাসে নামতা পড়েন। মেয়েদের মধ্যে হাসির হিড়িক পড়ে যায়। আবার সন্দেহ প্রকাশ হয়—দূর, স্যার যেমন কড়া—প্রেম ট্রেম বোঝে না। আমার মনে হয় রীনাদি একটু চাউনি। একটু হেসে—বাড়ি খরচার হিসেব লিখিয়ে নেন। কেউ কেউ মন্তব্য করেন, রীনাদি এক শাড়ি একবার পরেন সপ্তাহে—দেখিসনি। সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য ছাত্রীরা বলল, সেই সঙ্গে ম্যাচ করে ব্লাউজ, জুতো—প্রত্যেক শাড়ির সঙ্গে চুল বাধাও আরেক রকম্ করে। সুন্দরী

তো মানায় দারুন। স্যারের সাধ্য নেই—অত বড় হাতি পোষে। হাতি কি বললিরে—মেয়েরা হেসেই খুন। আরেকটি মেয়ে গম্ভীর হয়ে মন্তব্য করে—রীনাদির বিয়ে না হলে কিছু অন্যায় ছিল না। বিয়ে হয়ে হয়েছে মুস্কিল। যদি স্বামীকে ডিভোর্স করে? —এবার এক ছাত্রী বলে—আমি কিন্তু স্যারের কাছে প্রাইভেটে পড়ি— সব বলে দেব। এই, না, মাইরী, স্যার যা কড়া, দেবে টেষ্টে বসিয়ে—তাছাড়া স্যার বোর্ডের খাতা দেখে। একটি মেয়ে এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করে—বলবে? কি বলবি রে? কি বলবি? স্যার আপনার সঙ্গে রীনাদির নাকি ইয়ে হয়েছে? পারবি বলতে? সাহস আছে? বল তো যেয়ে? সবাই মেয়েটার সঙ্গে যোগ দেয়।

সেদিন ক্লাস আরম্ভ হবার প্রায় বিশ মিনিট আগে রীনা এসে দেখল বিমলেন্দু তখনও আসেনি। এক কোণে চেয়ারে বসে রীনা বিমলেন্দুর জন্যে ছটফট করতে লাগল। একজন শিক্ষিকা জিজ্ঞেস করল—রীনা, তোমাদের ভবানীপুরে ক'দিন আগে একটা ট্রাফিক পুলিশকে মেরেছে—পত্রিকায় দেখছিলাম।

—হ্যাঁ, আমিও পত্রিকায় দেখেছি।

যদিও আজকাল পত্রিকা রীনা প্রায় পড়েই না। সেদিনের ঘটনায় যে কল্যাণ ছিল—তা রীনার কাছে বলতে গিয়ে ওর অনাগ্রহ দেখে অতি সংক্ষেপে শেষ করেছে। রীনারও কথা বলতে ইচ্ছে হচ্ছিল না। তাই নিজের অনিচ্ছা সংক্ষিপ্ত উত্তরের মধ্য দিয়ে শেষ করল।

শিক্ষিকা ভাবল, আমি তো বিমলেন্দু নই—আমার সঙ্গে গল্প করবে কেন? সাতসকালে কার জন্য এসেছে—তা কেনা জানে। আমি থাকি আরেক রাজ্যে এন্টালী—তাই আমাকে আগে রওনা হতে হয়। বিমলেন্দু ঢুকে রীনার পাশের চেয়ারে বসল।

রীনা বলল—গতকাল কি আমার ভয়ে পালিয়ে ছিলে? তুমি কি আমাকে ভয় করতে আরম্ভ করেছ? থাকলি কেন—আমি সারা পথ একা একা। রীনা বুঝতে পারে কান্নার আভাস গলায় আসছে—তাই চুপ করে গেল।

—গতকাল পাঁচটায় একটা ইন্টারভিউ দিতে গেছিলাম ল্যান্সডাউনে। উত্তরবঙ্গের একটি কলেজের জন্য।

রীনা সব ভুলে জিজ্ঞেস করল—তুমি চলে যাবে?

বলতে গিয়েও বলতে পারল না—তা হলে আমি বাঁচব কি করে।

চুপ থেকে নিজেকে সামলে জিজ্ঞেস করল—যাচ্ছ, আমার ভয়ে? বিমলেন্দু একটু ম্লান হেসে বলল—সব বলব, অনেক ব্যাপার। ক্লাস আরম্ভ হতেই কিছুক্ষণ পর রীনা ও বিমলেন্দু ক্রুদ্ধ হয়ে বের হয়ে এল। তারপর রীনার ঘরে ঢুকে বলল—এটা যে লিখেছে—তাকে আমি এক্সপ্লেন করব এটা যেন মুছে ফেলা না হয়—আমি ফটোগ্রাফার আনছি—মোড়েই দোকান—তারপর ক্লাসের সব মেয়ের হাতের লেখা পরীক্ষা করব। ফটো আসবার আগে যদি কেউ মোছে—সব ক্লাসকে আমি দায়ী করব। বিমলেন্দু ও রীনা দু'জনে দু'জনের সঙ্গে ক্লাসে গিয়ে দেখল। ক্লাসের বোর্ডে লেখা,

বিমলেন্দু-রীনা। ক্লাসেও এই লেখাটি দেখে বিমলেন্দু একই ধমক দিয়ে বের হয়ে এল। --স্যার। ফিরে দেখল ক্লাস টেনের একটি মেয়ে। মেয়েটি কাঁদতে কাঁদতে জানাল, ওই লিখেছে, ইংরেজি শিক্ষিকার কাছেও প্রাইভেটে পড়ে। না লিখলে বলেছে, টেষ্টে ফেল করিয়ে দেবে। বলল, ক্লাস আরম্ভ হবার আগে লিখেছে—দু'ক্লাসেই। মেয়েটি দু'জনের পায়ে পড়ে কাঁদতে লাগল। ক্লাসের মেয়েরা বের হয়ে এল। ওর কান্না দেখা মেয়েদের দেখতে দিয়ে তারপর বিমলেন্দু মেয়েদের ধমক দিল—যাও, ক্লাসে যাও সব।

এবার বিমলেন্দু রীনাকে ও মেয়েটিকে নিয়ে ক্লাসে ঢুকে বলল—যখন তুমি লিখেছ—তোমাকেই মুছতে হবে। তুমি এস আমার সঙ্গে। আমি তোমাকে গগনবাবুর কোচিং এ ভর্ত্তি করে দেব। সে ক্ষমতা আমার কাছে। ওর মত টিচার এ তল্লাটে নেই। তুমি সত্যি কথা বলেছ—তা তার সামনে বলতে হবে।

এবার ইংরেজি টিচারকে বিমলেন্দু ডাকল। তিনি ইতিমধ্যেই ব্যাপারটার প্রতিক্রিয়ার জন্যে অপেক্ষা করছিলেন। কিন্তু মেয়েটি ফাঁস করে দেবে—তার কল্পনার অতীত।

বিমলেন্দু কঠোর স্বরে বলল—মিস দত্ত, একটু বাইরে আসুন তো। এই মেয়েটিকে আপনি আমার আর ওর নামে বোর্ডে লিখতে বলেছিলেন কেন?

—না, বলিনি।

—আপনি বলেছেন দিদিমণি, আরো অনেকে ছিল।

রীনা বলল—আমি পঞ্চাশ হাজার টাকার মামলা করব আপনার নামে।

মিস দত্ত বললেন—অত মেজাজ দেখাবেন না। টাকার যদি অত গরম তবে মাষ্টারী করেন কেন?

—আপনার ভিটেয় আমি ঘুঘু চবাব। আমার সোর্স আপনি জানেন না। আমি পড়াতে ভালবাসি বলেই পড়াই। শিক্ষকতাকে আমি ভিক্ষাবৃত্তি থেকে আলাদা করে ভাবি। বলুন—কেন এ কুৎসা।

বিমলেন্দু বলল—চলুন হেড মিস্ট্রেসের কাছে। আর ছাত্রীদের বলে দিচ্ছি—আমি আজ থেকে তোমাদের পড়াব না। স্কুলের কাজে আমি আগেই ইস্তাফা দিচ্ছি।

রীনা বলল—আমিও ইস্তাফা দেব। তোমরা সবাই দোষী। তুমি লিখে অন্যায় করেছ—আর তোমরা আমাদের লেখাটি দেখিয়ে মজা পেয়েছ—দেখেও মুছে দাও নি। যেখানে শিক্ষক শিক্ষিকার এত অসম্মান—সেখানে আমি আর চাকরি করব না।

বিমলেন্দু ও রীনা মিস দত্ত ও সেই মেয়েটিকে নিয়ে প্রধান শিক্ষিকার ঘরে এসে সব বলল। মেয়েটি সাক্ষ্য দিল। মিস দত্তকে ও সবাইকে বাইরে যেতে বলে প্রধান শিক্ষিকা একটু ভাববার সময় চাইলেন। রীনা বলল—আমাদের ভাবনা শেষ হয়ে গেছে—আমি ইস্তাফা পত্র এখনই দিচ্ছি—আর আমি ক্লাস করব না—বিমলেন্দু বলল, আমাকে তাড়াবার অনেক প্ল্যান চলছে জানি। আজ আমি নিজেই ইস্তফা দিচ্ছি—এই মুহূর্ত থেকে। আমি পার্মানেন্ট নই—সুতরাং আমাকে ছাড়তে কোনো অসুবিধে নেই।

রীনা বলল—না হয়, তিন মাসের মাইনে আমি ফেরত দেব।

এবার বিমলেন্দু বলল—সাহস থাকে মিস দত্ত—আপনি রেসিগনেশন দিন। আর

দিন বা না দিন—আমি আপনার বিরুদ্ধে আইনী ব্যবস্থা নিচ্ছি। আমিও পঞ্চাশ হাজার টাকা আদায় করব। আপনি আমাদের অবৈধ সম্পর্ক প্রমাণ করবেন কোর্টে।

দু'জনেই বের হয়ে এল। দুটো ইস্তফা পত্র দু'জনে দিয়ে দিল। প্রধান শিক্ষিকার ঘরে বাইরে দাঁড়িয়ে ছাত্রীরা সবই শুনছিল। এবার ঘন্টা পড়বার সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য শিক্ষিকারাও এসে হাজির হয়ে জিজ্ঞেস করলেন—এত হৈচৈ কিসের?

মিস দত্ত বিরস মুখে বসেছিল। সে জানে, কোনো কেস লড়বার ক্ষমতা তার পক্ষে অসম্ভব। বিমলেন্দুর অবস্থা জানে—রীনার কাছ থেকে টাকা পেয়ে মামলা করবে। দুটো মামলা। চাকরিতো যাবেই—মা, বোন, ভাই নিয়ে সংসার। পাস কোর্সের গ্রাজুয়েট। অনার্স দিয়েছিল পায়নি—পরে স্পেশ্যাল অনার্স দিয়েছে। মেয়েটা এত ভয় পেয়ে গেল। ইতিমধ্যে এইট নাইন টেনের মেয়েরা বিমলেন্দু ও রীনাকে নিয়ে কান্নাকাটি শুরু করে দিল—ক'টি মাতব্বর গোছের মেয়ে প্রধান শিক্ষিকার কাছে গেল। টিচার্স কাউন্সিলের সেক্রেটারী মিসেস পালিত ও আরও কয়েকজন শিক্ষিকা প্রধান শিক্ষিকার ঘরে গেলেন। বিমলেন্দু বলল, এবার চলি।

—চলুন। কিনা উঠে দাঁড়ায়। ছাত্রীর পথ আটাকে দাঁড়ায়—স্যার যাবেন না, দিদিমণি যাবেন না। ক্লাসে কেউ যাচ্ছিল না। উপরের ক্লাসের মেয়েরা মাথা কুটছে—স্যার দিদিমণি এবারের মতো ক্ষমা করে দিন। আর করব না। এই সময় মিসেস পালিত ও অন্যান্য শিক্ষিকারা এসে মিস দত্ত ও বিমলেন্দু ও রীনার কাছে এসে জানাল—চলুন, বড়দি ডাকছেন।

বড়দি বললেন—দেখুন ম্যানেজিং কমিটি আপনাদের ইস্তফা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেবে—আমি ফরোয়ার্ড করতে পারি।

বিমলেন্দু বলল—কোথায় ইস্তাফা পত্র যাবে—আমার কনসার্ন নয়। আমরা আপনার কাছে সংবাদটা জানিয়ে ইস্তাফা দিচ্ছি। রীনা বলল—ম্যানেজিং কমিটি দেখিয়ে লাভ নেই। আপনার কাছে বিচারপ্রার্থীও নই। কিন্তু এমন জঘন্য কাজে যারা ছাত্রীকে নিয়োগ করে—তাকে আমি ছেড়ে দেব না। মিসেস পালিত এ.বি.টিয়ের একজন সক্রিয় সদস্য। বেশ গুছিয়ে কথা বলতে পারেন। বললেন, এভাবে লেখা ও লেখান অত্যন্ত নিন্দনীয়। মিস দত্তের সেই জন্য শর্তহীন ক্ষমা চাইতে হবে। আপনারা গেলে আমরা থাকব কি করে। আমাদের স্কুল একটা পরিবার। কাউকে বাদ দিয়ে আমরা নই। আমরা একসঙ্গে সবাই লড়াই করেছি—করছি। দোষ, ত্রুটি ক্ষমা করতে পারব না কেন? রীনা চলে গেলে এ স্কুলের সৌন্দর্য চলে যাবে—সাংস্কৃতিক জীবন চলে যাবে। বিমলেন্দুবাবু চলে গেলে স্কুলের তেজই চলে যাবে। কাউকে আমরা ছাড়তে পারব না।

রীনা জিজ্ঞেস করল—মিস দত্ত কেন এ কাজ করেছেন? মিস দত্ত বলল—মেয়েটি মিথ্যা বলেছে।

এবার পালিত কঠোর স্বরে বললেন—মিস দত্ত, আপনাকে ক্ষমা চাইতে হবে—নইলে পরিণাম নিয়ে আমরা দায়ী থাকব না। অন্যান্য শিক্ষিকারাও বললেন—ক্ষমা চাইতে হবে।

মিস দত্ত কাঁদতে আরম্ভ করলেন।

মিসেস পালিত বললেন—মেয়েটিকে নিয়ে কী করা যায়? বিমলেন্দু বলল—মেয়েটি আন্ডার থ্রেট করেছে। ওকে আমি শাস্তি দিতে চাইনা। ওকে ভয় দেখান হয়েছে—নইলে টেস্টে আটাকানো হবে। তবে কোর্টে কেস হলে ওকে সাক্ষ্য দিতে হবে। এদিকে ছাত্রীরা কান্না ভেজা গলায় শ্লোগান তুলল—স্যার, যাবেন না, রীনাদি যাবেন না।

মিসেস পালিত বললেন—মিস দত্ত, আমি কিন্তু আপনাকে প্রটেকসন দিতে পারব না।

মিস সোম ম্যানেজিং কমিটির শিক্ষক প্রতিনিধি—তিনিও বললেন, ম্যানেজিং কমিটিতে যদি ব্যাপারটা ওঠে আমি কিন্তু আপনার ডিফেন্সে একটি কথাও বলতে পারব না। ডিসিপ্লিনারি চার্জ আসবেই।

এবার মিস দত্ত বললেন—আমি যদি অন্যায় করে থাকি তবে ক্ষমা চাচ্ছি।

বিমলেন্দু বলল—এ ক্ষমা আমি গ্রহণ করলাম না।

—আমিও ক্ষমা গ্রহণ করলাম না।

বিমলেন্দু বলল—তিনি কার কাছে কি অন্যায় করেছেন তা স্পষ্ট করে বলুন। ক্ষমা স্পেসিফিক হলেই এ ব্যাপার মিটবে—আমরা মিসেস পালিতের অনুরোধে সেই শর্তেই রাজি হয়েছি। সবাই ক্ষমার জন্য অপেক্ষা করে চুপ করে রইল।

বিমলেন্দু বলল—চলি। ক্ষমা করবার জন্যে যে মত দিয়েছিলাম তা আমি তুলে নিচ্ছি।—রীনা বলল—চলুন। ক্ষমা শুনবার জন্য আমরা ব্যগ্র নই। এবার মিস দত্ত বললেন—আমি বিমলেন্দুবাবু ও রীনা চ্যাটার্জীর কাছে ঐ লেখাটির জন্য ক্ষমা চাচ্ছি। আর ছাত্রীকে নিয়ে লেখানোর অপরাধ স্বীকার করে তার জন্যও আমি ক্ষমা চাচ্ছি। শিক্ষা পরিবেশ হঠাৎ ঝোঁকের মাথায় নষ্ট করবার জন্য আমি আপনাদের সকলের কাছে ক্ষমা প্রার্থী।

প্রধান শিক্ষিকা এবার ইস্তাফা পত্র ছিড়ে এনে বাইরে বললেন—তোমাদের কাজ খুব অন্যায় হয়েছে—আর যেন এমন না হয়। এবারের মত অতি কষ্টে—মিস দত্ত ক্ষমা চাওয়ায়—বিমলেন্দুবাবু ও রীনাদি থাকতে রাজি হয়েছেন। যাও। ক্লাসে যাও। মেয়েরা খুশি হয়ে যে যার ক্লাসে দৌড়াল।

মিসেস পালিত গর্বিত ভাবে এসে ষ্টাফরুমে বসলেন। টিফিনের পর আবার ক্লাস আরম্ভ হল। তবে মিস দত্ত ছুটি নিয়ে চলে গেলেন।

ফিস ফিস করে শিক্ষিকরা ক্লাসে যাবার সময় বলল—মিস দত্ত একেবারে বোকা। তুই বাইরের লোক দিয়ে করাতে পারলি না। স্কুলের বাইরে দেয়ালে লেখাতে পারলি না। এখন কিছু হলে তোকেই ধরবে। হল ভাল—অপরাধি পুরস্কার পেল—আর দোষকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখাল তাকেই নাকি ডিসিপ্লিনারী এ্যাকসনে পড়তে হবে। যেত দুটো একসঙ্গেই।

—কই একবারও মিস দত্তের পক্ষে মুখ খুললেন না।

—ধরা পড়ে গিয়ে মাটি করল।

—ঐ বিমলেন্দু শয়তানের হাঁড়ি। হাতে পেয়েছে একটি ধনী পরস্ত্রী। ওর বাড়িতে একটা উড়ো চিঠি।

—চুপ, চুপ। দেয়ালেরও কান আছে। না লেখালেখির মধ্যে নয়। পরে—পরে আলোচনা করবো।

মিসেস পালিত, মিসেস সোম আরও জনাকয়েক একসঙ্গে বসলেন। মিসেস পালিতকে সোম বললেন—যে ভাবে আপনি ম্যানেজ করলেন। সত্যি—যা দাঁড়িয়েছিল। ওরা দু'জন তো ওকে (প্রধান শিক্ষিকা) গ্রাহ্যই করছিল না। ভাগ্যিস আপনি—

মিসেস পালিত সগর্বে বললেন—ঐ বিমলেন্দুকে তো চেন না। প্রচণ্ড জেদি—একগুঁয়ে—না খেয়ে মরবে—তবু কম্প্রোমাইজ করবে না। ইস্টবেঙ্গল থেকে এসে অতগুলো ভাই বোন নিয়ে ক্ষেপে ক্ষেপে পড়াশুনা করেছে। এখানে ওর মত রেজাল্ট কার? স্কুল ফাইনালে অঙ্কে লেটার নিয়ে ফার্স্ট ডিভিসন, আবার গ্যাপ দিয়ে ফিফটি এইট পারসেন্ট নম্বর অঙ্কে অনার্স নিয়ে বি.এ., আবার গ্যাপ দিয়ে সেকেন্ড ক্লাস থার্ড—ফিফটি সেভেন। ও শেষ পর্যন্ত কলেজে যাবে। আর রীনা বিশ্ববিদ্যালয়ে এস.এফ.আই. করত— ভালো বলতে পারে। রেজাল্টও ভালো। কি হয়েছে, দু'জনে যদি একটু বেশি মেশামেশি করে। সকাল থেকে রাত সাড়ে দশটা পর্যন্ত বিমলেন্দুর টিউশন। স্কুলে খেটে পড়ায়—একজন সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে দুটো বেশি কথা বললে দোষ কোথায়। এই যে মেয়েরা ছেলেদের সঙ্গে কথা বললে, মিশলে দোষ হবে—এ ধারণাগুলো বাতিল করতে হবে। ভাবত, একটা স্কুলে এত মাষ্টারের মধ্যে একা তুমি মেয়ে মানুষ। এখানে বিমলেন্দুবাবু কত সহজ ও স্বাভাবিক। বাব্বা, বিমলেন্দুকে যে মানাতে পারব ভাবিনি। আর উনিতো (হেড মিষ্ট্রেসকে ইঙ্গিত করে) সবই ভেবে দেখি। আমাকে বলল—আপনি সিচুয়েশনটা সেভ করুন। কী বিশ্রি ব্যাপার। .....একটা হাই তুলে মিসেস পালিত বললেন—যাই, অনিমাদি আর সত্যজিৎদা ডেকে পাঠিয়েছেন—যেতে হবে কলেজষ্ট্রীটে।

ছুটির পর রীনা বলল—কোথায় ইন্টারভিউ দিলে। হঠাৎ ইন্টারভিউ কেন?

—তুমি অনেক ব্যাপার জান না। তোমার-আমার ব্যাপার নিয়ে সেক্রেটারী ও প্রধানার সঙ্গে আলোচনা হয়েছে। প্রমাণাভাবে কিছু করা যাচ্ছে না। ঠিক হয়েছে, সেক্রেটারীর এক বন্ধুর মেয়ে অঙ্কে অনার্স হয়ে পরীক্ষা দিচ্ছে—এবার রেজাল্ট বের হলেই আমার জায়গায় তাকে নেবে। এটা গার্লস স্কুল—যোগ্য পাত্রী না পাওয়াতে আমাকে টেম্পোরারী রাখা হয়েছে। পোষ্টটা মহিলাদের।

—এদ্দুর গড়িয়েছে। তুমি জানলে কার কাছে।

—স্বয়ং সেক্রেটারী যার কাছে গল্প করেছেন—তারই কাছে। বলা যেতে পারে, পরোক্ষে, সেক্রেটারী আমাকে চাকরি খুঁজে নিতে বলেছেন।

মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেল রীনার। কণ্ঠরোধ হয়ে এল। রাস্তার মধ্যেই বিমলেন্দুর হাত চেপে ধরল। বিমলেন্দু আরেক হাত দিয়ে ওর হাত বুলিয়ে বলল—বাইরের কলেজে দরখাস্ত আরম্ভ করেছিলাম। গতকাল একটা ইন্টারভিউ দিলাম—ল্যান্সডাউনে।

প্রিন্সিপল ছিলেন, গভর্নিং বডির মেম্বার ছিলেন একজন—অর্থাৎ স্টাফ কাউন্সিলের প্রতিনিধি, সেক্রেটারী—উনি এম.এল.এ, আর প্রেসিডেন্ট এম.পি। খুব পছন্দ হয়েছে আমাকে—সার্টিফিকেটে তো আমার বয়েস অনেক কম দেখান আছে—অনেক—পঁয়ত্রিশ হয়নি। ওরা পছন্দ করল। মার্কস দেখে খুব খুশি। বলল, কতদিনের মধ্যে জয়েন করতে পারবেন? বললাম, মাসের প্রথমেই জয়েন করতে পারব—কারণ, এখানকার ডি.এ.টা নিয়ে যেতে চাই। ক'টা ইনক্রিমেন্ট চাইলাম। তিনটের বেশি দিতে পারবে না বলল। ওরা গিয়ে গভর্নিং বডি থেকে এপয়েন্টমেন্ট লেটার পাঠাবে। আমাকে তৈরি থাকতে বলল। এম.এল.এ. ও এম.পি. দু'জনেই বলল—কথা হয়ে গেল। এখন শুধু টেকনিক্যাল কাজটুকু বাকি। স্কুল ছেড়ে দেবার আগেই আমি ছেড়ে দেব।

টার্মিনাস এসে গিয়েছিল—আমার কথা একবার ভাবলে না। বলে রীনা দ্রুত বাসএ উঠে গেল।

বাড়িতে এসে জামা কাপড় না ছেড়ে রীনা বিছানার ওপর উপুর হয়ে শুয়ে হুহু করে কাঁদতে লাগল। আজ এত ধকলের ওপরও বিমলেন্দুর চলে যাবার সংবাদ—বিমলেন্দুর অবিচলিত কণ্ঠস্বর, ওর মনে হতে লাগল আমি একা, আমি ঠকে গেলাম, আমিই শুধু ভালবেসে একলা হয়ে গেলাম।

কাঁদতে কাঁদতে রীনা আজ ঘুমিয়ে পড়ল। যখন ঘুম ভাঙল, তখন রাত সাড়ে আটটা। তাড়াতাড়ি উঠে কাপড় ছেড়ে গা ধুয়ে চা খেতে খেতে ভাবল এ আমি কি করছি! কোথায় চলেছি? কোন সর্বনাশ, আমাকে কোথায় টেনে নিয়ে যাচ্ছে। একটা প্রবল আতংক নিয়ে রাতের রান্না চাপায়। কল্যাণকে সহ্য করতে পারি না—এত রাগ হল—তবু মনে হয়, ও যেন আরো দেরি করে আসে। ওর সঙ্গে কথা বলতে পারছি না—কথা বলতে ইচ্ছে করছে না। কল্যাণও তো কথা বলে না। হয়তো আমার ইচ্ছে থেকে। আমি কল্যাণ এত শীতল কেন? বিমলেন্দুকে না দেখলে আমি বাঁচব না। আবার কান্না আসতে চায়। কল্যাণ মোটর কিনেছে—মোটরে চড়ে রোববার বাপের বাড়ি গেছে। মা আমার দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে কি যেন বুঝবার চেষ্টা করছেন। কল্যাণের পাশে চুপ হয়ে দু'জনে মোটরে বসেছিলাম। সারা রাস্তায় আমি কিছু বলতে পারিনি—আমাকে চুপ দেকে কল্যাণও বলেনি। ভাগ্যে আগের মত আদর করে না। কেন করে না—কি হয়েছে আমার —কি হয়েছে ওর। বিমলেন্দু না হলে আমি বাঁচব না। বিমলেন্দু চলে গেলে আমি বাঁচব না।

রাত নটায় গাড়ি গ্যারেজে রেখে কল্যাণ ঢুকল।

—খেয়ে শুয়ে পড়ব—বড্ড টায়ার্ড। নতুন ডিপার্টমেন্ট।

—রান্না হয়ে এল।

—আচ্ছা।

কল্যাণ জামাকাপড় ছেড়ে একটা পাজামা পাঞ্জাবী ও একটা শাল বের করে গায়ে দিয়ে সিগারেট নিয়ে আনমনা হয়ে বসে। বসে একমনে রমার কথা চিন্তা করে।

রমা অফিসের কাজে যোগ দিয়ে আরাম পায়। আরও দু'একদিন ইচ্ছে করলে ছুটি নিতে পারত। কিন্তু বাড়িতে হাঁফিয়ে উঠছিল। মা'র সঙ্গে অসহ্য লাগছিল। তবু বাবা থাকতে মা'র বিরক্ত মনোযোগ বাবাকে কেন্দ্র করে অনেকটা ব্যয় হয়ে যেত। এখন মা'র মনোযোগ সম্পূর্ণ রমার দিকে। এ ক'দিনের সামান্য হবিশ্যে, অর্ধ অনশনে, শ্রাদ্ধের পরিশ্রমে রমার ভেতরটা দুর্বল হয়ে গিয়েছিল। কল্যাণের পারচেজের চার্জে যাওয়া, মোটর কেনা সবই শুনেছিল। কল্যাণ নিজে থেকে কিছু বলেনি। ভটচাজদার মুখে শোনা। কল্যাণ বলেনি বলে রমাও জিজ্ঞাসা করেনি। আজ জয়েন করে কাজে কর্মে নিজেকে ব্যস্ত রেখে অনেকটা আরাম পায়। তারপর নিজেই কল্যাণকে ফোন করে জানায়—তোমার নতুন ডিপার্টমেন্ট কেমন লাগছে? আজই জয়েন করলাম। —আর দু'একটা দিন বিশ্রাম নিলে পারতে। নতুন ডিপার্টমেন্ট—মনে হচ্ছে হেল—এত ডিসওর্ডার। রমা জানে, প্রতিটি ইনচার্জ আগের ইনচার্জকে নিন্দে করবেই। এটা অফিস-মনস্তত্ব। —তোমার-আমার মনের মত ডিসঅর্ডার? —আমাদের মিলিত বিশৃঙ্খলার সৌন্দর্যের সৃষ্টি। ঘরের রুটিন বাধা জীবন থেকে কাজল কালো মেঘের বর্ষার জলে ভিজে আমরা এলোমেলো। আর ডিপার্টমেন্ট শৃঙ্খলাহীনতা ঘরদোর অপরিস্কার রাখার অপরিচ্ছিন্নতা। দু'টোর মধ্যে তুলনা চলে না।—আচ্ছা রাখি—এনকোয়ারীতে কে যেন আসছেন।

রমার মন পড়ে থাকে ছুটির সময়ের দিকে। কল্যাণের সঙ্গ পাবার জন্য। অথচ রাত করে গেলে মা রাগ করবে। তবে মা কিন্তু এমনিতে নীরব হয়ে গেছে। আজ কল্যাণকে সব বলব? আজই? থাকনা। অনেকটা সময় লাগবে? কল্যাণ বলে, মনকে মেরে ফেলবার জন্য একঘেয়েমির মত ওষুধ নেই। রুটিন বাধা জীবন যন্ত্রের। যেখানে টেকনিক্যাল পারফেকসন। জীবনে পারফেকসন নেই। তবে মনটনি মানুষকে যন্ত্র বানিয়ে ছাড়ে। ঘড়ি যন্ত্রের নিয়মে চলে। মানুষকে ঐ ঘড়ির কাঁটার নির্দেশ অনুযায়ী চলতে হয়। চারদিকে প্রাণকে মেরে ফেলবার জন্যে রুটিন ধাওয়া করে আসছে। জীবনের বিরুদ্ধে রুটিনের ষড়যন্ত্র। যারা রমার বাড়ি যায়নি—প্রত্যেকে রমার কাছে দুঃখ প্রকাশ করে গেল। ষ্টেটসম্যান ও অমৃতবাজার পত্রিকায় রমার লেখা অবিচুয়ারী খুব সাড়া ফেলেছে। কেউই প্রায় জানত না—রমার বাবার একজন আর্টিষ্ট। রমার সম্মান অনেক বেড়ে গেছে। পাড়ার লোকের খুব গর্ব হয়েছে। কিন্তু রমার কোনো ঠিকানা না থাকায়—অথচ ষ্টেটস্ম্যান ও অমৃতবাজার বিজ্ঞাপন বিভাগে খোঁজ করলেই তা পাওয়া যেত—কোনো নাম করা শিল্পীর তরফ থেকে কোনো খোঁজ আসেনি। অবশ্য সময়ও যায়নি। .....ঠান্ডা পড়েছে। রমা সোয়টারটা পরে নেয়। ভটচাজদা বলেছিল, আজ তাড়াতাড়ি চলে যাস। বড্ড খাট-খাটনি গেছে। মেয়েদের তো মুখে জানিয়ে দেয়া আছে—তিনটের পর যে কোনো সময় চলে যেতে পারে। আজ দেরি করিস না। .....তাও কি হয়। কল্যাণের অনুমতি না দিয়ে যায় কি করে? এখন যেন কল্যাণের ইচ্ছের বিরুদ্ধে যাবার শক্তি চলে গেছে। কিছু পরেই ফোন এল—আমার একটু দেরি হবে—অপেক্ষা করবে। তোমাকে পৌছে দেবার ভার আমার ওপর। রোজ রোজ তোমাকে পৌছে দেব? —কোন ঝড়ের সাগরে পৌছে দেবে? —যে সাগর ডোবায় না—ভেসে থাকতে দিতে

জানে। —তেমন সাগরের সন্ধান পেলে কোথায়? —কোথায় পেলাম বড় কথা নয়—শুধু প্রকৃতিই কি সৃষ্টি করতে জানে। মানব প্রকৃতি বিরাট সৃষ্টি করেছে। আর্ট থেকে আর্কিটেকচার—প্রকৃতির চেহারা পাল্টে দিয়েছে। যে সাগরে ডুবে থাকা যায়—ভেসে থাকা যায়—যেখানে বসন্ত আছে, বর্ষা আছে শীত আছে—কিছু সব ঋতুতেই ভাসমান শান্তি আছে—অক্সিজেন আছে। —ঠিক আছে। তেমন সাগরের জন্য অপেক্ষায় রইলাম।

পাঁচটার পর দু'জনে মোটরে উঠল। রমা বলল—মাধ্যাকর্ষণহীন সাগরটি কোথায়? —মাধ্যাকর্ষণ আমাদের দু'জনের মধ্যে। দু'জন দু'জনকে প্রবল ভাবে আকর্ষণ করছি। সাগরে মাধ্যাকর্ষণ যদি থাকে তা নিয়ে প্রকৃতি মাথা ঘামাক। কোথায় যাবে? কতদিন পর বের হলাম বলো তো? দয়া করে দিন তারিখের উল্লেখ কর না।

দু'জনে একটা বড় রেষ্টুরেন্টের একটা কোণায় গিয়ে টেবিল ভাড়া করল। বলল—দু'ঘন্টার জন্যে এই টেবিলটা ভাড়া নিলাম। তোমার বাবার জীবনী—সেই ট্রাজিক টেল—আজকে?

—এখন দুঃখের মুখে দুঃখের কথা ভালই লাগবে। আমাদের পাড়ার সবাই জানে। জানে বাবা ব্যর্থ আর্টিষ্ট—জীবনে সুযোগ পায়নি—আমরা দরিদ্র—অত্যন্ত অনটনের মধ্যে দিন গেছে এসসেটরা এসসেটরা। প্রথম থেকে বলছি—তবে প্রায় ত্রিশ বছরের কাহিনী যতটা সংক্ষেপে পারি।

—কি খাবে বল?

—এ সময় তো বাইরে কিছু খেতে নেই। শুধু চা খাব?

—তোমাকে যেন একটু দুর্বল দুর্বল লাগছে।

—সব দিক থেকেই আমি দুর্বল হয়ে গেছি।

—কফি দিক—যদি ভেজিটেবল কিছু থাকে।

রমা চুপ করে থাকে কিছুক্ষন।

কল্যাণ ভাবে বাপের কাহিনী ঘাড়ের ওপর রোজ ঝুলতে থাকার চেয়ে আজকেই শেষ হোক। কুইনিন মিক্সার মাত্র একদিনই খাব। রমা বলতে শুরু করে বাবা-মার পরিচয় দিয়ে। প্রায় দেড় ঘন্টার মাথায় রমা মৃত্যুর সময় বাবার উক্তিগুলো বলে—সেই কথাগুলোর মানে জানতে চায়।

কল্যাণ শুনতে শুনতে স্তব্ধ হয়ে যায়। এমন দুঃখ কষ্ট মানুষের হয়। শিল্পীর মৃত্যু, প্রেমের মৃত্যু, পুত্র-ভাইয়ের মৃত্যু—শান্তির মৃত্যু। মৃত্যু ও অশান্তির এমন পরিবেশে বড় হয়ে রমা এখনও মনকে বাঁচিয়ে রেখেছে কি করে? কল্যাণ যে কখন তন্ময় হয়ে গেছে—টেরও পায়নি। দু'বারই দু'চুমুক কফি খাবার পর বাকিটুকু দু'জনেই খেতে ভুলে গেছে।

—আমি নিজে প্রথম এই কাহিনী বললাম তোমাকে।

কল্যাণ বলল—বোধ হয়, তোমার মা যখন আত্মহত্যা করবার চেষ্টা করে—তখনই তোমার বাবার পারসনালিটি স্প্লিট হতে আরম্ভ করে, তারপর তোমার দাদার মৃত্যুর

পর —স্প্লিটটা ফাইনাল হয়। তখন তিনি রোগের আড়ালে আত্মগোপন করেছিলেন— মৃত্যুর সময় সেই শিল্প চেতনা—সেই ব্যক্তিত্ব আত্মপ্রকাশ করেছিল। যে মানুষকে ভয় পেত—সে ভগবানকে চ্যালেঞ্জ করছে—মৃত্যুর পর বোঝাপড়ার ভয় ভগবানকে দেখাচ্ছে। মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়ে বলছে—তোমাকে বিশ্বাস করে ঠকে গেছি। কী সাংঘাতিক সাহস—কী বেপরোয়া—বিশ্ব পরিকল্পনার ত্রুটি শিল্পীর কাছেই ধরা পড়ে।

দু'ঘন্টা পরে অভিভূত কল্যাণ রমাকে পৌছে দেয়। মা নিঃশব্দে দরজা খুলে দেয়। রমা নিঃশব্দে ভেতরে চলে যায়। দু'জনেই নীরবে সময় কাটায়। নীরবেই খেয়ে শুয়ে পড়ে। ঘুমাবার আগে পর্যন্ত বুঝতে পারে মা ঘুমায় নি। মা কথা না বললে—রমাও বলবে না। কথায় যদি ঝগড়া হয়—সেই পার্ক।

স্বপ্নে দেখল। মা কে খুজতে গিয়ে দেখে মা-র জায়গায় পার্কে দাদা একা বসে আছে। দাদাকে বাড়ি আনবার জন্য কত টানাটানি করল, কিন্তু দাদা আসবে না। রমা কেঁদে ফেলল। হঠাৎ মা'র ধাক্কায় জেগে গেল—কাঁদছিস রমা! রমা। রমা পাশ ফিরে শোয়।

আবার স্বপ্ন দেখল, কল্যাণের সেই সাগর—যেখানে ভেসে থাকা যায়—কেউ ডোবে না। রমা একটা জলাধারে দাঁড়িয়ে কল্যাণকে বলছে—এই সেই তোমার সাগর যেখানে ভেসে থাকা যায়— কেউ ডোবে না। কিন্তু কোথায় কল্যাণ। জলের মধ্যে দেখল বাবা আস্তে আস্তে ডুবে তলিয়ে গেল—রমার হাত পা অবশ, বাবাকে বাঁচাতে পারল না। কিন্তু বাবাকে যে নিজে পুড়িয়ে এলাম। এখানে বাবা-মৃত বাবা—এল কি করে। হাত পা অবশ—শরীরে জোর নেই—মনে অবাক হবার শেষ নেই। পরদিন বের হবার সময় মা বলল—তাড়াতাড়ি ফিরবি। সারাদিন একা থাকি। তারপর সন্ধ্যার পর মনে হয়, ঐ ঘর থেকে তোর বাবা আমাকে ডাকছে। এত ভয় করে। তবু লাইট জ্বলে দেখি, কিছু না। তবু এত ভয়—মা কেঁদে ফেললেন। রমা বলল, সাতটার মধ্যে ফিরব। তবে টিউটোরিয়াল, আর সর্টহ্যান্ড টাইপ এগুলো ছেড়ে দিচ্ছি। একটা নতুন ফার্মে—তুমি তো জানই—ভটচার্জদা—আচ্ছা সাতটার মধ্যে ফিরব। কল্যাণকে ফোনে জানাল। কল্যাণ বলল—সাড়ে চারটায় আগেই বের হব। এত আগে—যেন বুঝতে পারে রমা।

একটা বড় হোটেলে এসে কল্যাণ দু'ঘন্টার জন্যে ঘর ভাড়া নেয়। তারপর রমার কাছে এসে হাত বাড়াতেই রমা বুকে ঝাপিয়ে পড়ে। গভীর ভাবে অনেকক্ষণ দু'জনে চুমো খায়। তারপর দু'জনের দৈহিক মিলন সম্পূর্ণ হয়। রমা প্রথম পুরুষের পূর্ণ স্বাদ পায়। সাতটার আগেই পৌছে যায়।

তারপর রোজই বিভিন্ন হোটেলে দু'ঘন্টার জন্যে ওদের পূর্ণ মিলন হয়। ইতিমধ্যে ভটচাজদা পরীক্ষার জন্য কিছু বই দিয়ে গেছে। পূর্ণ মিলনের পর শান্ত চিত্তে রমা প্রায় দশটা পর্যন্ত পড়াশুনা করে। এমনি করেই কিছুদিন চলে গেল।

এরই মধ্যে একদিন রমা চারঘন্টা পরীক্ষা দিয়ে এল। পরীক্ষা খুব ভাল হয়েছে। কল্যাণ একটু অবাক হল। ভাবল, মৃত্যুর তিথিটিথি হবে। সেদিন কল্যাণ আর গেল

না। বাড়ি এসে দেখল, তখনও রীনা ফেরেনি। মোটর নিয়ে কিংশুকদার বাড়ি গেল। গিয়ে শুনল কিংশুকদা দশটার আগে আসবে না। তখন গাড়ি গ্যারেজ করে বাড়ি এসে দেখে রীনা এসেছে। কতক্ষন? রীনা তখনও পোষাক ছাড়েনি। বলল—এই মাত্র।

সেদিন রীনা স্কুলে গিয়েই শুনতে পেল বিমলেন্দু প্রফেসরী পেয়ে উত্তরবঙ্গের একটা কলেজে চলে যাচ্ছে। এই মাসের সাতাশ তারিখে মাইনে ও ডি.এ. দিয়ে দেবে। সেক্রেটারী তিনদিন আগেই মাইনে ও ডি.এ. দিতে রাজি আছেন। তাছাড়া বাকী ক'দিন ছুটি নিলেও নিতে পারে বিমলেন্দু। আঠাশ তারিখেই যেতে পারে। রীনা বুঝল গতকালই বিমলেন্দু নিয়োগপত্র পেয়েছে। বিমলেন্দু এসে পড়ায় সকলে অভিনন্দন জানাল। স্কুলের যা ক্ষতি হচ্ছে—তা শোনাল। বিমলেন্দু গতকাল রাতেই সেক্রেটারীর সঙ্গে দেখা করে—তিনি খুশি হন—আশে পাশে পেলে না? —পেলাম আর কই? আমাকে পয়লা জয়েন করতে হবে—দুদিনের পথ। তাই সাতাশ তারিখে শেষ স্কুল করব। মাইনে আর এই মাসে তো গভর্নমেন্ট ডি.এটা এসে গেছে—এই দুটো যদি সাতাশ তারিখে দিয়ে দিতে নির্দেশ দেন —বাকি ক'টা দিন ক্যাজুয়েল লিভ হিসেবে। আমার পাওনাও আছে। বছরের পর বছর আমি নাম মাত্র ক্যাজুয়েল লীভ্ নিয়েছি কিনা। তুমি প্রফেসরি করতে যাচ্ছ—আমাদের একজন ষ্টাফ কলেজে যাচ্ছে—এতো আমাদের গর্বেরই বিষয়। ও সবের জন্য তুমি কিছু ভেব না—সইটা কোন তারিখে করবে তোমাদের প্রধান শিক্ষিকা ঠিক করে দেবেন। আসলে প্রধান শিক্ষিকা কবে সই করতে বলবেন—যদি এক তারিখের আগে মাইনে দেবার নিয়ম নয়। বিমলেন্দু বলল— তাহলে আমি অসুবিধের মধ্যে আপনাদের ফেলতে চাইনা। মাইনে আর ডি.এ. না নিয়েই আমি সাতাশ তারিখে চলে যাব। —ব্যাপারটা তা নয়, তোমার জায়গায় তো কাউকে এই মুহূর্তে পাচ্ছি না—তাছাড়া অঙ্কের আর কেউ নেইও। ঐ দু'জন বি.এস.সি আছে—ওরা অঙ্ক করতে চায় না। তা ক'দিন ওরাই চালিয়ে নেবে। ঠিক আছে—বলে তিনি দরখাস্তের ওপর নির্দেশ লিখে দিলেন। সেক্রেটারী মনে স্বস্তি ও দুঃখ একই সঙ্গে কাজ করছিল। সেদিনের মিস দত্তের কাহিনী সবিস্তারে প্রধানা শিক্ষিকার কাছে শুনেছিলাম। মিস দত্তের শুনে খারাপ লেগেছিল, বিমলেন্দু আর রীনার স্পর্ধায় তার পিত্তি জ্বলে উঠেছিল। একটা আধপেটা শিক্ষক—অত স্পর্ধা। আর ঐ বড়লোকের বৌটাকেও কিঞ্চিৎ শিক্ষা দেবার সুযোগ একদিন আসবেই। তবে মিসেস পালিতের সব গৌরবটুকু প্রধান শিক্ষিকা একা নিলেন। ছাত্রীরা সব বিমলেন্দু আর রীনার পক্ষে শুনে চিন্তিত হলেন। ভাবলেন, ভাল পড়ালে সাত খুন মাপ ছাত্রীদের কাছে। যাই হোক, মিটে গেছে—তার কাছে পর্যন্ত আসেনি এ জন্যে তার ক্ষমতায় আঘাতও লাগল। এই উপলক্ষে নিজেকে জাহির করবার একটা সুযোগ হাতছাড়া হওয়াতে তিনি প্রধান শিক্ষিকার ওপর ক্ষুন্নই হলেন। মিসেস পালিত সেক্রেটারীর বাড়ি যাতায়াত গরেন। তার কাছে সব শুনলেন। শুনে তিনি হেড মিস্ট্রেস ও মিসেস পালিত দু'জনের ওপরই বিরক্ত হলেন। এরা সব কর্তৃত্ব নিজের হাতে নিচ্ছেন। কিন্তু মিসেস পালিত এ.বি.টিয়ের পান্ডা। দরকার হলে স্কুল বন্ধ করে দিতে

পারেন। তাছাড়া মিস সোম, পালিত এরা সব একটা পার্টি। তিনি জানেন, বিমলেন্দু প্রচ্ছন্নভাবে বামপন্থী। স্কুলটা এই দল দিয়ে ভরাতে তার ঢের আপত্তি ছিল। যাই হোক, বিমলেন্দুকে চলে যেতে হল—এতে স্কুলের ক্ষতি হল বলে দুঃখিত হলেন, দুঃখিত হলেন নিজে চাকরি খেয়ে দিতে পারলেন না বলে, আনন্দ হল, বন্ধুর মেয়েকে নির্বিঘ্নে ঢোকাতে পারবেন বলে। মেয়েটা বামপন্থী নন। ওদের বাড়িটা কংগ্রেসী। বিমলেন্দুর টাকা পয়সা আটকাবার সুযোগ ছিল—কিন্তু এতে স্টাফেদের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দেবে। প্রধান শিক্ষিকা সব দোষ সেক্রেটারীর ঘাড়ে চাপিয়ে দেবে। মিসেস পালিত একটা ইস্যু পাবে। যাক, বিদায় দিক। স্টাফের রুমটা বৃন্দাবন হয়ে উঠেছিল। বিমলেন্দু রীনার কাছে এসে প্রথমে নিয়োগ পত্র দেখাল। তারপর ওর ত্যাগপত্রের ওপর সেক্রেটারী নির্দেশ দেখাল। রীনা নিয়োগ পত্র মিসেস পালিতের হাতে দিলেন—হাতে-হাতে ঘুরতে লাগল। আগেই অভিনন্দন সবাই জানিয়ে ছিল। মিসেস পালিত বললেন—যাক, শেষ গ্রীক বিদায় নিল। প্রফেসর হয়ে যাচ্ছে—ফেয়ার ওয়েলটা ভাল করতে হবে। আমি জানতাম, আপনি কলেজেই যাবেন। স্বর্গ হতে বিদায়, বলব না, আবার 'যেতে নাহি দেবও' না, বলব, সার্থক হোক আপনার অধ্যাপনা। বলব 'আমি বর দিনু, সর্ব দুঃখ ভুলে যাবে বিপুল গৌরবে।' বলেই প্রধান শিক্ষিকা আসা মাত্র তিনি বিমলেন্দুর কাগজপত্র ছিনিয়ে নিয়ে প্রধানা শিক্ষিকার ঘরে গেলেন। এবার বিমলেন্দু মুখ খুললেন—মিসেস পালিত বললেন, শেষ গ্রীক আমি—তা নয়, একজন গ্রীক স্কুলে থাকতেই হবে—সে দারোয়ান। ঐ পোষ্টটা মেয়েদের জন্য সংরক্ষণ করা হয়তো সম্ভব হবে না। আমাকে তাড়াবার আগেই আমি নিজেই চললাম। ওকে তাড়ানো সম্ভব নয়। সকলের মুখে বিষন্ন হাসি। সবারই মনে মনে ধারণা হয়েছিল— সেদিনের ঘটনার জন্যেই বিমলেন্দু এত তাড়াতাড়ি চলে গেল। বিমলেন্দুর ওপর সহানুভূতি সবারই ছিল—স্কুলের একটা বল ভরসা। কতবার একা দাঁড়িয়ে রুখে গোলমালের মোকাবিলা করেছে। মিসেস পালিতের উচ্ছ্বাস ওদের ভাল লাগছিল না। সবাই এ জন্যে রীনাকে মনে মনে দোষ দিতে লাগল। পুরুষ চাখা মেয়েছেলে। ওর জন্যেই বিমলেন্দুকে যেতে হচ্ছে এত তাড়াতাড়ি। মুখ পুড়িয়ে তুইও সঙ্গে যানা, বুঝি কত দরদ। স্বামীর খাবে—আর স্কুলে এসে আরও কুড়াবে।

রীনা স্থির, অচঞ্চল। বিমলেন্দুকে যেতে হবে জানত। এত তাড়াতাড়ি। বিমলেন্দুর মুখে কোনো আনন্দ বা উদ্বেগ ছিল না। শুধু বলল—সাতাশ তারিখে শেষ ক্লাস করব—আঠাশ তারিখে রওনা হয়ে উনত্রিশ তারিখ রাতে পৌছব। দু'দিন হাতে রাখলাম। ট্রেনে বিভ্রাট হতে পারে—লেট হতে পারে আনইউজাল। তারপর বাস্ এ অনেকটা পথ—তারপর নৌকায় বড় নদী পার হয়ে তবে আমার কর্মস্থল। সেক্রেটারী দু'দিন আগে মাইনে আর ডি.এ. দিতে ইতঃস্তত করছিলেন—বললাম, তা হলে আমি মাইনে ডি.এ. না নিয়েই চলে যাব। আমি টেম্পোরারী—অনেক শুনেছি, আমাকে যে কোনো সময়ে চলে যেতে হতে পারে। এই অপমানের ঝাড়ু মাথার ওপর নিয়ে এ ক'বছর কাজ করেছি। টেম্পোরারী বলে আমার ইনক্রিমেন্ট হয়নি। মহিলা স্কুলে, মহিলা শিক্ষিকাদের

মধ্যে হংস মধ্যে বকের মত থেকেছি। আপনারা জানেন না, অনেক গোপন লাঞ্ছনা আমাকে হজম করতে হয়েছে। বড় সংসার চালাতে হয়—একা আমার আয়ে। সেই সুবিধে অনেকেই নিতে চেয়েছেন। যাক, ছাত্রীদের শ্রদ্ধা ও ভালবাসা পেয়েছি, আর আপনাদের সহানুভূতি আমার মনে রইল। —আরও ক'দিন তো আছেন—ওখানে গিয়ে উঠছেন—ছাত্রদের হোস্টেলে।—আপাতত, তারপর নিজেই একটা বাসা নিয়ে হাত পুড়িয়ে খাব। কলেজে এত পরিয়েড নয়, অফডে আছে। স্কুলে অফ ডে থাকা উচিত—আর এত ক্লাস করলে কারও ইনটেলেকচুয়াল ওয়ার্ক করবার কোনো ক্ষমতা থাকে না। তাই মননের ক্ষমতা আমাদের মধ্যে জন্মায় না। এ নিয়ে কেউ ভাবে না। আর এত কম মাইনেতে রীনাদেবীদের হয়ত কসমেটিকস্ এ খরচও হয়না—আমাদের অহোরাত্র টিউশন করে বেড়াতে হয়—তা প্রাইভেট টিউশনও আর থাকবে না। নকলের যুগ আসছে। ওকে আটকানো যাবে না। আর নকল চালু হলে কে আর প্রাইভেটে পড়বে।

রীনা একমনে বিমলেন্দুর কথা শুনছিল। এককালে বিমলেন্দুকে নগণ্য, তুচ্ছ, যোগ্যতাহীন বলে ভেবেছিল। কিন্তু কিছু কালের মধ্যেই টের পেয়েছে, মানুষটি লোহার মতই শক্ত—আবার লোহার মধ্যে ব্যথাও লুকিয়ে আছে। চাকরি টিউশনির জন্যে ওর চিন্তার শেষ নেই—কিন্তু দরকার পড়লে দারুণ ঝুঁকি নিতে পারে। রীনা একদৃষ্টিতে বিমলেন্দুর দিকে তাকিয়ে ছিল। ঘন্টা পড়ল। মিসেস পালিত জানালেন—আপনার হয়ে সব পেপার আমি জমা দিয়ে দিয়েছি—বলেছি—সব দেনা-পাওনা যেন মিটিয়ে দেয়া হয় সাতাশ তারিখের মধ্যে। এই আপনার এপয়েন্টমেন্ট লেটারটা নিন। যত্ন করে রেখে দিন। আপনারা পুরুষরা যা আগোছাল। আমি অবশ্য পুরুষের পক্ষে। বোন কখনও ভাইয়ের বিরুদ্ধে যেতে পারে। আমার পড়াশুনায় বাধা এসেছে মেয়েদের মধ্য থেকে—সাহায্য পেয়েছি পুরুষদের মধ্য থেকে। চলুন, ক্লাসে যাওয়া যাক। বিমলেন্দুবাবু আপনি টিফিন পরিয়েডে আমাদের সঙ্গে দেখা করবেন। ফর্মাল কথাবার্তা। হ্যাঁ, বিমলেন্দুবাবুকে গ্র্যান্ড ফেয়ারওয়েল দিতে হবে। রীনা তোমাকে এ ভার নিতে হবে। তুমি স্ক্রিপ্ট করে দেবে। রীনা কিছু না বলে ক্লাসে চলে গেল। শেষ পিরিয়ডে বিমলেন্দু এসে দেখল, রীনা চলে গেছে। প্রধানা শিক্ষিকা রীনাকে ফেয়ারওয়েলের চার্জ নিতে বলায়—রীনা বলেছে—দেখুন, বিমলেন্দুবাবু ও আমাকে নিয়ে একটা স্ক্যান্ডাল তৈরি করবার চেষ্টা হয়েছে—তাই এবার এ ভার আমি নিতে চাইছিনা। অন্য কাউকে দিন। আমি নিলে অনেক কথা উঠবে। —উনি তো চলেই যাচ্ছেন—কি কথা উঠবে। —আমার মন চাইছে না। সেদিনের ব্যাপারের পর ভিতরটা কেমন তেতো হয়ে গেছে। —আর কাকে দেব? তুমি গান করবে তো?—দেখি। প্রধান শিক্ষিকার রীনার প্রকৃত মনোভাব আঁচ করতে অসুবিধে হল না। তিনি বললেন—ঠিক আছে, ভেবে দেখ। শেষ পিরিয়ডে রীনা একটু পড়িয়ে ছেড়ে দিয়ে চলে গেল। বিমলেন্দু এসে না পেয়ে চুপ করে বসে রইল। এমন বড় হয় না। জীবনে যে ভালবাসা কল্পনাতীত ছিল—তাই এল এ বয়সে।

এমন নারী ওর মধ্যে কী দেখল! কী কষ্ট পাচ্ছে মেয়েটা। এদিকে টিউশনগুলোর একটা বিলি ব্যবস্থা করতে হবে। চলে যাবে শুনলে মাইনে দেবে কিনা। মাইনের টাকা সংসারে দিতে হবে। শুধু ডি.এ. একান্ন বাহান্ন টাকায় ভরসা করে এতদূর যাওয়া। আজ ক্লাসে ক্লাসে ছাত্রীদের বিষন্ন মুখ। একটা শোকের ছায়া সমস্ত স্কুলে। বিমলেন্দুর পাঁচটায় টিউশনি শুরু। এখন না গেলে—তবু, রীনার বাড়ির দিকে রওনা হল। কলিং বেল টিপতেই রীনা এল—চোখ মুখ কান্নায় ফুলে উঠেছে। হাত ধরে ঘরে নিয়ে জড়িয়ে ধরে চুমুতে চুমুতে ওকে পাগল করে রীনা অবুঝের মত বলতে থাকে, তুমি যেওনা—তুমি যাবে না—আমি কি করে বাঁচব। ঘন্টাখানেক দেড়েক পর চা খাবার খেয়ে বিমলেন্দু বের হয়ে এল—এর আগে চারদিন সারা দুপুর কাটিয়ে গেছে—আজই সব থেকে কম সময় থাকল। বিমলেন্দুর ভয় হতে থাকে রীনা কিছু করে বসে। এত প্যাসেন থাকে মেয়েদের মধ্যে। অথচ ওর সঙ্গে কোন স্থায়ী বন্দোবস্ত হতে পারে না। এ সব বললে রীনা জানায়, এ সব আমি জানি না—এসব বল না— তুমি গেলে আমি কি নিয়ে থাকব। রীনা যেন এক অবুঝ বালিকায় নেমে গেছে।

পরদিন স্কুলে রীনা এল না। কিন্তু সেদিন বিমলেন্দুও এল না। ওর এখন টাকার দরকার। প্রাইভেট ছাত্রগুলোর কাছ থেকে আদায় পত্তর রয়েছে। একটা উদ্বেগে দিন কাটল।

পরদিন স্কুলে বিমলেন্দুর সঙ্গে কোনো কথাই বলল না। শুধু যাবার সময় বলল—বিকেলটা আমাকে দাও। তুমি একটা টাকা নিয়ে যেতে পারবে। অতদূর দেশে পঞ্চাশ টাকা! টিকিট থেকে খাওয়া—একমাসের মত খরচ হাতে না নিয়ে! এই নাও দু'শ টাকা। আপত্তি করবে না—ফেরত দেবার কথা বললে আজ থেকে আমি কথা বন্ধ করে দেব।

—যদি কোনো দিন ফেরত দেবার সঙ্গতি আসে—তখনও?

—না।

—ঠিক মত পৌছালে কিনা—জানব কি করে। চিঠি দিও না।

—আচ্ছা। তোমাকে ট্র্যাঙ্ককল করতে পারি—কখন সুবিধে হয় শনি আর রবিবার ছাড়া—সবদিন সাড়ে পাঁচটা থেকে সাড়ে ছ'টা।

মাথা নাড়ে বিমলেন্দু—শুধু ভালবাসা নয়—এমন করে ওর জন্যে জীবনে কেউ ভাবেনি। সকলেই ওর টাকার অপেক্ষা করে। আর মেয়েটি নারীর যা দেবার সব দিয়েছে—দিয়েছে ঝুঁকি নিয়ে। ওর মত হিতকাঙ্ক্ষী কেউ আর হয় না। লেকচারারশিপ, প্রেম সব এত দেরিতে এল। প্রেম ও প্রতিষ্ঠা। আজ ওর না গিয়ে উপায় নেই। যেতে ওর ইচ্ছে করে না। রীনাকে দেখবার বাসনা দিয়ে কতকাল স্কুলে গেছে। আজ ওর সৌন্দর্য মাধুর্য বাদ দিয়ে প্রতিষ্ঠা। রীনাকে তার ঐশ্বর্য থেকে ছিনিয়ে এনে নিজের করে রাখবার সাহস ওর নেই—প্রেম ও জীবনকে এতটা বিশ্বাস এই বয়সে বিমলেন্দু করতে পারে না।

—আর একটা জিনিস চাইব—?

—আমার ফটোতো? তা দেব না। ফটো দিয়ে আমাকে ভুলতে তোমাকে দেব না। ফটো না দেখে আমাকে ভুলে যেও—সইবে। কি করে সইবে জানি না। ফটো দেব না।

—আমি যে কি নিরুপায় হয়ে যাচ্ছি—আমি—

—জানি, জানি, জানি। যে ক'দিন পার বিকেলটা আমাকে দিও। তারপর রীনা রোজ বিকেলে বিমলেন্দুকে নিয়ে আসত। প্রায় সাতটার কাছাকাছি বিদায় নিলে, ক্লান্ত রীনা বিদায় নেয়।

ফেয়ারওয়েলের দিন রীনা আসেনি। কিন্তু ঠিক ষ্টেশনে হাজির হয়েছে। ওর ভাই ওকে পৌছে দিতে এসেছিল। রীনা একটা বাক্স ওকে দিল। কী আছে ওতে? আর এক গোছা রজনী গন্ধা।

— প্রেসার কুকার। আর টুকিটাকী।

পরে বিমলেন্দু দেখেছিল—প্রেসার কুকারের গর্ভের মধ্যে রীনার বিয়ের আগে তোলা একটি ছবি। একটা এনভেলপের মধ্যে।

ঐ এক প্ল্যাটফর্ম ও এক কামরা লোকের মধ্যে রীনা বিমলেন্দুর হাত ধরে ছিল সব সময় । সে দিন বাড়িতে ঢুকে বহুবার আত্মহত্যার চিন্তা করেছে। কিন্তু যদি গর্ভবতী হয়ে থাকে— সম্ভবত তাই হয়েছে—পিরিয়ড তো হল না। রীনা যেন জীবনকে খাতির করা ছেড়ে দিল। আজ ওর কোনো আনন্দ নেই—আশা নেই—শুধু সংসার টেনে নেয়া। রীনার আরো একটা লজ্জা আছে যা রীনা স্বীকার করতে চায় না। স্কুলের কাছে রীনার প্রেমকে তুচ্ছ করে বিমলেন্দু চলে গেল—রীনার আকর্ষণ বিমলেন্দুর যাওয়াকে আটকাতে পারল না—এই লজ্জাও ছিল। কিন্তু রীনা সেই ভাবনাকে গ্রাহ্য করল না। চাকরি ছেড়ে দেবে—কিন্তু সারাদিন বিমলেন্দুকে নিয়ে কাঁদার হাত থেকে বাঁচাও দরকার। স্কুলে তবু কিছুক্ষণ সময় কাটে। চাকরি ছাড়া চলবে না। নিজেকে কি ভাবে ভুলে থাকা যায়? কি ভাবে বিমলেন্দুকে ভুলে থাকা যায়? এমন মন্ত্র কেউ জানে? যদি জানে তবে তা সে বলে না কেন? কল্যাণ কে আমার? ওই সামাজিক সম্পর্ক চিরকাল বইতে হবে? নিজেকে ভুলে থাকার মন্ত্র? যদি একেবারে সব কিছু ভুলে যেতে পারে—টোটাল এমনেশিয়া। ....সেদিন রাতে স্বপ্ন দেখল কল্যাণের নতুন কেনা মোটরে ওকে নিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু পাশে কল্যাণ কেন? বিমলেন্দু নয় কেন? ওকে তো দু'শ টাকা দিয়েছে। হঠাৎ তাকিয়ে দেখল, কল্যাণ নেই, বিমলেন্দুও নেই। চালকহীন মোটর গাড়ি উত্তরবঙ্গে চলেছে। কিন্তু নদীর পারে তো মোটরের ব্রেক কষতে হবে। কিন্তু মোটরসহ রীনা নদীর ওপর পড়ল। কিন্তু কি আশ্চর্য, মোটর নদী নয়—সমুদ্রে পড়েছে---যার কোনো কিনারা নেই—সীমা নেই—একলা মোটরে এই সমুদ্রে রীনা কোথায় চলেছে? রীনা জানে কেউ কোথাও নেই —চিৎকার করা বৃথা—তবু চিৎকার করতে গিয়ে দেখল, গলা দিয়ে স্বর বের হচ্ছে না—দূরে সমুদ্রে একটা প্রেসার কুকার খালি খালি ভেসে যাচ্ছে। তা হলে কি বিমলেন্দু মরে গেছে। একটা প্রবল কান্নার ঝোঁকে ঘুম ভেঙে গেল। তখনও অনেক রাত। শুয়ে শুয়ে প্ল্যাটফর্মে দাঁড়ানো বিমলেন্দুকে

ভাবতে লাগল। এই শেষ রাতটুকু বিমলেন্দুর জন্য থাকুক। কি করছে এখন? টেনে ঘুমুচ্ছে? না, জানলা দিয়ে আকাশের তারা দেখছে? ওর কথা ভাবছে? কি ভাবছে?

প্রায়ই হোটেলে দু'ঘন্টা করে মিলনের ফলে কল্যাণ ও রমার মধ্যে একটা ক্লান্তি এসেছে, তা ওরা স্বীকার করতে রাজি নয়। মিলনের ঘোর যে জোর করে ধরে রাখছে —তা মানতে নারাজ। রমা সাতটায় মধ্যে বাড়ি ফেরে। কল্যাণ পৌঁছে দেয়। তা যে পাড়ার লোকেরা লক্ষ্য করেছে—তা রমা জানে। একটি সুন্দর ভদ্রলোক যে ওকে নামিয়ে দিয়ে যায়—রমা এতে একটা আত্মপ্রসাদ বোধ করে। গর্বও বোধ করে। অফিসের অনেকে লক্ষ্য করেছে—তাও জানে। আর এই মিলনের ফলেই যে ওর মনোযোগ দিয়ে পড়াশুনা করতে পারে—তা ও জানতে পারেনি। রিটিন পরীক্ষা দেবার পর মাঝে মধ্যে একটা কথা রমাকে পীড়া দেয়। কল্যাণকে চিরকালের জন্য পাওয়া সম্ভব নয়। হয়তো কল্যাণের আকর্ষণ একদিন কমতে শুরু করবে—তখন রমার কল্যাণের রুটিন-মোহ থেকে আগেই যেন রমা সরে আসতে পারে। কল্যাণকে পাবে না—এ চিন্তা প্রতিটি মিলনের সময় রমাকে মনে করতে হয়েছে। তাই জীবনের প্রতিটি চুমোকেই প্রথম ও শেষ চুমো মনে করেছে। রমা জানে, চিরকালের জন্য কল্যাণকে ধরে রাখবার মত দৈহিক সম্পদ ওর নেই। ওর মধ্যে কল্যাণ যা অনুভব করে তা রমার অভিনবত্ব। এমন অস্ফুট ভাবনা চাপা থাকলেও তার অস্তিত্ব একটা না একটা মহূর্তে রমা অনুভব করেছে। বলিষ্ঠ, সুন্দর কল্যাণের মোহ ওকে আচ্ছন্ন করলেও—ওই আচ্ছন্ন অবস্থার মধ্যে রমা একটা ভাবী বিচ্ছেদের ভাবনা না ভেবে পারত না। রমার অসুবিধে হচ্ছে কাঁদতে হলে বাড়িতে কাঁদতে হয়। আর বাবার নাম করে কল্যাণের জন্যে কাঁদতে ওর রুচি হয় না। অনেকবার ভেবেছে, যেদিন কল্যাণ চলে যাবে—সেদিনের কান্না আজ কাঁদব কেন? সেদিনের জন্যে আগাম মন খারাপ করে রাখব কেন? আজকের মুহূর্তকে পূর্ণ ভাবে নিয়েইনি না কেন? সম্পূর্ণ চুমুক দিয়ে সব আস্বাদ গ্রহন করি না কেন? রমা জানে, সারা জীবন নিরানন্দ থেকে রমা আনন্দকে বিশ্বাস করতে পারে না—সুখকে সন্দেহের চোখে দেখে। যেমন মা প্রতি মুহূর্তে রমার চাকরি যাবার জন্য উৎকণ্ঠিত হয়ে থাকেন—তা যে আগের দারিদ্রও ফিরে আসবার ভয় শুধু নয়, আজকের নিশ্চিন্ততাকে অবিশ্বাসও নয়—নিজেকে উদ্বিগ্ন রাখা, উৎকণ্ঠিত রেখে কষ্ট দেয়া অভ্যাস হয়ে গেছে। বেশি দুঃখে থাকলে বোধ হয় মানুষ আত্মপীড়ক হয়ে ওঠে। একটা গোপন আত্মপীড়ন রমার মধ্যে পূর্ণ মিলনের মধ্যেও লুকিয়ে থাকত। অন্তত রমার তাই সন্দেহ। তাছাড়া আকর্ষণ ভেতরে ভেতের শিথিল হতে আরম্ভ করেছে বলেই যে এই ভাবনাগুলো দেখা দিচ্ছে—তা অবশ্য রমা ও কল্যাণ স্বীকার করতে চায় না।

একদিন হোটেলে রমা বলল—আমাদের মিলনও রুটিন হতে আরম্ভ করেনি তো?

—রোজ রোজ ভোরের স্নিগ্ধ আলো কখনও পুরোনো হয়?

—ভোরের আলোর ভবিষ্যৎ আছে—তার সামনে দুপুর বিকেলের সারা জীবন পড়ে আছে।

ইঙ্গিতটা কল্যাণের বুঝতে অসুবিধে হয়নি। তবু বলল—দুপুর আসতে এখনও অনেক বাকি—দুপুর এলে দুপুরের মুখোমুখী হব। আর দুপুর যে ভোরের থেকে বিচ্ছিন্ন নয়—রূপান্তর মাত্র—এ কথা ভাবলে দুশ্চিন্তা থাকে না।

—এ কথা ভাবতে পারার মত সাহস আমার নেই।

—তোমার যদি সাহস না থাকে—আমার একার সাহসে দু'জনের কাজ হয়ে যাবে। ভরসাটা নির্ভেজাল কর—ভরসা থেকে ভয়টাকে বাদ দাও। আসলে তুমি ভয়কে বড্ড আপন করে পেয়েছ। এবার ভরসাকে আপন করে নাও। রমা চুপ করে কল্যাণের বুকে মাথা রাখে।

কল্যাণ মাঝে মধ্যে অনুভব করে, প্রায়ই সাড়ে চারটায় বেরিয়ে আসা ঠিক হচ্ছে না। ফাইল পড়ে থাকছে। অথচ রমার টাইমটা বদলান যায় না। ওর মা আবার বাবার ভূত সাতটার পর দেখতে পাবার ভয়ে অস্থির। হঠাৎ যদি এত বছরের প্রিয় স্বামী আবার দেখা দেন। যদি বলেন, চল, তোমাকে আবার ইলোপ করে পরলোকে নিয়ে যাই। মৃত্যুর সময় স্বামীর মুখে সেই প্রথম প্রেমের আলো দেখেছেন—এখন যদি প্রথম প্রেমের সেই পালিয়ে যাবার অফার রিভিউ করেন। রমার সুরে কিসের প্রত্যাশা। রমা কি কোনো স্থায়ী আশ্বাস চায়? এই মুহূর্তগুলোকে কি আরো কিছুকাল ধরে রাখা যায় না? এই যে সংস্কারের বন্ধনহীন শুধু মিলন—উৎকণ্ঠা, উদ্বেগ, দায়িত্ব সব থেকে আলাদা করে এই মিলন—এর সৌন্দর্য তো নরনারীর সবচেয়ে কাম্য হওয়া উচিত। সংসারের ও দাম্পত্য জীবন তো রমা দেখেছে। ওর কি সংসারকে ভয় নেই। এই সংসার বন্ধনহীন মিলন—এই সমাজ সংসারের ভ্রুকুটিহীন অবাধ মিলন—একে যতদূর পারা যায় টিকিয়ে রাখতে দোষ কি?

—আচ্ছা রমা, সংসার, সমাজ থেকে থেকে তুলে এই যে আমাদের হাল্কা ও গভীর মিলন—যতদূর পারা যায় একে স্থায়ী করা যায় না? যতদিন?

রমা বুঝতে পারে, বলে, চলো চেষ্টা করে দেখি—যতদিন তুমি পারবে ততদিনই আমার ভাগ্য। প্রেম আর স্বাধীনতা একসঙ্গে। বেশ তো? সেদিন এ পর্যন্তই।

সেদিন রমা বুঝেছিল, ওদের ভালবাসা একটা সীমা দেখতে পাচ্ছে—এখনও সীমা আসেনি—তবে দেখা যাচ্ছে।

দু'জনেই নিজেদের ভোলাবার চেষ্টা করছে—নিজেকে, নিজেদের কাছে গোপন করছে। নিজের কাছে ধরা পড়তে ভয় পাচ্ছে। একটা শিথিল আকর্ষণকে নিবিড় ভেবে তার আড়ালে দু'জনেই লুকিয়ে রইল।

তারপর একদিন রমা বোম্বে থেকে ইন্টারভিউ লেটার পেল। ভটচাজদা ভেতর থেকে খবর নিয়ে এল রিটিনে তুই ফার্স্ট হয়েছিস। তারপর ভটচাজদাই টিকিট করে জানিয়ে দিল—তুই বলবি, একমাসের মধ্যে জয়েন করতে পারব। রমা জানাল, তিনমাসের নোটিশ না দিলে এরা রিলিজ অর্ডার দেবে কেন? — সে আমি দেখব খন। একটা স্পেশাল অর্ডার করিয়ে নেব। সে তুই ভাবিস না। তবে টপ সিক্রেট। যাওয়া ও আসা।

ভট্টচাজদা বার্থ রিজার্ভ করে টিকিট করে দিল। বোম্বের ভি.টি. স্টেশনের সামনেই একটা হোটেলের নাম বলল, ওটা বাঙালীর হোটেল। ইন্টারভিউ দিয়ে পরদিন রওনা হবি। থাকার জায়গা নিয়ে ওরা গন্ডোগোল করবে না। ওরা জানে, বোম্বেতে থাকার জায়গা পাওয়া কঠিন। ওদের দাদারে কোয়ার্টার্স আছে। যাতায়াত করবি—তখন বন্দোবস্ত ভাল। আর বাস্ এ উঠে অবাক হয়ে যাবি—বসবার সিট না থাকলে ওরা নেয় না।

—আচ্ছা, অনেকে তিনমাসের লিভ উইদাউট পে ছুটি নিয়ে জয়েন করে—পরে, রেসিগনেসন পাঠিয়ে দেয়।

—ওরা বোকা মেয়ে, ওখানে যাবি—সঙ্গে মা যাবে—খরচপত্তর আছে না। তোর প্রভিডেন্ট ফান্ড তুলতে হবে। বোনাসের টাকা তুলতে হবে। জিনিসপত্তর পাঠাতে হবে। একমাসের মত রেস্ত সবসময় হাতে জমা রাখতে হয়—এদিকে বাবার শ্রাদ্ধে তো ফতুর হয়েছিস।

মা ব্যাপারটা জানতেন। দিন কয়েকের ছুটি নিয়ে রমা বোম্বে ভায়া নাগপুর এক্সপ্রেসে রওনা হল। কল্যাণের কাছে কিছু বলল না। কল্যাণ বলল—তুমি ক'দিন আমাকে এত সময় দিচ্ছ কেন? একটু ব্যস্ত মনে হচ্ছে?

—বলব তোমাকে।

—এখন নয় কেন?

—ভোরের জন্য একটা বিশেষ রাগ আছে তো?

—হ্যাঁ, ভৈরব বা ভৈরব। তুমি তোমার মুখে চোখে একটা পূরবীর প্রচ্ছন্ন বিষন্নতা।

—আমি শুনেছি, সন্ধ্যায় আমার জন্ম। পূরবী দিয়েই আমার জীবন শুরু—এত পথ পেরিয়ে তোমার মধ্যে ভোরের রাগিণীর স্বাদ পেলাম—এ আমার অমূল্য সম্পদ।

হঠাৎ কিছু বুঝবার আগেই রমা কল্যানের কোলের ওপর উপুড় হয়ে পড়ে অনেকক্ষণ কাঁদল। মাঝে মাঝে কান্নার বেগে ওর শরীর কেঁপে কেঁপে উঠছিল। কল্যাণ মাথায় হাত দিয়ে বলে—আর কাঁদে না, এই রমা, আর নয়। ওর কান্না কল্যাণের মধ্যেও সঞ্চারিত হয়—একটা সহানুভূতিতে ওর অন্তর ভরে যায়।

এক সময় রমার কান্না থামে। বেসিনে চোখে মুখে জল দিয়ে বলে, চলো।

কল্যাণ উঠে দাঁড়ায়। ফিরতে ফিরতে রমা ভাবে, যাবে না বোম্বে। টিকিট ফিরিয়ে দেবে। যতদিন টেকে টিকুক্—তা বলে কল্যাণ ছাড়া আমি ভাবতে পারি না।

অবশ্য পরদিন আবার যাবার জন্যে প্রস্তুত হয়। সন্ধ্যায় ট্রেন। অফিস থেকে দেড়টার মধ্যে ফিরে আসে। ভটচাজদা হাওড়ায় থাকবেন। মা চুপ করে দেখছিলেন। যাবার সময় প্রণাম করতেই মা শুষ্ক মুখে বললেন—ফিরবি তো? দেখ, আমি আমার বাবা-মা'র মত নই। তুমি যদি অন্যায়ও করিস—আমাকে ছেড়ে যাস না। ফিরে আসিস্। আমি সব দোষ ক্ষমা করতে পারি।

—মা, আমি যাচ্ছি একটা বড় চাকরির জন্যে। চারদিনের মধ্যেই ফিরব। হয়তো পাঁচদিন হবে। কল্যাণ হয়তো আসবে, বলবে, চাকরির ইন্টারভিউ দিতে বোম্বে গেছে।

ভটচাজদার নামও করবে না।

ট্রেনের কামরায় বসে ভটচাজদাকে বললেন, মা ভাবছেন, আমি কল্যাণের সঙ্গে পালাচ্ছি।

—তোর মাকে আমি ম্যানেজ করে দেব।

—মাকে অবশ্য বলেছি, কল্যাণ এলে বোম্বে ইন্টারভিউ দিতে যাবার কথা বলতে।

—এখন জানলে ক্ষতি নেই।

থ্রি টায়ারের উপরের ব্যাংকে একটি ছেলেও ইন্টারভিউ দিতে যাচ্ছে ও.এন.জি.সি.তে। ওর ইন্টারভিউও একটায়—রমারও।

ভটচাজদা বললেন, ভালো সঙ্গী পেলি। ছেলেটি জিওলজিতে ফাস্ট ক্লাস। খুব স্বাস্থ্যবান। প্রবল যৌবনের সারল্য ও কৌতূহল চোখে মুখে। ট্রেন ছেড়ে দিল। আজ কিছু না বলে চলে এসেছি। ফোনে জেনে যাবে আমি চলে গেছি। অভিমানে আজ আর বাড়িতে যাবে না। সত্যি, অফিসে, পাড়ায় সবাই জেনে গেছে ওদের সম্পর্ক। ওর স্ত্রী কি কিছু বোঝেনি।

বোম্বে পৌছে দু'জনে এক হোটেলে উঠল। তারপর স্নান করে তক্ষুনি কিছু খেয়ে ওরা ইন্টারভিউ-এর জন্য যে যার জায়গায় পৌছে গেল।

ন'জন ইন্টারভিউ বোর্ডে। মাত্র জনা দশেক ইন্টারভিউতে ডেকেছে। প্রথমেই রমার ডাক পড়ল। বোম্বে পৌছে ওর বার বার মনে হচ্ছিল, ভটচাজদা চক্রান্ত করে কল্যাণের সঙ্গে আমার বিচ্ছেদ ঘটাচ্ছে। ইন্টারভিউ ভেস্তে দেব। না যেন সিলেক্ট হই।

প্রায় আধ ঘন্টা ইন্টারভিউ হল। ইন্টারভিউ বোর্ডে ঢুকতেই ওর মনে হল—চ্যালেঞ্জ হারলে চলবে না। তারপর চাকরি করি বা না করি আমার ইচ্ছে। নানা রকম প্রশ্ন। নানা দিক থেকে। এতদিন অফিসে থেকে অফিসের কাজ কর্ম সম্পর্কে একটা ধারণা ছিল। সুতরাং ধীর স্থির ভাবে সুললিত ইংরেজিতে প্রায় প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর দিল। বিভিন্ন সিচুয়েশনের কথা বলে—রমা কি ভাবে ট্যাকল করবে—জানতে চাইল। ভারতবর্ষের অফিসের সব চেয়ে প্রয়োজন কি? রমা বলল, আমাদের দেশে বেকার সমস্যা বেশি বলে অফিসে লোক বেশি। ফলে কাজ হতে দেরি হয়—আমরা সময় নষ্ট করি। ওয়ার্ককালচার বাড়ানো—একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কাজটা শেষ করা, একটা সুখী সম্পর্ক উপর থেকে নিচু পর্যন্ত। শাসন নয়, সহযোগিতা। শেষ প্রশ্ন—তুমি কি কমিউনিষ্ট? —না। কমিউনিষ্ট ভাবধারায় বিশ্বাস কর? কমিউনিজম সম্পর্কে আমার ধারণা খুব ভাসা ভাসা। তারপর ওকে বলল—এই স্লিপটা নিয়ে পাশের ক্লিনিকে তোমার হেলথ চেকআপ হবে—চোখ, রক্ত ও লাংসের এক্সরে হবে। রিপোর্টটা ওরা পাঠিয়ে দেবে। তুমি যদি অ্যাপয়েন্টমেন্ট পাও—কতদিন নোটিশ লাগবে? —এক মাস। ঠিক আছে। আর থাকবার জায়গা বলছ নেই। দাদারে আমাদের কোয়াটার্স আছে। তবে অফিসার্স কোয়াটার এখন খালি নেই। যিনি রিটায়ার করবেন ছ'মাস পরে—তখন তা খালি হবে। আপাততঃ টু-রুম ফ্ল্যাট—কেরানিদের জন্য তুমি পাবে। তাতে তোমার মর্যাদায় লাগবে নাতো। রমা জানাল—না।

বেরিয়ে আসতেই এক অবাঙালী কেরানি ওকে ধরে নিয়ে যাতায়াতের ভাড়া—ফার্স্ট ক্লাসের দিয়ে দিল। এ ইংরেজি ফার্ম নয়—এক পিঠের ভাড়া দেয়—এরা দু'পিঠের ভাড়াই দেয়। ভদ্রলোকের সঙ্গে ভিতরে গিয়ে যতটুকু দেখা যায় দেয়—প্রত্যেকের আলাদা আলাদা ঘর। কাঁচের পার্টিসন। সব চুপচাপ। কোথাও কোন গন্ডোগোল নেই।

স্বাস্থ্য পরীক্ষার শেষ হতে তিনটে বাজল। মা'র জন্য, কল্যাণের জন্য একটু কেনাকাটা করে হোটেলে এসে শুনল, ছটার সময় এলাহাবাদ হয়ে হাওড়া মেনের ফাস্টক্লাসের টিকিট পাওয়া যাবে। ছেলেটির জন্য অপেক্ষা না করে হোটেলের চার্জ মিটিয়ে—বোম্বে এলাহাবাদের ফাস্টক্লাসে একটা নিচের বার্থ পেল। এক দম্পতি যাচ্ছেন কলকাতা। একজন প্রফেসর জব্বলপুর। রাতের খাবার খেয়ে যাত্রীদের সঙ্গে আলাপ করে সোজা ঘুম দিল—বড্ড ক্লান্ত—সারাজীবনে মাকে দেখিনি দুদিন। মা'র জন্যে, কল্যাণের জন্য মন ব্যাকুল। যতটুকু বোম্বে দেখেছে কলকাতার সঙ্গে তুলনাই হয়না। এ যেন বিদেশের কোন শহর।

সেদিন হাওড়া থেকে ফিরে আর ভটচাজদা রমার মা'র সঙ্গে দেখা করতে পারল না। পরদিন সকালে এসে জানিয়ে গেল —আমি নিজে ওকে ট্রেনে তুলে দিয়ে এসেছি। আসলে ওর বোম্বের চাকরি সম্মানের, মাইনেও অনেক। ওখানে অফিসার হয়ে যাবে—যদি হয় আর হবেই। আসলে মাসীমা জানেন—সুযোগ এসে গেল—তাই হাতছাড়া করতে চাইলাম না। আর কলকাতাতেও ওকে বড় অফিসে—এমনকি এই অফিসেই অফিসার করে দিতে পারতাম। ওর মত যোগ্যতা একটা মেয়েরও এখানেই নেই।

—তাই কেন করলে না, বাবা।

—ঐ কল্যাণের জন্যে। নিরীহ মেয়ে পেয়ে খেলিয়ে বেড়াচ্ছে। ওর হাত থেকে রক্ষা করবার জন্যই কলকাতার বাইরে রমাকে পাঠালাম। বড় অফিস, মাইনে বড়। কোয়ার্টার পাবে। কল্যাণের হাত থেকে বাঁচবে। ওদিকে বাড়িতে সুন্দরী স্ত্রী রয়েছে। আর অফিসে রমাকে তাতাবার তালে আছে।

মা বললেন—কল্যাণকে একটা মার দিতে পার না। ছ'মাস বিছানায় শুয়ে থাকুক।

—তা কি আর ভাবিনি—আমার হাতে লোকও আছে। কিন্তু আপনার মেয়েই রোজ কল্যাণের বাড়ি যাবে। আর অফিসে জানাজানি হলে কল্যাণের দলে উপরওয়ালারা—কল্যাণের কিছু হবে না। কল্যাণের বৌ অফিসকে জানালে—কি মামলা করলে—রমার চাকরি নিয়ে টানাটানি। তবে ভাববেন না—আমরাও রমার দলে আছি।

রমার মা চুপ করে শোনেন। তারপর ভটচাজ বিদায় নিলে মা ভাবেন—এই ভটচাজ লোকটা কল্যাণের লোক নয়তো।

কল্যাণ দুদিন পরপর রমাকে না দেখে অধীর হয়ে শেষে রমার বাড়িতে এল।

মা শান্ত ভাবেই বললেন—কেন তুমি জান না, রমা ইন্টারভিউ দিতে বোম্বে গেছে।

—কিসের ইন্টারভিউ?

—চাকরি।

কল্যাণ চলে আসে।

রমা কি বাড়ি থেকে না বলে দিল মাকে দিয়ে। কিন্তু ওর জন্যে অফিস কামাই করবার মেয়ে রমা নয়। কাজে কখনও ফাঁকি দেয় না। চাকরির ব্যাপারে খুব সাবধান। অত্যন্ত চাকরি-মনস্ক। আমাকে এড়াতে বোম্বে? আমার স্পর্শ দোষ এড়াতে নিজেকে নির্বাসন। কল্যাণ বাইরে যত হতাশ বলে মনে করল—ভেতর ঠিক ততটা হতাশ হল না—একটা আশাভঙ্গের বেদনা শুধু বোধ করল।

রমাকে দেখে ওর মার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। এ ক'দিন বিকাশ এসে রাতে শুয়েছে। বিকাশ সন্ধ্যায় এসে বসে পড়াশুনা করত। লিফলেট লিখত। কখনও দু'জন বন্ধুর সঙ্গে বসে আলোচনা তর্ক করত। রাতে খেয়ে এসে শুয়ে পড়ত। সকালে রমার মা'র হাতে চা পরোটা খেতে বিদায় নিত। —গাড়ি মগরা এসে দাঁড়িয়ে পড়ল। এলাহাবাদ হয়ে এলাম। সকালে পৌঁছে ইন্টারভিউ দিয়ে—বিকেলেই রওনা দিয়েছি। কী সুন্দর শহর মা—একটু খানিইতো দেখলাম। রমাকে দেখে বল ভরসা পেলেন। তারপর আলোয়ান মানা দেখে খুব খুসি হলেন—তুই-ই যা দিলি, খুলি। নিজের শাড়িটা দেখাল।

—ওরা ফার্স্ট ক্লাসের যাতায়াতের ভাড়া দিয়েছে। চাকরি হবে কিনা বলতে পারি না—তবে হাবভাব দেখে মনে হয়, নেবে।

দু'দিন বেজায় ঘুমিয়েছি। নিরামিষ খেয়েছি—তবে তোমার মত ধোঁকা তৈরি করতে পারে না।

মা অনেকটা নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন কল্যাণের অবাক হওয়া দেখে। তিনি ভেবেছিলেন—হয়তো কল্যাণকে বিয়ে করেই চলে আসবে। দোজবরে নিজের মেয়েকে! তিনি ডুকরে কেঁদে উঠেন। কিম্বা আসবেই না। কিন্তু সিঁথিতে সিঁদুর না দেখে, হাতে শাখা না দেখে তিনি আশ্বস্ত হন। যাক, তাহলে সত্যি ইন্টারভিউ দিতেই গিয়েছিল। বোম্বাই—কী জানি কেমন। তার মনও একটা পরিবর্তন চাচ্ছিল। কিন্তু এ বাড়ি ছাড়তে তিনি চান না।

—মা জীবনে এই প্রথম একা বের হলাম। জীবনে এই প্রথম তোমাকে ছেড়ে চারদিন থাকলাম।

মা'র চোখে জল এসে গেল। মনে পড়ল নিজের মা'র কথা। বছর প্রায় ত্রিশ বছর। আছে কি নেই কে জানে। সেই বাপের বাড়ি—এখান থেকে এমন কিছু দূরে নয়। সেই রাস্তা—বাড়ির নাম 'প্রসাদ'। ওরা হৃদয়হীন। জানত নাকি? নিশ্চয়ই জানত? মা'র মন—ওর মার মন ওকে ত্যাগ করে—হয়তো দু'দিন চোখের জল ফেলেছি। তাও ফেলেছি কিনা কে জানে? অপমান—রাগই ওদের সব।

পরদিন অফিসে কল্যাণের সঙ্গে সৃষ্টি বিনিময়ে বুঝল, কল্যাণ অভিমান-ক্ষুব্ধ। ভটচাজদা বললেন, খবর বল।

শুনে বললেন, হেলথ একসামিনেশন মানে তোকে সিলেক্ট করেছে। না হলে স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্যে পয়সা খরচ করতে যাবে কেন? তুই গোছগাছ শুরু করে দে—এপয়েন্টমেন্ট এল বলে। তারপর লাথি মেরে চলে যা—।

চারটার সময় কল্যাণকে ফোন করে বলল—কখন দেখা পাব?

—আজ পাঁচটা হবে।

—তুমি যতক্ষণ না আসবে—ততক্ষণ অপেক্ষা করব।

—তোমার দয়া।

পাঁচটার একটু পরে কল্যাণ এসে ওকে গাড়িতে তুলে নিল।

—কোথায় যাবে?

—তুমি যেখানে নিয়ে যাবে। বলতো, নেমেও যেতে পারি। কল্যাণ জবাব না দিয়ে একটা পরিচিত হোটেলের একটা টেবিল এক ঘন্টার জন্য ভাড়া নিল।

—বোম্বে গিয়েছিলে? একা?

—হ্যাঁ, একাই। আর কাকে পাব—তুমি ছাড়া।

—আগে জানাওনি কেন?

—তুমি আপত্তি করতে।

—আমি আপত্তি করতে পারি জেনেও গেলে।

—তোমার আপত্তির মুখে যেতে খারাপ লাগত।

—কিসের চাকরি।

রমা কোম্পানির নাম, পোস্টের নাম বলল।

—তুমি যে পোষ্টে আছ—তা তোমার যোগ্য নয় জানি। তবে আমাকে যদি বলতে —এখানে—এমনকি এই অফিসে আমি চেষ্টা করতে পারতাম।

—এ অফিসে আমি অন্য পোস্টে গেলেও—আমার অতীত কেউ ভুলত না।

—তুমি কি আমাকে এড়াতেই পালাচ্ছ?

—ভালবাসা নিঃশেষিত না হওয়া পর্যন্ত একা থাকব—এ আমি চাই না। বিয়ের প্রশ্ন এসেছে এখানে। আকর্ষণ যখন কমে যায় তখনও যাতে সম্পর্ক থাকে। আমি পূর্ণ ভালবাসার মধ্যে বিচ্ছেদ চাই। আমাদের পরিণত ভালবাসার মধ্য দিয়ে আমরা বিদায় নেব। ভালবাসা মরে যাবে—আর আমরা থাকব—এ আমি হতে দিতে চাই না। এবার আমাদের বিদায় নেবার সময় এসেছে।

—তুমি ভালবাসাকে হত্যা করতে চাও?

—না, ভালবাসার অপমৃত্যু আমি দেখেছি। ওকে হত্যাও বলতে পার। ঘটনার চাপে পড়ে সেই ভালবাসার অপমৃত্যু ঘটেছে। আর সেই ভালবাসার শবের ওপর বসে দিন কাটান কি ভয়ংকর তা আমি জানি। আমি পৃথিবীর শেষ নারী যে ভালবাসাকে মরতে দিতে পারি না।। তুমি আমার জীবনে প্রথম পুরুষ—একমাত্র পুরুষ—তুমি আমাকে প্রথম চুমো খেয়েছ। তোমার কাছ থেকে আমি শেষ চুমো নেব। এ অধিকার আমি আর কাউকে দেব না। যদি আমার মৃত্যু সংবাদ পাও—তাহলে মৃত্যু-চুমো রেখে এস আমার নীল হয়ে যাওয়া বিবর্ণ শীতল ঠোটের ওপর। কল্যাণ, অনেক ভেবেছি, অনেক কেঁদেছি, ঘর-সংসার আমার হবে না। তোমার ঘর আমি ভাঙতে পারব না। সারা জীবন অপরাধবোধে ভুগব। আমি একাই থাকব। তোমার ফটো আমার কাছে থাকবে। কলকাতায় এলে দেখা করব। সমাজ বিরুদ্ধে, মা বেঁচে আছেন—নইলে তোমার কাছ থেকে একটা সন্তান আমি চেয়ে নিতাম। একা তাকে মানুষ করতাম। তা হবার নয়। ভালবাসা চিরস্থায়ী নয়। বেশিকাল বাঁচে না। অভ্যাস ও রুটিনের গন্ধ পাচ্ছি আমাদের ভালবাসার মধ্যে। তার চেয়ে অন্তর ভরে কাঁদতে কাঁদতে বিদায় নিয়ে আকর্ষণহীন অভ্যাসকে শেষ হাসি হাসতে দেব না।

বলতে আরম্ভ করবার সময় থেকেই রমার চোখ দিয়ে দরদর করে জল পড়ছিল।

রমা থেমে আবার বলে—বিশুদ্ধ ভালবাসা—যা দেহের ও মনের তীব্র পিপাসায় জন্ম নেয়—তাকে নিছক অবুঝ অভ্যাসে আমি মরতে দিতে চাই না, কল্যাণ।

কল্যাণ বলল—ভালবাসা মরবেই এ কথা ধরে নিচ্ছে কেন? অন্যের ভালবাসা যাই হোক—আমাদের ভালবাসা কেন চিরস্থায়ী হবে না। রমা, তোমার জন্য আমি সবত্যাগ করতে পারি। এটুকু অবিশ্বাস করো না।

—বিশ্বাস করি। যা জন্ম নেয়—তা মরে। কোন লোক তো বলতে পারেনা—আর পাঁচজন মরেছে বলেই আমি কেন মরব। তোমার আমার মধ্যে যে ভালবাসার জন্ম হয়েছে—তা অমর নয়। তুমি, কল্যাণ, অভ্যাস ও রুটিনকে ভয় পাও। কিন্তু আমাদের ভালবাসা সেই পরিণতির দিকে যাচ্ছে। ভালবাসার মধ্যে বেঁচে থাকতে থাকতে আমরা বিদায় নেই—আমরা তাজা থাকতে থাকতে মরি—রক্তাক্ত অন্তর নিয়ে বিদায় নেই। ভালবাসাকে যতটুকু পারি—নিয়ে চলে যাই—নিজের মনে বাচিয়ে রাখি—স্মৃতির মধ্যে বাঁচিয়ে রাখি। ভালবাসা যেন আমাদের বিদায় না জানায়। কল্যাণ, এখন বিচ্ছেদ হলে, দু'জনেই দু'জনকে তীব্রভাবে কিছুকাল অনুভব করব। এরপরে বিদায় নিলে—অন্তরে বেদনাকে ডেকে আনতে চেষ্টা করতে হবে।

—ঠিক আছে—যতদিন ভালবাসা থাকে থাক্। ততদিন থাকি। কবে ভালবাসা কমে যাবে—সেই ভয়ে এখন চলে যাব কেন? ভালবাসার মৃত্যু যদি হয় হোক—না হওয়া পর্যন্ত আমরা বিচ্ছেদকে স্বীকার করব কেন? কবে বাবা মরবে বলে কেউ তো বাবাকে গলা টিপে মারে না। বা বাবার শ্রাদ্ধ আগে করে রাখে না। ভালবাসা যদি মরে সৎভাবে আন্তরিকভাবে তার মোকাবিলা করব। তা হলে এখন তো বিদায় নেবার কথা আসে না। তোমার দৃষ্টিভঙ্গী আমি স্বীকার করি না। একদিন ভালবাসা যদি বিদায় নেয়—হাসিমুখে বিদায় দেব—আত্মপ্রবঞ্চনা করব না—বা তাকে ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে পাঠিয়ে বাঁচাবার চেষ্টা করব না। সহজভাবে মেনে নেবে। তুমি বিচ্ছেদ ঘটিয়ে তাজা ভালবাসাকে রক্তাক্ত অন্তকরণে বিদায় দিতে চাচ্ছ। কেউ মরবে একদিন—তাই তাজা যৌবনকে হত্যা করতে হবে। এ কেমন যুক্তি। একটু থেমে কল্যাণ আবার বলল—তুমি ভালবাসাকে সংসারে নিয়ে আসতে চাওনা—ঘরোয়া করতে চাওনা—আমার ত্যাগ চাওনা—তুমি যতদিন পার আমাকে ছেড়ে যেওনা—আমি ভবিষ্যৎকে অত ভয় পাইনা। ভালবাসার ক্ষমতা সম্পর্কে অত বিশ্বাস আমার নেই।

—আমরা পরস্পরকে ছাড়তে চাই না—এই-ই হচ্ছে আমাদের বিদায়ের অন্তিম লগ্ন। তোমার ভালবাসা নিয়ে আমাকে বিদায় দাও—আমার ভালবাসা নিয়ে তুমি আমার কাছে থেকে বিদায় নাও। ভালবাসার এমন বিদায় লগ্ন বয়ে যেতে দিও না। কল্যাণ, আমি ভালবাসার মৃত্যুর, অপমৃত্যুর ভয়ংকর চেহারা দেখেছি। তুমি অবিবাহিত হলেও আজ যে কথা তোমাকে বলেছি, তাই বলতাম। তোমার-আমার মধ্যে বিচ্ছেদ হোক—ভালবাসার মধ্যে বিচ্ছেদ হোক—ভালবাসার নিঃস্বতার মধ্যে যেন বিচ্ছেদ না ঘটে। কল্যাণ, আমি চলে যাব—যে ক'টা দিন আছি—ভালবাসার মধ্যে থাকতে চাই—ভাটার টানকে আমার বড় ভয়। আমি সংসার করব না। তোমাকে নিয়েও না। তোমার জীবন্ত স্মৃতি নিয়ে বাকী দিন কাটাব। আর জীবন্ত স্মৃতি তুমি যদি রাখতে পার রেখ। ভুলে

গেলে নিজেকে দোষ দিও না। দু'জনেই—দু'জনের চোখে তাকিয়ে থাকে। কল্যাণের চোখ জলে ভরে ওঠে।

তারপর নিঃশব্দে কল্যাণ রমার হাত ধরে বেরিয়ে আসে। কফি তেমনি পড়ে রইল। কেউ এক চুমুকও মুখে দেয়নি। তারপর কল্যাণ গাড়ি চালাতে আরম্ভ করে বলল—স্বপ্নকে তুমি দুঃস্বপ্নে পরিণত করতে চাও, আশাকে শূন্যতায় ভরিয়ে তুলতে চাও, মিলনের আকাঙ্ক্ষাকে শ্মশানের আগুনে ছুড়ে ফেলে দিতে চাও—তাই যদি তোমার ইচ্ছে—আমি.....আমি শুধু শাস্তি পেলাম। রমা কাঁদতে কাঁদতে নেমে গেল। বোম্বে থেকে কল্যাণের জন্য যে উপহার এনেছিল—তাও ভুলে গেল।

রাতে বিছানায় শুয়ে বালিশে মুখ ঘষতে ঘষতে বলল—কল্যাণ, কল্যাণ, আমার জীবনের একমাত্র চুমো তুমি—তোমাকে ছেড়ে আমি কি ভাবে থাকব—কি ভাবে বাঁচব। ভগবান, যেন এপয়েন্টমেন্ট লেটার না আসে।

পরদিন অফিসে দেখল, অনেকেই জানে বোম্বাই রমা গিয়েছিল কেন? কল্যাণের সঙ্গে বের হবার সময় জানাল, দেখলাম অনেকেই বোম্বাই যাবার ব্যাপারটা জানে।

—পরোক্ষভাবে তোমার ওপর একটা চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে। যদি কারো সাহায্য পেয়ে থাক—তবে সে তোমার বন্ধু নয়।

—গতকাল এত তন্ময় ছিলাম, তোমার বোম্বে থেকে এই প্যান্টের পিস, সার্টের পিস—আরো দেখতো টাইটা। টাইটা যা তোমাকে মানাবে। নেবে তো?

—আমার জন্য এত খরচ করলে কেন?

—'তোমায় কিছু দিতে চায় যে আমার মন—তোমার নাইবা থাকল প্রয়োজন।' তোমাকে কিছু দিতে পারলে আমার যে কী আনন্দ হয়!

যাবার পথে কল্যাণ জিজ্ঞেসা করে—তুমি কি ভালবাসার পাড়, কিনারা—সীমানা যাই বল, দেখতে পেয়েছ?

—আমি পাইনি, কেন?

—তুমি তো আমার দিকে তাকিয়ে রয়েছ—তাই দেখতে চাচ্ছ না।

—অর্থাৎ তাকালেই দেখতে পাব? তুমি এত সিওর?

—দেখতে না পেলেও তুমি জান—দূরে পাড় রয়েছে। যে অনুভূতি তোমাকে এ সংবাদ দিচ্ছে—তুমি তাকে অগ্রাহ্য করছ—আমল দিচ্ছ না। তার পরদিন যাবার সময় কল্যাণ আবার বলল—ঠিক আছে অল্পই হল—না হয় নিছক আকর্ষণহীন অভ্যাসও হল—তবু দু'জনে তো একসঙ্গে থাকব।

—সে থাকা ভয়ঙ্কর। তা তুমি জান না। আকর্ষণহীন অভ্যাস যখন বিগড়ায় তার প্রেতের নৃত্য তুমি দেখনি। ভালবাসার জন্য যাকে বিয়ে করলে—তখন কোনো একপক্ষের ভালবাসা যখন মরতে শুরু করে তখন যে মরতে শুরু করে সে টের পায় না—অপর সঙ্গী টের পায়। তখন মৌন অভিযোগ যে বঞ্চনার ব্যথা সৃষ্টি করে—একটা তিক্ত পরিবেশ সৃষ্টি হয়—অভ্যাসটাও পীড়ন হয়ে দাঁড়ায়। দেখ কল্যাণ, আমাদের বাঁচবার জন্যে মরা দরকার। মরতে যখন হবেই—তখন নিজের শোকের মিছিলে নিজে নিষ্ক্রিয় হয়ে অংশ না নিয়ে সক্রিয় অংশ নিই না কেন?

আবার একদিন।

—কল্যাণ, তুমি মন বিশ্লেষণ করতে পার—আর আমি বুঝি মন সচেতন নই। কল্যাণ, তুমি তো কল্পনা কর—সুন্দরকে তুমি সৃষ্টি করতে পার—অনেক উচু কল্পনার অধিকারী। আর আমি মনের গোয়েন্দা—অন্তরের অপরাধীকে খুঁজে বের করা আমার স্বভাব। বাজে স্বভাব।

অনেকক্ষণ পর রমা আবার বলল—অবুঝ হয়োনা লক্ষ্মীটি। আমার বোঝা নিতে আমার যে কষ্ট হচ্ছে—সে কথা বুঝবার—রমার কণ্ঠস্বর কান্নায় আক্রান্ত হয়।

আর তার পরের দিন।

—রমা, কেন তুমি ভালবাসার ওপর নির্ভর করতে পারনা। জীবনকে বিশ্বাস করনা—ভাগ্যকে ভয় পাও?

—কল্যাণ তুমি সুন্দর। আর বাবা-মা না থাকলেও আনন্দময় পরিবেশের মধ্যে বড় হয়েছ। সংসারে সুখ আর আনন্দ আর আদরের মধ্যে বড় হয়েছ। তাই আমার মধ্যে তোমার স্থায়ী আস্তানা। একটা স্বচ্ছল ভাগ্যের মুখশ্রী তুমি দেখে এসেছ। আমি নিজে জানি—দেখতে আমি কেমন। বাইরের লোক তার চেয়ে কম জানে না। আমি দেখতে কেমন। সুন্দরের অবজ্ঞা আমার রোজকার খাদ্য। একটা বীভৎস, আতঙ্কময় কদর্থতার মধ্যে আমি বেড়ে উঠেছি—আমার বাল্য, কৈশোর আর যৌবনের বেশ ক'টা বছর—তোমাকে ভালবাসার আগে পর্যন্ত কেটেছে। ভাগ্যের মধ্যে কার্পণ্য আর নিষ্ঠুরতার এক নকশা আমার জন্য বরাদ্দ—এ আমি টের পেয়েছি। সেই ভাগ্য তোমার হাত দিয়ে আমাকে শাস্তি দেবে—এ আমি হতে দেব না—কিছুতেই হতে দেব না—। রমার কান্না ঝলসে ওঠে।

—আমি তোমার কোনো দুর্ভাগ্যের কারণ হতে পারি না রমা। তোমার জন্যে আমি কী ভীষণ ভাবে দুর্বল। কথা দিচ্ছি।

—না, কথা দেবে না। তুমি স্বেচ্ছায় আমার ওপর নিষ্ঠুর হতে পার না—তা না বললেও আমি জানি। আর জানি কত উচু দরের ভদ্র অন্তকরণ তোমার। কিন্তু একদিন তোমার নীরব অন্যমনস্ক ঠান্ডা দৃষ্টি—তা আমাকে সইতে বলো না। পৃথিবীর সচেতন অবজ্ঞা আমি সয়েছি—কিন্তু তোমার অনিচ্ছাকৃত শীতল চাহ্নী সে যেন আমার ভাগ্যে না ঘটে। তোমার মধ্যে দরদি বন্ধু, দুর্বার ভালবাসা ক্ষমতাবান পুরুষ আর নিজেকে বিলিয়ে দেবার শক্তি আমি দেখেছি। আর আমি কিছু চাই না। আমার ভাগ্যে সইবে না। তাই তাজা থাকতে থাকতে বিদায় নিয়ে কাঁদতে কাঁদতে চলে যাই। আমরা বেঁচে আছি—তাই হাসি মুখে বিদায় নিতে পারব না।

—ভালবেসে এত আনন্দ আর দুঃখ আমি পাইনি।

—আমাদের চলে যাওয়াটাই সবচেয়ে বেশী সত্য নয়—ভালবাসার প্রতিটি দিন প্রতিটি রাত সত্য। হোক তা অল্পায়ু। স্মৃতিতে শুধু বিদায় নয়—আরম্ভ থেকে বিদায় পর্যন্ত—সব কিছুকে নিয়েই আমাদের অস্তিত্ব। আমাদের ভূমিকা থেকে পরিশিষ্ট পর্যন্ত সবটাই আমাদের দু'জনের মিলিত অস্তিত্ব। শুধু শেষের পাতাটি নয়।

আরেকদিন রমা বলল—তুমি জীবনে অনেক পেয়েছ কল্যাণ। আমার ভাগ্যের একমাত্র দান তুমি। তুমি আমার একমেবাদ্বিতীয়ম।

আরো একদিন রমা বলল—আমি এত কথা বলছি—শুধু তোমাকে নয়, নিজেকে

বোঝাতে আমার যে কী কষ্ট হচ্ছে—তা তোমাকে বলতে পারব না। নিজের সংকল্পে স্থির থাকা দিন দিন আমার পক্ষে কঠিন হয়ে উঠছে। আমাকে সাহায্য কর কল্যাণ—নিজের সংকল্প নিয়ে আর আমি একা একা পেরে উঠছি না।

—কোনো সাহায্য করব না।

পরদিন বাড়ি এসে রাতে এপয়েন্টমেন্ট লেটার পেল। কবে জয়েন করতে পারবে লিখে জানাতে বলেছে। ভটচাজদা বলল, ধন্যবাদ দিয়ে লিখেদে—পয়লা জয়েন করবি। তবে কোয়ার্টাসে পৌঁছবে আগের আগের দিন। সেদিন যেন কোয়াটার পাওয়া যায়। রেজিষ্ট্রি করে চিঠি গেল। রমা অফিসকেও জানিয়ে দিল। ভটচাজদা সব ব্যবস্থা করলেন। অনেক কাজ। বাড়িওয়ালাকে জানাল হল। পি.এফ একাউন্টের টাকার জন্য আবেদন। ইত্যাদি।

ভটচাজদা সত্যিই করিৎকর্মা। এক সপ্তাহের মধ্যে পি.এফ. এসে গেল। বোনাস পেয়ে গেল। ব্যাংক একাউন্ট তুলে নেওযা হল। ইতিমধ্যে ওরা জবাব দিল—দাদারে কেয়ারটেকারকে ইনফর্ম করা হয়েছে—তুমি দু'দিন আগে যেতে পার। কোম্পানি তাতে আপত্তি করবে না। সে জন্যে কোনো রেন্টও নেবে না।

এত টাকা—প্রায় হাজার কয়েক টাকা—সঙ্গে করে নিয়ে যাওয়া উচিত নয়। ব্যাংক ড্রাফটও সেফ নয়। শুধু মাইনের টাকাটা হাতে রাখবি, আর সামান্য কিছু। দেখ, বড় বাজারে হুন্ডী হয়। আমার জানাশুনা—তুই এখানে টাকা জমা দিবি। ওরা একটা চিরকূট দেবে। বোম্বেতে ওদের ঠিকানা—বোম্বে স্টক একসচেঞ্জের কাছের এক রাস্তায়—গিয়ে দেখালেই ওরা টাকা দিয়ে দেবে। তুই ভয় পাস না—এভাবে লক্ষ লক্ষ টাকার কারবার করে। বড় বাজারে গিয়ে টাকাটা হুন্ডী করতে গিয়ে দেখল বহু লোক হাজার হাজার টাকার হুন্ডী করছে। ফিস ফিস করে বলল—সব ব্ল্যাক মানি। তোর তো সবই সাদা। বন্দোবস্ত হয়ে গেল। ইতিমধ্যে ছবি, বাকস ইত্যাদি সব রোড ট্রান্সপোর্টে পাঠিয়ে দেয়া হবে—ওরা দাদরের ঠিকানায় পৌঁছে দেবে। সব ঠিক ঠাক।

একদিন সন্ধ্যায় মা বেঁকে বসলেন—এ বাড়ি ছেড়ে আমি যাব নারে রমা। একবার কলকাতা ছেড়ে—তীর্থ ক্ষেত্রেই গিয়েছিলাম—বিয়ে হল—কিন্তু ছেলে, স্বামী হারালাম। সেই যে বের হয়েছিলাম—সর্বনাশ হয়ে গেল। আমি কলকাতা ছেড়ে আর যাব না।

রমা নির্বাক হয়ে গেল। তারপর মা বললেন, এই বাড়িতে বিয়ে হয়ে এসেছি—তোরা হয়েছিস—আজ এতকাল কেটেছে—অবন গেল—তোর বাবা গেল। আমিও এ বাড়ি থেকে শ্মশানে যাব। এখানে অবন রয়েছে, তোর বাবা রয়েছে—এই বাড়ি থেকে আমি কোথায় যাব। তুই যা—ক'টা টাকা পাঠাস মাকে। আমি থাকি।

মার সামনে বসে নিরুপায়ভাবে রমা বসে থাকে। তারপর দু'জনে মিলেই কাঁদতে থাকে। তারপর রমা বলে, কলকাতায় থাকলে এ বাড়ি একদিন আমি কিনে নিতাম। মা, এখানে কে আছে। অবন, বাবা, তো শ্মশানে গেছেন। যে বাড়ি তোমাকে কতটুকু শান্তি দিয়েছে—বাড়িটি অপয়া নয়। পরদিন সকালে মা বললেন, চল, কিসের জন্যে এখানে থাকব। আর কিসের আশা—তুই বড় চাকরি করবি—তোর গাড়ি বাড়ি হবে। চল, তোর মুখের দিকে তাকিয়েই। মেয়েদের কাছে বাড়ি যে কী জিনিস—বিয়ে হয়নি, বুঝবি না।

যাবার দু'দিন আগে সেই বাড়িওয়ালা—পঁচাত্তর বছর বয়েস—স্ত্রী-বৌ-ছেলে নিয়ে হাজির। খুব খুশি বাড়ি এবার নূতন করে প্রচুর ভাড়া পাবেন। কারণ পাড়ার লোক রমার পক্ষে। জীবনে কোনোদিন তুলতে পারবেন না। ওদের কাছেই বিক্রি করে দিতে হবে। তাই চলে যাবার সংবাদে বাড়ি নিয়ে ওরা স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছে।

এসে শুরু করল, বৌমা সেই ষোল-সতেরো বছরের ফুটফুটে কচি বৌটি। আজও মনে পড়ে। প্রদ্যোৎ বাড়ি ভাড়া দিতে না পেরে বলত, মিত্তিরদা বড় অভাবে আছি—বাড়ি ভাড়া কোথা থেকে দেব? ওর সততা আমার মন থেকে কিছুতেই যাবে না। তুমি মা বড় চাকরী পেয়ে বোম্বে যাচ্ছ—আজ মিত্তিরদা থাকলে কী আনন্দ হত।

মা বললেন, আপনারা যা সাহায্য করছেন—তা কোনদিন যদি ভুলি—ভগবান সইবে না। —না, না, কী আর সাহয্য করেছি। অনেক করা উচিত ছিল। ইত্যাদি।

যাবার ক'দিন আগে থেকে পাড়ার প্রতিটি বাড়ি থেকে বৌ, শ্বাশুড়ি, মেয়ে এসে দেখা করে গেছে। রমা একটা অব্যক্ত যন্ত্রণায় ছটফট করে। ছেড়ে যাচ্ছে চিরকালের কলকাতা।

যাবার আগের দিন সন্ধ্যায় চার্জ বুঝিয়ে দিয়ে মাইনে নিয়ে সকলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সকলের চোখের সামনে কল্যাণের মোটরে উঠল। দু'জনে হোটেলে উঠে একটা কামরায় দু'জন দু'জনকে জড়িয়ে ধরল। রমার কান্নায় কল্যাণের কোট ও জামা ভিজে উঠল। চুমু ও কান্নার মধ্যে এক ঘন্টা কাটিয়ে রমা এসে পৌঁছাল নিজের বাড়ির দরজায়। মাত্র ক'দিনের এই ভালবাসা। এই তো সেদিন ওকে ডেকে প্রথম রমা আত্মপ্রকাশ করল। আজ করল আত্মবিনয়। কল্যাণ বিদায় নিয়ে চলে গেল। রাস্তার দিকে একমনে তাকিয়ে বিভোর হয়েছিল। হঠাৎ মনে পড়ল, মা'র রাগ করে পার্কে যাবার সময় এইখানে দাঁড়িয়ে ভেবেছে, বাবা ঝগড়াও করবে, আবার মাকে দেখতে না পেলে অস্থির হয়ে উঠবে। এই কলকাতা। ওর কষ্ট, শোক, ভালবাসা—এ পাড়ার সঙ্গে মিশে আছে।

—রমাদি, এই ঠান্ডায় দাঁড়িয়ে যে?

—ও, বিকাশ। আজ শেষ অফিস করলাম।

প্রায় দশ মাস কেটে গেছে রমার বোম্বেতে। প্রথমে উঠেছিল একটা দু'রুমের ফ্ল্যাটে। মাস চারেক হল এই তিন রুমের সাজানো ফ্ল্যাটে উঠে এসেছে। হিন্দি রমা মোটামুটি জানে। মা হাট বাজার করতে যতটুকু হিন্দি দরকার—ততটুকুই জানেন। কিন্তু এখানে সামাজিক জীবন নেই। সকলের সঙ্গেই জানাশুনা আছে—সবাই খুব ফর্মাল। কেরানিরা অফিসারদের সঙ্গে মেশে না। অফিসারও পরস্পরের মধ্যে খুব একটা মেলামেশা নেই। স্বামী-স্ত্রী পার্টিতে যায়। মাকে ফেলে রমা পার্টিতে যায় না। ও, অনেক আর্টের বই কিনেছে। আর্ট বুঝতে চেষ্টা করে। ইচ্ছে আছে কয়েক বছর পড়াশুনা করবার পর বাবার আর্ট ও জীবন নিয়ে ইংরেজিতে বই লিখবে। বাবার ছবিগুলো প্রিন্ট করে রাখতে চায়।

মা সুন্দর করে ঘর গুছিয়েছে। তিনটি ঘরেই বাবার ছবি আছে। মা এখানে এসে খুশি হয়নি—সব দেমাকে চলে। অহংকারী। কথা বলার লোক নেই—সেই সাড়ে সাতটায় তুই বেরিয়ে যাস—ঢুকিস ছ'টায়। একা একা আমার কেমন পাগল পাগল

লাগে। এখানে দেখা হলে এড়িয়ে যায়—নয়ত মুচকি হেসে পাশ কাটায়। বৌ ঝিদের সঙ্গে হিন্দিতে কী আর সুখ দুঃখের কথা চলে। কলকাতায় সবাই পরিচিত ছিল। কেউনা কেউ কখনও কখনও আসতই। বাজারে গেলে কত পরিচিত মানুষ ছিল—সবাই চিনত। সব দোকানদার আমাকে জানত। দূর, এ পান্ডববর্জিত দেশ। সবাই টাকার দেমাকে অস্থির। আর ওদের সঙ্গে বলবই বা কি। সবাই তো ঠোটে রঙ মাখে। কয়লার মত কালো—তবু ঠোটে সবুজ রঙ। কি রুচিরে। একলা একলা।

মা রেডিও শুনবেন না। গান পছন্দ করেন না। যদিও খুব ভালো রেডিও—তবু কলকাতা ধরা যায় না। বাড়ি ফিরে রেডিও খুললে বা বই নিয়ে বসলে মা বিরক্ত হন। মার সঙ্গে কি কথা বলবে। মা'র সঙ্গে যোগাযোগের ভাষা হারিয়ে ফেলছে। রমা বোধ করে, নিজেও যেন কেমন অসহিষ্ণু—খিট খিটে হয়ে যাচ্ছে।

সেদিন অফিসে বসে কাজ করছিল। টেলিফোনে ওকে জানাল, একজন কোম্পানির ম্যানেজার তথা মালিক ওর সঙ্গে দেখা করতে চায়। ওর ফাইল নিয়ে আলোচনা করতে চায়। রমা পাঠিয়ে দিতে বলল।

ভদ্রলোক বসলে রমা মাথা তুলে একটু অবাক হয়ে গেল। ভদ্রলোক কার্ড দিলেন। সমীর চাটার্জী। ইনস্ট্রুমেন্ট—বিশেষ করে নানা যন্ত্রপাতি এরা তৈরী করে—এখানে একটা পেমেন্ট আটকে আছে।

রমা আশ্চর্য হয়ে যায় ভদ্রলোককে দেখে। দাদার সঙ্গে, মা'র সঙ্গে এত মিল। বাঙালি। মা'র কেউ নয় তো। চল্লিশের কাছে বয়স।

সঙ্গে সঙ্গে ওর ফাইল আনতে বলল।

—মিঃ চাটার্জী জানালেন—আমরা সাধারণতঃ অফিসার পর্যন্ত যাইনা। কিন্তু পেমেন্টটা বেশি—আমাদের ডেলিভারী চেক হয়ে গেছে তাও জানি। তবু, এতদিন ধরে ফাইলটা মুভ করছে না কেন—তাই জানাতে এলাম।

—ফাইলটা দেখছি—বসুন।

সব ফাইলটা দেখে রমা বলল—এতদিন পড়ে থাকার কথা নয়। আপনি কাল দুপুরের পর আসুন—আমি চেক রেডি করবার জন্যে রিকমেন্ডেসন করে দিচ্ছি। আপনি কালই পাবেন। আমি নিজে দেখছি।

ভদ্রলোক ধন্যবাদ জানিয়ে উঠে গেল। মনে হল, পেছন থেকে অবন হেটে যাচ্ছে। মা'কে কিছু বলল না।

পরদিন চেক পেয়ে ভদ্রলোক ধন্যবাদ জানাতে এসে বললেন—এত তাড়াতাড়ি হবে ভাবিনি। সত্যি ধন্যবাদ।

গতদিন ও আজও ইংরেজিতেই কথা হচ্ছিল।

—মিস মিত্র—আপনি বাঙালি।

—হ্যাঁ—বলল রমা।

—আমিও বাঙালী।

—তা তো দেখেই বুঝেছি।

—কই আপনি তো বাংলায় কথা বললেন না।

—আপনি প্রবাসী বাঙালি হতে পারেন—বাংলা বলতে হয়তো কষ্ট হয়।

—না। আমি দশ বছর এখানে ব্যবসা করছি। কলকাতায় আমার বাড়ি। বাবা-মা বেঁচে আছেন—তাই প্রতি বছর দেখা করতে যাই।

—ঠিক আছে। রমা উঠে দাঁড়াল। ভদ্রলোকও বুঝছেন, ওর সঙ্গে আর কথা নয়। শুনেছিলেন, মহিলা কড়া। ভয়ংকর এ্যাকটিভ। ফাইল পেনডিং রাখেন না। সমীরবাবু জিজ্ঞেস করতে চাচ্ছিলেন—মিস মিত্র কোথাকার লোক। বুঝলেন, মহিলা ব্যক্তিগত আলাপ পছন্দ করেন না।

তারপরও দু'বার ভদ্রলোক এসেছেন। রমা ওর কাজ সঙ্গে সঙ্গে করে দিয়েছে। প্ল্যাটফর্মেও ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা হয়েছে—একটু হাসি বিনিময় হয়েছে। ভদ্রলোক বুঝেছেন মহিলা ভয়ংকর ফর্মাল।

শনি ও রোববার ছুটি। মাকে নিয়ে মাঝে মধ্যে মালাবার হিল—ইন্ডিয়া গেট ঘুরিয়ে আনে। মা মেরিনবীচে বসে থাকতে ভালবাসেন। সেদিন ভীড় কম ছিল—মাকে নিয়ে বসেছিল। হঠাৎ একটি কণ্ঠস্বর পেছন থেকে এসে পাশে বসল। —মিস মিত্র? —ও মিঃ চাটার্জী। এবার দেখা গেল দু'টি সাত আট বছরের ছেলে মেয়ে সঙ্গে তাদের মা ও বাবা। অর্থাৎ সপরিবারে মিঃ চাটার্জী মেরিন বিচে হাওয়া খেতে এসেছেন।

—মিস্ মিত্র, পরিচয় করিয়ে দি—মিসেস্ আর ওরা—ডলি আর অয়ন—আমার দুটি দুষ্টু সন্তান।

—আমার মা।

সবাই পরস্পর হাত জোড় করে প্রণাম করল। মা যেন ভদ্রলোককে দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেছেন—ভদ্রলোকও অবাক।

—মিস মিত্র, কোথায় আপনাদের বাড়ি।

—সাউথ ক্যালকাটায়।

—আমাদেরও তাই। একডালিয়া। রাস্তার নাম বলল। তারপর বলল, আমরা পুরান বাসিন্দা। বাড়ির নাম 'প্রসাদ'। বাচ্চা দুটোকে কাছে টেনে নিয়ে বলল—কুইজ করব? বলতো তোমার ঠাকুরদার নাম কি? আজকাল ছেলেমেয়েরা ডাডি মামী করে নিজের বাবার নামও বলতে পারে না। দু'জনেই একসঙ্গে রমার মা'র বাবার নাম বলল।

—গুড।

—আপনাদের বাড়ি কোথায় ছিল বললেন না তো?

—পাম এভিন্যুতে।

মহিলা বললেন—তোমার মা'র সঙ্গে স্ট্রেঞ্জ মিল না?

মা উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, শরীরটা ভাল লাগছে না, চল। মা ওদের কাছে বিদায় নিয়ে চলতে আরম্ভ করল। রমাও হাসি মুখে বিদায় জানিয়ে চলল। যেতে যেতে মহিলার কণ্ঠস্বর—পেছনটাও—চলনটাও মা'র মত।

—মা'র সেই ছেলেবেলাকার চেহারা। এমন মিলও হয়।

রমা দূর থেকে শুনতে পায়—তা হলে এই তোমার সেই মিস মিত্র।

বাড়ি এসে মা চুপ করে বসে থাকেন। রমা বলে—সমীর মানে তোমার সবচেয়ে ছোট—নন্তু। ডাক নাম—ভাল নাম সবই রমার মুখস্ত।

—আমি অফিসেই সন্দেহ করেছিলাম—অবনের সঙ্গে মিল দেখে।

মা ভয়ে ফ্যাকাসে হয়ে গেছেন। —আর বের হব না। আর বের হব না। এখন তোর কাছে সুবিধা পেয়ে খাতির জমাতে এসেছে।

মা সেদিন রাতে খেতে পারলেন না। দু'দিন পর বললেন, দ্যাখ, মাঝে মাঝে মাথার মধ্যে কেমন যেন করে।

—তোমাকে ডাক্তার দেখাব।

—না, পয়সা খরচ অযথা। অফিসের ডাক্তার দেখাব—আমার পয়সা লাগবে না। ক'দিন ধরে মা যেন নির্বাক হয়ে গেছে। একাই চুপচাপ বসে থাকে। পরের শনিবার দুপুরবেলা দু'টো হবে। হঠাৎ শুনল মা যেন গান করছে। চুপ করে শুনতে লাগল। মা বলে চলেছে একা একা ঃ মরার আগে বললে ছায়া তোমাকে ভালবেসেছিলাম—জীবনে যারে তুমি দাওনি মালা, মরনে কেন তারে দিতে এলে ফুল। বিয়ের সময় মালা দিয়েছিলে তো। ....অবন.....অবনরে.....শূন্য এ বুকে পাখি মোর উড়ে আয়। মা গান করে চলেছেন। আমি দ্বার খুলে আর রাখব না—পালিয়ে যাবেগো—গেলাম তো পালিয়ে। আটকাতে পারলে। এমন নিষ্ঠুর বাবা মা ভাই বোন......ওগো নিষ্ঠুর দরদিয়া। ......কি করবে তুমি ভগবানের একটা সতেরো বছরের মেয়েকে ঠকিয়ে নিয়ে এসেছ—ভগবান তোমাকে ঠকিয়েছেন—তুমি আমাকে ঠকাওনি। কই? শেষ ছবি পারলে আঁকতে......অবনরে.....আমার একটা মেয়ে আছে......কি যেন নাম তার.......ঐ তো ঐ ঘরে বসে.......কি যেন নাম......কি যেন নাম। মা আবার গেয়ে উঠলেন—দুঃখে যাদের জীবন গড়া, তাদের আবার দুঃখ কিরে......। রমা দেখল, মা পাগল হয়ে গেছেন।

কল্যাণ আশ্চর্যরকম চুপচাপ হয়ে গেছে। ও আর রিসেপসনিষ্টদের দিকে তাকায় না। ক্লান্ত শরীরে মোটর নিয়ে হোটেলে এসে সেই কোণের টেবিলে একা এসে বসে থাকে অনেকক্ষণ। হোটেলে এসে ঘর ভাড়া নিয়ে—সেই ঘর—শুয়ে থাকে চুপচাপ একা। চা, খাবার পড়ে থাকে। ইচ্ছে হয় রমার বাড়ির দিকে যায় কিন্তু নিজেকে দমন করে। রমা বলেছিল, চিঠিপত্র দিয়ে ভালবাসাকে অকিসজেন দিয়ে বাঁচিয়ে রাখা সাংসারিকদের প্রয়োজন হতে পারে—আমরা তো সংসারকে বাদ দিয়ে ভালবাসাকে রেখেছি। দরকার নেই চিঠি পত্রের। তোমার ফটো রইল আমার কাছে—আমারটা রইল তোমার কাছে। বাইরের দুটো কায়া—অন্তরের প্রতিবিম্বকে যতদিন পার উদ্ধার কর—তবে চেষ্টা কর না। রমা যাবার আগে থেকে কল্যাণ কেমন গুটিয়ে ফেলছিল শেষ দিকে। শেষ দিকে বুঝেছিল, রমা ওকে ভালো বোঝে—ওর নিজের চেয়েও। ক'টা মাসের এই ভালবাসা কল্যাণকে কেমন পরিবর্তন করে দিল। নিজের স্বাভাবিকতাও ভুলে গেছে—তা আর চায়ও না। আজকাল বড় ক্লান্ত লাগে নিজেকে। নিরানন্দ রুটিনবদ্ধ জীবন।

একদিন সন্ধ্যায় কল্যাণ বাড়ি ফিরে কাপড় ছেড়ে হাত মুখ ধুয়ে একা বসে অন্যমনস্ক হয়ে সিগারেট খাচ্ছিল। রীনা চা নিয়ে এসে পাসে বসল। আজকাল রীনা ও কল্যাণ দু'জনেই মুখোমুখী বসে থাকে অন্যমনস্ক হয়ে। তারপর কখন রীনা উঠে যায় কল্যাণ খেয়ালও করে না। দু'জনের মধ্যে কেমন একটা নীরবশীতলতা নেমে এসেছে।

সেদিন রীনাা বলল—আগে আগে সন্ধ্যায় প্রায়ই তোমার সহকর্মীর নাম বলে বড্ড

উড়ো ফোন আসত। তুমি নাকি মিস মিত্র নামে কোন মেয়েকে নিয়ে......মোটর কেনার পর একসঙ্গে মোটরে.....এইসব। পরে বলল, সেই মেয়েটা বদলি হয়ে বোম্বে গেছে। আর আপনার ভয় নেই। আমি বলেছি, এসব নোংরা কথা আমাকে জানাবেন না। আমার স্বামী পাঁচটা মিস মিত্রকে নিয়ে বেড়াবার হিম্মত রাখে। ওতে আমাদের কিছু যায় আসে না। তুমি পারচেজে যাবার পর থেকে এটা আসতে থাকে।

কল্যাণ একদৃষ্টিতে রীনার দিকে তাকিয়ে বলল, তোমার নামেও কোনো মহিলা নিজেকে সহকর্মীর নাম দিয়ে জানাত, বিমলেন্দু নামে কোনো অঙ্কের টিচারের সঙ্গে নাকি....তুমি করে বল, একসঙ্গে পাশাপাশি বস—ফেরবার পথে একসঙ্গে ফের—একসঙ্গে ছুটি নাও। তারপর, একদিন বলল, ঐ বিমলেন্দুবাবু নাকি উত্তরবঙ্গে প্রফেসর হয়ে গেছে। এবার আপনার বিপদ কাটল। আমি বললাম, দেখুন আমার স্ত্রীর সঙ্গে যদি কারও ঘনিষ্ঠতা হয়—তবে তার ঘনিষ্ঠজন একজন সহকর্মীদের মধ্যে রইল। লোকবল তো সব সময়ই দরকার। তবে আপনারা শিক্ষিকা হয়ে যে নিন্দুকের ভূমিকার অবতীর্ণ হয়েছেন—তাতে বুঝতে পারছি। শিক্ষা ক্ষেত্রে যোগ্য লোক যাচ্ছে না।

এবার রীনার সেই শুকনো দৃষ্টি স্পষ্ট ভাবে কল্যাণের দিকে তুলে বলল—দেখ, কোনো ভদ্রলোকের যদি আমাকে ভালো লাগে—আমার সঙ্গে একটু বেশি মেশে—ফেরবার পথ আমাদের একই—যদি এই বোমাবাজির সময়ে সঙ্গে একজন সঙ্গী পাই—আমি কি করব বল? রক্ষণশীল মহিলার মত তার সঙ্গে অভদ্র ব্যবহার করব। আমার বাবা যদি দেখতেন, তিরস্কার করতেন, কারণ, ভদ্রলোক দেখতে সুশ্রী নন, তিরস্কার করতেন, কারণ, সে গরিব, টাকা পয়সা নেই বলে। ছোটবেলা থেকে আমরা এই শিক্ষা পেয়েছি—দেখতে খারাপ আর গরিব এদের সঙ্গে মিশবে না। জান, আজ আমার বড় দুঃখ হয়—বিশ্ববিদ্যালয় পড়বার সময় কত মেয়ে, কত ছেলে আমার সঙ্গে একটু মিশতে, একটু কথা বলতে চাইত। মিশিনি, কথা বলিনি। পৈতৃক সংস্কার আমাকে অভদ্র করে দিয়েছে। অথচ আমি পার্টির হয়ে মিছিলে গেছি, বক্তৃতা দিয়েছি। আজ দুঃখ হয়—আমার মত ওরাও কাঁচা বয়সেরই তো। কর্মক্ষেত্রে দেখলাম তা চলে না। দেখ, তুমি সুন্দর—পুরুষের মধ্যে ক'টা এমন সুপুরুষ আছে—মেয়েরা তোমার ওপর কেন আকৃষ্ট হবে না? আর তুমি যদি হও—কিছুক্ষণের জন্যেও হয়—নিজের ইচ্ছায় তো হবে না। এতে দোষ থাকতে পারে—কিন্তু মানব প্রকৃতি তা মেনে নেয় না। ভালবাসা নিজের ইচ্ছেয় হয় না—নিজের ইচ্ছায় যায়ও না। আমি ভেবে দেখেছি, আমি বলি, আমি তোমার—হয়তো তাই ভাবি। তুমি বল, তুমি আমার—সত্য কথাই বল। কিন্তু আমরাই কি আমাদের। আমি কি আমার।

—তুমি ঠিক বলেছ রীনা। ও সব ফালতু ফোনের কথা গ্রাহ্য কর না। তবে তুমি ঠিক বলেছ, আমরাও আমাদের নই। আমিও নিজের নই। আমাদের অন্তরের মালিক আমরা নই। মনে করি বটে আমরা। কিন্তু, সত্যি বড় খাটি কথা বলেছ।

—ভদ্রলোক দু'মাস আগে চলে গেছেন। এখন সব শান্তি। ভাই টাইফয়েডে বিনা চিকিৎসায় মরতে বসেছে। আমার কাছ থেকে পঞ্চাশ টাকা ধার নিয়েছিল—ভাইকে বাঁচাবার সময়। যাবার সময় বলল, টাকা এখন ফেরত দিতে পারলাম না। আমি বললাম, ফেরত না দিলে আমি কিছু মনে করব না। বরং যাবার সময় খালি হাতে যাচ্ছে—

কিছু সাহায্য করলাম। ভদ্রলোক ভয়ানক তেজি, জেদি, তবু সেদিন সে টাকা কুণ্ঠিতভাবে নিলেন। চোখ ছল ছল করে উঠল।

—তিনি তোমাকে ভালবাসতেন—সেই অধিকারেই টাকা নিয়েছেন। সমস্ত ব্যাপারটায় কোন দোষ নেই। যা করেছ, বেশ করেছ।

—কল্যাণ, আমরা বড্ড বদলে গেছি, তাই না?

—আজ হোক, কাল হোক, বদলে যেতামই। বদলটা মেনে নিতে হবে। যখন আমরা টের পেলাম, আমিই আমার সম্পত্তি নই—এই উপলব্ধি আমাদের বদলে দিয়েছে। আগের ব্যবহারের নকল করে আমরা নিজেদের ঠকাব না।

—না। অভিযোগও নেই বদলের জন্য। এ জন্যে আমরা দায়ী নই। সব মেনে নেব। কল্যাণ চুপ হয়ে যায়। রীনাও চুপ করে থাকে। কারো চোখে বেদনা নেই। দু'জন দু'দিকে তাকিয়ে রয়েছে—দু'জনের চোখ জ্বল জ্বল করছে। অন্তরের কোনো আগুন ওদের চোখে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। ম্লান অন্তর নেভবার আগে যেন চোখে জ্বলে উঠেছে।

এ নিয়ে আর ওরা কখনও জীবনে কথা বলেনি। তবে ভদ্রলোকের উত্তরবঙ্গে যাবার মাস থেকেই রীনা সন্তান সম্ভাবনা—এই খটকা—একটা সূক্ষ্মকাঁটা সারা জীবন কল্যাণের ছিল। ভুলেও থাকত অধিকাংশ সময়। দু'এক সময় কাটার অস্তিত্ব টের পেত। আর রীনা তো সারাজীবনে গোপন খটকা থেকে টের পায়নি—তার প্রথম সন্তানটির বাবা কে? বিমলেন্দু, না কল্যাণ? কল্যাণ সবই বুঝেছে। রীনাও সব বুঝেছে। তাই নিজেদের বদল হবার মধ্য দিয়ে নিজেদের প্রকাশ করেছে। বদল মেনে নেবার মধ্যে অভিযোগ না রাখার কারও কিছু বুঝতে বাকী নেই। এর চেয়ে বেশী কেউই শুনতে চায় না। রুচিও নেই। রীনা যখন তখন গান করে না। কল্যাণ বাড়ি ফিরে এই পড়ে, নয়ত কাজ থাকলে ফাইল নিয়ে বসে। গানের কথা মনে পড়লে রীনার চোখে জল আসে। আর বই পড়তে পড়তে কখন কল্যাণ এক দৃষ্টিতে অন্য দিকে তাকিয়ে থাকে। আজ ওরা প্রত্যেকেই একলা। কল্যাণ ভিতরে ভিতরে জানে, রীনার সম্পর্কে ওর আগ্রহ নেই, রীনা জানে, কোনো কৌতূহল ও আগ্রহ কল্যাণ সম্পর্কে ওর নেই। রীনা শুধু জানে, কল্যাণ বদলে গেছে, যাক। নিজেও বদলে গেছে তা চিন্তা না করে, ভাবে, বিমলেন্দু চলে গিয়ে ওর স্কুল ও বাড়ি—দু'দিকেই ওর আকর্ষণ চলে গেছে। নতুন অভ্যাস আয়ত্ত করবার কথা ভাবতে ওর ক্লান্তি লাগে। এদিকে সন্তান পেটে।

সেদিন সকালে কল্যাণ উঠে সিগারেট খাচ্ছিল। এখনও চা খাওয়া হয়নি। পত্রিকা আজকাল বিশেষ কল্যাণ পড়ে না—বড় জোর হেডলাইনের ওপর চোখ বুলোয়। পত্রিকা এসে গেছে। কল্যাণ আনমনে সিগারেট টেনে চলেছে। রীনা চা নিয়ে এসে কল্যাণকে দিয়ে, নিজের কাপ নিয়ে কল্যাণের পাশে বসল। তারপর রীনা পত্রিকা নিয়ে পাতা উল্টাতে উল্টাতে হঠাৎ এক জায়গায় থেমে চিৎকার করে ওঠল —ওমা, একী, কিংশুকদা গতকাল ক্লাসে খুন হয়েছেন। কল্যাণের হাত থেকে চায়ের কাপ পড়ে যায়। একটানে পত্রিকাটি টেনে নিয়ে পড়ে কল্যাণ পত্রিকা পড়েই বলল বাঃ বাঃ, এরা যুক্তি ও জ্ঞানকে হত্যা করেছে। আমি যাচ্ছি। বডি পোস্টমর্টম করে আজ নিয়ে আসবে। তুমি যাবে—বৌদির কাছে—তোমাকে বড় পছন্দ করেন। আমার এ অবস্থায় যেতে নেই —ও, আচ্ছা। কল্যাণ একটা পাজামা আর পাঞ্জাবী পরে তক্ষুনি রওনা হয়ে গেল।

গাড়ি নিল না। হাটতে হাটতে কান্না গলার ভিতর আটকে গেল। সেই কিংশুকদা—বি.কম পড়বার সময় থেকে আলাপ—ওরা সাত জন এক রেস্তোরায় বসত, পার্কে বসত। এমন বিষয় নেই—যা আলোচনা হত না। এমন দিন যায়নি—যেন কল্যাণ কিংশুকদার কাছ থেকে কোনো না কোনো বিষয়ে মনকে আলোকিত করেছে। ওর নিজের মধ্যে একটা চিন্তার পরিমণ্ডল ছিল। ওরা সাতজন নিজেদের নাম দিয়েছিল, সপ্তর্ষি। কিংশুকদা বলতেন, বল, কালপুরুষ। ঐ ধ্রুব তারাটির ধারণা আজ পাল্টে গেছে—আজ হোচ্ছে কোনো একটা প্রসঙ্গে তোমাকে বিচার করতে হবে—ফ্রেম অফ রেফারেন্স। তবে আমি বলে মরি, যে কোনো মতবাদ বিচার করতে হবে, যে কোনো চিন্তা-প্রণালীর সামগ্রিক বিচার করতে হবে, দেখতে হবে—তার ইনট্রিনসিক ভ্যালু অর্থাৎ স্বগত মূল্য, যুগের কত উপযোগী, তার পরিণতি। অসুবিধে যাই হোক—আমরা বৈজ্ঞানিক তথ্য থেকে মূল্যবোধে যেতে পারি না—এখন পর্যন্ত পারা যায়নি, কিন্তু মূল্য বোধের ধারা তথ্যের সমান্তরাল চলেছে। মূল্যবোধের মধ্যে চিরতনত্ব নেই বলে যত তারস্বরেই চিৎকার হোক না কেন—মূল্যবোধ আপেক্ষিক বলে কোরাস শুরু করলেও, একটা বিষয়ের কিন্তু জবাব পাওয়া যায়নি—মানুষ সভ্যতার—যা যে কোন স্তরেই হোক—কখনও মূল্যবোধ ছাড়া ছিল না—তা মূল্যবোধ যে স্তরেরই হোক না কেন বা মূল্যবোধের রূপ যাই হোক না কেন? হোমোস্যাপিয়ান মূল্যবোধ নিয়েই যাত্রা শুরু করেছে। তা হলে সহজাত বুদ্ধির উন্মেষের মধ্যে তার অস্তিত্ব? কার্যকারণ না বোধের অন্তরে সে বাস করে—এ সম্পর্কে চট করে মত দেয়া ঠিক নয়। মূল্যবোধের বিভিন্নকালে, দেশে বিভিন্নরূপ রয়েছে বলেই তা আরোপিত—সমাজ ঘাড়ের ওপর চাপিয়ে নিয়েছে—এ কথা বিচার সাপেক্ষ। এখানে সন্দেহ থেকেই যায়। আমার পয়েন্ট, মূল্যবোধ যাই হোক, মানুষ কখনও মূল্যবোধ ছাড়া নয়। .....কিংশুকদা আজ তোমার মৃত্যুর বিচার কি দিয়ে হবে? শিক্ষককে হত্যা করা বড় দুর্লভ ঘটনা। রাজ্যের জন্যে বাবা, মা, ভাই, বোন সবাইকে হত্যার নজির আছে—কিন্তু শিক্ষককে হত্যার নজির মনে পড়ে না।

কল্যাণ এসে দাঁড়াল কিংশুকদার বাড়ির সামনে—এখনই বডি এসে পড়বে। কিংশুকদার স্ত্রী বসে আছেন। বললেন, দেখ কি হয়ে গেল। কল্যাণ চুপ করে রইল। শুনল, ফোন এসেছে—কিংশুকদার ছেলে বডি নিয়ে রওনা হয়ে গেছে। ইতিমধ্যে সেই সপ্তর্ষির গৌতমদা, সতীশদা, হাজরাদা এসে পড়ল—কেউ নিজের মোটরে কেউ ট্যাক্সি করে। বাড়ির সামনে বেশ ভীড়—ওরা আবার ফুল কিনতে চলে গেল। ফুল নিয়ে এসে দাঁড়াল। এরা সকলেই গতকাল রাতেই রেডিওতে সংবাদটা শুনেছে। কেবলই কল্যাণ রেডিও শোনে না বলেই জানত না। ওরা ফোনে জেনেছে—আজ সকালে বডি দেবে।

একটু পরে তিনটি ট্রাক হাজির হল। কিংশুকদার মুখে যেন একটা ব্যথার ছাপ। শুনল, হত্যাকারী একজনই। বাইরে ক'জন ছিল। স্কুলের দারোয়ানকে বলল, হেডস্যার কোন ক্লাসে আছেন—শুনল, ক্লাস টেনে—সে বিনা অনুমতিতে ঘরে ঢুকে বলল, আপনার ওপর আমার কোনো ব্যক্তিগত বিদ্বেষ নেই—কিন্তু আপনি প্রতিক্রিয়াশীল সমাজের জ্ঞানের ধারাকে বহন করে সমাজের শত্রু হয়েছেন। গণ-আদালত আপনার

মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে। আপনি উত্তম শিক্ষক—সেই জন্য আপনি সবচেয়ে বেশি ক্ষতি করছেন—সমাজের পক্ষে বেশি ক্ষতিকর। বলেই কাছ থেকে ক'টা গুলি করে—ছাত্রদের দিকে তাকিয়ে বলল—যদি আমাকে চিনে থাক, বা চিনতে পুলিশকে সাহায্য কর—তবে যারা করবে—তার পরিবারের কেউ বাঁচাবে না। ছাত্রটি ক'বছর আগে পাশ করে বেরিয়ে এখন কি করে জানা যায়নি। কিংশুকদা বললেন—তুমি আমাকে মারবে? মৃত্যু ভয় আমি করি না। কিন্তু আমার ছাত্র আমাকে....? কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বুকে, কপালে, পেটে তিনটে গুলি করে ছেলেটি চলে যায়। বেরিয়ে যেতেই ছাত্ররা কিংশুকদার কাছে কিছু ছুটে আসে, কিছু ছেলে দৌড়ে মাঠে এসে বলল—চল ওদের ধরি—না হয় মরব। আমরা স্যারকে রক্ষা করতে পারলাম না। তখন ওরা গেটের বাইরে গেছে—ক'টি ছেলে দৌড় আরম্ভ করতেই ওরা বোমা ফাটাল। ছেলেরা থেমে গেল। একজন টিচার বলল—চেয়ার টেবিল ধরে স্যারকে শুইয়ে দিলাম—বহু ছেলে পা ধরে চিৎকার করে কাঁদতে লাগল। পুলিশ এল অনেক পরে। তক্ষুনি মরে গিয়েছিলেন। ছেলেটি মুখ ঢেকে আসেনি। অনেকেই পুলিশকে বলেছে, আবার দেখলে ঠিক চিনতে পারবে।

হাওড়া থেকে তিনটি ট্রাকে ওরা এসেছে। সারাদিন সারারাত ওরা মর্গের পাশে বসেছিল। তারপর তিনটি ট্রাকে ওরা এসেছে। —ছেলেটি বলল—আমার ফাইনাল ইয়ার। দেখুন কি সর্বনাশ হয়ে গেল। বাবা স্পষ্ট বক্তা ছিলেন, কাউকে খাতির করতেন না, অনেকের সঙ্গেই বনিবনা হত না। কাউকে গ্রাহ্য করতেন না। কিন্তু সে জন্যে নয়—শুধু ভাল পড়ান বলেই খুন করা হল। আর যে করল—সে বহু বছর বাবার কাছে পড়েছে।

তারপর ফুল চন্দন সাদা ধুতি ও পাঞ্জাবী দিয়ে কিংশুকদার তিন বোন—তাদের মেয়েরা সাজিয়ে দিল। ভগ্নিপতিরা তদারক করতে লাগল। মৃতদেহ বাইরে নিয়ে এলে ছেলেরা নেমে ট্রাকের ড্রাইভারকে বলল—কেওরাতলায় গিয়ে অপেক্ষা কর। কল্যাণ ও তার তিন বন্ধু ফুল দিল। গৌতম বলল—ভাল শিক্ষককে রাষ্ট্রীয় সম্মান দেন সরকার। কিংশুকদা সেই সম্মান পাননি। পুরস্কৃত হলেন খুন হয়ে। একজন টিচার বললেন—আরে তোরা বল, কোন সিলেবাসে আমরা পড়াব। ক'টা টিচারকে তোরা খুন করবি?

শোকযাত্রা শুরু হল—কেওড়াতলা খুব দূরে নয়। ওরা চার বন্ধু আস্তে আস্তে পেছনে যেতে লাগল। বিরাট ছাত্রের দল, বহু অভিভাবকও এসেছিলেন—স্থানীয় ছাত্র—পাড়ার লোক। যদিও কিংশুকদা খুব জনপ্রিয় বা সামাজিক ছিলেন না। তবু, সবাই জানত, ট্রিপল এম.এ., শুধু ভালপড়াবার জন্য তাকে মারা হল।

গৌতমদা বললেন—কিংশুকদা বলতেন, ওরা চিন্তাশক্তিকে ভয় পায়। বর্বররা চিরকাল সভ্যতা ধ্বংস করেছে। আধুনিক বর্বরেরাও তাই বইকে, জ্ঞানকে, চিন্তা শক্তিকে ভয় পায়। শুধু ওরা নয়—সব রাজনৈতিক দলই ভয় পায়—এরাইতো নয়া বর্বর।

সতীশদা জিজ্ঞাসা করলেন—বর্বরতার কি সংজ্ঞা দেবে।

গৌতমদা বললেন—যে দল বা গোষ্ঠী মনে করে তাদের মতবাদ চূড়ান্ত ও চরম—এর বিরুদ্ধে যারা তারা শত্রু—যারা নিরপেক্ষ—তারা নিরপেক্ষ থেকে শত্রুকে সাহায্য করছে—তারা শত্রু—তাদের বিরুদ্ধে যুক্তির লড়াই নয়—তাদের শত্রু ও নিরপেক্ষকে হত্যা করতে হবে। এরাই বর্বর। এদেরই যুগ শুরু হচ্ছে। গৌতমদা বললেন—এখন

যারা এসব করছে—এরা বেশি দিন টিকবে না। কারণ পাবলিক সিমপ্যাথি এরা পাচ্ছে না। আর এরা ভীরু। কিন্তু যারা সুসংগঠিত, সশস্ত্র ও অর্থে ও সামর্থে বলবান—সেই সব বর্বর ক্ষমতায় এলে চিন্তা, জ্ঞান, শিক্ষা সব দেউলিয়া হবে—যেমন হয়েছে রাশিয়ার আর পূর্ব ইউরোপের দেশগুলিতে।

কল্যাণ বলল—ক্রিমিনাল ইডিওলজি ক্রিমিন্যাল তৈরী করে—ক্রিমিন্যাল আকর্ষণ করে। বর্তমান এই ক্রিমিনাল ইডিওলজিরই যুগ শুরু হচ্ছে। এই তো সবে প্রভাত। এমন একটা সময় আসবে যখন শিক্ষকরা হবে অশিক্ষিত। শিক্ষক নিরক্ষরতার যুগ অনিবার্য হয়ে উঠছে। জ্ঞান, চিন্তাশক্তি, মনন এদের নির্বাসনের প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে।

আবার চুপচাপ হাটতে থাকে। কল্যাণ বলল—কাজ আর টিউশনের চাপে। মনোমত পড়াশুনা করতে পারতেন না। বলতেন, আর দশটা বছর কোনো মতে পার করে বাকি জীবনটি পেট ভরে পড়াশুনা করব।

মৌন মিছিল এগিয়ে এল মহাশ্মশানের দিকে।

গৌতম বলল—আধুনিক বর্বরেরা পেশি শক্তি ও ধূর্ত বুদ্ধির ওপর নির্ভর করে আছে। দরকার পড়লে জাতিকে নেশাগ্রস্ত করতে পাবে—নিজের কাজের জন্যে টেকনোলজির সাহায্য নিতে পারে। ধূর্তজীবী তো সমাজে সব সময়ই ছিল—যুক্তিশীল চিন্তাজীবিই দুর্লভ। এরাই সভ্য—এদের মধ্যে সভ্যতা বেঁচে থাকে—গতিশীল হয়।

কল্যাণ বলল—সেদিন কিংশুকদা বলেছিলেন, মরব কিন্তু সাবমিট করব না।

সতীশ বলল—সাবমিট করা মানেই মানসিক মৃত্যু। দেহের জন্য মনকে হত্যা করতে হবে।

গৌতম বলল—কল্যাণ ঠিকই বলেছে, ক্রিমিন্যাল ইডিওলজি ক্রিমিনালই তৈরি করে—আকর্ষণ করে। খুনীর মতবাদ খুনী তৈরি করে—খুনীদের টেনে আনে।

মিছিল কেওড়াতলায় পৌছে যায়।

বিমলেন্দু কলেজে যোগ দিয়েছে এক বছর হয়ে গেছে। এখানকার পরিবেশ সম্পূর্ণ অন্য রকম। ছাত্র ছাত্রীর অত্যন্ত রাজনীতি -সচেতন মানে পার্টি-সচেতন। স্যার কোন দলে? কিন্তু বিমলেন্দু অঙ্কের লেকচারার। ছাত্র ছাত্রীদের সঙ্গে বাইরের কথার সুযোগ নেই। বিমলেন্দুর গাম্ভীর্য অচিরেই ওকে একটা স্বাতন্ত্র্যও এনে দিল। কিন্তু বিমলেন্দু যেহেতু অধ্যাপক হিসেবে মনোযোগী ও ভাল বোঝাতে পারে—অচিরেই ওর কাছে প্রাইভেটে ছাত্র আসতে আরম্ভ করল। এই অঞ্চলই মোটামুটি চা, তামাক ও কাঠের ব্যবসা কেন্দ্র। তাই যেখানে প্রাইভেট পড়াতে হয় একা—সেখানে বিমলেন্দুর চার্জও অনেক বেশি। তাছাড়া সপ্তাহে দু'দিনের বেশি প্রাইভেটে পড়াতে হয় না। তাছাড়া একদিন অফডে—স্ল্যাক সিজন-এ দু'দিন। ক্লাসও বেশি নয়—তিনটে-খুব বেশি হলে চারটে। ছাত্রাবাস ছেড়ে প্রথম মাসেই একটা টিনের বাড়ি বাড়া নিল—আরেক সহকর্মীর সঙ্গে। নিজের রান্না করত। পরে একটি ছেলেকে রেখে দিল—সেই প্রেসার কুকারে রান্না করে দিত। এক বছরের শেষে বিমলেন্দু উদয়াস্ত ছাত্র পড়াত। নিজের বাড়িতে পাঁচজন করে গ্রুপ করে—অথবা কোনো জায়গায়—ছাত্র বা ছাত্রীর বাড়িতে পাঁচ জনের গ্রুপে। বেশি অঙ্কের টাকায় প্রাইভেটে। দিন দিন বিমলেন্দুর চাহিদা বাড়তে লাগল।

এদিকে প্রায়ই স্ট্রাইক হয়। ছাত্র ইউনিয়নের কথায় অধ্যক্ষ ওঠেন-বসেন। বাড়িতে নিয়মিত টাকা পাঠাত। অনেক রাতে একা হত। তখন পাইপে তামাক ভরে অনেকক্ষন পাইপ টানত। মনটা রীনার জন্য হুহু করত। ভাই-বোন-মা সবার জন্য কেমন করত। কোনদিন ওদের ছেড়ে থাকেনি। সবাই ওকে ভয় করত—ও যে সবাইকে খাওয়াচ্ছে—খাটছে—সে জন্যে সবাই ওকে ভয় করত। বাড়িতে বেশিক্ষণ থাকতে পারত না। বোনেরা সব করে দিত। আজ ওদের কথা মনে হয়। নিজের রূঢ় ব্যবহারের কথা মনে হয়। রীনার ফটো বের করে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। চোখ দুটো জলে ভরে ওঠে। রীনা ওকে সব দিয়েছে—কোনো প্রতিদানের আশা না করে। আসবার সময় প্রেসার কুকার সহ কেরোসিনের ষ্টোভ, সব দিয়েছে।

পাশের ঘরের অধ্যাপক জিজ্ঞেস করেন—ব্যস্ত নাকি?

—এই রাত এগারটায় কি আর ব্যস্ত হব।

—আমাদের একটা ব্রীজের আড্ডা আছে—যাবেন নাকি, একদিন।

—আমি তাস চিনি না।

—শিখিয়ে দেব।

—না, রুচি নেই।

—সারাদিন তো পড়ান—ডিপার্টমেন্টে সব তো আপনার শত্রু। সে যাই হোক। একটু অবসর বিনোদনও তো দরকার। এবার ঘুমিয়ে পড়ুন।

—অবসর নেব—ষাটের পর অথবা তার আগে যদি মৃত্যু হয়। আচ্ছা, রাত হল।

—তাড়াচ্ছেন? আমি ফিলজফির লোক—টিউশনি জোটে না। কী সাবজেক্ট পড়েছিলাম। সব এখন বাংলায় হয়ে গেছে। নোট বই আছে। কে আর পড়ে বলুন। আগে আগে লজিকে দু'চারটে হত। প্রি ইউনির্ভাসিটিতে পেতাম দু'চারটেকে? অনার্সেও মেয়েরা নোট বই পড়ে। সব বাংলায় হয়ে গিয়ে......আজ দেড়টার পর ক্লাস ছিল না। এসে ঘুমুচ্ছি তো ঘুমুচ্ছি—পাঁচটা পর্যন্ত—সন্ধ্যায় ব্রীজের আড্ডায়। কিছুক্ষন আগে এলাম।

ভদ্রলোক চলে গেলেন।

কি করছে রীনা? স্বামী কিছু জানতে পেরেছে কি? ঠিকানা নেয়নি। চিঠি দিতে ওই তো নিষেধ করে দিয়েছে। বিমলেন্দু দিতে পারে। কিন্তু যদি স্বামীর হাতে পড়ে? এই দেশ—এই শহর—এখানে বাকি জীবন কাটাতে হবে। শহরের নদীর ধারে সব সময় ছাত্র ছাত্রীর ভিড়—ওকে দেখলে আড়ষ্ট হয়—যাওয়া যায় না।

এক ইনসিওরেন্সের দালাল ঘুরছে। একটা ইনসিওর করে নেব। ব্যাঙ্কে টাকা জমেছে। মনটা কলকাতার জন্য হুহু করে। রীনার ফটোর দিকে তাকিয়ে কখন অন্যমনস্ক হয়ে যায়। পাইপ নিভে গেছে কিছুক্ষণ। সেই ছেলেবেলা থেকে চিন্তা কি করে মাস চলবে? আজ আর সে চিন্তা নেই। যা কলকাতায় রোজগার করত সব মিলে—তার চেয়ে বেশি টাকা এখন পাঠায় বাড়িতে। নিজের খরচ খরচা বাদ দিয়ে ব্যাংকেও জমেছে অনেক কিছু। রীনাকে কোনোদিন কিছু দেয় নি। নিজের দারিদ্রের বীভৎসতা তখন ওর কাছে কি ভাবে প্রকট হয়েছে। প্রেম সমানে সমানে হলে মর্যাদা থাকে। রীনার ভালবাসা পাবার পর—রীনা কোনদিন অমর্যাদা করেনি। ওর ভালবাসা দেবীর আশীর্বাদ। বিমলেন্দু

লাইট নিভিয়ে শুয়ে পড়ে। দু'চোখের জলে বালিশ ভিজে যায়। স্বপ্নে দেখল। সেই স্কুল থেকে ফেরবার পথে সিগারেটের দোকানে দাঁড়িয়ে বিমলেন্দু রীনার জন্যে অপেক্ষা করছে—রীনা আর আসছে না। অপেক্ষা করতে করতে ঘুম ভেঙে গেল। রীনা এল না। এই স্বপ্নটা বিমলেন্দু প্রায়ই দেখে।

আজ রোববার। বরুণ সকালে চা খেয়ে ছেলেমেয়েদের নিয়ে পড়াতে বসেছে। ওদের ইংরেজি ও অঙ্ক বেশ শক্ত ভিত্তির দাঁড়িয়েছে। দু'জনেই ক্লাসে ফার্স্ট হচ্ছে। এদের নিয়ে 'ল্যামিসারেবল' পড়া শেষ হয়েছে। ওরা মুখে মুখে ইংরেজিতে গল্পটা বরুণকে শুনিয়েছে। প্রথম অংশটা বলেছে ছেলে, শেষ অংশটা বলেছে মেয়ে। তারপর তা লিখে দেখিয়েছে। বরুণ দেখে খুশি হয়েছে। এবার বরুণ জিজ্ঞেস করেছে, আচ্ছা বলতো তোরা বড় হয়ে কি হবি? তোমার মত জজ হব—যদিও জজ হওয়াকে মাম্মি হেট করে। করুক। —না, রে জজ না। প্রফেসর হবি—কলেজে পড়াবি—ইউনিভার্সিটিতে পড়াবি। আরও কতকি পড়বি? এই দেখ্, কত বই আলমারিতে, পরীক্ষার জন্যে নয়, নিজের আনন্দের জন্যে পড়বি, জ্ঞানের জন্যে পড়বি। পড়বার মত, জ্ঞানের মত আনন্দ আর নেই রে। তোদের সময় মাইনে পত্তর অনেক বেড়ে যাবে। আর দেখ, তোর মা'র মত সুন্দরী বিয়ে করবি না। ছেলে মেয়ে দুটো না বুঝে একবাক্যে বলে 'নেভার'। —জান, মাম্মী আমাদের টলারেট করতে পারে না। বলে, লোকের সামনে আমার কাছে আসবি না—মাম্মী বলে ডাকবি না। মেয়েটি বলে, প্রফেসর হলে আমি তোমার মত ফিগারের একজনকে বিয়ে করব তো—খুব লার্নেড। —হ্যা রে মা। আমার চেয়ে দেখতে খারাপ হলেও চলবে। কিন্তু স্কলারকে বিয়ে করবি। নিজে স্কলার হবি। ক্লাসে যখন পড়াবি—মুগ্ধ হয়ে ছেলেমেয়েরা তোর দিকে তাকিয়ে থাকবে। কত রেসপেকট পাবি। তখন আমি থাকব না। দু'জনে অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে কেন, বাবা। —তার অনেক আগে আমি প্রকৃতিতে বিলীন হয়ে যাব। এটম হয়ে যাব—শেষ পর্যন্ত। হয়তো কোটি বছর আগে এখন থেকে লম্বা জার্নি করে এই আমিতে ইভলভ হয়েছিলাম—কিন্তু মাত্র কয়েক ঘন্টার মধ্যেই রিটার্ন জার্নি শেষ হয়ে যাবে। —তুমি না থাকলে কে আমাদের পড়াবে, বাবা। .....বরুণ বলেছিল, তোরা মাকে মাম্মী বলিস—কিন্তু আমাকে 'বাবা' বলবি। ওরা বলেছিল, তোমার কথা আমরা ওবে করব—যা বলবে। আজ ওরা ইতঃস্তত করে বলে, বাবা, মাম্মী তোমার সঙ্গে এত কোয়ারেল করে কেন? আমাদের খুব খারাপ লাগে। তোমার গায়ে এত জোর বাবা। বরুণ হেসেছিল। বলল, আমি না থাকলে, তোদের জন্য কিছু ব্যবস্থা করে যাব—। শেষে হয়ত কষ্ট পাবি—আমি, তোর পিসি, ঠাকুমা কত কষ্ট করেছি। কিন্তু তখন কত আনন্দে ছিলাম। —পিসি, খুব ভাল, কত কিছু আমাদের প্রেজেন্ট করে। মা আর পিসি কেউ কাউকে ষ্ট্যান্ড করতে পারে না। কতকাল পিসি আসে না—আমরা যাই না। কিন্তু বাবা তুমি এটম হবে কেন? —একদিন সব বুঝবি। বড় হয়ে আমার ডাইরী গুলো পড়িস—প্রমিস—এখন পড়িসনা—কঠিন করে লেখা তো—বুঝবি না। প্রমিস? —প্রমিস। —বাবা, এটমতো ইনভিজিবেল—এটম হলে তো কথা বলবে কি করে। এটা ম্যাজিক বাবা? —সব বুঝবি—একটু সময় লাগবে। —এরপর কোন বই ধরবে? —তোরা ঠিক করে ফেল

নিজেদের মধ্যে। নিজেরা আরম্ভ করে দে—কেমন। তুমি পড়াবে না। —প্রথমে একলা একলা পড়। —ঠিক আছে। —তোরা দু'জনেই আজকের দিনটা মনে রাখিস। —কেন, তোমার বার্থডে তো নয়। —তুমি তো বার্থডে কর না। —আগে মা আর তোর পিসি করত। —তোর মা পছন্দ করে না। —আমরা করব। —ঠিক আছে আগামী বছর থেকে করিস। —ঠিক আছে। এবার করব। পিসিকে ইনভাইট করব তো? —করিস, বেশ ভাল হবে। —রাতে তো মাম্মী থাকে না—জন্মদিনের কথা মাম্মীকে আগে বলব না। তোমার বার্থডে এবার থেকে আমরা করব। বরুণ বলতে যাচ্ছিল—তোদের মধ্যে বেঁচে থাকব। বলল না। —ওরা আবার বলল, আজকের দিনটা কথা কেন মনে রাখব? —আগামী কালই জানতে পারবি? —অল রাইট। ছেলে মেয়েকে চুমো খেয়ে বরুণ একটু আদর করে বলল, যা স্পেল রাইট নিয়ে খেলা কর গে। ওরা একটু অবাক হয়ে চলে গেল। তারপর নিজেদের মধ্যে বলল, বাবার মধ্যে কেমন একটা সরো আছে। মেয়েটি বলল—মা, বাবার সঙ্গে....ছেলেটি মাথা নাড়ে। —তা জানি। বাবা শুধু এ কথা —আই হেট কোয়ারেল।

বরুণ চুপ করে বসে থাকে। মা একটু পরে এসে বলে, আমাকে কমলার বাড়ি পাঠিয়ে দে। —আর দিন-দুই পরে যেও। মা চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকেন—আমি জানি মা, তুমি কি বলবে। আজকে এ শহরে আমার মত স্ত্রৈণ কাপুরুষ কেউ নয়—এ ডিস্ট্রিক্টেও কেউ নেই। আমার মত ভীরু, কাপুরুষ, স্ত্রৈণ—শহরের প্রতিটি লোক আমাকে নিয় টিটকারী দেয়। বলে, যে নিজের স্ত্রীকে শাসন করতে পারে না—সে অপরের বিচার করবে কি ভাবে? আমি এই শহরের একজন ঘৃণিত মানুষ। আমি নিজেকে কত ঘেন্না করি, ধিক্কার দি—আমি আমাকে সহ্য করতে পারি না—আই হেট মাইসেলফ। মা চুপ করে ছেলের দিকে তাকিয়ে থাকেন। —আমি শীগগীরই একটা বন্দোবস্ত করছি। বরুণ উঠে মা'র পায় হাত দিয়ে ছুয়ে প্রণাম করল। একটা কঠিন রায় নিতে হবে—তোমার আশীর্বাদ চাইলাম। জানি—মা, আমি সব জানি। তোমার সঙ্গে মীনা যে রকম খারাপ ব্যবহার করে—তা আমি জানি। তুমি তো জান মা, আমার কোন কন্ট্রোল নেই ওর ওপর। তোমাকে রক্ষা আমি করতে পারি না। অতটুকু তেজ আমার মধ্যে নেই। তুমি একটা অপদার্থ ছেলে গর্ভে ধারণ করেছিলে। মা, আবার যদি জন্ম হয়, বাবার মত বাবা, তোমার মত মা, কমলার মত বোন, আমার বাচ্চা দুটোর মত সন্তান যেন পাই—কিন্তু মীনার মত সুন্দরী স্ত্রী যেন কোনো জন্মে না পাই।

এবার মা বললেন—সুন্দর ওর চেয়ে অনেক দেখেছি—সুন্দর নয়—স্বভাব।

—আমি জানি মা, কিছু লম্পট আর কামুক ছাড়া ওকে কেউ পছন্দ করে না। সমস্ত শহরে ওর নামে প্রতি সপ্তাহে একটা করে স্ক্যান্ডাল হয়। আমি নিতান্ত ব্যক্তিত্বহীন, অন্ধ—মেরুদণ্ডহীন কাপুরুষ—কি বলে নিজেকে গাল দেব বল? তবে পরিণতির আর দেরি নেই। দু'দিন অপেক্ষা কর।

—আমাকে কমলার কাছে পাঠিয়ে দে।

—তাই যাবে—তবে দিন দুই অপেক্ষা কর। বাচ্চা দুটো পর্যন্ত ওকে ঘৃণা করে। মা ছেলের দিকে তাকাতে তাকাতে যান, মনে মনে বলেন জ্ঞানপাপী।

দিন দুই আগে, রাত একটায় মাতাল অবস্থায় এস.পির ড্রাইভার ওকে নামিয়ে নেয়।

বরুণ ওকে ধরে ওর ঘরে শুইয়ে দেয়। মা উঠে দাঁড়িয়ে দেখেন। বহু দিন হল ওরা আলাদা শোয়। মীনাই বলেছে, তোমার সঙ্গ বড্ড এক ঘেয়ে—মনটনাস। আমি সেপারেট শুতে চাই। বরুণ রাজি হয়ে পাশের ঘরে ব্যবস্থা করে দিয়েছে। মা বাচ্চাদের নিয়ে আলাদা ঘরে শোয়।

পরদিন ভোরে বরুণ বলে, মীনা, তুমি মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছ আজকাল।

—মাত্রা আমি ছাড়িয়েছি বহুদিন আগে—তুমি ইচ্ছে করে চোখ বুজে ছিলে—যাতে দেখতে না হয়। তা হঠাৎ গ্রেট যে। স্ত্রৈণ স্বামীর পৌরুষ জাগল নাকি?

—তুমি আমাকে ছেড়ে দাও—লেট আস' সেপারেট।

—তা তো হবে না। আমি তোমার মত একটা স্বামী চেয়েছিলাম। যে আমার শুধু অফিসিয়াল হাসবেন্ড হবে। দু'টো সন্তান তোমাকে দিয়েছি—এখন তোমাকে ছুঁতেও আমার ঘৃণা হয়। তুমি মামলা কর—আমি কনটেষ্ট করব। তার আগে আমি তোমার নামে এফ আই আর করব—আমার ওপর নির্যাতন কর।

—আজ শহরে তুমি কত হেটেড জান?

—না, আমি শহরে বহু লোকের কাম্য। সমাজে থাকলে একটা হাসবেন্ড দরকার। আমি একজন পুরুষকে বেশিদিন সহ্য করতে পারি না—এ কথা বহুবার তোমাকে বলেছি—যাদের সঙ্গে মিশে দু'দিন পরে কাটিয়ে দিয়েছি—তাদেরও বলেছি। আমার মত সুন্দরী মেয়ে কারো ব্যক্তিগত সম্পত্তি হতে পারে না।

—আমার স্ত্রীর পরিচয় থেকে তুমি নিজেকে মুক্ত করে নাও।

—নেভার। কেস করতে চাও করো—তবে তা আমার ফেভারে যাবে—এখনকার অফিসার মহল তোমার বিরুদ্ধে—সকলে আমার পায়ের চাকর। তুমি কি করবে।

—মামলাটা তোমার চেয়ে ভালো বুঝি আমি।

—তোমার মত একটা বোরিং হাসবেন্ড। বাবা আই.এ.এস পাত্র খুঁজছিলেন। কিন্তু তারা পনেরো বিশ হাজার টাকা পণ চাচ্ছিলেন। পছন্দ করেও তারা টাকার অঙ্ক কমান নি। আমি এখন এ সব আই.এ.এসদের চাকরের মত নাচাই। তাদের টাকায় মদ খাই—তাদের স্ত্রীদের রাতের ঘুম কেড়েনি। সবাই বলে, বুরোক্র্যাটদের আমি সৌন্দর্যে মাতাল করে দিয়েছি। ওদের পনেরো বিশ হাজার টাকা খসিয়ে আমি এক এক জনকে কিক্ করব। তোমার বোঝা উচিত ছিল, যখন দু'টি সন্তান হবার পর আমি নিজে যেচে লাইগ্রেসন কেন করে নিলাম।

—এই এমেচারী প্রষ্টিটিউট হবার জন্য লাইগ্রেসন।

—উর্বসী বেশ্যা নয়? স্বর্গের দেবীদের চরিত্র কেমন? তারা কি আমার চেয়েও সুন্দরী। প্রত্যেকের মুখ দিয়ে আমি বলে নিয়েছি, আমার চেয়ে সুন্দরী সিনেমাতেও দেখেনি। শুধু কি অফিস মহল—ব্যবসায়ীরা আমার পেছনে ঘুর ঘুর করছে না। তুমি আমার হ্যাসবেন্ড—এটাই তোমার পক্ষে যথেষ্ট। আর কিছু আশা কর না।

—আমার স্নায়ুর ওপর এত অত্যাচার কর তুমি। আসলে তুমি মানসিক ভাবে অসুস্থ—স্যাডিষ্ট—অপরকে পীড়ন করে তুমি একটা পারভার্টের প্লেজার পাও।

—উল্টো কথা, অপরে আমাকে দেখলে—একবার তাকালে ধন্য হয়ে যায়। আমার সঙ্গ তাদের এত প্লেজার দেয়। না, ডিভোর্স তুমি পাবে না। আর আমি? আমার মত

চলব। তুমি আমার সঙ্গে যত কম কথা বল—একেবারে যদি নাও বল—আমি খুশি হব। আমি তোমাকে ঘৃণা করি বুঝতে তোমার অসুবিধে হওয়া উচিত নয় তো। ও তো আমি গোপন করি না। আজ এ শহরে কত লোক আমাকে ডিজায়ার করে তুমি জান? আমি বেশিদিন একজনকে ফেবার করতে পারি না। কারণ আমার রক্তে বহু স্টেসনের আকাঙ্ক্ষা। তবে আমি তোমার মত বুদ্ধিজীবী এফিমিনেটদের ফেবার করি না। তোমাকে বুদ্ধিজীবী আমি বলি না—তোমার সহ কর্মীরা বলেন, ইনটেলেকচুয়াল। আমি তাদেরও বলেছি, বুদ্ধিজীবিরা বোরিং। আমি পছন্দ করি, যে ম্যানলি তাকে। চক্রবর্ত্তী, সান্যাল, মিশ্র, চাটার্জী এদের—এরা সেদিন পাঁচটি চরমপন্থীকে গুলি করে মারল—জানাল এনকাউন্টারে মরেছে। খুন করতে পারে। মিথ্যা বলতে পারে সাহসের সঙ্গে—একটা প্রচণ্ড জোর এদের মধ্যে। কিন্তু আমার কাছে এদের জোরও যখন কাপুরুষ ও স্ত্রৈণতায় বোর হয়ে ওঠে—আমি নির্দ্বিধায় তাদের ছেড়ে দি। একবার ফেবার দেখালেই—তাকে চিরকাল ফেবার দেখাতে হবে—অমন আবদার আমার কাছে নেই। সব ষ্ট্রং ম্যান দেখলাম—ষ্ট্রং যখন দুর্বল—আমি লাথি মেরে চলে আসি।

—তোমার লাম্পট্যের কাহিনী বন্ধ কর। তুমিও আমার ঘরে এস না।

—কেন, শুনতে শুনতে জেলাস হচ্ছ? তোমার ঘরে থাকি—এই ফেবারটুকু তোমাকে করি—এতেই সন্তুষ্ট থাক। আর কোন ঘরে আমি আসব বা আসব না তা আমার ইচ্ছা।

মীনা চলে গেল।

বেশ কিছুদিন হল মীনার সঙ্গে পার্টিতে যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছে। পার্টিতে মীনা অপরের সঙ্গে নাচে, মদ খায় প্রচুর পরিমাণে—তারপর কেউ একজন ওর হাত ধরে টেনে নিয়ে যায়—বরুণের দিকে চেয়ে হাসতে হাসতে বলে—লুক হিস ফেস্—ফেস অফ এন এফিমিনেট।

বরুণ আর যায় না। বাড়ি থাকলে যদি রায় লিখতে হয় লেখে। মনোযোগ দিতে পারে না—সারা দিন মীনার কথা চিন্তা করে। মীনাকে কেন চাবুক মারতে পারে না—কেন রুচিতে বাঁধে। আবার মীনার হাসি মুখ, ওর বিরক্ত মুখ—ওর উচ্ছিষ্ট দেহকে কেন ঘৃণা করতে পারে না। পড়তে পারে না, হিয়ারিং শুনতে শুনতে অন্য মনস্ক হয়ে যায়। শহরে মানুষের কাছে লজ্জায় মুখ দেখাতে পারে না। মীনার বিশ্বাসঘাতকতায় তেমন করে ক্রুদ্ধ না হতে পেরে নিজেকে ঘৃণা করতে আরম্ভ করেছে। মীনার জন্য গাড়ি আসে—হর্ন বাজে—মীনা অপরূপ সাজে বেরিয়ে যায়। কোনো ভ্রুক্ষেপ না করে। মা'কে যাতা বলে। রান্নার লোক মীনার ভয়ে তটস্থ হয়ে থাকে। ছেলে মেয়েরা মা'র কাছেও ঘেষে না। মীনা বেরিয়ে যাবার পর বরুণ একটা অস্থির চিত্তে বসে থাকে। ঘুমের ওষুধ খায়। তেমন ঘুম হয় না—রাত করে মাতাল মীনাকে বরুণই ঘরে পৌঁছে দেয়। অনেক সহ্য করেছে। বরুণ এখন যেন নিজেকে সহ্য করতে পারে না। নিজেকে ওর মত ঘৃণা কেউ করে না। নিজের জীবনের নিষ্ফলতা ওর কাছে আজ স্পষ্ট। মীনা ওর অবসেসন হয়ে গেছে। মীনা ছাড়া কিছু ভাবতে পারে না। ডাইরীতে মীনার ব্যবহার লিখে রাখে—লিখে রাখে নিজেকে ঘৃণার কথা। অথচ ওর মনে হয়—এত শুনেও মনে হয়, মীনা ছাড়া জীবন নিস্ফল। মীনাকে কতটা ভালবাসে—কতটা ঘৃণা করে বড়

কথা নয়—শুধু মীনার চিন্তা—ও এখন কার সঙ্গে? মাতাল? চরম মিলনের কথা ভেবেও বরুণ কষ্ট পেয়েছে—তবু, মীনাকে রাতে ঘরে পৌঁছে দেয়—এই ঘৃণ্য মুহূর্তটার জন্যে সারাদিন অপেক্ষা করে থাকে—ঐ টুকুই মীনার স্পর্শ পায়। ঘুমের ওষুধেও ঘুম হয় না। ঘুম না হলে বড় কষ্ট হয়।

আজ রোববার—ঠিক করে নিল—আজই ওর জীবনের শেষ দিন। কমলাকে দেখতে বড় ইচ্ছে করছে—একটা মাত্র বোন। কিন্তু মীনা যোগাযোগ রাখতে নিষেধ করেছে। মীনাকে অমান্য করতে ওর সাহস হয় না। মীনার ওপর ঘৃণা—বিদ্বেষ—ভালবাসা দিয়ে বরুণের মনের অবস্থার ব্যাখ্যা করা যায় না। বরুণ মীনা ছাড়া কিছু ভাবতে পারে না। আর মীনার ভাবনা মানেই নিজের অন্তরের ক্ষতের যন্ত্রণা বাড়িয়ে তোলা। আজ মীনার চিন্তা—ওর কাছে মনের ক্যান্সারের মত যন্ত্রণাময়। অথচ ক্যান্সারের শেষ আছে। মীনার চিন্তার শেষ নেই। মীনাকে যতটা ঘৃণা করে—নিজেকে তার চেয়েও ঘৃণ্য মনে হয়।

রোববার আর ঘুমের ওষুধ খায়নি। বরুণ চুপ করে বসে আছে। সেদিন রাত এগারটায় মীনা টলতে টলতে এল—বরুণ বের হল না। মীনা প্যাসেজে বসে পড়ল। রাঁধুনি এসে ধরে ওকে ঘরে দিয়ে এল। বাবু বের হলেন না দেখে একটু অবাক হল। রোজই এ দৃশ্য সে দরজার আড়াল থেকে দেখে। রাতে মীনা খায় না। খেয়ে আসে। মাও জেগে থাকে। মনে মনে বৌকে অভিসম্পাত দেয়। ছেলের জন্যে ধিক্কারে মন ভরে যায়।

বরুণ বের হল না। সুইসাইড নোট—নিজের প্যাডে লিখল। ওর মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ী নয়। একটা সকালেই লিখেছিল—ওর উকিলকে—ওর যা পাওনা যেন সে নমিনিকে আদায় করে দেয়, ছেলে মেয়েদের শিক্ষার জন্য টাকা, প্রভিডেন্টফান্ড ও গ্রাইচুইটির টাকা ছেলে মেয়ে পাবে—ক'দিন আগেই নমিনি বদল করে দিয়েছে। ইনসিওরের টাকাটা ছেলে মেয়ে পাবে—আর ফ্যামিলি পেনসনের যে ক'টা টাকা—তা কেবল মীনা পাবে—এই তার ইচ্ছা। ইনসরেন্সের টাকার নমিনি নিজে অফিসে গিয়ে বরুণ বদল করে এসেছে ক'দিন আগেই। তিনটি ইনসিওর দিত। দু'টি ছেলে মেয়েদের শিক্ষার জন্য। আর একটি নমিনি মীনা ছিল। মীনার নাম বদলে ছেলে মেয়ের নাম করে দিয়েছে। ওর ইচ্ছে টাকাটার সুদ দিয়ে এখন ওদের সংসার চলবে। আর ব্যাংকের টাকা অল্প কিছু রেখে বাকিটা তুলে নিল। আগেরটা যৌথ ছিল। এসব কাজের জন্যে দুটো চেকও চিঠির সঙ্গে দিয়ে এনভেলাপে ভরে আজই ডাকে ফেলে দিয়ে এসেছে। দ্বিতীয় চেকটির টাকা ছেলের হাতে গোপনে যেন দিয়ে দেয়—যেন বলে দেয় মাকে না জানাতে কিছুতেই এটি ওর বাবার শেষ অনুরোধ। আসলে একমাত্র ফ্যামিলি পেনসন ছাড়া—ওর সব কিছু সঞ্চয় ছেলে মেয়ে পাবে—ব্যাঙ্কের টাকা পর্যন্ত। সুইসাইড নোট লিখে চুপ করে বসল। মন ফাঁকা। বহুকাল পর আজ একটা শান্ত স্তব্ধ অনুভূতির স্নিগ্ধ বাতাস অনুভব করল। অনুভূতিটা থাকতে থাকতেই বরুণ রিভলবার বের করে টোটা ভরে টিগার টিপল। হঠাৎ রিভলবারের আওয়াজে মা ছুটে এলেন—ছেলের রক্তাক্ত দেহের ওপর পড়ে চিৎকার করে কাঁদতে লাগলেন। রাঁধুনি ছুটে এল। কান্নার আওয়াজে ছেলে মেয়ে ছুটে এসে হতভম্ব হয়ে তারপর বাবা বাবা বলে বরুণের

ওপর ঝাপিয়ে পড়ল। এবার আশে পাশের বাড়ি থেকে কান্নার আওয়াজ পেয়ে সব ছুটে আসতে লাগল। দরজা ধাক্কা দিতে থাকল। রাঁধুনি দরজা খুলে দিল। সামনে দু'জন সাব জজ, এক জন ডেপুটি সস্ত্রীক ঢুকলেন—আরো অনেকে। লোকে ঘর ভরে গেল। অনেক পরে মীনা প্রায় টলতে টলতে এল। তারপর বলল, কাওয়ার্ড, এ ফি মিনিটে।

শান্ত মনে মরবার সময় বরুণ ভাবল, শহরের লোক অন্তত এটুকু জানবে—মরবার সাহস ওর কাছে—যত কাপুরুষ ওকে ভেবেছে—তত নয়। মীনার মতো অমন সুন্দরীকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিতেও চায় না। অমন সুন্দরকে প্রাণহীন করতে ও পারবে না—যদি তা হৃদয়হীন ছিল। তবু তা ও পারবে না। কিন্তু মীনা ওকে বাঁচতে দিতে চায় না। মীনার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক। মীনা যে ওকে রোচনা দিচ্ছিল—তা বুঝতে ওর কোনো অসুবিধে হয়নি। এবার মীনা স্বাধীন। এবার কারও ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়। পুলিশ এসে বডি নিয়ে গেল রাত তিনটায়। সুইসাইড নোটও নিয়ে গেল।

পরদিন বিকেলে শ্মশানে বরুণের দাহ হল। ছেলেটি কাঁদতে কাঁদতে মুখাগ্নি করল। শহরের বহু গণ্যমান্য লোকই ছিলেন। সকলের অনুচ্চারিত মত হল এ ছাড়া কোনো উপায় ছিল না। জজ সাহেব বললেন মানুষটা স্কলার ছিল, চিন্তাশীল ছিল। আইন ভাল জানত। চমৎকার ইংরেজি বলতেন। নির্ভীক ছিলেন—কিন্তু কারও সঙ্গে ঝগড়া করতেন না। রুচিশীল ছিলেন। নিজেকে এ ভাবে শেষ করলেন.....উপায় কি?

মীনার ক্লাবের সহচররা সস্ত্রীক শ্মশানে উপস্থিত ছিলেন। তারা বেশ সোচ্চার ও তাদের বক্তব্য স্পষ্ট। বরুণবাবুর উচিত ছিল মীনাকে হত্যা করা। স্বামীদের শুনিয়েই তারা বলল।

মীনার দাদা এসেছিল। এদিকে টাউনহলে শোক সভা হল। বক্তারা বরুণের পাণ্ডিত্য, মননশীলতা, নির্ভীকতা, তীক্ষ্ণ আইন জ্ঞান, ভদ্রতা ও উন্নত রুচির প্রশংসা করলেন। শোকসন্তপ্ত পরিবারকে গভীর বেদনা জানিয়ে এই বেদনার শরিক যে তারা তাও জানালেন। শ্রাদ্ধের টাকা উকিলই দিলেন। উকিল গোপনে অল্প কিছু টাকা ছেলের হাতে দিল। মীনার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি থেকে তা ছেলে বাঁচাতে পারল না। উকিল এটাই আশঙ্কা করেছিলেন। ছেলেকে বললেন, টাকার দরকার হলে আমাকে লিখো। বরুণের মা রাঁধুনিকে নিয়ে কন্যার উদ্দেশ্যে চলে গেলেন। দাদা সব জিনিস পত্র ট্রাকে পাঠিয়ে ছেলেমেয়ে ও মীনাকে নিয়ে রওনা হলেন। কেউ আর মীনাকে স্টেসনে শেষ অভ্যর্থনা জানাতে এল না। মীনার দাদা রাঁধুনীর কাছে সবই শুনেছিলেন। মীনা তখন বাড়িতে ছিল। জানতে পেরেও চুপ ছিল।

ট্রেনে উঠে বরুণের মা'র নাতি নাতনী দুটোর জন্যে প্রাণ হুহু করতে লাগল ওরা। যে একসঙ্গে বাবা আর ঠাকুমাকে হারাল—ওদের যে আর কেউ রইল না। ট্রেনে বার বার সেই কথা মনে পড়তে লাগল। রাধুনি বলল—আমি তো ঠিক করেছিলাম, এ বাড়ি ঘেন্নায় ছেড়ে দেব। একটা মাকাল ফল ঘরে এনে ঘর ভাঙল। জলজ্যান্ত মানুষটা নিজে মরল। ঐটাকে মারতে পারল না। যাই বল, তোমার ছেলে কেমন পুরুষ। আসলে মানুষটা যে বড় ভাল ছিল।

বহু দিন পর্যন্ত শহরে বরুণের আত্মহত্যা ও মীনার লাম্পট্যের গল্প লোকের মুখে মুখে ফিরত।

নরেন নার্সিংহোমের দিকে তখন মোটর নিয়ে বেশ গতিতেই যাচ্ছিল—তখন ওর অন্তর বলছিল, তোমার মৃত্যু আসন্ন, যেও না—গেলেই বলবে। এই সেই অন্তর—হয়ত ইনটিউশনও হতে পারে—যা কখনও ভুল আশঙ্কা করে না। তবু, আজ নরেনের মনে একটু দ্বিধা ছিল—সামান্য দ্বিধা—ইনটিউশনের ছদ্মবেশে ভয় নয় তো। আবার আজকের সকালের সেই নেই হয়ে যাওয়া একটা ক্লেয়ায়েন্স—ভবিষ্যৎ-এর একটা আগামচিত্র মৃত্যুর দিকেই ইঙ্গিত করে। হোক ভয়, হোক মৃত্যু—যাই আসুক—সমস্ত ছেলেবেলা শাসনের মধ্যে থেকে—এখন একটা অধীর নীরব প্রতিবাদ ওর অন্তরে এসেছে। আমার স্ত্রীকে রিভলবার দেখিয়ে টাকা নিয়ে যাবে—প্রায়ই ফোন করে জানাবে—আমি রোগীদের শোষণ করছি—রোগীদের নিয়ে ব্যবসা করছি। দরকার পড়লে আমাকে সরিয়ে দেয়া হবে। এই মৃত্যুভয় দেখানোতেই ওর রাগ সবচেয়ে বেশি। একটা দুর্বার ক্রোধ আর জেদ নিয়ে নার্সিংহোমের সামনে গাড়ি থামাল। নামতেই চোখে পড়ল—রিসেপসনের সামনে একটি ছেলে রিভলবার তাক করে টেলিফোনের সামনে দাঁড়িয়ে। নামতেই গোটা তিনেক ছেলে ওর সামনে এসে রিভলবার তুলল।

সজোরে নরেন বলল—রিভলবার নামাও—কি চাও তোমরা।

—আমাদের গণ আদালত স্থির করেছে, আপনার মৃত্যুদণ্ড।

—গণ আদালত আবার কোন আদালত। গণ আদালত বলে কিছু হতে পারে না। আদালতে বিচারক হতে গেলে তার যোগ্যতা দরকার। বিচার করবার অধিকার তোমাদের কে দিয়েছে—কোন বিশ্ববিদ্যালয়। গণ-আদালত তোমাকে একটা হার্ট অপারেশন করবার নির্দেশ দিতে পারে? খুন করতে চাও কর। কিন্তু একদল লোক কখনও আদালত বানাতে পারে না। আইন বিশেষজ্ঞ হতে হয়।

—ও সব বুঁজোয়া ধারণা ছেড়ে দিন। জনগণ বিচার করবে।

—কোথায় সেই জনগন যে আমার কোনো কথা না শুনেই আমার বিচার করবে। তোমরা ক'টা কলেজ পালানো ছেলে—পরীক্ষায় ভাল ফল করতে না পারলে মুখ দেখাতে পারবে না—এই জন্যে এ আন্দোলনে যোগ দিয়েছ।

—আমরা বি.এ. বি.এস.সি তে অনেকেই ফার্স্ট ক্লাস পেয়েছি।

—টায়ে টোয়ে পেয়ে থাকতে পার—কিন্তু এম.এ. বা এম.এস. সিতে ফার্স্ট ক্লাস পাবে নিশ্চিত জানলে তোমরা পড়া ছেড়ে দিতে না। তোমার আত্মীয়স্বজন বন্ধু বান্ধব জানে, তোমরা অসাধারণ—আসলে অতি সাধারণ ভালো ছেলে তোমরা—জান অসাধারণ নয়—নিজেরা পরীক্ষায় অসাধারণ হতে পারবে না বলেই বাড়ি থেকে পালিয়েছ। যাতে বলতে পারে, পড়লে ফাস্ট ক্লাস পেতই। উৎকট কিছু করে লোকের কাছে অসাধারণ হতে পার।

—আপনি রোগীদের শোষণ করেন।

—আমি রোগীদের বাঁচাই। প্রাণ দিই। ভিজিট নি।

—এত ভিজিট নিয়ে আপনার খাই মেটেনা—হাজার টাকার জন্যে একজন কমরেডের বিরুদ্ধে ডাইরী করিয়েছেন।

আরেকজন বলল—অন্যান্য অনেক ডাক্তার ভিজিট কমালেও আপনি কমাননি।

রাতে বের হন।

—আমার মত যোগ্যতা পশ্চিমবঙ্গে কম আছে। আমার ভিজিট বেশি হবেই। আজ পর্যন্ত একটা রোগীও আমার হাতে মরেনি। আর রোগীরা বলেছে, আমি তাদের শোষণ করি?

—বলেছে—বলেছে।

—কেউ বলেনি। তোমরা মিথ্যা থিওরির ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছ। মিথ্যা কথা বলা, খুন করা এই হচ্ছে তোমাদের কাজ। ক'জন মিলে একজনকে পিটিয়ে মেরে তার নাম দিচ্ছ গণ পিটুনি—কিছুদিন ধরে তোমাদের এ উৎপাত আরম্ভ হয়েছে। ক'টা রিভলবার আর খুন করবার থিয়োরী ও প্র্যাকটিস গভর্নমেন্ট অচিরেই সমূলে শেষ করে দেবে।

—কেউ আমাদের শেষ করতে পারবে না। আমরা ইতিহাসের দূত।

—তোমরা ইতিহাসের আঁস্তাকুড়—জঞ্জাল।

—এই ফায়ার কর।

—আমাকে মেরে কুকুরের মত পালাবে—আর এক কুকুর এসে গন্ধশুঁকে তোমাদের ধরিয়ে দেবে। কুকুরই কুকুরের গন্ধ চেনে।

—মৃত্যুর জন্য তৈরি হন।

—তোমরাও তৈরি হও—তখন পুলিশের হাতে পায়ে ধরবে.....।

এক সঙ্গে ক'টা গুলি লাগতেই নরেন লুটিয়ে পড়ল। কমলা আর ঘুমন্ত ছেলেদের ছবি মনে আসতে আসতেই শেষ হয়ে গেল।

ওরা দৌড়ে পালাল। ওরা যেতে ছেলেটি বাইরে এসে নরেনের পাশে দাঁড়িয়ে কাঁপতে লাগল। কিছুক্ষণ পর চেঁচাতে শুরু করল। নার্স ডাক্তার বেরিয়ে এল। ওদিকে নরেনের ডিসপেনসরি দোকান থেকে ছেলেটা বেড়িয়ে এল। ওরা ডাক্তার আসতেই টেলিফোনের তার কেটে দিয়েছিল। রেসিডেন্ট ডাক্তার পরীক্ষা করে বললেন—না, সঙ্গে সঙ্গে শেষ—মাথায়, হার্টে, পেটে—ঝাঁঝড়া করে দিয়েছে। একজনকে থানায় যেতে হবে। ডিসপেনসরিতে তো ফোন আছে— ঐখান থেকে ফোন কর। আর একজন—কে যাবে? এই এম্বুলেন্সের ড্রাইভারকে নিয়ে এসে তো? তাকে ডাক্তার সাহেবের বাড়িতে খবর দিতে যাও। আমাদের নাইটগার্ড কোথায়? —সে ঘুমুচ্ছে। বেশ—একজন জুনিয়ার ডাক্তার বলল—আমি সঙ্গে যাচ্ছি। ডিসপেন্সরিতে সুব্রত জেগে উঠে সব শুনে তক্ষুনি প্রথমে এস.ডি.পিও কে ফোন করল। অপারেটর ফোন দিতে চায় না। তখন বলল—ডঃ নরেন গাঙ্গুলী খুন হয়েছেন—তাই জানাচ্ছি। এস.ডি.পিও—ফোন ধরে বললেন—সে কি ডঃ গাঙ্গুলী খুন হয়েছে—এখনও পুলিশ আসেনি। আমি আসছি। —থানায় ফোন করতেই জানাল—যাচ্ছি এক্ষুনি। সিনিয়র ডাক্তার বললেন—এই শহরে রোগী মরে গেলেও আর রাতে ডাক্তাররা বের হবে না। কাকে মারলি তোরা। এত বড় সার্জেন—আমাদের দেশে ক'জন আছে। পসার বেশি হলেই মারতে হবে। আরে—ওর ডিগ্রিগুলো দেখ।

আস্তে আস্তে নাইটের স্টাফ প্রায় সবাই নেমে এল। —একটু আগে যদি টের পেতাম—অন্তত একটা হল্লা তো করা যেত।

ইতিমধ্যে কমলা ব্যস্ত হয়ে নেমে বলল—ওকি, ও এমন ভাবে রাস্তায় পড়ে কেন—

এত রক্ত—ডাক্তার ওকি নেই? ওগো, ওগো, এমনভাবে তোমাকে ওরা মারল—সবাইকে তুমি বাঁচাও—ওগো, একী হল—আমি দম নিতে পারছি না—মাথার মধ্যে। কমলা অজ্ঞান হয়ে গেল। ওকে নিয়ে আউটডোরে একটা কড়া ঘুমের ওষুধ দিতে শুইয়ে দেয়া হল।

প্রথমে এস.ডি.পিও রিভলবার হাতে নামল। পুলিশ আসেনি এখনও? প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই থানার ওসি দলবল নিয়ে হাজির হন।

—আধঘন্টা আগে ডঃ গাঙ্গুলীর ফোন পেয়ে আমি আপনাকে নির্দেশ দিলাম—আর আপনি এত পরে এলেন।

—আজ্ঞে—একটু বাথরুমে—

—আপনি কাউকে তক্ষুনি পাঠালেন না কেন?

এবার রিসেপসনিষ্ট বললেন—ডাঃ বাবু অনেকক্ষণ ওদের সঙ্গে তর্ক বিতর্ক করেছেন।

—অর্থাৎ ওদের তর্কে এনগেজ করে আমাদের অপেক্ষা করেছেন।

—কি, কি কথা বার্তা হয়েছে শুনেছেন—সব শুনেছি—প্রতিটি কথা আমার অন্তরে গেঁথে গেছে।

—সবটা লিখে দেবেন আমাকে। আপনিও ফোন করেছিলেন।

—আজ্ঞে, রিভলবার ধরে আমাকে ফোন করতে বললেন। আমি ভয়ে কাঁপছিলাম। আবার ডাক্তারবাবু ফোন করে কনফার্ম করলেন। ডাক্তারবাবু এসে পৌঁছতেই ওরা লাইন কেটে ছিল।

—ডাঃ বাবু বাড়িতে—

—স্ত্রী এসে অজ্ঞান হয়ে গেছেন—তাকে ঘুমের ওষুধ দিয়ে কেবিনে রাখা হয়েছে।

—আচ্ছা বডি পোষ্টমর্টেমে পাঠিয়ে দিন।

তারপর ও.সি'র দিকে তাকিয়ে বলল—ওরা হেটে আধঘন্টার মধ্যে কতদূর যেতে পারে—অনুমান করে সার্চ করুন—ডগস্কোয়াডে ইনফর্ম করছি। তবে আপনাকে আমি ছেড়ে দেব না—আপনার ডিলে করবার কোন কৈফিয়েৎ নেই। এই থানাগুলো অপদার্থ হয়ে গেছে। সেদিন এস.পি বলছিলেন, আমরা সবার গান সারেন্ডার করতে বলেছি—সারেন্ডারও হয়েছে—অথচ যারা তখনও সারেন্ডার করেনি—তাদের নাম লিক হয়ে চলে যাচ্ছে উগ্রপন্থীদের হাতে। আশ্চর্য। এ নিয়ে এডমিনিষ্ট্রেসন চলে। বডি নিয়ে দারোগা চলে গেলেন। রিসেপসনের ছেলেটা ইতিমধ্যে নরেন ও ওদের মধ্যে কথোপকথনটা লিখে এস.ডি.পিও কে দিল। সে পড়ল। চুপ করে থেকে বলল—আমার স্ত্রী ছেলেকে বাঁচাল—আমি ওকে বাঁচাতে পারলাম না। আমি বের হতে নিষেধ করছিলাম—তা ডাক্তার তো—ওর মত ডাক্তার—চুপ থাকতে পারে না। সন্দেহ হয়েছে—তবু ঝুঁকি নিয়ে রোগীকে বাঁচাতে এসে নিজে মরলেন। এদের আমি সাফ করব।

পরদিন নরেনের মৃত্যুর প্রতিবাদে হাসপাতালের ডাক্তারা বারো ঘন্টার কর্মবিরতি পালন করলেন।

কমলা নিজেই নরেনকে সাজিয়ে দিল। তারপর ছেলে মেয়ের হাত ধরে মোটরে—

শবের পেছনে এল। সমস্ত শহর ভেঙে পড়েছে। বলতে গেলে সেদিন শহরে অঘোষিত হরতাল। কাতারে কাতারে লোক শ্মশানের দিকে চলেছে। এই শহরেই কর্মজীবন শুরু করেছিল—এই শহরের শ্মশানেই ওর শেষ ঠিকানা।

পরদিন ছেলে মেয়ে দুটোকে বুকে চেপে কমলা বলল, বাবার মত হবি—তোরা দু'জনেই নাম কড়া ডাক্তার হবি। তোর বাবা সব রেখে গেছেন। মানুষটা অন্তরে ছিল নিস্পৃহ বৈরাগী।

পরদিন মা'কে দেখে—দাদার মৃত্যু সংবাদ পেয়ে কমলা স্তম্ভিত হয়ে গেল। অনেক পরে বলল, আজ আমার আর কেউ নেই। মাথার উপর কেউ নেই। হয়ত ভগবানও নেই। আমি একা, এত দায়িত্ব, আমি কোথায় এত শক্তি পাবো—কে আমাকে শক্তি দেবে।

সব ক'টা ঘর ঘুরে বলল—কোনো ঘরেও নেই। আর কোনো ঘরে থাকবে না। জানি, তবু খুঁজলাম। আমাকে ওদের মানুষ করতে হবে। এ অন্যায়ের কি কোনো প্রতিকার নেই। নিষেধ করেছিলাম বের হতে। শুনল কই।

সত্তর দশকের প্রথমেই এসে এই কাহিনী থামল।

কাহিনীতো এখানেই শেষ। তবু, একটু পরিশিষ্ট যদি থাকে—ক্ষতি কি? দেখাই যাক না। এ কাহিনীর পাত্রপাত্রী যারা শেষ পর্যন্ত টিকে গেলেন—তারা এই শতাব্দীর শেষ বছরে কে, কোথায়, কেমন আছেন বা আছেন কিনা।

কল্যাণ ডিরেক্টার হয়ে অবসর নিয়েছে। সল্টলেকে সুন্দর বাড়ি করেছে। মোটরের মডেল অনেক পাল্টেছে। রীনার দুটি সন্তান। প্রথমটি মেয়ে—অপূর্ব সুন্দরী। রীনার মা বলেছিলেন, দেখতে মীনার মত হয়েছে। পরে ছেলেটি কল্যাণের মত। ছেলেটি ইঞ্জিনিয়ার। বিলিতি ডিগ্রি আছে। মেয়েটিও ডাক্তার—বিলিতি ডিগ্রি তারও আছে। দু'জনেই আমেরিকা থাকে। দু'জনেরই বিয়ে হয়েছে—নিজেরাই করেছে। তিন বছর পর হয়তো একবার ক'দিনের জন্যে এসে থেকে যায়। ইদানীং অনেক দিন আসেনি। রীনার মাথার সামনের দিকে চুল পেকেছে। একটু মোটাও হয়েছে—তবে তেমন উল্লেখযোগ্য নয়। একজন গুরু ধরেছে। দীক্ষা নিয়েছে। প্রায়ই যায় উপদেশ শুনতে। কখনো যায়, বেদান্ত মঠে, গীতা ভাষ্য শুনতে বা শ্রীমদভগবত আলোচনা শুনতে। ঠাকুর ঘরে বসে অনেকক্ষণ জপ করে। কল্যাণ ঈষৎ ব্যঙ্গ করে বলে, জপ মানে তো নাম জপ—ভগবানকে তোষামোদির দরকার হয় না। ভগবান তার মহিমা শুনতে চান না। আমাদের নাম-ক্ষমতা-লোলুপ নেতাদের চেয়ে ভগবানের রুচি উন্নত হতে বাধ্য। না হলে তিনি ভগবানই নন। রীনা জবাব দেয় না। নিজের মত জপ করে যায়। মাঝে মধ্যে গুনগুন করে পূজা পর্ব থেকে কিছু গান করে। গুরুর উপদেশ, সাধু প্রসঙ্গ, গীতা, ভগবত আলোচনা ও গান নিয়ে নিজের মনে থাকে। কল্যাণ বাধা দেয় না—কদাচিৎ ব্যঙ্গ করে। রীনা গায় মাখে না। বাকি সময় টি.ভি. দেখে। কল্যাণের চুল পেকেছে। রক্তে শর্করা ধরা পড়েছে। প্রেসারও খুব হাই। নিয়মিত ওষুধ খেতে হয়। তাছাড়া ঘুম

হয় না। ঘুমের ওষুধও খেতে হয়। একটু শীর্ণ হয়েছে। বেশ সৌম্য চেহারা হয়েছে কল্যাণের। বার্ধক্যে মানুষ সুন্দর হয়—কল্যাণকে দেখে তা মনে হয়। তবে কল্যাণ ঠিক বৃদ্ধ এখনও হয়নি—অবসর নেয়া আর চুল পাকা ছাড়া বার্ধক্যের আর কোনো লক্ষণ ওর চেহারায় নেই। তবে সৌম্য চেহারার অন্তরালে কল্যাণ একটু খিটখিটে হয়েছে। অল্পেতে রেগে যায়। রাগ পড়তে সময় নেয়। পড়াশুনা নিয়েই দিন কাটে। সকালবেলা গোটা তিনেক পত্রিকা রাখে। টি.ভি. তে শুধু সংবাদটা শোনে। আর টি.ভি.র সামনে বসে না। সারাদিনে রীনার সঙ্গে কোনো কোনো দিন একটা কথাও হয়না। সারাদিন যে কল্যাণ কথা বলেনি—এ কথা তার মনেও থাকে না। বিকেলে একটু হাঁটে। বৃদ্ধদের আসরে কখনও যায় না। একা একাই হাটে। সকালে হাটতে বের হয় না। ঘুমের ওষুধের জন্যে একটু বেলা করে ওঠে। চাকর চা দিয়ে যায়। অনেকক্ষণ পত্রিকা পড়ে। তারপর জল খাবার খেয়ে কোনো বই নিয়ে বসে। এখন ইজিচেয়ারে বসে এক মনে বই পড়ে স্নান করতে যাবার আগে পর্যন্ত। দুপুরে একটু ঘুমোবার চেষ্টা করে। সন্ধ্যার পর বই পড়ে, টি.ভি. দেখে। কেউ দেখা করতে এলে কিছুক্ষন গল্পগুজব করে। মনে হয়, কল্যাণ যেন মানুষের সঙ্গ আর চায় না। সেদিন গৌতমদা এলেন কল্যাণের সঙ্গে দেখা করতে। তখন কল্যাণ গেছে ডাক্তারের কাছে মাসিক চেক আপের জন্যে। একটু পরেই ফিরবে। রীনা অভ্যর্থনা করল—আসুন গৌতমদা—কতদিন পরে এলেন। —বয়েস হয়েছে। এখন গতি বন্ধ হবার সময় হল। তা আপনি শুনলাম নাকি দীক্ষা নিয়েছেন, জপটপ করেন।

রীনা একটু চুপ করে জানলার মধ্যে দিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর বলল, আসলে বড্ড একলা একলা লাগে। ছেলে মেয়েরা বড় হতেই ওদের মা'র প্রয়োজন মিটে যায়। তারপর ওরা রয়েছে বিদেশে। চিঠিপত্র কমই লেখে। আপনার বন্ধু বরাবরই নিজের মতন থাকেন। ওর পড়াশুনা করে দিন কাটে। এক সময় চাকরি করতাম। দু'টি বাচ্চা হবার পর ছেড়ে দিলাম। এখন বড্ড একলা। গুরুদেব, মন্ত্র, জপতপ, ধর্ম আলোচনা—এ গুলো নিয়ে সময় কেটে যায়। একলা একলা ভাবটা ভুলে থাকা যায়। এই আর কি?

গৌতমদা মাথা নেড়ে বলে—যাতে মন শান্তি পায়—তাই করবেন।

এসময় কল্যাণ এসে হাজির—আরে গৌতমদা—এখনও বেঁচে আছেন তো?

—ঠিক বলতে পারছি না কল্যাণ। দেহের মৃত্যু হলে ফাইনাল বলতে পারব। কল্যাণ ইজিচেয়ারে বসে। পাশের সোফায় গৌতমদা বসেন।

দু'জনেই সিগারেট ধরায়। দু'জনেই চুপচাপ থাকে কিছুক্ষণ। তারপর গৌতম বলে, তা এ শতাব্দী তো শেষ হতে চলল।

—এ শতাব্দীর গোড়াতেও পরাধীন—শতাব্দীর শেষেও পরাধীন। এখন ক্যাডারদের হাতে কয়েদি। আজ সারা দেশে ক্ষমতার এ নির্লজ্জ লোলুপতা, এমন ব্যাকুল কাঙালপনা—ক্ষমতার এমন উলঙ্গ কামুকতা—পেশী শক্তির এ প্রকাশও বাড়াবাড়ি। বেঁচে থাকবার ইচ্ছে হয় না।

গৌতমদা বলেন—তা ছাড়া দেখ, দেশে একটা চিন্তাশীল লোক নেই, মননশীল মানুষ নেই, একটা ভালো থিয়েটার বা সিনেমা তৈরী হয় না—একজন শক্তিশালী লেখক

নেই, শিল্পী নেই—এমন সাংস্কৃতিক বন্ধ্যাদশা বহুকাল আসেনি।

—গৌতমদা, হয়তো চিন্তাশীল, মননশীল মানুষ আছেন—কিন্তু তাদের লেখা প্রকাশের ভাবনা নেই। কারণ প্রিন্ট মিডিয়া নিজেদের পছন্দ করা লেখার বাইরে কোন লেখা ছাপবে না। কিংশুকদার মৃত্যুর পর আমি বাংলা ও ইংরেজিতে কয়েকটি প্রবন্ধ লিখি। কোনো পত্রিকায় ছাপেনি। আপনার চিন্তা প্রকাশের জায়গা কোথায়? প্রকাশক পারেন না। আপনার যুক্তিশীল স্বাধীন মতামত প্রকাশের জায়গা নেই। তাছাড়া, স্বাধীন মত মুখে ব্যক্ত করলেও ক্যাডাররা আপনাকে চিহ্নিত করবে। হয়তো আপনাকে ধরে পিটিয়ে মেরে—জানাবে, জনরোষ। আজ পুলিশ কোথায়? প্রশাসন বলে কিছু নেই। আপনার জীবনের নিরাপত্তা ততক্ষণই—যতক্ষন আপনি দলের সঙ্গে শ্লোগান দিতে পারবেন। একটা দলে আপনাকে যেতে হবেই। অথচ আপনি ও আমি জানি—কতকাল আমরা বলে এসেছি—তবু বলবার জায়গা পাইনি বলে কথাটাও কোনো প্রচার পায়নি : পার্টি স্বাধীনতার শত্রু, মুক্তবুদ্ধির শত্রু, ব্যক্তিত্ব বিকাশের শত্রু, মানুষের অস্তিত্বের শত্রু। যারা চিন্তা করতে পারে না—যাদের মন ভাল ভাবে জাগেনি বা জন্ম নেয়নি—যাদের মনন কথা বলতে শেখেনি—তাদের পক্ষে শ্লোগানই একমাত্র পথ। বুলি আর শ্লোগান মনকে খর্ব করে বামন করে রাখে। এই বামন নিয়েই রাজনীতির সার্কাস।

—দেখ কল্যাণ, সারা জীবন কলেজে মাষ্টারী করলাম। ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যে জানবার পিপাসা এত কম দেখেছি —যা বলবার নয়। স্কুল জীবন থেকে এমন শিক্ষা ব্যবস্থা—যেখানে ছাত্ররা কোন আগ্রহের সন্ধান পায় না। শিক্ষকের কাজ কি? বিষয় সম্পর্কে ছাত্রকে আগ্রহ জাগান, ছাত্রকে ভাবতে শেখানো, যুক্তিবাদী চিন্তার সন্ধান দিয়ে ছাত্রের মনকে কৌতূহলী করে তোলা—জ্ঞানের স্বাদ পাইয়ে দেয়া। স্কুল জীবনেই এটা হয়নি। শিক্ষা হচ্ছে কুইনাইন মিক্সচার। আমাদের স্কুল জীবনেই খুব কমই যোগ্য শিক্ষক ছিল বা আছে। কলেজে এসেও নিজের বিষয় সম্পর্কে আগ্রহী হতে পারে না। কারণ বিষয় সম্পর্কে আগ্রহ সৃষ্টি করতে ক'জন শিক্ষক পারেন। শিক্ষক, অধ্যাপক এরা প্রতিটি ক্লাসে বিষয়কে হত্যা করে। বিষয় হত্যার কাজ হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান দায়িত্ব। তাই কোনো উদ্ভাবন, আবিষ্কার, মৌলিক জিজ্ঞাসা আমাদের মধ্যে দেখা দেয়নি। কোন জীবনবোধ নেই—এ জাতির। সেই ত্রিযুগ প্রাচীন কুসংস্কার রাজত্ব করে চলেছে। জান কল্যাণ, আমার মনে হয়, স্বাধীনতার চেয়ে জরুরি ছিল মুক্ত বুদ্ধির উন্মেষের জন্যে শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন করা। চিন্তার দৈন্য থেকে মানুষকে মুক্ত করা। একটা সার্বিক সংস্কার আন্দোলনের থেকে ও অন্নের দৈন্য প্রয়োজন ছিল বেশি। কিংশুকদাদের যারা মারল আজ তাদের নিয়ে গৌরবগাথা তৈরি হচ্ছে।

—জানি। যারা খুন করবে—খুনীরা জেলে কষ্ট পেয়েছে—তার জন্য কান্না। যারা গণতন্ত্রকে হত্যা করতে চেয়ে পরাজিত হল—তারা গণতান্ত্রিক ব্যবহার চায়। কিন্তু যুক্তিশীল চিন্তার বদলে উত্তেজনার মদে দেশের বুদ্ধিকে জাগতে দেয়া হল না। তাই আজ অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে—শিক্ষা জগতে শিক্ষিত লোক নেই। আজ বিশেষজ্ঞরাও সৃষ্টিশীল নয়। ধার করা চিন্তা মুখস্ত করে—মুখস্ত বলে—জীবন কেটে গেল। ভাবতে শিখলাম না আমরা। চিন্তা ও মনন জগত থেকে নির্বাসিত হয়ে আমরা টেলিভিশনে সেক্স আর ভাইয়োলেন্সে, আর রাজনীতির সুস্বাদু নোংরামিতে আত্মমগ্ন হয়ে থাকি।

আমরা নিজেদের ভুলে গেছি। আমাদের কোনো আইডেনটিটি নেই। আমরা জনতা-মানুষ। মানুষ দরকার নেই—মানুষের সংখ্যাটা বড় কথা। মানুষ নয়—জনতা—বিরাট জনতা—যেখানে মানুষের মুখ হারিয়ে যায়—মিলিয়ে যায়—এমন জনতায় আজ মানুষ হারিয়ে গেছে। তার নিজের মন নেই—জনতার মনই তার মন। আমাদের মনও হারিয়ে গেছে। শতাব্দীর শেষে আমরা সর্বহারা।

দু'জনেই চুপ করে থাকে।

কল্যাণ বলে, কিংশুকদা বলতেন, বর্বরদের যুগ চিরকাল জিতেছে—সভ্য মানুষ চিরকাল হেরেছে—যা কিছু করেছে—বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিই সভ্য সমাজকে এগিয়ে নিয়ে গেছে। সাধারণ মানুষ যখন উঁচু চিন্তার মানুষকে অনুসরণ করে তখন সমাজ সভ্য থাকে। মানুষ যখন নিচু তলার মানুষকে আশ্রয় করে তখনই সমাজ বর্বর হয়ে ওঠে। বইকে অল্প লোকই চিরকাল ভালবাসত। তারা এখনও বাসে। কিন্তু টেলিভিশন শুধু বইয়ের শত্রু তা নয়, মানুষের বাস্তব বোধের শত্রু। মানুষ একটা অবাস্তবতার মধ্যে তন্ময় হয়ে থাকে। ফলে জগতের মোকবিলার শক্তি তার নষ্ট হয়ে যাবে—প্রতিযোগিতায় তার পরাজয় কে আটকাবে?

রীনা খাবার নিয়ে চা নিয়ে এসে বলল—আর হাহুতাশ করে লাভ নেই। যা ঘটছে, তা ঘটবেই।

কল্যাণ আবার বলল, গৌতমদা আমরা আরো দুটো জিনিস হারিয়েছি। আমাদের মনে আনন্দ নেই আর আমরা হাসতে ভুলে গেছি।

—ঠিক বলেছ, ঘরে ঘরে কত সরঞ্জাম, কত আধুনিক গেজেট—কিন্তু কারও প্রাণে হাসি নেই—কারো মনে হাসি নেই। মনে কর, সেই পার্কে বসে যখন আমরা আড্ডা দিতাম—একটা আনন্দের বলয় আমাদের ঘিরে থাকত—পাঁচ দশ মিনিট অন্তর আমরা হাসতাম।

—হাসি আর আনন্দকে এ শতাব্দীতে রেখেই আমরা আগামী শতাব্দীতে পৌঁছাব। নতুন শতাব্দীতে কত কত বুড়ো বুড়ি বিরস মুখে ঢুকবে তার স্থির নেই। হাসি হারিয়ে গেছে—আনন্দ নিরুদ্দেশ।

গৌতমদা চলে গেলেন।

যাবার সময় বললেন—কথা বললাম কতকাল পরে। অনেকটা হাল্কা মনে হচ্ছে। কল্যাণ বলল—আপনি আসবার জন্যে, এখনও যে ভাবতে পারি—সেই ভাবনাকে বলতে পারি—নিজের কাছে এই খবর আমার পৌঁছাল।

গৌতমদা চলে গেলেন।

হঠাৎ হাসি ও আনন্দের কথায় কল্যাণের রমাকে মনে পড়ল। অফিসের ড্রয়ারে ওর ছবি থাকত। ছবিটা কত ড্রয়ার যে ঘুরেছে। অবসর নেবার সময় ছবিটা এনে বইয়ের আলমারীর কোন একটা বইয়ের মধ্যে রেখেছে। কোন্ বইতে যে রেখেছে—তা এখন মনে নেই। রমা—কত বছর হল। কল্যাণের রমার চেহারাটা ভালো করে মনে পড়ল না। হাসি, আনন্দ ও রমা সবাই একসঙ্গে নিরুদ্দেশ। রমাকে আর ওর বড় মনে পড়ে না।

রীনা বিমলেন্দুকে ভুলে গেছে। যদি কখনও স্বপ্ন দেখে সকালেও তা মনে থাকে

না। রীনাকে বিমলেন্দুর কথা বললে হয়তো মনে পড়ত। কিন্তু রীনাকে বিমলেন্দুর কথা মনে করিয়ে দেবে কে?

আজ রমার বয়েস হল সাতচল্লিশ। বেঁচে থাকতে মা এই জন্মদিনে ওকে এক বাটি পায়েস করে দিতেন। মা'র ঠিক মনে থাকত। যখন ওদের অবস্থা খুবই খারাপ ছিল—তখনও মা ছোট বাটিতে একটু পায়েস করে—পায়েসের ওপর একটা গাদাফুলের পাপড়ি বিছিয়ে ওকে দিতেন—আর অবনকে একটা প্লেটে করেও দিতেন। অবন সকাল থেকেই বলত, তোর জন্মদিন—মা পায়েস রাধছে। জন্মদিনের দিন ছেলেবেলায় বাবাকে গিয়ে যখন প্রণাম করব—বাবা, মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করে বলতেন—তোর একটা ছবি আমি এঁকে দেব। সেই ফটো আর আঁকা হয়নি। মা'কে প্রণাম করতেই দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলতেন, একটা ফ্রক না, একটা শাড়ি না, কি ঘরে জন্মেছিস। শেষে দাদাকে প্রণাম করলে, দাদা বলত—জানিস বড় হয়ে তোকে খুব দামী ফ্রক—না, তখন তো তুইও অনেকটা বড় হয়ে যাবি—খুব ভাল শাড়ী কিনে দেব—অনেক দাম দিয়ে। সে দিন সকলের মনোযোগ এই বালিকার ওপর পড়ত। শত অভাব সত্ত্বেও দিনটার আকর্ষণ ওর কাছে খুবই ছিল। সারা বছর অপেক্ষা করে থাকত। পর জীবনে মা কোনদিন ভোলেন নি। পাগল হয়ে যাবার আগের জন্মদিন পর্যন্ত তিনি পায়েস রেধে ওর জন্যে অপেক্ষা করতেন। বাবার ছবি আঁকা হয়নি, দাদা বড় হয়ে শাড়ি দেবার আগেই মরে গেছে—আজ মাও নেই।

রমা কখনও জন্মদিন পালন করে না। আজও কেউ জানে না। ইচ্ছে করলে পার্টি দিতে পারে—কেক কাটতে পারে—সবই পারে—কত আর খরচ—কিন্তু কেউ জানে না কবে ওর জন্মদিন। ছুটি থাকলে একা একা কাটায়। পায়েসও তৈরি করে না। কার আগ্রহ আছে ওর প্রতি। ওরও আগ্রহ নেই কারো ওপর। এখানে সবাই পরিচিত—কিন্তু যাতায়াত প্রায় নেই বললেই হয়। ঝি সকালে এসে কাজ করে দেয়। নিজেই ব্রেকফাস্ট তৈরি করে খেয়ে অফিসে যায়। অফিস কেন্টিনে খায়—রাতে কিছু করে নেয়—নতুবা অফিস ফেরবার পথে রাতের খাবার জন্যে কিছু কিনে আনে।

মা পাগল হয়ে বেশি দিন বাঁচেনি। যে দিন মা প্রকৃতিস্থতা হারালেন—ডাক্তার এসে বললেন, সাইকিয়াট্রিস্ট দেখাতে হবে—তবে আমি ঘুমের ওষুধ দিচ্ছি। দেবার আগে তিনি মার প্রেসার ও হৃদযন্ত্র পরীক্ষা করে বললেন, হার্টতো খুব খারাপ—কিছু জানেন না। মা চলাফেরা বাজার ঘাট সবই তো এতকাল করে এসেছেন। কই ছিল বলেনি তো। মা গোপনে মৃত্যুকে আসতে দিয়েছেন। সেই রাতেই একজন কার্ডিওলজিষ্ট এসে ই.সি.জি করলেন—বললেন, হার্টের অবস্থা ভাল নয়। বলে রিপোর্ট লিখে ওষুধ দিয়ে দিলেন। পরদিন সাইকিয়াষ্ট্রিট শুনে বললেন—দেখুন আমাদের প্রথমে টার্গেট ডোজ খুঁজতে হবে—প্রথমে একটা দিয়ে দিচ্ছি—তবে হার্ট তো ভাল নয়। তিনি ওষুধ দিলেন। রমা মা'র জন্য ট্রেইন্ড আয়া রেখে দিল, যে শুধু ওষুধ খাওয়ানো থেকে সব কিছু করবে। মা চুপচাপ থাকতেন। মাঝে মধ্যে একটু কথা বলতেন, একটু গান—পরের দিকে একেবারে চুপ। কী শান্ত! অফিস থেকে এলে রমা পাশে বসে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকতেন—যেন চিনতে চেষ্টা করছেন। —মা, আমাকে চিনতে পারছ না? মার ঠোঁট

দুটো কাঁপত —কিছু যেন বলতে চান। —মা, কিছু বলবে? মা অনেকক্ষণ পর উঠে যেতেন। আয়াকে বলতেন, ওরা সব গেল কোথায়? অবনের বাবা, অবন আর আমার মেয়েটা, মেয়েটা.....। তিন মাস পর একদিন দুপুরে আয়ার টেলিফোন পেয়ে বাড়ি এসে দেখলেন—মা ঘন্টাখানেক আগে চলে গেছেন। কী শান্ত মুখশ্রী। কী অসাধারণ লাবণ্যময়ী। মাকে গরদের একখানা শাড়ি কিনে দিয়েছিল রমা। রমা সেই শাড়ি পরিয়ে মাকে সাজিয়ে দিল। জন্ম থেকে কখনো মাকে রমা সাজতে দেখে নি। আজ অপূর্ব লাগছিল। এখানকার অনেকে শ্মশান বন্ধু হয়েছিল। এমন দিনে বার বার পাম এভিন্যুর বাড়ির কথা মনে পড়ছিল। ওখানেই মা মরতে চেয়েছিলেন। মা'র জীবনের কোনো আশাইতো পূর্ণ হল না। রমা নাসিকে গিয়ে শ্রাদ্ধ করল। পরে এখানে সবাইকে একদিন খাইয়ে দিল। এক বছর পরে সপিণ্ডকরণ করল বেনারসে গিয়ে। এখানেই বাবা-মা'র স্বপ্নময় বিয়ে হয়েছিল—তারপর গয়ায় দু'জনের—অবনেরও পিন্ড দিল। এসব রমা যে মানে তা নয়—তবু যদি তিনটি বঞ্চিত আত্মা থেকে থাকে—ওরা যেন আনন্দ পায়, শান্তি পায়। যদি মিলিত হয়—তবে শান্তি পায়। তবে রমার মনে হয়, জীবন যখন ওদের কিছু দেয়নি—মৃত্যুই কি দেবে? বিশ্ব বড় কৃপণ।

আজ জন্মদিনে রমার মনে হয়, এই চার জনের সংসারে—তিনজনই চলে গেছে। বাকি রইল রমা। অবন দিয়ে আরম্ভ—রমাতে এসে শেষ।

রমা বহুকাল আর্ট নিয়ে পড়াশুনা করেছে। বাবার শিল্প প্রতিভার মূল্যায়ন করতে গিয়ে দেখল, প্রতিভার মধ্য গগনে বাবার আঁকা বন্ধ হয়ে গেছে। শেষ দিকে ছবিগুলোর মধ্যে কেমন গ্লুমি ভাব—একটা অন্ধকার যেন প্রাণপণে আত্মপ্রকাশ করবার চেষ্টা করছে। বাবার ছবিগুলো প্রিন্ট করিয়ে নিয়ে—রোজ টাইপরাইটারে বসে কিছুটা সময় টাইপ করে। কয়েক পৃষ্ঠা হয়। আগে ছবিগুলোর বৈশিষ্ট্যগুলো আলোচনা করে শেষে জীবনীটা লিখবে। বৃহত্তর শিল্পী মহলে যাবার জন্য ইংরেজীতেই লিখবে। যে ছবিগুলোর প্রদর্শনী হয়েছিল—তৎকালীন সমালোচনায় তার অন্তঃসারশূন্যতা দেখিয়ে পরে জীবনীতে তার প্রতিক্রিয়া লিখবে ঠিক করল। লেখা আর টাইপ করার এখন রমার দরকার হয় না। সোজা টাইপই করে। ছবির বৈশিষ্ট্য অনেকটাই হয়েছে—ভেতর থেকে শেষ করবার একটা তাগিদ বোধ করতে আরম্ভ করেছে—একটা উদ্বেগ সর্বদা রয়েছে, শেষ করতে পারবে তো? একটা বড় পাবলিশারের সঙ্গে কথা হয়েছে—বই ছাপবার খরচ রমা দেবে—ওরা ডিস্ট্রিবিউশন—বিজ্ঞাপন—এবং ভাল রিভিউ-এর ব্যবস্থা করবে। নাম ঠিক করেছে নেগলেকটেড এন্ড ফরগটন আর্টিষ্ট। কিন্তু শেষ করতে পারবে কি? যা শরীর রমার!

চল্লিশ বছর পার হতে না হতেই রমাকে বাবার ব্যাধি ধরল। হাঁপানী। এখন রমা বোঝে কী কষ্ট বাবা পেতেন। তবু সব রকম আধুনিক চিকিৎসা রমার জুটেছে। কার্ডিয়াক এজমা। বাবা গিয়েছিলেন পঞ্চাশে, মা'র আরো আগে। রমা পৌছাতে পারবে তো পঞ্চাশে। মা'র মৃত্যুর পর রমা নিজের ঘরে পড়বার টেবিলে কল্যাণের ছবি বাধিয়ে টেবিলের ওপর রেখেছে। বাইরের কেউ এ ঘরে ঢুকতে পারে না।

আজ জন্মদিন। ঠিক করল, আজ থেকে কল্যাণকে একটা চিঠি লিখবে। একটু একটু করে—অনেক দিন ধরে। কিছু আগে থেকে, এখন ঠিক করা বড় কঠিন। কখন যে

টান উঠবে—সঙ্গে রাখতে হয় পাম্প, সরবেট্রেট ও ডেরিফাইলিন। হার্টের ওপর চাপ রয়েছে। বাবা ও মা'র দু'জনের রোগ ওর শরীরে। রাতে টানের সময় এত একা লাগে। কী ভয়ংকর নিঃশব্দ একাকিত্ব। শুধু শোনা যায় নিজের টানের শব্দ। কেউ কোথাও নেই। বাবার পাশে মা ছিলেন। মা'র পাশে রমা ছিল। আজ রমার পাশে কেউ নেই। রমাকে বিয়ের কথা অনেকে বলেছে। কিন্তু রমার আত্মবিশ্বাস ছিল না কোনো পুরুষকে বহুদিন আকর্ষণ করে রাখতে পারবে। তাছাড়া নিজের সংসারের আবাল্য অভিজ্ঞতা ওকে সংসার সম্পর্কে ভীত করে তুলেছে। সংসারকে রমার বড় ভয়। ছেলে হয়ে যদি অবনের মত মরে যায়। স্বামী যদি ক'দিন পরে ত্যাগ করে। এ গুলোর যৌক্তিকতা নেই—তা রমা জানে—তবে সংসারকে ওর ভয়। রোগ ওর মনকে বড় দুর্বল করে দিয়েছে। আগে একা একা থাকাটা সহ্য হত—অসুবিধে হত না—নিঃসঙ্গ লাগত ঠিকই। কিন্তু এখন কেমন অসহায় লাগে—যখন মনে হয়, ওর কেউ নেই কোথাও। একটা আদর করবার বাচ্চা নেই, সস্নেহে তাকাবার স্বামী নেই (এখানে কল্যাণের কথা মনে পড়ত), এমনকি কোন বন্ধুত্বও কারো সঙ্গে গড়ে ওঠেনি।

টান উঠলে সেদিন অফিস যায় না। টান কমে গেলেও যাবার মত জোর থাকে না। প্রচুর ছুটি ওর পাওনা। রমা ঘুরেছে অনেক—অফিস থেকে বছরে দু'হাজার মাইল ঘুরবার টাকা দেয়। কন্যাকুমারিকা থেকে কাশ্মীর। দিল্লী, আগ্রা, মথুরা, বৃন্দাবন, গুজরাত—অনেক।

এখন নিজের মোটর আছে—ড্রাইভার সকালে ওকে অফিসে পৌঁছে দেয়—বিকেলে নিয়ে আসে। শনি, রবিবার বিকেলে কখনও মেরিন বীচে, ইন্ডিয়া গেট—মালাবার হিলস্‌এ এখন আর উঠতে পারে না।

প্রমোশন হয়েছে রমার। মাইনে বেড়েছে প্রচুর। আজ অর্থ খরচ করবার জয়গা নেই। অত্যন্ত কড়া, কর্মঠ ও কর্মপ্রিয় ও সৎ অফিসার হিসেবে সকলে ওকে সমীহ করে। ম্যানেজিং ডিরেক্টার পর্যন্ত।

একবার ভটচাজদা সপরিবারে এসেছিলেন। ওদের সবাইকে প্রচুর উপহার দিয়েছেন। ভটচাজদাকে গরদের ধুতি পাঞ্জাবী, শাল, স্ত্রীকে শাড়ি ও শাল—ছেলে মেয়েদের স্যুট ও ম্যাক্সী ইত্যাদি। ভটচাজদার কাছে শুনলেন—ওদের বাড়ি এখন চারতলা বাড়ি হয়েছে ফ্লাট সিস্টেমে। কল্যাণ ডিরেক্টার। —তোকে এখানে নিয়ে আসবার জন্য কল্যাণ কত রকম বিপদে যে আমাকে ফেলতে চেয়েছে তার ঠিকানা নেই। তবে আমি ইউনিয়ন করি—এখন আমাদের রাজত্ব। কিচ্ছু করতে পারেনি। দরকার পড়লে আলিমুদ্দিন ষ্ট্রীট পর্যন্ত আমি যেতে পারি। জানিস্‌তো আমাদের পার্টি কী রকম মজবুত। ইলেকসন আমাদের হাতের মুঠোয়। এমনকি বিপক্ষদলে কারা যাবে—তাও আমরা ঠিক করে দেব। সেন্টার আমাদের চটাতে রাজি হবে না। চলবে আমাদের রাজত্ব বহুকাল। সেও কতকাল হল—ভটচাজদা মারা গেছেন। শ্রাদ্ধের চিঠি ছেলে দিয়েছিল।

বেলা দশটা বাজে। প্রেসার কুকারে কিছু করে নেব। কল্যাণকে চিঠি লিখতে বসে রমা।

কল্যাণ,

আজ আমার জন্মদিন। আজ তোমাকে প্রণাম করতে খুব ইচ্ছে করছে। একটু

আশীর্বাদ নিতেও। আজ আমার প্রণাম করবার কেউ নেই। বাবা, দাদা, মা—মাথার উপরে হাত রেখে, ছবি এঁকেদেবার প্রতিশ্রুতি দিতে বাবা নেই, বড় হয়ে শাড়ি দেবার প্রতিশ্রুতি দিতে দাদা নেই, পায়েসের বাটি হাতে নিয়ে ফ্রক দিতে না পারার আফশোষ করবার মা নেই। গুরুজন কেউ নেই। শুধু তুমি আছ? আর্শীবাদ করবে তো? শুধু আর্শীবাদ কর, সুস্থভাবে মরি।

কিন্তু প্রণাম তোমাকে করেছি। তোমার ফটো আমার টেবিলে। ভোরে উঠেই আজ তোমাকে প্রণাম করলাম। নিজের মনেই তোমার হয়ে নিজেকে আশীর্বাদ করলাম, মরবার সময় কষ্ট পেওনা। রাগ করলে?

কল্যাণ, আমরা ভালবাসা থাকতে থাকতেই বিদায় নিয়েছিলাম। দু'জনে একসঙ্গে থাকতে থাকতে একলা হয়ে যাব—এই ভয়ে। ঠিক করেছিলাম কিনা এখন বুঝে উঠতে পারছিনা। হয়তো ভালবাসা আছে—অথচ তুমি নেই। এই যন্ত্রণা যে কত বড়—এই নিঃসঙ্গ প্রবাসে তোমাকে জানাতে লজ্জা হয়—কষ্ট হয়। কষ্ট হয়, নিজের একা হয়ে যাওয়া যখন অসহ্য হয়—নিজেকেও যখন এত একঘেয়ে লাগে, তখন। কষ্ট হয়, যখন চারদিকে অসংখ্য মানুষ নিজেদের সংসার নিয়ে ব্যস্ত—আর আমি স্বাধীন—একটা নিঃস্বতার মধ্যে আমি স্বাধীন। কষ্ট হয়, যখন কলকাতার সেই শেষের দিনগুলোর কথা ভেবে—যখন তোমার সুন্দর আনন্দ ও সৌন্দর্যে ভরা কথাগুলো কমে আসতে লাগল—আমি তোমার আনন্দ ও সৌন্দর্যকে কেড়ে নিলাম—নিজের অফুরন্ত বিষণ্ণতা থেকে কিছুটা তোমাকে দিয়ে এলাম। তুমি কেমন বিষণ্ণ, বিমর্ষ হয়ে গিয়েছিলে শেষ ক'টা দিনে। সেদিনের কথা ভাবলে আমার বুক ফেটে যেত। সেই আনন্দ ও সৌন্দর্য ফিরে পেয়েছ তো?

দেখ কল্যাণ, আমার একাকিত্ব কতটা বংশগত বা পরিবেশ ঘটনাগত ঠিক বলতে পারব না, বুঝতেও পারছিনা। বাবা যখন যশ, খ্যাতি ও অর্থের আশা ছেড়ে দিয়ে মা'কে অপয়া, অলক্ষ্মী বলে নিজের বিচ্ছিন্নতার মধ্যে আড়াল খুঁজছিলেন—তখন মারও একাকিত্বের শুরু। বাবা-মা'র কিন্তু অবলম্বন ছিল দাদা-অবনদা। কিন্তু অবনদার মৃত্যুর পর বাবা একাকিত্বকে রোগে দিয়ে আড়াল করে রাখেন—মা'র একাকিত্ব তখন সম্পূর্ণ। বাবারও সঙ্গী ছিলাম না—মা'র সঙ্গী ছিলাম না। আমার ওপর তাদের ছিল নির্ভরতা। তাই বাবা মরবার সময় মা'র নাম ধরে ডেকে ছিলেন। অবনের নাম করেছিলেন—কিন্তু আমার নাম মনে করতে পারেননি। মা পাগল হবার পর বাবা অবন সবার কথা বলেছেন—কিন্তু আমার নাম মনে করতে পারেননি। আমার সামনে চুপ করে বসে চিনতে চেয়েছেন—পারেননি। যাক্ যা বলছিলাম, শেষ পর্যন্ত মা অপ্রকৃতিস্থতার আড়ালে নিজের নিঃসঙ্গতাকে ঢাকা দিলেন।

জান কল্যাণ, এই যে বাবা ও মা আমার নাম মনে করতে পারল না, আমি যেন এর মধ্যে একটা ভাগ্যের আগাম ইঙ্গিত অনুভব করছি। যেন নাম ধামহীন সম্পর্কহীন হয়ে আমার নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবার একটা লক্ষণ অনুভব করছি। বুক কেঁপে ওঠে। সত্যি বলো তো কল্যাণ, তুমি আমাকে মনে রেখেছ তো—আমাকে মনে রেখেছ—না, মাঝে মাঝে মনে পড়ে। অথবা একেবারেই মনে পড়ে না—চিঠিটা পেয়ে মনে পড়বে। তুমি যদি ভুলে যাও—আমার সান্ত্বনার আর কিছু থাকবে না। আজ জন্মদিনে এ কথা না

মনে করেও পারলাম না। আমার তো কেউ নেই। তা তুমি জান। যেদিন তোমার সঙ্গে আমার বাড়িতে প্রথম দু'জনের ঠোঁট এক হল—তুমি বলেছিলে—তা অবিস্মরণীয় দিন। আজ তুমি ভুলে গেলে আমি যে হয়ে যাব চিরবিস্মরণীয়া। কেউ আমাকে মনে রাখবে না। তুমি ভুলতে পার না, কল্যাণ। তুমি ভুলবে কি করে। ওই কটা মাসই তো আমার জীবন। তোমার-আমার জীবন।

অনেক কথা লিখব কল্যাণ। রোজ রোজ কিছুটা করে। যেমন বাবার শিল্প প্রতিভা নিয়ে একটা বই লিখছি—বলব সব। এত বছরের কত কথা—শুনবে না? আজ এখানে থামছি। আবার আগমীকাল কিছুটা, কেমন?

রমা এ পর্যন্ত লিখে ক্লান্ত অনুভব করল। এর আগেও তো কত জন্মদিন গেছে। আজকের মত জন্মদিনের কথা এমন করে মনে পড়েনি তো? আজ বার বার মনে হচ্ছে, আরেকটা জন্মদিন আসবে তো?

বিকেলে মেরিন বীচে গিয়ে বসে থাকল সন্ধ্যা পর্যন্ত। এখানে সন্ধ্যা হতে হতে সাড়ে সাতটা। কলকাতায় এখন রাত। কলকাতার অনেক পরিবর্তন হয়েছে। এখন নাকি চেনা যায় না। নিজের পাম এভিন্যুর বাড়ির জন্যে মন কেমন করে। বড্ড দাদাকে দেখতে ইচ্ছে করে। দাদা আমার কথা শুনত। জেদ করলে যখন দেখত আমি জেদ করছি না কেমন লজ্জা পেত। রমা ভাবল, একটা ভাল শাড়ি দাদার নামে কিনে পরবে। মা তবু এই মেরিন বিচেই শেষ এসেছিল। বাবা যদি দক্ষিণ ভারতটা দেখত —ইলোরা—অজন্তা—বাবা তো ছবি দেখেছে মাত্র।

রাতে শুয়ে পড়ল রমা। ওষুধ খেয়ে। পাশে ওষুধ রেখে। হঠাৎ বুকের প্রবল যন্ত্রণায় ধড়মড় করে উঠে বসল। তাড়াতাড়ি সরবেটট্রেট বা হাতে নিয়ে দরজা খুলতে গেল—দরজা খুলে মনে হল কোথায় জল—একটা প্রবল আতঙ্কে দিশেহারা হয় জলের জন্যে টেবিলের দিকে আসতে গিয়ে মনে পড়ল লাইট জ্বালা দরকার। সরবেট্রেট যে জিভের তলায় দিলেই হয় আতংকে তা ভুলে গেল—টেবিলের দিকে আসতে গিয়ে জ্ঞান হারিয়ে পড়ে গেল। অন্ধকারে হাতে সরবেট্রেটের বড়ি।

সকালে ঝি এসে পড়ে থাকতে দেখে চিৎকার করে লোক ডাকাডাকি করে নিয়ে আসে। সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তার এসে দেখে বলল—ঘন্টা চারেক আগেই শেষ হয়ে গেছে। সরবেট্রেট মুখে দিতে ভুলে গেছেন। ডেথ সার্টিফিকেট লিখে দিচ্ছি। বয়েস কত? সবাই বলে, কেউ জানে না। ডাক্তার নিজে উদ্যোগী হয়ে টেবিল থেকে আগের প্রেসকৃপসন থেকে বয়েস উদ্ধার করে। বয়স সাতচল্লিশ বছর। নাড়াচাড়া করতে আইডেনটিটি কার্ডটা বের হল। দেখে ডাক্তার বললেন, উঃ বাবা, গতকালই ওর সাতচল্লিশ হয়েছে। জন্মদিনেই মৃত্যু দিন। অবশ্য ইংরেজী মতে.....।

কোনো আত্মীয় স্বজনের ঠিকানা কোথাও নেই। ঘরে একটা লেখা ছিল—লম্বা চিঠি। এখানে বাংলা পড়তে পারেন কেউ। একজন প্রবাসী এগিয়ে এসে প্রথম দু'লাইন পড়ে বললেন—কোনো একজনকে লিখেছিলেন জন্মদিনের আর্শীবাদ চেয়ে। বাংলা পড়তে তার কষ্ট হয়।

অফিসের লোক ও কমপ্লেক্সের লোক জড় হয়ে রমার শীতল নীল হয়ে যাওয়া শরীর দাহ করে এল বিকেল বেলা।

রমার ঘর সীল করে দেওয়া হল। প্রদ্যোৎ, ছায়া, অবন ও রমা পৃথিবী থেকে মুছে গেল। শতাব্দীর অনেক আগেই রমাকে সকলে ভুলে গেল। কল্যাণও রমাকে কোন বইয়ের মধ্যে হারিয়ে ফেলেছে মনে নেই। রমার আশঙ্কাই সত্য। রমা চিরবিস্মরণীয়া।

বিমলেন্দু এখন অবসর নিয়েছে। চোখে ভাল দেখেনা। বয়েস হয়েছে আটষট্টি। নিজে বাড়ি করেছে কর্মস্থলেই। বেশ বড় বাড়ি। সঙ্গে বাগান আছে। একটি মাত্র ছেলে। উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজের হাউস স্টাফ। বিমলেন্দু এখনও টিউশনি করে। তবে খুব কম। বিকেলে এখন আর পড়ায় না। নদীর তীরে একা বসে থাকে বেশ কিছুক্ষণ। সন্ধ্যা হলে স্ত্রী এসে ওকে নিয়ে যায়। স্ত্রীর নাম, মুকুল। একটা রিক্সা করে দু'জনে ফেরে।

এখানে এসে বিমলেন্দু টিউশনির একটা ভাল বাজার পায়। কলেজে পড়ানোর সময় ছাড়া প্রায় সব সময়ই চলত ওর পড়ানো। ক্লাসে কখনও তৈরি না হয়ে যেত না। কলেজের ক্লাসেও ছেলেমেয়েরা উপকৃত হত। কলেজে অঙ্ক অনার্স ছিল। সুতরাং হায়ার সেকেন্ডারী থেকে অনার্স পর্যন্ত ছাত্র ছাত্রী বাড়তেই থাকে। বিমলেন্দু ছোটবেলা থেকেই পরিশ্রমী। স্বাস্থ্যও ভাল। আর অর্থের প্রয়োজন ওর খুব বেশী। অল্প কিছুকাল পরেই ব্যাচ করে দিল। আয় ওর দিন দিন বাড়তেই থাকে। কলেজের বেতনের তিনগুণ আয় ছিল ওর। বছর চারেকের মাথায় ওর ভয়ানক অসুখ হয়। তার আগে মুকুল দু'বছর ওর কাছে পড়ে পাসকোর্সে বি.এ. পাশ করে। সেই সময় মুকুল ওকে দিন রাত সেবাযত্ন করে। মফঃস্বল জায়গা। ছাত্ররা স্বভাবত একটু অনুভূতিপ্রবণ। তারা ব্যাচ করে রাত জাগত। আর তাদের সঙ্গে মুকুল নিজে থেকে ওষুধ খাওয়ানো—পথ্য তৈরি করা। বাড়ির অনুমতি নিয়ে অনেক রাত পর্যন্ত থেকে রাতের ওষুধ খাইয়ে বাড়ি ফিরত।

সেরে ওঠে বিমলেন্দু বুঝল, ওর একা থাকা সম্ভব নয়। আর হাত পুড়িয়ে খেতে ইচ্ছে করে না। নিজেই একদিন মুকুলকে ডেকে বিয়ের প্রস্তাব দিল। মুকুল বলল, বাবা মার অমত হবে না। তবে দেরি করলে আপনি কিন্তু অসুখে পড়বেন। বাবা-মা খুব খুশি। ওরা অনেক ভাই বোন। বিয়েতে কলকাতা থেকে মামা ভাই ও মেজো বোন এল।

এবার একটা ভাল বাড়ি ভাড়া নিল। মুকুলের বাবা ব্যবসায়ী। তামাকের ব্যবসা। বিমলেন্দুর ঘরদোর সাজিয়ে দিল—বউভাতের খরচও দিল। তারা বিমলেন্দুকে কি দেবে—জিজ্ঞেসা করেছিল। বিমলেন্দু বলেছিল, শুধু মুকুলকে চাই। আর কিছু নয়। মুকুল বাবা-মাকে বলেছিল—সংসার করব আমি—কি দরকার ওকে জিজ্ঞেস করছ কেন?

রীনার ফটো দেয়ালে টাঙিয়ে রেখেছিল। মুকুল জিজ্ঞাসা করেছিল—এই বিবাহিতা মহিলা কে? ভারী সুন্দর তো?

বিমলেন্দু বলেছিল—মর্তের এক দেবী। নিঃস্বার্থভাবে দান করবার এমন হৃদয় আমি দেখেনি। ওর আর পরিচয় তোমার জানার দরকারও নেই। মুকুল যা বুঝবার বুঝেছিল। কিন্তু বিবাহিতা দেখে ভাবল, হয়তো ভালবাসত —এখন বিয়ে হয়ে গেছে—তবে স্বামী যে দেবদাস নয়, এতেই নিশ্চিন্ত। তাছাড়া বাক্স পেটরা ঘেটে কোন চিঠিপত্র পায়নি।

কোন দিন কোন চিঠিপত্রও আসেনি। মর্তের দেবী যে কি পদার্থ —বিশেষ করে কলকাতার মেয়ে—এ সম্পর্কে মুকুলের নানা গল্প শোনা ছিল। কিন্তু মাথা ঘামায়নি। মুকুলের একটি ছেলে হল। যদিও স্বামীর সঙ্গে মুকুলের বয়সের পার্থক্য অনেকটা। তবে মেয়েদের ক্ষেত্রে তা বাধা হয় না।

ছেলে-স্বামী নিয়ে মুকুলের সংসার গড়ে উঠল। বিমলেন্দু বাড়িতে টাকা পাঠাত নিয়মিত। তারপর একটা মোটা টাকা পাঠাল—ভাইদের ও বোনদের জন্য। ভাইরা একটা স্টেসনারী দোকান করবার কথা চিন্তা করে দাদাকে লিখল। দাদা অর্থ দিল। বড় বোন ও মেজবোন মিলে মেয়েদের সায়া-ব্লাউজ-ফ্রকের একটা দোকান খুলতে চাইল—বিমলেন্দু টাকা পাঠাল। তাছাড়াও নিয়মিত টাকা বন্ধ করল না। দোকানের ক্যাপিটাল যেন সংসারে খরচ না হয়। ছোট বোন সেই সত্তর দশকের উগ্রপন্থীদের সঙ্গে বাড়ি থেকে পালিয়ে যায়। তারপর বহুকাল কোনো খোঁজ পায়নি। ভাইদের ধরে পুলিশ টানাটানি করেছে। বহু পরে জেনেছে—বোন মরিসাসে আছে। সেখানেই ঘর বেধেছে। মাও গত হয়েছেন—অনেক দিন।

মাঝে—বছর দশ পর—বিমলেন্দু কলকাতা এল। স্কুলে গিয়ে শুনল রীনা বহুকাল স্কুল ছেড়ে দিয়েছে। মিসেস পালিত এখন প্রধান শিক্ষিকা। রীনার দু'টি বাচ্চা। দু'টি বাচ্চা শুনে বিমলেন্দু কেমন দমে গেল। রীনার সঙ্গে দেখা করবার ইচ্ছা চলে গেল।

এর মধ্যে স্ত্রীকে নিয়ে কুভু স্পেশ্যালে অনেক জায়গা ঘুরেছে। ছেলের পড়াশুনা নিজে দেখে। বাবা হিসেবে বিমলেন্দু অত্যন্ত কড়া।

একদিন মুকুল লক্ষ্য করল রীনার ফটোটা বেশ নষ্ট হয়ে গেছে। কিন্তু বিমলেন্দুর সেদিকে লক্ষ্য নেই বলে কিছু বলল না।

আরও দশ বছর পরে বিমলেন্দু কলকাতা এল। কী পরিবর্তন হয়েছে। এত লোক, সমস্ত কলকাতা যেন গিজ গিজ করছে। এবার একদিন বিকেলে রীনার বাড়ি এল। শুনল, ওরা সল্ট লেকে চলে গেছে, না ঠিকানা জানে না।

রীনার ফটো নষ্ট হয়ে গেছে। বাড়ি করবার পর ফটো খুলতে গিয়ে বিমলেন্দু আবিষ্কার করে। ফটোটি জঞ্জালের মধ্যে স্থান পায়। রীনাকে তেমন করে মনে পড়ে না। অবসর নেবার পর ছেলেটা বাইরে থাকে এ নিয়ে চিন্তা হয়। ছেলেটা ঘরে থাকলে বল ভরসা পাওয়া যায়। মুকুলের ওপর এখন এত নির্ভরশীল!

দেশে ভাইরা ভাল আছে। দোকান বড় হয়েছে। বোনেরা বয়স্কা। বিয়ে হয়নি। ভাইদের ছেলে মেয়েদের নিয়ে থাকে। নিজেরা সেলাই করতে পারে না। লোক রেখেছে। তবু আয় ভালই। সংসারের স্বচ্ছলতা এসেছে। বিমলেন্দু নিয়মিত টাকা পাঠান বন্ধ করেছে অনেক দিন। ছেলেকে মেডিক্যাল পড়িয়েছে। অবসরের আগে থেকেই ক্ষেপে ক্ষেপে বিমলেন্দুর মাইনে বাড়ছিল। হিসাবী বিমলেন্দু প্রভিডেন্ট ফান্ডে প্রচুর জমিয়েছে। তাছাড়া ব্যাংক ব্যালেন্স—আই.টি.সি., ইন্দিরা বিকাশপত্র ইত্যাদিতে বিনিয়োগ তো আছেই। আজ বিমলেন্দুর কোন অভাব নেই। অভাব নেই প্রায় প্রথম থেকেই। রীনাকে প্রথম প্রথম খুবই মনে পড়ত। কেঁদেছেও। তারপর কঠোর পরিশ্রমের চাপে রীনাকে মনে করবার ফুরসত ছিল না। অবসর যখন এল, রীনাকে মনে নেই। ফটোও নষ্ট হয়ে গেছে।

আগে মাঝে মাঝে স্বপ্নে রীনার জন্যে অপেক্ষা করত। সিগারেটের দোকানে দড়ি থেকে সিগারেট ধরিয়ে রীনার জন্য অপেক্ষা করছে, অপেক্ষাই করে চলেছে—কিন্তু রীনা আর আসে না। তারপর—তার বেশ কিছুকাল পর—স্বপ্ন দেখল, যেন কলকাতার স্কুলের স্টাফ রুমে মিসেস পাতিলকে জিজ্ঞাসা করছে—রীনার জন্যে বিমলেন্দু রাস্তায় অপেক্ষা করে—রীনা অসে না কেন? মিসেস পালিত বললেন, রীনা তো অনেক দিন চাকরি ছেড়ে দিয়েছে। ওর জন্যে অপেক্ষা করে কি হবে? স্বপ্ন ভেঙে গেল, বিমলেন্দুর মনে হয়, রীনা যেন একটা নেশা। একটা নেশার ঘোরের মধ্যে—অদ্ভুত মাতাল অনুভূতির মধ্যে ক'টা মাস। মুকুলের মধ্যে সেই নেশা নেই। রীনা কতদূরে—সময় ও স্থানের। মাঝে মধ্যে রীনার মুখ কিছুতেই মনে আনতে পারে না। কখনও মুখ মনে আনবার চেষ্টার কথাও ভুলে যায়।

নদীর ধারে বিমলেন্দু অবসর কালের বিকালটা কাটায়। এতকাল শহরে আছে—একজন গন্যমান্য লোক। সবাই চেনে, শ্রদ্ধা করে। ওর ছাত্ররা এখন ব্যাংকে, কর্পোরেশনে, ইলেকট্রিক অফিসে সর্বত্র চাকরি করে। কোন কাজে গেলে সবাই খাতির করে বসায়।

নদীর দিকে তাকিয়ে বিমলেন্দুর হঠাৎ মনে হয়, রীনাকে কতকাল মনে পড়ে না। আবার মনে হয়, এই তো কিছুদিন আগে মনে করেছিলাম। হঠাৎ নিজেকে জিজ্ঞেস করে, আমার কি ভুল হতে আরম্ভ হল। বয়েস হল—জীবনে স্বাচ্ছন্দ্য এল এত পরে।

সন্ধ্যায় মুকুল এসে ওকে যখন নিয়ে যায়, তখন রীনার কথা আর মনে পড়ে না। শুধু চিন্তা হয়। পাওয়ার পাল্টে পাল্টেও দৃষ্টি পরিস্কার হচ্ছে না—অথচ ছানিও পড়েনি। ডাক্তাররা অন্য কিছু সাসপেক্ট করছে না তো?

বরুণ যদি আর দিন দশ আত্মগ্লানি বহণ করতে পারত—তবে হয়ত ওকে আত্মহত্যা করতে হত না। কারণ, এস.পি.র স্ত্রীও একজন এস.পির মেয়ে। মহিলা প্রকাশ্যে তার স্বামীর সঙ্গে উলঙ্গ ব্যাভিচার সহ্য করবার লোক নন। তিনি তলে তলে শহরের বেশ ক'জন গুন্ডার সঙ্গে যোগাযোগ করেন—এতে তাকে সাহায্য করেন এস.পির ড্রাইভার। তাছাড়া যারা ফেরার থেকে বর্তমানে বঞ্চিত—তারাও নানাভাবে চিন্তা করতে থাকেন। কেউ নিজস্ব লোক নিয়ে মীনার মুখে এ্যাসিড ছুড়ে মারা—কেউ বা অ্যাকসিডেন্ট করাবার কথা চিন্তা করছিলেন গুরুতর ভাবে। মীনার চারদিকে কয়েকটা ষড়যন্ত্রের জাল পাতা হতে যাচ্ছিল। যার কোনো পুরুষকে বেশিদিন সহ্য হয় না—তার শত্রু নারী-পুরুষ মিলে কম হতে পারে না। তবে সবাই এক বাক্যে ধিক্কার দিত বরুণকে।

উকিলবাবু যখন জানতে পারলেন, ইনসুরেন্সের নমিনি পাল্টানো হচ্ছে, প্রভিডেন্ট ফান্ডের নমিনি পাল্টানো হচ্ছে—এবং একদিন যখন বরুণবাবু তাকে বললেন—একটা অনুরোধ আপনাকে করব—কিন্তু আপনি কিছু জিজ্ঞাসা করতে পারবেন না। আমি একটা হলফনামা দাখিল করে আমাদের ছেলেমেয়েদের দায়িত্ব আপনাকে দিয়ে যাচ্ছি—আমার অবর্তমানে ওরা সময়মত পাওনাগুলো পায়—ওদের পড়াশুনা নষ্ট না হয়। আমার অবর্তমানে আপনাকে ওদের অভিভাবক করে গেলাম। আপনাকে জিজ্ঞেস না করেই একাজ করেছি। এখানে আপনি আমার একমাত্র বন্ধু। তবু আপনাকে কিছু বলা

সম্ভব নয়। কেন নয়, তা আপনি অচিরেই জানতে পারবেন। ওদের পাওনা টাকা কিছুতেই যেন অন্য কারও হাতে না পড়ে—অন্য কারও—কথাটা আপনি একসময় বুঝবেন। অন্য কেউ ছিনিয়ে না নেয়—ওরা দুই ভাইবোন—আর আপনি ওদের রক্ষক। আপনি ছাড়া ওদের আর কেউ নেই—বলেই জানবেন।

—বরুণবাবু। মনে হয় ভয়ংকর কোন ডিসিসন নিতে যাচ্ছেন। সে সম্পর্কে আমি প্রশ্ন করছি না। আপনার সঙ্গে আমার অনেক দিনের আলাপ। এমন একদিন যায়নি—যেদিন আপনার কাছ থেকে কিছু শিখিনি। আপনার সঙ্গ আমার কাম্য। আপনার কথা বুঝতে পেরেছি। ওদের জন্য যথাসাধ্য করব।

—এ জন্য আপনাকে একটা টোকেন পারিশ্রমিক দেব। আর আমার ব্যাঙ্ক একাউন্ট থেকে টাকা তুলে নিয়ে নিজের কাছে রাখবেন। দুটো চেক থাকবে—একটা আপনার পরিশ্রমিক—আরেকটাও আপনার নামে। ছেলেমেয়েদের প্রয়োজনমত ওদের দেবেন। দেখবেন, কেউ যেন ছিনিয়ে না নেয়।

—বরুণবাবু, আপনার ছেলেমেয়েদের দায়িত্ব আমি নিলাম। ওদের দেখব। আর কিছু জিজ্ঞাসা করে আপনার অসুবিধে সৃষ্টি করতে চাই না। এ সম্পর্কে আইনগত কাগজপত্র উকিলবাবু যথা সময়ে পেয়ে গেল। উকিলবাবুর ধারণা হল স্ত্রীকে হত্যা করে বরুণবাবু সারেন্ডার করবেন। ফাঁসি হলে—তিনি ডিভেন্ড করবেন না। বলবেন, সন্দেহের বশে খুন করেছি। সন্দেহের কোনো প্রমাণ নেই। সুতরাং এ ক্ষেত্রেই তার না থাকবার প্রশ্ন আসে। আর যদি আত্মহত্যা করেন—উকিলবাবুর মন সায় দেয় না—এমন স্বৈরিণীর জন্যে এমন একটা জ্ঞানী লোক আত্মহত্যা করবে। তা সম্ভব নয়। নিজের না থাকা—নিজের মৃত্যু সম্পর্কে এত নিশ্চিত কেন? সত্যি শহরে বরুণবাবু আজ মুখ দেখাতে পারে না—কেন ডিভোর্স নিয়ে আসছেন না?

উকিলবাবু ভোর রাতেই আত্মহত্যার সংবাদ পেলেন। শ্মশানে জজ সাহেব বললেন—এ ছাড়া বরুণবাবুর অন্য পথ খোলা ছিল না। রুচিশীল ভদ্রলোক—তিনি আত্মহত্যাই করতে পারেন—হত্যা করতে পারেন না।

তারপর বরুণবাবুর শেষ চিঠি ও দুটো চেক পেয়ে—সেদিনই টাকা তুলে নিলেন।

ছেলেকে কিছু টাকা দিয়ে দেখলেন—মা, তা ছিনিয়ে নিল।

ওরা কলকাতায় এলে মীনার বাবা ওদের সঙ্গে কোন কথা বললেন না। এত বড় একটা খরচের—এত অপব্যয়। ওদের ভাড়ার ঘরটি বড় ছিল—সেখানে ছেলে মেয়ের স্থান হল। উকিলবাবু ওদের শহরতলির একটা মিশনারী স্কুলে ভর্তি করে দিলেন। এক বছরের মাইনে ও হোস্টেল চার্জ দিলেন। তিনি যে স্কুলে পড়তেন সেই ফাদারের চিঠি এনেছিলেন। উকিলবাবু পাকা লোক। ফাদারের কাছে ওদের জন্যে কিছু টাকা রেখে গেলেন। বইপত্র জামা কাপড় সব ব্যবস্থা করে দিলেন। বরুণের লোক চিনতে ভুল হত না। ভুল হয়নি মীনার ব্যপারেও কিন্তু মীনার কৃপার জন্য নিজের কাঙালপনা তিনি কেন এত করতেন কিছুতেই তার কোন জবাব পাননি।

বরুণের ছেলে ও মেয়ে শনি রোববার মামা বাড়ি আসত। কেউ কথা বলত না। কেবল দিদিমা ডেকে খাওয়াতেন। হোস্টেলে কি খেতে দেয়—এসব জিজ্ঞাসা করতেন। মাকে দেখতে পেতেন। জিজ্ঞাসাও করতো না। দাদু কথা বলত না। থাকতে দিত ভাড়ার

ঘরে। ঘরে ফ্যান ছিল না। একবার দাদু বলেছিল, আমার বাড়ি উইক এন্ড এর হোটেল নয়। এ কথা শুনে দিদিমা বললেন—ওর মা তো টালিগঞ্জে ঘুরে ছাইভস্ম গিলে—সারাদিন টোটো করে এসে রাতে এসে মাতলামি করে। সারারাত চিৎকার করে বলে 'ক্যাবেরে নাচব'—তখন চুপ থাক কেন? বরুণ ঠিক ব্যবস্থা করেছে মীনা থেকে বাচ্চাদের আলাদা করে। দাদু চিৎকার করে বললেন—খবরদার সেই সন অফ এ বীচ এর নাম তুমি আমার কাছে করনা। ঘৃণায় মীনার মা ঘর থেকে চলে গেল। মামা মাসি মামীরা দাঁড়িয়ে রইল। ওরা ভয়ে ভয়ে ভাড়ার ঘরে গিয়ে কাঁদতে লাগল। বোন ক্ষীণস্বরে দাদাকে বলল—বড় হয়ে প্রতিশোধ নিস্। ওরা ইংলিশ মিডিয়ামের ছেলে। গালাগালটি ভালই বুঝল। তারপর ওরা আর আসত না। তবু রাতে বাবার জন্যে ছেলে মেয়ে দু'টি কাঁদত— মা'র জন্যেও কাঁদত। ঠাকুমার জন্যে ব্যাকুল হত। স্নেহ পিপাসু মন একটু স্নেহের জন্যে ব্যাকুল হত। সবার বাবা-মা আত্মীয় স্বজন আসে—ওদের কেউ আসে না। শনিবার বিকেলে বোনের সঙ্গে দেখা করতে চায়—দু'জনে এক সঙ্গে বের হয়। ইতিমধ্যে ওরা জেনেছিল—পিসেমশায় খুন হয়েছেন। দাদুর কাছেই। দাদু বলছিল—মীনার ননদের ঐ নিগ্রো বরটা খুন হয়েছে—খুব কামাচ্ছিল। দিয়েছে শেষ করে। ওদের ইচ্ছে করে পিসিমণির কাছে যায়। ঠাকুমার কাছে যায়—কি জানি, কি ব্যবহার পাবে—দাদু, মামা, মামী কেউ ওদের দেখতে পারে না। বাবা যার মরে গেল—মা খোঁজ নেয় না। একদিন মোটরে কল্যাণ মেসো ও রীনা মাসি এসে হাজির। বলল— তোরা শনি রোববার আমার বাড়ি আসবি। ওদের জন্যে জামা কাপড় মিষ্টি দিয়ে গেল। ওরা কিছু না বলে কেবল কাঁদল। কিন্তু গেল না। ওরা অনাথ ছেলেদের মত। বছরে একবার এক্সমাসের ছুটির সময় মামা বাড়ি যেত। ঘন্টাখানেক থেকে চলে আসত। এমনি একবার গিয়ে শুনল—মা বাড়িতেই আছে। মা'র সঙ্গে দেখা হল। মা চুপ করে ওদের দিকে তাকিয়ে রইল অনেকক্ষণ। তারপর উঠে সাজগোজ করে বেরিয়ে গেল। ওরাও মাকে অনেক দিন পরে দেখে অনেক কষ্টে কান্না থামাল। তারপর মা বেরিয়ে যাবার পর ছোট মামাকে প্রগ্রেস রিপোর্ট দেখিয়ে চলে এল। তারপর ওরা আর যায়নি। উকিল কাকা বড় দিনের ছুটিতে নিজের বাড়িতে নিয়ে যেত। ওদের পুরানো শহর।

ছেলেটির নাম অরুণ আর মেয়েটির নাম মিতা। বরুণ কন্যাকে বলত মা, তুই আমার মিতা, সখী। সেই থেকে কন্যা হল মিতা। অরুণ আগের বছর হায়ার সেকেন্ডারী পাশ করতেই উকিল কাকু বললেন—চল, কোথায় ভর্ত্তি হবে—হোস্টেলে জায়গা পাওয়া কঠিন। একটা কলেজে ইংরেজি অনার্স নিয়ে ভর্ত্তি হল। আর আঠার বছর বয়েস হতেই বাবার টাকাটা হাতে পেল। একটা মেসে জায়গা পেল—ক'টি ছাত্র এক সঙ্গে থাকে। অরুণ দেখতে বরুণের মত লম্বা চওড়া। ভাল ইংরেজি বলতে পারে—লিখতে পারে। কলেজে ও মেসে পার্টির পাল্লায় পড়ল। এই সময় একজন নেতৃ স্থানীয় লোক বলল—আমি প্রমোটার—কি করবে পড়ে। স্কুলে মাস্টারী পেতেও এখন পঞ্চাশ ষাট হাজার টাকা ডোনেশন দিতে হয়। এ কথা হায়ার সেকেন্ডারী পড়বার সময় বহু মাস্টারের কাছে শুনেছে। আর প্রফেসরী—অনেক গ্যাঁড়াকল। তোমার মত একটা ছেলে আমার দরকার। কমিশন ভিত্তিতে কাজ করবে। আস্তে আস্তে অরুণ কলেজ যাওয়া বন্ধ করে প্রমোটারের সহকারী হল। দারুণ স্বাস্থ্য, লেখাপড়ায় ভাল ছিল। এক বছরের মাথায় কাজ শিখে গেল। পার্টির ক্যাডার হল। রিভলবার ছুঁড়তে শিখল। মাঝে মাঝে এ্যাকসনেও যেত। এবার একটা বাড়ি ভাড়া নিয়ে নিল। খুব ভালো ভাবে হায়ার সেকেন্ডারী পাস করবার

পর মিতাকে নিয়ে এল। —দাদা, পড়া ছেড়ে দিয়েছিস—বাবার স্বপ্ন। —ও হবে না মিতা, প্রফেসার দূরে থাক— মাষ্টার হতেও এখন লাখ টাকা ডোনেশন দিতে হয়। এম.এ. তে ফিফটি ফাইভ পার্সেন্টি নাম্বার পেতে হবে—তারপর পরীক্ষা দিতে হবে। সেখানে তুমি যদি আগে ক্যাডার না হয়ে থাক— তবে খুব মুস্কিল। মিতা এ সব কথা যে শোনেনি তা নয়। মনটা ভেঙে গেল। এবার অরুণ একদিন মামাবাড়ি গিয়ে ওদের জিনিস পত্র নিয়ে এল। বাবার আলমারী—খাট— যা ছিল—ধূলায় মলিন জড়ো করা বাবা মার ফটো। দিদিমা মারা গেছে। অরুণ একটা টেম্পো করে জিনিস নিয়ে এল। অরুণ কারো সঙ্গে বিশেষ কথা বলল না। শেষে দাদু এসে জানাল—এগুলো আমি দিয়েছিলাম। এগুলো বাবার জিনিশ—আমাদের প্রাপ্য। আপনি বড় বাজে কথা বলেন—এখান থেকে যান। অরুণের চোখে আগুন জ্বলছে। দাদু বললেন—সেই সান অফ এ বীচের ...। হঠাৎ অরুণ উঠে এসে দাদুর গালে এক থাপ্পড় মেরে ইংরেজিতে বলল—বুড়ো কুকুর। কোনদিন যদি বাবার সম্পর্কে একটা কথা বল—তোমার হাড় গুড়িয়ে দেব। তুমি নিজে সান অফ এ বীচ—তাই মার মত মেয়ের বাপ। তোমার বাড়িতে শুধু বেশ্যা প্রসব হয়—আর কিছু না। ফ্লুয়েন্ট ইংরেজিতে এ কথা বলে জিনিস পত্র নিয়ে চলে এল। মামারা হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। কেউ সাহায্য করতে এগিয়ে এল না। অনেকক্ষন পর দাদু বললেন—জেনকিন্স সাহেবের সোর্স থাকলে ওকে আমি থানায় পুরতাম। টেগার্টের মত পুলিশ কমিশনার......অরুণ অবশ্য ঠিকানা দিয়ে এসেছিল।

মিতা কলেজের প্রথম বছর শেষ হবার আগেই মডেলিং এ চান্স পেয়ে গেল। একজন মহিলা প্রফেসরের পরামর্শে ওর যোগাযোগ ঘটল। একে তো দেখতে অবিকল মীনা। তারপর ইংরেজি মিডিয়ামে পড়ার ফলে যেমন স্মার্ট, তেমনি ফ্লুয়েন্ট। তাছাড়া আঠার বছর পার হতেই উকিল-কাকা মিতার টাকা মিতার নামে জমা করে দিলেন। তিনি জানতেন, মিতা পড়ছে। মডেলিং ট্রেনিং নিল। তারপর মিতার নাম হতে লাগল। ওর ডায়েটিং, ডিসিপ্লিন, অভিনয় ক্ষমতা। বিজ্ঞাপন ক'টা করবার পর ওর নাম হয়ে গেল। হিন্দি, ইংরেজি, বাংলা বিজ্ঞাপনে মিতার দারুন চাহিদা, প্রচুর টাকা।

অরুণ এখন নাম করা প্রমোটার। পার্টির দৌলতে ওর সোর্স অফুরন্ত। ইলেকসনের সময় ওর চাহিদা প্রচুর। এ্যাকসনে যেমন নির্ভীক, তেমন নিপুণ। আরেকটা তিন রুমের ফ্ল্যাটে ওরা উঠে এল।

আসবার কিছুপরে একদিন মীনা এল। শীর্ণ চেহারা। দেখলে বোঝা যায় সুন্দরী, এখন সৌন্দর্যের অন্তিম পর্ব।

—অনেক ঘুরে তোদের সন্ধান পেলাম। ঐ বাড়ি থেকে ঠিকানা নিয়ে গিয়ে শুনলাম—এ বাড়িতে এসেছিস। ট্যাক্সি করে ঘুরে ঘুরে এলাম।

মীনা বসে হাঁফাতে থাকে। —তোর নাম বলতে, একটা ছেলে ধরে আমাকে তুলে দিল। আর্থারাইটিস সর্বাঙ্গে। তিন মাস হাসপাতালে ছিলাম। কিছু খেতে দে।

মিতা কিছু খাবার এনে দিল।

—কতকাল পরে তোদের দেখতে পেলাম। অরুণ তো তাঁর বাপের মত হয়েছে। মিতাকে দেখে তো চিনতে ভুল হয় না। বোম্বে থেকে আসছি। শেষ ক'টা দিন তোদের কাছেই থাকব।

দু'জন কিছু বলে না। মিতা ওর নিজের ঘর ছেড়ে দিতে চায়। বাধা দিয়ে অরুণ বলে, আমার ঘরটা দে। আমি বসবার ঘরে থাকব। অরুণের ঘরে মীনা এসে শুয়ে পড়ে। সঙ্গে ওষুধপত্র। প্রেসকৃপসন। দুপুরে খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। ভাই-বোন কাজে বেরিয়ে যায়।

এবার মীনার কথা একটু বলা যাক।

মীনা সেই পরিচালকের কাছে ঘোরাঘুরি আরম্ভ করল। তার আগে দুটো বই ফ্লপ করেছে। মীনাকে দেখিয়ে প্রডিউসার জোগাড়ের চেষ্টা করতে লাগলেন। শেষ পর্যন্ত মীনাই প্রডিউসারের সঙ্গে যোগাযোগ করে, খাতির জমিয়ে, মদ খাইয়ে, তার সঙ্গে কিছুকাল থাকবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে—তাকে রাজি করাল। কিন্তু মীনা অভিনয় করতে পারে না—মৃত্যুর দৃশ্যে চিৎকার করে কাঁদছে—মুখে বেদনার ছাপ নেই। বই ফ্লপ করল। মীনার সৌন্দর্যের প্রশংসা হল—তবে অভিনেত্রীর কোনো যোগ্যতা নেই। প্রতিটি আলোচনায়, রিভিউতে এই কথাই প্রতিধ্বনিত হল। শেষ পর্যন্ত একজন পরামর্শ ছিল—আর্ট ফ্লিমে যান। কিন্তু সেখানেও জায়গা হল না। এখানে কাহিনীর চেয়ে অভিনয় দক্ষতা কম প্রয়োজনীয় নয়। অনেকে পরামর্শ দিল—হিন্দিতে যান—ওখানে গ্লামারের প্রয়োজন। কিন্তু সেখানেও নাচ, গান অনেক কিছু প্রয়োজন। অভিনয় তো অবশ্য। কোনো সুযোগই পেল না। তারপর রক্ষিতা হিসেবে অনেকের কাছে ছিল। কিন্তু কাউকেই বেশি দিন সহ্য করতে পারে না মীনা। একজন ছেড়ে আরেক জন। এমনি করে বহু বছর—বোম্বে, রাজস্থান, দিল্লী, কত জায়গায় কতজনের রক্ষিতা ছিল সে হিসেব বোধ হয় মীনা দিতে পারবে না। তারপর কানপুরে এসে ওর বাতের ব্যথা শুরু হল। কিছুকালের মধ্যে পা নাড়তে পারে না। পায়ের আঙুল আড়ষ্ট। হাত ফুলে কী ভয়ঙ্কর যন্ত্রণা—নিজে খেতে পারে না। ওকে হাসপাতালে ভর্ত্তি করে দেয়া হল। নিজের যা টাকা ছিল—গেল। সেই ভদ্রলোকও কেটে পড়লেন। তারপর গয়না বিক্রি করে হাসপাতালের পাওনা মিটিয়ে কলকাতা এলেন। এসে বাপের বাড়ি দরজা খুলতেই বাবা বললেন—তোমার ছেলেরা যোগ্য হয়েছে—তাদের কাছে যাও—যদি তারা না নেয়—তবে গলায় দড়ি দিও। মা, মাসী সব হচ্ছে প্রস্টিটিউট—আমি সান অব বীচ। তিনি দরজা বন্ধ করতে যাচ্ছিলেন-ছোট ভাই ঠিকানা দিল। ট্যাক্সিকে সেই মত নির্দেশ দিল। সেই বাড়িতে বলল—ওরা তো উঠে গেল—আপনি ঐ পাড়ায় গিয়ে যাকে জিজ্ঞেস করবেন—সেই বলে দেবে। সেই পাড়ায় এসে একটি ছেলেকে বলতেই বলল—ও, অরুণদার বাড়ি—আপনি নিশ্চয়ই মিতাদির মা বা মাসী। সেই ছেলেটি ধরে ধরে ওকে তুলে দিল। ট্যাক্সির ভাড়া মিটিয়ে ছেলেটির সাহায্যে আসতে আসতে ভাবছিলেন—ওদের চিনতে পারব তো—ওরা চিনতে পারবে তো?

মীনার অস্টিও আর্থারাইটিস। ডাক্তার বলেছেন, সেই সঙ্গে ডায়াবেটিস ও হাইপ্রেসার। অরুণ মা'র সঙ্গে প্রায় কথাই বলে না—তবে বড় বড় ডাক্তার দেখিয়েছে। সবসময়ের জন্য আয়া রেখে দিয়েছে। মিতা এসে দেখে যায়। বসে কখনও কখনও। সব সময় মীনার মুখে রোগের কথা। রোগ ছাড়া অন্য চিন্তা নেই। ছেলে মেয়ে কে কখন যায় আসে—তা জানতে আগ্রহ নেই। ওরা কি করে, জিজ্ঞেস পর্যন্ত করেনি। শুধু বলে, যে ক'টা দিন আছি—তোদের কাছেই থাকব। বোধ হয় ভয় ওরা তাড়িয়ে না দেয়।

যেমন তাড়া দিয়েছে বাবা। তবু কিসের জন্য একটা ছটফটানি দিনের বেলা।

সেদিন রাতে ডাইনিং টেবিলে বসে অরুণ ও মিতা। যাবার শেষে ওরা এক পেগ করে হুইস্কি খায়। মাপা। একটুও বেশি নয়। অরুণ বলল—মিতা, নতুন যে বাড়িটা করছি—তাতে তোর নামে একটা ফ্ল্যাট সাউথ ফেসিং, আর আমার নামে একটা ফ্ল্যাট সাউথ ফেসিং। চার রুমের ফ্ল্যাট—বিলাস বহুল।

মিতা বলল—ঠিক আছে নেব। যা দাম, জানিয়ে দিস।

—মাকে নিয়ে কী করা যায় বলত?

—পালা করে তোর আর আমার কাছে থাকবে—না মরা পর্যন্ত।

—তোকে একটা কথা বলিনি মিতা, উকিল কাকা এসেছিলেন। দুকাটা জায়গা করেছেন—আমার কাছে পরামর্শ নিতে। অত ছোট কাজ আমি নিই না। তবে তা বললাম না। গেলাম আমাদের শহরে। কে আর আমাকে চিনবে। ওকে একটা সুন্দর তিনরুমের ফ্ল্যাট করে দিয়েছি। একটা পয়সাও নিইনি। বললাম, আমার আর আমার বোনকে অনাহার ও অপমান থেকে আপনি বাচিয়েছেন। দুটো জীবন আপনি রক্ষা করেছেন। এ আমার কৃতজ্ঞতা নয়। এ আপনার দায়িত্ববোধের স্বীকৃতি।

—তুমি আমাকে বললে, আমিও কনট্রিবিউট করতাম।

—ঠিক আছে। একটা কথা বলছি। তিনটি মেয়ে আমাকে বিয়ে করতে চাচ্ছে। ওর মধ্যে একটি খুবই সুন্দরী। কাকে চয়েস করি বলত?

—বিয়ে করবি?

—তাই ভাবছি, বনিবনা না হলে লাথি মেরে তাড়িয়ে দেব।

—তা হলে সবচেয়ে কম সুন্দরী মেয়েটিকে বিয়ে কর। অনুগত হয়ে থাকবে। আমার সঙ্গে পরিচয় করে দিস—আমার চয়েস আমি দেব।

—তুই বিয়ে করবি না? বাবা-মার ইতিহাস নিয়ে ভয় পাচ্ছিস—ও নিয়ে আজকাল কেউ মাথা ঘামায় না।

—বাবার ডাইরীগুলো সব পড়লাম। কী যন্ত্রণা বাবা পেয়েছেন—মা কি অত্যাচার বাবার ওপর করেছে—শেষ পর্যন্ত শহরে বাবার মুখ দেখাবার উপায় ছিল না।

—শেষের দিনটা মনে আছে?

—যখন হোস্টেলে থাকতাম। বাবার মৃত্যুদিন আমি একটা ফুল বাবাকে দিয়ে স্মরণ করতাম।

—বাবারা ভালবাসাকে এত গুরুত্ব দিতেন। ভালবাসা যেন জীবন মরণ ব্যাপার। এত রোমান্টিক ফুল ছিল—ঐ জেনারেসন।

—তোর বাবার ওপর সিমপ্যাথি নেই।

—সিমপ্যাথি বা সেন্টিমেন্টালিটি নেই। তবে বাবাকে ভালবাসতাম এ কথা মনে আছে। বাবাও আমাদের ভালবাসতেন তা মনে আছে। অনেক অতীত—পুরানো স্মৃতি—আমি ভাবি না। তা তুই বিয়ে করবি না।

— না রে। আমার কেরিয়ার আমি বিয়ে করে নষ্ট করব না। সে রকম কোনো আর্জ যদি ফিল করি—তবে লিভ টুগেদার।

—মাও তো সারাজীবন.......।

—না, মা'র মত নয়। দু'জনে কনটাক্ট হবে। কনট্যাক্টচুয়াল লিভ টুগেদার। তবে তা যে করবই বলছি না। সেক্সের জন্য স্লেভারী করব না নিশ্চয়ই। আসলে কিছু ঠিক

করি নি। আচ্ছা বলতো, মা অভিনেত্রী হতে পারল না কেন?

—মা'র অভিনয়ের টেলেন্ট নেই।

—কেন নেই?

—নেই।

—তা নয়। অত উগ্র প্রকৃতির মানুষ অভিনয় করতে পারে না। আর ঘর বাধতে পারল না কেন?

—রেষ্টলেস সেক্সসুয়াল আর্জ।

—তা এসেছে—ক্রমাগত পদ মর্যাদাসম্পন্ন লোকদের সেক্স দিয়ে বশ করে ডমিনেট করা। যেই বশ হত—মা'র আর্জ চলে যেত।

—মা সম্পর্কে আমার কোনো ইন্টারেস্ট নেই। তুই মনে করিয়ে দিলি—তাই বাবার কথা মনে পড়ল। নইলে বাবা-মা'র কোনো আবেদন আমার কাছে নেই। দু'জনেই শুয়ে পরে দু'ঘরে।

মীনা তখনও জেগে। ওরা শুয়ে পড়তেই আস্তে আস্তে অতি কষ্টে টর্চ জ্বেলে হাটতে হাটতে ডাইনিং রুমে আসে। তারপর ফ্রিজ খুলে কাঁপতে কাঁপতে একটা গ্লাস হুইস্কি অনেকটা ঢালে। তারপর বোতল রেখে গ্লাসটা নিয়ে অতি কষ্টে বিছানায় এসে বসে তারিয়ে তারিয়ে গ্লাসটা শেষ করে। সারাদিনের ছটফটানি কাটে। এবার ঘুমিয়ে পড়ে।

মা যে ডাইনিং রুমে এসে হুইস্কি খাচ্ছে—বা গ্লাসে ঢেলে নিয়ে যাচ্ছে—ভাই-বোন দু'জনেই তার টের পায়। কিন্তু তারা যে জেগে আছে তা জানতে দেয় না।

মীনা সারাদিন এই সময়টার জন্যে অপেক্ষা করে।

পরপর দু'টি অপমৃত্যুতে কমলা পাথর হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু মনে মনে স্বামীকে কথা দিয়েছিল—তোমার ছেলেমেয়েকে আমি মানুষ করব।

শক্ত হাতে সমস্ত বিষয় সম্পত্তির হাল ধরল। ছেলে মেয়েদের নিজে আর্মড ও গার্ড নিয়ে স্কুলে পৌছে দিত। সেখান থেকে নার্সিংহোম যেত। তারপর ডিসপেনসরি হয়ে ছেলেমেয়েদের নিয়ে বাড়ি ফিরত। ডিমপেনসরির ভদ্রলোক ওর সবচেয়ে সহায় ছিলেন। তিনিই ভাড়া আদায় করে দিতেন। কমলার মা একা ঘরে বসে ছেলের জন্যে কাঁদতেন। নাতি নাতনীকে দেখবার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠতেন। কিন্তু কমলা তাতে সাড়া দিত না। এমনি করেই চলছিল। দেশের জমি জমা যেটুকু ছিল —তা দখল হয়ে গেছে—কেবল বিরাট বাড়িটা আছে। পূজোর ক'দিন আর্মড গার্ড নিয়ে ছেলে মেয়ে নিয়ে দেশের বাড়িতে কাটিয়ে আসতেন।

ওরা হায়ার সেকেন্ডারীতে কুড়ির মধ্যে ভাই বোন দু'জনেই ছিল। জয়েন্ট এনট্রেন্স পরীক্ষায়ও স্ট্যান্ড করল। তারপর দু'জনেই কলকাতায় মেডিক্যাল কলেজে ভর্ত্তি হল। দু'জনকেই হোস্টেলে রাখত। ওরা প্রথম প্রথম সপ্তায়ান্তে আসত। পরে মাসে একবার। তারপর কমে গেল আসা। ওরা এম.বি.বি.এস করল। এখানেই এম.ডি. করল।

মা চুপচাপ বসে থাকেন। কখনও কাঁদেন। কখনও কমলার কাছে বৌয়ের উচ্ছৃঙ্খলতার কথা—বরুণের শেষ প্রণামের কথা বলেন। নাতি নাত্নির জন্যে চোখের জল ফেলেন। তারপর একদিন—ওরা তখন এম.ডি. করছে, হঠাৎ মা'র সেরিব্রেল

আট্যাক হল। তক্ষুনি নার্সিংহোমে ভর্ত্তি করা হল। তারপর তিনদিন অজ্ঞান থাকার পর মৃত্যু নয়। কমলা মা'র শ্রাদ্ধ নিজে করে। ছেলে মেয়ের এম.ডি. হবার পর ওদের বিলেত পাঠান। সেখানে বেশ কয়েক বছর পর ওরা সর্বোচ্চ ডিগ্রি পায়। মেয়ে হয় গাইনি, ছেলে নেফ্রোলজিষ্ট। কিন্তু ওরা আমেরিকার দুটো হাসপাতালে চাকুরী পেয়ে যায়। জয়েন করবার আগে মাত্র দু'দিনের জন্যে দেখা করতে আসে।

ঠিক এই সময়ই দেশের বাড়িতে হাসপাতাল করবার একটা পরিকল্পনা ওর কাছে আসে। কমলা দান করতে রাজি হয় একটা সর্তে—নাম হবে 'নরেন্দ্র মেমোরিয়াল হসপিট্যাল'। ছেলেরাও রাজি হয়। মাকে পাওয়ার অব এটর্নী দেয়। উদ্বোধনের দিন কমলা গিয়েছিল—রাজ্যপালের সঙ্গে অনেকক্ষণ গল্প করে। ওকে ট্রাষ্টি বোর্ডের মেম্বার করা হয়। কিন্তু কমলা আর যায়নি। ছেলের রঙ ফরসা—তবে মুখে বাবার আদল আছে। মেয়ের চেহারা কমলার চেয়ে দিদিমার মত অনেকটা। দু'জনেই কী স্মার্ট। কমলা বলল—তোরা দেশে থাকবি না?

দু'জনেই একসঙ্গে ঘাড় নাড়ে। —না, মা, বাবার মত এতবড় ডাক্তারকে যেখানে বাঁচতে দেয়নি—সেখানে আর নয়।

—এসব বিষয় সম্পত্তি নিয়ে কী করব।

—বিক্রী টিক্রী করে চলে এস আমাদের কাছে —আমেরিকায়।

—তা কি হয়। তোর বাবার বুকের রক্ত জল করে এত বড় বিষয় করেছে। তোর ঠার্কুদা সেকালের এম.বি হয়েও নিজের শহর ছাড়েনি। তোরা ছেড়ে দিবি সব।

—মা, ও দেশে না গেলে সভ্য দেশ, মুক্ত সমাজ এসব বোঝানো যায় না। ওখানে ডাক্তারের দায়িত্ব আর মর্যাদা—তা ছাড়া মা ওখানে মানুষের জীবনের মূল্য অনেক। মানুষের মর্যাদাও অনেক।

ওরা চলে যায়। কিছুকাল পর খবর পায়—ওরা একে একে বিয়ে করেছে। মেয়ে যে হাসপাতালে কাজ করে সেই হাসপাতালের এক ডাক্তার—হরিয়ানায় ওদের বাড়ি—তাকে বিয়ে করেছে। ছেলে করেছে মাদ্রাজের আয়ার ফেমিলির একটি মেয়েকে—মেয়েটি কার্ডিওলজিস্ট।

ওরা সদলবলে বিয়ের দু'বছর পরে এল। দু'জনের কোলেই বাচ্চা। ওদের সঙ্গে সঙ্গে বহুকাল পরে কমলা কলকাতা এল। বেথুন স্কুল, বেথুন কলেজ দেখে মন অধীর হয়ে ওঠে। কলকাতা বদলে গেছে, এত লোক—বাড়ি ঘর—স্কাইস্ক্রেপার—বহুতল ফ্ল্যাট—তারপর নিত্য লোডসেডিং। ওরা ক'দিন হৈচৈ করে চলে গেল—মেয়ে গেল হরিয়ানায়। ছেলে গেল মাদ্রাজে। দু'জনেই দু'জায়গা থেকে প্লেন ধরবে। ইতিমধ্যে নার্সিংহোমে নানা অনিয়ম, দুর্নীর্তি দেখা দিতে লাগল। কমলা সামলাতে পারে না। ডাক্তারদের মধ্যে দলাদলি। ইউনিয়ন করেছে। নিত্য ঝামেলা। তারপর বিরক্ত হয়ে কমলা এক মাড়োয়ারীর কাছে নার্সিংহাম বেঁচে দিল। টাকাটা ফিক্সড ডিপজিট করে রেখে দিল। বাড়ি দু'খানা ভেবেছিল—একটা ছেলের নামে—একটা মেয়ের নামে লিখে দেবে—ওরা কেউ এখানে থাকবে না। বাড়ি দুটো প্রমোটারের কাছে বিক্রী করে দিল। টাকা ব্যাংকে ফিক্সড় ডিপসিট করে দিল। মোটর ড্রাইভারের মৃত্যুর পর গাড়িও বেচে দিল। কেবল আমর্ড গার্ড রইল। তারও বয়েস হয়েছে। ডিসপেনসরির সেই ভদ্রলোক

এখনও আছেন—তার দুই ছেলেও ঐখানেই কাজ করে। এখন কমলার আয় কেবল ডিসপেনসরী থেকে। তবে ব্যাংকে সুদ বেড়েই চলেছে। আমর্ড গার্ডটি দেশে গিয়ে মারা যায়। এবার একতলা কমলা ভাড়া দিয়ে দেয়। ব্যাংকে রিক্সায় একা যায়। ব্যাংকের সবাই কমলাকে খাতির করে—পাস বইগুলো দু'তিন মাস, অন্তর কারেন্ট করে। টাকা জমা দেয়—তোলে। পুরানো বামনদি মরে গেছে। এখন তার বিধবা মেয়ে সারা সময়—রান্না বান্না—ঘরদোর পরিস্কার—সবই করে। কিছুকাল আগে ছেলে মেয়েরা এসেছিল—মা'কে ওদের সঙ্গে যেতে বলল।

—দেখ, আমি এককালে অনেক ইংরেজি-আমেরিকান উপন্যাস পড়েছি। ওদের সমাজে বিয়ের পর ছেলে মেয়ের সঙ্গে বাবা-মা থাকে না। তোরা বিদেশে—বিদেশীর মত চলবি। রোমে রোমানদের মত ব্যবহার করতে হয়। ছেলেরা যতক্ষণ থাকে— বৌরা কেউ বাংলা জানে না। শাশুড়ির ইংরেজি শুনে অবাক হয়ে যায়। ওদেশের হালচাল শাশুড়ি জানে।

—ক'দিন গিয়ে থেকে আসবে, চল।

—না রে, তোর বাবার বাড়িতেই থাকব। আমার জন্যে এ বাড়ি নিজে থেকে দাঁড়িয়ে তৈরি করেছিল। জমিদারের ছেলে তো। তাই এত বড় বাড়ি। তোর বাবার স্মৃতি ছেড়ে আমি কোথাও যাব না।

—ছেলেকে বলল—দেখ, বাবার জন্যে একটা গয়ায় গিয়ে পিণ্ড দে—মানিস না মানিস। শুধু আমার দিকে চেয়ে।

—না, মা, ওসব রিচুয়াল—পারব না।

ওরা চলে গেলে। কমলা ডিসপেনসরির একটি ছেলেকে দিয়ে গয়ায়—স্বামীর পিন্ড, দাদর পিণ্ড, মার পিণ্ড, বাবার পিণ্ড, এমনকি নিজের পিণ্ডও দিয়ে আসে।

এর পরও কয়েক বছর কেটেছে। ছেলে মেয়ে চিঠিও অনিয়মিত। কালে ভাদ্র ফোন করে। কমলা একটা দান পত্র লিখেছে। ওর মৃত্যুর পর ডিসপেনসরিটা ওই ভদললোককেই দিয়ে দেবে—সে যদি জীবিত না থাকে—দু'ছেলেকে—তবে নাম পাল্টাতে পারবে না। আর ব্যাঙ্কের টাকা—ছেলে ও মেয়ে। আর বাড়িটা একটা হেলথ সেন্টারের জন্যে দান করবে।

কমলার চুল কিছু পেকেছে। বয়েস মধ্য পঞ্চাশ। কেমন ভেতর থেকে আর জোর পায় না। কোন কিছুতে আগ্রহ নেই। নিজের শোবার ঘরে নরেনের বড় এনলার্জ করা ফটো। পাশের ঘরে দাদার এনলার্জ করা ফটো। ছেলে মেয়েদের ঘরে প্রত্যেকের আলাদা ফটো। বৌ জামাই ও নাতিদের ফটো এলবামে। বাড়িতে রেডিওগ্রাম, প্রজেক্টার, টি.ভি., রেকর্ডপ্লেয়ার সবই আছে। কিন্তু এ বাড়িতে গান কোনদিন আর বাজেনি।

আজকাল কমলা কেবল কাঁদে। ওর বকেয়া কান্না কি সেরে নিচ্ছে? রাঁধুনি শুধু সাক্ষী। কমলা কাঁদে—যখন তখন কাঁদে—সময় অসময় নেই কাঁদে—ঘুমের আগে কাঁদতে কাঁদতে ঘুমিয়ে পড়ে—ঘুমের মধ্যে কেঁদে ঘুম ভেঙে যায়। ঘুম ভেঙে, ঘুমের কান্নাটি শেষ করে।

সোফায় বসে থাকে। আজকাল দাদার কথা বড় মনে পড়ে। সেই দাদা নতুন ইংরেজি উপন্যাস আনত। শুয়ে শুয়ে পড়ত। পেছনে দাঁড়িয়ে কমলাও পড়ে যেত। তারপর

দাদার সঙ্গে আলোচনা। দাদা বেণী খুলে দিত। কতদিন—বাবার মৃত্যুর পর—মা একটু সাগু রাতে খেত— শুধু চিনি দিয়ে কোয়াটার পাউন্ডের দু'টি পাউরুটি দু'জনে খেয়েছে। দাদা তার থেকে ছিড়ে ওকে দিতে চেয়েছে—ও না নিয়ে পালিয়েছে। দু'জনেই জানে কারো পেট ভরেনি। কতদিন রাতে মা ছাতু মেখে নুন, চিনি লঙ্কা দিয়ে মেখে দিয়েছে—অপূর্ব স্বাদ। কত গরীব ছিল—কত আনন্দ ছিল। বাড়িওয়ালার কাছ থেকে কত ধার করে নিয়ে আসা। দাদা প্রফেসরী পাওয়ার পর কি আনন্দ—এবার ওদের নিয়মিত আয়। দাদার ফটোর সামনে এসে কমলা দাঁড়ায়। চেয়ে থাকে এক দৃষ্টিতে। তারপর বলে, দাদা, দাদাগো, মরলে কেন? এভাবে নিজেকে মারলে কেন? জানি, কেন মরেছ, বৌদিকে ভালবেসে বড় একলা হয়ে গিয়েছিলে—সেই একলা হবার অপমান আর যন্ত্রণা থেকে বাঁচবার জন্যে মরেছ। দাদা মরবার সময় আমার কথা কি মনে পড়েনি। আমি তোমার একমাত্র বোন—তুমি আমার একমাত্র ভাই—দাদা—দাদাগো—আমাকে ফেলে গেলে—আমাকে মনে পড়ল না—দাদা, দাদাগো—আজ এমন করে আমার মনে কেন বারবার জান না—আমি কী ভীষণ একলা—ও দাদাগো। কমলা ছবির নিচে মাথা রেখে কেঁদে চলে—কান্নায় শাড়ি ব্লাউজ ভিজে যায়। কখনো স্বামীর ফটোর দিকে তাকিয়ে বলে, তুমি বলতে গান বাজলে—যে বাড়িতে গান বাজনা হয়—সে বাড়িতে দুঃখ শোক বাইরে থেকে কলিংবেল বাঁজাতে ইতস্তত করে। আর ঘরে শোক-দুঃখ থাকলে—ঘরে গান বাজলে শোক দুঃখ দরজা দিয়ে বের হয়ে যায়। বল, তুমি বল, এতকাল তো চুপ করে রইলে—আমি গান বাজাতে পারি—শোক, দুঃখ, কষ্টকে ঘর থেকে তাড়াতে পারি। আমার শোকের মধ্যে তুমি, দুঃখের মধ্যে তুমি, কষ্টের মধ্যে তুমি। আমি কি গান বাজাতে পারি। কেন, জেনে শুনে মরতে গেলে। আজ আমি এত একলা—তুমি আমাকে এমন করে একা করে দিলে। কমলার চোখ কান্নায় ঝাপসা হয়ে যায়।

—বছরের পর বছর—আমি একা। ছেলে মেয়ের ফটোর কাছে এসে দাঁড়ায়—তোরা কোনোদিন মায়ের দুঃখ বুঝলি না। বুঝতে চাসও নি। তোরা নির্ভর করেছিস—আমাকে বুঝিস নি। ভালও কি বেসেছিলি তোরা? সত্য বলতো? ভালবাসলে এমন করে চলে যেতে পারতিস? তোরা আমাকে সব একা করে দিলি।

সন্ধ্যায় দক্ষিণা বাতাসে ঘরের পর্দাগুলো উড়তে থাকে। সেই আধো অন্ধকারের ঘরে ঘরে কমলার আর্তনাদ—আমি একলা—কেন আমি এত একলা—কতকাল আমি একলা। কতকাল আমি কেবল একা—কেবল একা.....। বাতাসে বাতাসে কমলার আর্তনাদ ভেসে বেড়ায়—আমি একলা—কতকাল......। কেউ সেই আর্তনাদ শোনে না। পাশে নিচে ঘরে ঘরে মানুষ তখন টেলিভিশনের দিকে তাকিয়ে যৌন উত্তেজনা, হিংস্রতার রস ও রাজনীতির নোংরা সংবাদে আত্মমগ্ন। শতাব্দীর এই একলা হবার আর্তনাদ কমলা কি পারবে আগামী শতাব্দীতে পৌঁছে দিতে?